ভারতীয় অর্থবিদ্যা

[প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড]

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ
অরুণকুমার সেন, এম্. এ. (সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত),
এম্. এস্-সি. (ইকন্., লণ্ডন), ব্যারিষ্টার এ্যাট্-ল্
প্রণীত

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এস্-সি.
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

চতুর্থ সংস্করণ—আগষ্ট, ১৯৬০

মূল্য নয় টাকা

মুদ্রাকর :

শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬নং তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

শ্রীলালমোহন দত্ত
সাধনা প্রেস
৩১।১নং ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ভারতীয় অর্থবিদ্যার সম্পূর্ণ পরিমার্জিত রূপে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ববর্তী সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বিশেষ না হইলেও ইতিমধ্যে বিষয়বস্তুর যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা একরূপ অবর্ণনীয়। এখন দ্বিতীয় পরিকল্পনা সমাপ্তির পথে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সম্ভাব্য ফলাফলের বিচারও করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তুতি হিসাবে কর-ব্যবস্থা, শ্রমনীতি প্রভৃতির যথাযোগ্য পরিবর্তনসাধনও করা হইয়াছে। স্বভাবত, এই সকল পরিবর্তনের ভিত্তিতেই বর্তমান সংস্করণের পরিমার্জনাকার্য করিতে হইয়াছে।

বর্তমান দিনে ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা একপ্রকার নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। এই আলোচনা এখন অর্দ্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়। বর্তমান সংস্করণে এই রীতিও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার যে-সকল সহকর্মী বন্ধু তথ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক লোকরঞ্জন দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিটি কলেজ, কলিকাতা
২রা আগষ্ট, ১৯৬০

অরুণকুমার সেন

শুদ্ধি

	আছে	হইবে
ণ্ডের ৪২৬ পৃষ্ঠার ১৯শ লাইন	কার্যের সন্তোষজনক সর্তাদির	কার্যের 'অ'সন্তোষজনক সর্তাদির
২য় খণ্ডের ৯৭ পৃষ্ঠার ২য় লাইন	১৯৪৯ সালের জুন	১৯'৫'৯ সালের জুন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার প্রকৃতি ও আলোচনাক্ষেত্র

(Nature and Scope of Indian Economics)

আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতীয় অর্থবিদ্যা। অনেকে প্রশ্ন করেন, "ভারতীয় অর্থবিদ্যা আবার কি বস্তু?" ব্রিটিশ মার্কিন ফরাসী অথবা চৈনিক অর্থবিদ্যা বলিয়া ত' কোন শাস্ত্র নাই। অর্থবিদ্যা যখন একটি বিজ্ঞান তখন ইহার মূল তত্ত্বগুলি সর্বত্রই প্রযোজ্য। উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে অথবা শিল্পোন্নত ও কৃষিপ্রধান সমাজের মধ্যে পার্থক্যের কারণে অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে বিভিন্নতার সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষের মূল প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া সকল দেশেই ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের সূত্রগুলি মূলত একই হয়। সুতরাং 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিয়া কোন পৃথক্ শাস্ত্রের কল্পনা করা অযৌক্তিক। ভারত ত' আর সৃষ্টি-বহির্ভূত দেশ নয়!

'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি প্রাচীন ব্যাখ্যা

যাঁহারা 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, উপরি-উক্ত যুক্তি যেমন সত্য ইহাও তেমনি অনস্বীকার্য যে দেশ ও সমাজ-ব্যবস্থা ভেদে অর্থনৈতিক সমস্যারও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এই পার্থক্য যদি বিশেষ গভীর হয় তবে সাধারণ অর্থবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলির বিচার, বিশ্লেষণ ও সমাধান করিবার চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ ভুল করা হইবে। এই দিক দিয়াই বিচারপতি র‍্যাণাডে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯২ সালে তিনিই সর্বপ্রথম কথাটি ব্যবহার করেন।

পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের সমাজ-জীবনের মধ্যে পূর্বতন বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য

ভারতে বিদেশী শাসকবর্গের নীতি ছিল পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার সূত্রগুলিকে এই দেশে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করা। র‍্যাণাডে প্রমুখ মনীষিগণ ইহার মধ্যে পাইয়াছিলেন অমংগলের সুস্পষ্ট ইংগিত। সুতরাং তাঁহারা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। র‍্যাণাডে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য দেশসমূহ এবং ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সকল দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ; প্রতিযোগিতা এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা (religious indifference)। অপরদিকে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যৌথ পরিবার, প্রথা (custom) এবং একরূপ ধর্মান্ধতা। ভারতে ব্যক্তি নয়—পরিবারই সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্র; প্রতিযোগিতা নয়—প্রথাই এদেশে অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে; এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার স্থলে আছে এক অনন্যসাধারণ

সমাজ ও ধর্মবোধ (socio-religious outlook)। পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যা যে-যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতে তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার সূত্রগুলির প্রয়োগ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত তাহাদের পরিবর্তনসাধন করিয়া অর্থবিদ্যার যে-শাস্ত্র চর্চা করা হইবে তাহা 'একান্তভাবেই ভারতীয়' হইবে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যা 'একান্তভাবেই ভারতীয়' হইবে

র‍্যাণাডের উপরি-উক্ত প্রতিবাদের পর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আজ আর বলা যায় না যে পাশ্চাত্য দেশ ও ভারতের আর্থিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ গভীর। বর্তমানে যৌথ পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে; প্রথা আজ আর বর্তমানে আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না বলিলেই চলে—তৎপরিবর্তে সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছে প্রতিযোগিতা; লোকের ধর্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া দেখা দিয়াছে বস্তুবাদী (materialistic) জীবনদর্শন এবং ব্যক্তিগত ধর্ম-নিরপেক্ষতা। উপরন্তু, এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে-বিরাট নগরিকরণ (urbanisation) ঘটিয়াছে তাহার ফলে পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় সাধিত হইয়াছে অভূতপূর্ব ঐক্য; এবং সাম্প্রতিক পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা ঐক্যসূত্রকে করিয়াছে দৃঢ়তর। সুতরাং বর্তমানে এরূপ কোন ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার কল্পনা করা যায় না যাহা 'একান্তভাবে ভারতীয়ই' হইবে। বলা যায়, যেমন 'ভারতীয় পদার্থবিদ্যা' বা 'ভারতীয় রসায়ন' বলিয়া কোন নূতন বিজ্ঞান থাকিতে পারে না, তেমনি 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিয়াও কোন বিশেষ শাস্ত্রের কল্পনা করা যায় না। অবশ্য ইহা সত্য যে এখনও অর্থবিদ্যার সূত্রগুলিকে ভারতের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহা যে-কোন দেশের বেলাতেই সত্য। সকল দেশেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, র‍্যাণাডেও 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে সম্পূর্ণ কোন নূতন শাস্ত্রের চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইংগিত দেন নাই। পরিবর্তিত আকারে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার তত্ত্বগুলিকে ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ একই উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথক্‌ভাবে ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং করিতে বলিয়াছিলেন।*

বর্তমানে 'একান্তভাবে ভারতীয়' কোন বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় না

* অবশ্য অধ্যাপক ওয়াদিয়া, মার্চেন্ট প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় লেখকগণ মনে করেন যে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' কথাটি এক নূতন শাস্ত্রের অর্থে ব্যবহার করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। ইঁহাদের মতে, এ্যাডাম স্মিথ ম্যালথাস রিকার্ডো মিল প্রভৃতি অর্থবিদ্যাবিদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে-অর্থবিদ্যার পরিস্ফুটন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে যে নূতন অর্থবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে 'সোবিয়েত অর্থবিদ্যা' বলিয়া অভিহিত

এইভাবে র‍্যাণাডে, রমেশ দত্ত প্রদর্শিত পথে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চা সুরু হয় এবং পরে উহা একরূপ এক পৃথক্ শাস্ত্রে পরিণত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করে। এই পৃথক্ শাস্ত্র হইল জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের আর্থিক অবস্থা ও সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা। এই আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তববাদী, কোনমতেই তত্ত্বগত নহে। ইহাকে ব্যবহারিক অর্থবিদ্যার (applied economics) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার ন্যায় ভারতীয় অর্থবিদ্যার চর্চাও ফলপ্রদায়ী বা উদ্দেশ্যমূলক (fruit-bearing)। ভারতের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির উপাদান ও অর্থ নৈতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়াই এই পর্যালোচনার উদ্দেশ্য। ইহা অতীতের পটভূমিকায় সমস্যাগুলির উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করে, বর্তমানে সমস্যাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে।

বর্তমানে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা' বলিতে কি বুঝায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা প্রধানত ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যাসমূহকে লইয়া গঠিত এবং একরূপ সম্পূর্ণভাবে সমস্যাসমূহের সমাধানের উদ্দেশ্যে বলিয়া এই পর্যালোচনাকে বর্তমানে অনেকে 'ভারতীয় অর্থবিদ্যা'র পরিবর্তে 'ভারতীয় অর্থ নৈতিক সমস্যা' (Indian Economic Problem) বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত' এই শাস্ত্র'এই নূতন নামই গ্রহণ করিবে।

ভারতীয় অর্থবিদ্যাকে 'ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা' বলিয়াও অভিহিত করা যায়

ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র (Scope of Indian Economics)ঃ ভারতীয় অর্থ বিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। 'ভারতীয় অর্থ বিদ্যা' বলিতে ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং অর্থ নৈতিক সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই বুঝায়। এই আলোচনা বিশেষ গভীর ও ব্যাপক। ভারতীয় অর্থ বিদ্যার ছাত্রকে ভারতের ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ, ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির উপাদান, ভারতের জনগণ, ভারতের কৃষি ও শিল্প, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে সরকারী নীতি, ভারতে সমবায় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন, ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, ব্যাংক-ব্যবস্থা, ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, জাতীয় আয়-ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতে হইবে এবং ইহাদের সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধানের ইংগিত দিতে হইবে।

সম্প্রতি অর্থ-ব্যবস্থার নূতন রূপান্তর হেতু ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে। ইহা হইল স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা (*laissez faire* economy)

করিতে কোনই আপত্তি নাই। নয়া চীনের অর্থবিদ্যা আবার এই সোবিয়েত অর্থবিদ্যা হইতে কিছুটা পৃথক্। সুতরাং নয়া চীনের নিজস্ব অর্থবিদ্যা আছে। জার্মান অর্থবিদ্যাবিদ লিষ্ট (List) জার্মেনীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন অর্থবিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অতএব, 'একান্তভাবে ভারতীয়' কোন অর্থবিদ্যা সম্পূর্ণ সংগতভাবেই থাকিতে পারে।

হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় (planned economy) রূপান্তর। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে ভারতের প্রায় সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে আনয়ন করা হইতেছে। ফলে অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটিতেছে। পদে পদে এই হস্তক্ষেপের অনুসন্ধান করিয়াই ভারতীয় অর্থবিদ্যার ছাত্রকে পর্যালোচনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে ভারতীয় অর্থবিদ্যার আলোচনা-ক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে

ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত আর একটি বিষয় গভীরভাবে জড়িত আছে। ইহা হইল ভারতের অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার (underdeveloped economy) সম্যক উন্নয়নের প্রশ্ন। ভারত অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ। এই অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যই গ্রহণ করা হইয়াছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। বর্তমানে আবার অর্ধোন্নত দেশগুলির কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা একরূপ বিশ্বজনীনভাবে চলিতেছে। সুতরাং এই প্রচেষ্টার সহিত ভারতও সম্পর্কিত—ইহাতেও ভারতের ভূমিকা রহিয়াছে। ভারতীয় অর্থবিদ্যার ছাত্রকে এ-সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত জড়িত আর একটি বিষয়

ভারতীয় অর্থবিদ্যা পর্যালোচনার সার্থকতা (Utility of the Study of Indian Economics)ঃ ভারতের বিভিন্ন ও জটিল অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ করিতে হয় বলিয়া ভারতীয় অর্থবিদ্যা পর্যালোচনায় ভারতবাসীর দিক দিয়া কাম্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। ভারতীয়গণের মানসিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ-শিক্ষার স্থান নিশ্চয়ই রহিয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে যে-ভারতীয় সম্যক অবহিত নহে অনেকে তাহাকে প্রকৃত শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত করিতেই চাহেন না।

১। ইহাতে কাম্য শিক্ষার প্রসার ঘটে

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌছিয়াছি। প্রায় দুই শতাব্দীর পরাধীনতার পরে আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজের শাসন-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা করিতেছি। এ-চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে না যদি না ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে আপামরসাধারণের সম্যক জ্ঞান থাকে। সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা ইত্যাদি দেশের জনসাধারণের আদর্শের আপেক্ষিকই হয়। অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সংগঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শবাদী জনসাধারণের। এ-দিক দিয়া ভারতীয় অর্থবিদ্যা চর্চার গুরুত্ব যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও চলিবে।

২। স্বাধীন ভারতে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে

তৃতীয়ত, ব্যবহারিক জীবনেও ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চার ফল পরিলক্ষিত হয়। ভারতের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকিলে কৃষির ক্ষেত্রে সম্যক সংগঠন, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল কার্যই সহজে সম্পাদিত হইতে পারে।

৩। ব্যবহারিক জীবনেও এই চর্চার ফল পরিলক্ষিত হয়

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে ভারতীয় অর্থবিদ্যা-চর্চাকে সম্প্রসারিত করিবার। আজ শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলকেই ভারতের আর্থিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করিতে হইবে এবং ইহাদের সমাধানকল্পে নির্দেশিত পথ দিয়া ব্যক্তিগতভাবে চলিতে হইবে এবং অপরে যাহাতে চলে তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই পদ্ধতিতেই নিহিত আছে ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তি যাহার জন্য শত-সহস্র দেশপ্রেমিক স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature and scope of Indian Economics. (১-৪ পৃষ্ঠা)
2. What is the utility of the study of Indian Economics ? (৪-৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক পরিবেশ

(The Physical Environment)

অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব (Influences of Physical Features upon Economic Life):

যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় সকল দিকের উপরই প্রকৃতির পরিবেশের প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, ভৌগোলিক পরিবেশই অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রধান ভিত্তি। দেশের জলবায়ু ও শ্রমের দক্ষতা খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি নিরূপণ করে; বৃষ্টিপাত কোন্ কোন্ শস্যাদি উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ধারণ করে; নদী ও সমুদ্রোপকূল বহুল পরিমাণে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে; এবং এইভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা দেশের শিল্পবাণিজ্য, সরকারী আয়-ব্যয়, সরকারী অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভৃতি সকলই নিরূপিত, নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব রহিয়াছে

অপরদিকে, আবার ইহাও সত্য যে দিন দিন প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং ফলে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। সমুদ্র আজ আর অজানা নাই বা থাকিবে না; পর্বতের বাধা আর অলংঘনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না; বিভিন্ন স্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতাকে ইতিহাসের ঘটনায় পরিণত করিয়াছে; অরণ্যের

তবে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে

কবল হইতে পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া কৃষি-জমির সীমাবদ্ধতাকে দূর করা হইতেছে; এক দেশের মাটিকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত করিয়া এবং অন্যভাবে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা হইতেছে; ভূগর্ভে প্রোথিত কয়লা ও তৈল উত্তোলন করা হইতেছে; নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া নৌবাহ খাল খনন, বন্যা-নিরোধ প্রভৃতির ব্যবস্থাও করা হইতেছে; ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বোধ হয় কোনদিনই হইবে না। মানুষের কলাকৌশল এড়াইয়া যাইবার অদ্ভুত শক্তি প্রকৃতির আছে। প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্যের ফলে মানুষের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইতে পারে। সমুদ্রে বরফ জমিয়া সমুদ্রপোতের পথ রোধ করিতে পারে; ভূমিকম্পে বাঁধ ভাঙিয়া যাইতে পারে বা নদীর গতি পরিবর্তিত হইতে পারে; বরুণ-দেবতার কৃপণতার ফলে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতির উপর মানুষ যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা আংশিক মাত্র; এবং এই কারণেই কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় ঐ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবের আলোচনাও করিতে হয়।

কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই

এই কারণেই প্রাকৃতিক পরিবেশের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, অরণ্যসম্পদ প্রভৃতি সকলই অল্পবিস্তর ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন এ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

ভারতের আয়তন ও অবস্থান (Size and Location of India) ঃ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে অবিভক্ত ভারতবর্ষ ছিল একটি বিরাট উপদ্বীপ। বর্তমান ভারতীয় ইউনিয়ন অবিভক্ত ভারতবর্ষ হইতে আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও উহাকে বিরাট দেশ বলিয়া অভিহিত করিলে কোনরূপ অত্যুক্তি করা হয় না। বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের আয়তন হইল ১,২৬০ হাজার বর্গমাইলের কাছাকাছি।* ভূখণ্ডের আয়তনের দিক দিয়া ভারত পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সপ্তম স্থানাধিকারী। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ইউনিয়ন হইল গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় ১৩ গুণ এবং উপরি-উক্ত আয়তন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, হাংগেরী, রুমানিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, স্পেন, পর্তুগাল ও ডেনমার্কের সমষ্টিগত আয়তন অপেক্ষাও বড়। সুতরাং এখনও ভারত একটি বৃহৎ উপমহাদেশ—ক্ষুদ্র দেশ মাত্র নহে।

এখনও ভারত একটি বৃহৎ উপমহাদেশ—ক্ষুদ্র দেশ মাত্র নহে

জনসমষ্টির দিক দিয়া দেখিলে পৃথিবীতে ভারত দ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র। একমাত্র চীন প্রজাতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র জনসংখ্যায় ভারতকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই; সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ ভারতেই বাস করে। সুতরাং বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ একরূপ বৃহৎ হইতে বাধ্য।

* India—1959

ভারত পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উত্তরে হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান ও আরব সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে বংগোপসাগর, পূর্ব পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থানে অবস্থিত বলিয়া ইউরোপ, মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার সহিত বাণিজ্য চালান ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। ভারতের উপকূল-রেখাও বিশেষ দীর্ঘ। পরিমাণ ৩,৫০০ মাইলের উপর। কিন্তু ইহা অভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা বিশেষ কম। ফলে বহু ব্যয়ে নদীমুখে কলিকাতার ন্যায় বন্দর নির্মাণ করিতে হয় এবং উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

অবস্থানগত সুবিধা এবং অভগ্ন উপকূল-রেখাজনিত অসুবিধা

প্রাকৃতিক বিভাগ (Natural Divisions): ভূ-প্রকৃতি হিসাবে ভারতবর্ষকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল।

তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ

(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (The Mountain Zone of the Himalayas): পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা দ্বারা সীমানির্দিষ্ট হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল প্রধানত চারিটি ভাগে বিভক্ত—যথা, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবংগের উত্তরাঞ্চল এবং আসামের পার্বত্য অঞ্চল। পূর্বে এই অঞ্চলকে খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ নয় বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই অঞ্চলে কয়লা পেট্রোল জিপসাম পাথুরে লবণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ প্রভূত পরিমাণে ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে।

১। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ও ইহার গুরুত্ব

ভারতের আর্থিক জীবনেও হিমালয়ের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। হিমালয় ভারতের জলবায়ুর নিয়ামক। হিমালয় দ্বারাই মৌসুমী বায়ুর গতিপথ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সিন্ধু গংগা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি এই নিত্যবহ নদনদীগুলি হিমালয়ের তুষারগলা জলে পরিপুষ্ট। ভারতের অন্যতম প্রধান কৃষিজ দ্রব্য চা হিমালয় অঞ্চলেই অধিক উৎপন্ন হয়। চা ছাড়াও এই অঞ্চলে ধান্য, ইক্ষু ও নানাপ্রকার শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। জীবজন্তু ও বনসম্পদে হিমালয় অঞ্চল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দূরদূরান্তর হইতে পর্যটককে আহ্বান করিয়া আনে। দার্জিলিং মুসৌরী সিমলা নৈনিতাল শ্রীনগর উপত্যকার ন্যায় রমণীয় শৈলাবাসগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত।

(২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল (The Indo-Gangetic Plain): উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ বাদ দিয়া সমগ্রটা, পশ্চিমবংগ ও বিহারের হিমালয় অংশ বাদ দিয়া সমগ্রটা, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের নিম্নভূমিসমূহ এবং রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চল লইয়া সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল গঠিত। দৈর্ঘ্যে ১,৫০০ মাইল

এবং প্রস্থে ১৫০-২০০ মাইল এই অঞ্চল সিন্ধু গংগা ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের শাখা-প্রশাখার দ্বারা বিধৌত। এই নদনদীগুলির পলিমাটি দ্বারাই এই অঞ্চলের ভূমি গঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চল বিশেষ উর্বর। কৃষির দিক দিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

২। সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল ও ইহার গুরুত্ব

(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল (The Deccan Plateau): দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল উপদ্বীপের মালভূমি অঞ্চল (The Peninsular Plateau) নামেও অভিহিত। সিন্ধু-গাংগেয় অঞ্চল এবং এই মালভূমির মধ্যে আছে অসংখ্য পর্বতমালা। ইহাদের মধ্যে আরাবল্লী বিন্ধ্য সাতপুরা মাইকাল অজন্তা প্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির এক দিকে আছে পূর্বঘাট এবং অপরদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। নর্মদা তাপ্তী গোদাবরী মহানদী কৃষ্ণা কাবেরী প্রভৃতি নদনদী এই মালভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হয় আরব সাগর না-হয় বংগোপসাগরে পড়িতেছে। ধান্য তৈলবীজ জোয়ার বাজরা ভুট্টা প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। লৌহ-মাক্ষিক অভ্র চুনাপাথর বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদেও এ-অঞ্চল সমৃদ্ধ।

কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ

ভারতের মৃত্তিকা (Soils of India): ভারতের মৃত্তিকাকে একরূপ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—পলিমৃত্তিকা, কৃষ্ণ মৃত্তিকা, গৈরিক মৃত্তিকা এবং প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা।

পলিমৃত্তিকা বা পলিমাটি (Alluvial Soil): বিভিন্ন নদীর গতিপথে যুগ যুগ ধরিয়া তলানি সঞ্চিত হইয়া যে-মাটি গঠিত হয় তাহাকে পলিমাটি বলে। সিন্ধু-গাংগেয় সমতলভূমি, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাটের উপকূল অঞ্চল এবং আসামের সুরমা উপত্যকা প্রধানত এই মৃত্তিকায় গঠিত। পলিমাটি দ্বারা গঠিত মোট ভূমির পরিমাণ ৩,০০,০০০ বর্গমাইল বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই মাটি নরম, জলবহ (porous) এবং নানা রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ বলিয়া ইহাতে নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন হয়।

পলিমৃত্তিকার গুণ

কৃষ্ণ মৃত্তিকা (Black Soil): কার্পাস তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া কৃষ্ণ মৃত্তিকাকে কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা (Black Cotton Soil) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। বোম্বাই-এর অধিকাংশ অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের কিয়দংশে এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। বিশেষভাবে আর্দ্রতা ধারণ করিতে পারে বলিয়া এই মৃত্তিকায় জলসেচের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিলেই চলে। কার্পাস ছাড়াও গম জোয়ার বাজরা প্রভৃতি শস্য এই মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

কৃষ্ণ মৃত্তিকার ফসল

গৈরিক মৃত্তিকা (Red Soil): মাদ্রাজের অধিকাংশ অঞ্চল, বোম্বাই-এর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বিহারের সাঁওতাল পরগণার প্রায় সমগ্রটা, পশ্চিমবংগের বীরভূম প্রভৃতি

জিলা এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। রাসায়নিক সমৃদ্ধি এবং গভীরতার দিক দিয়া এই মৃত্তিকায় ঐ সকল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অবশ্য প্রভূত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। আর্দ্রতা ধারণের উপযোগী নয় বলিয়া শস্যোৎপাদনের জন্য এই মৃত্তিকায় বিশেষ জলসেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজন।

গৈরিক মৃত্তিকায় জলসেচের প্রয়োজনীয়তা

প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা (Laterite Soil) ঃ অনেকক্ষেত্রে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকাকে গৈরিক মৃত্তিকা (Red Soil) হইতে পৃথক্ করা হয় না। কারণ গৈরিক মৃত্তিকাও একরূপ প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা। গৈরিক মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকা হইল উদ্ভিদ-ক্ষার, চুন প্রভৃতি রাসায়নিক গুণবিহীন মৃত্তিকা। ইহা উড়িষ্যা, বোম্বাই, আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের কোন কোন অংশে এবং মালাবার উপকূলে পাওয়া যায়। যে-সকল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথবা জলসেচের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে সেই সকল স্থানে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকাতেও শস্য উৎপন্ন হয়।

গৈরিক মৃত্তিকা ও প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার পার্থক্য

সম্প্রতি বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর হইতে ভূ-গঠনের প্রকৃতি বা মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি লইয়া বিশেষভাবে গবেষণা করা হইতেছে। ভারতের কৃষি-বিদ্যালয়ে (Agricultural Institute) ভারতের মৃত্তিকার একখানি মানচিত্রও প্রস্তুত করা হইয়াছে।

অন্যান্য অর্থ নৈতিক সমস্যার ন্যায় ভারতে মৃত্তিকা সংক্রান্ত সমস্যাও একটু বিশেষ ধরনের। অন্যান্য অনেক দেশের মৃত্তিকা আর্দ্র; কিন্তু ভারতের মৃত্তিকা শুষ্ক। সুতরাং ভারতে মৃত্তিকা সম্পর্কিত প্রধান সমস্যা হইল জলসেচের সমস্যা। অন্যান্য অনেক দেশে এই সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতে হয় না; ফলে তাহারা পতিত জমির পুনরুদ্ধার, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি প্রভৃতির দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে সমর্থ হয়।

ভারতের মৃত্তিকা সংক্রান্ত সমস্যা

জলবায়ু (Climate) ঃ সামগ্রিকভাবে ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের (monsoon-tropical) জলবায়ু বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু এই বর্ণনা ভারতের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন ইংগিত দেয় না। ভারত বিশাল দেশ; ইহাকে উপমহাদেশ বলিয়াই অভিহিত করা হয়। অবস্থানের দিক দিয়াও ভারত কোন একটি বিশেষ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং ভারতের জলবায়ুর সামগ্রিক বর্ণনা বা সামগ্রিক আলোচনা একরূপ অস্পষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণে ভারতকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া ইহার জলবায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের জলবায়ু

ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু; কিন্তু সমতলভূমিতে উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু দৃষ্ট হয়। আবার আগ্রা জিলা, পশ্চিম রাজস্থান প্রভৃতির ন্যায় ভারতের বহু স্থানের

জলবায়ু হইল চরমভাবাপন্ন। পশ্চিম রাজস্থানে গ্রীষ্মে উষ্ণতা ৪৮° সেন্টিগ্রেডের উর্ধ্বেও উঠে, আবার জানুয়ারী মাসে ৪.৫° সেন্টিগ্রেডের নিম্নেও নামিয়া আসে। পার্বত্য অঞ্চল ও সমভূমির মধ্যে পার্থক্যের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে উষ্ণতা ১.৭° সেন্টিগ্রেডের নিম্নেও নামিয়া আসে এবং দ্বিতীয়োক্ত কয়েকটি অঞ্চলে উষ্ণতা ৫০° সেন্টিগ্রেডের উর্ধ্বেও উঠে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জলবায়ুর বিশেষ তারতম্য

বৃষ্টিপাতের বেলাতেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের থর মরুভূমিতে গড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হইল মাত্র ৫ ইঞ্চি; কিন্তু চেরাপুঞ্জিতে ইহা হইল ৪৩০ ইঞ্চি বা ততোধিক।

বৃষ্টিপাতের আঞ্চলিক তারতম্য

জলবায়ুর এইরূপ অনন্যসাধারণ তারতম্যের জন্য ভারতীয়গণের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উপজীবিকা এবং এমনকি দৃষ্টিভংগির মধ্যেও বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ ভেরা এ্যানস্টী (Dr. Vera Anstey) ভারতে জলবায়ুর অর্থনৈতিক প্রভাবকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: জলবায়ুর তারতম্যের জন্য ভারতে কাশ্মীরের লোমশ পাহাড়ী ছাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্থানের উষ্ট্র এবং বংগদেশের ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন জীবজন্তু; উত্তরাঞ্চলের গম এবং দেবদারু বৃক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া উপকূলভূমির ধান্য ও নারিকেল বৃক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন শস্যাদি; এবং বংগ, বিহার ও উড়িষ্যার লৌহ-কয়লা খনি হইতে আরম্ভ করিয়া মহীশূরের স্বর্ণখনি ও পাঞ্জাবের লবণ পর্বত প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়।

জলবায়ু তারতম্যের ফল

ভারতীয় জনগণের কর্মদক্ষতার উপর জলবায়ু কতখানি প্রভাব বিস্তার করে ইহা লইয়া পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে, উষ্ণ জলবায়ু প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভবে সহায়তা করিলেও, পরবর্তীকালে ইহার অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। উষ্ণ জলবায়ু শারীরিক কর্মদক্ষতাকে হ্রাস করে বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। অপর দিকে, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অধিকতর শারীরিক কর্মদক্ষতা সম্ভব হয় বলিয়া এইরূপ জলবায়ুকে সর্বদাই আর্থিক সমৃদ্ধির সহায়করূপে দেখা গিয়াছে। এই যুক্তিকে বর্তমানে অবশ্য বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। অতীতে ভারত, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশে সভ্যতা উন্নতির যে শিখরে উঠিয়াছিল তাহা হইতে এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, উষ্ণ জলবায়ু সর্বদাই সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী। বর্তমানেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কর্মদক্ষতায় ভারতীয় শ্রমিক ইউরোপ বা আমেরিকার শ্রমজীবী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। তবে উষ্ণ জলবায়ু অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা যে সামান্য বৃদ্ধি পায় সে-কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না।

ভারতীয়গণের কর্ম-দক্ষতার উপর জল-বায়ুর প্রভাব

বৃষ্টিপাত (Rainfall) : বৃষ্টিপাত জলবায়ুর অন্যতম উপাদান হইলেও ভারতীয় অর্থবিদ্যায় বৃষ্টিপাতের ভূমিকার আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা হয়—কারণ ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর যে-সকল ভৌগোলিক বিষয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে বৃষ্টিপাতই সর্বপ্রধান। অধ্যাপক জাথার ও বেরীর (Profs. Jather and Beri) ভাষায় বলা যায়, ভারতের ন্যায় পৃথিবীর আর অন্য কোথাও বৃষ্টিপাত অর্থ নৈতিক জীবনের সকল দিককে এরূপভাবে প্রভাবান্বিত করে না।

ভারতীয় অর্থবিদ্যায় বৃষ্টিপাতের ভূমিকার স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের বৃষ্টিপাতের অধিকাংশই সংঘটিত হয় মৌসুমী বায়ুর দ্বারা। এইজন্যই ভারতের জলবায়ুকে উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের জলবায়ু বলা হয়। মৌসুমী বায়ু বলিতে বুঝায় আর্দ্রতা বহনকারী বায়ুপ্রবাহ। আর্দ্রতা বহন করে বলিয়া এইরূপ বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয়। ভারতে এইরূপ বায়ু দুই দিক দিয়া প্রবাহিত হয়; এবং ফলে ইহা দুই নামে পরিচিত—উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর গুরুত্বই অধিক কারণ ইহাই ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ভারতে মৌসুমী বায়ু

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর কারণকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে: গ্রীষ্মকালে উত্তর উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে; ফলে ভূ-ভাগের উপরিস্থিত বায়ুর চাপ বিশেষ কমিয়া যায়। যে-সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমিয়া যায়, সেইদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বাতাস বহিতে থাকে। এই বায়ুস্রোত সমুদ্রের উপর দিয়া আসে বলিয়া জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আর্দ্র বা বৃষ্টিবাহী হয়। ভূ-খণ্ডের উপরে আসিয়া ইহা পর্বতমালার সহিত সংঘর্ষের ফলে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

১। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও ইহার গুরুত্ব

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দুইটি স্রোত আছে: বংগোপসাগরীয় স্রোত এবং আরব সাগরীয় স্রোত। প্রথমোক্ত স্রোতটি প্রথমে পূর্ব উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া আসামের পর্বতমালার দিকে ধাবিত হয় এবং সেখান হইতে আসাম ও পশ্চিমবংগের প্রায় সর্বত্র বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া গাংগেয় সমতলভূমি ধরিয়া, পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। শেষোক্ত বা আরব সাগরীয় স্রোতের প্রথম সংঘর্ষ হয় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সহিত। তাহার পর ইহা দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হয়।

উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় শীতকালে। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহার গতিপথে বংগোপসাগরের কিয়দংশ ছাড়া আর কোন জলভাগ পড়ে না। সুতরাং ইহা বংগোপসাগরের উপর দিয়া দাক্ষিণাত্যে আসার সময় জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে শীতকালীন বৃষ্টিপাত ঘটায়।

২। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু

বলা হইয়াছে যে, ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগ সংঘটিত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা। মৌসুমী বায়ুর বৈশিষ্ট্য হইল যে, পর্বতমালার সহিত প্রথম

সংঘর্ষের সময় ইহা সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং পরে ইহা যত অগ্রসর হইতে থাকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তত কমিতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর ফলে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয় আসামের উপত্যকা এবং পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে। তারপর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিতে কমিতে রাজস্থানে আসিয়া একেবারে হ্রাস পায়।

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়ঃ

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতের আঞ্চলিক বিভাগ

(১) **আর্দ্র অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হইল ১০০ ইঞ্চির উপর। আসামের উপত্যকা অঞ্চল এবং পশ্চিমবংগের উপকূল ভূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(২) **নাতি-আর্দ্র অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চি হইতে ১০০ ইঞ্চির মধ্যে। পশ্চিমবংগ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

(৩) **শুষ্ক অঞ্চল**—এই অঞ্চলে বৎসরে ৪০ ইঞ্চির কম গড় বৃষ্টিপাত হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। রাজস্থানের অনেকস্থানে বৎসরে গড়ে ৫ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়।

শুধু যে আঞ্চলিক বণ্টনেই বৃষ্টিপাতের এইরূপ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, বৃষ্টিপাতের সময়েরও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণত জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইলেও সময়ে সময়ে ইহার প্রবাহে বিশেষ বিলম্ব ঘটিতে পারে। অনেক সময় আবার কোন কোন অঞ্চলে প্রথমে প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটাইয়া সে-অঞ্চলে আর দেখা নাও দিতে পারে। এরূপ ঘটিলে কৃষককে একবার শস্যক্ষেত্রের দিকে আর একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইতে হয়।

বৃষ্টিপাতের সময়গত অনিশ্চয়তা

মৌসুমী বায়ুর ফলাফল (Economic Effects of the Monsoons): ভারত প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। ভারতের মাটি শুষ্ক বলিয়া শস্যোৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এখনও পর্যন্ত ভারত পর্যাপ্ত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। সুতরাং এখনও পর্যন্ত কৃষক জলের জন্য বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল। কিন্তু এমন বৎসর বড় একটা দেখা যায় না যখন ভারতের কোন-না-কোন অঞ্চলে হয় অতিবৃষ্টি না-হয় অনাবৃষ্টি ঘটে। বলা যায় যে, ভারতীয় মৌসুমী বায়ু প্রাচ্য দেশীয় রাজন্যবর্গের মতই স্বৈরাচারী; ইহা সম্পূর্ণভাবে নিজের খেয়ালখুশী মত চলে। কোন বৎসর হয়ত' ইহা বৃষ্টিপাত একরূপ নাও ঘটাইতে পারে; কোন বৎসর হয়ত' দেশ বা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলকে একেবারে ভাসাইয়া দিতে পারে। কোন বৎসর ইহা অতি শীঘ্র, কোন বৎসর বা অত্যধিক বিলম্বে ঘনঘটা করিয়া আসিতে পারে। মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালীর এই ধরনের যে-কোনরূপ প্রকাশের ফলে দেশের অর্থনৈতিক

ক। অর্থনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা মৌসুমী বায়ুরই অনিশ্চয়তার ফল

জীবন নোঙরহীন হইয়া সম্পূর্ণভাবে অজানার উজানে চলিতে থাকে। বস্তুত, ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনের অস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তা বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তারই ফল।

বৃষ্টিপাত আশানুরূপ না হইলে:
১। কৃষকের ক্ষতি
২। শিল্পে কাঁচামালের অভাব

যদি বৃষ্টিপাত আশানুরূপ বা সময়মত না হয় অথবা যদি ইহা প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় তাহা হইলে শস্যের ক্ষতি হয় বলিয়া প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক। শস্যের ক্ষতি হইলে কাঁচামালের যোগান কমিয়া যায় বলিয়া ভারতীয় শস্যজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের পক্ষে এই শিল্পগুলিকে চালু রাখার জন্য বাহির হইতে কাঁচামাল আনয়ন করার প্রয়োজন হইতে পারে।

৩। খাদ্যাভাব

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ভারতে খাদ্যাভাব সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরেও ভারতে খাদ্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং স্বাভাবিক বুভুক্ষা নিবারণের জন্যই সরকারকে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। ইহার উপর যদি কোন কারণে আবার শস্যহানি ঘটে তবে দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য সরকারকে বাহির হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। গঠনমূলক কার্য বন্ধ রাখিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি (reserve of foreign currency) ইহার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। অর্থে না কুলাইলে ঋণ করিয়াও আমদানি করিতে হইবে; এবং বর্তমানে ইহাই করা হইতেছে। মূলধন-দ্রব্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় আমদানি পরিহার করিয়াও বুভুক্ষা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

৪। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস
৫। যানবাহনের চাহিদা হ্রাস
৬। অন্যান্য শ্রেণীর আয় হ্রাস

শস্যোৎপাদন ব্যাহত হইলে প্রথমেই শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবীর আয় কমে। কৃষিজীবীর আয় কমিলে শিল্পজাত দ্রব্যেরও চাহিদা কমে; ফলে শিল্পপতি, শিল্প-শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের আয়ও কমে। শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমিলে যানবাহনের চাহিদাও কমে। ফলে যাহারা জীবিকার জন্য যানবাহনের উপর নির্ভরশীল তাহাদের আয়ও কমে। এইভাবে প্রধান প্রধান সামাজিক শ্রেণীর আয় কমিলে উকিল ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতি সমাজের বাকী শ্রেণীর আয় কমিতে বাধ্য।

৭। সরকারের আয়-হ্রাস ও ব্যয়বৃদ্ধি

সকল শ্রেণীর আয় যখন কমে তখন বিভিন্ন কর হইতে প্রাপ্য এবং রেলপথ, ডাক-বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সেবামূলক কার্য হইতে লভ্য সরকারী আয়ও হ্রাস পায়। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতীয় কৃষিজ পণ্য এক বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া আছে বলিয়া শস্যের ক্ষতি হইলে রপ্তানি শুল্ক হইতে আয় কমিয়া যায়, এবং রপ্তানির উপরই আমদানি নির্ভর করে বলিয়া আমদানি শুল্ক হইতেও আয় কমে। শস্যের ক্ষতি হইলে শুধু যে সরকারী আয়ই কমে তাহা নহে, দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য খাদ্যশস্য আমদানি, উপযুক্ত বণ্টনের জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (system of control and rationing) করিতে হয় বলিয়া ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে।

ভারত ও রাজ্যসরকারসমূহের আয়-ব্যয় মৌসুমী বায়ুর উপর এত বেশী নির্ভরশীল যে, ভারতীয় বাজেটকে ভারত সরকারের অন্যতম ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব স্যর ফ্লীটউড উইলসনের (Sir Fleetwood Wilson) ভাষায়, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা (a gamble in rains) বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা

উপরন্তু, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব যে সকল ভৌগোলিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মৌসুমী বায়ুকে সর্বপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছন্দে অভিহিত করিতে পারা যায়। বৃষ্টিপাত প্রচুর পরিমাণে হয় বলিয়াই পশ্চিমবংগ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কতকাংশের লোকবসতি এত ঘন এবং অপ্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্যই রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষভাবে জনবিরল। ভারতের অধিবাসিগণের অদৃষ্টনির্ভরশীলতা যে কতকাংশে মৌসুমী বায়ুর জন্য—ইহাও বলা চলে। মৌসুমী বায়ুর আগমন-প্রত্যাগমনের সময়ের পরিবর্তন অথবা ইহার পরিমাণভেদের ফলে কৃষকের সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে তাহার কোন হাত নাই। আবার পর বৎসর যদি সুবৃষ্টি হয় তবে সে আশানুরূপ ফসল ঘরে তুলিতে পারে। তাহার অদৃষ্ট যখন এরূপভাবে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত সংযুক্ত তখন সে অদৃষ্টবাদী হইতে বাধ্য। আবার যখন কৃষকের ভাগ্যের সহিত জনসংখ্যার অপরাপর অংশের ভাগ্য বিজড়িত তখন ইহা বলা যায় যে, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত ভারতবাসীকে অতিমাত্রায় অদৃষ্টনির্ভরশীল হইতে শিখাইয়াছে।

মৌসুমী বায়ুর দ্বারা লোকবসতির বণ্টন নির্ধারিত হইয়াছে

খ। মৌসুমী বায়ুর জন্যই ভারতীয়গণের অদৃষ্টনির্ভরশীলতা

উপসংহার ঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ দিন দিন অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাবের পরিমাণকে হ্রাস করিয়া আনিতেছে। পূর্বে যে-সকল ভৌগোলিক বিষয় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত, বর্তমানে তাহাদের মধ্যে অনেককে অর্থনৈতিক জীবনের সমৃদ্ধিসাধনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে মৌসুমী বায়ুর বেলায় দেখি যে, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা দূরিকরণের জন্য বহু নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইতেছে। এই সকল নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (River Valley Projects) হইতে জলসেচ ছাড়াও বন্যা নিরোধ, আভ্যন্তরীণ জলপথের প্রসার প্রভৃতি ব্যবস্থাও করা হইতেছে। এই দিক দিয়া বহু কিছু করা হইলেও ভারতের বিশাল আয়তনের তুলনায় বিশেষ কিছু করা এখনও সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য ভৌগোলিক বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও শুধুমাত্র মৌসুমী বায়ুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও বহুদিন সময় লাগিবে।

মৌসুমি বায়ুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে ভারতের পক্ষে বহুদিন লাগিবে

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the extent to which economic life in India has been affected by geographical features. (৬-১৪ পৃষ্ঠা)

2. What are the monsoons ? Describe their influence on the economic life of India. [B. Com. 1947] (১১-১৪ পৃষ্ঠা)

3. Describe the important variety of soils in India and point out their suitability for the growth of particular kinds of crops. [B. Com. 1941] (৮-৯ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো

(Economic Structure)

অর্থনৈতিক কাঠামো বলিতে কি বুঝায়

কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও উহার অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, মূলধন ও উহার গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন, মাথাপিছু আয় ও লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি হইতেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি বুঝা যায়।

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে দেশগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যে এক ধরনের নয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কতকগুলি দেশে শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ; ফলে সেখানে লোকের জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ। আবার কতকগুলি দেশ অর্থনৈতিক প্রসারের দিক হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে ; স্বভাবতই সেখানকার লোকের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিয়া সকল দেশকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মেনী প্রভৃতি কতকগুলি দেশকে অতি উন্নত (highly developed) দেশ বলা হয় ; এই সকল দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় অধিক। দ্বিতীয়ত, ইতালী, হাংগেরী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের অর্থনৈতিক প্রসার অতি উচ্চস্তরে না পৌছাইলেও অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, মালয় প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহারা অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। এই সকল দেশে লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন।

এই তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে 'অনুন্নত দেশ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু 'অনুন্নত' শব্দটির ব্যবহারে অনেক দেশের আপত্তি থাকায় বর্তমানে অর্থবিদ্যাবিদগণ এই সকল দেশকে অর্ধোন্নত দেশ (underdeveloped countries) বলিয়া অভিহিত করেন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের উপর লোক এই অর্ধোন্নত দেশগুলিতে বাস করে বলিয়া উহাদের উন্নয়ন অন্যতম আন্তর্জাতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশ যে অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।* এখন আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন যে অর্ধোন্নত দেশের লক্ষণ কি কি? এই সকল দেশের কাঠামো কি প্রকার এবং ইহাদের উন্নয়ন সাধনেরই বা পন্থা কি? আমরা এই সকল আলোচনা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেই করিব।

অর্ধোন্নত দেশ বলিতে কি বুঝায়

বিভিন্ন লেখক অর্ধোন্নত দেশের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই তর্ক-বিতর্কের ভিতর না যাইয়া সংক্ষেপে অর্ধোন্নত দেশের বর্ণনা এইভাবে করিতে পারা যায়: অর্ধোন্নত দেশ হইল সেই দেশ যাহার বর্তমান মাথাপিছু আয় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অতি সামান্য এবং যাহার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা (potentiality) রহিয়াছে। জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের তুলনায় যে-সকল দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় নিম্ন সে-সকল দেশকেই বুঝাইবার জন্য আমরা অর্ধোন্নত দেশ কথাটি ব্যবহার করি।† ভারতের দৃষ্টান্ত লইলেই এ সংজ্ঞার অর্থ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব অনুসারে ভারতে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ৭২ টাকা; অপরদিকে ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ ছিল ৯,১৩১ টাকা, ইংল্যাণ্ডে ৪,২৮৭ টাকা এবং কানাডায় ৬,৭৪২ টাকা। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারত কত পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং জনবলের প্রাচুর্য রহিয়াছে। আমরা এই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়াও অতি দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। উৎপাদনের উন্নতিসাধন করিয়া এই সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলে লোকের মাথাপিছু আয় বাড়িয়া যাইবে এবং জীবনযাত্রার মানও উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে। সুতরাং বর্তমান মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা এবং আর্থিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হইল অর্ধোন্নত দেশের দুইটি প্রধান লক্ষণ।

অর্ধোন্নত দেশের দুইটি লক্ষণ

---

* Pant A. Samuelson—Economics, An Introductory Analysis.

† *Measures For The Economic Development of underdeveloped countries*—Report by a Group of Experts appointed by the Secretary General of the United Nations.

অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Structural Features of an Underdeveloped Economy): অর্ধোন্নত দেশগুলির দিকে তাকাইলে উহাদের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। ভারতের দৃষ্টান্ত লইয়া এই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করা যায়।

(১) শিল্পের অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগ লোক কৃষিজীবী এবং মাত্র ১০·৫ ভাগ লোক শিল্পকার্যে নিযুক্ত। বাকী অংশ বাণিজ্য, পরিবহন, চাকরি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।* সমগ্র জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মত আসে কৃষি হইতে। সংগঠিত কারখানা-শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৯ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয় আর ক্ষুদ্র শিল্প হইতে আসে শতকরা ১০ ভাগ। বাকিটা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া যায়।

অর্ধোন্নত দেশে কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা

জাতীয় জীবনে কৃষির ভূমিকা প্রধান হইলেও এইরূপ দেশে কৃষি অনুন্নতই হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন, জমি অসম্বদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেচ-ব্যবস্থা অনুন্নত, সার ও বীজ নিকৃষ্ট ধরনের হইতে দেখা যায়। ফলে জমি হইতে ফসল উৎপন্নের হার অতি কম হয়। ইহা ছাড়া দেখা যায় যে, অর্ধোন্নত দেশে ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থায় জমির মালিকানা কৃষকের থাকে না; সকলের উপরে থাকে জমিদার এবং তাহার পর থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে এইরূপ ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল।

অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি

জমিদার ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের ভূমিকা

(২) অর্ধোন্নত দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (disguised unemployment)। ভারতে শিল্পপ্রসারের অভাবে এবং বৈদেশিক যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কুটির ও গ্রাম্য শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অধিকাংশ জমিতে গিয়া ভিড় করিয়াছে। ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। পরিবারভুক্ত ক্ষুদ্র জমি চাষ করিতে যত লোকের প্রয়োজন হয় তাহার অধিক লোক ঐ জমিতে খাটিতেছে। এই অতিরিক্ত লোকদের জমি হইতে সরাইয়া আনিলে জমির উৎপাদন কোনক্রমেই হ্রাস পায় না। সুতরাং এই সকল লোকদের অনাবশ্যক বা বেকারের পর্যায়ে ফেলিতে হয়। কৃষিতে এই ছদ্ম বেকারত্ব ছাড়াও এই দেশে শিল্পগত বেকার-সমস্যা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের বেকারত্ব রহিয়াছে।

অর্ধোন্নত দেশে ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের আধিক্য

(৩) ভারতের মত দেশে লোকবলের অভাব নাই; বেকার, অর্ধ-বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যা বহু। ইহাদিগকে সম্পদসৃষ্টির কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের প্রকৃত মূলধন বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাদের উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিবার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হইল কারিগরি দক্ষতার অভাব। ইহাকে অর্ধোন্নত দেশগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়।

কারিগরি দক্ষতার অভাব

* National Income Committee's Report, 1954.

(৪) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে অর্ধোন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অতি অল্প এবং জনসংখ্যার অধিকাংশকেই সারাজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইতে হয়।

মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা

(৫) অর্ধোন্নত দেশে ধনবৈষম্য অতি প্রকট। একদিকে অগণিত জনসাধারণ অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে জীবন কাটায়, অপরদিকে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির মধ্যে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য দেখা যায়।

প্রকট ধনগত বৈষম্য

(৬) অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া লোকের সঞ্চয় ক্ষমতাও অতি সামান্য।* আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে, দেশের সঞ্চয় হইতেই দেশের মূলধন গড়িয়া উঠে। সুতরাং অর্ধোন্নত দেশের সঞ্চয়ের হার স্বল্প হওয়ায় মূলধন-গঠনের হারও স্বল্প হয়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১০-২০ ভাগ মূলধন গঠনকার্যে নিয়োজিত হয়। অর্ধোন্নত দেশে মূলধন-গঠনের জন্য জাতীয় আয়ের সামান্য অংশই ব্যয় করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্বেও জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগের বেশী মূলধন-সৃষ্টির জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা সামান্য বাড়িয়া জাতীয় আয়ের শতকরা ৮.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

সঞ্চয় ক্ষমতা কম হওয়ায় মূলধন-গঠনের হারও কম

(৭) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের প্রকৃতি হইতে অর্ধোন্নত দেশের অনগ্রসরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিবার যে-ব্যয় করে তাহার মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগের উপর ব্যয় হয় খাদ্যের উপর এবং শতকরা ৬ ভাগের মত ব্যয় হয় জামাকাপড় ক্রয় করিতে।† শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতিতে ব্যয় অতি নগণ্য বলিলেই হয়। নগরাঞ্চলে সাধারণ লোকের ব্যয় অর্ধেকের মত হয় খাদ্যদ্রব্যের উপর। খাদ্যদ্রব্যের উপর আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করা সত্ত্বেও লোকে জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য জোটাইতে পারে না। ন্যূনতম পুষ্টিকারিতার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক অন্তত ৩,০০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে গড় ক্যালোরি গ্রহণ হইল ২,২০০ মাত্র। সাধারণ লোক শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় করিতে অক্ষম বলিয়া অর্ধোন্নত দেশে অশিক্ষা ও ব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা যায়। আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৮৩ জন লোক নিরক্ষর।

সাধারণ লোকের আয়ের অধিকাংশই খাদ্য যোগাইতে ব্যয় হয়

সাধারণ লোকের খাদ্য গ্রহণ ন্যূনতম পুষ্টিকারিতার পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়

অশিক্ষা ও ব্যাধির ব্যাপকতা

---

* 'The domestic accumulation of capital in a poor country is bound to be slow'. —Jacob Viner.

† 'With very low living standards the bulk of the aggregate money income of the population is spent on food and relatively primitive items of clothing and household necessities. —Paul A Barau

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং জন্মমৃত্যুর হারের আধিক্য

(৮) ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অতি দ্রুতগতিতে হয়। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫-৫০ লক্ষ করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্মমৃত্যুর উচ্চহার, স্বল্পায়ু ও শিশুমৃত্যুর আধিক্যও অর্ধোন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অর্ধোন্নত মূলধনের বিনিয়োগ কাম্যভাবে হয় না

মূলধন-দ্রব্য অপেক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে অধিক ঝোঁক

(৯) অর্ধোন্নত দেশের মূলধনের সংগতি যে অতি অল্প তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে। এই সামান্য মূলধনও সকল সময় জাতীয় স্বার্থে শিল্পপ্রসারের জন্য নিয়োজিত হয় না।* ব্যক্তিগত মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সহজে অধিক মুনাফা শিকার করিতে চায়; সেইজন্যই ফটকা বাজার, চোরাকারবার, মাল মজুত, দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতে থাকে। কিছুটা সঞ্চয় গহনাপত্রাদিতেও ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা এবং লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ভারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে চাহে না, কারণ এগুলিতে আশু লাভের সম্ভাবনা কম অথবা অধিক ঝুঁকি থাকে। ফলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের অপেক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে তাহারা টাকা বিনিয়োগ করে; এবং ফলে দেশের প্রকৃত মূলধন সামান্যই গড়িয়া উঠে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনের

(১০) অর্ধোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক (colonial) ধরনের হয়। এরূপ বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে সস্তা দরে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে কাঁচামাল রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করা। এরূপ হইবার প্রধান কারণ হইল বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ। ভারতের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। ব্রিটিশ সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভারতের শিল্পপ্রসারে বাধা দিয়াছে এবং নিজ দেশের শিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে ভারতকে সেদিন পর্যন্ত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানি ও যন্ত্রশিল্প নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিতে হইয়াছে।

দুই প্রকার রূপান্তর

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition in Indian Economy)ঃ ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা অর্ধোন্নত হইলেও বর্তমানে উহার রূপান্তর ঘটিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে উন্নয়নমূলক রূপদানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের আলোচনা দুই দিক হইতে করা যাইতে পারে—যথা, (ক) স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর, এবং (খ) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর।

---

* Paul A. Samuelson—Economics : *An Introductory Analysis*-এর ৭১৪-১৫ পৃষ্ঠা 'Mal-investment of savings is an important problem in underdeveloped countries.'—Measures for the Economic Development of Uuderdeveloped Countries (United Nations, Department of Economic Affairs).

(ক) স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition from *Laissez Faire* Economy to Planned Economy)ঃ স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থা ধনতন্ত্রেরই প্রতিফলন। এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যায়—যথা, (ক) ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তিতে অব্যাহত অধিকার, (খ) উদ্যোগের স্বাধীনতা (freedom of enterprise), এবং (গ) ভোগ্যপণ্য-ক্রেতার স্বাধীনতা (sovereignty of the consumer)।

স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যবাদই ছিল বহু-অনুসৃত অর্থ-ব্যবস্থা। বিভিন্ন অর্থবিদ্যাবিদ নানা দিক দিয়া ইহার গুণগানও করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা দিয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একরূপ বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিক্রিয়া। অন্যান্যের মধ্যে বলা হয় যে এই প্রকার অর্থ-ব্যবস্থা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নহে।

পরিকল্পনা-প্রবণতার কারণ

ব্রিটিশ আমলে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদী থাকিলেও পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা বেশ কিছুদিন পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ইহার মধ্যে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস কর্তৃক 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি' (National Planning Committee) গঠন এবং ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ' (Planning and Development) স্থাপন এবং শিল্পপতিগণ কর্তৃক বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan) রচনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।*

ভারতে পরিকল্পনার প্রচেষ্টা

স্বাধীনতার পর পরিকল্পনা-প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৮ সালের সরকারী শিল্পনীতি প্রস্তাবে (Industrial Policy Resolution) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) প্রবর্তনের ঘোষণা করা হয়। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থারই একটি রূপ।

ইহার পর ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত এবং পরবর্তী বৎসরে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে প্রথম পরিকল্পনা শেষ হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যও অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রাক্কালে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকারী শিল্পনীতির পরিমার্জনা করিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ব্যাপকতর এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হয়। ইহার ফলে ভারত পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পথে আরও এক পদ অগ্রসর হয়।

আশা করা যাইতেছে যে এইভাবে ধীরে ধীরে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সংকোচন ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ দ্বারা একদিন পূর্ণ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা হইবে। সেদিন

বর্তমান রূপান্তর

* দ্বিতীয় খণ্ডে 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

5/99

ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা হইবে সমাজতন্ত্রী ধরনের। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের অন্যতম দিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

(খ) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর (Transition from Underdeveloped Economy to Developmental Economy): ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি—যথা, (ক) অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, (খ) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য

ভারত যে অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। এখন দেখা প্রয়োজন যে অর্ধোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের কারণ কি। অর্ধোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের কারণ প্রধানত তিন প্রকার—(ক) রাষ্ট্রনৈতিক, (খ) সামাজিক, এবং (গ) অর্থনৈতিক। রাষ্ট্রনৈতিক দিক দিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে ঔপনিবেশিক, অঞ্চলসমূহ অর্ধোন্নতই থাকিয়া যায়—কারণ পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাম্রাজ্যিক শক্তির স্বার্থ-বিরুদ্ধ।

অর্ধোন্নত অঞ্চলসমূহের অস্তিত্বের তিনটি কারণ

অর্ধোন্নত দেশের সমাজ বিশেষভাবে শ্রেণীবিভক্ত এবং সামন্তপ্রথা সমন্বিত হয়। এখানে ভূস্বামিবর্গ পরগাছার ন্যায় কৃষককুলের স্কন্ধে চাপিয়া থাকে, শিল্পপতিগণ চরম স্বৈরাচারী হয় এবং সরকারী কর্মচারীবৃন্দ দেশের শোষণে বিদেশীকে সহায়তা করিতে থাকে। উপরন্তু বর্ণভেদ প্রথা, যৌথ পরিবার প্রথা প্রভৃতির ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে।

অর্ধোন্নত দেশসমূহের অস্তিত্বের অন্যতম অর্থনৈতিক কারণ হইল অত্যধিক হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। জনসংখ্যার আয়তন বিরাট হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন এবং শ্রমের কাম্য সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় না—স্বল্প জমি ও মূলধনের সহিত অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হয়। স্বভাবতই শ্রমিক পিছু উৎপাদন হয় স্বল্প।

এই অবস্থা হইতে মুক্তি—অর্থাৎ অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ হইল পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে (ক) অধিক মূলধন-সংগঠনের (capital formation) দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, (খ) শ্রমের অপব্যয় যথাসম্ভব রহিত করিয়া উহাকে উৎপাদন কাজকর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, (গ) মূলধনকে অধিকতর উৎপাদনশীল করিতে হইবে, (ঘ) জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, এবং (ঙ) সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে স্থাপিত করিতে হইবে।

অর্ধোন্নত অবস্থা হইতে মুক্তির উপায়

বর্তমান ভারতে ইহাই করা হইতেছে। তাই বলা হয় যে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা আজ আর এক দিক দিয়া রূপান্তরের পথে। এই রূপান্তর হইল অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর।

ভারত এখন মুক্তির পথে

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by an underdeveloped country ? In what sense is India an underdeveloped country ? (১৬-১৯ পৃষ্ঠা)

2. What are the main features of an underdeveloped economy ? Illustrate your answer with reference to India. (১৬-১৯ পৃষ্ঠা)

3. Briefly describe the transition in Indian Economy. (১৯-২১ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদ

(Natural Resources)

অর্থবিদ্যায় যাহা সামগ্রিকভাবে 'ভূমি' (land) বলিয়া অভিহিত, সেই সকল প্রাকৃতিক দানের (Gifts of Nature) সহযোগে মানুষ সম্পদ (Wealth) সৃষ্টি করে। যে-দেশকে প্রকৃতি যে-পরিমাণে দান করিয়াছে তাহার সামগ্রিক সম্পদ (Total Wealth) সেই পরিমাণই হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় উহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখা প্রয়োজন যে, ঐ দেশের মানুষ প্রকৃতির দানকে কিভাবে এবং কতটুকু পরিমাণে কাজে লাগাইয়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে এই কয় ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়: খনিজ সম্পদ, শক্তিসম্পদ, বনসম্পদ এবং প্রাণিসম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources): ভারতে এখনও বিস্তারিতভাবে খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইহার ফলে ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী দুইটি ধারণা বর্তমান আছে। অনেকের ধারণা হইল যে, ভারতের খনিজ সম্পদ একরূপ অপর্যাপ্ত; উৎপাদনজনিত ত্রুটি এবং অপারগতার জন্য ভারত খনিজ সম্পদে অন্যান্য উন্নত দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। অপরদিকে, অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, খনিজ সম্পদের দিক দিয়া ভারতকে দরিদ্র দেশসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা যায়। উৎপাদনজনিত ত্রুটি দূর করিলে এই দিক দিয়া ভারতের অবস্থার সামান্য মাত্র পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে; বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। এই দুই পরস্পরবিরোধী মতের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে। ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় এই দেশের খনিজ সম্পদকে

ভারতের খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত কিনা ?

অপর্যাপ্ত বলিয়া বর্ণনা করা যায় না ; আবার ভারতের খনিজ সম্পদ একরূপ নগণ্য—একথাও বলা যায় না। ইহা অবশ্যই সত্য যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ভারতে খনিজদ্রব্যের যথাযোগ্য উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। যে দিন উহা সম্ভব হইবে সেই দিন ভারতের খনিজ সম্পদকে 'একরূপ নগণ্য' বলিয়া কোনরূপে বর্ণনা করা যাইবে না।

'গাণ্ডোয়ানা' নামে অভিহিত ছোটনাগপুরের মালভূমিই হইল ভারতের খনিজ সম্পদের প্রধান স্থান। গঠনের দিক হইতে দেখিলে ভারতে কয়েকটি খনিজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—যথা, লৌহ-আকর (iron ore), অভ্র, ম্যাংগানীজ, কয়লা, বক্সাইট, প্রভৃতি। ইহার মধ্যে ভারতকে আবার অভ্রের একচেটিয়া উৎপাদক বলিয়াও বর্ণনা করা চলে। কিন্তু আর কয়েকটি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে ভারত নিঃসন্দেহে দরিদ্র দেশ। ভারতে তাম্র দস্তা পারদ টিন স্বর্ণ রৌপ্য চীনামাটি প্রভৃতির সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না।

কয়েকটি খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য—কয়েকটির অভাব

ভারতের খনিজ শিল্পের একটি প্রধান ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে খনি শিল্প এতদিন প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয়দের হস্তে ছিল। তাহারা প্রধানত রপ্তানির জন্যই খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করিত। ইহার ফলে বিদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে ভারতের অনেক মূল্যবান খনিজ সম্পদকে একপ্রকার নিঃশেষ করা হইয়াছে। স্বাধীন দেশের পরিকল্পিত শিল্প-ব্যবস্থায় এই নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই। তবে এই বিষয়টি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় শিল্পের প্রয়োজনেও খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলিবে না। যাহারা আমাদের পশ্চাতে আসিতেছে সেই উত্তরপুরুষদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের খনিজ সম্পদের ব্যবহার করিতে হইবে।

খনি শিল্পে একটি প্রধান ত্রুটি

ভবিষ্যতের নীতি সম্বন্ধে নির্দেশ

ভারতের খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of the Mineral Resources of India) : ভারতের খনিজ সম্পদের অন্যতম শ্রেণীবিভাগ হইল (১) জ্বালানি খনিজ, (২) ধাতব খনিজ, এবং (৩) অ-ধাতব খনিজের মধ্যে।

(১) জ্বালানি খনিজ (Fuels) : ভারতের জ্বালানি খনিজের মধ্যে কয়লা এবং তৈল প্রধান। এই দুইটির মধ্যে আবার কয়লাকেই সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

কয়লা (Coal) : ভারতের পক্ষে কয়লা শুধু সর্বপ্রধান জ্বালানি মাত্র নহে ; ইহা এখন পর্যন্ত শক্তিরও (Power) সর্বপ্রধান উৎস। যানবাহন, কলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন, নিত্য সংসারযাত্রা, প্রভৃতিতে এখনও ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কয়লা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত সপ্তম স্থানাধিকারী। ভারতের কয়লা-খনির অধিকাংশই পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের 'গাণ্ডোয়ানা অঞ্চলে'

কয়লা এখনও শক্তির সর্বপ্রধান উৎস

অবস্থিত। ইহার মধ্যে আবার পশ্চিমবংগ ও বিহার রাজ্যের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো এবং গিরিডির খনি অঞ্চল হইতে মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৯০ ভাগ পাওয়া যায়। তাহার পরের স্থানের অধিকারী হইল আসাম। বোম্বাই, রাজস্থান এবং কাশ্মীরেও কিছু কিছু কয়লা পাওয়া যায়। কিন্তু এই কয়লা হইল অপেক্ষাকৃত নিরেস কয়লা।

গাণ্ডোয়ানা অঞ্চল এবং কয়লাখনিগুলির আঞ্চলিকতা

ভারতের কয়লাখনিগুলির এই আঞ্চলিকতা শিল্পোন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পের জন্য পশ্চিমবংগ ও বিহারের কয়লাখনিগুলি হইতে কয়লা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ফলে উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে এবং সময়মত কয়লা না পৌছাইলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কয়লার আঞ্চলিক বণ্টনজনিত এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার আর্কট অঞ্চলে পিংগলবর্ণের কয়লা বহু পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছে। আর্কট অঞ্চলে পিংগলবর্ণের কয়লা বহু পরিমাণে সঞ্চিতও আছে। অন্ধ্র সরকারও ঐ রাজ্যের কয়লাখনিগুলি হইতে আধুনিক উপায়ে অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কয়লা খনি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আঞ্চলিকতাজনিত ত্রুটি ও ইহার প্রতিকারের প্রচেষ্টা

ভারতের খনিজ সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্পর্কিত দ্বিতীয় সমস্যা হইল যে, ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্কাশক (Metallurgical) এবং 'কোক' কয়লার (Coking Coal) পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ভূগর্ভে সঞ্চিত সকল প্রকার কয়লার পরিমাণ ৬ হাজার কোটি টন হইলেও * কয়লা বোর্ড কমিটি (Coalfield Committee) দেখাইয়াছিল যে, ইহার মধ্যে 'কোক' কয়লার পরিমাণ মাত্র ২০০ কোটি টন। এই ২০০ কোটি টনের মধ্যে যতটুকু আমরা বাস্তবিকই খনি হইতে উত্তোলন করিতে পারি তাহার পরিমাণ মাত্র ১৬০ কোটি টন। ১৯৫০ সালের ধাতুনিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণ কমিটির (Metallurgical Coal Conservation Committee, 1950) রিপোর্ট অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে উপরি-উক্ত অনুমিত উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া অর্ধেক হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার উত্তোলন ও ব্যবহারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কারণে ১৯৫২ সালে ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার বাৎসরিক উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন [Coal Mining (Conservation and Safety) Act, 1952] নামে একটি আইন পাস করা হইয়াছে এবং সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বনের জন্য একজন কমিশনারের (Coal Commissioner) অধীনে কয়লা বোর্ড (Coal Board) নামে একটি বোর্ডও স্থাপন করা হইয়াছে।

কয়লা সম্পর্কিত দ্বিতীয় সমস্যা ও ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা

* **India—1959**

বর্তমানে খনি হইতে কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অবলম্বন করা হইতেছে। সম্প্রতি ভারত সরকার মিশ্র পেট্রোলিয়াম (synthetic petrol) উৎপাদনকার্যে কয়লা ব্যবহারে মনোযোগী হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে ধৌতকরণ কারখানা (coal washeries) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিল। কমিটি অনতিবিলম্বে এইরূপ কারখানা স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে। উৎকৃষ্ট ধাতুনিষ্কাশক ও কোক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যথাসম্ভব এই প্রকার সকল কয়লারই ধৌতকরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ভিলাই ও রুরকেলার ইস্পাত কারখানায় কোক কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য ১৯৫৮ সালে একটি জাপানী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কারগালিতে (Kargali) ২.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কয়লা ধৌতকরণ কারখানা ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হইয়াছে। এই কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা বাৎসরিক ২২ লক্ষ টন। দুর্গাপুরের কারখানার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার একটি জার্মান প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৭.২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কয়লা চুল্লী কারখানা স্থাপন করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস হইতে এই চুল্লী কাজ সুরু করিয়াছে। ইহা দৈনিক ১ হাজার টন উৎকৃষ্ট কোক কয়লা সরবরাহ করিবে।

উৎপাদনজনিত ত্রুটির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

১৯৫০ সালে কয়লার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৬ সালে ইহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য প্রথমে ৬ কোটি টনে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের হিসাব হইতে দেখা যায় যে উৎপাদন ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে।*

তৈল (Oil): ভারতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ খুবই সামান্য। আসামের ডিগবয় হইতেই যা-কিছু তৈল পাওয়া যায়। এই সূত্র হইতে ৪ লক্ষ টন বা ভারতের মোট প্রয়োজনের শতকরা ৫ ভাগের কিছু উপর তৈল পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় তৈলের বাকী অংশ বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। সম্প্রতি অবশ্য আসামের নাহার-কাটিয়া ও মোরাণে দুইটি বৃহৎ তৈলখনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং তৈল উত্তোলনের জন্য কয়েকটি কূপও ইতিমধ্যে খনন করা হইয়াছে। এই দুই তৈলখনি হইতে বর্তমানে বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টন করিয়া এবং শেষ পর্যন্ত ৫০ লক্ষ টন করিয়া অপরিশুদ্ধ তৈল (crude oil) পাওয়া যাইবে অনুমান করা হইয়াছে। তখন ভারতের মোট প্রয়োজনীয়তার শতকরা ৪০ ভাগ আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতেই মিটিবে। ইহার উপর বর্তমানে ভারতের নানা অঞ্চলে বিশেষ করিয়া আসাম, পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যার অববাহিকা অঞ্চলে, পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে, রাজস্থানের জয়শল্মীরে এবং বর্তমান বোম্বাই-ভুক্ত ভূতপূর্ব সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধানকার্যও চলিতেছে। সরকারী বিবৃতি অনুসারে বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত ক্যাম্বেতে তৈলখনির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। আশা করা হইতেছে যে ইহা হইতে লাভজনকভাবে তৈল উৎপাদন করা

তৈলের অভাব পূরণ-করণের নূতন প্রচেষ্টা

* **India—1959**

সম্ভব হইবে। অপরদিকে আবার ইক্ষু অপজাত (by-product) এবং কয়লা হইতে মিশ্র পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করিয়া তৈলের এই অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বর্তমানে এই সূত্র হইতে ২ কোটি গ্যালনের মত তৈল উৎপন্ন হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (Standard Vacuum Oil Co.) ও ক্যালটেক্স (Caltex) এবং ব্রিটিশ কোম্পানী বার্মা শেলের (Burmah Shell) তিনটি পৃথক্ চুক্তি দ্বারা তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। উহাদের মধ্যে বার্মাশেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়ামের কারখানা দুইটি বোম্বাইএর নিকট ট্রম্বেতে এবং ক্যালটেক্সের কারখানাটি অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনমে স্থাপিত হইয়াছে। অপরিশুদ্ধ তৈল প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে আমদানি করা হয়। প্রথমে শোধনাগার তিনটির উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ৪৩ লক্ষ টন। পরে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৫০ লক্ষ টনের উপরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বর্তমানে নাহারকাটিয়া ও মোরাণের খনির তৈল শোধন করিবার জন্য দুইটি শোধনাগার স্থাপনের জন্য একটি সরকারী কোম্পানী গঠন করা হইয়াছে। শোধনাগার দুইটির মধ্যে একটি বিহারের বারৌণী এবং অপরটি আসামের গৌহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আসামের শোধনাগারটি স্থাপনের জন্য রুমানিয়া সরকার দীর্ঘকালীন ঋণ প্রদান করিবে।

তৈল শোধনাগার স্থাপন

(২) ধাতব খনিজ (Metallic Mineral) : ভারতের ধাতব খনিজ সম্পদের মধ্যে লৌহ আকর, ম্যাংগানীজ-আকর, বক্সাইট, তাম্র, স্বর্ণ এবং ইউরেনিয়ামই প্রধান।

লৌহ-আকর (Iron Ore) : লৌহ-আকরের দিক দিয়া ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ভারতের কোন কোন স্থানের লৌহ-আকর পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৭০ ভাগের কাছাকাছিও লৌহ পাওয়া যায়। অনেকের মতে, এশিয়ার মধ্যে ভারতেই সর্ববৃহৎ লৌহ-আকরের খনি আছে এবং ইহার পরিমাণ এত অধিক যে হাজার বৎসরেও ইহা নিঃশেষ হইবে না। সরকারী হিসাব অনুসারে আনুমানিক সঞ্চয়ের পরিমাণ হইল ২,১০০ কোটি টন।

লৌহ-আকরে ভারত সমৃদ্ধ দেশ

বিহারের সিংভূম জিলা এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বোনাই ও কেওনঝর অঞ্চলের লৌহ-আকর সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, পশ্চিমবংগ, মাদ্রাজ এবং হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলেও লৌহ-আকর পাওয়া যায়। ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত ব্যুরোর (The Indian Mineral Resources Bureau) মতে, মাদ্রাজের সালেম ও নেলোর অঞ্চলে অফুরন্ত লৌহ-আকর ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। এগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। আনুমানিক ২,১০০ কোটি টন সঞ্চয়ের মধ্যে মাত্র ৬০০ কোটি টন সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।*

* **India—1959**

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের ইহা অন্যতম সৌভাগ্য যে, যে-সকল অঞ্চলে লৌহ-আকর পাওয়া যায় প্রধানত সেই সকল অঞ্চলেই কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। ফলে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) সুসংগঠিতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং দিন দিন ইহা ক্রমোন্নতির পথে চলিতেছে। এ-সম্পর্কে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আলোচনা প্রসংগে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। ১৯৫০ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ টন লৌহ-আকর খনি হইতে উত্তোলন করা হয়; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ বাড়িয়া ৪৬ লক্ষ টনেরও উপর দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পিণ্ড লৌহ (pig iron) এবং ইস্পাত তৈয়ারির পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে অন্তত মোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন লৌহ-আকর উত্তোলনের কথা আছে।*

ভারতে কয়লা ও লৌহ কাছাকাছি পাওয়া যায়

ম্যাংগানীজ-আকর (Manganese Ore): ম্যাংগানীজ হইল অন্যতম গঠনকারী ধাতু (Structural Metal)। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ম্যাংগানীজ ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে ইস্পাত শিল্পই প্রধান। ম্যাংগানীজেও ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। উৎপাদনের দিক দিয়া ইহাতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে ম্যাংগানীজ-আকর সঞ্চিত আছে এবং এই দুই রাজ্য হইতেই দেশের মোট ম্যাংগানীজ-আকর শতকরা ৯০ ভাগের উপর উৎপন্ন হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই ছাড়া বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং রাজস্থানেও এই খনিজ সম্পদ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।

ম্যাংগানীজের উপযোগিতা

ভারতের ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট ম্যাংগানীজ-আকরের পরিমাণ ১১·২ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে ১৯৫০ সালের পূর্বে বৎসরে গড়ে ৬ লক্ষ টন করিয়া ম্যাংগানীজ-আকর উৎপন্ন হইত। ১৯৫৬ সালে এই পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া ১৫ লক্ষ টনের উপর দাঁড়ায়। পূর্বে ভারতে উৎপন্ন ম্যাংগানীজের অধিকাংশই বিদেশে চালান যাইত। বর্তমানে বহু পরিমাণে ম্যাংগানীজ ভারতীয় শিল্পসমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে উৎপাদনের লক্ষ্য ২০ লক্ষ টনে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পসমূহে উত্তরোত্তর ম্যাংগানীজের ব্যবহারবৃদ্ধি

বক্সাইট (Bauxite): বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারি হয়। বোম্বাই, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে বক্সাইট পাওয়া যায়। ভারতে সঞ্চিত বক্সাইটের পরিমাণ ২৫ কোটি টন বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর আকর হইল মাত্র ৩·৫ কোটি টন। ১৯৫০ সালে মোট ৬৪ হাজার টন বক্সাইট উৎপাদন করা হয়। ১৯৫৫ সালে ইহা বাড়িয়া ৮১ হাজার টনে দাঁড়ায়। প্রয়োজনের তুলনায় এই পরিমাণ বক্সাইট

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা দেখ।

উৎপাদন অতি সামান্য, কারণ ইহা হইতে মাত্র ৪ হাজার টনের কিছু উপর এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হইতে পারে। বক্সাইট হইতে আরও এলুমিনিয়াম তৈয়ারির পথে প্রধান বাধা হইল সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়িলে এই অন্তরায় দূর হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টনের মত বক্সাইট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারির পথে বাধা

তাম্র (Copper) : প্রধানত বিহারের সিংভূম জিলায় এবং হিমালয়ের গাড়ওয়াল অঞ্চল, কুলু উপত্যকা, সিকিম, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর ও রাজস্থানের কোন কোন অংশে কিছু কিছু তাম্র পাওয়া যায়। তবে বিহারের সিংভূম ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের তাম্রের বিশেষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব নাই ; কারণ এই সকল অঞ্চলে তাম্রকে খনি হইতে উত্তোলন করার খরচ পোষায় না। পূর্বে ভারতে বিশেষ সমৃদ্ধ তাম্রশিল্প ছিল ; বর্তমানে কিন্তু একমাত্র বিহারের সিংভূম জিলার তাম্র কারখানা অতীতের সাক্ষ্য দান করিতেছে। বর্তমানে ভারতে ৩·৫ লক্ষ টনের মত তাম্র উৎপন্ন হয়।

তাম্রের উৎপাদন কমিতেছে

স্বর্ণ (Gold) : ভারতে বাৎসরিক স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ অধিক নহে। বর্তমানে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়া ২·৫ লক্ষের মত আউন্সে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ উৎপন্ন হয় একমাত্র মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি হইতে। বাকী অংশ আসে হায়দরাবাদের হাট্টি (Hatti), অন্ধ্রের অনন্তপুর এবং সুবর্ণরেখা, বৈতরণী, প্রভৃতি বিভিন্ন নদীর বালু এবং অন্যান্য খনি হইতে।

ইউরেনিয়াম (Uranium) : ইউরেনিয়াম আণবিক শক্তি উৎপাদনের কার্যে অপরিহার্য বলিয়া সম্প্রতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ভারতে ত্রিবাংকুর-কোচিন এবং আরও কোন কোন অঞ্চলে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়।

(৩) অ-ধাতব খনিজ (Non-metallic Minerals) : ভারতের অ-ধাতব খনিজের মধ্যে লবণ, চুনাপাথর, অভ্র, চীনামাটি এবং জিপসাম প্রধান।

লবণ (Salt) : লবণ যে শুধু দৈনন্দিন খাদ্যের পক্ষে অপরিহার্য তাহাই নহে। কষ্টিক সোডা, বস্ত্রাদি ধৌতকরণের সোডা, প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিতেও লবণের প্রয়োজন হয়। ভারতে লবণ তিনটি সূত্র হইতে পাওয়া যায়—যথা, (১) রাজস্থানের লবণাক্ত জলের হ্রদসমূহ (প্রধানত সম্বর হ্রদ) হইতে ; (২) রাজস্থান ও হিমাচলপ্রদেশের লবণাক্ত প্রস্তরসমন্বিত পর্বতমালা হইতে ; এবং (৩) সমুদ্রের লবণাক্ত জল হইতে।

কিছুদিন পূর্বেও ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। সুতরাং বৎসরে ১ কোটি টাকার লবণ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া এদেশের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে

হইত। বর্তমানে ভারত লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে; এমনকি কিছু কিছু লবণ বাহিরে রপ্তানিও করিতে পারিতেছে। বর্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি মণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহাকে ১০ কোটি মণে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

বর্তমানে লবণ উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে

চুনাপাথর (Limestone): চুন, সিমেন্ট, সোডা, কষ্টিক সোডা, প্রভৃতি উৎপাদন করিতে চুনাপাথরের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় চুনাপাথরের খণ্ড ইটের বদলে বাড়ীঘর নির্মাণের কার্যেও ব্যবহৃত হয়। চিনি শিল্পেও চুনাপাথরের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই পাথর বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহার বাৎসরিক গড় উৎপাদন হইল প্রায় ৬০ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ইহাকে বৃদ্ধি করিয়া ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছে।

অভ্র (Mica): পৃথিবীর মধ্যে ভারতই অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক। সমগ্র বিশ্বে বৎসরে যত পরিমাণে অভ্রের পাত (Sheet Mica) উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ আসে ভারত হইতে। বিহারের হাজারিবাগ ও গয়া জিলা-ই অভ্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। মাদ্রাজ ও রাজস্থানের কোন কোন অংশেও অভ্র উৎপন্ন হয়। বর্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার টন।

ভারত অভ্রের সর্বপ্রধান উৎপাদক

অভ্রের প্রধান ব্যবহারক হইল বৈদ্যুতিক শিল্প। ভারতে যে-পরিমাণে বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে তাহার তুলনায় অভ্রের উৎপাদন হইল অত্যধিক। সুতরাং অভ্র শিল্পকে বিশেষভাবে রপ্তানির উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান বৎসরে প্রায় ৩.৪ হাজার টন রপ্তানি করা হয়।

অভ্রের রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে

চীনামাটি (China Clay): ইহা মৃৎশিল্প, কাগজ ও বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভারতে প্রধানত বিহারেই চীনামাটি পাওয়া যায়। চীনামাটিতে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনে বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে চীনামাটি আমদানি করিতে হয়।

জিপসাম (Gypsum): সিমেন্ট এবং রাসায়নিক সার তৈয়ারি করিতে বিশেষ পরিমাণে গন্ধকের প্রয়োজন হয়। জিপসামের মধ্যে গন্ধক থাকে। রাজস্থান ও মাদ্রাজে জিপসাম পাওয়া যায়। সিন্ধ্রি প্রভৃতিতে সার তৈয়ারির কারখানা স্থাপন এবং অধিকতর সিমেন্ট উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণের পর ধাতু হিসাবে জিপসামের গুরুত্ব এদেশে বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। সঞ্চিত জিপসামের পরিমাণ ৯ কোটি টনের কাছাকাছি বলিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে জিপসামের উৎপাদন ৬ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ২০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

জিপসামের গুরুত্ব বৃদ্ধি

খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারী নীতি (India's Minerals Policy): ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে একটি মাত্র 'নীতি' ছিল—বলা চলে ; এবং ইহা হইল খনিজ মালিকদের স্বার্থে খনিজ দ্রব্যের যথেচ্ছ উত্তোলন ও রপ্তানি। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু ইহার দ্বারা প্রয়োজনমত জাতীয় শিল্পের প্রসার ঘটিতেছিল না।

ব্রিটিশ আমলে সরকারী নীতি

খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন-পদ্ধতিও ছিল বিশেষ প্রাচীন ধরনের। অতি অল্প ক্ষেত্রেই খনিতে আধুনিক যন্ত্রিকরণের (mechanization) নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। এই কারণে বহু পরিমাণে খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটিতে থাকে।

ব্রিটিশ শাসনের যুগে ভারতে খনিজ দ্রব্য সম্পর্কিত গবেষণার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাও কিছু করা হয় নাই।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিবার পর পরিকল্পনা কমিশনারের দৃষ্টি স্বভাবতই এ-দিকে পড়ে। ফলে খনিজ সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। গবেষণার দিক দিয়া একটি খনিজ দ্রব্য গবেষণা সংক্রান্ত ব্যুরো (Indian Bureau of Mining Research) এবং একটি জ্বালানি খনিজের গবেষণাগার (National Fuel Research Laboratory) স্থাপিত হইয়াছে।

জাতীয় সরকারের নীতি :

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে নীতি (Mineral Policy under Planned Economy) : পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ সুরু হইবার পর ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার খনিজ সম্পদের বিস্তারিত অনুসন্ধান, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকিকরণ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে একটি ব্যাপক নীতি গ্রহণ করে।

১। ব্যাপক নীতি গ্রহণ

এই নীতি অনুসারে জিওলজিক্যাল সার্ভে (Geological Survey of India), ভারতীয় খনি সম্পর্কিত ব্যুরো (Indian Bureau of Mines), জাতীয় ধাতুনিষ্কাশন সম্পর্কিত গবেষণাগার (National Metallurgical Laboratory), কেন্দ্রীয় কাঁচ এবং মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠান (Central Glass and Ceramic Research Institute) এবং জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Fuel Research Institute) সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া যাইতেছে।

২। গবেষণার ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানীর সহিত এক চুক্তি অনুসারে এবং এককভাবে সোবিয়েত বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় আসাম, পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যার

অববাহিকা অঞ্চলে, রাজস্থানের জয়শল্মীরে, পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে এবং বর্তমানে বোম্বাই-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধান চালান হইতেছে।

৩। নূতন খনিজ সম্পদের সন্ধান

বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধানের ফলে নূতন নূতন তৈল, কয়লা, তাম্র ও জিপসামের খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১৯৪৮ সালে খনিজ দ্রব্যের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খনি এবং খনিজ দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন) আইন [Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1948] পাস করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে নিয়মাবলীও প্রস্তুত হইয়াছে এবং এগুলিকে কার্যকর করা হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর মধ্যে যন্ত্রিকরণের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪। সংরক্ষণ ও আধুনিকিকরণ

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয় যে, কতকগুলি খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে। এই খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়লা, লৌহ-আকর, খনিজ তৈল, জিপসাম, টিন, সীসা, দস্তা, তাম্র, হীরক, স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা হয়, এই শ্রেণীভুক্ত খনিজ শিল্পগুলি ধীরে ধীরে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) চলিয়া আসিবে এবং মাত্র সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণতাই বে-সরকারী উদ্যোগ দ্বারা পূরিত হইবে।

৫। নূতন শিল্পনীতি ও সরকারী উদ্যোগের প্রসার

ইহার পর ভারতীয় সংবিধানকে সংশোধন করিয়া এই ব্যবস্থা করা হয় যে, খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অধিকারকে পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত করিয়া কোন আইন পাস করা হইলে তাহা আদালত কর্তৃক অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে না। সংবিধান সংশোধনের অব্যবহিত পরেই স্বর্ণ ও হীরক খনি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং কয়লাখনির ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। অবশ্য সরকার হইতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় খনিজ শিল্পের উন্নয়ন পদ্ধতিতে উভয় প্রকার উদ্যোগই পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে—বে-সরকারী উদ্যোগকে বিলুপ্ত করা হইবে না।

ইহার পর আছে খনিজ সম্পদের আঞ্চলিক উন্নয়ন। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি আঞ্চলিক বোর্ড ও আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিবহনজনিত অসুবিধা দূরিকরণের জন্য খনিজ সম্পদ পরিবহন উপদেষ্টা কমিটি (Minerals Transport Advisory Committee) গঠিত হইয়াছে। খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারী নীতি কার্যকরকরণের জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Mines and Oil) সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিদপ্তর ইস্পাত, খনি এবং জ্বালানি মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Steel, Mines and Fuel) সহিত সহযোগিতায় কার্য করে।

৬। আঞ্চলিক উন্নয়ন

৭। নূতন মন্ত্রিসভা

পরিশেষে, উপরি-উক্ত সরকারী শিল্পনীতিকে কার্যকর করিবার ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে তৈল, স্বাভাবিক গ্যাস ও কয়লা ব্যতীত অপর সকল

খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য একটি জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন (National Mineral Development Corporation) গঠন করা হইয়াছে। করপোরেশনটি ১৫ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে গঠিত হইয়াছে। প্রয়োজনমত করপোরেশন অধীনস্থ কোম্পানী গঠন করিয়া রাজ্য সরকার বা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে এই উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে দিতে পারে।

৮। জাতীয় খনিজ দ্রব্য উন্নয়ন করপোরেশন

উড়িষ্যার কিরিবুরুতে লৌহ-আকর উৎপাদনই হইবে করপোরেশনের প্রধান কার্য। এই অঞ্চল হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন করিয়া লৌহ-আকর উৎপাদন করিয়া জাপানে রপ্তানি করা হইবে। রপ্তানিকার্য করিবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation)। লৌহ-আকর উৎপাদন করা স্থরু হইবে ১৯৬০-৬১ সাল হইতে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করপোরেশন তাম্র উত্তোলনের কার্যও আরম্ভ করিবে। তবে এই কার্যের স্থচনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকেও হইতে পারে।

শক্তিসম্পদ (Power Resources)ঃ ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে, কোন দেশের শক্তিসম্পদের উপাদান হইল জনশক্তি (Man power), প্রাণিশক্তি (Animal power), বনভূমি (Forests), কয়লা, তৈল এবং জলবিদ্যুৎ। কিন্তু শক্তিসম্পদের পর্যালোচনায় সাধারণত শেষোক্ত তিনটি উপাদানেরই আলোচনা করা হয়। আমরা এই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভারতের শক্তিসম্পদের পর্যালোচনা করিব। অবশ্য ভারতের প্রাণিসম্পদ ও জনসংখ্যা আলোচনা প্রসংগে জনশক্তি ও প্রাণিশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ মাত্রায় ইংগিত দেওয়া হইবে।

ব্যাপক দৃষ্টিতে শক্তিসম্পদের উপাদান

কয়লা (Coal)ঃ ভারতের খনিজ সম্পদের আলোচনা প্রসংগে কয়লার পরিমাণ, ইত্যাদি সম্বন্ধে একরূপ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এবং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে কয়লা-খনি শিল্পের আলোচনা প্রসংগে এই শিল্পের সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইবে। এখনও পর্যন্ত ভারতে কয়লা শক্তির প্রধান উৎস বলিয়া পরিগণিত। বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন, বিভিন্ন প্রকারের কলকারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতিতে কয়লাই এখনও পর্যন্ত প্রধান শক্তি সরবরাহকারী হিসাবে কার্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ভারতে ভাল 'কোক' কয়লা ও ধাতু নিষ্কাশনকারী কয়লার (metallurgical coal) সঞ্চিত পরিমাণ বিশেষ অধিক নহে।* স্থতরাং সতর্কতার সহিত এই কয়লা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। অপর দিকে অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে আণবিক শক্তির ন্যায় নূতন কোন

কয়লার ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

কয়লা হইতে অধিকতর বিদ্যুৎ উৎপাদন

* ২৪ পৃষ্ঠা

শক্তির আবিষ্কারে কয়লার ব্যবহার একরূপ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাই বলিয়া এই আশায় বিবেচনাবিহীনভাবে সঞ্চিত উৎকৃষ্ট কয়লার ধ্বংসের সপক্ষে কোনমতেই মত দেওয়া যায় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ একরূপ অফুরন্ত বলিয়া এই কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবার সীমাহীন সুযোগ আছে বলা যায়। বর্তমানের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে এই দিকে দৃষ্টিও দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পিত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রে সারা বৎসরব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণকে অব্যাহত রাখিবার জন্য কয়লা লইতে তাপজ বিদ্যুৎ (thermal power) উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

তৈল (Oil)ঃ তৈল ও পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদের মধ্যে তৈল কয়লার পরই স্থানাধিকার করে। প্রথমে কয়লা শক্তির একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইত; পরে পেট্রোলিয়াম ইহাকে কতকটা স্থানচ্যুত করে। শিল্প-বিপ্লবের দিক হইতে দেখিলে বিপ্লব সংঘটিত করে কয়লার ব্যবহার এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে তৈল। শক্তির উৎস হিসাবে তৈল ক্রমে কয়লার স্থানাধিকার করে। ভারতে কিন্তু ভূগর্ভে সঞ্চিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া কয়লার পরিবর্তে প্রভূত পরিমাণে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার কল্পনা করা যায় না। তবুও ভারতে নানাভাবে তৈলের যোগানের পরিমাণকে বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে। তিন-চারিটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করিয়া, আসাম ও পশ্চিমবংগের অববাহিকা ক্যাম্বে জয়শল্মীর জ্বালামুখী প্রভৃতি অঞ্চলে তৈলখনির সন্ধান করিয়া, নিকৃষ্ট কয়লা হইতে মিশ্র পেট্রোলিয়াম (synthetic petrol) এবং ইক্ষু ভুট্টা বার্লি প্রভৃতির অপজাত হইতে শক্তি সুরাসার (power alcohol) উৎপাদন করিয়া তৈলের অভাব যথাসম্ভব পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সরকারী হিসাব অনুসারে তৈল শোধনাগার তিনটি স্থাপনের ফলে বর্তমানে বৎসরে ৫ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) বাঁচিয়া যাইতেছে। কিন্তু এ-সকল চেষ্টা সবিশেষ ফলবতী হইলেও ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় তৈলের সরবরাহ কখনও পর্যাপ্ত হইতে পারিবে না। উপরন্তু, শক্তির উৎস হিসাবে তৈলকে অধিকাংশ সময় প্রধান স্থান দেওয়া যায় না। কারণ, শক্তির এই উৎস বিশেষ সুলভ নহে। ভারতের গ্রামাঞ্চলের পক্ষে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের উন্নয়ন-ব্যবস্থায়, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য অন্য কোনরূপ শক্তির উৎসের প্রয়োজন। এই শক্তি হইল জলবিদ্যুৎ—ভারতে যাহার সীমাহীন সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শক্তির উৎস হিসাবে তৈল ব্যবহারের সীমা

জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity)ঃ সাম্প্রতিক যুগের অর্থ-ব্যবস্থায় জল-বিদ্যুতের ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা একরূপ অসম্ভব। উন্নত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদন, যানবাহন পরিচালন, কৃষিকার্য, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রভৃতি সকল দিকেই জলবিদ্যুৎ একরূপ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায় জলবিদ্যুতের ভূমিকা

ভারতের উদাহরণ লইয়া বলা যায় যে, ধাতুনিষ্কাশনমূলক (metallurgical) প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, রেলপথ প্রভৃতি যানবাহনে, দৈনন্দিন ঘরকন্নার কার্যে বর্তমানে জলবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিতেছে এবং ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে করিবে।

শিল্প-ব্যবস্থায় কয়লা ও জলবিদ্যুতের তুলনামূলক উপকারিতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, জলবিদ্যুৎ শুধু যে সুলভ তাহাই নহে—জলবিদ্যুৎ শিল্পের উপযুক্ত স্থাননির্দেশেও সহায়তা করে। ভারতের কয়লাখনিগুলি একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করার ফলে ভারতে অকাম্যভাবে শিল্পের আঞ্চলিকতা ঘটিয়াছে। এখন প্রয়োজন হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ছড়াইয়া (dispersal) দিয়া আঞ্চলিকতার ত্রুটি দূর করা। এই কার্য জলবিদ্যুতের মাধ্যমেই সাধিত হইতে পারে। জলবিদ্যুতের উৎপাদন-কেন্দ্র একস্থানে অবস্থিত হইলেও বহুদূরে ইহার সরবরাহের ব্যবস্থা করা সহজেই সম্ভব। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারকল্পে প্রতিটি গৃহে ইহা পৌঁছাইয়া দেওয়াও সম্ভব। জাপান্ সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা অনন্যসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে সুলভ জলবিদ্যুতের দান।

শিল্পে জলবিদ্যুতের ভূমিকা

কুটির শিল্পে জল-বিদ্যুতের উপযোগিতা

কৃষির উন্নয়নেও আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। নলকূপ প্রোথিত করা এবং কূপ ও নলকূপ হইতে জল উত্তোলনের কার্যে বৈদ্যুতিক শক্তিকে লাগাইয়া ভারতের শুষ্ক কৃষি-জমিতে জলসেচের সমস্যার সমাধান কতক পরিমাণে করা যাইতে পারে। কৃষির যন্ত্রিকরণ (mechanization) ব্যবস্থাতেও ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করা যাইতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কৃষি-জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

কৃষির উন্নয়নে জলবিদ্যুৎ

যানবাহনের কার্যে জলবিদ্যুৎকে আরও অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করিলে পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া শিল্প-ব্যবস্থায় উন্নতিসাধন করিবে, গ্রামাঞ্চলের স্বতন্ত্র নির্জন অস্তিত্বের অবসান ঘটাইবে এবং গ্রাম্য জনসাধারণের অন্ধ সংস্কার দূর করিয়া আধুনিক, উন্নত জীবনযাত্রার পথ নির্দেশ করিবে।

যানবাহনে জলবিদ্যুৎ

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য মাথা পিছু বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয়কে জীবনযাত্রার মানের অন্যতম সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন (Generation of Hydro-electricity in India)ঃ কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশনের শক্তি শাখার [Water and Power Commission (Power Wing)] হিসাব অনুসারে ভারতের বিভিন্ন উৎস হইতে আমরা ৪·১ কোটি কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন

করিতে পারি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কার্য স্থরু হইলেও এ-পর্যন্ত (১৯৫৮-৫৯) আমরা উপরি-উক্ত সম্ভাবনার মাত্র এক-দশমাংশ উৎপাদন করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছি। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির ভোগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর রহিয়া গিয়াছে। ১৯৫৮ সালের হিসাবে ভারতে মাথাপিছু বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ৩৫ কিলোওয়াট মাত্র। তুলনামূলকভাবে দেখিলে নরওয়েতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৭,২৫০ কিলোওয়াট, কানাডায় ৫,৪৫০ কিলোওয়াট, ব্রিটেনে ২,০০০ কিলোওয়াট, জাপানে ৮৫০ কিলোওয়াট, সোবিয়েত ইউনিয়নে ৯৬০ কিলোওয়াট এবং সমগ্র পৃথিবীর গড় হইল ৬৭০ কিলোওয়াট।* অতএব দেখা যাইতেছে, সমগ্র পৃথিবীর গড় আমাদের দেশের অপেক্ষা প্রায় ২০ গুণ অধিক। ইহা ভারতের অর্ধোন্নত অবস্থার আর একটি পরিচায়ক। তবে আশার কথা যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন দিন দিন বাড়িতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে মাথাপিছু উৎপাদন ছিল মাত্র ১৪ কিলোওয়াট। এখন উহা ৩৫-এ পরিণত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৫০-এ পরিণত হইবে আশা করা হইতেছে। সেচ-ব্যবস্থার প্রসংগে জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

উৎপাদনের পরিমাণ অত্যল্প

ইহা অনগ্রসরতার লক্ষণ

বনসম্পদ (Forest Resources) ঃ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে প্রকৃতি-প্রদত্ত আর একটি মূল্যবান সম্পদ হইল ভারতের অরণ্যভূমি। প্রকৃতপক্ষে, বনসম্পদ ভারতের পক্ষে অন্যতম গর্বের বিষয়। কিন্তু অরণ্যভূমির পরিমাণ ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সরকারী হিসাব অনুসারে ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ হইল ২·৮১ লক্ষ বর্গমাইল। ইহা মোট স্থলভূমির শতকরা ২২·৩ ভাগ মাত্র।** ইহার মধ্যে আবার শতকরা ৫ ভাগ সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল—কারণ ইহা বিশেষভাবে বিক্ষিপ্ত। পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছে যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এই অনুপাত অত্যন্ত কম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে স্থলভূমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইল বনভূমি; ইহা সত্ত্বেও বনসম্পদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ঐ সকল দেশ বনভূমির আরও প্রসার করিবার পক্ষপাতী। অনেকের মতে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মোট স্থলভাগের অন্তত এক-চতুর্থাংশ অরণ্য দ্বারা আবৃত থাকিবে। কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমিই—এক-চতুর্থাংশ নহে, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (FAO) হিসাব অনুসারে ইন্দোনেসিয়ার স্থলভাগের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ব্রহ্মদেশের স্থলভাগের শতকরা ৩০ ভাগ অরণ্য দ্বারা আবৃত। বননীতির উপর সরকারী প্রস্তাব অনুসারে ভারতের মোট স্থলভাগের অন্তত শতকরা ৩৩ ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশ অরণ্যভূমি দ্বারা আবৃত থাকিবে এবং পার্বত্য অঞ্চলে

বনভূমির আয়তন ও পরিমাণ

ভারতে অরণ্যভূমির অনুপাত অতি অল্প

* India—1959. ** India—1959.

অরণ্যভূমির পরিমাণ হইবে শতকরা ৬০ ভাগ আর সমভূমিতে উহা হইবে শতকরা ৩০ ভাগ। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে অরণ্যভূমির অনুপাত যে অতি অল্প তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতের অনেক অরণ্যই নামেমাত্র অরণ্য এবং উহাদের গুরুত্ব অতি অল্প।

বনভূমির অনুপাত হ্রাসের কারণ

চিরকালই অবশ্য এইরূপ অত্যল্প অনুপাত ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও দেশের বনভূমি ভারতের পক্ষে পার্যপ্ত ছিল। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগরিকরণ এবং রেলপথের প্রসারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একরূপ পরিকল্পনাবিহীনভাবেই বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইয়াছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বনভূমির সংরক্ষণ ও প্রসারের দিকে হয়ত' কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, কোন নীতি বা তত্ত্ব স্মরণ না রাখিয়াই অরণ্যের ধ্বংস-সাধন করা হইয়াছে।

সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

অরণ্যভূমির এইরূপ অবস্থার ফলে ভারতে বনভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে বনভূমি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সমস্যা হইল বণ্টন লইয়া। বণ্টনের দিক দিয়া ভারতের অরণ্যসম্পদ বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। কোন কোন রাজ্যে এরূপ গভীর বনভূমি দৃষ্ট হয় যে তাহাকে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বলিয়াই অভিহিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ কেরল ও মধ্যপ্রদেশের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। এই দুইটি রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা আবৃত। অপরদিকে রাজস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য এবং বোম্বাই-এর সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ এত অল্প যে ইহাকে বিপজ্জনক বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। পাঞ্জাবের কোন কোন অংশে বনভূমির অনুপাত মোট স্থলভূমির শতকরা ৩ ভাগেরও কম; সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে ইহা শতকরা ৪ ভাগের সামান্য উর্ধ্বে মাত্র। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে বনভূমির অনুপাত ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও এই বনভূমির অধিকাংশই পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এই সকল রাজ্যের সমভূমি অঞ্চল হইল মরুসদৃশ। আবার ত্রিপুরা এবং বর্তমানে হিমাচলপ্রদেশের বিলাসপুর অঞ্চলে বনভূমির অনুপাত শতকরা ৭০ ভাগেরও অধিক। পশ্চিমবংগ, বিহার ও উড়িষ্যায় এই অনুপাত হইল যথাক্রমে ২০, ২০ ও ২৪।

বনভূমির বণ্টন-সংক্রান্ত সমস্যা

অরণ্যভূমির স্বল্পতার জন্য মরুভূমির প্রসার

বলা হইয়াছে, অরণ্যভূমির বণ্টনজনিত এই ত্রুটি হইল ভারতের বনভূমি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সমস্যা। অন্য এক দিক দিয়া ইহাকে প্রথম ও প্রধান সমস্যারূপেও গণ্য করা চলে। ভারতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ আধুনিক নির্ধারিত মানের তুলনায় অল্প হইলেও অত্যল্প নহে; কিন্তু স্থানে স্থানে ইহা এত অল্প যে এই অবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে অরণ্যভূমির স্বল্পতার জন্য মরুভূমির প্রসার ঘটিতেছে। সুতরাং এই

দিকে দৃষ্টি না দিলে দূর ভবিষ্যতে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণেই বণ্টন-জনিত ত্রুটি দূরিকরণকেই অনেকে ভারতে বনসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যার প্রধান সমাধানরূপে গণ্য করেন।

বনভূমির উপযোগিতা (Utility of Forests) : অধ্যাপক জাথার ও বেরীর ভাষায় বলা যায়, যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বনভূমির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয় প্রকার উপযোগিতাই রহিয়াছে। প্রথমেই পরোক্ষ উপযোগিতা লইয়া আলোচনা করিতে হয় কারণ ইহা প্রত্যক্ষ উপযোগিতা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা

ভারতের জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির উপর বনভূমির বিপুল প্রভাব রহিয়াছে। বনভূমির প্রভাবে আবহাওয়ার চরমভাব নষ্ট হয়। বনভূমি আবার আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে বলিয়া ইহার ফলে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। বনভূমি বায়ুপ্রবাহকেও নিয়ন্ত্রিত করে। মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয় নিবারণ, কৃষি-জমির উর্বরতাবৃদ্ধি, বন্যার সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে হ্রাস করা, পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার পতন রোধ করা প্রভৃতিও বনভূমির পরোক্ষ উপযোগিতা। বনভূমির অস্তিত্ব মরুভূমির প্রসারও বন্ধ করে। মরুভূমির চতুষ্পার্শ্বে বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া মরুভূমির অগ্রগতি রোধ করিবার ব্যবস্থা করা যায়। বনভূমির অস্তিত্বের জন্য দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও নয়নাভিরাম হইয়া উঠে। বনভূমি দেশের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ (flora) এবং জীবজন্তুর (fauna) আশ্রয়স্থল। পূর্বে প্রতিরক্ষার দিক দিয়াও বনভূমির অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বর্তমানে গরিলা যুদ্ধের (guerilla warfare) জন্যও বনভূমি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা

বনভূমির প্রত্যক্ষ উপযোগিতা উদ্ভূত হয় বনজাত দ্রব্যাদি হইতে। প্রধান প্রধান বনজাত দ্রব্যাদি (major forest produce) বলিতে আসবাব ও ঘড়বাড়ী তৈয়ারির কাঠ, রেলপথের কাঠ, জ্বালানি প্রভৃতিই বুঝায়। বিভিন্ন শিল্পের জন্য যে-সকল কাঁচামাল বন হইতে সংগৃহীত হয় তাহাদিগকেই অপ্রধান বনজাত দ্রব্যাদি (minor forest produce) বলে। এই অপ্রধান বনজাত দ্রব্যাদির মধ্যে কাগজ শিল্পের জন্য বাঁশ ও সাপুই ঘাস, নৌকা ও দিয়াশলাই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঠ, চামড়া শিল্পের জন্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, রজন, লাক্ষা ও ঔষধ তৈয়ারির জন্য বিবিধ পত্রগুল্মাদি, খবরের কাগজ তৈয়ারির জন্য বাঁশ প্রভৃতিই প্রধান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মেনী কাষ্ঠ হইতে চিনি ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন করিয়াছিল। ইহা ভারতেও সম্ভব বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

নিয়োগের দিক দিয়া বনভূমির গুরুত্ব

গোচারণ-ক্ষেত্র হিসাবে এবং গবাদি পশুর খাদ্যের যোগানেও বনভূমির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। বনভূমি হইতে এই সকল দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় বলিয়া কাঠুরিয়া, মিস্ত্রী, কাঠের কারবারী, পত্রগুল্মাদি সংগ্রহকারী, ঔষধ নির্মাতা প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বনভূমি হইতে সরকারের সরাসরি প্রচুর আয়ও হয়।

ভারত সরকারের বননীতি (Forest Policy of the Government of India) : ভারত সরকারের বর্তমান বননীতি আলোচনা করিবার পূর্বে সামান্য ঐতিহাসিক পরিক্রমার অবতারণা করা প্রয়োজন। কারণ, ইহা ব্যতিরেকে বর্তমান বননীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ঐতিহাসিক পরিক্রমায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে ভারতে বননীতি বলিতে কোন কিছু ছিল না ; বাণিজ্যিক প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইত। অরণ্যকে উৎপাদনাভিমুখী (productive) করিবার কোন ব্যবস্থাই তখন পর্যন্ত করা হয় নাই। ধীরে ধীরে সরকার ভারতের বনসম্পদের উপযোগিতা ও ইহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকে। ক্রমে একজন বনভূমির ইনস্পেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হন ; বনভূমি সংক্রান্ত দপ্তর স্থাপিত হয় ; বনভূমি শ্রেণীবিভক্ত হয়।

ইহার পর বনভূমি সংক্রান্ত শিক্ষাদানের বিদ্যালয় (Forest School) ও বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার (Forest Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত সরকারী বননীতির উদ্দেশ্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বেই এই কার্য সমাধা হইলেও ইহাদিগকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা বা সুপরিকল্পিত নীতি বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না। এ-পর্যন্ত সরকারের বননীতি দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হইতেছিল—(১) বনভূমি হইতে রাজস্ব সংগ্রহ এবং (২) জলবায়ুর উপর প্রভাবের জন্য বনভূমির সংরক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে পরস্পরবিরোধী। সংরক্ষণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাজস্ব সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায় ; এবং অধিকতর রাজস্ব সংগ্রহে মনোযোগী হইলে বনভূমির প্রয়োজনমত সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় না। যাহা হউক, এই দুই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যের সমবায়ে গঠিত বননীতিই বিংশ শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় দশক অবধি কার্যকর ছিল।

ভারতীয় কৃষি-কমিশন ও বননীতির লক্ষ্য পরিবর্তন

১৯২৮ সালে ভারতীয় কৃষি কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) কৃষিকার্যের দিক হইতে বনভূমির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বনভূমির সংরক্ষণে অধিকতর মনোযোগী হইতে সুপারিশ করে। ক্রমে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির সংরক্ষণ, অরণ্যজাত দ্রব্যাদি হইতে নানাপ্রকার শিল্পের প্রসার প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি পড়ে। দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার বিভিন্ন শিল্পে উত্তরোত্তর অরণ্যজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার লইয়া গবেষণা করিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে স্বাধীনতার পূর্বে এ-সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যথেচ্ছভাবে বনভূমির ধ্বংসসাধন করা হইতে থাকে।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের দৃষ্টি স্বভাবতই এদিকে পড়ে ; এবং শ্রী কে. এম. মুন্সী যখন খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভিযানের

সংগে 'অধিক বৃক্ষ রোপণ কর' অভিযান বা বন মহোৎসব যুক্ত করেন। ১৯৫০ সালের জুলাই-এ প্রথম 'বন মহোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা বার্ষিক কার্যসূচীতে পরিণত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন কার্য করিতে থাকে, এবং কমিশন বনসম্পদবৃদ্ধিকে কৃষির উন্নয়নের অপরিহার্য পরিপূরক বলিয়া ঘোষণা করে। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এক ব্যাপক বননীতি গ্রহণের জন্যও কমিশন সুপারিশ করে। এই উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ ব্যাপক বননীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অরণ্যরক্ষক বোর্ড (Central Board of Forestry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জাতীয় সরকারের বন-নীতি—বন মহোৎসব

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ

বর্তমান বননীতির মূলসূত্র

পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ ও অরণ্যরক্ষক বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫২ সালে একটি ব্যাপক বননীতি গৃহীত হয়। দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই নীতিকে পরিচালিত করা হইতেছে। প্রথমত, অরণ্যসম্পদের দীর্ঘকালীন উন্নতিবিধান করা। দ্বিতীয়ত, অদূর ভবিষ্যতে কাষ্ঠের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা হইবে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা। সংক্ষেপে ১৯৫২ সালের বননীতির মূলসূত্রগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে:

(১) বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মোট স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশে পরিণত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির অনুপাত হইবে স্থলভাগের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সমতল ভূমিতে শতকরা ৩০ ভাগ।*

(২) সমপরিমাণ নূতন বনভূমির পত্তন না করিয়া বনভূমির কোন অংশের ধ্বংসসাধন করা যাইবে না।

(৩) পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করিয়া বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৪) দুর্গম বনভূমি অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(৫) চারণভূমি এবং জ্বালানি কাঠ সরবরাহের জন্য গ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে সাধারণ বনভূমির পত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) বিভিন্ন শিল্পে বনজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার এবং শিল্পসমূহের মধ্যে সংযোগসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপরন্তু, মরুভূমি অঞ্চলে বনভূমি পত্তনের জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। রাজস্থানের মরুভূমির পশ্চিম অংশে প্রস্থে পাঁচ মাইল এক বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া এই মরুভূমির অগ্রগতি রোধের ব্যবস্থা হইতেছে। এই বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২,০০০ বর্গমাইল হইবে। দেরাদুনের বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগারের সম্পূর্ণ আধুনিকিকরণ ও কার্যবৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই

রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার বন্ধের প্রচেষ্টা

---

* ৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখা (Soil Conservation Wing) যুক্ত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে যে-সকল মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অরণ্যভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ হইল তাহাদের অন্যতম প্রধান কার্য।

মৃত্তিকা সংরক্ষণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অরণ্যসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যের জন্য মোট ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম অনুসরণের ফলে ১৫ হাজার একর মরুসদৃশ ভূমি অরণ্য শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে, বৎসরে ৩ হাজার একর করিয়া দিয়াশলাই কাষ্ঠের জমি বৃদ্ধি পাইয়াছে, বনভূমির মধ্যে ৩ হাজার মাইলের মত সড়ক নির্মিত হইয়াছে এবং ২০ লক্ষ একর অরণ্যভূমি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা

পরিবর্তিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বনভূমির পুনর্বাসন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য ২৪·৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।* এই অর্থব্যয়ে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার (afforestation) এবং ১ লক্ষ ১৫ হাজার একরের মত জমিতে নূতন বনভূমির পত্তন করা হইবে। এই ১ লক্ষ ১৫ হাজার একর নূতন বনভূমির মধ্যে ৫০ হাজার একর জমিতে দিয়াশলাই শিল্পের জন্য কাষ্ঠ প্রভৃতির মত কাঁচামাল সরবরাহকারী বৃক্ষ রোপণ করা হইবে এবং ৫০ হাজার একর জমিতে সেগুন প্রভৃতি বাণিজ্যিক বৃক্ষ রোপিত হইবে। বাকী ১৫ হাজার একর নিযুক্ত হইবে গঁদ প্রভৃতির জন্য বৃক্ষ এবং ঔষধপত্রাদির জন্য গুল্মাদি রোপণে। ইহা ছাড়া বনভূমির মধ্যে ৭ হাজার মাইলের উপর সড়কের উন্নতিসাধন বা নির্মাণ করা হইবে। সম্প্রতি বনসম্পদের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। বনভূমির উন্নততর তদারক ও বনসম্পদের গবেষণাই এই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ। বর্তমানে মোট বাৎসরিক ব্যয় ১০ কোটি টাকার উপর। নানাস্থানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত অরণ্যভূমির পুনরুদ্ধার, নূতন বনভূমি পত্তন বা পুরাতন বনভূমির সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে অরণ্যসম্পদের সম্প্রসারণ ও মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ ভারতে একটি বনসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বনসম্পদ

প্রাণিসম্পদ (Animal Resources): ভারত নানাপ্রকার বন্য ও গৃহপালিত জীবজন্তুর বাসভূমি। ভারতের ক্ষেত্রে জীবজন্তুর মধ্যে গরু ও মহিষই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে গো-মহিষে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতম দেশ।

---

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan.

১৯৫৬ সালের পঞ্চবার্ষিকী পশু আদমসুমারি অনুসারে পৃথিবীর সমগ্র গরুর ১৯ ভাগ এবং মহিষের প্রায় অর্ধেক ভারতেই আছে। সংখ্যায় ইহারা হইল যথাক্রমে ১৫'৫ কোটি ও ৪'৫ কোটি। সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক হইলেও ভারতের গো-মহিষ উৎকৃষ্ট জাতের নয়। দুগ্ধদান ও শক্তির উৎস—উভয় ব্যাপারেই ইহারা অন্যান্য উন্নত দেশের গো-মহিষাদির সমকক্ষ নয়। ভারতের গো-মহিষাদির প্রায় এক-দশমাংশ একেবারেই অকেজো। তবুও সংখ্যায় অধিক বলিয়া ইহাদের দ্বারা হল-কর্ষণ, জলসেচ ও ভারবহনের কার্য একরূপ সমাধা করা হয়; এবং ইহাদের হইতে দুগ্ধ পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও বেশ কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। গো-মহিষাদির পরে আছে গাধা, ছাগল, উট, ভেড়া প্রভৃতি। ছাগল প্রধানত দুগ্ধ ও মাংস সরবরাহ করে; গাধা ও উট ভারবাহী পশু হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনে লাগে; এবং ভেড়া হইতে পশম ও মাংস পাওয়া যায়। ভারতে ভেড়া ও উটের সংখ্যা অধিক নয়।

সংখ্যায় ভারতের গো-মহিষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক

পশুপালন সমস্যা ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ইহার কারণ হইল পশুচারণ ভূমি ও পশুখাদ্যের অভাব, উন্নত পশুপালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সাধারণ লোকের দারিদ্র্য। পশুখাদ্যের অভাবের জন্যই ভারতের মোট গো-মহিষাদির এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের খাদ্যের অভাব মিটাইবার জন্য নূতন নূতন কৃষি-জমির সন্ধান করা হইতেছে। এ ক্ষেত্রে পশুখাদ্যের জন্য অধিক জমি ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ লোকের উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুপালন সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই; ধারণা থাকিলেও দারিদ্র্য হেতু ইহাকে অধিকাংশ সময় কার্যে রূপদান করিতে পারে না। কিন্তু প্রাণিসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং পশুপালন সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উন্নততর পদ্ধতিতে পশুপালনের নীতি ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হইয়াছে এবং সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ (Directive Principle) অনুসারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ইহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

ভারতের পশুপালন সমস্যা

প্রথম পরিকল্পনায় গো-পালন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬০টি গো-সদন প্রতিষ্ঠা করিয়া চারণভূমির উপর হইতে চাপ কমাইবার নীতি ঘোষিত হয়। তুলনামূলকভাবে অকেজো গো-মহিষাদিকে যেখানে স্বল্পতার প্রশ্ন নাই এরূপ দূরের চারণভূমিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয় নাই; ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে মাত্র ২৫টি গো-সদন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়; এবং প্রতিষ্ঠিত গো-সদনগুলিও প্রয়োজনীয় চারণভূমি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে গো-সদন প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে মূল গ্রাম-পরিকল্পনার (key village scheme) প্রতি। এই পরিকল্পনায় উন্নততর স্বাভাবিক ও কৃত্রিম প্রজনন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যবস্থা

পদ্ধতিতে উন্নততর জাতের গো-মহিষাদির সৃষ্টি করা হয়। পশুখাদ্য সরবরাহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সমবায় পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা হয়।

পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ হইল ৫৬ কোটি টাকা। ইহার দ্বারা মূল গ্রামের সংখ্যা ১,২০০-র মত বৃদ্ধি করা ছাড়াও ১,৯০০ নূতন পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পশুমড়ক নিবারণ, উন্নত শ্রেণীর পশম অধিক পরিমাণ উৎপাদনের ব্যবস্থা, হাঁস-মুরগী পালনের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of the mineral resources of India and point out their utility for its industrial development. [C. U. B. A. 19.7] (২২-২৯ পৃষ্ঠা)

2. Give a critical estimate of the minerals policy of the Government of India. (৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

3. Indicate the importance of forests in the economic life of India. (৩৭ পৃষ্ঠা) [C. U. B. Com. 1948, '50]

4. Give an account of the forest policy of the Government of India. (৩৮-৪০ পৃষ্ঠা)

5. Briefly describe the power resources of India. (৩২-৩৫ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

কোন দেশের আর্থিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে ধারণা করিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হইল উহার জাতীয় আয়ের বিশদ পর্যালোচনা করা। "প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থার আলোচনা উহার জাতীয় আয়ের পরিমাণ, বণ্টন ও স্থায়িত্ব নির্ধারক উপাদানগুলির আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।"* অতএব, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরই ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, জাতীয় আয় বলিতে সঠিক কি বুঝায় এবং উহা পরিমাপের পদ্ধতি কি? বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে আমরা জাতীয় আয়কে দুইটি দিক হইতে দেখিতে পারি। একদিক দিয়া আমরা বলিতে পারি যে, কোন দেশে নির্দিষ্ট সময়ে যে-সমস্ত সামগ্রী ও

* Benham—Economics.

সেবামূলক কার্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার নীট অর্থমূল্যই জাতীয় আয়। বিদেশজাত নীট আয়কেও এই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার অপরদিক হইতে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের উপাদানসমূহ আয় হিসাবে যে মোট অর্থ উপার্জন করে তাহাই হইল জাতীয় আয়। উপরে যে নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা সাধারণত এক বৎসরকেই ধরা হয়। যে-দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন একই ফল পাওয়া যাইবে—কারণ একই জিনিসকে আমরা দুইটি দিক হইতে দেখি। উৎপাদন-উপাদানের পারস্পরিক সহযোগে বার্ষিক উৎপন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যের মূল্যসমষ্টি এবং উৎপাদন-উপাদানের বার্ষিক আয়ের সমষ্টি। তবে পরিমাপের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

জাতীয় আয়ের বিচার দুই দিক হইতে করা যায়

উপরি-উক্ত দুইটি দিক হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি আছে। ইহারা হইল : (১) উৎপাদনস্থমারি পদ্ধতি বা চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি (Census of Production Method or Final Products Total), এবং (২) উৎপাদন-উপাদানের আয়স্থমারি পদ্ধতি বা উৎপাদন-উপাদানের আয়সমষ্টি (Census of Incomes Method or Factor-Payments Total)।

জাতীয় আয় পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি

(১) উৎপাদনস্থমারি পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ উৎপন্নের সমষ্টি—এই পদ্ধতিতে প্রথমে বৎসরে যে-পরিমাণ সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপাদিত হয় তাহার অর্থমূল্য যোগ দেওয়া হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product)। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণের সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে, একই দ্রব্য যেন দ্বিতীয়বার গণনা করা না হয়। এই কারণে মাত্র চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের অর্থমূল্যই ধরা হয়; মধ্যপর্যায়ের দ্রব্য বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না। কারণ, সম্পূর্ণ দ্রব্যের অর্থমূল্যের মধ্যে উহার মূল্য নিহিত রহিয়া গিয়াছে—যেমন, বস্ত্রের মধ্যেই কাঁচা তুলা বা স্থতার মূল্য রহিয়া গিয়াছে। স্থতরাং কাঁচা তুলা বা স্থতার মূল্য পৃথক্‌ভাবে যোগ দেওয়া হইলে একই জিনিসের অর্থমূল্য একাধিকবার ধরা হইবে। এইভাবে নির্ধারিত মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মূলধনের যে-অপচয় (depreciation) ঘটিয়াছে তাহার পূর্তির খরচ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product) পাওয়া যাইবে।

উৎপাদনস্থমারি পদ্ধতি

মোট জাতীয় উৎপাদন

নীট জাতীয় উৎপাদন

উৎপাদন-উপাদানের আয়স্থমারি পদ্ধতি বা উৎপাদন-উপাদানের আয়সমষ্টি—এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বার্ষিক অর্থ-আয়কে যোগ দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। উপাদানের অর্থ-আয় বলিতে বুঝায় : (১) মজুরি বেতন ও ভাতা, (২) সকল প্রকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নীট আয়, (৩) নীট স্থদ, (৪) নীট খাজনা। এইভাবে জাতীয়

উৎপাদন-উপাদানের আয়স্থমারি পদ্ধতি

আয় হিসাব সম্পর্কে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ঃ প্রথমত, হস্তান্তর-পাওনা (transfer payments) জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কারণ, কোন উৎপাদনকার্যের জন্য উহা উপার্জিত হয় না। যেমন, আশ্রয়প্রার্থীদের অর্থসাহায্য করা হইলে ঐ অর্থ জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হয় না, কারণ কোন উৎপাদনকার্যের জন্য উহা অর্জিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার একাংশ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হইলে উহাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়ত, মালিকের নিজস্ব জমি, শ্রম প্রভৃতি উপাদানের আয় বাজার-মূল্যে নির্ধারিত করিয়া জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আরও বলা হয় যে, যে-সমস্ত সামগ্রী বা সেবামূলক কার্যের জন্য অর্থমূল্য দেওয়া হয় না, (যেমন, গৃহিণীর কার্য, বাগানের তরিতরকারি যাহা যাহা বাজারে বিক্রয় করা হয় না, ইত্যাদি) তাহা জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতের মত অনগ্রসর দেশে উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ উৎপাদকেরা নিজেরাই ভোগ করে—যেমন, কৃষিজাত দ্রব্যের বিরাট অংশই কৃষকেরা সরাসরি ভোগ করিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দ্রব্য-বিনিময় চলে। সুতরাং ইহাদের বাদ দিলে জাতীয় আয়ের হিসাব একপ্রকার অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, জাতীয় আয় উৎপাদন-পদ্ধতি বা আয়-পদ্ধতি যে-কোনটির সাহায্যেই পরিমাপ করা হউক-না-কেন ফল একই পাওয়া যাইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতিতে উৎপাদনের মূল্যসমষ্টি নির্ধারণের সময় বাজার-মূল্য হইতে অপ্রত্যক্ষ করকে বাদ দিতে হইবে।

জাতীয় আয় পরিমাপের আরও কতকগুলি সমস্যাঃ (১) জাতীয় আয় পরিমাপের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিষয়ও বিচার করিতে হইবে। বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যাদির আমদানি-রপ্তানির পার্থক্যকে ধরিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে। এই উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে উহা আভ্যন্তরীণ জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে ; আর উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে আভ্যন্তরীণ আয় হইতে উহাকে বাদ দিতে হইবে।

জাতীয় আয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(২) জাতীয় আয় অর্থের মাধ্যমে হিসাব করা হয়, কিন্তু অর্থের নিজের মূল্য বা ক্রয়-ক্ষমতা পরিবর্তনশীল। এই অবস্থায় জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত না হইলেও উহার অর্থমূল্য পরিবর্তিত হইতে পারে—যেমন, কোন দুই বৎসরের উৎপন্ন সামগ্রী ও সেবামূলক কার্যের পরিমাণ একই থাকিতে পারে। কিন্তু প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বৎসরে দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অর্থমূল্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উৎপাদন সম্প্রসারিত হয় নাই। সুতরাং দুই বৎসরের প্রকৃত জাতীয় আয়ের তুলনা করিতে হইলে অর্থমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করিয়া জাতীয় আয়ের অর্থমূল্য সংশোধিত করিয়া লইতে

জাতীয় আয় ও অর্থমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি

হইবে। মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক বিচার করিবার সময়ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থের ক্রয়শক্তির পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (The Utility of National Income Analysis)ঃ বিভিন্ন দিক হইতে জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব রহিয়াছে। প্রথমত, বলা হয় কোন দেশের আর্থিক কল্যাণ জাতীয় আয়ের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু এইভাবে আর্থিক কল্যাণের পরিমাপ সকল সময় নিরাপদ নহে।

১। জাতীয় আয়ের সাহায্যে জাতীয় কল্যাণ পরিমাপ করা যায়

উদাহরণস্বরূপ, হীনস্বাস্থ্যসম্পন্ন জাতির পক্ষে জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদিতে ব্যয় করাই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় আর্থিক কল্যাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতে পারিত তাহা সম্ভব হয় না। অবশ্য স্বাস্থ্যোন্নয়নের ফলে জাতীয় উৎপাদন বা আয় কতকটা বৃদ্ধি পাইবে। আবার কোন দেশে বিশৃংখলা বা অরাজকতা অনবরত লাগিয়া থাকিলে নিরাপত্তা ও শৃংখলা রক্ষার জন্য 'পুলিসী ব্যয়' অধিক হইবে। ইহার ফলে জাতীয় আয় জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না। যাহা হউক হেবারলারের ভাষায় বলা যায়, "অন্যান্য বিষয় সমান ধরিয়া লইলে জাতীয় আয় অধিক হইলে আর্থিক কল্যাণও অধিক হইবে।" দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় হইতে কোন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বুঝা যায়। এ-ক্ষেত্রেও মনে রাখিতে হইবে যে, মাত্র

২। জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে জীবন-যাত্রার মান বুঝা যায়

গড়পড়তা আয়ের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাত্রার মান সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ কয়েক জনের হাতে গিয়া পড়িতে পারে ; মাত্র সামান্য অংশই সংখ্যাধিক জনসাধারণের ভাগ্যে জুটিতে পারে। অতএব প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার স্থবিধার জন্য জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয় পৃথক্‌ভাবে দেখানও প্রয়োজন।

৩। জাতীয় আয় হইতে অর্থনৈতিক প্রসারের গতি বুঝা যায়

তৃতীয়ত, দেশের অর্থনৈতিক প্রসারের গতি কোন্ দিকে এবং উহা কাম্য কিনা? তাহা জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে এবং উহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি অপরিহার্য। অর্থনৈতিক কার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে

৪। পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব

উৎপাদনের হার কি, বিভিন্ন শ্রেণীর সঞ্চয় কতটা প্রভৃতি অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করিয়া সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, করনীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে। এইজন্য জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) বলিয়াছে, "জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা এবং উহার বিভিন্ন অংশের ব্যবস্থা ও সম্পর্কের সাধারণ রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে।"

পরিশেষে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সভ্যতার পর্যায় ও জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক

বিচার-বিবেচনা করিতে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান সহায়তা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক তুলনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম কতদূর পরিচালিত হয়, মূল্যের স্তর কি, জীবনযাত্রার প্রণালী কি প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্নতা থাকায় অনেকে আন্তর্জাতিক তুলনার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। ডাঃ বাউলি (Dr. Bowly) বলেন, "দুই দেশের মধ্যে সংখ্যাসূচক তুলনা নিশ্চিতভাবে করা যায় কিনা এ-সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।"

৫। বিভিন্ন দেশের সহিত তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয় সহায়তা করে

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India) ; ভারতে জাতীয় আয় হিসাবের প্রধান অন্তরায় হইল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা। ফলে হিসাবে ভুল থাকিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় এবং ভোগকারীর ব্যয় ও সঞ্চয় সম্পর্কে তথ্যাদি অ-পর্যাপ্ত। শিল্পের বেলায়ও পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়। মূলধন-গঠন সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা দুষ্কর।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণে অসুবিধা :
১। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব

দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট হইতে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু ভারতে নিরক্ষরতা ব্যাপক হওয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন। আবার এই দেশে হিসাব-রক্ষার প্রচলন বিশেষ নাই। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক তথ্যাদি সংগ্রহকে জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখে এবং ঐ ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে চায় না। তৃতীয়ত, উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে বিক্রয় হয় না। হয় উহা উৎপাদকেরা নিজেরাই ভোগ করে অথবা উহাকে অন্যান্য দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের সহিত সরাসরি বিনিময় করা হয়। এই অসুবিধার জন্য জাতীয় আয় কমিটি আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত (monetary and non-monetary sectors)—এই দুই ক্ষেত্রে ভাগ করিয়া জাতীয় আয় পরিমাপের পরামর্শ দিয়াছে। চতুর্থত, শিল্পক্ষেত্র ভেদে জাতীয় আয়ের শ্রেণীবিভাগ করাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়ে—কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তিতে (household affairs) চলে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া অর্থোপার্জন করে। পঞ্চমত, শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন [বিশেষভাবে] অসংগঠিত। ফলে উহার পরিমাপ করা সহজসাধ্য নহে।

২। পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা কঠিন

৩। উৎপাদনের একটা বিরাট অংশ বাজারে আসে না

৪। শিল্পক্ষেত্রভেদে জাতীয় আয়ের শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন

৫। অসংগঠিত কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা

ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Estimates of National Income of India) : সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সরকার ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেয় নাই। অধুনা ১৯৪৯ সালে সরকার রাজস্ব মন্ত্রিদপ্তরে

একটি জাতীয় আয় শাখা (a National Income Unit) গঠন করে।

রাজস্ব মন্ত্রিদপ্তরের জাতীয় আয় শাখা

এই শাখার কর্তব্য হইল জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাব রচনা করা। এই শাখাকে পরিচালিত করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে একটি জাতীয় আয় কমিটিও নিযুক্ত করা হয়। জাতীয় আয়

জাতীয় আয় কমিটি

কমিটির হিসাব আলোচনার পূর্বে জাতীয় আয়ের অন্যান্য কয়েকটি হিসাবের সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে।

দাদাভাই নওরোজির প্রথম প্রচেষ্টা

জাতীয় আয়ের হিসাবের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন দাদাভাই নওরোজি। তিনি ১৮৬৭-৭০ সালের হিসাব দিয়াছেন। জাতীয় আয়ের পূর্ববর্তী হিসাবগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হইল :

হিসাবপ্রণেতা	বৎসর	বার্ষিক মাথাপিছু আয়
		টা. আ. পা.
দাদাভাই নওরোজি	১৮৬৭-৭০	২০—০—০
লর্ড ক্রোমার এবং ব্যারবোর (Lord Cromer and Barbour)	১৮৮২	২৭—০—০
ডিগ্‌বী (Digby)	১৮৯৮-৯৯	১৭—৮—২
" "	১৯০১	১৮—৮—১১
লর্ড কার্জন (Lord Curzon)	১৯০০	৩০—০—০
এ্যাট্‌কিনসন (F. G. Atkinson)	১৮৭৫	৩০—৮—০
" "	১৮৯৫	৩৯—৮—০
ওয়াদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	৪৪—৫—৬
শাহা এবং খাম্বাটা	১৯০০-১৪	৩৬—০—০
" "	যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়	৩৮—০—০
ফিণ্ডলে শিরা (Findlay Shirras)	১৯২১	১০৭—০—০
" "	১৯২২	১১৬—০—০
সাইমন কমিশন রিপোর্ট (Simon Commission Report)	১৯২৯	১১৬—০—০
ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও	১৯২৫-২৬	৭৬—০—০
" " " " " "	১৯৩১-৩২	৬৫—০—০
স্যার জেমস গ্রিগ্ (Sir James Grigg)	১৯৩৭-৩৮	৫৬—০—০
ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট (Eastern Economist)	১৯৩৯-৪০	৭২—০—০

মাথাপিছু আয়ের কতকটা ইংগিত দিলেও এই সমস্ত হিসাবের নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াছে। বিভিন্ন হিসাবপ্রণেতা বিভিন্ন জিনিস্ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর তাহা ছাড়া তাহারা যে-সমস্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও নির্ভুল নয়। তবে ইহাদের মধ্যে ডাঃ রাও-এর হিসাবই অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য আয়-পদ্ধতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহার পর ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর ১৯৪৭-৪৮ সালের এক হিসাব প্রকাশ করে। এই হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭২ টাকা।

পূর্ববর্তী হিসাবের ত্রুটি

ভারত স্বাধীন হইবার পর জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রণয়নের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। বাণিজ্য মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হিসাবে বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করা হয় না। তখন জাতীয় আয়ের হিসাব রচনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য জাতীয় আয় কমিটি (National Incomes Committee) নিযুক্ত করা হয়। কমিটি জাতীয় আয় হিসাবের জন্য আয়-পদ্ধতি (Incomes Method) এবং উৎপাদন-পদ্ধতি (Production Method)—উভয় পদ্ধতিরই সাহায্য গ্রহণ করে। কৃষি, পশুপালন, অরণ্যজাত দ্রব্য, মৎস্যচাষ, খনিজ দ্রব্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন-পদ্ধতি নিয়োগ করা হয় আর বাণিজ্য, পরিবহন, শাসনকার্য, বিভিন্ন পেশা, গৃহভৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে আয়-পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। জাতীয় আয় কমিটির প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে এবং শেষ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই রিপোর্ট দুইটি এবং ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (Central Statistical Organisation) কর্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য হিসাবের ভিত্তিতে গত কয়েক বৎসরের জাতীয় আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:

জাতীয় আয় কমিটি নিয়োগ

কমিটি আয়-পদ্ধতি ও উৎপাদন-পদ্ধতি উভয় পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে

কমিটির রিপোর্ট প্রদান

*** জাতীয় আয়ের হিসাব** (প্রচলিত দামের ভিত্তিতে)

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৭-৫৮
কৃষি (Agriculture)	(১)	(২)	(৩)	(৪)
কৃষিকার্য, পশুপালন ও আনুষংগিক কার্য—	৪,১৬০	৪,৭৮০	৪,৪১০	৫,৫৫০
অরণ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন—	৬০	৭০	৭০	৮০
মৎস্য চাষ—	৩০	৪০	৫০	৬০
মোট :	৪,২৫০	৪,৮৯০	৪,৫৩০	৫,৬৯০

* Estimates of National Income—published by the Central Statistical Organisation, Government of India.

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭*
খনিজ কার্য, যন্ত্রশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প (Mining, manufacturing and small enterprises)				
খনির কার্য—	৬০	৭০	১০০	১১০
ফ্যাক্টরী—	৫৫০	৫৫০	৭৮০	৮৯০
ক্ষুদ্র শিল্প—	৮৭০	৯১০	৯৭০	৯৭০
মোট :	১,৪৮০	১,৫৩০	১,৮৫০	১,৯৭০
ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও সংসরণ (Commerce, transport and communication)				
সংসরণ—	৩০	৪০	৫০	৫০
রেলপথ—	১৭০	১৮০	২৫০	২৮০
সংগঠিত ব্যাংক ও বীমা—	৫০	৭০	৯০	১০০
অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন—	১,৩৫০	১,৪০০	১,৪৯০	১,৫০০
মোট :	১,৬০০	১,৬৯০	১,৮৮০	১,৯৩০
অন্যান্য সেবামূলক কার্য (Other services)				
বিভিন্ন পেশা ও সুকুমার বৃত্তি—	৪৩০	৪৭০	৫৬০	৫৮০
সরকারী চাকরি—	৪০০	৪৩০	৫৭০	৬০০
বাড়ীর চাকরবাকর—	১২০	১৩০	১৪০	১৫০
গৃহসম্পত্তি—	৩৯০	৪১০	৪৬০	৪৮০
মোট:	১,৩৪০	১,৪৪০	১,৭৩০	১,৮১০
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Net domestic product at factor cost)—	৮,৬৭০	৯,৫৫০	৯,৯৯০	১১,৪১০
বিদেশ হইতে উপার্জিত নীট আয় (Net earned income from abroad)—	–২০	–২০	–	–১০
উৎপাদন-উপাদানের ব্যয়ের হিসাবে নীট জাতীয় উৎপাদন=জাতীয় আয় (Net National Output at factor cost = National Income)—	৮,৬৫০	৯,৫৩০	৯,৯৯০	১১,৪১০

উপরে প্রচলিত দামের ভিত্তিতে (at current prices) জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু মূল্যস্তর অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের

* ৪৮ পৃষ্ঠার তালিকার শেষের কলমেও ১৯৫৭-৫৮ সালের পরিবর্তে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইবে।

ভিত্তিতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। নিম্নে দুইটি হিসাব পাশাপাশি দেওয়া হইল :

জাতীয় আয় (হিসাব কোটি টাকায়)

বৎসর	প্রচলিত দামের ভিত্তিতে	১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০	৮,৬৫০
১৯৫০-৫১	৯,৫৩০	৮,৮৫০
১৯৫৫-৫৬	৯,৯৯০	১০,৪৮০
১৯৫৬-৫৭	১১,৪১০	১১,০১০

মাথাপিছু আয় (হিসাব টাকায়)

	১৯৪৮-৪৯	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
প্রচলিত মূল্যের হিসাবে (at current prices)	২৪৬.৯	২৬৫.২	২৬০.৮	২৯৪.৩
১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে (at 1948-49 prices)	২৪৬.৯	২৪৬.৩	২৭৩.৬	২৮৪.০

উপরি-উক্ত জাতীয় আয় সংক্রান্ত হিসাব হইতে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় :

১। বৈশিষ্ট্য : জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে

প্রথমত, ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল—কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে (at 1948-49 prices) ভারতের নীট জাতীয় আয় ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৮,৬৫০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১,০১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ১৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে দেখা যায় যে, জাতীয় আয় পূর্বের বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বাড়িয়া হয় ১১,০১০ কোটি টাকা।—অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা, ৫.১ ভাগ বৃদ্ধি

পায়। প্রচলিত মূল্যের হিসাবে (at current prices) বিচার করিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৯০ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা হয় ১১,৪১০ কোটি টাকা; অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে জাতীয় আয় শতকরা ১৪·২ ভাগ বাড়িয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১৩,৪৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে—অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। এখন পরিকল্পনার ছাঁটকাটের ফলে উহা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক জাতীয় আয় খুব চমকপ্রদভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও পরিকল্পনা প্রবর্তনের ফলে উহার গতি উর্ধ্বাভিমুখী হইয়াছে। তবে ১৯৫৭-৫৮ সালে যে-গতি দেখা দিয়াছে তাহা আশংকাজনক। নিম্নে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা

দ্বিতীয়ত, যদিও মাথাপিছু আয় কিছুটা বাড়িয়াছে কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রার কোন বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের হিসাবে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল প্রায় ২৪৭ টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বাড়িয়া হয় ২৮৪ টাকা। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা ১০·৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।* পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।** কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয়, সাধারণ লোকের দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকট। অন্যান্য দেশের মাথাপিছু আয়ের সংগে তুলনা করিলে দেখা যাইবে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় অতি সামান্য। ১৯ ৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও যুক্তরাজ্যে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৮,৭৮৪ টাকা এবং ৪,০৫৭ টাকা।

২। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই

তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয়ের দ্বারাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাইবে না। কারণ, উহা গড়পড়তা হিসাব মাত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি না থাকিলেও বিভিন্ন বেসরকারী সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে বলা যায় যে, জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ সাধারণ লোক জাতীয় আয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে। অপরদিকে জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের মত বিত্তশালী লোক জাতীয় আয়ের আর এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে। বাকিটা মধ্যবিত্তের হাতে যায়।

৩। জাতীয় আয় বণ্টন-ব্যবস্থার বৈষম্য

* Review of the First Five Year Plan.

** জাতীয় আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু আয় সেই পরিমাণে নাও বাড়িতে পারে—কারণ ইতিমধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

চতুর্থত, ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো যে সুসমঞ্জস নয় তাহা উপরের হিসাব হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। জাতীয় আয়ের মোটামুটি শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি হইতে। বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য বেশী। কারখানা-শিল্প জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগের মত যোগান দেয়; অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ শতকরা ৯ ভাগের মত। খনি হইতে জাতীয় আয়ের অংশ শতকরা ১ ভাগেরও কম। পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসরণের অংশ হইল শতকরা ১৭ ভাগের মত। অন্যান্য উৎস হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬ ভাগের মত পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ভারত এখনও কৃষিপ্রধান।

৪। ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সুসমঞ্জস নয়

বিভিন্ন উৎস হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ

জাতীয় আয় কমিটি আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছে। প্রথমত, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের তুলনায় অধিক হইয়াছে। ১৯৪৯ সাল এবং ১৯৫৩ সালের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে। অপরদিকে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৩ ভাগ। দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ কর হইতেই সরকারী আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে অধিক। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সরকার প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ করের উপর অধিক নির্ভরশীল।

৫। বেসরকারী উদ্যোগের তুলনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার অধিক

৬। প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ কর হইতেই সরকারের অধিক আয় হয়

১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় (National and Per Capita Income in 1957-58): ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয়ের যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে উহার নিয়মিত বৃদ্ধি ব্যাহত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ১৯৫৭-৫৮ সালে জাতীয় আয় ছিল ১০,৮৩০ কোটি টাকা। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ১·৫ ভাগের মত কম। পূর্ববর্তী বৎসরে জাতীয় আয় ছিল ১১০১০ কোটি টাকা। মাথাপিছু আয়ও ২৮৪ টাকা হইতে কমিয়া ২৭৬ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই আয় হ্রাসের কারণ হইল কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস। ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কৃষিজ উৎপাদন ৩১০ কোটি টাকার মত হ্রাস পায়। অপরদিকে অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্র হইতে ১৪০ কোটি টাকার মত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে মোট হ্রাস ১৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৯৫৮-৫৯ সালে জাতীয় আয়ের হিসাব না পাওয়া গেলেও অনুমান করা হইতেছে যে এই বৎসরে ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইবে—কারণ, কৃষিজ উৎপাদন আবার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, ১৯৫৭-৫৮-সালের কথা ছাড়িয়া মোটামুটিভাবে পূর্বোল্লিখিত অভিমতের সমর্থন করা যায় যে ভারতের জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Give in brief the important features of Indian economy as revealed by the study of the National Income of India.

[ইংগিত : (১) প্রথম পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। (৩) জাতীয় আয়ের বণ্টন-ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। (৪) ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসমঞ্জস নয়। এখনও জাতীয় আয়ের অর্ধেকের মত কৃষি হইতে আসে। কারখানা-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইল যথাক্রমে শতকরা ৮ ও ৯ ভাগ। (৫) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির হার অধিক। (৬) সরকার প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ করের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল...এবং ৫০-৫২ পৃষ্ঠা দেখ।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক পরিবেশ

(The Social Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশের মত না হইলেও, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সামাজিক পরিবেশ দ্বারাও বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্ধোন্নত অঞ্চলের অস্তিত্বের অন্যতম কারণই হইল রক্ষণশীল সামাজিক পরিবেশ। ভারত অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ বলিয়া ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জীবনের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা অধিক। ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প এবং সাধারণ ভারতবাসীর জীবন এখনও প্রথা ও সামাজিক মর্যাদা (custom and status) দ্বারা বহুপরিমাণে নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির (materialistic outlook) প্রসার ঘটিলেও অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ভারতবাসীর ধর্মবোধ এখনও বিশেষভাবে জাগ্রত। এখনও বিশেষভাবে তাহার জীবনযাত্রার ভিত্তি হিসাবে স্থানাধিকার করিয়া আছে সামাজিক, ধর্মীয় ও প্রথাগত নিয়মশৃংখলা এবং বাধানিষেধ। তাই ভারতের অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় এই দেশের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়।

ভারতের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সূত্র আছে। ইহাদের সকলই অর্থনৈতিক জীবনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করে। বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার, উত্তরাধিকার আইন, ধর্মবোধ, সামাজিক মর্যাদা ও প্রথা, বিবাহের সর্বজনীনতা, স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা, উৎসব ইত্যাদিতে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রভৃতি সকলেরই প্রভাব ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমরা প্রথম চারিটিকে লইয়াই

ভারতের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক

প্রধানত আলোচনা করিব, কারণ বর্তমানে এইগুলিই ভারতের সমাজ-সংগঠনের প্রধান চারিটি দিক।

বর্ণভেদ প্রথা (The Caste System) ঃ বর্ণভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহা ভারতীয় হিন্দু সমাজের জীবনযাত্রাকে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। এইভাবে নির্ধারিত গণ্ডি এতদিন একরূপ অনতিক্রম্যই ছিল।

কবে, কিভাবে বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। হিতবাদী জেমস্ মিলের মতে, ইহা হইল শ্রমবিভাগের উপযোগিতায় অনুপ্রাণিত কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্য—অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ শ্রমবিভাগের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া কার্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন জীবিকার ভিত্তিতে বর্ণের সৃষ্টি করিয়া। মার্শাল (Dr. Alfred Marshall) বলেন, "....প্রাচীন সভ্যতার রথ যে-যে জাতি চালনা করিয়াছিল তাহাদের সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর কঠোর বর্ণভেদ প্রথা দৃষ্ট হয়।" প্রকৃতপক্ষে, আর্য জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, তাহারা যে-যে দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যথা, প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষ—সেই-সেই দেশেই বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল।

আর্য জাতি ভারতে আসিল বিজয় পতাকা উড়াইয়া। তারপর এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসবাস করিতে লাগিল। প্রথমে কোনরূপ ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন সামাজিক কর্মের বিশেষিকরণ (specialization) প্রয়োজন হইয়া পড়ায় বর্ণভেদ দেখা দিল। পূজার মন্ত্রতন্ত্র জটিল হইতে জটিলতর রূপ ধারণ করায় একশ্রেণীর লোক আচার-অনুষ্ঠান ও শিক্ষা-দীক্ষার কার্য একচেটিয়া করিয়া লইল। তাহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইল। অনার্যদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের কার্যে আর এক শ্রেণীর লোককে সর্বদা নিয়োজিত থাকিতে হইত বলিয়া যুদ্ধকে তাহারা পেশা করিয়া লইয়া ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইল।

আর্য জাতির মধ্যে কর্মগত বর্ণভেদ প্রথা

তৃতীয় শ্রেণীর আর্যেরা সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য কৃষিকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎপাদন-কার্যে লিপ্ত রহিল। তাহারা বৈশ্য নামে পরিচিত হইল। এবং যে-সকল আদিম অধিবাসী আর্য জাতির বশ্যতা স্বীকার করিল তাহারা অপর তিন বর্ণের সেবার কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া শূদ্র বা দাস নামে পরিচিত হইল। এইভাবে ভারতীয় আর্য সমাজে কর্মগত (functional) বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব হইল।

বর্ণভেদ প্রথা প্রথমে ছিল অতি সরল। ইহা নির্ধারিত হইত কর্মের ভিত্তিতে; এবং প্রথম তিন বর্ণের পক্ষে কর্মানুসারে বর্ণ পরিবর্তন সম্পূর্ণ সম্ভব ও সহজ ছিল। কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ প্রথা হইয়া উঠিল জটিল ও কঠোর এবং ইহা নির্ধারিত হইতে লাগিল জন্মের ভিত্তিতে, কর্মের ভিত্তিতে নয়। পেশাগত অসংখ্য বর্ণের সৃষ্টি হইল এবং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আচার-

বর্ণভেদ প্রথার জটিল রূপ গ্রহণ এবং অস্পৃশ্যতার উদ্ভব

অনুষ্ঠান ও বিবাহাদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া গেল। নিম্ন বর্ণসমূহ সামাজিকভাবে হেয় হইয়া পড়িল ; এবং একদিন অস্পৃশ্যতা নামে মহাপাপ সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিল।

আরও পরে হিন্দু সমাজে কর্মগত বর্ণের উপরে দেখা দিল চণ্ডাল, রাজবংশী প্রভৃতির ন্যায় জাতিগত বর্ণ (Racial Castes), এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্মগত বর্ণ। সমাজ আরও শ্রেণীবিভক্ত হইল।

জাতিগত বর্ণ

গুণ : বর্তমানে আমরা পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ গুণকীর্তন করিয়া থাকি। এরূপ সমাজে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা নাই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘর্ষ নাই, ব্যক্তিগত লোভ ও লাভের স্থান নাই। সামাজিক কল্যাণই হইল ধ্রুবতারকা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সকলে পথ চলে।

১। বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ একরূপ পরিকল্পিত সমাজ

বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গ্রাম্য সামাজিক ব্যবস্থা ছিল এইরূপ এক পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্মানুসারে নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইত, অপরের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সামাজিক অপচয়ের সৃষ্টি করিত না। এইজন্য বর্ণভেদ প্রথার সমর্থকগণ ইহাকে "বিশেষভাবে পরীক্ষিত বিভিন্ন কর্মগত শ্রেণীর মধ্যে ভারসাম্য সংরক্ষণকারী বিজ্ঞান-সম্মত প্রাচীন সমাজতন্ত্রবাদ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বস্তুত, বর্ণভেদ প্রথার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের একপ্রকার ইংগিত পাওয়া যায়। ইহারই অধীনে প্রাচীন ভারতে গ্রাম্য সভ্যতার অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ অর্থ নৈতিক সূত্রের দিক দিয়া দেখিলে, বর্ণভেদ প্রথা শ্রমবিভাগের সৃষ্টি করিয়া অর্থ নৈতিক জীবনের অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছিল। অনেকের মতে, প্রাচীন ভারতের শিল্পোন্নতির মূলে আছে এই শ্রমবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রথা।

২। ইহা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছিল

তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথা সকলের জন্য সহজ ও সরল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। শিশুর পক্ষে পৈতৃক পেশা আয়ত্ত করা যত সহজে সম্ভব, অন্য পেশা আয়ত্ত করা তত সহজে সম্ভব নহে। প্রাচীন ভারতে যখন রাষ্ট্র কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষার (public instruction) কোন বন্দোবস্ত ছিল না তখন বর্ণভেদ প্রথার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সকলের শিক্ষার এই সুবন্দোবস্তের উপযোগিতা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

৩। ইহা সকলের জন্য সহজ ও সরল শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিল

চতুর্থত, এই প্রকারে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্পদক্ষতা বংশ-পরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। পুত্র পিতার শিল্প দক্ষতার অধিকারী হইয়া জাতীয় শিল্পদক্ষতাকে অব্যাহত রাখিয়াছিল।

৪। ইহার ফলে শিল্প-দক্ষতা বংশ-পরম্পরায় সংরক্ষিত হইয়াছিল

পঞ্চমত, প্রাচীনকালে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন পেশাগত বর্ণের শ্রমিকসংঘের অভাব পূরণ করিরাছিল। একই বর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন অনুভব

করিত। এবং ফলে পরস্পরের মংগলসাধনে সচেষ্ট থাকিত; এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বিভিন্ন বর্ণের এই ভূমিকার জন্য তাহাদিগকে মধ্যযুগের শিল্প-সংঘসমূহের (Trade Guilds) সহিত তুলনা করা হয়।

৫। ইহা শ্রমিক সংঘের অভাব পূরণ করিয়াছিল

পরিশেষে, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি রুদ্ধ করিয়া বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সাংস্কৃতিক ও জাতিগঠনের দিক দিয়া রক্তের এইরূপ বিশুদ্ধতাকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়।

৬। ইহা হিন্দু সমাজের রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছিল

ত্রুটি ঃ বর্ণভেদ প্রথার গুণকীর্তন অতীতকালের গুণকীর্তন মাত্র। বর্তমানে বর্ণভেদ প্রথা উপরি-উক্ত গুণের অধিকাংশই হারাইয়াছে। বর্তমানের সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগে বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তিতে স্থূল কর্মগত শ্রমবিভাগকে আর বিশেষ মূল্য প্রদান করা হয় না; এই প্রথার ভিত্তিতে পরিকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থাও আজ সম্পূর্ণ অচল; রক্তের বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তাও আজ অধিকাংশে স্বীকার করেন না—ইহা অক্ষুণ্ণ রাখাও অসম্ভব; উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষাপ্রাপ্তির মূল্যও বিশেষ কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক দিকেই বর্ণভেদ প্রথা বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। বলা যায় যে অতীতে এই প্রথার প্রভূত উপযোগিতা ছিল; কিন্তু আজ ইহা সকল উপযোগিতাশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রয়োজন ইহার বিলোপসাধনের।

বর্তমান দিনে বর্ণভেদ প্রথা উপযোগিতাশূন্য

অতীতেও বর্ণভেদ প্রথা ত্রুটিহীন ছিল না; ইহার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি অতীতেও কার্য করিয়াছে। এই ত্রুটিগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে: জন্ম দ্বারা ব্যক্তির বৃত্তি নির্ধারিত হয় বলিয়া বর্ণভেদ প্রথার অধীনে কর্ম-কুশলতার মর্যাদা নাই। অন্য বৃত্তির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও পুত্র পিতার বৃত্তি অনুসরণ করিতে বাধ্য। ইহার ফলে প্রভূত জাতীয় অপচয় ঘটিয়া থাকে। বর্ণভেদ প্রথার জন্য কত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে সামান্য কর্মে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। প্রথার বন্ধন কঠিন হওয়ার জন্য প্রতিভা বিকাশের সুযোগ-সুবিধার অনুসন্ধানও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১। ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্মকুশলতার মর্যাদা নাই

দ্বিতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার অধীনে পূর্ব-নির্ধারিত বৃত্তির জন্য শ্রমের বিভিন্নমুখী গতি বা সচলতা (mobility of labour) সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে বৃহদায়তনে উৎপাদনও ব্যাহত হয়। সুতরাং বর্ণভেদ প্রথা ক্ষুদ্রায়তনে ও কুটির শিল্পের প্রসারের সহায়ক হইলেও, বৃহদায়তনে উৎপাদনের বিশেষ পরিপন্থী।

২। ইহা শ্রমের সচলতা ব্যাহত করে

তৃতীয়ত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রমের মর্যাদা দিতে শিখে নাই। এক সময় তাহারা কায়িক পরিশ্রমকে হেয় মনে করিত; আজও অনেকে করে। সুতরাং ইহাতেও বৃহদায়তনে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে।

৩। অনেক সময় শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হয় না।

চতুর্থত, বর্ণভেদ প্রথার জন্য সামাজিক সচলতাও (social mobility) ব্যাহত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের জন্য আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহাদি প্রভৃতি ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকায় সমাজ কঠোরতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে ইহা আরও অবনতির স্তরে নামিয়া অস্পৃশ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কঠোর সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও অস্পৃশ্যতা সর্বদাই সামাজিক ও জাতীয় সংহতিসাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়াছে।

৪। ইহার সামাজিক সচলতাও ব্যাহত হইয়াছে

পরিশেষে, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন কোনমতেই করা যায় না। মানুষে মানুষে সাম্য হইল অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। ইহার জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। বর্ণভেদ প্রথা কিন্তু এই আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন মর্যাদা—অর্থাৎ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ অস্বীকারই হইল ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং এ-প্রথা নানা গুণ-সমন্বিত হইলেও আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে ইহা একেবারে অচল।

৫। ইহা সাম্য নীতির বিরোধী

বর্তমান গতি ঃ প্রকৃতপক্ষে বহুদিন পূর্ব হইতেই বর্ণভেদ প্রথা প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অচল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ফলে সাম্প্রতিক যুগে ইহার কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া নগরাঞ্চলসমূহ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল অঞ্চলের লোকেরা বর্তমানে আর বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সহভোজন ও সামাজিক মেলামেশাকে অবৈধ বলিয়া মনে করে না ; অন্তঃবর্ণ বিবাহকে (inter-caste marriage) আর পূর্বের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দেখে না। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধেও নগরাঞ্চলের মনোভাব পূর্ব হইতে কিছু পরিমাণে পৃথক্ বলা যায়। এই সকল পরিবর্তনের মূলে আছে অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকগণের প্রচেষ্টা। আর্য সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হিন্দু ধর্মের সংস্কারসাধনের দ্বারাও এই দিকে সহায়তা করিয়াছে।

নানাভাবে বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছে ও পাইতেছে

অপরদিকে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য লোকে আর পূর্বপুরুষের পেশা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে না। ফলে শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; শ্রমের সচলতার অভাব বর্তমানে আর বৃহদায়তনে উৎপাদনের পক্ষে প্রতিবন্ধকরূপে পরিগণিত হয় না। শ্রমিক সংঘসমূহ (Labour Unions) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিল্প-সংঘসমূহের (Trade Guilds) প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইয়াছে।

এইভাবে বর্ণভেদ প্রথা বিভিন্ন দিক দিয়া আক্রান্ত হইলেও ইহা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই—কারণ ভারত এখনও প্রধানত গ্রাম্য ভারত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী এখনও অশিক্ষিত ; সুতরাং সংস্কারান্ধ। তাই নূতন করিয়া চেষ্টা করিতে হইতেছে বর্ণভেদ প্রথাকে লুপ্ত করিবার জন্য। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত

কিন্তু এই প্রথা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই

হইয়াছে; অনুন্নত বর্ণসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে; শিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে; পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে; ইত্যাদি। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সাম্য (social equality) প্রতিষ্ঠিত করিতে বহুদিন লাগিবে বলিয়া মনে হয়।

যৌথ পরিবার প্রথা (The Joint Family System): যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের সামাজিক পরিবেশের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য দেশের ধারণা অনুসারে এখানে পরিবার মাত্র স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হয় না। ভারতে 'পরিবার' বলিতে বুঝায়, একই পূর্বপুরুষের বিভিন্ন বংশধরের পরিবারসমূহের সমষ্টি। এইরূপ দেখা যায় যে, একই যৌথ পরিবারের অধীনে লোকে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে। যৌথ সম্পত্তি, যৌথ ঘরকন্না এবং যৌথ ধর্মাচরণ হইল ভারতের যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের সূচক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মত প্রত্যেক একান্নবর্তী পরিবারে একজন করিয়া প্রধান থাকেন। তাঁহাকে গৃহস্বামী বা 'কর্তা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সকলে তাহাদের উপার্জন যৌথ পরিবারের জন্য গৃহস্বামীর নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য এবং বিনিময়ে পরিবার তাহাদের ভরণপোষণ ও বিবাহাদি সামাজিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, একান্নবর্তী পরিবার পরিচালনার সকল ব্যাপারে গৃহস্বামীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। যৌথ পরিবার প্রথাকে আর্য সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়। শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় যৌথ পরিবারের স্বরূপ

গুণ: তত্ত্বগতভাবে দেখিলে যৌথ পরিবার প্রথা উচ্চ সামাজিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি উচ্চাদর্শ যৌথ পরিবার প্রথার ভিত্তি। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যৌথ পরিবারে লোকে সামর্থ্যমত কার্য করে এবং প্রয়োজনমত উপকরণ প্রাপ্ত হয়। ইহাই সমভোগবাদী সমাজের (communistic society) মূল কথা। সুতরাং যৌথ পরিবার প্রথা একরূপ সমভোগবাদী সমাজের দ্যোতক; কিন্তু ইহা বলপ্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

১। ইহা উচ্চ সামাজিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত

দ্বিতীয়ত, আধুনিক যুগে রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার (social security) নানাবিধ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেছে। আধুনিক সমাজে অসুস্থতা, বেকার অবস্থা, বার্ধক্য ও মৃত্যুর কারণে ব্যক্তির ও পরিবারের উপার্জনের পথ সহসা রুদ্ধ হইবার যে-আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রতিবিধান বর্তমান রাষ্ট্রকেই করিতে হইতেছে। পূর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামাজিক নিরাপত্তার এইরূপ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যৌথ পরিবারসমন্বিত সমাজে ইহার প্রয়োজনও ছিল না। যৌথ পরিবার ব্যক্তির উপার্জনের অনিশ্চয়তার সকল

২। ইহা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছিল

ঝুঁকিই বহন করিত। উপার্জনে অসমর্থ হইলেও সম্মানের সহিত পরিবারের সভ্যপদে আসীন থাকিয়া ইহার সুখদুঃখের অংশগ্রহণ করিত।

তৃতীয়ত, বৃহদায়তনে উৎপাদনের ন্যায় বৃহদায়তনে সংসার পরিচালনারও কতকগুলি সুবিধা আছে। ইহাতে পরিবার পরিচালনার ব্যয় হ্রাস হয়। বৃহৎ পরিবারে মাথাপিছু ব্যয় ক্ষুদ্র পরিবার অপেক্ষা অল্প। সুতরাং অর্থনৈতিক সূত্রের দিক দিয়া যৌথ পরিবার প্রথাকে সমর্থন করা যায়।

৩। অর্থনৈতিক সূত্রের দিক হইতেও সমর্থন করা চলে

চতুর্থত, যৌথ পরিবার না থাকিলে হিন্দু সমাজের বিধবাদের কি গতি হইত তাহা কল্পনা করা কঠিন। যৌথ পরিবারে বিধবারা নিরাপদ ও সম্মানজনক আশ্রয়লাভ করে। পরিশেষে, যৌথ পরিবার প্রথা ভারতের উত্তরাধিকার আইনের ত্রুটি বহুল পরিমাণে দূর করিয়াছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইন অনুসারে সম্পত্তি বহুজনের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়। ভূ-সম্পত্তির এইরূপ বণ্টনের ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা (subdivision and fragmentation of holdings) ঘটিয়াছে—যাহাকে কৃষিকার্য পরিচালনার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসাবে গণ্য করা যায়। যৌথ পরিবার প্রথা প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কুফল যতদূর প্রসারিত হইতে পারিত, ততদূর পারে নাই। সুতরাং ভারতে জীবিকার্জনের সর্বপ্রধান সূত্রের অবনতি প্রতিরোধেও যৌথ পরিবার প্রথার ভূমিকা রহিয়াছে।

৪। ইহা হিন্দু বিধবাদের আশ্রয়দান করিয়াছে

৫। ইহা উত্তরাধিকার আইনের ত্রুটি অনেকাংশে দূর করিয়াছে

ত্রুটি ঃ যৌথ পরিবার প্রথার সর্বাপেক্ষা বড় গলদ হইল যে, ইহা নিরুদ্যম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়। এইরূপ পরিবারে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব গৃহস্বামীর উপর ন্যস্ত থাকায় অপর সকলের পক্ষে নিরুদ্বেগে ও আলস্যে কাল কাটাইবার সুবিধা ঘটে। ইহার ফলে পরিবারে হিংসা, ঝগড়া প্রভৃতি অশান্তির সৃষ্টি হয়।

১। ইহা নিরুদ্যম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগ ও আত্মনির্ভরশীলতাই অর্থনৈতিক প্রগতির মূল সূত্র। একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তির মধ্যে এই দুইটি গুণের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তি তখনই উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয় যখন সে উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফল একান্তভাবে স্বয়ং ভোগ করিতে পারে। একান্নবর্তী পরিবারে তাহা সম্ভব হয় না। ফলে ভারতের ন্যায় যৌথ পরিবারসমন্বিত সমাজে অর্থনৈতিক উন্নতিও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

২। ইহা অর্থনৈতিক প্রগতিকে ব্যাহত করে

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয় আর একটি বিশেষ কারণের জন্য। একান্নবর্তী পরিবার মূলধন-সংগঠনের (capital formation) পরিপন্থী। এইরূপ পরিবারে প্রত্যেকের উপার্জন ব্যয়িত হয় সকলের জন্য। উপার্জনশীলের আয় দ্বারা অসমর্থের ভরণপোষণ করা হয়। সুতরাং সঞ্চয় বিশেষ কিছু হইতে পারে না। গৃহস্বামীর হস্তে কিছু

৩। ইহা মূলধন-সংগঠনকে ব্যাহত করে

সঞ্চিত অর্থ থাকিলে পরিবারের সামগ্রিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করিয়া তিনি ইহা বিনিয়োগ করিতে পারেন না। ফলে সঞ্চয়ের অভাবে মূলধনের সংগঠন সম্ভাব্য পরিমাণে হইতে পারে না ; এবং অপর্যাপ্ত মূলধনের জন্য শিল্পোন্নয়নও পর্যাপ্ত পরিমাণে হইতে পারে না।

৪। ইহা বর্তমান জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যার অন্যতম কারণ

চতুর্থত, ভারতের জনসংখ্যার আয়তন সম্বন্ধে বর্তমানে যে-সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও কতকাংশে যৌথ পরিবার প্রথার ফল। পরিবার যখন সকলেরই ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবে তখন আর্থিক কারণে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা পরিমিত করার কোন প্রয়োজন নাই। এইজন্য এ-চেষ্টাও একান্নবর্তী পরিবারের বিশেষ কেহ করে না।

৫। ইহাতে সামাজিক অপচয় ঘটে

পঞ্চমত, যৌথ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণত রক্ষণশীল দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হয়, কারণ তাহারা রক্ষণশীল গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে বাস করে। এই রক্ষণশীলতার জন্য ব্যক্তিত্ব (Individuality) নষ্ট হয় ; এবং ব্যক্তিত্বের এইরূপ বিনাশকে অন্যতম সামাজিক অপচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৬। এই ব্যবস্থা দায়িত্বশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে

পরিশেষে বলা যাইতে পারে যে, যৌথ পরিবার যৌথ দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সকলেই এই দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করে। এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, যে-দায়িত্ব সকলের সে-দায়িত্ব কাহারও নহে। স্থতরাং পরিবার প্রথা হইল এক দায়িত্বহীন অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এই তত্ত্বগত কারণেও যৌথ পরিবার প্রথা সমর্থিত হইতে পারে না।

ইহা বর্তমানে বর্ণভেদ প্রথা অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে

বর্তমান গতি ঃ জাতিভেদ প্রথা অপেক্ষাও একান্নবর্তী পরিবার প্রথা দ্রুতগতিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসার যৌথ পরিবার প্রথার মূলে প্রথম আঘাত হানে। গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের ধ্বংস ও নগরিকরণের ফলে লোক পরিবার হইতে চ্যুত হইয়া জীবিকা সংস্থানের জন্য নগরাঞ্চলে বাস করিতে থাকে। ইহাতে পরিবারের সহিত যোগাযোগের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। যানবাহনের অভাবনীয় উন্নতি ব্যক্তির পক্ষে দূর-দূরান্তরে গমন আরও সম্ভব করিয়া তুলে। ফলে মূল পরিবারের সহিত তাহার যোগসূত্র একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উত্তরোত্তর বর্ধমান জনসংখ্যাও একান্নবর্তী পরিবারের সংহতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে সর্বদিকে আক্রান্ত হইয়া যৌথ পরিবার প্রথা একরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলা হয়। আজও ইহার যে-ধ্বংসাবশেষ আছে তাহাও হিন্দু সংহিতা (Hindu Code) আইনে সম্পত্তি বণ্টনের নূতন ব্যবস্থার ফলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

উত্তরাধিকার আইন (The Laws of Inheritance) ঃ ভারতের সকল প্রকার উত্তরাধিকার আইনই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বহুজনের উত্তরাধিকার স্বীকার করে। ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রবর্তিত প্রথার একপ্রকার বিপরীত। সেখানে বহুজন নয়, সকল পুত্র-সন্তানও নয়—কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সাধারণত মৃত পিতার অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়।

ভারতের উত্তরাধিকার আইনের বৈশিষ্ট্য

হিন্দু সংহিতা কার্যকর হইবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের দুইটি প্রধান শাখা ছিল—দায়ভাগ ও মিতাক্ষর। দায়ভাগ আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির সকল পুত্র-সন্তানই পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমান অংশীদার হিসাবে গণ্য হইত। মিতাক্ষর আইন অনুসারে পরিবারের সকল পুরুষ-সভ্য যৌথভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল। জন্মমাত্র শিশুপুত্রও পরিবারের অন্যান্যদের সমান অংশীদার হইয়া দাঁড়াইত। দায়ভাগ আইন পশ্চিমবংগে এবং মিতাক্ষর আইন ভারতের অন্যান্য অংশে প্রবর্তিত ছিল। সম্প্রতি দায়ভাগ ও মিতাক্ষর উভয়কে একীভূত করিয়া যে হিন্দু-সংহিতা আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহাতে সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সহিত সকল কন্যারও সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

মুসলমান উত্তরাধিকার আইন আরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে মৃতের সম্পত্তির অংশীদাররূপে গণ্য করে। মাত্র সকল পুত্র-কন্যা নহে, পিতামাতা জীবিত থাকিলে তাঁহারাও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ভাগীদার হন।

গুণ ঃ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পত্তিতে বহুজনের সমানাধিকার স্বীকার করিয়া ইহা কতকটা সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লইয়া জীবনযাত্রা সুরু করিবে—ইহাই ত' সাম্যের মূল কথা। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন এই মূল নীতির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্কে আইন স্ত্রী-পুরুষে ভেদ করে নাই।

১। ইহা সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত

ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের জন্য সকলেই উত্তরাধিকার সূত্রে সামান্য সম্পত্তি পায় বলিয়া সকলেরই কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগ অটুট থাকে। ইহাতে ধনোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে; সুতরাং অর্থ নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়।

২। ইহা কর্মস্পৃহা ও উদ্যোগ অটুট রাখে

ত্রুটি ঃ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদনের পরিপন্থী। উত্তরাধিকার আইনের জন্য কৃষি-জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; এবং ইহার ফলে জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দেখা দেয়। যৌথ পরিবার প্রথার আলোচনা প্রসংগে এ-সম্বন্ধে ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে এবং পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখান হইবে যে, জোতের এই অসম্বদ্ধতা ও খণ্ডিকরণ কৃষিকার্য সুপরিচালনার পথে প্রধান অন্তরায়।

১। ইহা বৃহদায়তনে কৃষিকর্মের পরিপন্থী

উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার আইন প্রতিবন্ধকের কার্য করে।

২। ইহা বৃহদায়তনে বিনিয়োগের পথে প্রতিবন্ধক

একজনের সঞ্চয় তাহার মৃত্যুর সংগে সংগে বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যায় বলিয়া বৃহদায়তনে বিনিয়োগ সম্ভবপর হয় না। সকলেই তাহার সামান্য সম্পত্তিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া গতানুগতিকভাবে ভোগ করিতে সচেষ্ট হয়।

৩। ইহা কর্মোদ্যমের পথেও বাধা সৃষ্টি করে

ইহাও বলা যায় যে, সকলেই কিছু কিছু পায় বলিয়া গোড়া হইতেই সকলে কর্মোদ্যমী ও উদ্যোগী হইয়া উঠে না। সুতরাং উত্তরাধিকার আইন যেরূপ এক দিকে কর্মোদ্যম ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করে ; অপর দিকে আবার ইহার প্রতিবন্ধকের কার্যও করে।

ধর্মের প্রভাব (Influence of Religion) : ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। আপামর সাধারণের অনন্যসাধারণ ধর্মবোধ হইল ভারতীয় সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্ম বস্তুবাদী সভ্যতাকে অস্বীকার করিতে শিখায়। এই ধর্মের মতে, মানুষ ইহলোকে আসে দুঃখ ভোগ করিতে। ইহলোককে পান্থশালার সহিত তুলনা করা যায় ; এখানে স্থিতি হইল ক্ষণিকের জন্য। পরলোকই ব্যক্তির স্থায়ী আবাস ; পরলোকে সুখের আশাই একমাত্র ভরসা। সুতরাং ব্যক্তিকে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা ছাড়িয়া আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করিতে হইবে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতীয়গণের মধ্যে এইরূপ পারলৌকিক মনোভাবই তাহাদের উদ্যমহীনতা এবং ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ।

মুসলমানদের মধ্যেও ধর্মের প্রভাব অর্থনৈতিক জীবনকে কিছুমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে। টাকা খাটাইয়া সুদ লওয়া ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ। ফলে অনেক মুসলমান টাকা বিনিয়োগও করিতে চাহে না। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতদের অনেকে বলেন যে, ইহার জন্যও ভারতের শিল্পোন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উপরি-উক্ত যুক্তির কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে পারা যায় না। হিন্দুধর্মের শিক্ষা কোন অসাধারণ শিক্ষা নয়। সকল ধর্মই—এমনকি খ্রীষ্টধর্মও, অল্পবিস্তর ঐহিক বস্তুগত সুখকে তুচ্ছ করিতে শিখায়। তাহা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণ অর্থনৈতিক প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মের প্রভাব যখন অধিকতর ছিল তখনই ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্যে অনন্যসাধারণ উন্নতি-লাভ করিয়াছিল। ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয়গণ শিল্প-বাণিজ্য ও বস্তুগত লাভালাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে ছাড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের

ভারতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হইল প্রায় দুইশত বৎসরের পরাধীনতা। বিদেশী শাসন ভারতের নিজস্ব শিল্পকে ধ্বংস করিয়াছে, নানাভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে, শিক্ষা বিস্তারে পরাঙ্মুখ থাকিয়া দেশবাসীকে অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারাই ভারতীয়গণের ধর্মান্ধতাকে কাজে লাগাইয়া

নিজেদের স্বার্থসাধন করিয়াছে। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ধর্মের প্রভাবকে যে-দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা হয় তাহার পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। ভারতীয়গণের ধর্মবোধ প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত করে নাই; পরোক্ষভাবে ইহারই সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

সামাজিক প্রথা (Social Customs) : ভারতে পিতৃদায়, মাতৃদায়, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, পূজাপার্বণ প্রভৃতি নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। ইহাতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভোজন করাইবার প্রথাও প্রবর্তিত আছে। ফলে এই সকল প্রথার জন্য বিরাট ব্যয় হয়। ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এইরূপ ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান পালন না করাই উচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকে ঋণ করিয়াও এগুলি পালন করিয়া থাকে। ইহা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। এইরূপ আচার-অনুষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বিপুল ঋণের প্রধান না হইলেও অন্যতম কারণ। আবার ইহার জন্যই সামগ্রিকভাবে দেশে মূলধন-সংগঠন ব্যাহত হয়। লোক যদি তাহার সঞ্চয় বিনিয়োগ না করিয়া আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে তবে মূলধনের সৃষ্টি ব্যাহত না হইয়া পারে না। এই সকল কারণে উদার-নৈতিক ও উপযোগিতামূলক শিক্ষা বিস্তারের সাহায্যে আড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান হইতে বিদায় লইবার দিন আসিয়াছে।

ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান

প্রশ্নোত্তর

1. In what manner do the important social and religious institutions help or hinder the economic progress of the people of India ? Give examples.
[B. Com. 1942, '44 ; B. A. 1941] (৫৩-৬৩ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the economic consequences of the caste system. Do you think that there is any justification for its continuance in the present condition of society ? (৫৪-৫৭ পৃষ্ঠা)

3. Consider the economic effects of the Indian joint family system. What forces have, in recent times, tended to break up the system ? [B. A. 1945] (৫৮-৬০ পৃষ্ঠা)

4. To what extent the under-developed condition of India is attributable of her social environment ? (৫৩, ৫৬-৫৭, ৫৯-৬০ এবং ৬২ পৃষ্ঠা)

ভারতের জনগণ

(People of India)

ভারতীয় অর্থনীতিচর্চা উদ্দেশ্যমূলক (fruit-bearing)। অনগ্রসর অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নই ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। ভারতের জনগণকে আলোচনাক্ষেত্রে না আনিয়া এই সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায় না বা সমস্যা সমাধানের জন্য পথনির্দেশও করিতে পারা যায় না।

জনগণ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা।

প্রকৃতির দানে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ। প্রকৃতি ভারতকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অধিকাংশ উপাদানই মুক্তহস্তে দান করিয়াছে। অথচ ভারতবাসী দরিদ্র এবং ভারত অনগ্রসর দেশ। বস্তুত, 'সমৃদ্ধ দেশের দরিদ্র অধিবাসী'ই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের সার্থক পরিচয়। কিন্তু কেন এই দারিদ্র্য, কেন এই অনগ্রসর অবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বিদেশী শাসকবর্গ বলিতেন, জনাধিক্যই ইহার কারণ। কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা বলিতাম বিদেশী শাসনই আমাদের দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা আমাদের সমৃদ্ধ হইতে দেয় নাই। এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার জন্য আমাদিগকে ভারতীয় জনগণের পর্যালোচনা করিতে হইবে।

১। ভারতের দারিদ্র্যের কারণ জনাধিক্য কিনা তাহা স্থির করা

উপরন্তু, তত্ত্বগতভাবে দেখিলে প্রকৃতি ও মানুষ এই দুইটিই উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। প্রকৃতির দানকে ব্যবহার করিয়া মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে। সুতরাং যে-কোন দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এই সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে শ্রমের যোগান—যাহা প্রধানত জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু জনগণ উৎপাদনের উপাদান মাত্রই নহে, উৎপাদনের লক্ষ্যও বটে। জনগণের ভোগের জন্যই উৎপাদন করা হয়। সুতরাং দেখা প্রয়োজন, উৎপাদন দেশের বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে কিনা। অতএব বাস্তব ও তত্ত্ব—উভয় দিক দিয়াই জনসংখ্যার পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বলা যায়, এই পর্যালোচনা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যালোচনা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অথবা মাত্র অব্যাহত রাখার জন্যই প্রাকৃতিক সম্পদের কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে? প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহারই যথেষ্ট কিনা?—অর্থাৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনা ব্যতিরেকে দেওয়া যায় না।

২। তত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলিতে জনসংখ্যার আয়তন, জনবসতির ঘনত্ব, জনসংখ্যার বণ্টন-পদ্ধতি বা নগর ও গ্রামের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন, জনগণের জীবনধারণ প্রণালী বা উপজীবিকা অনুসারে জনবসতির বণ্টন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতি বুঝায়। এখন এগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যার আয়তন (Size of the Population): ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহ বাদ দিয়া ভারতের মোট জনসংখ্যা হইল ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষের কিছু উপর। ১৯৫১ সালে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষেত্রসমূহে আদমসুমারি গণনা হয় নাই; ফলে অন্যান্য তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষের কিছু উপর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬০ হাজার বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে বলা হয় যে ১৯৫৮ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা (জম্মু ও কাশ্মীর এবং সিকিমের জনসংখ্যা লইয়া) ৩৯ কোটি ৭৫ লক্ষের মত হইবে।

ভারতের মোট জনসংখ্যা

ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে উত্তরপ্রদেশই সর্বাপেক্ষা জনবহুল। ইহার জনসংখ্যা ৬ কোটি ৩২ লক্ষের উপর। তাহার পরেই আছে বোম্বাই। বোম্বাই-এর বর্তমান লোকসংখ্যা হইল ৪ কোটি ৮২ লক্ষের উপর। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আছে যথাক্রমে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশ। ১৯৫১ সালে আদমসুমারি গণনার সময় পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৮ লক্ষের কিছু উপর। পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে ইহা ২ কোটি ৬৩ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।* রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের কথা ছাড়িয়া দিলে আসামই সর্বাপেক্ষা জনবিরল। এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৯০ লক্ষের কিছু উপর।

উত্তরপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাজ্য

আসাম সর্বাপেক্ষা জনবিরল রাজ্য

আয়তনের দিক দিয়া ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। প্রথম স্থানাধিকারী হইল চীনদেশ। পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২২'২ ভাগ চীনদেশে এবং শতকরা ১৫ ভাগের উপর ভারতে বাস করে।

ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় জনবহুল দেশ

জনবসতির ঘনত্ব (Density of Population): জনবসতির ঘনত্ব বলিতে বুঝায় প্রতি বর্গমাইলে গড় লোকবসতি। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে সমগ্র ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব হইল ৩১২—অর্থাৎ ভারতে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে

* ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

৩১২ জন করিয়া লোক বসবাস করে।* স্মরণ রাখিতে হইবে, জনসংখ্যার ঘনত্বের সূচক উপরি-উক্ত সংখ্যা সমগ্র ভারতের গড়। সুতরাং বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের লোকবসতির ঘনত্বের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাও থাকিতে পারে। বস্তুত, উপরি-উক্ত গড় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বা অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্বের পরিচায়ক নহে। ভারতের কোন কোন রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব উপরি-উক্ত সংখ্যার তিনগুণ, কোথাও বা এক-তৃতীয়াংশ। ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক হইল কেরলে; সেখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৯০৭ জন লোক বসবাস করে। অবশ্য অন্যতম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল দিল্লীকে একক হিসাব ধরিলে উহার ৩,০১৭ ঘনত্বকে সর্বাধিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অপরদিকে রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষভাবে জনবিরল; ইহার জনসংখ্যার ঘনত্ব মাত্র ৫৪। উপরের দিক হইতে রাজ্যগুলির মধ্যে কেরলের পরই আছে পশ্চিমবংগ। এখানে ঘনত্ব ৭৭৬ বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। রাজ্যগুলিতে জনবসতির ঘনত্ব বুঝাইবার জন্য নিম্নের ছকটি† দেওয়া হইল ঃ

ভারতের জনবসতির গড় ঘনত্ব

ঘনত্ব সর্বাধিক কেরলে এবং সর্বনিম্ন জম্মু ও কাশ্মীরে

রাজ্য	ঘনত্ব
১। কেরল	৯০৭
২। পশ্চিমবংগ	৭৭৬
৩। মাদ্রাজ	৫৯৭
৪। বিহার	৫৭৮
৫। উত্তরপ্রদেশ	৫৫৭
৬। পাঞ্জাব	৩৪৩
৭। অন্ধ্রপ্রদেশ	২৯৬
৮। মহীশূর	২৫৯
৯। বোম্বাই	২৫৩
১০। উড়িষ্যা	২৪৩
১১। মধ্যপ্রদেশ	১৫২
১২। রাজস্থান	১২১
১৩। আসাম	১০৬
১৪। জম্মু ও কাশ্মীর	৫৪

* জম্মু ও কাশ্মীর, সিকিম এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষেত্র ধরিলে গড় ঘনত্ব কমিয়া ২৮৭-তে দাঁড়ায়—India 1959.

† India—1959

ভারতের জনবসতির ঘনত্বে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডের এক-চতুর্থাংশের কম অংশে বাস করে। দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্বের এরূপ তারতম্য আর বিশেষ কোথাও দৃষ্ট হয় না। উচ্চ ও নিম্ন গাংগেয় সমতলভূমির ঘনত্বের সহিত জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের জনবসতির ঘনত্বের যে-বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে তাহা একরূপ সমান্তরালবিহীন। সর্দার পাণিকর প্রভৃতির মতে, জনবসতির আঞ্চলিক বণ্টনজনিত এইরূপ অসমতাই ভারতের জনগণ সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা। এ-সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

জনবসতির ঘনত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

জনবসতির আঞ্চলিক বণ্টনজনিত অসমতার জন্য সমস্যা

জনগণের বসবাস-পদ্ধতি (Pattern of Living of the Population)ঃ বসবাস-পদ্ধতি কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে বিগত আদমসুমারির রিপোর্টে। বসবাস-পদ্ধতি বলিতে প্রধানত বুঝায় নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার বণ্টন। ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ভারতের ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের কাছাকাছি—অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। বাকী প্রায় ৬ কোটি ১৮ লক্ষের উপর—অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা হইল নগরাঞ্চলের পাঁচগুণ। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রতি ছয়জন ভারতীয়ের পাঁচজন গ্রামাঞ্চলে বাস করে। এই কারণে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির (Committee on Rural Credit Survey) রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারত হইল বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত।*

বসবাস-পদ্ধতি বলিতে কি বুঝায়

ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত

ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত হইলেও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলের জনবসতির বৃদ্ধি নিয়মিত ঘটিতেছে। ১৯২১ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ ভাগ নগরাঞ্চলে বাস করিত। ১৯৩১ সালে উহা ১২ ভাগে, ১৯৪১ সালে ১৪ ভাগে এবং বর্তমানে উপরি-উক্ত ১৭ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। অন্য এক দিক দিয়া দেখিলে, ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৩৯ ভাগ বৃদ্ধি ঘটিলেও, নগরাঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে শতকরা ১২০ ভাগ। নগরসমূহের সংখ্যাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে অন্তত ১ লক্ষ জনসংখ্যাসমন্বিত নগরের সংখ্যা ছিল ৫৮; ১৯৫১ সালে ইহা ৭৫-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলের তুলনায় ভারতের নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটিতেছে

* All-India Rural Credit Survey—Vol. II.

সুতরাং যে-দিক দিয়াই দেখা হউক না কেন ভারতে জনবসতির গতি যে নগরাঞ্চলের দিকে সে-কথা সম্পূর্ণ অনস্বীকার্য।

তবুও উল্লেখযোগ্য নগরিকরণ (urbanization) ঘটিতে ভারতের পক্ষে বহুদিন লাগিবে। তুলনামূলকভাবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে শতকরা ৮০ ভাগের কাছাকাছি লোক নগরাঞ্চলে এবং ২০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। ভারতের নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের অনুপাত এখনও ২০-তে পৌছায় নাই।

জনগণের জীবনযাপন প্রণালী (Pattern of Livelihood of the Population): জনগণের জীবনযাপন প্রণালী বলিতে বুঝায় উপজীবিকা অনুসারে জনসংখ্যার বণ্টন। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে উপজীবিকা অনুসারে ভারতীয় জনগণকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—যথা, কৃষিজীবী (agricultural) এবং অ-কৃষিজীবী (non-agricultural)। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষিজীবী বলিতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং অ-কৃষিজীবী বলিতেই নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণকে বুঝায় না। নগরাঞ্চলের অনেক অধিবাসী উপজীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল; এবং গ্রামাঞ্চলে অনেক ব্যক্তি কৃষি ছাড়া অন্যান্য উপজীবিকা হইতে অন্নসংস্থান করে। যাহা হউক, উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর প্রত্যেকটিকে আবার চারিটি করিয়া শ্রেণীতে পুনর্বিভক্ত করা হইয়াছে। কৃষিজীবিগণের চারিটি শ্রেণী হইল: (ক) জমির মালিক হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষকশ্রেণী, (খ) রায়ত বা প্রজা হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষকশ্রেণী, (গ) কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী, এবং (ঘ) কৃষিকর্মের সম্পর্কবিহীন কিন্তু কৃষি-জমির মালিকানা স্বত্বভোগকারিগণ। এই চারিটি শ্রেণীর প্রত্যেকটির আবার স্বাবলম্বী (self-supporting) এবং পরাবলম্বী (dependents) এই দুই শ্রেণী আছে। কৃষিজীবিগণের উপরি-উক্ত শ্রেণীসমূহের প্রত্যেকটির সংখ্যা ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনুপাত বুঝাইবার জন্য পরের পৃষ্ঠার ছকটি দেওয়া হইল।

জীবনযাপন প্রণালী বলিতে কি বুঝায়

কৃষিজীবী এবং অ-কৃষিজীবী

ভারতের প্রতি দশ জনের মধ্যে সাত জন ব্যক্তি জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ—স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী সকলকে ধরিয়া হইল মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ (৬৯.৮) ভাগ। অন্যভাবে বলিতে পারা যায় যে, ভারতে প্রতি ১০ জন ব্যক্তির মধ্যে ৭ জনের উপর জীবিকার জন্য কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল।

অ-কৃষিজীবিগণের শ্রেণীবিভাগ

অ-কৃষিজীবিগণের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে করা হইয়াছে: (ক) শিল্পে (কৃষিশিল্প ছাড়া) নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (খ) বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, (গ) পরিবহনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, এবং (ঘ) অপরাপর অ-কৃষিজীবী ব্যক্তিগণ।

বিভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা ও তাহাদের পারস্পরিক অনুপাত বুঝাইবার ছক

১। কৃষিজীবী শ্রেণী	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণ		স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী ব্যক্তিগণ	
	সংখ্যা কোটিতে	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণের শতকরা ভাগ	সংখ্যা কোটিতে	মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ
(ক) মালিক হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষকশ্রেণী	৪·৫৭	৪৩·৮	১৬·৭৩	৪৬·৯
(খ) রায়ত বা প্রজা হিসাবে কৃষিকর্ম করে এমন কৃষক-শ্রেণী	০·৮৮	৮·৪	৩·১৬	৮·৮
(গ) কৃষি-শ্রমিকশ্রেণী	১·৪৯	১৪·৩	৪·৪৮	১২·৬
(ঘ) কৃষিকর্মের সহিত সম্পর্কবিহীন জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগকারিগণ	০·১৬	১·৫	০·৫৩	১·৫
মোট	৭·১০	৬৮·০	২৪·৯০	৬৯·৮

অ-কৃষিজীবিগণের জীবনযাপন প্রণালী বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত ছকটি প্রস্তুত করা হইয়াছে :

২। অ-কৃষিজীবী শ্রেণী	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণ		স্বাবলম্বী ও পরাবলম্বী ব্যক্তিগণ	
	সংখ্যা কোটিতে	স্বাবলম্বী ব্যক্তিগণের শতকরা ভাগ	সংখ্যা কোটিতে	মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ
(ক) শিল্প	১ ২২	১১ ৭	৩·৭৭	১০·৫
(খ) বাণিজ্য	০·৫৯	৫ ৭	২·১৩	৬·০
(গ) পরিবহন	০·১৭	১·৬	০·৫৬	১·৬
(ঘ) অন্যান্য	১·৩৬	১৩·০	৪·৩০	১২·১
মোট	৩·৩৪	৩২·-	১০·৭৬	৩০·২
কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী শ্রেণীর মোট	১০·৪৪	১০০·০	৩৫·৬৬	১০০·০

জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট হইতেও ভারতীয় জনগণের জীবনযাপন প্রণালীর স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। উক্ত কমিটির অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে মোট ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ কর্মে নিযুক্ত লোকের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত ছিল ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ বা শতকরা ৭২ ভাগ লোক, শিল্প ইত্যাদিতে নিযুক্ত ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ বা শতকরা ১০.৬ ভাগ লোক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহনে নিযুক্ত ছিল ১ কোটি ১১ লক্ষ বা শতকরা ৭.৭ ভাগ লোক। বাকী অংশ নিযুক্ত ছিল সরকারী চাকরি ও ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিতে।*

জাতীয় আয় কমিটি প্রদত্ত তথ্য

বয়সের দিক হইতে জনসংখ্যার গঠন (Age Composition of the Population)ঃ বয়সের দিক দিয়া যে-কোন দেশের জনগণের গঠন হইল একটি পিরামিডের ন্যায়। এই পিরামিডের ভিত্তি শিশুগণই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। তারপর যত উপরের দিকে উঠা যায়, পিরামিড ততই শীর্ণ হইতে থাকে। এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতের পার্থক্য হইল এইখানে যে ভারতীয় পিরামিডের ভিত্তিস্থল প্রশস্ততর—অর্থাৎ অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের শিশুর অনুপাত বিশেষ অধিক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণত শ্রমিক সরবরাহকারী ১৫-৫৪ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণই সংখ্যায় বিশেষ গরিষ্ঠ হয়; ভারতে কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিগণ মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মাত্র। উপরন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের অনেকে গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহাদের জনসংখ্যা কর্মে নিযুক্ত অংশের মধ্যে ধরা হয় না। ১৯৫১ সালের হিসাব অনুসারে ৩৫ কোটি ৩৮ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি ৩২ লক্ষ ছিল কর্মে নিযুক্ত। ফলে ভারতে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান পাশ্চাত্য দেশসমূহ অপেক্ষা কম দেখা যায়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতের ন্যায় মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এত পরাবলম্বী ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখা যায় না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে শিশুর সংখ্যা অত্যধিক

ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে পরাবলম্বীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাত (The Sex Ratio of Population)ঃ ১৯৪১ সালের মত ১৯৫১ সালের আদমসুমারিতেও দেখা গিয়াছে যে, ভারতে স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী। পুরুষের এই সংখ্যাধিক্য ভারতীয় জনগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় ভারতে কন্যা-সন্তান অপেক্ষা পুত্র-সন্তানই অধিক সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করে; এবং যে-সময়ে স্ত্রীলোকের সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে (reproductive age) সেই সময়ে তাহারা এত সংখ্যায় মারা যায় যে, পুরুষের সংখ্যা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে বাধ্য।

স্ত্রীলোকের অনুপাতে পুরুষের সংখ্যাধিক্য

* **Final Report of the National Income Committee, 1954 এবং India—1959.**

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ভারতে প্রতি ১ হাজার পুরুষ পিছু ৯৪৭ জন করিয়া স্ত্রীলোক ছিল; এবং মাত্র পাঁচটি রাজ্যে—যথা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ত্রিবাংকুর-কোচিন, মণিপুর এবং কচ্ছ—স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অধিক ছিল।

ভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অল্প হইলেও এবং সন্তানবতী হইবার সময়ে স্ত্রীলোকগণ বহুসংখ্যায় মারা গেলেও ১৯২১ সাল হইতে সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে সন্তানবতী হইবার যোগ্য বয়স্ক স্ত্রীলোক বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়মিতভাবে ঘটিয়া চলিতেছে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি (Growth of Population): ১৯৪১ সালে এবং ইহার পূর্ববর্তী সময়সমূহে অখণ্ডিত ভারতবর্ষে আদমসুমারি লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৫১ সালে আদমসুমারি লওয়া হয় জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চলের কতিপয় অংশ বাদ দিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে। সুতরাং ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অনুরূপ বিষয়ের আলোচনা অখণ্ড ভারতবর্ষের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়।

১৯৪১-৫১ সাল, এই দশ বৎসরের গড় লইলে দেখা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় জনগণের শতকরা ১২·৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহাকে গত দশকের গড় বৃদ্ধি (mean decennial growth) বলিয়া অভিহিত করা যায়। দশকের গড় না লইয়া সোজাসুজি শতকরা বৃদ্ধি হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহা হইল ১৩·৩ ভাগের কাছাকাছি। সাধারণত জনসংখ্যার বৃদ্ধি সোজাসুজি শতকরা হিসাবেই ধরা হয়। সুতরাং তাহাই করা হইবে।

১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার নির্দেশ করিবার জন্য নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল:

১৯০১	ভিত্তি বৎসর
১৯১১	+৫·৮
১৯২১	−০·৩৫
১৯৩১	+১১·০০
১৯৪১	+১৪·৩
১৯৫১	+১৩·৩

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯১১ সালে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫·৮ ভাগ বৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তী দশকে কিন্তু বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা শতকরা ০·৩৫ ভাগ হ্রাস পায়। আবার ১৯৩১ সালে আসিয়া জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় হইতে বৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে। ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে শতকরা ১৩·৩ ভাগ বৃদ্ধি হইল বাৎসরিক ১·৩৩ হারে বৃদ্ধি। ইহা অত্যধিক না হইলেও

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি

ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে ইহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখা হয়। এরূপ দেশে জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিও সংখ্যাজনিত গুরুতর সমস্যাকে আরও গুরুতর করিয়া তুলে। সুতরাং ভারতে জনসংখ্যার আঞ্চলিক বণ্টন, বসবাস পদ্ধতি, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি স্থিতিশীল দিক (static aspect) অপেক্ষা জনসংখ্যার গতিশীল দিক (dynamic aspect) অর্থাৎ ইহার বৃদ্ধির পর্যালোচনাই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির বাৎসরিক হার—ইহা কি অধিক?

ভারতের জনাধিক্যের সমস্যা (Problem of India's Over-population) : ভারতে জনাধিক্যের সমস্যাকেই সাধারণত ভারতীয় জনগণ সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু ভারতে প্রকৃত জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা এ-বিষয়েই মতবিরোধ রহিয়াছে। সুতরাং জনাধিক্যের লক্ষণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতে জনাধিক্য সম্বন্ধে মতবিরোধ ও তত্ত্বসমূহ :

মোটামুটিভাবে বলা যায়, জনাধিক্য সম্বন্ধে দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে—যথা, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (Malthusian Theory) অনুসারে জনসংখ্যার আয়তনকে খাদ্য-যোগানের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইয়া ইহার প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়—অর্থাৎ দেখা হয় যে, খাদ্যের যোগান জনসংখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা। যদি পর্যাপ্ত না হয় তবে দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে এইভাবে জনাধিক্য ঘটিলে মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি জনসংখ্যার বাড়তিটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks)। জনসংখ্যা অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি করানো যেন একটি পাপ এবং পাপের জন্যই প্রকৃতি এই সকল উপায়ের সাহায্যে মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়। ম্যালথাসের মতে, ইহাদের মাধ্যমে মৃত্যুর অত্যধিক হারই হইল জনাধিক্যের লক্ষণ।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের দ্বারা যে-ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অস্থায়ী ভারসাম্য (temporary equilibrium) মাত্র—কারণ জনসংখ্যার সর্বদাই ঝোঁক রহিয়াছে খাদ্যের যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে। স্বভাবতই, অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে মানুষকে সর্বদাই মহামারী, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং ম্যালথাসের মতে অন্য উপায়—অর্থাৎ জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive checks) অবলম্বন করা উচিত। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলিতে ম্যালথাস বিবাহ ব্যাপারে সংযম, জন্মনিরোধ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে (Theory of Optimum Population) অর্থনৈতিক

প্রমাণ বিচারও (Economic Test) বলা হয়। অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারে জনসংখ্যাকে মাত্র খাদ্যের যোগানের সহিত তুলনা না করিয়া দেশের সামগ্রিক ধনোৎপাদনবৃদ্ধির আপেক্ষিক হিসাবেই দেখা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন। ইহাকে কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলা হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অল্প হইলে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু আয় (per capita income) সর্বাধিক হইতে পারে না। অপরদিকে, আবার জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে মোট জাতীয় আয় (total national income) বাড়িতে পারে; কিন্তু মাথাপিছু আয় কমিতে থাকে। সুতরাং প্রয়োজন হইল যাহাতে এখন জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। তত্ত্বগতভাবে বলা হয়, এই জনসংখ্যা দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে।* ইহার সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাস ভারসাম্যের অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়। অতএব, দেশের জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলে, দেশে জনাধিক্য ঘটিতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে; ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর কমিয়া যাওয়া। যদি দেশের জনসংখ্যা কাম্য স্তরে না পৌঁছিয়া থাকে তবে তত্ত্বের দিক হইতে দেশটি জনবিরল (underpopulated) এবং ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার অবস্থায় আসিবে। এই অবস্থাকে 'সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা' (point of maximum return) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—কারণ, এই অবস্থায় মাথাপিছু আয় হয় সর্বাধিক। তারপর আর জনসংখ্যার বৃদ্ধি কাম্য নহে; তখন জনসংখ্যার সামান্য বৃদ্ধিকেও জনাধিক্যের সূচক বলিয়া ধরিতে হইবে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচার

কাম্য-জনসংখ্যা কাহাকে বলে

সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা ও জনাধিক্যের লক্ষণ

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই দিক হইতেই এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, পি. কে. ওয়াটাল, অধ্যাপক গিয়ানচাঁদ প্রভৃতি প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থবিদ্যাবিদগণ ভারতকে অতিপ্রজ বা মাত্রাতিরিক্তভাবে জনবহুল দেশ (over-populated country) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়, জনাধিক্যের লক্ষণ দেশের মুখমণ্ডলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ১৯৪৩ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ অনেকাংশে বিকৃত শাসননীতির ফল হইলেও, এই সময় হইতেই এই ধারণা দৃঢ়তর হয় যে

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে

* Optimum population "remains in technological equilibrium with the productive resources of the country."

ভারতে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে শতকরা ৬-৭ ভাগ খাদ্যশস্য যোগানে ঘাটতি ছিল। ১৯৫৭ সালে নিযুক্ত খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির (Foodgrains Enquiry Committee) রিপোর্ট অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অন্তেও খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ১৫ লক্ষ টনের মত ঘাটতি দেখা দিবে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের (Ford Foundation Team) হিসাব অনুসারে কৃষিজ উৎপাদন বর্তমান হারে চলিলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে, খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন বা মোট প্রয়োজনীয়তার শতকরা ২৫ ভাগে দাঁড়াইবে।

প্রমাণ :
১। খাদ্যাভাব

খাদ্য-যোগানের অপ্রতুলতার প্রধান প্রমাণ হইল বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালেও ভারতকে ১৫৯ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। ইহার উপর ভারত নিয়মিত ভাবে কিছু খাদ্য সাহায্য হিসাবেও পাইয়াছে। খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটির হিসাব অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ে খাদ্য-ঘাটতি মিটাইবার জন্য এবং খাদ্য-মূল্য দমিত রাখিবার জন্য বৎসরে ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে। সুতরাং ১৯৪৯ সালে লর্ড বয়েড-ওর (Lord Boyd-Orr) উক্তি করিয়াছিলেন যে চিরন্তন অর্ধাহার এবং নিয়মিতভাবে সাময়িক অনাহার হইল ভারতে অন্যতম নিয়ম—তাহা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই।

মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণও ভারতে উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে ইহা ছিল ১১১ সেণ্ট ; ১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ইহা ৮৪ সেণ্টে আসিয়া দাঁড়ায়। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দুই প্রকার শস্য উৎপাদনের জমির (double crop area) পরিমাণও ১৯২১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে কমিয়া ১৩ সেণ্ট হইতে ১০ সেণ্টে পরিণত হইয়াছে।

মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া

সুতরাং যে-কোন দিক হইতে দেখিলেই দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-যোগানের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা দিন দিন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।*

দ্বিতীয়ত, ১৯২১ সাল হইতে জনসংখ্যার যে-নিয়মিত বৃদ্ধি তাহাকেও ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে জনাধিক্যের অন্যতম সূচক বলিয়া গণ্য করা যায়। ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা মোট ১০ কোটি ৯০ লক্ষ বাড়িয়াছে। শুধু ১৯৪১-৫১ সাল ধরিলে ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা ১·৩৩ হারে বাড়িয়াছে।** ইকাফের (ECAFE) অন্যতম সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, এই বৃদ্ধি পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও, ভারতের

২। জনসংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি

* খাদ্য-সমস্যার মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 'ভারতের খাদ্য-সমস্যা' সংক্রান্ত অধ্যায়টি দেখ।

** ৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

ক্ষেত্রে ইহাকে বিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে—কারণ ভারতের জনসংখ্যা এতই অধিক যে ইহার সামান্য বৃদ্ধিও আশংকাজনক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও বলা হইয়াছে যে, ভারতের বাৎসরিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অধিক না হইলেও বৎসরে ৪৫-৫০ লক্ষ পরিমাণ জনবৃদ্ধিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবেই ধরিতে হইবে।*

৩। ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের কার্যকারিতা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের কার্যকারিতাও ভারতে বিশেষমাত্রায় দৃষ্ট হয়। আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ ভারতে লাগিয়াই আছে; সংক্রামক ব্যাধি ও মহামারীর প্রকোপ কমিলেও তাহারা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই কারণ:

১। ভারতে মোট উৎপাদন জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে

সুতরাং ম্যালথুসীয় তত্ত্বের লক্ষণসমূহের দিক হইতে দেখিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়াই অভিমত প্রদান করিতে হইবে। অপরদিকে যাঁহারা ম্যালথুসীয় তত্ত্বের পরিবর্তে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারের পক্ষপাতী তাঁহাদের মতে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পূর্বে ডাঃ পি. জে. টমাস ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও মোট উৎপাদনবৃদ্ধির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন ও শিল্পজাত উৎপাদন উভয়ই জনসংখ্যার তুলনায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

২। মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বাড়িতেছে

অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারের অপরাপর সমর্থকগণ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে ইহা দেখাইয়াছেন যে এই শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে মাথাপিছু আয় বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫ টাকা; ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা ২৮৪ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।† পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মাথাপিছু আয় শতকরা ১০·৫ ভাগ এবং আর্থিক মজুরি শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য মূল্যবৃদ্ধির কথা ধরিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে প্রকৃত আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

ভারতে সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা এখনও পোঁছায় নাই

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে ভারতে এখনও জনাধিক্য ঘটে নাই; অধ্যাপক ক্যান্নান (Cannan) প্রভৃতি কল্পিত 'সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থা' (point of maximum production) এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। তবে যে ভারতে অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার নিম্ন মান প্রভৃতি দৃষ্ট হয় ইহার কারণ কি? কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মতে, ইহা হইল গতানুগতিক উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং

* Second Five Year Planএর ৫ পৃষ্ঠা।

† ৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

অন্যায্য বণ্টন। সমৃদ্ধির বিভিন্ন

ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা হইল সুদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা

ভারতে উৎপাদন-ব্যবস্থার যদি আধুনিক রূপ দেওয়া যায়, অর্থনৈতিক উৎপাদনকে যদি অধিকতর উৎপাদনাভিমুখী করা যায় এবং বর্তমান উৎপন্নের যদি ন্যায্য বণ্টন করা হয় তবে ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাই থাকিবে না। উৎপাদন-ব্যবস্থা দক্ষতাহীন এবং বণ্টন-ব্যবস্থা অন্যায্য বলিয়াই ভারতীয়গণ প্রাচুর্যের মাঝখানেও দরিদ্র জীবন যাপন করে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাসীদের এই মতকে অধ্যাপক সেলিগম্যানের (Seligman) ভাষায় এইভাবে বিবৃত করা যায়: ভারতের জনগণ সম্পর্কিত সমস্যা মাত্র সংখ্যার সমস্যা নহে; ইহা হইল সুদক্ষ উৎপাদন ও ন্যায্য বণ্টনের সমস্যা।*

ভারতে জনাধিক্য সম্বন্ধে মতামত পোষণকারী আর একদল ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ম্যালথুসীয় তত্ত্ব ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মধ্যপথ দিয়া চলেন। তাঁহাদের মতে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচার বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়। মিরডালের (Myrdal) অনুসরণে ইঁহারা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কল্পনাপ্রসূত ধারণা মাত্র বলিয়াও অভিহিত করিতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। জাতীয় আয়-কমিটি প্রদর্শিত মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইঁহারা বলেন যে প্রকৃত আয়ের যে-বৃদ্ধি গত ২০ বৎসরে ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। খাদ্যের উৎপাদন জনসংখ্যাকে সময় সময় ছাড়াইয়া গেলেও ইহা অতিমাত্রায় দৈবনির্ভরশীল। যে-কোন বৎসরে দেশের যে-কোন অংশে সহসা খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা

অপরদিকে, ম্যালথুসীয় তত্ত্ব পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নহে। ইউরোপের বেলায় ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইয়াছিল। ইউরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে জীবনযাত্রার মানের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ভারতের ক্ষেত্রে অবশ্য ম্যালথাসের তত্ত্বের কিছুটা গুরুত্ব আছে—কারণ ভারতে উৎপাদন ও জনসংখ্যা সাধারণত ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু যে-সকল ম্যালথুসীয় লক্ষণ ভারতে পরিদৃষ্ট হয়—যথা, অনাহার, অর্ধাহার, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাহা অনেক সময় শাসননীতির অপপ্রয়োগেরই ফল। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষের উল্লেখ করা হয়। অপরদিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এই প্রাকৃতিক উপায়গুলির কার্যকারিতাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে এবং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া অযথা আশান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। বর্তমানে ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা (state of over population) না ঘটিলেও জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিতেছে তাহা

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমালোচনা

মধ্যপন্থীদের সিদ্ধান্ত: ভারতে জনাধিক্য না ঘটিলেও গতি জনাধিক্যের দিকে

* "The problem of population is not one of mere number but of efficient production and equitable distribution."

হইতে জনসংখ্যার গতি যে জনাধিক্যের দিকে (tendency to over-population) তাহা নির্ধারণ করা কঠিন নয়। এইভাবে আদমসুমারি কমিশনার (Census Commissioner) বিগত তিন দশকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করিয়া ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে—স্পষ্ট এই অভিমত প্রকাশ না করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারত বিশেষ সংকটের সম্মুখীন।

বর্তমানে এই মতই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে, এখনও ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা ঘটে নাই, তবে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপ্রতিহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতেই জনাধিক্য ঘটিবে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতেও উৎপাদনবৃদ্ধি বেশী দিন বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। এইজন্য খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি খাদ্য-উৎপাদনবৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সংগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও পরামর্শ দিয়াছে। বস্তুত, ভারতে যে বর্তমানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে এ-সম্পর্কে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত।

জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি (Future Growth of Population) ঃ উপরি-উক্ত উপসংহারের পর জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

বর্তমানে কুৎসিনস্কির (Kuczinski) বিখ্যাত প্রণালীকে জনসংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নির্ধারণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই প্রণালীকে নীট পুনরুৎপাদন হার (Net Reproduction Rate) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে প্রণালীটি হইল এইরূপ ঃ প্রথমে দেখিতে হইবে যে, যে-বয়সে সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা (সাধারণত ১৫-৪৫ বৎসর) সেই বয়সে দেশের স্ত্রীলোকগণ কি হারে স্ত্রী-সন্তান প্রসব করে। তারপর এই হার হইতে যে-সকল কন্যা-সন্তান সন্তানবতী হইবার পূর্বেই মারা যায় এবং যাহারা কুমারিত্ব, বৈধব্য ইত্যাদির জন্য সন্তানবতী হইতে পারেন না তাহাদের গড় বাদ দেওয়া হয়। ফলে যে সংখ্যা বা গড় পাওয়া যায় তাহাই নীট পুনরুৎপাদনের হার। এই হার ১ হইলে জনসংখ্যায় হ্রাস বা বৃদ্ধি কোন দিকেই কিছু ঘটে না—জনসংখ্যার আয়তন একই থাকে। এই হার ১-এর কম এবং ১-এর বেশী হইলে বুঝিতে হইবে যে যথাক্রমে জনসংখ্যার হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটিতেছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান নীট পুনরুৎপাদনের হার ১ অপেক্ষা সামান্য কম; ভারতে কিন্তু ইহা অধিক। সুতরাং নির্ভরযোগ্য প্রণালীর হিসাব অনুসারে ভারতে নিয়মিত জনবৃদ্ধি ঘটিয়া চলিতেছে।

নীট পুনরুৎপাদনের হার

নীট পুনরুৎপাদনের হার অনুসারে ভারতে জনবৃদ্ধি ঘটিতেছে

এই প্রণালীতে হিসাব অনুসারে ভারতে কি-হারে জনবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহা অবশ্য সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয়-কমিটির জনসংখ্যা সাবকমিটি এই হারকে ১.৫-এর কাছাকাছি বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। নীট পুনরুৎপাদন হার প্রায় ১.৫ হইলে জনসংখ্যা ১৯৭১ সাল বা ২০ বৎসরের পূর্বে ৫০ কোটিতে পৌছিবে। এই হিসাব অবশ্য অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। কিংকস্‌লে ডেভিসের এক সাম্প্রতিক

হিসাব অনুসারে ভারতে নীট পুনরুৎপাদনের হার হইল ১.৩০—অর্থাৎ ১০০ জন বর্তমান মাতা ১৩০ জন ভাবী মাতা রাখিয়া যায়। এই হিসাব অনুসারেও ত্রিশ বৎসরের বহু পূর্বেই ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়াইয়া যাইবে।

নীট পুনরুৎপাদন হারের প্রণালী নির্ভরযোগ্য হইলেও ভারতে নীট পুনরুৎপাদনের হার নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং একমাত্র ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া জন্মহার, মৃত্যুহার প্রভৃতি সকল বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করিতে হইবে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির চূড়ান্ত রিপোর্টে ইহাই করা হইয়াছে।

আদমসুমারির রিপোর্টে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে অভিমত

উপরি-উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে, জন্মনিয়ন্ত্রণ, খাদ্যের যোগানে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক, সহসা মৃত্যুহার বৃদ্ধি প্রভৃতি না ঘটিলে আগামী ৩০ বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে বৃদ্ধি পাইবে :

সাল	জনসংখ্যা (ভগ্নাংশ বাদ দিয়া কোটিতে)
১৯৫১	৩৬
১৯৬১	৪১
১৯৭১	৪৬
১৯৮১	৫২

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বর্তমান হারে আগামী ত্রিশ বৎসরের পূর্বেই জনসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়াইয়া যাইবে। ইকাফের (ECAFE) অন্যতম সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে এই বৃদ্ধির হার উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অত্যধিক না হইলেও ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে ইহার ভীতির কারণ। সুতরাং প্রয়োজন হইল প্রতিবিধান অবলম্বনের।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব (Effect of Development Planning upon Populational Growth) ঃ এই প্রসংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উন্নয়ন কার্যাবলীর প্রভাব লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণের, এমনকি অনেক অর্থবিদ্যাবিদেরও ধারণা যে উন্নয়ন কার্যাবলীর ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। কুৎসিনস্কি, ডাঃ চার্লস প্রভৃতি উন্নত দেশ-সমূহের অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন যে শিল্পোন্নতির সংগে সংগে ঐ সকল দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া গিয়াছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য হইতে অনেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ভারতেও উন্নয়ন কার্যাবলীজনিত জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, যে তত্ত্বের উপর ইহা নির্ভরশীল তাহা আংশিকভাবে সত্য মাত্র। উন্নত দেশে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইলে; তৎপূর্বে জনসংখ্যা

পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হারেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডাঃ নবগোপাল দাশ বলেন, "অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রাথমিক অবস্থায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিই ঘটায়, হ্রাস নহে।" প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে—অর্থাৎ বেশ কিছুটা উন্নয়ন সাধিত হইলে, জনসংখ্যা সমহারে বাড়িতে থাকে। তারপর উন্নয়নের পরিমাণ আরও বাড়িলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিতে সুরু করে। অতএব, উন্নয়নকার্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপর উহার ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় উন্নয়নকার্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়.

ভারত এখন পরিকল্পিত উন্নয়নকার্যের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত। সুতরাং এই অনুমান করাই স্বাভাবিক যে বর্তমানে ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের (Princeton University) দুইজন অধ্যাপক—এ্যানস্‌লে কোলে (Ansley Coale) ও এড্‌গার হুভার (Edger Hoover) ভারতের জনগণ সম্পর্কিত সমস্যার বিশদ আলোচনা করিয়া যে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই অভিমতই সমর্থিত হইয়াছে। পুস্তিকাটির নাম হইল "ভারতে ১৯৫৬-৮৬ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন" (Population Growth and Economic Development in India, 1956-86)। অধ্যাপকদ্বয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে ভারতে জনসংখ্যা বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে বাড়িতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরও ছাঁটকাট করা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কথাই উঠে না। ইহা করা হইলে জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইবে অথবা নামিয়া আসিবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে ছাঁটকাট করিয়া বর্তমানে (১৯৫৮, ডিসেম্বর) যে ৪,৫০০ কোটি টাকাতে দাঁড় করান হইয়াছে তাহা বজায় রাখিতেই হইবে। সম্ভবমত ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া প্রাথমিক বরাদ্দ ৪,৮০০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিগুণ (১০,০০০ কোটি টাকার মত) ব্যয়-বরাদ্দের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

ভারতেও ইহা ঘটিতেছে

জীবনযাত্রা প্রণালীর পদ্ধতির উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল (Effect of Populational Growth on the Pattern of Livelihood) ঃ

জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর এই জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল কি হইয়াছে এবং ফল আর কি হওয়া সম্ভব। জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রথম ফল হইল মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া। আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ ১১১ সেণ্ট হইতে ৮৪ সেণ্টে পরিণত হয়। দুই প্রকার শস্য উৎপাদনকারী জমির (double crop

জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফল ঃ ১। মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়া

area) এবং সেচসমন্বিত জমির (irrigated area) পরিমাণও ঐ সময়ের মধ্যে যথাক্রমে ১৩ সেণ্ট হইতে ১০ সেণ্টে এবং ১৮ সেণ্ট হইতে ১৪ সেণ্টে নামিয়া আসে। সুতরাং কোন দিক দিয়াই মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে তাল রাখিতে পারে নাই।

২। জনসংখ্যার নগরাভিমুখী গতি ও ইহার ফল

মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে বহুসংখ্যায় পল্লী অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কর্মের অনুসন্ধানে নগরাঞ্চলে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। বিগত আদমসুমারির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১-৫১ সালের মধ্যে পল্লী অঞ্চলের জনসংখ্যা মোট শতকরা ৩৮·৭ ভাগ বাড়ে। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ১১৯·৫ ভাগ। অধ্যাপক কোলে ও হুভারের মতে, জনসংখ্যার নগরজীবনের প্রতি এই আকর্ষণ বিশেষ কাম্য নহে। ইহা শিল্পোন্নয়নের সূচক হইলেও, ইহা নগরজীবনে ভারসাম্যের অভাব ঘটাইতেছে। সুতরাং এই গতি নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন এবং সংগে সংগে মূল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে একটি জাতীয় নগরাঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা (a national urban development plan) গ্রহণ করাও অপরিহার্য।*

৩। প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণবৃদ্ধি

জনসংখ্যাবৃদ্ধির আর একটি ফল হইল প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণবৃদ্ধি। জাতীয় আয়-কমিটির সাম্প্রতিক হিসাব হইতে জানা যায় যে এখনও শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লোক কৃষি এবং অনুরূপ জীবিকা অর্থাৎ প্রাথমিক জীবিকাসমূহের (primary occupations) উপর নির্ভরশীল। বিগত আদমসুমারি অনুসারে শতকরা ৬৯·৮ ভাগ লোক জীবিকার জন্য মাত্র কৃষির উপরই নির্ভর করিত। জাতীয় আয়-কমিটি আর একটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে প্রাথমিক জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অনুপাত শতকরা ১·২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মাধ্যমিক ও তৃতীয় জীবিকাসমূহের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির শতকরা ভাগ যথাক্রমে ৩·৫ এবং প্রায় ·৮ কমিয়া যায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই অভিমত সমর্থন না করিয়া উপায় নাই যে জনসংখ্যা ও দেশের আর্থিক সম্পদের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন ও রক্ষা করিতে হইলে বর্তমান হারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধানের সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে—জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রসংগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ হইল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অন্যতম প্রয়োজনীয় সর্ত।†

* Population Problem and Economic Development in India.

† Second Five Year Plan-এর ৭ পৃষ্ঠা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিত প্রতিবিধানসমূহ (Suggested Remedies for checking Populational Growth) : আদমসুমারি কমিশনারের মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হইল 'অদূরদর্শী মাতৃত্ব'কে (improvident maternity) পরিহার করিবার ব্যবস্থা করা। অদূরদর্শী মাতৃত্ব বলিতে আদমসুমারি কমিশনার বুঝাইয়াছিলেন, ইতিমধ্যেই তিন বা ততোধিক সন্তানবতী মাতার পুনরায় মাতৃত্ব লাভ করা। এইরূপ অদূরদর্শী মাতৃত্ব রহিত করার পন্থা হিসাবে সাধারণ ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার, লোকের কুসংস্কার দূরিকরণার্থে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য উরযুক্ত সংখ্যায় উপদেশ কেন্দ্র (Family Planning Clinics), দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় বা বিনামূল্যে প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবিধানসমূহ :
১। অদূরদর্শী মাতৃত্ব পরিহার করা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আর একটি পদ্ধতি হইল বিবাহের, বিশেষত স্ত্রীলোকের বিবাহের, বয়সকে বাড়াইয়া দেওয়া। স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়সকে বাড়াইয়া দিলে সন্তানবতী হইবার মোট সময়কে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং যে-সময় সন্তানবতী হইবার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে সেই সময় হইতে কিছুটা অংশ বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং জন্মহার কমিয়া যায়।

২। বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া

উপরি-উক্ত পদ্ধতিসমূহের সমালোচনা হিসাবে বলা যায় যে, শিক্ষার বিস্তার করিয়া, কুসংস্কার দূর করিয়া, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণ করিয়া ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের পক্ষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সময়-সাপেক্ষ। এই পদ্ধতি ও পন্থাগুলি কার্যকর হইবার পূর্বেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইবে। বিবাহের বয়সকে আইনের দ্বারা বাড়াইয়া দিলে কতটা কার্যকর হইবে বলা কঠিন। স্ত্রীলোকের বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারক 'সর্দা আইন' কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই বলিলেই চলে। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের বয়স আপনা হইতেই বাড়িয়া গিয়াছে ; ইহার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় নাই। এই বয়স বাড়িয়াছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু দরিদ্র দেশবাসীসমূহ যাহারা বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারা এখনও এই সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় নাই। শিক্ষার অভাবে জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন ; সন্তান তাহাদের নিকট কোন দায়িত্ব নহে—বরং সামান্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই পরিবারের উপার্জনশীল সভ্য বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং বিবাহের বয়সকে বাড়াইয়া দিয়া জনসংখ্যাকে কতদূর নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সকল কারণে অনেকের মত হইল যে, জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক সম্পদের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন এবং সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে অবলম্বনীয় পন্থা হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা।

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ও পন্থাসমূহের সমালোচনা

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে উন্নয়নের স্তরে জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ (Adopted Remedies) : এখন যে-যে প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা করা হইতেছে মাত্র কিছুদিন পূর্ব হইতে

জন্মসংখ্যা ও অর্থনৈতিক সম্পদসমূহের মধ্যে কাম্য ভারসাম্য আনয়ন করার কোন প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ যুগে হয় নাই বলা চলে। জাতীয় সরকার-পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতেই এ-দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে; এবং জাতীয় আয়-কমিটির ও ১৯৫১ সালের আদমসুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেও ইহার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণের জন্য বরাদ্দ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন সমস্যার গুরুত্বকে লঘুই করিয়াছিল। উপরন্তু, ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছিল যে, পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল স্বাস্থ্য ও পারিবারিক কল্যাণ। ইহার ফলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক কল্যাণকে পশ্চাতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্ভরযোগ্য সূত্র লইয়া গবেষণা করা হয়; বেতার ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালান হয়; শতাধিক পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান বিতরণ-কেন্দ্রও খোলা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যাদি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্যার উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় মোট পরিবার নিয়ন্ত্রণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল প্রায় ৫ কোটি টাকা। ইহা দ্বারা নগরাঞ্চলে ৫০০ এবং গ্রামাঞ্চলে ২,০০০—এই ২,৫০০ জ্ঞান বিতরণ-কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। কর্মসূচী নির্ধারণ করিবার জন্য কেন্দ্রে এবং কয়েকটি রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড (Family Planning Boards) স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং পুস্তিকা, প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ-বিষয়ে প্রচারকার্য চালান হইতেছে।

সমালোচনা : অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহ পর্যাপ্ত নহে

এই সকল পদ্ধতি অবশ্য কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। বিশেষভাবে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার না ঘটিলে এগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করা যায় না। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে মোট ৩০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে। তবুও প্রথম পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনায় ইহা অধিক; তবে কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে, শিক্ষা বিস্তারের উপর শুধু জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা নয়; অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও অল্পবিস্তর নির্ভরশীল।

জনসংখ্যার আঞ্চলিক বন্টনজনিত সমস্যা (Problem relating to the Regional Distribution of Population)ঃ জনসংখ্যার ঘনত্ব বা আঞ্চলিক বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি যে, এক এক অঞ্চল অত্যন্ত জনবহুল এবং এক এক অঞ্চল বিশেষভাবে জনবিরল। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সর্দার পাণিকর প্রভৃতির মতে জনসংখ্যার বণ্টনজনিত এই অসমতাই ভারতের জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রধান সমস্যা।* সুতরাং ইহার সমাধানের প্রচেষ্টাই সর্বাগ্রে করিতে হইবে। ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া যে-অভিমত প্রকাশ করা হয় তাহা এই শ্রেণীর লেখকগণের মতে হইল আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্যা। যদি জনবহুল অঞ্চলসমূহ হইতে বেশ কিছু পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনবিরল অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া দেওয়া হয় তবে ভারতে জনাধিক্যের বিশেষ কোন সমস্যাই থাকিবে না। সুতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ (internal migration) হইল জনাধিক্যের সমস্যার প্রধান সমাধান।

আঞ্চলিক বণ্টনজনিত সমস্যার গুরুত্ব

এই মতানুসারে জনাধিক্যের সমস্যার প্রধান সমাধান

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের মাধ্যমে ভারতে জনাধিক্যের সমস্যার সমাধান করা যাইবে কিনা এই বিচার করিবার জন্য জানা প্রয়োজন যে, কি-কি বিষয় দ্বারা জনসংখ্যার আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যার আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারক বিষয়গুলি দেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, এই দেশ কৃষিপ্রধান বলিয়া যে-যে অঞ্চলে কৃষিকার্যের সুবিধা আছে সেই-সেই অঞ্চলে জনবসতি বিশেষভাবে ঘন। কৃষিকার্যের সুবিধা বলিতে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তি, ভূমির অবস্থানগত প্রকৃতি (configuration of land), বৃষ্টিপাত, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতিই বুঝায়। নিম্ন ও উচ্চ গাংগেয় সমতলভূমিতে (Lower and Upper Gangetic Plains) এই উপাদানগুলির অস্তিত্ব অধিকমাত্রায় বর্তমান বলিয়া এই অঞ্চলই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভারতীয় ইউনিয়নের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় ভূখণ্ডের এই অংশেই বাস করে। নিম্ন-গাংগেয় সমতলভূমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব হইল প্রতি বর্গমাইলে ৮৩২ জন করিয়া।

কি-কি বিষয় দ্বারা আঞ্চলিক ঘনত্ব নির্ধারিত হয়

ভূখণ্ডের পক্ষে কৃষিকার্যে জনবসতি অনুকূল হইবার ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই কৃষিকার্য জনবসতির ঘনত্বের পরিমাণ আর বৃদ্ধি করিতে পারে না। ভারতের ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিয়াছে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বর্তমানে আর জনবসতির আকর্ষক নহে। সুতরাং লোক গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাভিমুখী হইয়াছে। যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা

বর্তমান ভারতে শিল্প-বাণিজ্য জনসংখ্যার ঘনত্বকে নির্ধারণ করিতেছে

* ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

বিশেষমাত্রায় জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করিতেছে। বলা যায়, ভারতে কৃষির দ্বারা জনসংখ্যার বণ্টন নির্ধারণের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা নির্ধারণের যুগ আসিয়াছে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের পরিবর্তে জলসেচ-ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ শক্তি, বন্যানিরোধ-ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদানই বর্তমানে জনবসতির ঘনত্বের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন ভারতের আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের দ্বারা জনগণ-সম্পর্কিত সমস্যার কতদূর সমাধান করা যায় তাহা দেখা যাউক। অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব মোটেই অধিক নহে; বরং বিশেষ কম। পূর্বে বলা হইয়াছে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় অঞ্চল ধরিয়া ভারতে জনবসতির গড় ঘনত্ব ২৮১-র কিছু উপর। এই দুই অঞ্চল বাদ দিলে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ৩১২-তে দাঁড়ায়।* তুলনায় ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জনবসতির ঘনত্ব প্রায় ৭০০; জাপানে প্রায় ৬০০; এবং বেলজিয়ামে ৬৫০-এর অধিক। সুতরাং জনবসতির গড় ঘনত্বকে সূচক হিসাবে ধরিলে ভারতে জনাধিক্য ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। যাহা হউক, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও জনাধিক্যের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে বর্তমানেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের দ্বারা কতদূর কি ব্যবস্থা করা সম্ভব ইহাই হইল প্রশ্ন।

ভারতের জনবসতির গড় ঘনত্ব অধিক নহে

জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ করার জন্য প্রয়োজন জনবিরল অঞ্চলসমূহে সেচকার্যের ও জমির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার। কিন্তু সেচকার্যের ও জমির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি কতকটা সহজভাবে করা গেলেও জনবিরল অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। শিল্প-বাণিজ্য অনেক পরিমাণে ভৌগোলিক বিষয়সমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, প্রাকৃতিক কারণসমূহও শিল্পের আঞ্চলিকতা বহু পরিমাণে নির্ধারণ করে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যেখানে কয়লা ও লৌহ নাই সেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা স্থাপন করা কতদূর সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত সে-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে। জমির উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধি কতকটা সহজসাধ্য হইলেও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থানের মরুভূমিকে কৃষি-জমিতে পরিণত করার কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বনবেষ্টনী রোপণ, জলসেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা করা সম্ভব হইলেও, করিতে বহু দিন সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা অকাম্যভাবে বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর

আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের সম্ভাবনা কতদূর

একমাত্র আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণ পর্যাপ্ত সমাধান হইতে পারে না

* ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

না করিয়া জনাধিক্য সম্পর্কিত সমস্যার সমাধানকল্পে অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন। আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উৎপাদনবৃদ্ধি, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের হ্রাসের সংগে সংগে আভ্যন্তরীণ স্থানান্তরিকরণের ব্যবস্থাও কিছুমাত্রায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। এইরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিবিধানের মাধ্যমেই ভারতের জনসংখ্যা-সম্পর্কিত সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব।

প্রশ্নোত্তর

1. Examine some of the salient features of the Indian population as revealed by the last census.

[ইংগিত : ভারতে জনসংখ্যার আয়তনবৃদ্ধি, আঞ্চলিক বণ্টন, বসবাসপদ্ধতি, জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া জনাধিক্যের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা কর। ...(৬৫-৭১ পৃষ্ঠা দেখ।)]

2. Is India over-populated ? Give reasons for your answer.

[C. U. B. A. 1940, '43, '50 ; B. Com. 1955]

[ইংগিত : জনসংখ্যার আয়তন সকল সময়ই দেশের আর্থিক সম্পদের আপেক্ষিক। আর্থিক সম্পদ পর্যাপ্ত হইলে ক্ষুদ্রায়তন দেশেও বৃহৎ জনসংখ্যার পক্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে। আবার আর্থিক সম্পদ অপ্রতুল হইলে বৃহদায়তন দেশেও ক্ষুদ্র জনসংখ্যা অধিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং কোন দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচার করিতে হইবে ঐ দেশের আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে।

আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত দুইটি তত্ত্ব—ম্যালথুসীয় ও কাম্য জনসংখ্যা অনুসারে কোন দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচার করা হয়। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব আর্থিক সম্পদ বলিতে মাত্র খাদ্য-যোগানই ধরিয়া লয়। সুতরাং এই তত্ত্ব অনুসারে মাত্র খাদ্য যোগাইবার তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বিচার করা হয়। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচারে কিন্তু দেশের সামগ্রিক সম্পদ উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করা হয়। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, অর্থনৈতিক প্রমাণ বিচার অনুসারে ঘটে নাই। বর্তমানে এই দুই তত্ত্বের কোনটাকেই সম্পূর্ণ প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। তাই ভারতে একদল মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আছেন যাঁহাদের মতে, ভারতে বর্তমানে জনাধিক্য না ঘটিলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান হারে চলিলে অদূর ভবিষ্যতেই জনাধিক্য ঘটিবে—উৎপাদনবৃদ্ধি ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না। মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের এই মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে এইরূপ মধ্যপন্থাই অবলম্বন করা হইয়াছে।...(৭২-৭৭ পৃষ্ঠা দেখ।)]

3. Discuss the effect of development planning upon the growth of population in India. [C. U. B. Com. 1958] (৭৮-৮৯ পৃষ্ঠা)

4. What are the factors that determine the density of population in India ? How far can internal migration solve India's population problem ? (৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the effects of increase of population on the pattern of livelihood. (৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

6. Make out a case for population planning in India. Discuss the steps that have been taken to this end. (৭৬-৮২ পৃষ্ঠা)

7. Discuss the growth of population in this country in relation to the growth in food supply. (৭৩-৭৫ পৃষ্ঠা এবং খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর দেখ।)

অষ্টম অধ্যায়

কৃষি—সাধারণ পর্যালোচনা

(Agriculture—A General Survey)

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব (Importance of Agriculture in the Economic Life of India) : কৃষিকার্য প্রাচীনতম উপজীবিকা হইলেও শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং দিন দিন আরও কমিয়া যাইতেছে। ভারতে কিন্তু শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও এই গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে এই গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা যাইবে।

শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও ভারতে কৃষির গুরুত্ব কমে নাই

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কৃষিকার্যের সহিত জড়িত। ইহার উপর যদি ব্যাপক অর্থে কৃষির সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিগণকে ধরা হয় তবে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার শতকরা ভাগ মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকেও ছাড়াইয়া যাইবে। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, শিল্প-উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের জীবনযাত্রাপ্রণালী গত তিন-চার দশক ধরিয়া অপরিবর্তিতই আছে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতে কৃষির উপর এইরূপ অত্যধিক নির্ভরশীলতা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। ইংল্যাণ্ডের এইরূপ ব্যক্তিগণের ভাগ কমিতে কমিতে ৫-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শতকরা ভাগ হইল ১২।

১। কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তির শতকরা ভাগ অপরিবর্তিতই আছে

জাতীয় আয় কমিটির চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট নীট জাতীয় আয় ১১,৪০০ কোটি টাকার মধ্যে শতকরা ৪৯.৮ ভাগ কৃষিকার্য ও অনুরূপ উপজীবিকাসমূহ হইতে উপার্জিত হইয়াছিল।

২। কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ অর্জিত হয়

তৃতীয়ত, খাদ্য-সমস্যার জন্য কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটির (Foodgrains Enquiry Committee) মতে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও বৎসরে ১৫ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি থাকিবে। ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের রিপোর্ট অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে (১৯৫৮-৫৯ সালের উৎপাদন ৭ কোটি টন ধরা হইয়াছে।)। নচেৎ খাদ্যসংকট ঐ পরিকল্পনাকেই বানচাল করিয়া দিবে। সুতরাং কৃষির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেই হইবে।

৩। খাদ্য-সমস্যার জন্য কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে

কৃষিজ দ্রব্যসমূহকে ভারতীয় শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসাবে গণ্য করা চলে। এই কাঁচামালের উপর বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, তৈল ও বনস্পতি শিল্প নির্ভরশীল। সুতরাং এই শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এবং এগুলির উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিতে হইলে উপরি-উক্ত কৃষিজ দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি ও গুণগত উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

৪। শিল্পে কাঁচামাল যোগানের দিক দিয়া কৃষির গুরুত্ব

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও কৃষিজ দ্রব্যাদির ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। প্রাক্-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনেরই (colonial type) ছিল—অর্থাৎ ভারত তখন প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি ও নির্মিত দ্রব্যসমূহ (manufactured articles) আমদানি করিত। যে কাঁচামাল রপ্তানি করিত তাহার মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যাদিই ছিল প্রধান। এখনও কাঁচা পাট, চা, তৈলবীজ, তামাক, মসলাপাতি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট প্রায় ৫৭৬ কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি বাণিজ্যের মধ্যে একমাত্র চা-এরই রপ্তানি-মূল্য ছিল ১২৯ কোটি টাকা।*

৫। বহির্বাণিজ্যের দিক দিয়া কৃষির গুরুত্ব

১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) ভারতের সামগ্রিক সমাজজীবনেও কৃষির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের সামগ্রিক জীবন ও অর্থনীতিতে কৃষির সম্যক ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। উপরন্তু, ভারতের ক্ষেত্রে "কৃষিকার্য উপজীবিকা মাত্র নহে। ইহা অন্যতম জীবনযাপন-প্রণালী যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কোটি কোটি জনগণের চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে রূপদান করিয়া আসিতেছে।" সুতরাং ভারতীয় কৃষির আধুনিকিকরণ এবং ইহার সহিত শিল্পপ্রসারের সমন্বয়সাধন করিয়া কৃষিকে সুপরিকল্পিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বলা যায়, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে ইহাই করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। এবং এই কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সার্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল কৃষির উপর।

কৃষির গুরুত্ব সম্বন্ধে ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Indian Agriculture):

ভারতে অন্যান্য উপজীবিকার উপর কৃষির যে অনন্যসাধারণ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই ভারতীয় কৃষির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। উপজীবিকা হিসাবে ভারতে কৃষিকার্য বিশেষভাবে জনবহুল এবং ইহার উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এই গতি কোনমতেই কাম্য নহে। ইহা ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অনগ্রসরতারই লক্ষণ। যদি আমরা দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে না চাই তবে এই গতির পরিবর্তনসাধন

বৈশিষ্ট্য: ১। উপজীবিকা হিসাবে কৃষির ভারাধিক্য ভারতীয় কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য

* Report on Currency and Finance for 1958-59.

করিতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, সেই ব্যবস্থারই সূচনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে মূলশিল্প গঠনের উপর।

উপজীবিকা হিসাবে কৃষিকার্যের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হইলেও ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—ইহা হইতে লোকে কোনমতে মাত্র দিন গুজরান করিতে পারে। সুতরাং ইহাকে উপজীবিকা বা পেশা বলিয়া বর্ণনা করা একরূপ ভুল। ইহা হইল ভারতীয়গণের প্রধান জীবনধারণপ্রণালী। অনন্যোপায় হইয়াই সংখ্যাধিক্য ভারতীয় এই প্রণালী পুরুষানুক্রমে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

২। ভারতীয় কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত

তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশসমূহে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সাধারণ নীতি হইলেও ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হয়। ইহার প্রধান কারণ হইল ভারতে কৃষি-জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা। যৌথ পরিবার প্রথার বিলুপ্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার, ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পসমূহের ধ্বংস প্রভৃতির ফলে বিশেষ করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-জমির একক (unit of cultivation) ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে।

৩। ভারতে ক্ষুদ্রায়তনে কৃষিকার্যই হইল রীতি

চতুর্থত, কৃষিকার্যের পদ্ধতিও বিশেষ পুরাতন। ভারতীয় কৃষক আজও আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ, জলসেচ, অধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি পদ্ধতি আজও অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের বাহিরে।

৪। কৃষিকার্যের পদ্ধতি অতি প্রাচীন

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্যই ভারতীয় কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলে ; তাহা হইল কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বল্পতা। ভারতে প্রতি একর পিছু জমিতে ধান্য গম তুলা ইক্ষু প্রভৃতি শস্য ঐ সকল শস্য-উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণের একটি ধারণা পাওয়া যাইবে :

৫। উৎপাদনের স্বল্পতা

		প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ (পাউণ্ডে)
গম	জাপান	১,৬৬৮
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,০৮০
	অষ্ট্রেলিয়া	৯০০
	ভারত	৫৮১
ধান্য	জাপান	৩,৫৩৩
	মিশর	৩,৩৩৩
	ব্রহ্মদেশ	১,২৪০
	ভারত	৭০২

		প্রতি একর পিছু জমিতে উৎপন্নের পরিমাণ (পাউণ্ডে)
তুলা	মিশর	৫৯০
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩১০
	ভারত	৮০

উপরের ছকটি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত ১৯৫৮ সালের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। কিছুদিন পূর্বে উৎপাদন আরও কম ছিল। ১৯৫৩ সাল হইতে জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য চাষ সুরু করার পর হইতে প্রতি একর পিছু জমিতে ধান্য উৎপাদন এবং সার প্রয়োগ ও জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে অন্যান্য শস্যেরও গড় উৎপাদন বাড়িয়া এরূপ দাঁড়াইয়াছে। খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রিদপ্তরের পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অনুসারে ১৯৫৮-৫৯ সালে ধান্য উৎপাদনের গড় আরও বাড়িয়া ৮১৬ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।* যাহাই হউক, একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ এখনও অত্যল্প স্বল্প।

সিদ্ধান্ত: ভারতীয় কৃষি অতিমাত্রায় অনগ্রসর

ভারতীয় কৃষির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনার পর একটি স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারা যায় না। ইহা হইল ভারতের প্রাচীনতম ও প্রধানতম জাতীয় মূল শিল্পের (National Key Industry) অনগ্রসরতা। বস্তুত, ভারতীয় কৃষি বিশেষভাবে পশ্চাদ্‌পদ। প্রধান জাতীয় শিল্প বলিয়া ইহার উন্নয়নের প্রশ্নই সর্বাগ্রে আসিয়া পড়ে। সাম্প্রতিক যুগের ধ্বনি যে শিল্পোন্নয়ন ব্যতিরেকে আমরা বাঁচিতেই পারিব না তাহা ভারতের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সত্য মাত্র। ভারতের ন্যায় দেশে শিল্পোন্নয়নের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে কৃষির পুনর্বাসন, পুনর্গঠন ও আধুনিকিকরণের প্রশ্ন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে এ-প্রসংগেই আলোচনা করা হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে ভারতে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন সম্বন্ধে সামান্য ধারণা করা প্রয়োজন।

ভারতের কৃষিজ উৎপাদন (Agriculture Production of India)

কৃষিজ উৎপাদনের দুইটি বৈশিষ্ট্য

ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, উষ্ণমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের এমন কোন বিশেষ শস্য নাই যাহা ভারতে উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়ত, মোট কৃষি-জমির শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়।

খাদ্যশস্য (Food Crops): ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কৃষি-জমির পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ একর। ইহার শতকরা ৮৫ ভাগ হইতে ৬ কোটি টনের কিছু বেশী খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরে অবশ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ইহা হইতে ৬৭ লক্ষ টন অধিক। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হইতেও ২৪ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

* Handout of the Directorate of Economic and Statistics.—Min istry of Food and Agriculture.

ভারতের খাদ্যশস্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান ঃ

ধান্য (Rice) ঃ ধান্য সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য। ১৯৫৮-৫৯ সালে চাউলের জন্য মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ১৫ লক্ষ একরের উপর এবং অনুমিত উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালের এই অংকই ভারতীয় ইউনিয়নে ধান্য উৎপাদনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত বা রেকর্ড। ইহা পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদন হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ টন অধিক।

১৯৫৮-৫৯ সালে ধান্য উৎপাদনের রেকর্ড

গম (Wheat) ঃ খাদ্যশস্য হিসাবে গমের গুরুত্ব হইল ধান্যের পরই। ১৯৫৭-৫৮ সালে গম উৎপাদনের জন্য মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯৬ লক্ষ একর এবং উৎপাদন হইয়া ছিল ৭৭ লক্ষ টন। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহা অপেক্ষা ২৩ লক্ষ টন অধিক গম উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা হউক, বলা যায় যে প্রথম পরিকল্পনার সূচনা হইতে গমের উৎপাদন একরূপ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।* কিন্তু তবুও গমের উৎপাদন ভারতের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে গম আমদানি করিতে হইতেছে।

ইক্ষু (Sugarcane) ঃ ভারতে ইক্ষুর জন্য কর্ষিত জমির পরিমাণ হইল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ ধরিলেও ভারতকে সর্বপ্রধান ইক্ষুর উৎপাদক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তবুও ভারত চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই ; এখনও ভারতকে বহু পরিমাণে চিনি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ একর এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ টন ইক্ষুগুড় উৎপন্ন হয়।

সর্বপ্রধান উৎপাদক হইয়াও চিনি উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে

অন্যান্য খাদ্যশস্য (Other Foodgrains) ঃ অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে ডাইল জোয়ার বাজরা যব ভুট্টা প্রভৃতিই প্রধান। ডাইল ভারতীয়গণের, বিশেষত নিরামিষ-ভোজিগণের, প্রধান খাদ্যের প্রধান উপকরণ। যে জমিতে দুই প্রকার শস্য উৎপাদন করা যায় তাহাদের অধিকাংশেই দ্বিতীয় ফসল হিসাবে ডাইল উৎপন্ন হয়। আঞ্চলিকতার দিক দিয়া দেখিলে প্রায় সমগ্র ভারতেই ইহা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে উৎপন্নের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি টনের উপর।

জোয়ার বাজরা যব প্রভৃতি দরিদ্রের খাদ্য। সুতরাং দরিদ্র দেশ ভারতে ইহাদের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই সকল খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের মত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ৭৬ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি আশা করা হইয়াছিল। পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা অপেক্ষা ৩৫ লক্ষ অধিক বা মোট ৬·৫ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপর ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন অধিক উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার উপরও ১ কোটি ১০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে।

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্য

* Review of the First Five Year Plan—May, 1957.

বাণিজ্যিক শস্য (Commercial Crops) : সাধারণত বাণিজ্যিক শস্য বলা হয় সেই ফসলগুলিকে যেগুলি কৃষক সরাসরি নিজে ভোগ না করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। এই অর্থে ইক্ষু খাদ্যশস্য হইলেও বাণিজ্যিক বা কারবারী ফসল। কিন্তু ইক্ষুকে খাদ্যশস্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াই আলোচনা করা হইয়াছে। বলা যায়, ইক্ষু খাদ্যশস্য ও বাণিজ্যিক শস্যের মাঝামাঝি স্থান অধিকার করে। অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্যের মধ্যে তুলা পাট তৈলবীজ চা কফি তামাক এবং রবারই প্রধান।

বাণিজ্যিক শস্য কাহাকে বলে

তুলা (Cotton) : তুলা সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক ফসল। অবিভক্ত ভারত তুলা উৎপাদনে অবিসংবাদে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত; প্রথম স্থানে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশবিভাগের ফলে তুলা উৎপাদনের জমির শতকরা ৩০ ভাগের কিছু বেশী পাকিস্তানের অংশে পড়ায় ভারত দ্বিতীয় স্থান হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে। বর্তমানে আবার তুলার উৎপাদন যে-ভাবে বাড়িয়াছে তাহাতে অনুমান করা হইয়াছে যে ভারত আবার তুলা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। সূক্ষ্ম বস্ত্র-বয়নের উপযোগী লম্বা আঁশের তুলার উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ভারতকে এখনও বহু পরিমাণে এই তুলা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ২ কোটি একরের কিছু উপর এবং সকল রকমের তুলার উৎপাদনের পরিমাণ ৪৭ লক্ষ গাঁইটের মত।

পাট (Jute) : অবিভক্ত ভারতবর্ষ ছিল পাটের একচেটিয়া উৎপাদক ও রপ্তানিকারক। দেশবিভাগের ফলে ভারতীয় ইউনিয়ন হইয়া দাঁড়ায় পৃথিবীর মধ্যে পাটের প্রধান আমদানিকারক দেশ। দেশবিভাগের ফলে ভারতের অংশে মোট উৎপন্নের এক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি মাত্র পড়ে এবং ভারতীয় পাটকলগুলির পক্ষে মূলত পাকিস্তানী যোগানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। ফলে ভারতকে পাটের উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

বর্তমানে ভারত কাঁচা পাট উৎপাদনে কতকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৯ সাল হইতে কিছু কিছু কাঁচাপাট রপ্তানিও সুরু করিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার একর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ গাঁইট। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে।

দেশবিভাগের পর পাটের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

তৈলবীজ (Oilseeds) : তৈলবীজেও ভারত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উৎপাদক। উৎপন্ন তৈলবীজের মধ্যে তিসি সরিষা তিল চীনাবাদাম এরণ্ড বীজ বা রেড়ি এবং নারিকেলই প্রধান। এই সকল তৈলবীজের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তৈলই যে শুধু নানা প্রয়োজনে লাগে তাহাই নহে; ইহাদের অপজাত বা খইলও গৃহপালিত পশুর খাদ্য ও জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে ভারতে উৎপন্ন তৈলবীজের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা

তৈলবীজের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস

হইত। বর্তমানে বনস্পতি শিল্প প্রসারলাভ করায় তৈলবীজের পরিবর্তে তৈলই অধিক রপ্তানি করা হয়।

বর্তমান উৎপাদন

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ জন্মে। বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে সর্বপ্রকার (নারিকেল বাদ দিয়া) তৈলবীজ উৎপাদন করা হয় এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৭ লক্ষ টনের মত। তৈলবীজ উৎপাদনে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৫৫ লক্ষ টন মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তৈলবীজের মোট উৎপাদন-লক্ষ্য হইল ৭৬ লক্ষ টন।

ভারত চা-এর প্রধান রপ্তানিকারক দেশ

চা (Tea): চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ-বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারী হইল চীনদেশ। কিন্তু রপ্তানির দিক হইতে দেখিলে ভারতকেই প্রথম স্থান নির্দেশ করিতে হইবে। ভারতে উৎপন্ন মোট চা-এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বা ৫০ কোটি পাউণ্ডের মত প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে চা-এর মোট রপ্তানির মূল্য ছিল ১৩০ কোটি টাকার মত।

বর্তমান উৎপাদন

বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ একর এবং উৎপাদন ৬৮ কোটি পাউণ্ডের উপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০ কোটি পাউণ্ড উৎপাদন ও ৫০ কোটি পাউণ্ড রপ্তানির লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে।

তামাক (Tobacco): তামাক উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনদেশের পরই। তবে ভারতে উৎপন্ন তামাকের বিশেষ কিছু রপ্তানি হয় না; প্রায় সমগ্রটাই আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে লাগিয়া যায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে তামাকের জন্য মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ একর এবং মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ২.৫ লক্ষ টন।

পাতা তামাকের উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা

ভারতে প্রভূত পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইলেও ভারতীয় তামাক হইতে সেই পরিমাণে সিগারেট ও চুরুট তৈয়ারি হয় না। ইহার কারণ হইল উৎকৃষ্ট পাতা তামাকের অভাব। কিভাবে উৎকৃষ্ট পাতা তামাক উৎপাদন করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে বর্তমানে গবেষণা-কার্য চালান হইতেছে।

অন্যান্য কৃষিজ উৎপন্ন (Other Agricultural Products): অন্যান্য কৃষিজ উৎপন্নের মধ্যে কফি রবার সিনকোনা এবং আফিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কফির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদনও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

ভারতে রবার বহু পরিমাণে উৎপন্ন না হইলেও, উৎকৃষ্ট জাতের রবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ হইল প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার একর এবং মোট উৎপন্নের পরিমাণ ৫০ হাজার টনের কাছাকাছি। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রবারের চাষ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সিনকোনার চাষ হয় পশ্চিমবংগের দার্জিলিং এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতে। বর্তমানে ম্যালেরিয়ার অন্যান্য প্রতিষেধক বাহির হওয়ায় কুইনাইনের কাঁচামাল হিসাবে সিনকোনার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আফিমের চাষ হয়। একসময় ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে আফিম চীন প্রভৃতি দেশে চালান যাইত। বর্তমানে আর আফিম রপ্তানি করা হয় না। পূর্বে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে নীলের চাষ হইত। কিন্তু জার্মানীতে কৃত্রিম রাসায়নিক রং আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে নীলের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন যা-কিছু নীলের চাষ হয়, তাহা হয় বিহারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমে শতকরা ১৭ ভাগ সকল কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়। পরে উহাকে শতকরা ২৭ ভাগে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the importance of agriculture in the economic life of India. (৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)।
2. Describe the characteristics of Indian agriculture. (৮৭-৮৯ পৃষ্ঠা)।

নবম অধ্যায়

কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা

(Problems of Agricultural land)

আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার কারণ উৎপাদনের চারিটি উপাদানের মধ্যেই নিহিত। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতীয় কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে জমি, কৃষি-শ্রমিক, কৃষিগত মূলধন এবং কৃষিগত সংগঠন—এই চারিটি উপাদানই ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকটির সম্পর্কেই সমস্যা রহিয়াছে। এখন আমাদিগকে এই সকল সমস্যা ও তাহাদের প্রতিবিধান সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিতে হইবে। অনুসৃত প্রতিবিধান পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত না হইলে অন্য সমাধানেরও ইংগিত দিতে হইবে। বর্তমান অধ্যায়ে কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলিরই পর্যালোচনা করা হইবে।

কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের চারিটি উপাদানই ত্রুটিপূর্ণ

ভারতে কৃষি-জমি সংক্রান্ত সমস্যা বহুবিধ। প্রথমত, চাষযোগ্য সকল জমিই আবাদী জমি নহে। সুতরাং প্রথমত, সমস্যা হইল অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিবার সমস্যা—পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সমস্যা—অর্থাৎ চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সমস্যা। ইহার পর আছে জলসেচের সমস্যা—ভারতের শুষ্ক জমিতে যাহার গুরুত্বকে কোন অংশে ন্যূন করিয়া দেখা যায় না। তাহার পর তৃতীয় স্থানে আছে কৃষি-জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির

কৃষি-জমি সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যা

সমস্যা। পরিশেষে আছে খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জমি বা জোতের (holdings) সমস্যা—প্রধানত যাহার জন্যই ভারতীয় কৃষি হইয়া দাঁড়াইয়াছে মুনাফাহীন (unprofitable or uneconomic)।

চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সমস্যা (Problem of Extending the Area of Cultivation): ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তন হইল ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল বা ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর।* ইহার মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর জমি বা মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৮৯ ভাগের ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (land utilisation statistics) পাওয়া গিয়াছে। এই ৭১ কোটি ৯৭ লক্ষ একর জমির মধ্যে কৃষি-জমি ও কৃষিকার্যের উপযুক্ত পরিমাণ হইল নিম্নলিখিত রূপ:

জমির ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

	একর কোটি	একর লক্ষ
১। নীট কর্ষিত জমি	৩২	৭
২। বর্তমানে অনাবাদী জমি	২	৯৪
৩। চাষযোগ্য অপচয়	৫	৩৬
৪। তৃণভূমি, ফলের বাগান ইত্যাদি	৪	৩৪
৫। অন্যান্য (বন, মরুসদৃশ জমি, বাড়ীঘর ইত্যাদি দ্বারা অধিকৃত জমি)	২৭	২৬
	৭১	৯৭

দেখা যাইতেছে যে, মোট কৃষি-জমির পরিমাণ হইল ৩৫ কোটি ১ লক্ষ (৩২ কোটি ৭ লক্ষ + ২ কোটি ৯৪ লক্ষ) একর। ইহার মধ্যে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ একর জমিতে বর্তমানে চাষ হয় না, কিন্তু এক সময় হইত। সুতরাং এই সকল 'বর্তমানে অনাবাদী জমি'তে (current fallows) পুনরায় কৃষির ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং সহজও। উপরন্তু, প্রায় ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ একর জমি চাষযোগ্য অপচয় (cultivable waste) হিসাবে পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে অবশ্য সবটাতেই কৃষিকার্য করা ব্যয়ের দিক দিয়া যুক্তিযুক্ত নহে। তবে হিসাব করা হইয়াছে যে ১ কোটি একরের মত জমিতে লাভজনকভাবে কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায়। হিসাবটিকে মানিয়া লইলে দেখা যায়, চাষের জমির পরিমাণ ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ একরের মত (২ কোটি ৯৪ লক্ষ + ১ কোটি) বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বর্তমানে অনাবাদী জমিকে কৃষি-জমিতে পরিণত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কার্য।

চাষের জমির পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে

এখন প্রশ্ন হইল, ইহা যদি সহজসাধ্যই তবে কৃষি জমির জন্য এত বুভুক্ষা সত্ত্বেও এই সকল জমি বর্তমানে পতিত হইয়া রহিয়াছে কেন? উত্তরের সন্ধানে অবশ্য বেশীদূর

* India, 1959—২৫১ পৃষ্ঠা।

যাইতে হয় না। এই সকল জমি সাম্প্রতিক কালে পতিত হইয়া থাকিবার কারণ হইল ম্যালেরিয়া, নগরিকরণ (urbanization) অথচ পরিবহনের অবন্দোবস্ত এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি ক্ষয়ের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়া। সুতরাং বর্তমানে অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিতে হইলে সমস্যাটিকে তিন দিক দিয়া আক্রমণ করিতে হইবে—অর্থাৎ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, পরিবহনের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

চাষযোগ্য অপচয়কে অবশ্য চাষের জমিতে পরিণত করা কঠিন কার্য। এই সকল জমি হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া পতিত অবস্থায় আছে, না-হয় কোনকালে লাঙলের সংস্পর্শে আসে নাই। ইহার জন্য ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবহনের সুবন্দোবস্ত ছাড়াও শক্তিচালিত আধুনিক যন্ত্রাদির প্রয়োজন। সংগে সংগে এই সকল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। না হইলে এই সকল জমি চাষযোগ্য হইবার পরও অনাবাদী হিসাবে পড়িয়া থাকিবে। অনুমান করা হইয়াছে যে দশ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে এই সকল জমির ফসল হইতে ইহাদের আবাদী জমিতে পরিণত করার খরচ উঠিয়া যাইবে।

পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা (Land Reclamation in India): অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার বা পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯৪৭ সালে। ঐ বৎসর মার্কিন সৈনবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত ২০০ ট্রাক্টর লইয়া কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫১ সালে বিশ্ব ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development) হইতে ঋণ করিয়া ভারত সরকার আরও ২৪০টি নূতন ট্রাক্টর ক্রয় করে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন কর্তৃক প্রায় ১২ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধৃত হয়। ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত ঐ সংগঠন দ্বারা পুনরুদ্ধৃত জমির পরিমাণ প্রায় ১৭ লক্ষ একরে গিয়া পৌঁছিয়াছে।* বর্তমানে সংগঠন প্রধানত দণ্ডকারণ্যে কাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি রাজ্য সরকার তাঁহাদের নিজস্ব ট্রাক্টর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে রাজ্য ট্রাক্টরগুলি মোট ১৭ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার করে।**

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠা সংগঠন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করার খাতে মোট ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই ব্যয়ে মোট প্রায় ৭৪ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার করা যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন ১৪ লক্ষ একরের উপর জমি পুনরুদ্ধার করিবে, রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠনগুলি করিবে প্রায় ১২ লক্ষ একরের মত, এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কৃষকেরা মোট প্রায় ৪৮ লক্ষ একর জমিকে চাষের জমিতে

প্রথম পরিকল্পনাতে বরাদ্দ ও ব্যবস্থা

* India—1959.

** Review of the First Five Year Plan.

পরিণত করিবে। পরিকল্পনা কমিশনের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে উক্ত লক্ষ্যের অধিকাংশে পৌছান সম্ভব হইয়াছে; এবং তরাই, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন কর্তৃক পুনরুদ্ধৃত কৃষি-জমিতে কৃষিকার্য ব্যাপকভাবে সুরু করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষি-জমির উন্নয়ন-ব্যবস্থা

পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা ছাড়াও প্রথম পরিকল্পনায় বাঁধ নির্মাণ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা দ্বারা ৩০ লক্ষ একরের মত কৃষি-জমির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ১৫ লক্ষ একর জমির পুনরুদ্ধার এবং ২০ লক্ষ একর জমির উন্নয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই কার্য কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন, বিভিন্ন রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হইবে। ট্রাক্টর চালান শিক্ষাদান করিবার জন্য ১৯৫৬ সালে একটি ট্রাক্টর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আর একটি শিক্ষাদান-কেন্দ্র স্থাপন করিবার কথা আছে। ইহা ছাড়া ভারতের বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রকারের ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রের উপযোগিতা লইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য একটি পরীক্ষাকেন্দ্রও (a tractor testing centre) খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে ট্রাক্টরও নির্মিত হইতেছে। ১৯৫৯ সালের মে মাসে প্রথম ট্রাক্টর নির্মিত হয়।

সেচ-ব্যবস্থার গুরুত্ব

জলসেচের সমস্যা (Problem of Irrigation) : মৌসুমী বায়ুর আলোচনা প্রসংগে ভারতে জলসেচের গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত দেওয়া হইয়াছে।* এখন বিশদভাবে ইহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের মৃত্তিকা শুষ্ক। কাজেই এখানে শস্যোৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারত মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এখানে সকল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম রাজস্থানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে বৎসরে মাত্র ৫-১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ ভারতে অনেকাংশেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অতি অল্প। সুতরাং এই সকল অঞ্চলে সারা বৎসরই সেচকার্যের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, সুজলা অঞ্চলেও সারা বৎসর সমান বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে সেচের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অনাবৃষ্টির বৎসরে শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ধান্য ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত জলসরবরাহের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল, এবং এই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত জলসরবরাহ একমাত্র সেচের মাধ্যমেই সম্ভব। তৃতীয়ত, মৌসুমী বায়ুর ফলে বৃষ্টিপাত হয় প্রধানত বর্ষাকালে। কিন্তু আমাদের দেশে নানাপ্রকার শীতকালীন ফসলও উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সকল ফসলের জন্যও সেচের সুবন্দোবস্তের প্রয়োজন। পরিশেষে, বর্তমানে যে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা

* ১২-১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

হইতেছে তাহার জন্যও সেচকার্যের প্রয়োজন। এই সকল জমি সেচ-সমন্বিত হইলে তবেই উৎপাদনশীল চাষের জমিতে পরিণত হইতে পারে। সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পারা যায়, কৃষিকার্যের নিশ্চয়তা, প্রসার এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারতের ন্যায় দেশে সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এইজন্যই স্যর চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান (Sir Charles Trevelyan) বলিয়াছিলেন, "ভারতে সেচই সব; এখানে জল স্বর্ণ অপেক্ষাও মূল্যবান।"

গুরুত্বের সংক্ষিপ্তসার

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান শাসকেরা এই সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেচপ্রণালী খনন করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তারপর ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে সেচ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। কিন্তু দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতে থাকায় বিদেশী শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত সেচের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ফলে যে সেচ-ব্যবস্থা করা হয় তাহা পৃথিবীতে একরূপ অনন্যসাধারণ। এই সেচ-ব্যবস্থার ফলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের মরুসদৃশ অঞ্চল শস্যশ্যামল ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়; কৃষিজ উৎপাদন অনেকাংশে বাড়িয়া যায়; দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বহুলাংশে প্রতিহত হয় এবং রাজস্বেরও বৃদ্ধি ঘটে।

সেচকার্যের ইতিহাস

বর্তমানে ভারতে মোট কৃষি-জমির মাত্র শতকরা ২০ ভাগের কাছাকাছি সেচ-সমন্বিত। ইহা যে মোটেই পর্যাপ্ত নহে সে-ধারণা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই করা যাইবে। তাই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে নানাভাবে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে। এ-সম্বন্ধে বিশদ সমালোচনা করার পূর্বে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন ধরনের সেচ-ব্যবস্থা (Types of Irrigation Works):

ভারতে প্রধানত চারি ধরনের সেচ-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—যথা, কূপ নলকূপ পুষ্করিণী এবং খাল।

কূপ (Wells): কূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা কৃষকের আয়ত্তাধীনে বলিয়া কূপ ভারতের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। এখন পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে মোট সেচ-সমন্বিত জমির এক-চতুর্থাংশে বা প্রায় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একর জমিতে কূপ হইতে জলসেচ করা হইত।*

উপযোগিতার দিক হইতে দেখিলে কূপ হইতে সেচ-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে খাল হইতে সেচ-ব্যবস্থার ন্যায় জল কম পড়িবার বা অতিরিক্ত হইবার বিশেষ ভয় নাই; ইহা কৃষকের আয়ত্তাধীন বলিয়া প্রয়োজনমত ইহার খননের ব্যবস্থাও করা চলে। কিন্তু কূপ খনন করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কূপ হইতে সেচ-ব্যবস্থার ইহাই প্রধান অসুবিধা। সম্প্রতি সরকারী প্রচেষ্টায় স্বল্প ব্যয়ে কূপ খননের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য ছোট ছোট যন্ত্রচালিত পাম্পও সরকার হইতে কৃষকগণকে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল পাম্পের মূল্য কিস্তিতে দেয়। প্রথম

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee.

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ছোট ছোট সেচকার্যের জন্য মোট বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকার মধ্যে একটা মোটা অংশ কূপ খনন ও কূপ সংস্কারের জন্য ব্যয় করা হয়। পরিকল্পনার সূচনায় এই সূত্র হইতে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচ করা যাইত। বলা হইয়াছে যে ইহা বাড়িয়া ১ কোটি ৬৮ লক্ষ একরে দাঁড়ায়।

প্রথম পরিকল্পনাতে ব্যয়-বরাদ্দ ও ব্যবস্থা

নলকূপ (Tubewells) : ১৯৪৩ সালে 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' (Grow More Food Campaign) সুরু হইবার পর হইতে নলকূপের সাহায্যে জলসেচ প্রণালীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে নলকূপ প্রোথিত করা এবং নলকূপ হইতে জল উত্তোলন করা, কূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা অপেক্ষা সহজ এবং অল্প ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। উপরন্ত, কূপ শুকাইয়া যাইতে পারে; কিন্তু নলকূপ হইতে সারা বৎসর ধরিয়া পরিমিত জল সরবরাহের আশা করা যায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ভারতে সেচকার্যের জন্য মোট ২,৫০০ নলকূপ ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ,৬ লক্ষ একরের মত জমিতে নলকূপ হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯ লক্ষ একরের কিছু অধিক জমিতে নলকূপ দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা

পুষ্করিণী (Tanks) : পুষ্করিণী হইতে জলসেচের ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সমগ্র ভারতে মোট ১ কোটি একরের উপর জমিতে পুষ্করিণী হইতে জলসেচ করা হয়।* ইহার মধ্যে মাত্র মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ হইল প্রায় অর্ধেক। সম্প্রতি পশ্চিমবংগ, আসাম এবং উত্তরপ্রদেশেও পুষ্করিণী হইতে জলসেচ-ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। মাদ্রাজ ও অন্ধ্র সরকার এ-দিকে আরও দৃষ্টি দিতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় পুষ্করিণী হইতে প্রায় ৮৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইত। বর্তমানে ইহা বাড়িয়া ১ কোটি ১০ লক্ষ একরের উপর দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা হইতে ৯০ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার একটা বিশেষ অংশ নিশ্চয়ই পুষ্করিণীর ভাগে পড়িবে। কিন্তু কতটা পড়িবে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কিছুই বলা হয় নাই।

পুষ্করিণী হইতে জলসেচের দুইটি প্রধান অসুবিধা আছে: ইহা বৃষ্টিপাতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এবং বরাবর পুষ্করিণী সংস্কার করিতে হয়। তবুও যেখানে অন্যরূপ সেচ-ব্যবস্থা করার অসুবিধা আছে এবং যেখানে সহজেই মাটির নীচে জলের সন্ধান মিলে সেখানে পুষ্করিণী হইতে জলসেচের ব্যবস্থার সপক্ষে মত দিতে হইবে। কূপ নলকূপ ও পুষ্করিণী হইতে সেচকে সামগ্রিকভাবে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা (minor irrigation works) বলা

প্রথম পরিকল্পনায় ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee.

হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই সামগ্রিক সূত্র হইতে প্রায় ১ কোটি একর জমিকে সেচ-সমন্বিত করা হয়।*

খাল (Canals): সকল দিক হইতে বিচার করিলে খালই হইল জলসেচের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণও বটে। খাল হইতে জলসেচের নির্ভরযোগ্য হিসাবও ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ঐ হিসাব অনুসারে এই সূত্র হইতে ২ কোটি ৩২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইত।

ভারতে তিন ধরনের খাল আছে: প্লাবন খাল (Inundation Canal), নিত্যবহ খাল (Perennial Canal) এবং সঞ্চিত জলের খাল (Storage Canal)। বর্ষাকালে নদীর জলবৃদ্ধি বা প্লাবনের জল যে-সকল খালে প্রবেশ করে তাহাদিগকে প্লাবন খাল বলে। নদীর জল যখন শুকাইয়া যায় তখন আর এই সকল খাল হইতে জলসেচকার্য চলে না।

তিন ধরনের সেচ খাল: ১। প্লাবন খাল

নিত্যবহ খালগুলিতে কিন্তু সারা বৎসরই জল থাকে। নিত্যবহ খালগুলিতে জল প্রেরণ করিবার জন্য নদীতে আড়াআড়িভাবে বাঁধ বাঁধিয়া জলের উচ্চতাকে প্রয়োজনীয় উচ্চতার উপরে তোলা হয় এবং স্লুইস গেটের সাহায্যে জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

২। নিত্যবহ খাল

অনেক সময় উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়াও বৃষ্টির জলকে আটকাইয়া জল সঞ্চয় করা হয়। পরে সম্ভব হইলে সারা বৎসরই খাল মারফত এইরূপ সঞ্চিত জল কৃষিক্ষেত্রে যোগান দেওয়া হয়। সুতরাং সঞ্চিত জলের খালকেও নিত্যবহ খালরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ভারতের প্রধান প্রধান খাল নিত্যবহ।

৩। সঞ্চিত জলের খাল

খাল হইতে জলসেচ-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে করা যায়। ইহা হইতে জল-সরবরাহ প্রচুর পরিমাণেও করা যায়। কিন্তু নদীগুলি নিত্যবহ না হইলে জলসেচ বরুণদেবতার কৃপার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। সুতরাং অনাবৃষ্টির বৎসরে, যখন বিশেষ করিয়া জলসেচের প্রয়োজন, তখন জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় না। উপরন্তু, নদীর জল যদি লবণাক্ত হয় তবে কৃষি-জমিতে ধীরে ধীরে একটি সূক্ষ্ম লবণের স্তর পড়িতে থাকে এবং শেষে এই সকল জমি কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে।

এই সেচ-ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সেচ-ব্যবস্থা (Irrigation under Planned Economy): দেশবিভাগের সময় ভারতের অংশে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ একর সেচ-সমন্বিত জমি পড়ে, এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ইহা বাড়িয়া ৫ কোটি ১০ লক্ষ একরে গিয়া দাঁড়ায়। এই ৫ কোটি ১০ লক্ষ একর জমি ছিল তৎকালীন মোট কর্ষিত জমির শতকরা ১৭ ভাগের মত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬৩ লক্ষ একর জমি বড় বড় এবং মাঝারি সেচ-ব্যবস্থা (major and medium irrigation works) দ্বারা এবং আরও ১ কোটি একর জমি ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা

* Review of the First Five Year Plan.

সেচ-সমন্বিত হইয়াছে।* উক্ত ৬৩ লক্ষ একর বড় বড় সেচ-ব্যবস্থাধীন জমির মধ্যে ১০ লক্ষ একর এরূপ জমি আছে যাহা পূর্বে পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতির ন্যায় ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থাধীন ছিল। সুতরাং ইহা বাদ দিলে প্রথম পরিকল্পনায় সেচ-সমন্বিত জমির নীট বৃদ্ধিকে (net addition) ১ কোটি ৫৩ লক্ষ একরে ধরা যায়। এই বৃদ্ধির ফলে মোট কর্ষিত জমির অনুপাতে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ১৭ ভাগ হইতে শতকরা ২০ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।** এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইতিমধ্যে কর্ষিত জমির পরিমাণও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সেচ-ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়; এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে ৩৮১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৯৫টি নূতন সেচ-ব্যবস্থা আছে; ইহার মধ্যে ১০টির ব্যয় হইবে ১০-৩০ কোটি টাকার মধ্যে, ৭টির ব্যয় হইবে ৫-১০ কোটি টাকার মধ্যে এবং বাকিগুলির ব্যয় হইল ৫ ক্রোটি টাকার কম। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মাঝারি ধরনের সেচ-ব্যবস্থার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাঝারি ধরনের সেচ-ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বড়, মাঝারি, ছোট—সকল প্রকার সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণকে ২ কোটি ১০ লক্ষ একরের মত বৃদ্ধি করিবার আশা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বড় এবং মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার দান হইবে ৯০ লক্ষ একর এবং বাকী ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমি সেচ-ব্যবস্থাধীনে আসিবে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা। অবশ্য পরবর্তীকালে হিসাব করা হইয়াছে যে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা দ্বারা ১ কোটি ৪ লক্ষ একরের বেশী জমি সেচ-সমন্বিত হইবে না।†

দ্বিতীর পরিকল্পনায় লক্ষ্য

বড় বড় সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলিই হইল প্রধান। নিম্নে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন উভয়ের দিক দিয়াই ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project): দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার লক্ষ্য চারিটি—যথা, বন্যানিরোধ, জলসেচ, শক্তি-উৎপাদন এবং কলিকাতা ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের যাতায়াতের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য নাব্য খাল খনন। যাহা হউক, জলসেচকেই দামোদর পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

* Review of the First Five Year Plan.

** Second Five Year Plan—৩২৩ পৃষ্ঠা।

† Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan.

দামোদর পরিকল্পনায় জলসেচের উদ্দেশ্যে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেৎ পাহাড়ে বাঁধ (dams) বাঁধিয়া জলসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সঞ্চিত জলের প্রবাহ পশ্চিমবংগের দুর্গাপুর নামক স্থানে ধরা হইবে এবং সেখান হইতে অসংখ্য খাল দ্বারা ১০'৫০ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচ করা যাইবে। ইহার পূর্বেই অবশ্য বিহারের ১ লক্ষ একরের মত জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। এই ১১'৫০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৭'৫০ লক্ষ একর জমি দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেই সেচ-সমন্বিত হইবে।

জলসেচ

দামোদর পরিকল্পনার জলবিদ্যুৎ ও তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা হইল যথাক্রমে ১ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ কিলোওয়াট। তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র হইল বোকারো, দুর্গাপুর এবং চন্দ্রপুরা; এবং জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় পূর্বোক্ত তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেৎ পাহাড়ের কেন্দ্র হইতে। বর্তমানে ১ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় ২'৫০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

ভাক্‌রা-নাংগল পরিকল্পনা (Bhakra-Nangal Project) : ভাক্‌রা-নাংগল পরিকল্পনা হইতে আরও অধিক জমিতে জলসেচের অনুমান করা হইয়াছে। সমাপ্ত হইলে এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে মোট ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জলসরবরাহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সেচ-সমন্বিত হইবে ২৩ লক্ষ একর জমি।*

ইহা জলসেচের বৃহত্তম পরিকল্পনা

ভাকরা-নাংগল পরিকল্পনার মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হইল ৬০ লক্ষ কিলোওয়াটের উপর।

মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা (Mahanadi Valley Project) : মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা হইতে শেষ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একমাত্র হীরাকুঁদ বাঁধ হইতেই ৬'৭০ লক্ষ একর জমি সেচ-সমন্বিত হইবে। এই হীরাকুদ বাঁধই মহানদী পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। ইহার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন-শক্তি হইল ১'২৩ লক্ষ কিলোওয়াট।

কুশী পরিকল্পনা (Kosi Project) : কুশী পরিকল্পনা লইয়া বহুদিন ধরিয়া জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়া কুশী পরিকল্পনার কার্য পুরাদমে সুরু করা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য বন্যানিরোধ হইলেও ইহা হইতে বিহার রাজ্যের ১৪ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করা যাইবে।

* Second Five Year Plan—৩৬২ পৃষ্ঠা এবং India – 1959.

চম্বল পরিকল্পনা (Chambal Project)ঃ মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে চম্বল নদীর উপর তিনটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং জলসেচ-ব্যবস্থার যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাই চম্বল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। চম্বল পরিকল্পনার কার্য মাত্র ১৯৫৪ সাল হইতে স্থরু হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৯২ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইবে।

তুংগভদ্রা পরিকল্পনা (The Tungabhadra Project)ঃ ইহা মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সম্মিলিত চেষ্টায় নির্মিত হইতেছে। সমাপ্ত হইলে পরিকল্পনাটি হইতে প্রায় ৮·২৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৪৫ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইবে।

মযূরাক্ষী পরিকল্পনা পশ্চিমবংগের দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিকল্পনা

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (Mayurakshi Project)ঃ পশ্চিমবংগের দিক হইতে দামোদরের পরই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার উল্লেখ করিতে হয়। ময়ূরাক্ষী দামোদরের মত খেয়ালী নদী নয়। ইহা হইতে ৪ হাজার কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইলেও জলসেচই ইহার প্রধান লক্ষ্য। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনাকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া কার্যকর করা হইতেছে। ময়ূরাক্ষীর সম্পূর্ণ কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বেই শেষ হইবার কথা। তখন ময়ূরাক্ষীর খালসমূহ হইতে প্রায় ৭ লক্ষ একরের উপর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ কলম্বো পরিকল্পনার (Colombo Plan) সর্তানুসারে কানাডা সরকার বহন করিতেছে। এই কারণে ময়ূরাক্ষীর মাসানজোড় বাঁধকে 'কানাডা বাঁধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইহা অন্যতম বৃহৎ জলসেচ পরিকল্পনা

নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা (Nagarjunasagar Project)ঃ ইহা অন্ধ্ররাজ্যের বৃহত্তম জলসেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা মাত্র ১৯৫৭ সালে গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হইলে মোট ১৯·৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা হইতে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর।

অন্যান্য পরিকল্পনাঃ ইহার পর আছে বোম্বাই-এর 'কাক্রাপাড়া পরিকল্পনা' (Kakrapara Project), মহীশূরের 'ভদ্র জলসঞ্চয়স্থান' (Bhadra Reservoir), মাদ্রাজের 'নিম্ন-ভবানী পরিকল্পনা' (Lower-Bhabani Project), উত্তরপ্রদেশের রাইহান্দ পরিকল্পনা (Rihand Project) প্রভৃতি। ইহারা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের সংগে অল্পবিস্তর জলসেচেরও ব্যবস্থা করিবে। তবে কাক্রাপাড়া পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল জলসেচ। অনুমান করা হইয়াছে যে, সমাপ্ত হইলে এই পরিকল্পনা হইতে ৫·৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা যাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেকগুলি নূতন নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কার্য সুরু করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জলসেচের দিক দিয়া বোম্বাই-এর নর্মদা ও উকাই (Ukai) পরিকল্পনা, অন্ধ্রের পূর্ণা পরিকল্পনা এবং পশ্চিমবংগের কংশবতী পরিকল্পনাই প্রধান। অপরদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক দিয়া কেরলের নারীয়ামংগলম-কেন্দ্র, জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দারবাল ও মোহরা কেন্দ্র এবং বোম্বাই-এর খাপারখেদা কেন্দ্রই প্রধান। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছাঁটকাটের ফলে এই পরিকল্পনা হইতে কয়েকটি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাদ গিয়াছে—কারণ এই খাতে মোট ব্যয়বরাদ্দ ৯১৩ কোটি টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৮২০ কোটি টাকা করা হইয়াছে।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন নির্মাণকার্য

মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তিক্ষয়ের সমস্যা (Problem of Declining Fertility of the Soil)ঃ মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি বা উর্বরতা নানাভাবে ক্ষয় হয়। প্রথমত, ভারতের ন্যায় পুরাতন দেশ—যেখানে কৃষিকার্য বহুদিন ধরিয়া করিয়া আসা হইতেছে সেখানে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির সকল দানের মত মৃত্তিকারও উৎপাদিকাশক্তির একটি সীমা আছে বলিয়া এরূপ ঘটে। সুতরাং মৃত্তিকার উর্বরতা রক্ষাকল্পে মানুষের কর্তব্য হইল ক্রমাগত এই ক্ষয়পূরণ করিয়া যাওয়া। এই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সার (manures) এবং উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি (fertilizers) প্রয়োগ করিতে হয়।

ক। সাধারণ কৃষি-কার্যের পদ্ধতিতে মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয়

এখন প্রশ্ন, অতি প্রাচীনকাল হইতে কৃষিকার্য করিয়া আসার ফলে ভারতে মৃত্তিকার উর্বরতা কতটা হ্রাস পাইয়াছে এবং কতটাই বা ইহার পূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে? অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ভারতে মৃত্তিকার উর্বরতা যে-পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে তাহা পূরণ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হয় নাই। কৃষির উপর রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, যদিও ভারতের মৃত্তিকা বিপজ্জনকভাবে উৎপাদন-শক্তি হীন হইয়া পড়ে নাই, তথাপি ইহার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

ভারতের মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাসের প্রতি-বিধানের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে কিন্তু এ-সম্পর্কে সেদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। গোময়, নগর ও পল্লী অঞ্চলের ময়লা ও আবর্জনা, সরিষা ইত্যাদির খইল, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি সুলভ সার মৃত্তিকায় ব্যবহার না করিয়া অপচয় করা হইয়াছে। অপরদিকে রাসায়নিক উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির উৎপাদন এবং আমদানির কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং ভারতে মানুষ ব্যবহারের দ্বারা মৃত্তিকার ক্ষয়সাধন করিয়াছে কিন্তু ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করে নাই।

প্রতিবিধান কল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ:

* Re-appraisal of the Second Five Year Plan, Sept. '58.

ক্ষয়পূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র ১৯৫১ সাল হইতে। এই সালে সিন্ধ্রির এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট (ammonium sulphate) নামক রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম কারখানা। ইহাতে বর্তমানে মাসিক গড়ে ৩৮ হাজার টন করিয়া এ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট উৎপন্ন হয়। ১৯৫২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এক চুক্তি অনুসারে ঐ দেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানির ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথমে সিন্ধ্রিতে উৎপন্ন রাসায়নিক সারেরই যথেষ্ট চাহিদা হয় না, কিন্তু বর্তমানে, বিশেষ করিয়া জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য চাষ সুরু করিবার পর হইতে, রাসায়নিক উর্বরতা বৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদন হইল ৪ লক্ষ টন কিন্তু চাহিদা হইল ৯ লক্ষ টনের উপর।* ফলে এখন একা সিন্ধ্রি আর সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাসায়নিক সার তৈয়ারির আরও তিনটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব আছে। ইহারা রুরকেলা, নিভেলি এবং নাংগলে স্থাপিত হইবে; নাংগল ও রুরকেলার কারখানা স্থাপনের কথা বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত উৎপাদনক্ষমতা হইল ১·৫০ লক্ষ টন। ইহার উপর ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে সিন্ধ্রির উৎপাদনক্ষমতা প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্য সমাপ্ত হইলে সিন্ধ্রি হইতে এ্যামোনিয়াম সালফেট ছাড়াও অন্যান্য প্রকারের সার উৎপন্ন হইবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, টাটা কোম্পানী প্রভৃতি সার তৈয়ারির পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছে। বেশ কিছু পরিমাণ সার আমদানিও করা হইতেছে।

১। সিন্ধ্রির কারখানা

আরও নূতন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব

অপরদিকে আবার গোময়, আবর্জনা প্রভৃতির ন্যায় সহজলভ্য সারও যাহাতে অপচিত না হইয়া ব্যবহৃত হয় তাহার জন্যও প্রচারকার্য চালান হইতেছে। অন্যান্য প্রকার সুলভ সার উৎপাদনও করা হইতেছে। ইহাতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাগুলিকে (National Extension Service) অনেকটা কাজে লাগান হইয়াছে। এই সকলের ফলে সহজলভ্য সারসমূহের ব্যবহার পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

২। সহজলভ্য সারের যথাযোগ্য ব্যবহার

৩। প্রচারকার্য ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাতে এদিকে দৃষ্টি

ভূপৃষ্ঠের সাধারণ ক্ষয়ের দ্বারাও মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ঘটে। ইহাকে মৃত্তিকার ক্ষয় (soil erosion) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মৃত্তিকার ক্ষয় দ্বারা মৃত্তিকার রাসায়নিক গুণসমন্বিত উপরের ত্বকটি নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই স্থানে এরূপভাবে বালুকা আসিয়া জমা হয় যে, ঐ কৃষি-জমি চাষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইল যথেচ্ছভাবে অরণ্যভূমি এবং পত্রগুল্মাদির ধ্বংসসাধন। বৃক্ষ এবং পত্রগুল্মাদির ধ্বংসসাধন

খ। মৃত্তিকার ক্ষয় ও ইহার কারণ

* India—1959.

করা হইলে মৃত্তিকার উপরিস্থিত ত্বকটিকে বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সহজেই নষ্ট করিয়া ফেলে। উপরন্তু, অরণ্যভূমি বায়ুপ্রবাহ গতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। সুতরাং বনভূমি ধ্বংস করা হইলে একদিকে যেমন বায়ুপ্রবাহের বেগ সৃষ্টি হয়, অপরদিকে তেমনি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যায়। যে-অঞ্চলে এইরূপ ঘটে তাহা যদি মরুভূমির সমীপবর্তী হয় তবে মৃত্তিকার ক্ষয়ের ফলে মরুভূমির প্রসার ঘটিতে থাকে। রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার এইভাবেই ঘটিয়াছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই মরুভূমি বৎসরে গড়ে আধ মাইল করিয়া উর্বর ভূমিকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। বৃক্ষাদির অপরিকল্পিত ধ্বংসের জন্য পার্বত্য ভূমির ধ্বংসজনিত মৃত্তিকার ক্ষয় প্রতি বৎসর বহুপরিমাণ ঘটিতেছে।

অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণও মৃত্তিকার ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। গবাদি পশু স্বাভাবিক তৃণগুল্মাদি ধ্বংস করিয়া মৃত্তিকাকে বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের হাতে ছাড়িয়া দেয়।

তৃতীয়ত, জমির ব্যবহারের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিও মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য অনেকাংশে দায়ী। অনেক সময় পার্বত্য ও ঢালু জমিতে বাঁধের ব্যবস্থা না করিয়াই চাষ করা হয়। ফলে মৃত্তিকার উপরের ত্বক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা চালিত হইয়া অথবা বৃষ্টির জলে ধুইয়া নীচে নামিয়া আসে।

মৃত্তিকার ক্ষয়ের পরিমাণ

মৃত্তিকার ক্ষয় যে ঠিক কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। তবে কতিপয় অঞ্চল ইহার দ্বারা যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং মৃত্তিকার ক্ষয়ের জন্য সামগ্রিকভাবে যে ফসল উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে তাহা নিশ্চিত। বিজাপুর জিলা, যাহাকে এক সময় 'দাক্ষিণাত্যের শস্য ভাণ্ডার' (Granary of the Deccan) বলিয়া বর্ণনা করা হইত, আজ সম্পূর্ণ অনুর্বর হইয়া বারবার দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতেছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে সকল পার্বত্য অঞ্চল, পতিত জমি ও চারণভূমির এক-পঞ্চমাংশে মৃত্তিকার ক্ষয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।*

প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিকা সংরক্ষণের কর্মসূচী

প্রতিবিধান : মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রতিবিধানের জন্য সম্যক না হইলেও কিছু কিছু ব্যবস্থা অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা হইল রাজ্য (প্রাদেশিক) সরকারসমূহের নিজস্ব এলাকার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা। জাতীয় ভিত্তিতে প্রথম ব্যবস্থা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে। এই পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্মসূচী অবলম্বন করা হয়।

(ক) সমগ্র ভারতে মৃত্তিকার ক্ষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা ;

(খ) দেরাদুনের অরণ্যসংক্রান্ত গবেষণাগারের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখা (Soil Conservation Wing) সংযুক্ত করা ;

(গ) সমবায়ের ভিত্তিতে মৃত্তিকা সংরক্ষক সমিতিসমূহ সংগঠনে সহায়তা করা ;

(ঘ) সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা ;

* **Second Five Year Plan**—৩০৬ পৃষ্ঠা।

(ঙ) রাজস্থানের মরুভূমির পশ্চিম সীমায় প্রস্থে ৫ মাইল ব্যাপী এক বনবেষ্টনী রোপণ করিয়া উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লী রাজ্যের দিকে এই মরুভূমির অগ্রগতিকে রোধ করা ;

(চ) এই কর্মসূচীকে কার্যকর করিবার জন্য কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে প্রয়োজনীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

কর্মসূচীকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে

কর্মসূচী অনুসারে একটি কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষক বোর্ড (Central Soil Conservation Board) ও কতকগুলি রাজ্য মৃত্তিকা সংরক্ষক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বোর্ড মৃত্তিকা সংরক্ষক কার্যে শিক্ষাদানের জন্য ছয়টি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছে। এই সকল শিক্ষালয় ২৫০ জন সরকারী কর্মচারীকে সংরক্ষণের কার্যে শিক্ষাদান করিয়াছে। যোধপুরে নূতন বনভূমির পত্তনসংক্রান্ত গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। দেরাদুনের অরণ্যসংক্রান্ত শিক্ষালয়ের সহিত একটি মৃত্তিকা সংরক্ষক শাখাও (Soil Conservation Wing) সংযুক্ত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ছাড়াও বোম্বাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কেরল, পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য ১১টি দৃষ্টান্ত পরিকল্পনা (Pilot Schemes) গ্রহণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে মাদ্রাজ ও কেরলের দৃষ্টান্ত পরিকল্পনাকে পরে উন্নয়ন পরিকল্পনায় (development projects) রূপান্তরিত করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৭ লক্ষ একরের মত জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক একমাত্র বোম্বাই-এই অবস্থিত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০ লক্ষ একর জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করিবার কথা ছিল। এই উদ্দেশ্যে মূল পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বর্তমানে বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১৫'২৭ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে * প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩'২৫ কোটি টাকা।

খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা (Problem of Subdivided and Fragmented Agricultural Holdings) : খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা হইল কৃষিকার্যের একক (Unit of Cultivation) সম্পর্কিত সমস্যা। উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় কৃষিকার্যের বেলাতেও উৎপাদনের একটি বিশেষ আয়তন ব্যয়ের দিক দিয়া কাম্য বিবেচিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ আয়তনে উৎপাদন করিলে তবেই সর্বাধিক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুন কৃষিকার্যের একক এই কাম্য আয়তন অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র।

খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের সমস্যা হইতে কৃষির এককসংক্রান্ত সমস্যা

* Re-appraisal of the Second Five Year Plan.

খণ্ডিকরণ বলিতে বুঝায় উত্তরাধিকারের আইনের অধীনে পুরুষানুক্রমে সম্পত্তির বণ্টনের ফলে ব্যক্তিগত কৃষি-খামারের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাওয়া; এবং অসম্বদ্ধতা বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত জোত (holding) বহুদূর ব্যাপিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা। ভারতে উত্তরাধিকার আইন কৃষি-খামারকে উত্তরোত্তর খণ্ডীকৃত করিয়া কৃষিকার্যের এককের আয়তন দিন দিন কমাইয়া আনিতেছে। কৃষকের মৃত্যু হইলে তাহার জমিগুলি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে সমান অংশে বন্টিত হয়।* ফলে একটি কৃষি-খামার বহু অংশে বিভক্ত হয়। এইভাবে বিভক্ত কৃষি-খামার আরও এক পুরুষ পরে পুনর্বিভক্ত হয়। সুতরাং উত্তরোত্তর খণ্ডিকরণের ফলে কৃষি-খামারের আয়তন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেই থাকে। কৃষি-জমি যখন উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বন্টিত হয়—অর্থাৎ প্রত্যেক উত্তরাধিকারী প্রত্যেক জমির এক অংশ পাইয়া থাকে। ফলে প্রত্যেকের জোত (holding) ছোট ছোট খণ্ড হিসাবে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে ইহাকেই অসম্বদ্ধতা বলে।

খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা কাহাকে বলে

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার পরিমাণ (Extent of Subdivision and Fragmentation): বিভিন্ন সময় সরকারী ও বেসরকারী ভাবে জোতের খণ্ডিকরণের পরিমাণ নির্ধারণের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

খণ্ডিকরণের পরিমাণ

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে কয়েকটি রাজ্যে গড় জোতের পরিমাণ ছিল এইরূপ: বোম্বাই ১৩.৩ একর, পাঞ্জাব ১০ একর, মহীশূর ৬.২ একর, উড়িষ্যা ৪.৯ একর, আসাম ৪.৮ একর, মাদ্রাজ ৪.৫ একর, পশ্চিমবংগ ৪.৪ একর এবং উত্তরপ্রদেশ ২.৫ একর।

জোতের উপরি-উক্ত গড় আয়তন হইতে সাধারণ জোতের আয়তন সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে কারণ এই গড় নির্ণীত হইয়াছে সকল ছোট বড় জোত লইয়া। সুতরাং জোতের ক্ষুদ্রতার সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে বিভিন্ন রাজ্যে আরও বিশদভাবে তথ্যানুসন্ধান ও তাহাদের বিচার করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকার তথ্যানুসন্ধান করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের ভিত্তিতে অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে বোম্বাই রাজ্যে যেখানে জোতের গড় আয়তন সর্বাপেক্ষা অধিক (১৩.৩ একর), সেখানেও শতকরা ৫১ ভাগ জোতের পরিমাণ ৫ একরেরও কম। মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে এই ৫ একরেরও কম জমি হইল যথাক্রমে শতকরা ৬৭, ৬৬ ও ৫৯ ভাগ† কৃষকের। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে অনুমান করিয়া বলা হইয়াছে যে গড়ে

সর্ব-ভারতীয় গড় ২ একরেরও কম

* হিন্দু সংহিতা আইন পাস হইবার পূর্বে হিন্দু কৃষকগণের জমি শুধু তাহাদের পুত্রদের মধ্যেই বন্টিত হইত।

† Second Five Year Plan—২৩১-১৭ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক কৃষকের ২ একরেরও কম জমি আছে। উপরন্তু, এই সকল তথ্য হইল কৃষি-জমির মালিকানা (land holding) সম্বন্ধে। প্রকৃত কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে জোতের খণ্ডীকৃত রূপ আরও প্রকট—কারণ কৃষকের জীবিত অবস্থাতেই অনেক সময় তাহার উত্তরাধিকারিগণ নিজেদের মধ্যে আপোষে কৃষি-খামার বণ্টন করিয়া লইয়া পৃথক্‌ভাবে চাষ করিতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মালিকানার দিক দিয়া কোন কৃষি-জমি একটি একক হিসাবে পরিগণিত হইলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা নানা অংশে বিভক্ত হয়।

কার্যক্ষেত্রে খণ্ডিকরণের রূপ আরও ব্যাপক

অধিকাংশ রাজ্যে জোতের অসম্বদ্ধতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য পরিসংখ্যান কোন সূত্র হইতেই এখনও পাওয়া যায় না। যে-সকল রাজ্য সম্বন্ধে এই পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাহাও দু'একটি গ্রামের ভিত্তিতে বেসরকারী বা পুরাতন সরকারী অনুসন্ধানের ফল। এইরূপ এক অনুসন্ধানের ফলে বোম্বাই-এর একটি গ্রামে দেখা গিয়াছিল যে, গড়ে অর্ধ একর জমি ২০ খণ্ডে বিভক্ত। বোম্বাই-এর কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ডাঃ হ্যারল্ড ম্যান (Dr. Harold Mann) আর একটি গ্রামে দেখিয়াছিলেন যে, ১৫৬ জন কৃষকের ৭২৯ খণ্ড কৃষি-জমি আছে এবং ইহার মধ্যে ২১১ খণ্ডের আয়তন এক একরের এক-চতুর্থাংশেরও কম। পাঞ্জাবের একটি গ্রামে দেখা গিয়াছিল যে, ১২,৮০০ একর জোত ৬,৩০০ খণ্ডে বিভক্ত। আসামে একটি হিসাব হইতে জানা যায় যে, গড়পড়তা প্রত্যেকটি জোত ৪·৫ খণ্ডে বিভক্ত।

অসম্বদ্ধতার পরিমাণ

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ (Causes of Subdivision and Fragmentation): জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা—উভয়ের কারণ সম্বন্ধে সামান্য ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। খণ্ডিকরণ সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিগত কয়েক দশকে জোতের খণ্ডিকরণের দিকে যে-গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা ইংরাজ বিচারকগণ কর্তৃক ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যার ফল।" এই ইংরাজ বিচারকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া সকল সময় তাঁহারা ব্যক্তিগত মালিকানার অনুকূলেই ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে কৃষি-জমির মালিকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়াছে, জোতের খণ্ডীকৃত রূপও তত প্রকট হইয়াছে।

খণ্ডিকরণের কারণ:
১। উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যা

জমির খণ্ডিকরন ব্যাপারে উত্তরাধিকার আইনকে সহায়তা করিয়াছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ধ্বংস এবং ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ। ফ্লাউড কমিশন তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন "জনসংখ্যার বৃদ্ধির সংগে সংগে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমাগতই কমিয়া গিয়াছে।" জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়াছে সেই হারে যদি শিল্পোন্নয়ন হইত তাহা হইলে লোকে কৃষি-জমি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিত না। জমির মালিকানা ভোগ করিলেও নিজে চাষ না করিয়া জমি ভাড়া দিত। ফলে কৃষি-জমির একক ক্ষুদ্র

২। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কিন্তু শিল্পোন্নয়নের অভাব

হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে পারিত না। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি বাঁচিয়া থাকিলেও জোতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া এত কাড়াকাড়ি পড়িত না। যে উপজীবিকা দ্বারা কোনমতে মাত্র অন্নসংস্থান করা যায়, যাহা মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি বজায় থাকিলে তাহার প্রতি লোকের বিশেষ আকর্ষণ থাকিত না। সুতরাং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ধ্বংস হইল খণ্ডিকরণের একটি প্রধান কারণ।

৩। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ধ্বংস

চতুর্থত, পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার এবং পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যৌথ পরিবারের ধ্বংসও অনেকাংশে জোতের খণ্ডিকরণের পথ প্রস্তুত করিয়াছে। যতদিন একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা বজায় ছিল ততদিন কৃষি-সম্পত্তির বণ্টন প্রকট রূপ ধারণ করে নাই। ইহার ধ্বংস খণ্ডিকরণের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

৪। যৌথ পরিবারের ধ্বংস

সর্বশেষে আছে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা। একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে "হিন্দু উত্তরাধিকার আইন.......কুটির শিল্পের ধ্বংস ছাড়াও আর একটি কারণ আছে যাহা এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে....। ইহা হইল মর্টগেজ, বিক্রয় প্রভৃতির দ্বারা কৃষি-জমি মহাজনের নিকট হস্তান্তরিত হওয়া। ফলে প্রকৃত কৃষকের জমির পরিমাণ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে এবং এই উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত জমিই তাহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বণ্টিত হইতেছে।"

৫। গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা

অসম্বদ্ধতার কারণ মাত্র একটি। সামাজিক প্রথা অনুসারে জোত বণ্টনের সময় সকল কৃষি-জমিই (piece of land) বণ্টিত হয়। এইরূপ প্রথার মূলে আছে অবশ্য বিভিন্ন কৃষি-জমির মধ্যে উৎপাদিকা-শক্তির পার্থক্য। সকল জমি যদি সমান উর্বর হইত এবং সকল ক্ষেতে যদি একই ফসল ফলান যাইত তাহা হইলে বোধ হয় এইরূপ প্রথার উদ্ভব হইত না।

অসম্বদ্ধতার কারণ—সামাজিক প্রথা

জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার ফলাফল (Effects of Sub-division and Fragmentation of Agricultural Holdings): প্রধানত জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুনই ভারতে কৃষিকার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে মুনাফাহীন। প্রথমে জোতের খণ্ডিকরণ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যে, ইহা কৃষি-জমির সম্যক ব্যবহারের বিশেষ পরিপন্থী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-খামারের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উৎপাদনের উপাদানের নিম্নতম এককেরও (unit) পূর্ণ নিয়োগ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। একজন শ্রমিক, একজোড়া বলদ এবং একটি লাঙলকে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের নিম্নতম উপাদান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র জমিতে ইহারও পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে উৎপাদন-উপাদানের অপচয়ের দরুন উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

খণ্ডিকরণের কুফল:
১। উৎপাদনের ব্যয়-বৃদ্ধি

ব্যয়বৃদ্ধির আরও কারণ আছে। যে-কোন উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারীকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যয় (fixed cost) বহন করিতে হয়। উৎপাদনের আয়তন যতই বিস্তৃত হয় এই নির্দিষ্ট ব্যয় ছড়াইয়া গিয়া উৎপাদনের একক পিছু ব্যয়কে ততই হ্রাস করে। ভারতীয় কৃষির বেলায় ইহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। জমির খণ্ডিকরণের দরুন উৎপাদনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং সমগ্র নির্দিষ্ট ব্যয়ই সামান্য পরিমাণ উৎপাদনের উপর পড়ে বলিয়া স্বভাবতই উৎপাদনের ব্যয় বিশেষ অধিক হয়।

অর্থবিদ্যায় যাহাদিগকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost) বলা হয় তাহা উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সংগে অধিকাংশ সময় কমিয়া আসে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষির ক্ষেত্রে বেড়া দেওয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি ক্ষুদ্র ক্ষেতকে বেড়া বা আইল দিয়া ঘিরিতে যে-ব্যয় হয় একটি অপেক্ষাকৃত বড় জমিতে বেড়া বা আইল দিতে সেই অনুপাতে কম ব্যয়ই হয়। এই কারণেও ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

অনেক সময় আবার জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র হয় যে, কয়েকপ্রকার পরিবর্তনশীল ব্যয় না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এখানে জলসেচের উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। জোত অতি ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া কূপ খনন ইত্যাদি দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করিতে কৃষক মোটেই উৎসাহিত হয় না।

বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক হইতে খণ্ডিকরণ কোনভাবে সমর্থিত হইতে পারে না

সংক্ষেপে বলা যায়, বৃহদায়তন উৎপাদনের দিক হইতে খণ্ডিকরণ কোনমতেই সমর্থিত হইতে পারে না। বর্তমান যুগ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যুগ। কৃষিকার্যেও ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম নহে। বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়ঃ মোট উৎপাদনবৃদ্ধি এবং নানারূপ ব্যয়সংক্ষেপের ফলে একক পিছু উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস। ভারতীয় কৃষির পক্ষে উভয়ই অপরিহার্য। ভারতের উত্তরোত্তর বর্ধমান জনসংখ্যা এবং শিল্পসমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষিজ উৎপাদন-বৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতীয় কৃষককে বর্তমানে পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে বলিয়া উৎপাদনের ব্যয়হ্রাসও আবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জমির খণ্ডিকরণের জন্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া এই দুইটি লক্ষ্যের কোনটির অভিমুখেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বৃহদায়তনে উৎপাদন ও যন্ত্রিকরণ পদ্ধতির সাহায্যে কৃষির অভাবনীয় উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। সেখানে লোকে কৃষিকার্য পেশা হিসাবে গ্রহণ করে; কিন্তু ভারতে খণ্ডীকৃত জোত বৃহদায়তনে উৎপাদন ও কৃষির যন্ত্রিকরণের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। ফলে ভারতীয় কৃষক অনন্যোপায় হইয়াই পিতৃপুরুষের পেশা আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোনমতে দিন গুজরান করিয়া চলিতেছে।

২। কৃষি-জমির অপচয়

জোতের খণ্ডিকরণের জন্য অনেক কৃষি-জমিরও অপচয় ঘটে। বেড়া বা আইল দিয়া এত জমি নষ্ট করা হয় যে, ভারতের ন্যায় কৃষি-জমি বুভুক্ষুর দেশে ইহা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

অবশ্য জোতের খণ্ডিকরণ সর্বতোভাবেই সমালোচিত হয় নাই। তত্ত্বগত বা ব্যবহারিক অর্থনীতির দিক হইতে না হইলেও সামাজিক ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে

খণ্ডিকরণের সুফল

সমর্থন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, খণ্ডিকরণ ব্যবস্থা সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। ইহা কৃষি-জমি মাত্র কয়েক জনের হস্তে কেন্দ্রীভূত না করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত করিয়া দেয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, জমিতে বহুজনের মালিকানা রাখিয়াও বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।

উপসংহার

এই পদ্ধতিটি হইল সমবায় (co-operative) বা সামগ্রিক অর্থাৎ যৌথ (collective) পদ্ধতি। সুতরাং উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, জোতের খণ্ডিকরণ সম্পূর্ণভাবেই অসমর্থনীয় ব্যবস্থা। ইহার প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা আশু এবং অবশ্য কর্তব্য।

অসম্বদ্ধতার কুফল : উদ্যোগ ও শ্রমের অপচয়, বিবাদ-বিসংবাদ, অপকৃষ্ট কৃষি-পদ্ধতি প্রভৃতি

জোতের অসম্বদ্ধতার ফলে যে-সকল কুফলের উদ্ভব হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় ডাঃ হ্যারল্ড ম্যানের উক্তিতে। ম্যানের ভাষায়, অসম্বদ্ধতা "উদ্যোগের বিনাশসাধন করে, শ্রমের বিরাট অপচয় ঘটায়, সীমানা নির্ধারণের জন্য বহু জমি নষ্ট করে এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব করিয়া তুলে।

উক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া প্রথমত বলা যায় যে, অসম্বদ্ধতার কারণে কৃষকের উদ্যোগ বহুমাত্রায় বিনষ্ট হয়। তাহার জোত বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ছড়ান থাকে। ইচ্ছা এবং সংগতি থাকিলেও তাহার পক্ষে উদ্যোগী হইয়া কৃষির উন্নতিসাধন করার প্রশ্ন উঠে না—কারণ এরূপ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়ত, খণ্ডিকরণের মতই অসম্বদ্ধতার জন্য বহু জমি নষ্ট হয়। অসম্বদ্ধ জোতের বিভিন্ন অংশগুলির নির্দেশকল্পে কৃষককে আইল নির্মাণ করিতে হয়, বেড়া দিতে হয়।

তৃতীয়ত, কৃষককে বলদ লইয়া খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমিতে যাতায়াত করিতে হয় বলিয়া তাহার শ্রম, সময় এবং তাহার পশুশক্তির অপচয় ঘটে।

চতুর্থত, অনেক সময় পথ ও সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য অপরের জমির উপর দিয়া যাতায়াত করা হয় বলিয়া বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। ইহার উপর সীমানা নির্ধারণ লইয়াও কৃষক ব্যয়বহুল মামলায় জড়িত হইয়া পড়ে।

পঞ্চমত, উপরি-উক্ত অপচয় ছাড়াও উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায় এই কারণে যে, কৃষককে উৎপন্ন ফসল বিভিন্ন খণ্ডীকৃত জমি হইতে বহন করিয়া একস্থানে লইয়া আসিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে এইভাবে শতকরা ১৫-৩২ ভাগ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে।

পরিশেষে, প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবার জন্য কৃষকের পক্ষে জোতের সন্নিকটে বসবাস করা উচিত। কিন্তু তাহার জোত যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ব্যাপক ভূখণ্ডের উপর ছড়ান রহিয়াছে তখন সে জোতের সন্নিকটে বসবাস করিবে কিরূপে?

অসম্বদ্ধতার সুফলের দিকেও অবশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই প্রকার স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (natural insurance) জোত

বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ছড়ান থাকে বলিয়া ক্ষেতে একই ফসল উৎপন্ন হয় না। কোন কারণে একটি ফসল নষ্ট হইলে বা কোন ফসলের বাজার-দর বিশেষ কমিয়া গেলে অপর এক ক্ষেত হইতে আর এক ফসলের আশানুরূপ বাজার-দর সামগ্রিক ক্ষতির হাত হইতে বাঁচাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, অসম্বদ্ধতার দরুন বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া পালটি শস্য উৎপাদন (rotation of crops) সম্ভবপর হয়। ইহার ফলে কৃষককে বৎসরের অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকিতে হয় না; অধিকাংশ সময়েই সে কোন-না-কোন ফসলের উৎপাদনকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। অসম্বদ্ধতা আবার কতকটা সাম্যের নীতিরও সূচক। খণ্ডিকরণের দরুন প্রত্যেকেই কিছু কিছু জমি পাইয়া থাকে; অসম্বদ্ধতার জন্য সকলে বিভিন্ন উৎপাদিকাশক্তির কৃষি-জমি পাইয়া থাকে। ফলে সাম্যের নীতি আরও প্রসারিত হয়।

সুফল :

তবুও বলা যাইতে পারে যে, ত্রুটির তুলনায় অসম্বদ্ধতার গুণ অতি সামান্য—উপেক্ষণীয় বলিয়া অভিহিত করিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং খণ্ডিকরণের মত অসম্বদ্ধতারও আশু বিলোপসাধন প্রয়োজন। বস্তুত, ইহা ব্যতিরেকে কৃষির উন্নয়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিলোপ-সাধন অপরিহার্য

অর্থনৈতিক জোতের ধারণা (Concept of Economic Holding): জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিলোপসাধনের প্রশ্নের সহিত আংগাংগিভাবে জড়িত আছে অর্থনৈতিক জোতের ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনৈতিক জোত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়।

এখন অর্থনৈতিক জোতের ধারণা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক জোত বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ-সম্বন্ধে অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ একমত নহেন। ফলে ধারণাটিতেও কিছুটা অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। পূর্বে কৃষকের জীবনযাত্রার দিক হইতে অর্থনৈতিক জোতের ধারণা করা হইত। এই দিক হইতে কীটিঞ্জের (Keatinge) মতে—অর্থনৈতিক জোত হইল সেইরূপ কৃষি-জোত যাহার উৎপাদন হইতে কৃষক সমস্ত খরচপত্র মিটানর পর যুক্তিসংগত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। অপরদিকে ডাঃ ম্যানের ধারণায় কৃষি-জোত যদি গড় আয়তনের কৃষক পরিবারকে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ যোগাইতে পারে তবে তাহাই অর্থনৈতিক জোত। অধ্যাপক জেভন্সের (Prof. Stanley Jevons) মতে, অর্থনৈতিক জোত উন্নত জীবনযাত্রার মানকে নিশ্চিত করিবে।

অর্থনৈতিক জোত সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

বর্তমানে কিন্তু উৎপাদন-ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে অর্থনৈতিক জোতের বিচার করা হয়—কৃষকেরই জীবনযাত্রার দিক হইতে নহে। এই ধারণা অনুসারে অর্থনৈতিক জোত হইল সেই জোত যাহা হইতে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভবপর হয়।

বর্তমান ধারণা

ভারতে এখনও কৃষকের দিক হইতে অর্থ নৈতিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা হয় নাই

পারিবারিক জোত

যে-দেশে কৃষির উন্নয়ন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে মাত্র সেইখানেই এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগি বা উৎপাদনের ব্যয়ের দিক হইতে অর্থ নৈতিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা সম্ভব। ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের কৃষির পক্ষে এই অবস্থায় পৌছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাই ভারতে আর্থিক জোতের আয়তন নির্ধারণ করা হয় প্রথম দৃষ্টিভংগি বা কৃষকের দিক হইতে। 'অর্থ নৈতিক জোত' কথাটির দ্ব্যর্থবোধকতার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ইহার পরিবর্তে 'পারিবারিক জোত' (Family Holding) কথাটি ব্যবহার হইয়াছিল।* পারিবারিক জোত বলিতে চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদনকারী গড় আয়তনের কৃষকপরিবারের জন্য যতটা জমি প্রয়োজন হয় তাহাকে বুঝায়। বর্তমানে অবশ্য আবার অর্থ নৈতিক জোত কথাটি ব্যবহার করা হইতেছে।

অর্থ নৈতিক জোত কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে

এখন প্রশ্ন হইল, এই পারিবারিক জোত বা অর্থ নৈতিক জোতের আয়তন কি হইবে? বলা যায়, অর্থ নৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই। ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের অথবা অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের হইতে পারে। ক্ষুদ্রায়তনই হউক অথবা বৃহদায়তনই হউক যদি তাহা নির্দিষ্ট মাঝারি আকারের কৃষক পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার উপযোগী হয় তবে তাহাই অর্থ নৈতিক বা পারিবারিক জোত। ইহা হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে, জোতের আয়তন ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর—যথা, জমির অবস্থান, জমির উৎপাদিকা-শক্তি বা উর্বরতা, জলসেচের বন্দোবস্ত, কৃষিকার্যের পদ্ধতি ইত্যাদি। এই প্রসংগে মার্কিন বিশেষজ্ঞ হাউটষ্টনের (Howard E. Houtston) ** একটি অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হাউটষ্টনের মতে, কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বৃহদায়তনের জোত অপেক্ষা উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহারই অধিক প্রয়োজনীয়। জাপানেও জোতের একক অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু সেখানে এই সকল পদ্ধতি দ্বারা অধিক উৎপাদন সংঘটিত করা হয়। ভারতেও ইহা অবলম্বন করিলে মুনাফাহীন কৃষি-জোত অর্থ নৈতিক জোতে পরিণত হইবে।

হাউটষ্টনের উক্ত অভিমত স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে হয় যে জোতের আয়তন বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কৃষির জন্য সংস্কারসাধন সম্ভব নহে—কারণ পদ্ধতিগত উন্নয়নেরও একটা সীমা আছে যে সীমা অতিক্রম করিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns) ক্রিয়া সুরু করিবে। এখন খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতকে অর্থ নৈতিক জোতে পরিণত করিবার কিরূপ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং আর কিরূপ প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে তাহা লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

* First Five Year Plan—১৯৫ পৃষ্ঠা।

** হাউটষ্টন মার্কিন কারিগরি সহযোগিতা দলের (US Technical Mission) পরিচালক ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে ভারতে আসিয়াছিলেন।

খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে অবলম্বিত ও প্রস্তাবিত প্রতিবিধানসমূহ (Remedies adopted and proposed against Subdivision and Fragmentation) : খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের বিরুদ্ধে যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বিত বা প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : জোতের সংহতিসাধান, যৌথ খামার প্রথা, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য এবং সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা।

অবলম্বিত ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহের শ্রেণীবিভাগ

জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of Holdings) : জোতের সংহতিসাধন বলিতে বুঝায় বিক্ষিপ্ত জোতকে একত্রিত করিয়া সুসম্বদ্ধ জোতে পরিণত করা। পুনর্গঠনের জন্য কৃষক তাহার জোতের অংশ অপরের সহিত বিনিময় করিবে। বিনিময়-কার্য সমবায়িক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইতে পারে আবার আইন পাস করিয়া ইহাকে বাধ্যতামূলকও করা যাইতে পারে। জোতের সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বহুদিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। ১৯২১ সালে ক্যাল্‌ভার্ট (Calvert) পাঞ্জাবে জোতের সংহতিসাধন বা একত্রিকরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা করা হয় স্বেচ্ছাধীন পদ্ধতিতে সমবায়ের মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে যে সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলি (co-operative consolidation society) গঠন করা হইয়াছিল তাহারা কৃষকগণকে জোতের সংহতিসাধনে প্রণোদিত করিতে থাকে। পাঞ্জাবের পর তৎকালীন সংযুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এই-ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে সংহতিসাধনের পথে অগ্রসর হয়।

সংহতিসাধন ও ইহার পদ্ধতি :
ক। সমবায়িক,
খ। বাধ্যতামূলক

পাঞ্জাব ও সংযুক্তপ্রদেশের সমবায় সংহতিসাধন সমিতিগুলির কার্য হইতে দেখা গেল যে, সমবায়ের মাধ্যমে জোতের সংহতিসাধন অত্যন্ত দীর্ঘসূত্র পদ্ধতি। সুতরাং ইহাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য কিছু পরিমাণ বাধ্যতার প্রয়োজন। ইহা উপলব্ধি করিয়াই ১৯২৮ সালে প্রথমে মধ্যপ্রদেশে ও পরে ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাবে বাধ্যতামূলক পদ্ধতিতে জোতের সংহতিসাধনের আইন পাস করা হয় এবং কিছুদিন পরে সংযুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) ইহাদের অনুবর্তী হয়। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারও সম্প্রতি একটি অনুরূপ আইন পাস করিয়াছে।

আইন পাসের ফলে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সংযুক্তপ্রদেশে সংহতি-সাধনের কিছু কিছু কার্য সম্ভব হইলেও সামগ্রিকভাবে ফল সন্তোষজনক হয় নাই। সমবায় পদ্ধতির ন্যায় সম্পূর্ণভাবে না হইলেও ইহা বহুলাংশে সাধারণের অনুপ্রেরণার উপর নির্ভর-শীল ছিল বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশে উপরি-উক্ত আইনগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। স্বভাবতই একত্রিকরণকার্য অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উপরন্তু, একদিকে যেমন সংহতিসাধনের পদ্ধতি অনুসৃত হইতে থাকে অপরদিকে তেমনি আবার সময়ের সংগে সংগে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতাও স্বাভাবিকভাবে

চলিতে থাকে। সুতরাং সংহতিসাধনের প্রচেষ্টায় নীট ফল বিশেষ কিছুই থাকে না। ফলে খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার প্রতিরোধের ব্যবস্থা (preventive measures) প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং এইদিকে পথিকৃতের কার্য করে তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশ।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে বোম্বাই সরকার অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ এবং জোতের সংহতিসাধন আইন (Prevention and Consolidation of Holdings Act, 1947) পাস করে। এই আইন দ্বারা সরকারী উদ্যোগেই জোতের সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোম্বাই-এর অনুসরণে ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবও অনুরূপ আইন পাস করে; এবং ক্রমে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি উহাদের অনুবর্তী হয়। ইহার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোতের সংহতিসাধনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রাজ্যসমূহকে এই কার্যে অধিকতর উদ্যোগের সহিত অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে সংহতিসাধনকার্য উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় সংহতিসাধন

খণ্ডিকরণ প্রতিরোধের জন্য যে সকল রাজ্যে আইন পাস বা ধারা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের দ্বারা জোতের ন্যূনতম আয়তন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন প্রকার খণ্ডিকরণ বা হস্তান্তরিকরণ দ্বারা এই আয়তনকে হ্রাস করিতে দেওয়া হয় না। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিশেষ আয়তন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে জোতের ন্যূনতম আয়তন হইল ৬.৫ একর, মধ্যপ্রদেশে ৫-১৫ একর, এবং দিল্লীতে ৮ একর।

জোতের ন্যূনতম আয়তন নির্ধারণ

তবুও জোতের সংহতিসাধনের জন্য এবং খণ্ডিকরণ প্রতিরোধকল্পে আজ পর্যন্ত যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সমস্যার তুলনায় তাহা সামান্যই। পরিকল্পনা কমিশনও একথা স্বীকার করিয়াছে।* উপরন্তু, জোতের সংহতিসাধন করা হইলেই কৃষিকার্যের পর্যাপ্ত উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন অধিকতর উদ্যোগ ও মূলধন নিয়োগ। যতদিন না কৃষক জমিকে নিজস্ব বলিয়া গণ্য করিবে ততদিন সে ইহাতে যত্নবান হইবে না। এতদিন পর্যন্ত কৃষক নিজেকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিতে পারে নাই। তাই সে জোতের সংহতিসাধন বা কৃষির পুনর্বাসন কোনটিতেই আগ্রহান্বিত হয় নাই। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি-জমি সংক্রান্ত এই মৌলিক ত্রুটি দূর করিবারই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাতে ভূমি-স্বত্বের সংস্কারের দ্বারা কৃষককে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া ইহাতে সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। নূতন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থায় সাধারণ কৃষক অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক হইতে পারিবে মাত্র। ইহা দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য—যথা, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন—

* Second Five Year Plan—১৯৯ পৃষ্ঠা।

সাধন করা সম্ভব হইবে না। তাই প্রয়োজন হইল জমিতে 'খণ্ডীকৃত মালিকানা', ক্ষুদ্র জোতের মালিকানা বজায় রাখিয়া কোন পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করা। যে-সকল পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব তাহা হইল যৌথ খামার প্রথা (collective farming), সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (co-operative farming) এবং সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা (co-operative village management)। ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা ভূমিসংস্কার ও কৃষির পুনর্গঠন অধ্যায়ে পরে করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the scope of extending the area of cultivation in India.

(৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা)

2. Give a brief account of the various methods of irrigation practised in India. Indicate the points in favour and against each one of them,

(C. U. B. Com. 1955) (৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা)

3. Briefly describe the principal multi-purpose projects in India. Point out their influence on Indian agriculture and industries. (৯৯-১০৩ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the problem of declining fertility of the soil. Indicate the steps that have been taken to tackle the problem.

[ইঙ্গিত: মৃত্তিকার উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষয় দুইভাবে হয়: (ক) সাধারণ কৃষিকার্যের পদ্ধতিতে; এবং (খ) ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়ের দ্বারা।...(১০৩-১০৬ পৃষ্ঠা)]

5. One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endless subdivision and fragmentation of holdings. Discuss the statement and suggest remedies.

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর সম্বন্ধে ইংগিত: খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে দুই প্রকার প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে হইবে: প্রথমত, সমবায় কৃষিকার্য পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পদ্ধতির মধ্যেমে ক্ষুদ্র কৃষি-জোতকে আর্থিক জোতে পরিণত করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, এই আর্থিক জোত যাহাতে আবার খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ না হইয়া পড়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা এবং ১০৯-১১১ পৃষ্ঠা, এবং দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ১১৪-১১৬ পৃষ্ঠা।]

6. Discuss the lines along which attempts have been made in different parts of India to remedy the evils of subdivision and fragmentation. (১১৪-১১৬পৃষ্ঠা)

7. Discuss the concept of an economic holding. Indicate the factors upon which the size of an economic holding depends. (১১২-১১৩ পৃষ্ঠা)

দশম অধ্যায়

কৃষি-শ্রমিক

(Agricultural Labour)

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুসারে কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ বা মোট কৃষিজীবিগণের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। কৃষি-শ্রমিক বলিতে কৃষকের নিকট মজুরি বা মাহিনাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে বুঝায়। ১৯৫০-৫১ সালের 'কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানের' (Agricultural Labour Enquiry) সংজ্ঞা অনুসারে, যে-ব্যক্তি বৎসরের অর্ধেক দিনের উপর অপরের নিকট মজুরিতে কাজ করে, সেই কৃষি-শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত।* এই কৃষি-শ্রমিকগণকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়—সাময়িক শ্রমিক (casual workers) এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক (attached workers)। সাময়িক শ্রমিক হইল তাহারা যাহাদের কৃষির ক্ষেত্রে নিয়োগের কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা অন্তত কিছু দিন ধরিয়া নিযুক্ত থাকে। বিগত আদমসুমারি অনুসারে সাময়িক কৃষি-শ্রমিক মোট কৃষি-শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ। ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ ভূমিহীন কৃষক ছাড়াও কৃষি-জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিক, রায়ত এবং গ্রাম্য কারিকরগণও আছে। নিজেদের জমি বা উপজীবিকা হইতে জীবনযাপনের ব্যয় সংকুলান হয় না বলিয়া এই সকল ব্যক্তি সাময়িকভাবে কৃষি-শ্রমিকের কার্য করিতে বাধ্য হয়।

কৃষি-শ্রমিকদের কঠোর জীবনযাত্রা প্রণালী :
১। বহুসংখ্যকের ভূমিহীনতা

১৯৫০-৫১ সাল হইতে ভারত সরকারের নির্দেশে কৃষি-শ্রমিকদের নিয়োগ, উপার্জন, জীবনযাত্রার ব্যয়, ঋণের অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় লইয়া তথ্যানুসন্ধানকার্য চলিতেছে। বহু তথ্য ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। উপরি-উক্ত 'কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট' হইতে জানা যায় যে, ভারতের মোট গ্রাম্য পরিবারের শতকরা ৩০ ভাগের উপর হইল কৃষি-শ্রমিক পরিবার এবং ইহার অর্ধেক সম্পূর্ণভাবে কৃষি-জমিবিহীন।

এ-পর্যন্ত বর্ণনা হইতে অবশ্য ভারতে কৃষি-শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রাপ্রণালী যে কত কঠোর তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না, সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার অন্যান্য দিকের—যথা, মজুরির হার, মজুরি প্রদানের পদ্ধতি, নিয়োগের সময় প্রভৃতির পর্যালোচনা করিতে হইবে।

২। মজুরির অত্যল্প হার

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের মজুরির হার অত্যন্ত অল্প। অল্পক্ষেত্রেই শ্রমিককে তাহার জীবনধারণোপযোগী মজুরি (living wage) দেওয়া হয়। উক্ত কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ২৬৮ টাকার তুলনায় কৃষি-শ্রমিকের মাথাপিছু আয় ছিল ১০৪ টাকা মাত্র এবং কৃষি-শ্রমিক পরিবারের গড় আয় ছিল বৎসরে

---

* Second Five Year Plan—৩১২ পৃষ্ঠা।

মাত্র ৪৪৭ টাকা। মজুরিপ্রদানের পদ্ধতিও অত্যন্ত আপত্তিজনক। অনেকক্ষেত্রে শ্রমিককে নগদ মজুরি দেওয়া হয় না; অন্তত মজুরির একাংশ উৎপন্ন শস্যে প্রদান করা হয়। অবশ্য, বর্তমানে নগদ মজুরি প্রদানের প্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

৩। মজুরিপ্রদানের আপত্তিজনক পদ্ধতি

ভারতের কৃষি-শ্রমিকের নিয়োগকাল সাময়িক। শস্যোৎপাদনের সময়ে তাহাদের বিশেষ চাহিদার সৃষ্টি হয়। অন্য সময় তাহাদের উপার্জনের আশায় হয় শিল্পাঞ্চলে গমন করিতে, না-হয় গ্রামে থাকিয়া অতি নিম্ন মজুরিতে আরও সাময়িকভাবে অন্যান্য কার্য করিতে হয়। আবার এ-দুইটির কোনটি সম্ভব না হইলে গ্রামে বসিয়া শস্যোৎপাদনের সময়ের উপার্জন দিয়া সারা বৎসরের ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়।

৪। সাময়িক নিয়োগকাল

হিসাব করা হইয়াছে যে, কৃষিকার্যে কৃষি-শ্রমিকগণের গড় নিয়োগকাল বৎসরে ১৮৯ দিন মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ আবার বৎসরে ১০০ দিনেরও কম। শতকরা ১৬ ভাগ কৃষি-শ্রমিকের আবার বৎসরে কোন প্রকার নিয়োগই নাই।* সুতরাং অর্ধ-বেকারত্ব ও বেকারত্ব ভারতের কৃষি-শ্রমিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের ভয়ংকর অবস্থার আরও পরিচায়ক হইল আর একটি বিষয়ের অস্তিত্ব, যাহাকে কৃষিগত ভূমিদাস প্রথা (agricultural serfdom) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষ করিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে এক একটি করিয়া কৃষি-শ্রমিকশ্রেণী আছে যাহারা সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়া সর্বনিম্ন স্থানাধিকার করে এবং যাহারা ভূমির সহিত একরূপ দাসত্বসূত্রে আবদ্ধ। ভূমির মালিক সাধারণত প্রয়োজনের সময় তাহাদের এককালীন ঋণপ্রদান করিয়া একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া লয়। ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় তাহাদের নাই; ফলে প্রভুর আয়ত্তাধীনের বাহিরে যাইবার কথাও তাহারা চিন্তা করিতে পারে না। প্রভুই তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দেয় ও খাদ্য সরবরাহ করে। তাহাদের জন্য প্রভু যে-ব্যয় করে তাহার সহিত তাহাদের শ্রমের বাজার দামের কোনই সংগতি নাই। "কোনমতে জীবনধারণোপযোগী খাদ্য তাহাকে সরবরাহ করা হয় মাত্র এবং প্রকৃতপক্ষে তাহার অবস্থা হইল মধ্য যুগের ভূমিদাসের মত।"**

৫। ভূমিদাস প্রথা

ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের অদক্ষতা তাহার কঠোর জীবনযাত্রার কারণ কিনা? ইহা লইয়া এ-পর্যন্ত বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশের মতে, ভারতীয় কৃষক তাহার ইয়োরোপীয় বা মার্কিন প্রতিলিপির সমান দক্ষ না হইলেও দক্ষতার দিক দিয়া অভিযোগ করিবার বিশেষ কিছুই নাই। ডাঃ ভোয়েলকার (Dr. Voelcker) বলেন, ভারতীয় কৃষক কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী, কঠোর পরিশ্রমী,

কৃষি-শ্রমিকের দক্ষতা

* Second Five Year Plan—৩১৫ পৃষ্ঠা।

** Wadia and Merchant—Our Economic Problem.

অধ্যবসায়ী এবং অন্যান্য গুণসম্পন্ন। কিন্তু এ-সকলই অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, গতানুগতিকতা এবং কুসংস্কারের ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলে কৃষকের স্বাভাবিক দক্ষতা তাহাকে জীবনযাত্রার পথে বিশেষ সহায়তা করে না; সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকের ফলে সকলই অকার্যকর হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক, ভারতীয় কৃষি-শ্রমিককে এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাখিয়া কৃষির সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করিলে তাহা যে ফলবতী হইতে পারে না এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিশন, কমিটি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি একমত। ১৯৫০ সালে কৃষি-সংস্কার কমিটি (Agrarian Reforms Committee) সুস্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিল যে, পূর্বের মত কৃষি-সংস্কারের যে-কোন পরিকল্পনায় কৃষি-শ্রমিককে বাদ দিয়া রাখিলে কৃষি-ব্যবস্থায় একটি পরিচর্যাহীন উন্মুক্ত ক্ষত রাখিয়া যাওয়া হইবে। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছে, অব্যাহত নিয়োগের অভাব এবং নানারূপ সামাজিক প্রতিবন্ধক যাহাদের বৈশিষ্ট্য এরূপ বহুসংখ্যক কৃষি-শ্রমিকের অস্তিত্বকে বর্তমান কৃষি-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা এমনকি অনিশ্চয়তারও সূত্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।* সুতরাং প্রতিবিধান অবলম্বন করা অপরিহার্য।

কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

কারণ (Causes): প্রতিবিধানের পর্যালোচনার পূর্বে কৃষি-শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার কারণানুসন্ধান করা প্রয়োজন। কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, গ্রাম্য শিল্পের বিনাশের ফলে বহু শিল্পী আংশিকভাবে কৃষি-শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে; জোতের খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার প্রসার বহু কৃষককে সাময়িক কৃষি-শ্রমিকে পরিণত করিয়াছে; এবং বৃহৎ বৃহৎ খামারের আয়তন-হ্রাস সমস্যাকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে।** ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে, "গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থায় সাধারণ অধিকারের বিনাশ, যৌথ উদ্যোগের অব্যবহার, জোতের খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা, বাধাবিহীনভাবে মর্টগেজ প্রথায় কৃষি-জমি হস্তান্তরিতকরণ এবং কুটির শিল্পের অবনতিই" হইল ভূমিহীন বা প্রায়-ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অসম্ভব সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ।

কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ

কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মজুরির হার অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে এবং পুরাতন ভূমিদাস প্রথা প্রবর্তিত রাখা সম্ভব হইয়াছে। জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য কৃষিকার্যে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শ্রমিকের মজুরি আরও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বে গ্রাম্য ও কুটির শিল্প হইতে কৃষকের যে-আয় হইত তাহার পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অপরদিকে শ্রমিকের দক্ষতাবৃদ্ধির পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা করা হয় নাই, তাহার অজ্ঞতা কুসংস্কার দূর করিবার যোগ্য ব্যবস্থাও করা হয় নাই।

কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা-বৃদ্ধিই তাহাদের দুর্দশার কারণ

কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের কার্যক্রম (Programme for Amelioration of the Condition of Agricultural Workers): বিগত দুই

* First Five Year Plan—২০৪ পৃষ্ঠা।
** " " " " " "।

দশক ধরিয়া কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিয়া আসা হইলেও এই প্রচেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গৃহীত হইবার পর হইতে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কৃষি-শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের সুপারিশ করা হইয়াছিল :

প্রথম পরিকল্পনার কার্যক্রম

(ক) শ্রমিককে বাসগৃহে দখলিকার স্বত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং যেখানে যেখানে সম্ভব সেইখানেই তাহাকে বাসগৃহের সহিত একটি ছোট তরিতরকারির ক্ষেতের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(খ) ভূদানযজ্ঞের সমর্থন দ্বারা ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের জমির ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ভূদানকে চিরন্তনভাবে গ্রামোন্নয়নের কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ;

(গ) সর্বাধিক সংখ্যায় শ্রমিক-সমবায় সমিতি (labour co-operatives) গঠন করিতে হইবে এবং এই সকল সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ ও অনুরূপ অন্যান্য কার্য সম্পাদিত করিতে হইবে ;

(ঘ) যেখানে সম্ভব সেইখানেই পুনরুদ্ধৃত পতিত ও নূতন আবাদীকৃত জমিকে এই সকল সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণ করা হইবে ; এবং সমিতি ইহাতে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক এবং অতি ক্ষুদ্র জোতের মালিক কৃষকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে ;

(ঙ) গৃহনির্মাণ, এবং কৃষির সহিত সংগতিপূর্ণ শিল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় ইত্যাদি বাবদ অর্থসাহায্য করিতে হইবে ;

(চ) শিক্ষামূলক বৃত্তির (educational stipends) মাধ্যমে বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের বৃত্তিমূলক (vocational) ও শিক্ষাসম্পর্কিত (technical) শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(ছ) গ্রাম্য সম্প্রসারণ কর্মিগণকে (rural extension workers) কৃষি-শ্রমিকগণের কল্যাণের প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েৎগুলি বিশেষভাবে কৃষি-শ্রমিকগণের কল্যাণের দায়িত্ব বহন করিবে ;

(জ) কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন (Minimum Weges Act, 1948) কার্যকর করিতে হইবে ;

(ঝ) অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে যে কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা একরূপ প্রথম পরিকল্পনারই অনুসরণ। এই কার্যক্রমের মধ্যে আছে শ্রমিক সমবায় সমিতি (labour co-operatives) গঠন, কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বাসন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও কার্যকরকরণ ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও কৃষির উন্নততর সংগঠন, কুটির ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসার, অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের কল্যাণ, কৃষি-জমির পুনর্বণ্টন প্রভৃতি কৃষি-শ্রমিককে নানাপ্রকার সুবিধা দান করিবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্য ভূদান আন্দোলন ও শ্রমিক সমবায় সমিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ভূদানের মাধ্যমে যে-সকল জমি পাওয়া যাইবে তাহা প্রধানত কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্যই ব্যবহার করা হইবে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক সমবায় সমিতি গঠনে জাতীয় সম্প্রসারণ যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়। তৃতীয়ত, যেখানে ন্যূনতম মজুরি এখনও নির্ধারিত হয় নাই সেখানে এই কার্য অবিলম্বেই সমাধা করিতে হইবে। পরিশেষে, সমগ্র গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনে মনোযোগ দিতে হইবে।

এখন উপরি-উক্ত কার্যক্রমকে কতদূর অনুসরণ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনাতে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি পুনর্বাসন উপনিবেশ এবং ভূপালে একটি যান্ত্রিক কৃষি-খামার (mechanised farm) স্থাপন করা হয়। ভূদান, কৃষি-জমির ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধারের ফলে যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাইতেছে তাহা প্রধানত ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কার্যেই নিয়োগ করা হইতেছে। শ্রমিক-উপনিবেশসমূহে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য চালু করা হইয়াছে এবং শ্রমিক সমবায় (labour co-operatives) গঠন করা হইয়াছে। ভূমিদাস প্রথার বিলুপ্তির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহা পরিকল্পনার অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নয়নকার্যের অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি রাজ্যে কৃষি-শ্রমিকের বাসগৃহের জন্য জমির ব্যবস্থা করিয়া আইনও পাস করা হইয়াছে। ন্যূনতম মজুরি-নির্ধারণ কার্যও বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব, রাজস্থান, উড়িষ্যা, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ ও ত্রিপুরা—এই কয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমগ্রে এবং আসাম, বিহার, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবংগ প্রভৃতি ৭টি রাজ্যের স্বল্প মজুরি অঞ্চলে (low wage areas) কৃষি-শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হইয়াছে। বাকী রাজ্যগুলি এই কার্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যেই শেষ করিবে কথা আছে।

কার্যক্রমকে কতদূর অনুসরণ করা হইয়াছে

ইতিমধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালের কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা সম্বন্ধে আর একবার অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ইহা 'দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান' (Second Agricultural Labour Enquiry) নামে অভিহিত। এই অনুসন্ধানের রিপোর্টের ভিত্তিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইবে আশা করা যায়।*

উপসংহার: কৃষি-শ্রমিকের অবস্থান্তর হইল দীর্ঘকাল উন্নয়নের প্রশ্ন। এই সমস্যা জটিলও বটে। সমস্যাটির বিশ্লেষণকালে ও সমাধানের প্রচেষ্টায় দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে—যথা, (১) গ্রামাঞ্চলে বেকারাবস্থা (unemployment) এবং অর্ধ-নিয়োগের (under-employment) মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এবং (২) প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলেই সমস্যাটি সাম্প্রতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং শুধু যে

* India—1959.

বর্তমান বেকারাবস্থার পরিমাণই কমাইতে হইবে তাহা নহে, বর্ধমান জনসংখ্যার দরুন ভবিষ্যতেও নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। সমস্যার এই প্রকার সমাধান হইল দীর্ঘকালীন এবং সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন। সুতরাং আমাদিগকে দীর্ঘকালের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the present condition of agricultural labourers in India. What measures would you recommend to improve their lot? (১১৭-১১৯ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the measures that have been adopted to improve the lot of the agricultural worker in India. (১২০-১২৩ পৃষ্ঠা)

একাদশ অধ্যায়

কৃষিগত মূলধন

(Agricultural Finance)

সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Problem): বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঋণ হইতেই অধিকাংশ মূলধন সংগৃহীত হয়। কৃষিকার্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হয় বলিয়া ভারতের কৃষিকার্য ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় মালিকের নিজস্ব মূলধন হইতে পরিচালিত হয়। ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে ইহা কাম্য হইলেও সম্ভব হয় নাই। বরং ভারতীয় কৃষকের পক্ষে ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা উন্নত দেশসমূহের কৃষকগণ অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহার কারণ হইল ভারতীয় কৃষির প্রকৃতি। ভারতে কৃষিকার্য মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। এখানে কৃষক খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া কোনমতে দিন গুজরান করে। সাধারণ বৎসরেই জীবিকানির্বাহের ব্যয়ের পর তাহার হাতে উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না বলিলেই চলে। ইহার পর যদি কোন কারণে অজন্মা ঘটে—জলসেচ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাবে যাহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে—তবে কৃষকের পক্ষে ঋণের পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কৃষিকার্য পরিচালনা ছাড়াও সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন এবং ব্যাধি ইত্যাদির ন্যায় জীবনযাত্রার পথে আকস্মিক ব্যয়নির্বাহের জন্যও কৃষককে ঋণগ্রাহী হিসাবে অবতীর্ণ হইতে হয়—কারণ তাহার হস্তে সঞ্চিত অর্থ কিছুই থাকে না। এ-প্রসংগে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা হইল যে ঋণগ্রাহী হিসাবে কৃষকের ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। তাহার জামিন দিবার কিছুই থাকে না; কৃষির অনিশ্চয়তার জন্য ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার মাত্রাও অত্যধিক। উপরন্তু, ঋণের পরিমাণ সামান্য বলিয়া ঋণগ্রহণের অপরিহার্য ব্যয়ের (overhead costs) পরিমাণ অত্যধিক হইতে বাধ্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কৃষিগত মূলধন সমস্যার প্রকৃতিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে : (ক) ভারতীয় কৃষির সংগঠনগত দুর্বলতা কৃষককে ঋণগত মূলধনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে ; (খ) ভারতীয় কৃষক পুরাতন ঋণভারে প্রপীড়িত ; (গ) ঋণ সরবরাহের সূত্রগুলি পর্যাপ্ত বা কৃষকের পক্ষে কাম্য—কোনটাই নহে। সুতরাং কৃষিগত মূলধনের এই তিনটি দুর্বলতাই দূর করিতে হইবে। প্রথমত, কৃষির সংগঠনগত দুর্বলতা দূর করিয়া কৃষকের আয়বৃদ্ধির এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে ঋণগত মূলধনের উপর তাহার নির্ভরশীলতার পরিমাণ যেন দিন দিন হ্রাস এবং তাহার ঋণগ্রহণযোগ্যতা (creditworthiness) যেন দিন দিন বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, অনুৎপাদনশীল পুরাতন ঋণের পরিমাণকে এরূপভাবে কমাইতে হইবে যেন ইহা পরিশোধ করা কৃষকের সংগতিতে কুলায়। তৃতীয়ত, কাম্য পন্থায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি-ঋণ সরবরাহেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষিগত মূলধন-সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ

ইহার মধ্যে প্রথম করণীয় বা আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইল কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রশ্ন, যাহার আলোচনা কৃষিকার্য সংক্রান্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে করা হইতেছে। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যা—অর্থাৎ কৃষি-ঋণের সমস্যা (Problem of Agricultural Debt) ও কৃষিঋণ ব্যবস্থার সমস্যা (Problem of Agricultural Credit) এবং ইহাদের সমাধান সম্পর্কেই আলোচনা করা হইবে।

দুই প্রকার সমস্যা

কৃষি-ঋণের সমস্যা (Problem of Agricultural Debt) : ভারতের কৃষকশ্রেণী পুরুষানুক্রমে আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া আছে। বলা হয়, ভারতীয় কৃষক ঋণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, ঋণ লইয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং ঋণগ্রস্ত হইয়াই মারা যায়। মহাজনের নিকট হইতে একবার ঋণ করিলে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিশোধ করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না ; সুদ দিতে দিতেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। অনেক সময় আবার সুদও সে মিটাইয়া দিতে পারে না। ফলে ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেই থাকে। তারপর একদিন ঋণভার পুত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া ভারতীয় কৃষক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগত ঋণভার

কৃষি-ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি (Volume and Nature of Agricultural Debt) : বিভিন্ন সময়ে ভারতের কৃষি-ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক পরিক্রমায় দেখিলে কৃষি গ্রামাঞ্চলের ঋণের (Rural Debt or Rural Indebtedness) বর্ধমান প্রকৃতিতে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। দেখা যায় যে, ১৯১১ সাল হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে গ্রামাঞ্চলের ঋণের পরিমাণ ছয় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল—ইহা ৩০০ কোটি টাকা হইতে ১,৮০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

১৯১১-১৯৩৭ সালের মধ্যে কৃষি-ঋণের বৃদ্ধি

বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়নের কৃষি-ঋণের পরিমাণ কত তাহা হিসাব করা হয় নাই। ১৯৫১ সালে নিযুক্ত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি (All-India Rural Credit Survey Committee) মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে জরিপকার্য সমাধা করে। সুতরাং ইহার পক্ষে কৃষি-ঋণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা সম্ভব হইলেও, সমগ্র ভারতে মোট ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত কমিটি কিন্তু ভারতীয় কৃষকগণের মোট বাৎসরিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা (total annual requirement) সম্বন্ধে একটি হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা হইল ৭৫০ কোটি টাকা—অর্থাৎ সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য জরিপ কমিটির হিসাব অনুসারে ভারতীয় কৃষকগণের পক্ষে বৎসরে মোট ৭৫০ কোটি টাকার মত ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়।*

বর্তমানে কৃষি-ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন হিসাব নাই

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে বর্তমান গ্রাম্য ঋণের নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের সময়ে কৃষিজ দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে কৃষকের অবস্থার উন্নতির দরুন কৃষি-ঋণের পরিমাণ কতকটা কমিয়াছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে সকল হিসাব করা হইয়াছে তাহা এই অভিমতকেই সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৬ সালের বোম্বাই-এর সারাইয়া কমিটি (Saraiya Committee) এবং মাদ্রাজে ডাঃ নাইডুর অনুসন্ধানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সারাইয়া কমিটি দেখিয়াছিল যে, বোম্বাই রাজ্যে বড় বড় কৃষকদের ঋণ ৫০ ভাগ কমিয়াছে। ডাঃ নাইডুর হিসাবে মাদ্রাজ প্রদেশে মোট কৃষি-ঋণের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

মূল্যবৃদ্ধির দরুন যুদ্ধোত্তর যুগে ঋণের পরিমাণহ্রাস

তবে অনেকে বলেন যে, কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বড় বড় কৃষকেরই ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ কমিয়াছে, সকলের নহে। সাধারণ কৃষকের পক্ষে পরিবারের ভরণপোষণ এবং কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ব্যয় মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না বলিলেই চলে। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধি ঘটিল কি না-ঘটিল তাহাতে তাহার কিছুই যায় আসে না। বরং বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে তাহার পক্ষে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে - ঋণ পরিশোধ করার কথা চিন্তা করা ত' দূরের কথা। সারাইয়া কমিটি, ডাঃ নাইডু প্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মূল্যবৃদ্ধির দরুন মাত্র শতকরা ৬ ভাগ কৃষক লাভবান হইয়াছে। তবে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি মতে, ছোট ছোট ক্ষেত্রে ঋণের মোট পরিমাণ বা অর্থভার (money burden) যুদ্ধের সময় বিশেষ বাড়ে নাই। অপরদিকে বরং ঋণের আসল ভার (real burden) বহুলাংশে কমিয়াছে।** এইজন্য উক্ত কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, ভারতীয় কৃষিজীবী তাহার ঋণ পূর্বাপেক্ষা সহজে বহন করিতে সমর্থ।

ঋণের আসল ভার হ্রাস

* All-India Rural Credit Survey Committee—Report Vol. II. P. 156.

** All-India Rural Credit Survey—Report 1. P. 19.

ভারতের কৃষি-ঋণ সামান্য মাত্রায় ভিন্ন প্রকৃতির হইলে ইহার পরিমাণ লইয়া এত আলোচনার প্রয়োজন মোটেই হইত না। প্রত্যেক দেশেই কৃষককে ঋণ করিতে হয়। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই; আপাতদৃষ্টিতে ইহা কোন সমস্যাও নহে। কৃষিজীবিগণের সংখ্যার তুলনায় ভারতে কৃষি-ঋণের পরিমাণও অত্যধিক নহে। তবে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ সমান্তরালবিহীন বলা চলে। ভারতীয় কৃষক সকলসময় কৃষিকার্য সম্পাদনের জন্য ঋণ গ্রহণ করে না; দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং মামলা-মকদ্দমা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক কারণেও ঋণগ্রস্ত হয়। ফলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এই সকল ঋণ পরিশোধের উপায় থাকে না। কোন উদ্বৃত্তও তাহার থাকে না বলিয়া ঋণভার ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে তাহার বুকে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসে।

কৃষি-ঋণের প্রকৃতি

ঋণগ্রস্ততার কারণ (Causes of Indebtedness):—ভারতে কৃষি-ঋণের প্রাথমিক কারণানুসন্ধানে অধিক দূর যাইতে হয় না। লোকের আয় অপেক্ষা ব্যয় যখন অধিক হয় তখনই সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সাধারণ সত্যটি ভারতীয় কৃষকের বেলায় বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এক কথায় বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষকের চরম দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলের ঋণের বিপুলতার কারণ। ভারতে কৃষিকার্য অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা, মূলধনের অভাব, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের অব্যবস্থা, অন্যান্য উপজীবিকার অভাব প্রভৃতি ভারতীয় কৃষিকে মুনাফাবিহীন করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রসংগে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন, "যে-দেশে কৃষিকার্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা লইয়া জুয়াখেলা মাত্র এবং যেখানে প্রতি চার অথবা পাঁচ বৎসরের মধ্যে এক বৎসর অজন্মা হইবেই সেখানে কৃষক, যে স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরে কোনমতে দিন গুজরান করে, অজন্মার বৎসরে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেই।"* অজন্মার বৎসরে যদি তাহার পক্ষে আবার বীজ বা চাষের বলদ ক্রয় করিবার অথবা বসবাসগৃহ মেরামত করিবার প্রয়োজন হয় তবে ঋণের পরিমাণ বিশেষ বর্ধিত আকার ধারণ করিবেই। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখান হইয়াছে যে, ছোট ছোট কৃষকের ঋণের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হইল পরিবারের ব্যয়নির্বাহ করিবার জন্য।**

১। কৃষকের চরম দারিদ্র্য

এক দিক দিয়া কৃষকের দারিদ্র্য যেরূপ তাহার ঋণগ্রস্ততার কারণ অন্যদিক দিয়া তাহার ঋণগ্রস্ততাও আবার তাহার দারিদ্র্যের কারণ। পুরুষানুক্রমে যে-ঋণ কৃষকের স্কন্ধে চাপান আছে তাহা তাহাকে অনেকাংশে দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। পিতৃঋণের সুদ প্রদান করিবার জন্যই কৃষককে অনেক সময় ঋণ করিতে হয়; এবং একবার ঋণ করিলে অধিকাংশ সময় সারা জীবনেও ইহা পরিশোধ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত

২। পুরুষানুক্রমিক ঋণ

* Wadia and Merchant—Our Economic Problem, Ch. 12.

** All-India Rural Credit Survey Report I. P. 25.

কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯২৯ সালের ৯০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার উপর ছিল পিতৃপুরুষের ঋণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রামাঞ্চলের ঋণ সম্পর্কে একটি দূরতিক্রম্য চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষক দরিদ্র বলিয়াই সে ঋণগ্রস্ত, এবং ঋণগ্রস্ত বলিয়াই সে দরিদ্র।

৩। কৃষকের ব্যয়-বাহুল্য

তৃতীয়ত, ব্যয়বাহুল্যকেও কৃষিগত ঋণের অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। সাধারণত মামলা-মকদ্দমা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয় কৃষক অবিবেচকের ন্যায় ব্যয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি দেখাইয়াছিল যে, মাত্র কতিপয় ক্ষেত্রেই কৃষক কৃষি-জমি উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ কমিটি ইহাও উল্লেখ করিয়াছিল যে, কৃষি-ঋণ অনুৎপাদনশীল হওয়ার জন্য কৃষি-জমি মহাজনদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া ভূমিহীন সর্বহারার (landless proletariat) সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টেও * সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে কৃষক যে ঋণ করিয়াও অপব্যয় করে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

৪। ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক হার ও ইহার আদায়ের সময়

চতুর্থত, ভারতে ভূমি-রাজস্বের অত্যধিক হার এবং ইহা আদায়ের সময় কৃষি-ঋণের আর একটি কারণ। ভূমি-রাজস্বের হার অধিক বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে কৃষককে সুজন্মার বৎসরেও ঋণ করিয়া ইহা মিটাইতে হয়। অজন্মার বৎসরেও তাহাকে ইহা হইতে রেহাই দেওয়া হয় না। ইহার উপর আবার ফসল বাজারে বিক্রীত হইবার পূর্বেই ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হয়। ফলে কৃষককে মহাজনের নিকট ফসল বন্ধক রাখিয়া ঋণ সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাতে সে তাহার ফসলের উচিত মূল্য পায় না ; এবং স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

সম্প্রতি অবশ্য কর তদন্তকারী কমিশন (Taxation Enquiry Commission) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে আর উল্লেখযোগ্য নহে। তবুও বলা যায়, ভূমি-রাজস্বের হার পুরুষানুক্রমিক ঋণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। এই কারণে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্বের হার কমাইবার নীতি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে গৃহীত হইয়াছে।

৫। বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব

পঞ্চমত, বিভিন্ন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগিগণ কৃষকের ঋণগ্রস্ততার পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। মধ্যস্বত্বভোগিগণের অস্তিত্বের দরুনই বহুলাংশে কৃষিকার্য মুনাফাহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনেকক্ষেত্রে জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, কৃষকের পক্ষে মধ্যস্বত্বভোগিগণের দাবি মিটাইয়া তাহার নিজের পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করাই কঠিন হইয়া উঠিত। সুতরাং অনাহারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার পক্ষে অবলম্বনীয় একটিমাত্র পন্থা ছিল ঋণ করিয়াও কৃষি-জমির পরিমাণ বাড়ান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ইহাই করিত।

* Certain Aspects of Co-operative Movement in India—1958.

পরিশেষে আছে গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা। দারিদ্র্য এবং অন্যান্য কারণে কৃষকের ঋণের প্রয়োজনীয়তা যে-চক্রের সূচনা করিয়াছে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে ঋণদাতা হিসাবে গ্রাম্য মহাজন দ্বারা। গ্রাম্য মহাজনের অস্তিত্ব যদি না থাকিত তবে কৃষকের পক্ষে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধাও থাকিত না। কারণে-অকারণে সে যখন-তখন ঋণ গ্রহণ করিয়া ইহার ভারে প্রপীড়িত হইত না; ফসল বন্ধক রাখিয়া বাজার অপেক্ষা অল্প দামে ইহা বিক্রয় করিতেও সে বাধ্য হইত না।

৬। গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা

পূর্বে গ্রাম্য মহাজনকে নিয়ন্ত্রণ করিত সামাজিক প্রথা। এইরূপ প্রথা ছিল যে মহাজন যে-টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করিত সুদসমেত কোনমতেই তাহার দ্বিগুণের অধিক আদায় করিতে পারিত না। কালক্রমে এই সকল প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যায়; গ্রাম্য সমাজের অনুশাসনও শিথিল হইয়া পড়ে। ফলে মহাজনের পক্ষে নীতি-বিগর্হিত ব্যবহারের পথ ক্রমে সুগম হইয়া উঠে; হিসাবের সুকৌশল পরিবর্তনসাধন (manipulation of accounts) এবং অন্যান্য উপায়ে প্রবঞ্চনার পন্থাও সে ক্রমশ অবলম্বন করিতে থাকে। ইহার উপর অর্থশালী বলিয়া প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থায় তাহার পক্ষে প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য সকল অর্থ আদায় করিবার সুবিধা থাকায় গ্রাম্য মহাজন সুদখোর ও প্রবঞ্চকের ভূমিকায় দরিদ্র অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য কৃষককে শোষণ করিতে থাকে।

কৃষি-ঋণের কারণের উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলেন, "গ্রাম্য ঋণের কারণ হিসাবে অমিতব্যয়িতা ও কলহস্পৃহাকে নির্দেশ করিয়া হতভাগ্য কৃষককে অপরিণামদর্শী বলিয়া অকারণে অপরাধী করিলে সুস্পষ্ট অনুধাবনের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইবে।" কৃষি-ঋণের প্রধান কারণ মুনাফাহীন কৃষিকর্ম। যে অসম্বদ্ধ জোতে কৃষক ঋণভার বহন করিয়া চলিতেছে তাহা হইতে মুনাফা লাভ করা বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সম্ভব নয়—এমনকি ইহা হইতে দৈনন্দিন অন্নসংস্থানও করা কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থা অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশীল থাকিলেও ইহাকে বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। "কিন্তু ভারতীয় কৃষককে যখন বিশ্বের বাজার দামের ঘূর্ণাবর্তে টানিয়া আনা হইয়াছে তখন তাহার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মেনী প্রভৃতি দেশের কৃষকশ্রেণীর ন্যায় সংগঠন বা ঋণ-ব্যবস্থার কোন সুবন্দোবস্ত করা হয় নাই।"*

উপসংহার—কৃষি-ঋণের দুইটি প্রধান কারণ

১। মুনাফাহীন কৃষিকর্ম

২। ঋণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাব

অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট প্রদর্শিত দ্বিতীয় কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষক আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিশ্বের বাজারে কৃষিজ পণ্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত তাহার ভাগ্য বিজড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাটের দাম সহসা যদি কমিয়া যায় তবে ইহা ভারতীয় কৃষককে আঘাত করিবে। কিন্তু আঘাত সহ্য করিবার জন্য, প্রতিযোগী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য যে সংগঠনগত

* Wadia and Merchant—Our Economic Problem. Ch. 12

শক্তির প্রয়োজন, যে সহজপ্রাপ্য ঋণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহা ভারতীয় কৃষকের আয়ত্তাধীন নহে। ফলে কোন কিছু ঘটিলেই তাহাকে মূর্তিমান অকল্যাণ গ্রাম্য মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। কৃষি অস্তিত্ব বজায়ের সংগঠন বলিয়া একবার ঋণগ্রহণ করিলে ইহা হইতে কৃষকের আর পরিত্রাণ নাই। তাহার ঋণভার ক্রমশই বাড়িতে থাকে।

কৃষি-ঋণের প্রতিবিধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধান (Measures adopted to tackle the Problem of Rural Indebtedness) : ভারতে কৃষি-ঋণের সমস্যা সম্বন্ধে সরকার প্রথম সচেতন হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ইহার ফলে ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী পরিত্রাণ আইন (Deccan Agriculturists Relief Act, 1879) পাস হয়। এই আইনের দ্বারা সুদের অত্যধিক হার হ্রাস করা হইয়াছিল এবং মহাজনদিগকে রীতিমত হিসাবপত্র রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। উপরন্তু, দায়াবদ্ধ না থাকিলে কৃষকের নিকট হইতে জমির হস্তান্তরিকরণও নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহার পর ১৮৮৩ সালে ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন (Land Improvement Loans Act, 1883) এবং ১৮৮৪ সালে কৃষিজীবী ঋণ আইন (Agriculturists Loans Act, 1884) প্রণীত হয়। প্রথমোক্ত আইনটির দ্বারা কৃষি-জমি উন্নয়নের জন্য কৃষিজীবিগণকে দীর্ঘকালীন ঋণ দিবার এবং দ্বিতীয়োক্ত আইন দ্বারা চলতি খরচ মিটানর জন্য অল্পমেয়াদী ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হইল ১৯০১ সালে পাঞ্জাবের জমি হস্তান্তরিকরণ আইন (The Punjab Land Alienation Act, 1901)। এই আইনের দ্বারা অ-কৃসিজীবিগণের নিকট কৃষি-জমি হস্তান্তরিকরণ এবং ২০ বৎসরের অধিক জমিকে দায়াবদ্ধ রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় আন্দোলনের প্রচেষ্টাই হইল গ্রাম্য ঋণগ্রস্ততার বিরুদ্ধে অবলম্বিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে সমবায় আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ১৯০৪ সালে সরকার সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাস করে। ১৯১২ সালে এই আইনকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের (worldwide trade depression) ফলে ঋণগ্রস্ত হিসাবে ভারতীয় কৃষকের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। ফলে বিভিন্ন প্রদেশে ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আইন দ্বারা ঋণের পরিমাণ কমান, ঋণসালিসির ব্যবস্থা করা, মহাজনদিগকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রভৃতি হইল অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ।

স্যর এডওয়ার্ড ম্যাক্ল্যাগ্যানকে (Sir Edward Maclagan) অনুসরণ করিয়া কৃষি-ঋণের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় : (ক) অনর্থক ঋণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ ; (খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমূহ ; (গ) জমি হস্তান্তরিকরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাসমূহ ;

অবলম্বিত ব্যবস্থা-সমূহের শ্রেণীবিভাগ

(ঘ) ঋণ সরবরাহের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ; (ঙ) ঋণসালিসি এবং ঋণভার হ্রাসের ব্যবস্থাসমূহ; এবং (চ) কৃষককে সাহায্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ।

(ক) অনর্থক ঋণগ্রহণ রহিত করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures adopted to encourage the avoidance of unnecessary debts): কৃষিজীবিগণ যাহাতে অনর্থক অনুৎপাদনশীল ঋণগ্রহণ করিয়া ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হইল শিক্ষার প্রসার। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদিগের অজ্ঞতা দূর করিয়া অনেকাংশে তাহাদিগকে অনর্থক ঋণগ্রহণের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়াও সমবায় সমিতিগুলি এদিকে কিছু কিছু কার্য করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচারকার্যও চালান হইয়াছে। তবে গ্রাম্য ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই এখনও এই শিক্ষাবিস্তার, প্রচারকার্য বা সমবায় সমিতির সংশ্রবে আসে নাই। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে এই দিকে কিছু কিছু কার্য করা হইলেও বিশেষ কিছু করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

শিক্ষার প্রসার, প্রচার ইত্যাদি

(খ) দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for the improvement of civil law): কৃষি-ঋণ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধির সংগে সংগেই সরকার দেওয়ানী আইনের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়। পূর্বোল্লিখিত দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবী পরিত্রাণ আইন দ্বারা ঋণ পরিশোধ না করিলে কারারুদ্ধ করিবার যে-ব্যবস্থা ছিল তাহা বিলুপ্ত করা হয়। ইহা ছাড়াও ঋণের পরিমাণ ও সুদের হার হ্রাস করিবার এবং দায়াবদ্ধ না থাকিলে জমি হস্তান্তরিকরণ রহিত করিবার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয়। ১৯১৮ সালের সুদখোরী আইন (Usurious Loans Act, 1918) দ্বারা কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার হ্রাস করা হয়। ১৯২৯ সালে মন্দাবাজারের পর মহাজনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকাংশ প্রদেশই মহাজনী আইন পাস করে।

(গ) জমি হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ব্যবস্থাসমূহ (Measures for restricting alienation of land): কৃষিজীবিগণের নিকট হইতে কৃষি-জমি অ-কৃষিজীবিগণের নিকট হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ১৯০১ সালে পাঞ্জাবে। ইহার পর ১৯৩৮ সালে প্রণীত বিহার মহাজনী আইন (Bihar Money-lenders Act, 1938) জোতের একটি ন্যূনতম মাত্রা নির্ধারিত করিয়া দেয়, যাহা কোনমতেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃষকের নিকট হইতে হস্তান্তরিত করা যাইবে না। দাক্ষিণাত্যের কৃষিজীবী পরিত্রাণ আইনের দ্বারা জমি হস্তান্তরিকরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়ায় জোতের আয়তনবৃদ্ধির সম্ভাবনা সংকুচিত হইয়া পড়ে। ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য ব্যাহত হইতে থাকে। উপরন্তু, এইরূপ

আইন সকল সময় কৃষকের নিকট হইতে কৃষিজীবী মহাজনদের (agriculturist money-lenders) নিকট জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে নাই। ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ভূমিহীন হইতে থাকে কিন্তু কৃষিজীবী মহাজনগণের জোতের আয়তন দিন দিন বাড়িতে থাকে।

এই ব্যবস্থার কুফল

(ঘ) ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures undertaken with the object of providing credit to agriculturists): জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ, মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সংগে সংগে কম সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। অল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে তাকাভি ঋণ আইন (Taccavi Loans Act) পাস করা হয়। সাধারণত অজন্মার বৎসরে এবং কৃষিকার্যের জন্য মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই ঋণ প্রদান করা হইত। তাকাভি ঋণ জটিল অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ ছিল এবং প্রয়োজনের তুলনায় অত্যল্প ছিল বলিয়া ইহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই।

তাকাভি ঋণ

তাকাভি ঋণ ছাড়া ভূমি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকগণ ভূমি উন্নয়ন ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত না হওয়ায় এই ব্যবস্থাও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন

সরকারী ঋণ যে কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না ইহা উপলব্ধি করিয়া সরকার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমবায় আন্দোলনের সূচনা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে প্রথম এবং ১৯১২ সালে দ্বিতীয় আইন পাস করা হয়। সমবায়ের ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাংকেরও প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু সমবায় আন্দোলনও বিশেষ সার্থক না হওয়ায় গ্রাম্য মহাজনের উপর কৃষিজীবীর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে অব্যাহতই থাকে।

সমবায় আন্দোলন

(ঙ) ঋণসালিসি এবং ঋণভার হ্রাসের ব্যবস্থাসমূহ (Measures for debt conciliation and liquidation): উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই শতাব্দীর বিশ্ব-ব্যাপী মন্দাবাজার সংঘটিত হইবার পূর্বে অবলম্বিত হইয়াছিল। মন্দাবাজারের ফলে দেখা গেল যে কৃষিজীবিগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ইহার প্রতি-কারার্থে অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবিলম্বেই প্রয়োজন। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং অনুসন্ধান কমিটির (Central Banking Enquiry Committee) সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে ঋণসালিসি ও ঋণভার হ্রাসের (liquidation) জন্য আইন পাস করা হয়। কৃষকের ঋণভার হ্রাস করিবার জন্য আপোষ-মীমাংসার পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হইলেও কয়েক স্থানে ইহা বাধ্যতামূলক করা হয়।

ঋণসালিসি ও ঋণভার হ্রাসের আইন

(চ) কৃষককে সাহায্য ও কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ (Measures to help the agriculturists and to effect improvement in agri-culture): কৃষির উন্নতির মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিই হইল কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার শ্রেষ্ঠ

প্রতিকার। বলা চলে, এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৮৮৪ সাল হইতেই প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ঐ সালে প্রথম কৃষি-বিভাগ (Department of Agriculture) স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ভারত যে খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন হয় তাহার ফলে কৃষিগত উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ইহার প্রথম পর্যায়ে কৃষির উন্নতির উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ঋণ সংক্রান্ত আইনের ফলাফল (Effects of Debt Legislation): বিভিন্ন প্রদেশের সাম্প্রতিক ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি দ্বারা কৃষি-ঋণের সমস্যাকে দুই দিক দিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথমত, ঋণের পরিমাণকে সালিসির মাধ্যমে বা বাধ্যতামূলকভাবে কমাইয়া ইহাকে কৃষিজীবীর পরিশোধের ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, মহাজনগণের অপপদ্ধতি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে ভবিষ্যতে আর ঋণভারের বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। বলা যায়, এই উভয় দিক দিয়াই ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যক্ষেত্রে একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে।

ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

সালিসির মাধ্যমে ঋণভার হ্রাস করিবার যে-ব্যবস্থা তাহা সালিসি পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ত্রুটির দ্বারা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। অশিক্ষিত কৃষকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালিসির সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে নাই। শক্তিশালী মহাজনগণ বার বার অন্যায় ও বে-আইনীভাবে সালিসিকে কার্যকর করিবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দিলেও দারিদ্র্য হেতু তাহা পরিশোধ করিয়া উঠা অধিকাংশ কৃষিজীবীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে চুক্তিভংগের অজুহাতে সালিসি ব্যর্থ হইয়াছে।

বাধ্যতামূলকভাবে ঋণভার হ্রাস এবং মহাজনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা গ্রামাঞ্চলের ঋণগ্রস্ততার সমস্যাকে (problem of rural indebtedness) কিছুটা সরল করিলেও ঋণ সরবরাহের সমস্যাকে (problem of supply of credit) আরও জটিল ও গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। মহাজনগণ এখন আর তাহাদের বিশ্বস্ত খাতক ছাড়া কাহাকেও ঋণদান করিতে চাহে না। বিশ্বস্ত খাতকগণের বেলাতেও তাহারা নানারূপ নূতন অপপদ্ধতি অবলম্বন করে—যথা, অল্প ঋণ দিয়া অধিক ঋণের খত লিখাইয়া লয়, ঋণপ্রদানের সময়ই ঋণের টাকা হইতে সুদ কাটিয়া লয়, বিক্রয় কবালা লিখাইয়া লইয়া জমি বন্ধক হিসাবে রাখে, ইত্যাদি।

ঋণ সংক্রান্ত আইন ঋণ সরবরাহের সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে

বলা হয়, ঋণ সংক্রান্ত আইন এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের সূত্রকে সংকুচিত করিয়া একদিক দিয়া ভালই করিয়াছে—কারণ ইহাতে অনুৎপাদনশীল ঋণের সম্ভাবনা বিশেষ মাত্রায় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া ইহা যে কৃষকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ঋণগ্রহণ ব্যাহত করিয়াছে তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। গুণাগুণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া একজন লেখক

উপসংহার

এই উক্তি করিয়াছেন যে, "ঋণ সংক্রান্ত আইনগুলি মাত্র এ্যাম্বুলেন্সের কার্য করিয়াছে।" ইহারা আহত স্থানকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া প্রতিষেধকও প্রদান করিয়াছে যাহাতে ক্ষতের আর বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে; কিন্তু রোগের উৎসকে নির্মূল করিতে পারে নাই। বস্তুত, বর্তমান গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থায় গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকাকে কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। গ্রাম্য মহাজন থাকিলেই তাহার সংগে তাহার অপপদ্ধতি থাকিবেই। সুতরাং প্রয়োজন হইল নূতন করিয়া গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থাকে সংগঠিত করিবার। আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রচেষ্টাই করা হইতেছে। এবং এখন এই সম্পর্কেই আলোচনা করা হইবে।

কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার সমস্যা (Problem of Agricultural Credit): মোটামুটিভাবে ভারতীয় কৃষকের পক্ষে দুই প্রকার ঋণের প্রয়োজন হয়—(১) কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার জন্য, এবং (২) মামলা-মকদ্দমা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার জন্য। বীজরোপণ ইত্যাদির সময়ে সংসারনির্বাহের ব্যয়ও কৃষিকর্ম পরিচালনা করিবার ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণকেও কৃষিকর্মের জন্য ঋণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কৃষিকর্মের জন্য ঋণকে উৎপাদনশীল ঋণ এবং অন্যান্য কারণে গৃহীত ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়।

প্রয়োজনীয় কৃষি-ঋণের প্রকৃতি

উৎপাদনশীল ঋণ আবার তিন প্রকারের হইতে পারে। অল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী। অল্পমেয়াদী ঋণ হইল কয়েক মাসের জন্য। সাধারণত শস্য রোপণের সময় বীজ, সার ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য এবং সংসারযাত্রা ও অন্যান্য আনুষংগিক ব্যয়নির্বাহের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া সেই বৎসরে ইহা পরিশোধ করাও হয়। মধ্যমেয়াদী ঋণ কূপ খনন এবং বলদ ইত্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দুই হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য গ্রহণ করা হয়। স্বভাবতই ইহা ঐ সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিশোধ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সময় হইল দশ হইতে বিশ বৎসর। ইহা কৃষক পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, কৃষি-জমি ক্রয়ের জন্য অথবা কৃষি-জমির উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করে। ঐ দীর্ঘ সময়ে সে ধীরে ধীরে কিস্তিতে ঐ ঋণ পরিশোধ করে।

কৃষিগত ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র (Different Agencies for Supply of Agricultural Credit): ভারতে কৃষিজীবী নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে তাহার প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করে—যথা, পেশাদার মহাজন, কৃষিজীবী মহাজন, আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসাদার, সরকার, সমবায় সমিতি প্রভৃতি। ইহার উপর অবশ্য জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিও কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া থাকে।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির (All-India Rural

Credit Survey Committee) রিপোর্ট অনুসারে উপরি-উক্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে নিম্নলিখিত অনুপাতে গ্রামাঞ্চলের ঋণ সংগৃহীত হয় :

ঋণ সরবরাহের বিভিন্ন সূত্র	ঋণ সরবরাহের অনুপাত শতকরা ভাগ
১। পেশাদার মহাজনগণ	৪৪.৮
২। কৃষিজীবী মহাজনগণ	২৪.৯
৩। আত্মীয়-স্বজন	১৪.২
৪। ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ	৫.৫
৫। সরকার	৩.৩
৬। সমবায় সমিতিসমূহ	৩.১
৭। জমিদারগণ	১.৫
৮। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	০.৯
৯। অন্যান্য	১.৮
	১০০.০

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে এখনও প্রভুত্ব করিতেছে পেশাদার ও কৃষিজীবী মহাজনগণ; এখনও মোট গ্রামাঞ্চলের ঋণের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ইহারাই সরবরাহ করিয়া থাকে।*

মহাজনগণ এখনও প্রধান-সূত্র

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্বে কৃষিঋণ-ব্যবস্থায় গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা সম্বন্ধে একটু স্বতন্ত্র ধারণা বর্তমান ছিল। মনে করা হইত, বিভিন্ন রাজ্যে ঋণ সংক্রান্ত আইনের ফলে গ্রাম্য মহাজনগণ কার্যক্ষেত্র হইতে অনেকটা সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে, তাহাদের আধিপত্য এখনও একরূপ অব্যাহত রহিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের ঋণের যোগানে গ্রাম্য মহাজনের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। এ-সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান বা জরিপ কমিটি বলিয়াছে, "যদিও বা গ্রাম্য মহাজনগণ বিশেষভাবে অনুভূত অন্যতম অভাব পূরণ করে, তবুও তাহারা বৃহদায়তনে উৎপাদন এবং গ্রামাঞ্চলের সম্পদের যোগ্য বণ্টনের কোনরূপ সহায়ক নহে।" গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থার এই সূত্রের প্রধান ত্রুটি হইল যে, মহাজনগণের সুদের হার অত্যন্ত বেশী। উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা আবার মহাজনীর সহিত কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্যও করিয়া থাকে। ফলে তাহারা সামগ্রিকভাবে গ্রাম্য অর্থ ও ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়। এই সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল যে, তাহারা এই কার্যে সমগ্র দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী

মহাজনের এই ভূমিকা অবাঞ্ছনীয়

* All-India Rural Credit Survey—General Report (Vol. II)-এর ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা।

(Indigenous Bankers), নগরাঞ্চলের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে পূর্ণ সহায়তা পাইয়া থাকে।

ব্যবসায়ীদের ভূমিকা

গ্রামাঞ্চলের ঋণ সরবরাহের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইল ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ। মহাজনশ্রেণী হইতে ইহাদের পার্থক্য এইখানে যে, মহাজনীই হইল মহাজনদের প্রধান ব্যবসা এবং ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্য গৌণ মাত্র; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর বেলায় ক্রয়বিক্রয়ই মুখ্য ব্যবসা এবং এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া দাদন দিতে হয় বলিয়া মহাজনী কারবার করিতে হয়। দাদন দিয়া ফসল অগ্রিম ক্রয় করিয়া লয় বলিয়া কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর তাহাদের নিয়ন্ত্রণও ব্যাপক। এই দিক দিয়া তাহারা গ্রাম্য মহাজনগণের প্রতিদ্বন্দ্বী।

সরকারের ভূমিকা

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার যে-ভূমিকায় গ্রাম্য মহাজনগণ অবতীর্ণ হইয়াছে সেই ভূমিকা সরকারের পক্ষেই গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকার বর্তমানে মোট প্রয়োজনীয় ঋণের সামান্য এক অংশ—মাত্র শতকরা ৩'৩ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। উপরন্ত অন্যান্য কারণেও সরকারী ঋণ বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। কমিটির মতে, তাকাভি ঋণের (Taccavi Loans) ন্যায় সরকারী ঋণকে অকাম্যতা ও অপর্যাপ্তির চরম দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। (ক) পরিমাণে ইহা অ-পর্যাপ্ত, বণ্টনে ইহা অন্যায্য এবং নিরাপত্তার দিক দিয়া অনুপযুক্ত; (খ) ঋণ প্রদান ও আদায়ের দিক হইতে ইহা অসুবিধাজনক এবং আনুষংগিক ও অন্য নানা প্রকার ব্যয়ভারাক্রান্ত; (গ) তদারকের দিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ দক্ষতাবিহীন এবং সামঞ্জস্যের দিক দিয়া অসম্পূর্ণ।

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা

সমবায় সমিতিগুলির ঋণ সরবরাহের পরিমাণ হইল আরও অল্প। তাহারা মোট ঋণের মাত্র শতকরা ৩'১ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই শতকরা ৩'১ ভাগ ঋণেরও অধিকাংশ বড় বড় কৃষিজীবীর হস্তগত হয় এবং সামান্য অংশমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় সমবায় সমিতিগুলির এইরূপ অবিশ্বাস্য লঘু ভূমিকা অনুধাবনের পর একটিমাত্র অভিমত প্রদান করা যাইতে পারে—এবং ইহা হইল "অর্ধ শতাব্দী অভিযানের পর ভারতে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা।" ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় যে, ১৯০৪ সাল হইতে যখন প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit Societies Act, 1904) পাস হয় তখন হইতে ১৯৫৪ সাল* পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন চালাইয়া সমবায় সমিতিগুলি হইতে গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনীয় ঋণের মাত্র শতকরা তিন ভাগ সরবরাহ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাকে আন্দোলনের ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বলা যাইবে?

* গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (Remedial Measures): গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইলেও ইহাকেই এখন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে এবং ইহার ভিত্তিতেই গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার নূতন কাঠামো প্রস্তুত করিতে হইবে। কমিটি এই নূতন কাঠামো বা ব্যবস্থার নাম দিয়াছে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit)।

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনায় সমবায়কেই ভিত্তি করা হইয়াছে। কারণ, সরকারী ঋণ বিশেষভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং মহাজনগণ দ্বারা সংগঠিত ব্যক্তিগত ঋণ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে অকাম্য। সুতরাং প্রয়োজন হইল সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগত ঋণ-ব্যবস্থার (System of Institutional Credit)।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি-অনুমোদিত গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার প্রতি স্তরে আছে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ (State Partnership)।—অর্থাৎ রাজ্যসরকারগুলিকে বিভিন্ন স্তরে সমবায় সমিতির অংশীদার হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সমবায় ঋণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে—বিশেষ করিয়া ঋণপ্রদানের সহিত শস্য বিক্রয়করণ ও বিক্রয়-যোগ্যকরণ (marketing and processing) ব্যবস্থা সংযুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়ত, পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে বৃহদায়তন প্রাথমিক সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। চতুর্থত, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য দেশের সর্বত্র পণ্য সংরক্ষণের (warehousing) ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিশেষে, সর্বস্তরে সমবায় কর্মীদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

পরিকল্পনার অংগ

গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার আর একটি অংগ হিসাবে কমিটি রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সৃষ্টি করিতে বলে যাহার শাখা-প্রশাখা দেশের সর্বত্র থাকিবে এবং যাহার উপর পরোক্ষ অথচ সুস্পষ্টভাবে গ্রাম্য-ঋণ ও কৃষিজপণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়ন-দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে। কমিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ এবং ইহার সহিত হায়দরাবাদ ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক প্রভৃতি রাজ্যসরকার সম্পর্কিত ব্যাংকগুলিকে (State-associated) সংযুক্ত করিয়াই এই বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠনের সুপারিশ করিয়াছিল।

রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য কমিটি রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে একটি 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' [National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund] নামে একটি তহবিল গঠন করিতে নির্দেশ দেয়। এই তহবিল হইতেই রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্যসরকারগুলিকে সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদার হইবার জন্য ঋণপ্রদান করিবে। ইহা ছাড়া কমিটি রাজ্যসমবায় ব্যাংকসমূহকে মধ্যমেয়াদী ঋণপ্রদানের জন্য একটি

দুইটি তহবিল

'জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল' [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] সৃষ্টির সুপারিশ করে'। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা ইত্যাদির বৎসরে স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিণত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য-সমবায় ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করিবে।

জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল হইতে ঋণ লইয়া প্রত্যেক রাজ্যসরকার রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে একটি করিয়া সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। এইভাবে প্রণীত সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিবার জন্য এবং কৃষিজপণ্য সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য কমিটি একটি 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড' (National Co-operative Development and Warehousing Board) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। উপরন্তু, কমিটির মতে, প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (State Warehousing Corporation) স্থাপিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড

সুপারিশগুলির মূল্য নির্ধারণ (Appraisal of the Recommendations) : গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি গতানুগতিক নহে। ইহার মূলে আছে পটভূমিকার পরিবর্তন। পূর্বে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়া কিছুই ছিল না। তাই বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে প্রতিবিধান অনুমোদন করা হইত। বর্তমানে ত' আর ইহা চলিতে পারে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সুপারিশও সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া নগরাঞ্চলের শিল্পে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যেই গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইত। বর্তমানে কিন্তু পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজনেই ঐ অঞ্চলের সঞ্চয়ের ব্যবহারের অনুমোদন করা হয়। এমনকি গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নগরাঞ্চল হইতে সঞ্চয় লইয়া গিয়াও গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছে।

সুপারিশগুলি গতানুগতিক নহে

যে পরিবর্তিত পটভূমিকার উল্লেখ করা হইয়াছে—অর্থাৎ যে-বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি গ্রামাঞ্চলের ঋণের উপরি-উক্ত পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে তাহা হইল আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় গৃহীত কৃষিজ উন্নয়নের জন্য গতিশীল কার্যক্রম (dynamic programme of agriculture)। ভারতের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিবার জন্য কৃষির উন্নয়নের এই গতিশীল কার্যক্রম অপরিহার্য। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, এই গতিশীল কার্যক্রমকে সফল করিবার জন্য আবার অপরিহার্য হইল একটি গতিশীল কৃষিঋন-ব্যবস্থার (dynamic programme of agricultural credit)।

কৃষির উন্নয়নের গতিশীল কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন গতিশীল কৃষি-ঋণ ব্যবস্থা

এই ঋণ-ব্যবস্থাকে গতিশীল বলা হইয়াছে, কারণ ইহাকে উত্তরোত্তর বর্ধমান কৃষি-ঋণের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে হইবে। ইহা অবশ্য গ্রাম্য মহাজনকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করিতে পারিবে না; তাহার প্রয়োজনও নাই। গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় মহাজনের ভূমিকা এখনও কিছুদিন বর্তমান থাকিবে। নব-পরিকল্পিত ঋণ-ব্যবস্থা গ্রাম্য মহাজনের কাম্য বিকল্প সূত্র হিসাবে বর্তমান থাকিয়া মহাজনগণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে; ফলে সার্থক গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। এইরূপ আশাই গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি পোষণ করিয়াছিল এবং সেদিন পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনও মানিয়া লইয়াছিল।

ঋণ-ব্যবস্থাকে গতিশীল বলা হইয়াছে কেন

কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট* প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গতিশীল কৃষিঋণ-ব্যবস্থা গঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা দরকার যে ঋণ পরিকল্পনাকে ইতিমধ্যেই কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে।

সুপারিশগুলির সাম্প্রতিক সমালোচনা

কার্যক্রমকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে (Plan Implemented So Far): গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির নির্দেশানুযায়ী ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের (State Bank of India) প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সহিত বিভিন্ন রাজ্যসরকার সম্পর্কিত ব্যাংক (State-associated Banks)—যথা, হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক প্রভৃতিও সংযুক্ত করিবার সুপারিশ কমিটি করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত এই সংযুক্তিকরণ সম্পর্কে কিছুই করা হয় নাই। অবশেষে ১৯৫৯ সাল হইতে উহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীন ব্যাংকে (Subsidiaries of the State Bank) পরিণত করা হয়। ফলে উহাদের মালিকানার অর্ধেকের বেশী রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের হস্তগত হইলেও উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় আছে।

১। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠন

নবগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের উপর প্রতিষ্ঠার সময় হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, ৪০০টি শাখা স্থাপন করিবার ভার ন্যস্ত আছে। ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ৩১১টি শাখা স্থাপন করিয়াছে; বাকী ১০০টি শাখা উহা ১৯৬০ সালের মধ্যে স্থাপন করিবে। দ্বিতীয়ত, ইহা স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের অধিকতর সুবিধা (remittance facilities) প্রদান করিবে এবং গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা করিবে। পরে শস্যভাণ্ডার ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ইহার বিস্তৃততর সংগঠনের মাধ্যমে গ্রাম্য ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধির প্রধানতম সূত্র হইবে।

নবগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম

* "Certain Aspects of Co-operative Movement in India,"
—Malcolm Darling, 1958.

দাঁড়াইবে। এই শাখাগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার-সাধন করিবে।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অন্যান্য সুপারিশকেও কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমবায় সমিতির মালিকানায় রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণে সহায়তা করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া একটি 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' সৃষ্ট করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ইহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ কোটি টাকা হইবে। এই তহবিল হইতে রাজ্যসরকারগুলিকে বৎসরে গড়ে ৬ কোটি টাকার মত ঋণ দেওয়া হইতেছে।

২। জাতীয় কৃষি-ঋণ তহবিল

তৃতীয়ত, ঐ সালেই ১ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৫৮ সাল অবধি এই তহবিলের মূলধন ৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই পর্যন্ত এই তহবিল হইতে ঋণপ্রদানের প্রয়োজন হয় নাই। চতুর্থত, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৫৬ সালে 'কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) করপোরেশন আইন' [Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporation Act, 1956] পাস করা হয়। এই আইনের বলে ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) এবং ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (Central Warehousing Corporation) প্রতিষ্ঠিত হয়। করপোরেশন দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতে ১০০-এর মত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা (warehouses) স্থাপন করিবে এবং বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন' প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য প্রদান করিবে। ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মধ্যেই সকল রাজ্যেই পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন (State Warehousing Corporation) স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনগুলির পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ২৫০এর মত পণ্য সংরক্ষণ সংস্থা স্থাপন করিবার কথা আছে। পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়াও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিজ পণ্যের বাজারিকরণ, আমদানি-রপ্তানির উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রভৃতি হইল পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশনের কার্য।

কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল

৪। কেন্দ্রীয় সমবায় উন্নয়ন বোর্ড ও পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন

রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন কার্যও বহুদূর অগ্রসর হয়। সমবায় কর্মীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, ১০ হাজারের উপর বৃহদায়তন সমিতি এবং ১,৮০০-এর মত পণ্য বিক্রয়করণ সমিতি গঠন, মোট ২২৫ কোটি টাকা ঋণপ্রদান ইত্যাদি লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় সম্প্রসারণের

৫। সমবায়ের পুনর্গঠন

কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর উল্লিখিত রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ইহার গতিতে বাধা পড়িয়াছে। স্যর ম্যালকমের মতে, সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত বিশেষ বিচার-বিবেচনার পরই গ্রহণ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় সমিতিগুলিকে বৃহদায়তনে সংগঠিত করিবার সুপারিশ করিয়াছে তাহাও বিবেচনা-সাপেক্ষ। সমবায় আন্দোলনের সহিত ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক বর্তমানে যতটা ঘনিষ্ঠ ততটা হওয়া উচিত নয় বলিয়াও স্যার ম্যালকম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সাম্প্রতিক গতি

স্যর ম্যালকমের এই অভিমতের ফলে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার রূপদান কিছুটা মন্থরগতি হইয়াছে। এখন লক্ষ্য পড়িয়াছে ক্ষুদ্রায়তন সেবা সমবায় সমিতি (service co-operatives) গঠনের প্রতি। এ-সম্পর্কে সমবায় আন্দোলন অধ্যায়ে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature and extent of Agricultural Indebtedness in India and review the measure that have been adopted to tackle the problem.

(১২৩-১২৫ এবং ১২৮-১৩২ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the causes of Agricultural Indebtedness in India. Review the measures that have been adopted to tackle the problem.

[প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের ইংগিত: বাহত কৃষকের ঋণগ্রস্ততার কারণ হিসাবে ছয়টি বিষয়ের অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করা যায়—যথা, (১) কৃষকের আয়ের স্বল্পতা, (২) পুরুষানুক্রমিক ঋণ, (৩) বাহুল্য, (৪) ভূমি-রাজস্বের হার ও আদায়ের সময়, (৫) মধ্যস্বত্বভোগিগণের অস্তিত্ব, এবং (৬) গ্রাম্য মহাজনের ভূমিকা। কিন্তু অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্টকে অনুসরণ করিয়া বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যায় যে, কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার প্রধান কারণ হইল মাত্র দুইটি: মুনাফাহীন কৃষিকর্ম এবং ঋণ-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের অভাব। (১২৫-১৩২ পৃষ্ঠা)]

3. What are the main sources of supply of Agricultural Credit? Indicate the defects of each of them. (C. U. B.A. 1955) (১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা)

4. Give your own evaluation of the scheme of integrated structure of rural credit recommended by the All-India Rural Credit Survey Committee.

(C. U. B. Com. 1959) (১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠা)

দ্বাদশ অধ্যায়

কৃষিগত সংগঠন

(Organisation of Agriculture)

ভারতের কৃষিগত সংগঠনের ত্রুটি প্রধানত দুই প্রকারের—(ক) কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি, এবং (খ) কৃষিকার্যে অবলম্বিত পদ্ধতির ত্রুটি। প্রথমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা (Marketing of Agricultural Produce) : ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থাতেও রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় কৃষক জাতীয় এবং বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় কৃষককে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ-ব্যবস্থা (system of credit), যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত, বহির্জগতের বাজারের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদান প্রভৃতি বিশেষ কিছুই করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে সে ঋণগ্রস্ত হইয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে।* সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ভারতীয় কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে অন্যতম প্রাথমিক করণীয় কার্য হইল কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা।

এখন কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায় এবং ভারতে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি, সে-সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়

ভারতে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা নানা অংশে বিভক্ত। প্রথম হইল সামান্য সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্য কৃষকগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া এক বা একাধিক স্থানে জমায়েৎ করা (assembling)। তাহার পর আছে পণ্যের গুণের তারতম্য অনুসারে ইহাকে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা (grading)। নমুনা পাঠান (sampling), বাজারে প্রেরণ করা, মূল্য বৃদ্ধির আশায় শস্য মজুত রাখা প্রভৃতি হইল বিক্রয়-ব্যবস্থার অন্যান্য পর্যায়।†

কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of the System of Agricultural Marketing) : সাধারণভাবে বলা যায়, অন্যান্য দেশেও কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে

১। বিক্রয়-ব্যবস্থা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হস্তেই ন্যস্ত

এই সকল কার্য কৃষকেরা নহে—মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরাই সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ ভারতে কৃষিকার্য অতি ক্ষুদ্রায়তনে সম্পাদন করা হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের পক্ষে সামান্য উৎপন্ন লইয়া বাহিরের বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব হইয়া উঠে না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন

---

* ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

† First Five Year Plan—২৪১ পৃষ্ঠা।

ইহার কারণ

ক্ষেতে উৎপন্ন একই ফসলে এরূপ গুণগত তারতম্য দৃষ্ট হয় যে তাহাকে পর্যায়ভুক্ত না করিয়া বাহিরের বাজারে লইয়া গেলে উচিত মূল্য কোনদিনই পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের দুরবস্থার জন্য ফসল বাহিরের বাজারে লইয়া যাওয়াও কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। চতুর্থত, কৃষকের দারিদ্র্যও তাহাকে মহাজন ও ব্যাপারীদের নিকট দায়াবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া সে তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত কারণে ভারতে কৃষিজ পণ্য-বিক্রয় ব্যাপারী, ফড়িয়া, আড়তদার, মহাজন প্রভৃতি 'বিশেষজ্ঞদের' হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত অধিক ও ইহাদের প্রভাব এত ব্যাপক যে, ইহারা অনেক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য-ক্রেতা প্রদত্ত মূল্যের অর্ধাংশের উপর গ্রাস করিয়া থাকে। ইহার উপরও কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থায় অন্যান্য ত্রুটি আছে—যথা, উপযুক্ত সংখ্যায় সুসংগঠিত বা নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাব, বাজারে ওজন ও পরিমাণের তারতম্যজনিত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অপপদ্ধতির প্রচলন, বাজার দর সম্বন্ধে কৃষকের অজ্ঞতা, গুদামঘরের অভাব ইত্যাদি।

২। অন্যান্য ত্রুটি

নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাবের কুফল

নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাবের জন্যই অনেক ক্ষেত্রে কৃষক গ্রামে ফড়িয়া, ব্যাপারী ও আড়তদারের নিকট অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়; সামান্য পণ্য লইয়া সে দূরবর্তী নিয়ন্ত্রিত বাজারে যাইতে পারে না। ইহার উপর আবার পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কৃষকের নিকট হইতে চুংগি (octroi) আদায় করে বলিয়া সে সহরের বাজারে পণ্য লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেও চাহে না।

বাজারে প্রচলিত নানা অপপদ্ধতি

কৃষক তাহার পণ্য গ্রামে বিক্রয় করুক বা সহরের অনিয়ন্ত্রিত বাজারে লইয়া গিয়াই বিক্রয় করুক ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়তদার ও মহাজনগণের অপপদ্ধতির হাত হইতে সে সচরাচর রেহাই পায় না। গুণগত তারতম্যের দোহাই দিয়া অনেক সময় তাহাকে ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করা হয়, নানা অজুহাতে তাহার নিকট হইতে ফাউ আদায় করা বা দাম কাটিয়া লওয়া হয়, অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া প্রকৃত বাজার-দাম তাহাকে জানান হয় না। ইহার উপর আবার বাজারে প্রচলিত ওজন ও পরিমাণের বিশেষ তারতম্যও দৃষ্ট হয়। অধিক ওজনের পাল্লার দ্বারা ক্রয় করা ব্যাপারী ও ফড়িয়াগণের পক্ষে যেন একটা রীতি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওজন ও পাল্লা থাকে বলিয়া ব্যাপারীদের পক্ষে অজ্ঞ সরল কৃষকগণকে প্রবঞ্চিত করা সহজসাধ্য হয়।

শস্যমজুতে অসুবিধা ও অক্ষমতা

সময়গত উপযোগ (time utility) সৃষ্টি করিয়া কৃষক যে পণ্যের অধিক মূল্য আদায় করিবে তাহার অন্তরায় হইল শস্য মজুত রাখিবার মত স্থানের অভাব। ফলে সে মহাজন বা আড়তদারের নিকট দায়াবদ্ধ না থাকিলেও শস্যকর্তনের অব্যবহিত পরেই, যখন কৃষিজ পণ্যের মূল্য সর্বাপেক্ষা কম থাকে, তখনই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ (**Remedial Measures**): কৃষিজ পণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারকে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়করণ সমস্যার প্রধান প্রতিবিধান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণ সমস্যার সমাধানকল্পে দুইটি প্রধান প্রতিবিধান নির্দেশ করা যাইতে পারে—(ক) পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের (regulated markets) প্রতিষ্ঠা, এবং (খ) সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির (co-operative marketing societies) প্রসার। এই দুই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অধিকাংশ ত্রুটি দূর করা যায়। ইহা ছাড়াও অবশ্য অপচয় নিবারণ ও বিক্রয়করণ-ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (warehousing) স্থাপন, পথঘাটের উন্নতিসাধন, গ্রেড বা নির্ধারিত মান চালু করা প্রভৃতি ব্যবস্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দুইটি প্রধান প্রতিবিধান

অন্যান্য ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রিত বাজারে প্রকাশ্যভাবে নিলামের মাধ্যমে অথবা সরাসরি পণ্য বিক্রয় করা হয়, এবং এক একটি কমিটির হস্তে এই সকল বাজারের পরিচালনার ভার থাকে। বাজারে ওজন, পরিমাণ, দর, বাজারের দরুন প্রাপ্য (market charges) প্রভৃতিও নির্দিষ্ট থাকে। পরিচালকমণ্ডলীতে বিক্রেতাদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকে বলিয়া কৃষককে ঠকান ক্রেতাদের পক্ষে বড় একটা সম্ভব হইয়া উঠে না। অনেক সময় আবার নিয়ন্ত্রিত বাজারের পরিচালনার ভার সমবায় সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া বাজারকে অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই-এর কিয়দংশ এইভাবে সমবায় সমিতিগুলির হস্তে তুলার বাজার পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

১। নিয়ন্ত্রিত বাজার

সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ

সমবায় বিক্রয় সমিতিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিযোগী হিসাবে নয়—পরিপূরক হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির অভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার সফল হইতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত বাজারে ব্যাপারীদের অপপদ্ধতি দূর করা হয়; কিন্তু কৃষকের পক্ষে যদি নিয়ন্ত্রিত বাজারে পণ্য লইয়া আসা সম্ভবই না হয় তবে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সার্থকতা কোথায়? ইহার জন্য প্রয়োজন গ্রামাঞ্চল হইতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অপসারণ এবং কৃষককে প্রয়োজনমত ঋণপ্রদানের ব্যবস্থা করা। এই দুইটি কার্যের সম্যক সম্পাদন যে একমাত্র সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির দ্বারাই সম্ভব, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতিগুলি নামমাত্র কমিশন লইয়া পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, সভ্যগণের পক্ষে যৌথ দরাদরির (collective bargaining) ভার লয়, ঋণের মাধ্যমে দাদন প্রদান করিয়া কৃষককে মহাজন, ব্যাপারী ও আড়তদারদের কবল হইতে রক্ষা করে, ইত্যাদি। ইহার উপর সুসংগঠিত হইলে সমবায় সমিতি শস্যভাণ্ডার স্থাপন করিয়া শস্য

২। সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি

গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, সুলভ যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে পারে, উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদনের জন্য সভ্যগণকে উৎসাহিতও করিতে পারে। এইভাবে মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হস্ত হইতে কৃষককে রক্ষা করিয়া, উপযুক্ত সময়ে পণ্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া, পণ্যের গুণগত উন্নয়নে সহায়তা করিয়া সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি সর্বতোভাবে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিতে পারে।

শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণ সকল সময় সমবায় সমিতির সংগতিতে কুলায় না বলিয়া সরকারের পক্ষেও এইদিকে সচেষ্ট হইবার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

৩। সরকারী সাহায্যে বহুসংখ্যক গুদামঘর নির্মাণ করা

১৯৫৪ সালের গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, পর্যাপ্ত সংখ্যায় গুদামঘর নির্মাণ কৃষিগত ঋণ-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। কমিটির মতে, এই উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ উন্নয়ন তহবিলের (National Warehousing Development Fund) সৃষ্টি এবং একটি সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (All-India Warehousing Corporation) স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী * (State Warehousing Company) থাকিবে। উপরি-উক্ত জাতীয় পণ্য সংরক্ষণ তহবিল হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান শস্য গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য ফিনান্স করপোরেশনগুলিকেও এই উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য করিতে হইবে।

ভারতের গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নয়ন হইল আর একটি প্রয়োজনীয় প্রতিবিধান। বহু কমিটি ও কমিশনের মত গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটিও ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমাজ উন্নয়ন পদ্ধতিতে পথঘাটের সাধারণ উন্নয়ন ছাড়াও জিলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই বিষয় সম্পর্কে অধিকতর যত্নবান হইতে হইবে।

৪। গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নয়ন করা

ইহার পর আছে গুণগত বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত স্তর বা মান (grading) চালু করা এবং বিশেষ করিয়া রপ্তানি দ্রব্যসমূহের বেলায় নমুনা পাঠানর বন্দোবস্ত করা। পরিকল্পনা কমিশন পশম, লোমশচর্ম, লাক্ষা, মেষ ও ছাগচর্ম, বনস্পতি তৈলবীজ, কয়েক প্রকারের প্রয়োজনীয় তৈল, কাজু বাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মান নির্ধারণ ও প্রচলন করার জন্য সুপারিশ করিয়াছে। অনেকের মতে, মান নির্ধারণ করিবার ভার সমবায় বিক্রয় সমিতির হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে যাহাতে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৫। নির্ধারিত স্তর বা মান চালু করা

এ-সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ

* কোথাও কোথাও—যেমন, পশ্চিমবংগে ইহাকে 'রাজ্য পণ্যসংরক্ষণ করপোরেশন'ও বলা হয়।

কৃষিজ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ অধিক। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে ১৯৩৯ সালে এবং পরে ১৯৫৬ সালে আইন পাস করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের আইন দ্বারা মেট্রিক ব্যবস্থায় ওজন ও মাপ (metric weights and measure) চালু করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যাহাতে প্রসারিত হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৬। ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা

পরিশেষে আছে গবেষণা। পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছে যে, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার অর্থগত, সংগঠনগত এবং পরিচালনাগত সকল সমস্যাই বিরতিবিহীন গবেষণার দাবি করে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিশেষজ্ঞগণ লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি রাজ্যসরকার এবং সমবায় সংগঠনগুলিকে কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়-ব্যবস্থার পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুতিতে সহায়তা করিবে এবং বিশেষ সময়ান্তরে সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থার গুণাগুণের পর্যালোচনা করিবে।*

৭। গবেষণা

অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ (Measures Adopted): কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূরিকরণার্থে যে-সকল প্রতিবিধান এ-পর্যন্ত অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থার (Directorate of Marketing and Inspection) সৃষ্টিকে সর্বপ্রথম বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের তথ্যানুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন উপায়ে বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা ইহার কার্য। সংস্থা এ-পর্যন্ত প্রায় ১০০টি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা:

১। গবেষণা

কেন্দ্রীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণে বিভিন্ন রাজ্যও এইরূপ সংগঠন স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গবেষণার কার্য রীতিমত সুরু হইয়াছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান হইল কৃষিজ পণ্যের নির্দিষ্ট স্তর বা মান নির্ধারণ ও প্রচলন করিবার ব্যবস্থা করা; এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে কৃষিজ পণ্য (নির্দিষ্ট মান এবং বিক্রয়) আইন [Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937] পাস করা হয়। এই আইনের ফলে কেন্দ্রীয় কৃষিজপণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থা ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১১৭টি পণ্যের মান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। আইনে 'আগ মার্কা' (Ag Mark) শব্দটি গুণ ও বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'আগ মার্কা' কৃষিজ পণ্য গুণ ও বিশুদ্ধতায় নির্দিষ্ট মানের বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বাজারে ইহাদের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার্য 'আগ মার্কা' পণ্যের মধ্যে ঘৃত, বনস্পতি তৈল, মাখন, চাউল, আটা, তুলা, গুড় এবং ফল এই কয়টিই

২। কৃষিজ পণ্যের নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ

* AICC Economic Review—June, 1959.

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রপ্তানির জন্য তামাক চন্দনকাষ্ঠ পশম চর্ম প্রভৃতিতে 'আগ মার্কা' দেওয়া হয়। এইভাবে কৃষিজ পণ্যের মান-নির্ধারণ কার্য কতকটা সুরু হইয়াছে বলা যায়।

৩। নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা

নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার পথে কিন্তু বেশ কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ অবধি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল, মহীশূর ও উড়িষ্যা—এই ৮টি রাজ্যে এবং দিল্লী ও ত্রিপুরা এই দুইটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় অন্যান্য রাজ্যও এই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেছে দেখা যায়। ভারতের মোট ১,৮০০টি প্রাথমিক পাইকারী বাজারের মধ্যে ৫৪৯টিকে ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৬৫টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ের মধ্যে আরও ৪৫০টি বাজার নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিভিন্ন রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের জন্য কৃষিজ পণ্য বাজারিকরণ ও পরিদর্শন সংস্থার অধীনে একটি উপদেষ্টা শাখা (an Advisory Wing) গঠন করা হইয়াছে এবং এইরূপ বাজারের সম্পাদকদের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

৪। বেতারের মাধ্যমে প্রচারকার্য

নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যার স্বল্পতাজনিত ত্রুটি দূর করিবার একটি চেষ্টা করা হইতেছে বেতারের মাধ্যমে প্রচারকার্যের দ্বারা। ভারতীয় বেতার বিভাগ হইতে নিয়মিতভাবে কৃষিজ পণ্যের দাম, মজুতের অবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চলাভিমুখে পণ্যের গতি সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করা হয়। ইহার ফলে অনিয়ন্ত্রিত বাজার-সমূহও কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়ে।

৫। সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয়-ব্যবস্থার সংগঠন

সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনেও সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু কার্য সম্পাদন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম-জাতকরণ বোর্ড (National Co-operative Development and Warehousing Board) ৭ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই অর্থ সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি গড়িয়া তুলিবার জন্য রাজ্য সরকারসমূহের হস্তে প্রদান করা হয়। এইরূপ সমিতি প্রধানত শস্য বিক্রয়যোগ্যকরণ কার্যেই (processing activities) নিযুক্ত থাকে। ইহার ফলে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী সহায়তায় সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে ৫৫৪টি সমবায় সমিতি এই বিক্রয়যোগ্যকরণ কার্যে নিযুক্ত আছে।* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

* Statistical Statements Relating the Co-operative Movement in India, 1957-58. (Published in June, 1959)

শেষে মোট বিক্রয়যোগ্য কৃষিজ পণ্যের এক-দশমাংশ সমবায় বিক্রয়-সমিতির মাধ্যমে বিক্রীত হইবে এইরূপ আশা করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হইবে প্রধানত 'সেবা সমবায় সমিতির' (service co-operatives) মাধ্যমে। কংগ্রেস দলের নাগপুর প্রস্তাব (১৯৫৯ সাল) অনুসারে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে 'সেবা সমবায় সমিতি' সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইবে।

১৯৫২ সালে আগাম বাজার (নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Forward Markets (Regulation) Act, 1952] পাস এবং তৎপরবর্তী বৎসরে আগাম বাজার কমিশন (Forward Markets Commission) প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করা হইয়াছে। এই কমিশন কৃষিজ পণ্যে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ও আগাম বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিম ঘাটতি দূরিকরণের প্রচেষ্টা করে।

৬। অন্যান্য অবলম্বিত প্রতিবিধান

কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি দূরিকরণার্থে অন্যান্য যে-সকল উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নির্ধারিত ওজন ও মাপ কার্যকর করিবার প্রচেষ্টা, গুদামঘর নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যাপারে শিক্ষার প্রসার প্রভৃতিই হইল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের 'নির্ধারিত ওজন ও মাপ আইন' (Standard Weights and Measures Act, 1956) দ্বারা ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারে মেট্রিক প্রথায় ওজন ও মাপ চালু করা হইয়াছে। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দেশের সর্বত্রই একমাত্র মেট্রিক ওজন প্রবর্তিত হইবে এইরূপ লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণের ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই করা হইয়াছে।*

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কার্যক্রম

এ-পর্যন্ত আলোচনার পর ইহা আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের কার্যক্রম উপরি-উক্ত প্রতিবিধানসমূহ লইয়াই রচিত। নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট মান চালু করা, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা, সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি স্থাপন করা প্রভৃতি ব্যবস্থার সমন্বয়ে যে-কার্যক্রম প্রথম পরিকল্পনায় প্রণয়ন করা হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে তাহাকেই অনুসরণ করা হইতেছে। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঋণ-ব্যবস্থা ও বিক্রয়-ব্যবস্থাকে পরস্পরের অংগীভূত হিসাবে দেখিতে হইবে এবং উভয় ব্যবস্থারই উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইবে মূলত সমবায়ের ভিত্তিতে। এই উদ্দেশ্যে ১,৮০০-র মত সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি এবং ৬ হাজারের কাছাকাছি ছোটবড় গুদামঘর ছাড়াও ৩৫টি

* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

সমবায়িক চিনির কল এবং ১৬৬টি বিক্রয় যোগ্যকরণ সমিতি (processing societies) প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। তবে বর্তমানে 'সেবা সমবায় সমিতি' (service co-operatives) স্থাপনের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। এই সেবা সমবায় সমিতিগুলির প্রকৃতি অনেকটা বহু উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) সমিতির ন্যায়; ইহারা কৃষককে বহুভাবে 'সেবা' করিতে চায়।

কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতি (Existing Method of Agriculture) ঃ

কৃষিকার্যের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। ভারতে কৃষিকার্যের পদ্ধতি অতি পুরাতন। ভারতীয় কৃষক আজও আদিম যুগের সেই লাঙল এবং একজোড়া বলদ দিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করে। জল-সেচ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি আজও অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের নিকট অজ্ঞাত বা আয়ত্তের বাহিরে। ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনকেও কৃষিকার্যের পদ্ধতির একটি দিক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। তবে এ-সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে কৃষি-পদ্ধতির অন্যান্য দিক সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটিসমূহের সংক্ষিপ্তসার

এই অন্যান্য দিকের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হইল কৃষিকার্যে পশুশক্তির বিশেষ ভূমিকা। পশুশক্তি ব্যতিরেকে সাধারণ কৃষক কৃষিকার্য পরিচালনার কথা চিন্তাও করিতে পারে না। হলকর্ষণ, সেচের জন্য জল উত্তোলন, উৎপন্ন শস্যের পরিবহন প্রভৃতি সকল কার্যই পশুশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধারণত পশুশক্তি বলিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত গো-মহিষাদিকেই বুঝায়। গো-মহিষাদি আবার কৃষি-জমিতে সাধারণ ব্যবহার্য সারও সরবরাহ করিয়া থাকে। এইজন্য এই উক্তি করা হইয়াছে যে, ভারতে গো-জাতি তাহার স্কন্ধে সমগ্র কৃষিকার্যের ভার বহন করিয়া আছে।

১। কৃষিকার্যে পশু-শক্তির বিশেষ ভূমিকা পদ্ধতির অন্যতম ত্রুটি

কিন্তু ভারতের গো-মহিষাদি উৎকৃষ্ট জাতের নয়। একেবারে অকর্মণ্য গো-মহিষও ভারতে বহু আছে; কৃষককে ইহাদের জন্য চারণজমি ছাড়িয়া দিতে হয় এবং খাদ্যের অন্য প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। ফলে সক্ষম গো-মহিষাদির খাদ্যে ঘাটতি পড়ে। সুতরাং এই ত্রুটির প্রতিবিধান বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এই ত্রুটির প্রতিবিধান ব্যতীত কৃষির পুনর্গঠন কোনমতেই সম্ভব নয়।*

কৃষিকার্যের পদ্ধতির আর একটি ত্রুটিপূর্ণ বিষয় হইল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতে কৃষি-জমির সম্যক ব্যবহার করা যায় না। এখানে বৎসরের কয়েক মাস কৃষি-জমি অকর্ষিত রাখা যেন একটা রীতি। উন্নত দেশসমূহে কৃষি-জমি কোন সময়ে অকর্ষিত রাখা হয় না। এই সকল দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালটি শস্য উৎপাদনের (rotation of

২। কৃষি-জমির ব্যবহারজনিত ত্রুটি

* Report on India's Food Crisis and Steps to meet it,

crops) ব্যবস্থা করিয়া কৃষি-জমির পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পশু-খাদ্য (fodder crops) উৎপাদন করিয়া জমিকে কাজে লাগান হয়।

বীজ, সার এবং কৃষি-জমিকে চাষোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও ভারতে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ।

৩। বীজ, সার ও কৃষি-জমিকে চাষোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ

উন্নত বীজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা, নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ এখনও ভারতে ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। উক্ত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, সার প্রয়োগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারিলে জলসেচ, উন্নত বীজ প্রভৃতির পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিতে পারা যাইবে না।

জমিকে কৃষির উপযোগী করিবার ব্যবস্থাও অতি পুরাতন। জমির উপরের স্তরের একটি সামান্য অংশকে কোনমতে কর্ষিত করিয়া বীজ বপন করিতে পারিলেই ভারতীয় কৃষক সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে যে যথেষ্ট উৎপাদন সম্ভব নয় এ-বিষয়ে হয় সে অবহিত নহে, না-হয় সে উদাসীন।

পরিশেষে আছে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রশ্ন। বস্তুত, যন্ত্রিকরণ (mechanisation) কৃষিকার্যের পদ্ধতির উপরি-উক্ত সকল দিকের সহিতই বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যন্ত্রিকরণ

৪। যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি এখনও বিশেষ অবলম্বিত হয় নাই

সম্ভব হইলে স্বভাবতই বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিতে হইবে, কৃষিকার্যে পশুশক্তির ভূমিকার গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে, জমির পূর্ণ নিয়োগ সম্ভব হইবে এবং স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে উন্নত বীজ সার ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। এখন এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

কৃষির যন্ত্রিকরণ (Mechanisation of Agriculture) : কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে বুঝায় কৃষিকার্যের সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানব ও পশুশক্তির পরিবর্তে

যন্ত্রিকরণের অর্থ

যন্ত্রশক্তির ব্যবহার করা, অথবা যন্ত্রশক্তি দ্বারা মানব ও পশুশক্তিকে সহায়তা করা। উদাহরণস্বরূপ, কর্ষণ ব্যাপারে ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে পশুশক্তির ব্যবহার পরিহার করা যায় এবং মানবশ্রমকে বিশেষ পরিমাণে সহায়তা করা হয়। আবার 'কম্বাইন ড্রিল' (combine drill) দ্বারা একই সংগে শস্য বপন ও সার প্রোথিত করার কার্য সমাধা করা যায়; অথচ ইহাতে পশুশক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন মোটেই হয় না। বর্তমানে অন্যান্য এরূপ সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, জমি চাষোপযোগী করা হইতে ফসল কর্তন অবধি সকল পর্যায়েই পশুশক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিহার এবং মানবশ্রমের পরিমাণকে বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করা যায়। ব্যাপক অর্থে যন্ত্রিকরণ বলিতে ইহাই বুঝায়।

যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার কিছু প্রয়োজন হয় না। যে-দেশে কৃষিকার্য শতকরা ৭০ ভাগ লোকের জীবিকা, যে-দেশে বিশেষ করিয়া পদ্ধতিজনিত ত্রুটির জন্য কৃষিকার্য অনগ্রসর, যে-দেশে খাদ্যাভাবের আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে সে-দেশের

কৃষির উন্নয়নের জন্য যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা লইয়া সাফাই গাহিতে হয় না। উপরন্তু বর্তমান ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটিয়াছে। ভারতীয় কৃষককে আজ বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল পণ্যের গুণবৃদ্ধি ও উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস। এই দুইটিই কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, সাম্প্রতিক আবিষ্কার অনুযায়ীই আমাদের উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে; পুরাতন পদ্ধতিতে চলিলে আমরা কোনমতেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিব না। পরিশেষে কৃষিকার্যের সহিত সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় আছে—যথা, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি, যাহা যান্ত্রিক কৃষি ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না।

যন্ত্রিকরণের অসুবিধা (**Difficulties of Mechanisation**): ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে উপরি-উক্ত ভাবে ওকালতি করা গেলেও ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, দেখা প্রয়োজন যে ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণ বিশেষ কাম্য হইলেও বর্তমানে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব কিনা?

অন্তরায়—
১। কৃষি-জোতের ক্ষুদ্রতা

ব্যাপক প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হইল কৃষি-জোতের ক্ষুদ্রতা। খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুন ভারতে কৃষি-জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে, বর্তমানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায় না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে অবশ্যম্ভাবীভাবে বৃহদায়তনে কৃষিকর্ম বুঝায়। কিন্তু বৃহদায়তনে কৃষিকর্মের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোতের অস্তিত্ব। সুতরাং ইহাদের সংহতি-সাধনের ব্যবস্থা প্রথমে করিয়া পরে যন্ত্রিকরণের কথা চিন্তা করা যাইতে পারে। এইজন্য অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে যন্ত্রিকরণ-ব্যবস্থা মাত্র সমবায়িক খামার এবং সরকারী মালিকানাভুক্ত পুনরুদ্ধৃত পতিত জমিগুলিতেই প্রবর্তিত হইতে পারে।

২। মূলধনের সমস্যা

দ্বিতীয়ত, যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের (co-operative farming) প্রসারের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষি-জোত বৃহদায়তনই হইবে, তবে তখন ব্যাপক যন্ত্রিকরণের পথে অন্তরায় হিসাবে দেখা দিবে মূলধনের সমস্যা। যন্ত্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন যোগান দেওয়া সমবায় সমিতির পক্ষে বর্তমানেই সম্ভব হইবে না; স্বভাবত ঐ ভূমিকা সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে সরকারী নিয়ন্ত্রণও ব্যাপক হইয়া উঠিবে। ব্যাপক সরকারী নিয়ন্ত্রণ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

তৃতীয়ত, কৃষির যন্ত্রিকরণের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে কৃষি-শ্রমিকের বেকারত্বের প্রশ্ন। যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের ফলে এই সকল কর্মচ্যুত কৃষি-শ্রমিকদের ব্যবস্থা কি হইবে? ইহারাই প্রথমে সম্পূর্ণ বেকার হইয়া পড়িবে—কারণ, ইহাদের স্থানাধিকার করিবে যন্ত্র। ক্রমে কর্মচ্যুত কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। বর্তমানে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৪·৩০ কোটি। সুতরাং অনেকের মতে, বৃহদায়তন এবং কৃষিগত শিল্পের (agro-industries) সম্যক উন্নয়নের মাধ্যমে বা অন্যান্য উপায়ে এই সকল কৃষি-শ্রমিকের বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া যান্ত্রিক কৃষির ব্যাপক রূপ দেওয়া উচিত নয়।

৩। কৃষি শ্রমিকের বেকারত্বের প্রশ্ন

চতুর্থত, যন্ত্রিকরণ-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইলে বহুসংখ্যক অপ্রয়োজনীয় গো-মহিষাদির ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা হইল আর একটি সমস্যা। আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতের গো-মহিষাদি সংখ্যায় বহু হইলেও ইহাদের এক-দশমাংশ একেবারেই অকেজো।* সুতরাং ইহাদের অপসারণ প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের ন্যায় ধর্মান্ধ ও ভাবপ্রবণতার দেশে ইহা সহজসাধ্য কার্য নহে। ইহার উপর যদি আবার যন্ত্রিকরণের ফলে আরও কিছু অপ্রয়োজনীয় গো-মহিষাদি চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে সমস্যা আরও গুরুতর রূপ ধারণ করিবে।

৪। অপ্রয়োজনীয় গো-মহিষাদির সমস্যা

পঞ্চমত, যান্ত্রিক কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকগণের পক্ষে যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার। কিন্তু যে-দেশে সাধারণ কৃষকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অভাবই রহিয়াছে সে-দেশে কৃষকগণ রাতারাতি যন্ত্র-ব্যবহার করিতে শিক্ষিত হইয়া উঠিবে এরূপ কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সুতরাং কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য আমাদিগকে ভাবীকালের কৃষকগণের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করিতে পারিবে।

৫। যন্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার ব্যাপক রূপ দেওয়ার প্রশ্ন

ষষ্ঠত, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে একরূপ ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণ (specialisation of crops) বুঝায়। কিন্তু ভারতীয় কৃষক বিশেষিকরণের সহিত পরিচিত নহে; বিশেষিকরণ তাহার আয়ত্তাধীনও নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে, সনাতন পদ্ধতিতে এবং অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সে কোনক্রমে কৃষিকর্ম সম্পাদন করিয়া চলে। সুতরাং, কৃষি-পদ্ধতির সর্বাংগীণ সংস্কারসাধনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণের ব্যবস্থা করিয়া যন্ত্রিকরণের আহ্বানে সাড়া দেওয়া যাইতে পারে না।

৬। ফসল উৎপাদনের বিশেষিকরণের প্রশ্ন

৭। সেচ-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির অপরিহার্যতা

পরিশেষে, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, শক্তি সরবরাহের প্রসার প্রভৃতিও যান্ত্রিক কৃষির পক্ষে অপরিহার্য। কৃষিতে যন্ত্রনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আর অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলে না। সুতরাং যন্ত্রিকরণের পূর্বেই সেচ-ব্যবস্থার পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

* ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

অপরদিকে আবার যন্ত্র-ব্যবহারের জন্য শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন। এই শক্তি প্রধানত তৈল হইতে উদ্ভূত। সুতরাং তৈলের উৎপাদন ও সরবরাহ বিশেষভাবে না বাড়িলে কৃষির যন্ত্রিকরণের ব্যাপক রূপদানের প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে না।

উপসংহার ঃ উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, বর্তমান ভারতে কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইলেও উহার অনুসরণের পথে বহু প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। তাই বলিয়া প্রতিবন্ধকসমূহ দূর হওয়া অবধি অপেক্ষা করিতে হইবে—এরূপ অভিমতও প্রদান করা সম্পূর্ণ সংগত নহে। সুতরাং যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ধীরে ধীরে। বর্তমান পরিস্থিতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যন্ত্রিকরণকে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়া কার্য সুরু করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রবর্তনের দিক দিয়া প্রথমে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বা সমবায়িক খামারগুলিকে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে; যন্ত্র প্রয়োগের দিক দিয়া হাল্‌কা ধরনের ট্রাক্টর প্রভৃতির প্রয়োগ নির্দেশ করা যাইতে পারে; ইত্যাদি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষির যন্ত্রিকরণ দীর্ঘকালীন কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র; সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেই ইহার উপলব্ধি সম্ভবপর। শ্রীনেহরুর ভাষায় "অল্প দিনের মধ্যে যান্ত্রিক কৃষির কথা চিন্তাও করা যায় না।"*

কৃষির যন্ত্রিকরণ দীর্ঘকালীন কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অংশ

কৃষির যন্ত্রিকরণের প্রয়াস (Steps taken towards Mechanisation of Agriculture) ঃ ভারতে যন্ত্রিকরণের প্রথম প্রয়াস হিসাবে ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর-সংগঠনের প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিতে হয়।** এই সংগঠন বর্তমানে এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ইহা মার্কিন সৈন্যবাহিনী পরিত্যক্ত মাত্র ২০০ ট্রাক্টর লইয়া কার্য সুরু করিলেও বর্তমানে ভারী ও হাল্‌কা উভয় প্রকার ট্রাক্টরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫০০-র উপর। ইহার উপর কতকগুলি রাজ্য সরকারও তাহাদের নিজস্ব ট্রাক্টর-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা ট্রাক্টর-সংগঠনগুলির প্রধান কার্য হইলেও, সাধারণ কৃষিকার্য বা ভূমিকর্ষণের কার্যেও ইহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় কৃষকগণকে ইহা আবার ভাড়াও দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর-সংগঠন ও যান্ত্রিক কৃষির সূচনা

রাজ্য সরকারসমূহের ট্রাক্টর-সংগঠন

কিছুদিন পূর্বে অনেক শিক্ষিত ও উৎসাহী ভূস্বামিগণ ট্রাক্টরের সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে —অর্থাৎ, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই কৃষিকার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কৃষি-জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের (fixation of ceiling) জন্য ভূস্বামিবর্গের মধ্যে এ-বিষয়ে উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে। ফলে পূর্বের তুলনায় ট্রাক্টর আমদানিও কমিয়া

* AICC Economic Review May, 1959.

** ৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

গিয়াছে। কিন্তু এদিকে দেশের মধ্যে ট্রাক্টর নির্মাণের কার্য সুরু হইয়াছে। মাদ্রাজের একটি প্রতিষ্ঠান একটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত সহযোগিতায় ট্রাক্টরের বিভিন্ন অংশ আমদানি করিয়া ট্রাক্টর নির্মাণকার্য করিতেছে। একটি জার্মান ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উড়িষ্যায় আর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও এই কার্য সুরু করিয়াছে। ট্রাক্টর চালনাকার্যে শিক্ষাদানের জন্য ভূপালে একটি যান্ত্রিক কৃষিখামার স্থাপন করা হইয়াছে;* এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এইরূপ আরও একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা আছে।

কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না

অবশ্য, কৃষির যন্ত্রিকরণ বলিতে শুধু ট্রাক্টর নিয়োগই বুঝায় না, কৃষিকার্যে মানব ও পশুশ্রমলাঘবকারী অন্যান্য যন্ত্রের ব্যবহারও বুঝায়। এইদিকেও কার্য সুরু হইয়াছে বলা চলে। কিছু দিন হইতে কৃষিকার্যে ইলেক্‌ট্রিক মোটর, ডিজেল ইঞ্জিন প্রভৃতি অন্যান্য শক্তিচালিত যন্ত্রসমূহের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে আমাদের দেশে এই সকল যন্ত্রপাতি নির্মিত হইতেছে। 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া সরকার এইদিকেও নানাভাবে আর্থিক সাহায্য করিতেছে। অনেক সময় কৃষকগণকে যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য দীর্ঘকালীন ঋণদান করা হয়; অনেক সময় আবার যন্ত্রাদি ভাড়াও দেওয়া হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০ লক্ষ একরের মত জমিকে যান্ত্রিক কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে ১৫ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধার করা হইবে তাহার একাংশে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ (Japanese Method of Paddy Cultivation): আত্যন্তিক পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ—যাহাকে সাধারণত জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ বলিয়া অভিহিত করা হয়, কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের আর একটি দিক। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ২১ লক্ষ একর জমিতে এই উন্নত পদ্ধতিতে ধান্য-চাষ করা হয়। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মোট ১ কোটি একরের মত ধান্যের জমি এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

উন্নততর বীজ উৎপাদন-ব্যবস্থা ও রবিশস্য উৎপাদন অভিযান (Production of Improved Seeds and Rabi Production Campaign): পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায়, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, উন্নততর বীজ উৎপাদনের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ২৯ শতের কাছাকাছি বীজ উৎপাদনের খামার (seed farms) স্থাপন করা হয়।*

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan এবং India—1959.

অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই প্রভৃতি ৯টি রাজ্যে রবিশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য এক আত্যন্তিক অভিযান চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। মূলত ইহার ফলেই গম বার্লি ছোলা ও জোয়ার এই চারিটি রবিশস্যের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মিশ্র কৃষিকার্য (Mixed Farming) : মিশ্র কৃষিকার্যও কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত। মিশ্র কৃষিকার্য বলিতে বুঝায় একই কৃষিগত সংগঠন হইতে এক বা একাধিক ফসল ও নানাপ্রকার প্রাণিজ সম্পদ উৎপাদন করা। অর্থাৎ কৃষক যদি ধান্য, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপাদনের সহিত গো-মহিষ, হাঁস-মুরগী, মৌমাছি প্রভৃতি পালন করে, শাকসব্জীর বাগান ইত্যাদি করে, তবে এইরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে মিশ্র কৃষিকার্য বলা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিশ্র কৃষিকার্যে কৃষক ফসল উৎপাদনের সহিত এমন সকল কার্য মিশ্রিত করে যাহা প্রধান উৎপাদনকার্য বা ফসল উৎপাদনের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ—যাহা সে প্রধান উৎপাদনকার্যকে কোনরূপ ব্যাহত না করিয়াই সহজে সম্পাদন করিতে পারে।

মিশ্র কৃষিকার্য কাহাকে বলে

১৯৫০ সালের দ্বিতীয় ফিস্ক্যাল কমিশন ভারতে মিশ্র কৃষিকার্য ব্যাপকভাবে গ্রহণের সুপারিশ করার পরই এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে এইরূপ ব্যবস্থার গুণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই গুণ বা সুবিধাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

এই ব্যবস্থার গুণ :

প্রথমত, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষিক্ষেত্রে অর্ধ-নিয়োগের (under-employment) সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করিবে। ভারতে কৃষকগণ যে-সময়ে ঘরে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয় সে-সময়ে তাহারা গো-মহিষাদি পালন, মৎস্যের চাষ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতে পারিবে। ফলে, সারা বৎসর ধরিয়াই তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ নিয়োগের ফলে তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়া জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। তৃতীয়ত, মিশ্র কৃষিকার্য একরূপ স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা (a system of natural insurance)। প্রত্যেক উৎপাদন-পদ্ধতিতেই বিশেষ ঝুঁকি (risks) আছে; আমাদের কৃষিকার্যের ত' কথাই নাই। অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ভারতে কৃষিকার্যের ফলাফল সম্পূর্ণ দৈব নির্ভরশীল। আবার ভারতীয় কৃষি অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত বলিয়া ফসল উৎপাদন কোনক্রমে ব্যাহত হইলে কৃষকের অবস্থা সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু মিশ্র কৃষিকার্য অনুসরণ করিলে কৃষক গো-পালন, মৎস্যের চাষ ইত্যাদি হইতে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করিয়া অজন্মার বৎসরে এইগুলি হইতে কোনমতে দিন গুজরান করিতে পারে। চতুর্থত, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষককে অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলে। গো-মহিষ, হাঁস-মুরগী, মৎস্য ইত্যাদি হইতে কৃষক নানাপ্রকার প্রাণিজ খাদ্য পাইয়া থাকে। ইহাতে তাহার

১। ইহা অনেকাংশে অর্ধ-নিয়োগের সমাধান করিবে

২। কৃষকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইবে

৩। ইহা একরূপ স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা

আহার্য দ্রব্যের খাদ্য-মূল্য (food value) বাড়িয়া যায়। নিজে উৎপাদন না করিলে ঐ পরিমাণ খাদ্য-মূল্য গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হইত না। পঞ্চমত, মিশ্র কৃষিকার্য বলিতে একই ক্ষেত হইতে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন বুঝায়। ইহাতেও অনেকাংশে কৃষকের অর্থ-নিয়োগের সমস্যার সমাধান হইয়া আয়বৃদ্ধি ঘটে, স্বাভাবিক বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, ইত্যাদি। পরিশেষে, ১৯৫৯ সালের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলের মতে, ভারতের খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য অন্যান্য প্রতিবিধানের সহিত মিশ্র কৃষিকার্যও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এক একটি ক্ষেত হইতে মাত্র এক একটি ফসল তুলিয়া বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগান সম্ভব হইবে না।*

৪। ইহা খাদ্যে কৃষককে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে

৫। আর একটি কারণে আয়বৃদ্ধি

সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়া মিশ্র কৃষিকার্যকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। বস্তুত, সংকীর্ণ অর্থে দেখিলে ভারতের অধিকাংশ কৃষকই মিশ্র কৃষিকার্য অনুসরণ-কারী—অধিকাংশ সময় একই ক্ষেতে তাহারা বিভিন্ন ফসল জন্মাইয়া থাকে এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাহারা কৃষিকার্যের সহিত গো-মহিষাদি এবং হাঁস-মুরগী পালনও করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের এই 'মিশ্র কৃষিকার্য' ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। উক্ত ফিস্‌ক্যাল কমিশনের অভিমত হইল, কৃষির পুনর্গঠনের জন্য এই ব্যবস্থাকে বৃহদায়তনে পরিণত করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রয়োজনের আলোচনায় সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। মিশ্র কৃষিকার্যের প্রথম স্তর হিসাবে জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদনের কথা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতে অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকা এরূপ রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধ যে একই জমি হইতে নানাপ্রকারে ফসল উৎপাদন করা অসম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে, পালটি ফসল উৎপাদনকে (rotation of crops) (যাহা মিশ্র কৃষিকার্যের অংগীভূত) ভারতীয় কৃষির উন্নয়নকল্পে অন্যতম অবশ্য গ্রহণীয় পন্থা হিসাবে নির্দেশ করা হয়। প্রাণিপালন সম্বন্ধে বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষক এই ব্যবস্থা অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়াই থাকে; সুতরাং ইহার ব্যাপক রূপদান করাই প্রয়োজন। অতএব, সামগ্রিক অর্থে মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যাপক রূপ দেওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাপক রূপদানের পথে অনেক বাধা রহিয়াছে। রাসায়নিক গুণে সমৃদ্ধির জন্য পালটি ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকিলেও ক্ষুদ্রায়তন জোতের জন্য অনেক স্থলে ইহা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। আর্থিক সংগতির অভাব হইল এই পথে আর একটি প্রতিবন্ধক।

বর্তমানে মিশ্র কৃষি-কার্য প্রবর্তন কতদূর সম্ভব

প্রতিবন্ধক:
১। ক্ষুদ্রায়তন জোত এবং কৃষকের দারিদ্র্য

* Report on India's Food Crisis and Steps to meet it'

ক্ষুদ্রায়তন জোত এবং কৃষকের দারিদ্র্য মিশ্র কৃষিকার্যের অপরদিক—অর্থাৎ প্রাণী-পালন ইত্যাদির পথেও ইহা বিরাট বাধাস্বরূপ। ভারতীয় কৃষক প্রাণী-পালন ইত্যাদি কার্য সাধারণভাবে সম্পাদন করিয়া আসিলেও ক্ষুদ্রায়তন জোত ও দারিদ্র্য হেতু ইহাকে বৃহদায়তনে পরিণত করিতে পারে না। সুতরাং প্রথম প্রয়োজন হইল জোতের সংহতিসাধন ও কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের।

২। উন্নততর দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তনে মিশ্র কৃষিকার্য কৃষকের নিকট হইতে পরিবর্তিত এবং উন্নততর দক্ষতা ও কৌশল দাবি করে। এই উন্নততর দক্ষতা ও কৌশল হইল শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্ন। সুতরাং ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যাপক রূপের কল্পনা করা একরূপ অযৌক্তিক।

৩। কৃষকের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার

তৃতীয়ত, ভারতীয় কৃষকের ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কারও মিশ্র কৃষি-কার্যের পক্ষে অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কৃষকগণ শূকর পালন করিতে চাহিতেছে না অথবা যে-পদ্ধতিতে গো-পালন করা উচিত ধর্মান্ধতা হেতু সে-পদ্ধতিতে গো-পালন করিতে অস্বীকার করিতেছে।

৪। কৃষিজ দ্রব্যের অনুন্নত বিক্রয়-ব্যবস্থা

পরিশেষে বলা যায়, কৃষিজ দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নয়ন না করিয়া ব্যাপকভাবে মিশ্র কৃষিকার্য প্রবর্তন করিতে বলা অর্থহীন। যদি পণ্য-মূল্যের অধিকাংশ ফড়িয়া, ব্যাপারী ইত্যাদিই খাইয়া ফেলে তবে অধিকতর ব্যয়ে কৃষিজ উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন করিবার সার্থকতা কোথায়? বিক্রয়-ব্যবস্থার সংস্কার ব্যতিরেকে অনেক সময় হয়ত' মিশ্র কৃষিকার্যের ব্যয়ই সংকুলান হইবে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কৃষক আবার সাধারণ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হইবে।

উপসংহার

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মিশ্র কৃষিকার্য কৃষির অন্যান্য দিকের সংস্কারের প্রশ্নের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। কৃষির ভূমিগত, মূলধনগত এবং সংগঠনগত অধিকাংশ সমস্যার সমাধান না করিয়া মিশ্র কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হওয়া চলিতে পারে না। অনেকে তাই এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, কৃষির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পরিকল্পনার অন্যতম অংগ হিসাবেই মিশ্র কৃষিকার্যকে গ্রহণ করা উচিত—এককভাবে নহে।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the main defects of the present system of Agricultural Marketing. Suggest remedies which you consider desirable. (C. U. B. A. 1952) (১৪০-১৪৪ পৃষ্ঠা)

2. Review the measures that have been adopted to improve the system of agricultural marketing in India.

[ইংগিত : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা ও গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থাকে পরস্পরের অংগীভূত করিয়া উভয়ের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই উন্নয়নের ভিত্তি হইল সমবায় পদ্ধতি। ১৪৪-১৪৭ পৃষ্ঠা এবং সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ।]

3. Point out the main defects in the existing method of agriculture. How would you remedy them ?

[প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা দেখ। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত : কৃষি-কার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ দূরিকরণার্থে যে-সকল প্রতিবিধানের নির্দেশ করা হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : (ক) কৃষিকার্যে পশুশক্তির ভূমিকাকে লঘু করা, (খ) কৃষি-জমির পর্যাপ্ত ব্যবহার করা, (গ) উন্নততর বীজ, সার সরবরাহ এবং কৃষি-জমিতে জলসেচ করা এবং (ঘ) যথাসম্ভব যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করা।

ভারতে যন্ত্রিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে কৃষিকার্য বৃহদায়তনে সম্পন্ন করিতে হইবে। বস্তুত, ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদন বর্তমান ভারতীয় কৃষির অন্যতম প্রধান ত্রুটি। সুতরাং যন্ত্রিকরণ এবং অন্যান্য ব্যয়-সংক্ষেপের (economies) প্রয়োজনে বৃহদায়তন কৃষির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু যন্ত্রিকরণের পথে বহু প্রতিবন্ধক থাকার দরুন এ পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। স্বভাবতই কৃষি কার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন হইল দীর্ঘকালীন উন্নয়নের প্রশ্ন।]

4. Discuss the possibilities and limitations of Mechanised Farming in India. (C. U. B. A. 1951, 1955)

[ইংগিত : যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর।.........(১৪৮-১৫১ পৃষ্ঠা)]

5. Discuss the merits and possibilities of Mixed Farming in this country. What are the obstacles in its way ? (C. U. B. Com. 1950) (১৫৩-১৫৫ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে সমবায় আন্দোলন

(Co-operative Movement in India)

সমবায়ের অর্থ ও বৈশিষ্ট্য (Meaning and Features of Co-operation) : 'সমবায়' বলিতে ব্যবসায়-সংগঠনের অন্যতম রূপ বুঝায়। একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায়-সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ (capitalistic form) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যে কোন উপায়েই হউক সর্বাধিক মুনাফা লাভ (profit maximisation) করাই হইল ব্যবসায়-সংগঠনের এই সকল রূপের আসল উদ্দেশ্য। ইহাদের ফলে সমাজজীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারকার্য প্রভৃতির জন্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়, ধনীদের পছন্দ ও রুচিমত জিনিসপত্র তৈয়ারী হয় এবং দরিদ্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদি। এক শ্রেণীর লেখকের মতে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায়ের (co-operation) ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন করা।

সমবায় ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়-সংগঠনের ত্রুটিগুলি দূর করিতে চেষ্টা করে

সমবায়ের নানা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্যালভার্ট (Calvert) প্রদত্ত সংজ্ঞা হইল এইরূপ : কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহাকে সমবায় আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯১৪ সালের ভারতের ম্যাকলাগান কমিটির (Maclagan Committee) রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে সমবায়ের মাধ্যমেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমুদয় ধনীদের ন্যায় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে; ফলে, তাহারা নিরবলম্ব হইয়াও নিজেদের বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব্যবসা এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাত্রা (better farming, better business and better living) সম্ভব করিয়া তোলাই সমবায়ের আদর্শ।

সমবায়ের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে সমবায়ের কয়েকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, সমবায় সূচনা হয় দারিদ্র্যের পীড়নে। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণই সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে চায়। দরিদ্রের বিশেষ কোন মূলধন থাকিতে পারে না। মূলধন তাহাদের সংগঠন ভিত্তিও হইতে পারে না। অতএব, সমবায় সমিতির সদস্যগণ মূলধন-মালিক হিসাবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবেই সম্মিলিত হয়।

সমবায়ের নীতি বা বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক। এখানে মালিক-শ্রমিকে কোন ভেদ নাই; ম্যানেজার ও সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একই স্বার্থের ভিত্তিতে সদস্যগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হয় বলিয়া প্রত্যেকেই একাধারে শ্রমিক ও মালিক, একাধারে পরিচালক ও কর্মচারী।

তৃতীয়ত, সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামত উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে। প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য কার্য করিবে ইহাই সমবায়ের নীতি। সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি কার্যকর হয় না। জোর করিয়া লোককে সকলের জন্য কাজ করান যায় না।

পরিশেষে, সমবায় সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার করা। সুতরাং, সদস্যগণ ছাড়া অন্য কাহারও স্বার্থের প্রতি এবং সদস্যগণের বেলাতেও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্বার্থের প্রতি সমিতি দৃষ্টি দেয় না।

দেখা যাইতেছে, সমবায় মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথনির্দেশ করে। সুতরাং, যাহারা দরিদ্র, যাহাদের সম্বল অতি সামান্য, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী।

যে যে ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষ উপযোগী :

ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এরূপ দেশে কৃষকই সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। তাহার ক্ষুদ্র জোত খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ বলিয়া, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিসম্পন্ন বলিয়া, ঋণ-ব্যবস্থা অসংগঠিত বলিয়া কৃষি হইতে সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলে। এই অবস্থার অবসানকল্পে সমবায় আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই বলিলেই হয়।

১। কৃষি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবায়-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হইতে পারে। কারণ, এইরূপ শিল্পে অধিক মূলধন বা বিশেষ পরিচালন-দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী। নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হইলে দামে সুবিধা হয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে সমিতির যে লাভ হয় তাহাও সভ্যগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। অবশ্য সমসাময়িক কার্যকলাপের মধ্যে সুবিধাজনক সর্তে ঋণদান করাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাত্র কৃষকের নহে, মধ্যবিত্তদেরও স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল।

২। ক্ষুদ্র শিল্প

৩। ভোগ্যপণ্য ক্রয়

৪। মধ্যবিত্তের ঋণ-ব্যবস্থা

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি (Different Types of Co-operative Societies) : জার্মেনী সমবায় আন্দোলনের জন্মভূমি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম ঐ দেশে দুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন করা হয়—যথা, (ক) গ্রাম্য (rural), এবং পৌর (urban)। গ্রাম্য সমিতিগুলি কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করেন রাইফিজেন (Raiffeisen) নামক একজন সমাজ-সংস্কারক। রাইফিজেন দেখিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের চাষীদের দুঃখদৈন্যের মূলে রহিয়াছে সামান্য সুদে সহজলভ্য ঋণের অভাব এবং শোষণকারী মহাজনদের নিকট চিরস্থায়ীভাবে ঋণগ্রস্ততা। এই অবস্থার অবসানকল্পে তিনি যে-প্রকার সমিতি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 'রাইফিজেন ধরনের সমিতি' (Raiffeisen Type of Societies) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গ্রামাঞ্চলের সমিতিগুলি এই রাইফিজেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ : (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকে এবং ফলে সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয় ; (২) যাহাতে দরিদ্র কৃষক ও স্বল্পবিত্ত গ্রাম্য কারিগরগণ সহজেই সমিতির সদস্যপদ পাইতে পারে তাহার জন্য শেয়ারের মূল্য অতি অল্প রাখা হয় ; (৩) সমিতি যাহাতে মুনাফাকারী যন্ত্রে পরিণত না হয় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয় ; (৪) সদস্যদের দায়

৫। গ্রাম্য ও পৌর সমিতি

গ্রাম্য সমিতিকে রাইফিজেন ধরনের সমিতি বলা হয়

ইহার বৈশিষ্ট্য

বা দায়িত্ব অসীম (unlimited) হয়; (৫) মাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে (productive purposes) বা বিশেষ বিশেষ কারণে ঋণদান করা হয়—যথা, নূতন জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন জমির উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি; (৬) সমিতির সভ্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য করেন।

পৌর সমিতি স্থলজ-ডেলিতস্ ধরনের বলিয়া অভিহিত

জার্মেনীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তন করেন সমাজসেবী স্থলজ-ডেলিতস্ (Schulze-Delitsch)। সুতরাং, এই ধরনের সমিতি 'স্থলজ ডেলিতস্ ধরনের সমিতি' বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুলি এই স্থলজ-ডেলিতস্ ধরনের। এইপ্রকার সমিতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়ঃ (১) সমিতি অপরিচিত ব্যক্তিদের লইয়াও গঠিত হয় এবং ইহার কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না; (২) শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়; (৩) সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited) থাকে; (৪) সদস্য কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করিতেছে তাহার বিচার বিশেষ করা হয় না; (৫) বেতনভুক্ কর্মচারীদের দ্বারাই সমিতির কার্য পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইহার বৈশিষ্ট্য

রাইফিজেন এবং স্থলজ-ডেলিতস্ উভয় ধরনের সমবায় সমিতিই 'প্রধানত' ঋণদান সমিতি (credit society)।* কিন্তু ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের কার্যকারিতা রহিয়াছে—যথা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি সরবরাহ, বিক্রয়-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ, বীমাকার্য ইত্যাদি কার্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অতি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করিতে পারা যায়। ভারতে সমবায়ের এই বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটির অল্পবিস্তর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

২। ঋণদান ও অন্যান্য প্রকার সমিতি

উপরি-উক্ত সকল ধরনের সমবায় সমিতি অবশ্য এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়—যথা, হয় তাহারা ঋণদান করে, না-হয় ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করে, অথবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। এ-ধরনের সমিতিকে এক-উদ্দেশ্যসাধক (single-purpose) সমিতি বলা হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি বহু-উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) হইতে পারে—অর্থাৎ, সমিতি একই সংগে ঋণদান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ, উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ১৯৪৫ সালে সমবায় পরিকল্পনা কমিটির (Co-operative Planning Committee) রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর ভারতে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি স্থাপনের হিড়িক পড়িয়া যায়। কিন্তু ১৯৫৪ সালে সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির

৩। এক-উদ্দেশ্য-সাধক এবং বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি

সেবা সমবায়

* ঋণদান ছাড়াও ইহারা অন্যান্য কার্য করিতে পারে; তবে সাধারণত ইহারা ঋণদানেই ইহাদের কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখে।

রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ইহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। অপরদিকে ইহারই একপ্রকার পরিবর্তিত রূপ সেবা সমবায় সমিতি (service co-operatives) গঠনে ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short History of the Co-operative Movement in India) : ভারতে সমবায় আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ইহা সরকার কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষের দিকে মহাজনদের কবলে পড়িয়া কৃষকদের দুর্দশা চরমে পৌছায়। তাহাদের ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়া সরকার সিভিলিয়ান ফ্রেডারিক নিকলসনকে জার্মেনীর গ্রাম্য সমবায় সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান কারবার জন্য ঐ দেশে প্রেরণ করে। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার রিপোর্টে নিকলসন ভারতে জার্মেনীর রাইফিজেন ধরনের ঋণদান সমবায় সমিতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। মূলত এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯০৪ সালের সমবায় ঋণদান সমিতি আইন (Co-operative Credit Societies Act, 1904) পাস হয়।

নিকলসনের রিপোর্ট

আইনটির উদ্দেশ্য ছিল "কৃষক, কারিগর ও স্বল্পসহায়সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভরতা এবং সমবায় নীতির প্রসারসাধন।" এই আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রাথমিক ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতিগুলিকে গ্রাম্য ও পৌর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। গ্রাম্য সমিতিগুলি রাইফিজেন সমিতির নীতিকে অনুসরণ করে।

১৯০৪ সালের আইন ও ঋণদান সমিতি

কিছুদিনের মধ্যেই ১৯০৪ সালের আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন পাস হয়। এই আইন দ্বারা—(১) ঋণদান সমিতি ছাড়া ক্রয়বিক্রয়, উৎপাদন প্রভৃতি অন্যান্য প্রকারের সমিতিগুলি স্বীকৃত হয়। (২) প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান, হিসাব পরীক্ষার জন্য (ক) ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণপ্রদান করিবার জন্য (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও (গ) প্রাদেশিক ব্যাংক* মোট এই তিন প্রকারের কেন্দ্রীয় সংস্থার ব্যবস্থা করা হয়। (৩) পূর্বে সমিতিগুলিকে যে গ্রাম্য এবং পৌর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তে সমিতি-গুলিকে সসীম ও অসীম দায়যুক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে-সমিতির উদ্দেশ্য সভ্যদের ঋণপ্রদান করা এবং যাহার অধিকাংশ সভ্য কৃষক তাহার দায় হইল অসীম, আর যে-সমিতির সভ্য রেজিষ্ট্রারিভূক্ত সেই সমিতিসমূহের দায় হইল সসীম।

ফলে ১৯১২ সালের আইন প্রণয়ন—এই আইনের বৈশিষ্ট্য

* প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১৫ সালের ম্যাকলাগান কমিটির সুপারিশের পর।

১৯১২ সালের পর সমবায় আন্দোলন দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে। সমিতিসংখ্যা, সদস্যসংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দুগ্ধ সরবরাহ, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবাদি পশু-বীমা, সুতা ও সার ক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন ধরনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ১৯১৪ সালে সরকার ম্যাক্‌লাগান (Maclagan) কমিটি নিযুক্ত করে। এই কমিটি যে-রিপোর্ট দাখিল করে তাহাতে সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রসার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সরকার কমিটির প্রস্তাবসমূহকে কার্যকর করিতে পারে নাই। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইনে সমবায় বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত ক্ষমতাভুক্ত হইলে বিভিন্ন প্রদেশ আপনাপন প্রয়োজন অনুসারে নিজস্ব সমবায় আইন প্রবর্তন করিতে থাকে এবং আন্দোলনও আশাতীতভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজারের (Worldwide Trade Depression) ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় সমবায় আন্দোলন এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়। সমিতিগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। তখন সরকারকে সমবায় আন্দোলনের সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহিত কৃষি-ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) সংযুক্ত করা হয়। ইহা সমবায় আন্দোলনকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে থাকে।

ম্যাক্‌লাগান কমিটি

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার ও সমবায়

মন্দাবাজার ও সমবায়ের সংকট

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয় তখনও সমবায় আন্দোলন আপন অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য সমবায় আন্দোলন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে ; ফলে সমিতিগুলির অবস্থাতেও উন্নতি দেখা দেয়। দীর্ঘকালীন অনাদায়ী ঋণ কমিয়া গিয়া প্রায় অর্ধেকে দাঁড়ায়। এই সময়ের মধ্যে সমিতিগুলি এবং তাহাদের সদস্যসংখ্যাও যথাক্রমে শতকরা ৪১ এবং ৭০ ভাগের মত বাড়িয়া যায়। ইহা ব্যতীত একাধিক প্রদেশে ন্যায্য মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য ক্রেতাদের সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operatives) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উৎপাদক যাহাতে তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত বাজার-মূল্য পাইতে পারে তাহার জন্য সমবায় পন্থায় বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠিত করা হয়। ছোটখাট শিল্পগুলিকেও সরকারী সমবায় দপ্তর নানাভাবে সাহায্যদান করিতে থাকে। এই সকলের ফলে সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন পায় এক নূতন প্রেরণা। তবুও সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থায় সমবায় আন্দোলন যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহা যুদ্ধোত্তর স্বাভাবিক অবস্থায় স্থায়ী হইবে কিনা ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সমবায় আন্দোলনের প্রসার

১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই সরকার সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (Co-operative Planning Committee) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করে। কমিটি স্থপারিশ করে যে প্রাথমিক এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলিকে যথাসম্ভব বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে পরিণত করিতে হইবে এবং ১০ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাম ও শতকরা ৩০ ভাগ জনসংখ্যাকে এই প্রকার বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির অভ্যন্তরে আনয়ন করিতে হইবে। কমিটির স্থপারিশ মত কার্য স্থরু হইবার পূর্বেই আসিল দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা।

সমবায় পরিকল্পনা কমিটি

স্বাধীন ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in Free India) : স্বাধীনতা ভারতের সমবায় আন্দোলনে এক নূতন অধ্যায়ের স্থচনা করে। স্বাধীনতালাভের পর আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতিতে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

প্রথমত, সমিতি ও সদস্যসংখ্যা এবং কার্যকরী মূলধনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্নভাবেই হইয়া চলিয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে সকল প্রকার সমিতির সংখ্যা ছিল ১·৩৯ হাজার, সদস্যসংখ্যা ছিল ৯১ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৫৬ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালে সমিতিগুলির সংখ্যা হয় ২·৫৭ লক্ষ, সদস্যসংখ্যা ২·৪৪ কোটি এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৬·৯৬ কোটি টাকার উপর। সমিতি ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সমবায় আন্দোলন জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশকেই স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছে।*

বৈশিষ্ট্য : ১। সমিতি ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাংশই সমবায় আন্দোলনের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে

দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের বিভিন্ন দিকে শাখা বিস্তার করিবার প্রবণতা দেখা দিলেও এবং বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিলেও ঋণদান সমিতিগুলির প্রাধান্য এখনও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সকল প্রকার সমিতির সংখ্যা ধরিলে মোট ৭৩ ভাগ হইল ঋণদান সমিতি। এই ঋণদান সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা ও কার্যকরী মূলধন হইল যথাক্রমে মোট সদস্যসংখ্যা ও কার্যকরী মূলধনের শতকরা ৬৫ ও ৭৭ ভাগ।

২। ঋণদান সমিতিগুলির প্রাধান্য অপরিবর্তিতই রহিয়াছে

তৃতীয়ত, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতির প্রবর্তন সমবায় আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৫ সালের সমবায় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট অনুসারে স্বাধীন ভারতে এ-বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ফলে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ও সদস্যসংখ্যা বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি এবং

৩। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির প্রবর্তন আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

* Statistical Statements relating to the Co-operative Movement in India for the Year 1957-58.

উহাদের সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার এবং ৫'৫ লক্ষ। ১৯৫১-৫২ সালে সমিতি ও সদস্যসংখ্যা হয় যথাক্রমে ৪০ হাজার এবং ২১'৫ লক্ষ। ১৯৫৪ সালে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে বাধা পড়ে—কারণ জরিপ কমিটি বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির পরিবর্তে প্রধানত ঋণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করিতেই উপদেশ দেয়।

৪। রিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায় আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্ক পূর্বের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে রিজার্ভ ব্যাংক আন্দোলনকে সাহায্য করিতেছে। সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে কৃষি সংক্রান্ত কাজ-কারবার, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক অধিকমাত্রায় অর্থসাহায্য করিতেছে; ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ঋণদান-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও প্রসারসাধন কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেছে।

৫। সমবায় আন্দোলনকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির অনুগামী করা হইয়াছে

পঞ্চমত, সমবায় আন্দোলনকে অধিকমাত্রায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির অনুগামী করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের সহিত আন্দোলনের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশ যে-সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহার সমাধানে সমবায় আন্দোলনকে নিয়োজিত করা হয়। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, দুষ্প্রাপ্য নিয়ন্ত্রিত খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের বণ্টনের ভার সমবায় আন্দোলনের উপর পড়ে। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেও সমবায় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সমবায় কৃষি-সমিতি, সেচ-সমিতি প্রভৃতি ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠানও কৃষিজ উৎপাদনকে বৃদ্ধি করিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে। জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি তাহাদের ঋণদানের নীতিকে পরিবর্তিত করিয়া পূর্বের তুলনায় জমি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে ঋণপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন এবং নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সমবায় পন্থার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাদের সংগঠন ও প্রসারসাধনের জন্য সমবায় পন্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় পন্থার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে

সর্বোপরি ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলনের জন্য এক বিশিষ্ট ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়; স্বভাবতই সমবায় আন্দোলনের উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। শুধু কৃষি কেন, অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিসাধনের জন্য সমবায় পন্থাকে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। কৃষি ছাড়াও সমবায় পন্থায় পল্লী সংগঠন ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। ক্ষুদ্রায়তন

ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্যও ঐ পরিকল্পনায় সমবায় গঠনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করা হয়।

ঐ পরিকল্পনার সূত্রপাতেই (১৯৫১ সালে) গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও ইহার পুনর্গঠন সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থার যে পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তাহা পুনর্গঠিত সমবায় সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়াই করা হয়।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং নিয়োগের সংস্থান করিবার দায়িত্ব বহুলাংশে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণাংগ গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থা কার্যকর করা, কৃষি ও পল্লী সংগঠন করা ছাড়াও রাষ্ট্রকে শিল্প-ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্প্রসারণে অধিকমাত্রায় সচেষ্ট হইতে হয়। ১৯৫৮ সালে পূর্বোল্লিখিত স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবশ্য এই গতিতে কিছুটা বাধা পড়ে।** ইহার পর আবার ১৯৫৯ সালের নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী সেবা-সমবায় সমিতি (Service Co-operatives) এবং সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সুরু হয়।† অনুমান করা যাইতেছে যে বিভিন্ন স্থান হইতে বিরোধিতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাকী সময়ে এই সেবা-সমবায়ের সম্প্রসারণকার্যই চলিবে, এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার এবং সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট হইবে। সেবা-সমবায় সমিতি ও সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের সার্থক রূপদানের জন্য ইস্রায়েল, চীন, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশের সমবায় সমিতির পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে বা হইতেছে। এ-সম্পর্কে এই অধ্যায়ের শেষে আরও আলোচনা করা হইবে।

সমবায় সমিতির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Co-operative Societies) : ভারতের সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমত প্রাথমিক এবং কেন্দ্রীয়—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাথমিক সমিতিগুলি (Primary Societies) সদস্যদের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, আর ইউনিয়ন (Unions), কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Banks) ও রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক (State Co-operative Banks) প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সহিত সম্পর্কিত।

প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতি

প্রাথমিক সমিতিগুলিকে আবার ঋণদান সমিতি (Credit Societies) ও অ-ঋণদান সমিতি (Non-Credit Societies) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই দুই শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই কৃষি ও অ-কৃষি এই দুই প্রকারের সমিতি আছে। বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, জোতের

ঋণদান ও অ-ঋণদান প্রাথমিক সমিতি

* ১৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† Implementation of Nagpur Resolution—A. I. C. C. Economic Review, May, 1959.

সংহতিসাধন (consolidation of holdings), গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধন, সেচ, বীমা, বাজারিকরণ প্রভৃতি কার্য অ-ঋণদান কৃষি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়, গৃহনির্মাণ, স্থলভে কারিগরদের উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত হইল অ-ঋণদান অ-কৃষি সমবায় সমিতি। নিম্নে প্রদত্ত ছকটির সাহায্যে সমবায় সমিতিগুলির শ্রেণীবিভাগ মোটামুটিভাবে বুঝান যাইতে পারে :

ঋণদান ও অ-ঋণদান কৃষি ও অ-কৃষি সমিতি

সমবায় সমিতি (Co-operative Societies)

- প্রাথমিক সমিতি (Primary Societies)
  - ঋণদান সমিতি (Credit Societies)
    - কৃষি (Agricultural)
    - অ-কৃষি (Non-Agricultural)
  - অ-ঋণদান সমিতি (Non-Credit Societies)
    - কৃষি (Agricultural)
    - অ-কৃষি (Non-Agricultural)
- কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Societies) : (ক) ইউনিয়ন (Unions) (খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Banks) ও (গ) রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক (State Co-operative Banks)

(ক) প্রাথমিক সমিতি (Primary Societies) : প্রাথমিক সমিতিগুলিই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি। ইহাদের মধ্যে আবার কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিই সংখ্যায় সর্বাধিক। ১৯৫৭-৫৮ সালে সকল প্রকারের ২'৫৭ লক্ষ সমবায় সমিতির মধ্যে কৃষি-ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল ১'৬৬ লক্ষ বা মোট প্রাথমিক সমিতির শতকরা ৬৫ ভাগের উপর।* প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতির এইরূপ গুরুত্বের জন্য ইহাদের সম্পর্কে সামান্য বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কৃষি-ঋণদান সমিতির প্রাধান্য

প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমবায় সমিতি (Primary Agricultural Credit Societies) : অনধিক ১০ জন সদস্য লইয়া এইরূপ সমিতি গঠিত হইতে পারে। প্রত্যেকটি সমিতির কার্যক্ষেত্র সাধারণত এক একটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার উদ্দেশ্য হইল পারস্পরিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যেই সমবায় এইরূপ সমিতিগুলি সাধারণত অসীম দায়ের (unlimited liability) ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া থাকে।

গঠন

* Statistical Statements relating the Co-operative Movement in India for the year 1957-58.

মধ্যে অবশ্য গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সসীম দায়ের ভিত্তিতে বৃহদায়তন প্রাথমিক কৃষি সমিতির গঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। পরে কিন্তু ১৯৫৮ সাল হইতে স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্টের* ফলে সসীম দায়সম্পন্ন সমিতি গঠনে কিছুটা ভাঁটা পড়ে এবং সম্প্রতি সেবা-সমবায় সমিতি গঠনে গুরুত্ব আরোপ করায় পূর্ণ কৃষি-ঋণদান সমিতির প্রসারও কিছুটা ব্যাহত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক গতি

প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন শেয়ার-বিক্রয়, সভ্যদের ভর্তি ফী, সংরক্ষিত তহবিল, সদস্যদের আমানত প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সূত্র এবং সরকারী ঋণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ, সদস্য নয় এমন সমস্ত ব্যক্তির আমানত প্রভৃতি বহিঃসূত্র হইতে সংগৃহীত হয়।

কার্যকরী মূলধন

সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধনের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকারের উপর অধিক নির্ভরশীল। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৫ কোটি টাকা আর আমানতের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮.৬৩ কোটি টাকা। স্বভাবতই বাকী অংশ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা :

আমানতের অপ্রতুলতা এবং ঋণের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে সমবায় কৃষি-ঋণ আন্দোলন বিশেষ সফল হয় নাই—ইহা কৃষকগণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারে নাই।*

১। আমানতের অপ্রতুলতা—ইহা কৃষি-ঋণদান সমিতির ব্যর্থতার পরিচায়ক

সমিতিগুলি কেবল সভ্যদেরই ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। উৎপাদন, অনুৎপাদনশীল কাজকর্ম এবং পূর্বতন ঋণ পরিশোধ, এই তিন উদ্দেশ্যে ঋণপ্রদান করা হইয়া থাকে। উৎপাদনের জন্য যে ঋণপ্রদান করা হয় তাহার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণের উদ্দেশ্য হইল বর্তমান কৃষিকার্যকে সাহায্য করা আর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উদ্দেশ্য হইল কৃষিকর্মের স্থায়ী উন্নতিসাধনে সহায়তা করা। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মত অনুৎপাদনশীল কাজকর্মের জন্য ঋণপ্রদান করা সমবায় সমিতির কর্তব্য না হইলেও ঐরূপ ঋণ কৃষকদের দেওয়া হয় এই কারণে যে, অন্যথায় তাহারা মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালীন ঋণ গ্রহণের চাহিদা ব্যাপক হইলেও সমিতিগুলির পক্ষে নিজস্ব তহবিল বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মারফত প্রাপ্ত মূলধনের অপ্রাচুর্যের জন্য এইরূপ ঋণ খুব বেশী প্রদান করা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে অনেক সময় কাগজপত্রে যাহাকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা

২। ঋণপ্রদান নীতিই ত্রুটিপূর্ণ

* ১৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

আসলে হইয়া দাঁড়ায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ—কারণ অনেক সময় পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা হয়। ইহা ব্যতীত অনেক সময় দেখা যায়, যে উৎপাদনশীল কার্যের জন্য ঋণ-গ্রহণ করা হইয়াছিল উহা তাহাতে নিয়োগ না করিয়া অনুৎপাদনশীল কাজকর্মে ব্যয় করা হইয়াছে। ইহার ফলে সময় মত ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। প্রদত্ত ঋণের নিয়োগ সম্পর্কে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অব্যবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। সাধারণত ব্যক্তিগত জামিনেই ঋণপ্রদান করার নিয়ম থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রেই সম্পত্তি বন্ধক দিবার প্রয়োজন হয়। সহজ কিস্তিবন্দীতে ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। সুদ সম্পর্কে নীতি হইল যে উহা যাহাতে চাষীদের সামর্থ্যের বাহিরে না যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবুও দেখা যায়, কতিপয় রাজ্যে সুদের হার শতকরা ১২-র উপর।

৩। সুদের হারও অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক

ঋণদান বিষয়ে সমিতিগুলির বর্তমান অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ঋণপ্রদানের পরিমাণ প্রায় ৯৮ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯৭·২৯ এবং ১৩·১০ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালে উহাদের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২৭·১৫ এবং ২৪·১৮ কোটি টাকায়। অবশ্য মোট অনাদায়ী ঋণের মধ্যে দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের শতকরা ভাগ ৭·৫ হইতে কমিয়া ৫·৩ এ দাঁড়াইয়াছে।

৪। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোনদিক দিয়াই প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা সন্তোষজনক নহে, অথচ ইহারাই ভারতের সমবায় সংগঠনের ভিত্তি। সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, এই ভিত্তির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ ব্যতিরেকে সমবায়কে পুনর্গঠিত করা সম্ভব হইবে না এবং গ্রাম্য ঋণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেও রূপদান করা সম্ভব হইবে না।

জরিপ কমিটি প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে: (১) প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির কর্মক্ষেত্র বিস্তৃততর করিতে হইবে। সদস্যসংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ যাহাতে অধিক হয় তাহার জন্য একাধিক গ্রাম লইয়া সমিতি সংগঠিত করা সমীচীন। (২) বৃহদাকারের সমিতিগুলিকে সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। (৩) পর্যাপ্ত শেয়ার-মূলধন যাহাতে নিশ্চিত করা যায় তাহার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্য ব্যাংককে অর্থসাহায্য করিবে। রাজ্য ব্যাংক আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থসাহায্য করিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধন বৃদ্ধির জন্য অর্থপ্রদান করিবে। (৪) প্রাথমিক সমিতিগুলি কেবল স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিবে। (৫) প্রাথমিক সমিতিগুলি যাহাতে তাহাদের

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য জরিপ কমিটির সুপারিশ

তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখে তাহার জন্য সমিতিগুলিকে উৎসাহিত করিতে হইবে। (৬) ঋণদান ব্যাপারে শস্যের ভিত্তিতে ঋণদানের (crop loans) উপর অধিক লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন উৎপাদনকার্যের জন্য মধ্যমেয়াদী ঋণ (medium-term loans) প্রদান করিতে পারে। (৭) প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতি এবং বিক্রয় সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করিবার সর্তে প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতি সভ্যদের ঋণপ্রদান করিবে। (৮) অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের সমিতিতে বেতনভুক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মসচিব থাকিবে।

স্যর ম্যালকমের সমালোচনা

১৯৫৪-৫৫ সাল হইতেই এই সকল সুপারিশ অনুসারে কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বৃহদায়তন ও সসীম দায়ের ভিত্তিতে গঠিত প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতির সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। পরে ১৯৫৮ সালে স্যর ম্যালকম ডার্লিং এই গতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে বিশেষ বিচার-বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিলে এই গতি কিছুটা ব্যাহত হয়। কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিকে বৃহদায়তনে ও সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করার অর্থ হইল রাইফিজেন আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লওয়া। স্যর ম্যালকমের মতে, ইহা করিবার পূর্বে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এখনই এই সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। বর্তমানে সেবা-সমবায় (Service Co operatives) সমিতি গঠন ব্যাপারে স্যর ম্যালকমের এই নীতিকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। ঘোষণা করা হইয়াছে যে ইহারা সাধারণত এক একটি গ্রাম লইয়া অসীম দায়ের ভিত্তিতেই গঠিত হইবে।* প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ভবিষ্যতে এই সেবা সমিতিগুলিই প্রাথমিক কৃষি-ঋণ সমিতির স্থানাধিকার করিবে।

(খ) **কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান (Central Co-operative Societies) :** কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন তিন ধরনের হয়—যথা, তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ইউনিয়ন। (১) তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়ন (Supervising Unions) : প্রত্যেক সমবায় ইউনিয়ন একাধিক প্রাথমিক সমিতি লইয়া গঠিত হয়। কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিগুলিই ইহাদের সদস্য হইতে পারে। ইউনিয়নের কাজকর্মের ভার সভ্য-সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ইউনিয়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। ইহাদের কার্যের মধ্যে অন্যতম হইল প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান করা এবং উহাদের সহিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির সংযোগ স্থাপন করা। তত্ত্বাবধানকারী ইউনিয়নগুলির অধিকাংশই বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যায় নিতান্ত অল্প না হইলেও ইউনিয়নগুলি বিশেষ সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই।

সমবায় ইউনিয়নের গঠন

ইহাদের কার্য

* A. I. C. C. Economic Reivew May, 1959.

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন (Central Banks and Banking Unions) : ভারতে প্রাথমিক সমিতিগুলির মূলধন পর্যাপ্ত নহে, এইজন্যই প্রয়োজন হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং রাজ্য ব্যাংকের মত কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের। ইহাদের সাহায্যে প্রাথমিক সমিতিগুলি নিজেদের কাজকর্মের জন্য বাহির হইতে অর্থের সংস্থান করিতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলির মূলধনের ঘাটতি বা বাড়তির সমন্বয়সাধনের কেন্দ্র (balancing centre) হিসাবে কার্য করে। অর্থাৎ, যে-সমস্ত প্রাথমিক সমিতির হাতে বাড়তি মূলধন পড়িয়া থাকে তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করিয়া যে-সমস্ত সমিতিতে অর্থের অভাব দেখা দেয় তাহাদের সাহায্য করে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির এইভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা অপেক্ষা মূলধন সংগ্রহ করিয়া প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্য প্রদান করাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সাহায্য করা ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক আমানত গ্রহণ, বিল, চেক ও হুণ্ডির অর্থ আদায়, মূল্যবান সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা প্রভৃতি ব্যাংকিং কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কোন কোন রাজ্যে ব্যক্তিবিশেষকেও ঋণপ্রদান করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী

প্রথম পরিকল্পনার শুরু হইতে এ-পর্যন্ত ভারতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়নগুলির গতি ও কার্যবিবরণ নিম্নলিখিত ছকটি হইতে পাওয়া যাইবে :

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং ইউনিয়ন

	১৯৫০-৫১	১৯৫৭-৫৮
সংখ্যা	৫০৯	৪১৮
সদস্যসংখ্যা (লক্ষ)	২·৩১	২·৯২
প্রদত্ত ঋণ (কোটি টাকায়)	১০৫·৬৪	১৫৯·৮৬
কার্যকরী মূলধন "	৬০·১১	১৪৭·০০

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইউনিয়নগুলি তাহাদের কার্যকরী মূলধনের জন্য আমানতের উপর অধিক নির্ভরশীল। শেয়ার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ আশানুরূপ নহে। পূর্ববর্তী বৎসর বা ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধনের মাত্র ১৭ ভাগ ছিল নিজস্ব তহবিল, আমানতের শতকরা ভাগ ছিল ৫৩ এবং বাকী ৩০ ভাগ ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত হইয়াছিল।

মূলধন : কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ আসে আমানত হইতে

এই অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় সংগঠনের পক্ষে কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ আসিবে নিজস্ব তহবিল (owned funds)—যথা, শেয়ার হইতে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত তহবিল হইতে। অতএব ব্যাংকগুলির পক্ষে নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির আর একটি অসন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য হইল অনাদায়ী ঋণ ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণের আধিক্য। ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল ১১'৯০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আবার যে ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিলেই চলে (bad and doubtful debts) তাহার শতকরা ভাগ হইল ১৩।

অনাদায়ী ঋণ ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণবৃদ্ধি আর একটি ত্রুটি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থার উন্নতিকল্পে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে :

(১) যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ না হয় তাহার জন্য সাধারণত প্রত্যেক জিলায় মাত্র একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকিবে।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

(২) শেয়ার মূলধনের অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ রাজ্য সরকার যোগান দিবে।

(৩) ঋণপ্রদান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমিতিগুলির প্রয়োজনকে প্রথম স্থান দিবে। ব্যক্তিবিশেষকে ঋণপ্রদান সংকুচিত এবং ব্যবসায়ীদের ঋণপ্রদান বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক কাজকর্মে লিপ্ত হইবে না।

উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি কিছু কিছু কার্যকর করায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক-গুলির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ব্যাংকগুলির মোট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১'১৮ কোটি টাকা; ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা বাড়িয়া ২'১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে কিন্তু মুনাফা অর্জনে সক্ষম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংখ্যা ৩৭৪ হইতে কমিয়া ৩৫৬-তে পরিণত হয়।*

(গ) রাজ্য সমবায় ব্যাংক (State Co-operative Banks) : রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক সমবায় আন্দোলনের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। ১৯১৫ সালের ম্যাক্‌লাগান কমিটির সুপারিশ অনুসারে তৎপরবর্তী কালে বৃহৎ প্রদেশগুলিতে একটি করিয়া প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়।** প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে যেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির পক্ষে সেইরূপ রাজ্য সমবায় ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে অর্থসাহায্য, তাহাদের কার্যের শৃংখলাসাধন ও তাহাদের কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি-বাড়তির সমন্বয়সাধনেই রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উপযোগিতা। রাজ্য সমবায় ব্যাংক টাকার বাজারের সহিত সমবায় আন্দোলনের যোগসূত্র। রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কও রাজ্য ব্যাংকের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। প্রয়োজন হইলে রাজ্য ব্যাংক সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত রাজ্য

কার্যাবলী

* Statistical Statement relating to the Co-operative Movement in India for the year 1957-58.

** পূর্বে ইহাদিগকে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক (Provincial Co-operative Bank) বলা হইত।

ব্যাংক প্রাথমিক সমিতিগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করে না। ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি আবার প্রাথমিক সমিতি-গুলিকে ঋণদান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজ্য ব্যাংক পরোক্ষভাবে প্রাথমিক সমিতি-গুলিকে ঋণ পাইতে সাহায্য করিয়া থাকে।

গঠন

রাজ্য ব্যাংকগুলির গঠন সম্পর্কে বিভিন্নতা দেখা যায়। পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবের সমবায় সমিতিগুলিই কেবল রাজ্য ব্যাংকের সদস্য হইতে পারে। অন্যান্য রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংকে সমিতি ও ব্যক্তিবিশেষ উভয় শ্রেণীর সদস্যই আছে।

নিম্নলিখিত ছকটি হইতে প্রথম পরিকল্পনার সুরু হইতে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ব্যাংক-গুলির অবস্থা বুঝা যাইবে ঃ

রাজ্য সমবায় ব্যাংক

	১৯৫০-৫১	১৯৫৭-৫৮
রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা	১৬	২১*
সদস্যসংখ্যা	২৩,২৭২	৩২,১৮১
শেয়ার মূলধন	১'৯ কোটি টাকা	৪'৩৬ কোটি টাকা
মোট নিজস্ব তহবিল	৩'৮ "	৭'৬৫ "
আমানত	১৯'১ "	৩৬'৬৭ "
বিভিন্ন সূত্র হইতে গৃহীত ঋণ	১১'২ "	৮৬'২৩ "
কার্যকরী মূলধন	৩৬'৭১ "	১০৯'১৪ "
প্রদত্ত ঋণ	৫৫'৭২ "	২১৯'০১ "
দীর্ঘ অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ	২০'০১ "	৫৫'০০ "

রাজ্য ব্যাংকের অবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনায় সন্তোষজনক

ছকটি হইতে দেখা যাইবে রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা এবং উহাদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; শেয়ার-মূলধনের পরিমাণও বর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু নিজস্ব তহবিল (শেয়ার মূলধন, সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল লইয়া গঠিত) বৃদ্ধি পাইলেও উহা কার্যকরী মূলধনের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ মাত্র। বাকী ৯৩ ভাগ আমানত ও অন্যান্য ঋণ হইতে প্রাপ্ত। রাজ্য ব্যাংকগুলি প্রদত্ত ঋণ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অনাদায়ী ঋণের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক। যাহা হউক, মোটের উপর রাজ্য ব্যাংকগুলির আর্থিক অবস্থা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির তুলনায় অনেক ভাল।

* সংযুক্তি সাধনের ফলে রাজ্য ব্যাংকের সংখ্যা ২৩ হইতে কমিয়া ২১ এ দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৬টির সংগে রিজার্ভ ব্যাংকের কাজকারবার চলিতেছে।

রাজ্য সমবায় ব্যাংকের উন্নতিসাধনের জন্য সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে : (১) সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও রাজ্য ব্যাংকের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে এমন অন্যান্য ব্যাংকগুলিকেই রাজ্য ব্যাংকের সভ্যপদভুক্ত করা হইবে। ব্যক্তিবিশেষকে অতি অল্প সংখ্যায় সদস্যপদ দেওয়া যাইতে পারে। (২) রাজ্য সরকার শেয়ার-মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ যোগাইবে। (৩) ঋণদান বিষয়ে রাজ্য ব্যাংক কৃষি ঋণ-দানকে প্রথম স্থান দিবে; ব্যবসায়িগণকে ঋণদান ক্রমশ কমাইয়া দিতে হইবে। (৪) রাজ্য ব্যাংককে সমবায় ব্যাংকের বাড়তি অর্থের জিম্মাদার করিতে হইবে; এইজন্য যাহাতে সমস্ত সমবায়িক কেন্দ্রীয় অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের বাড়তি অর্থ রাজ্য ব্যাংকে বিনিয়োগ করে তাহার ব্যবস্থা আইনের দ্বারা করিতে হইবে।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

সমবায়ের পুনর্গঠন কার্যে উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহকে কার্যকর করা হইতেছে। রাজ্য সরকারসমূহ উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে রাজ্য ও অন্যান্য সমবায় ব্যাংকের শেয়ার-মূলধন যোগাইতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতিতে রাজ্য সরকারগুলির শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৬·৫০ কোটি টাকা।

পৌর সমবায়িক ঋণ-ব্যবস্থা (Urban Credit) : পৌর সমবায় ঋণদান আন্দোলনও উল্লেখযোগ্য। পৌর ঋণদান সমিতিগুলি নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের অথবা অফিসের কর্মচারী কিংবা কারখানার শ্রমিকদের মত নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদের ঋণদান করে। গ্রাম্য ও পৌর ঋণদান সমিতির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে। পৌর সমিতির সদস্যসংখ্যা অধিক হইতে পারে, সদস্যদের দায়িত্ব সাধারণত সীমাবদ্ধ এবং উচ্চ হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিবার ব্যবস্থা থাকে। পৌর সমিতিগুলিকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—যথা, (১) পৌর ব্যাংক (Urban Banks); এবং (২) বেতনভুক কর্মচারীদের সমিতি, মিল-কর্মচারীদের সমিতি প্রভৃতি ধরনের সহরাঞ্চলের অন্যান্য ঋণদান সমিতি।

গ্রাম্য ও পৌর ঋণদান সমিতির মধ্যে পার্থক্য

অনেকক্ষেত্রে ব্যাংক সংক্রান্ত সকল রকমের কাজকর্মই পৌর সমবায়িক ব্যাংকগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহারা শুধু আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করিয়াই থাকে।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্যেই পৌর ঋণদান সমিতিগুলি অধিক প্রসারলাভ করিয়াছে।

অন্যান্য ধরনের সমবায় আন্দোলন (Other Aspects of Co-operation) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমবায়ের বিভিন্নমুখী প্রসার ঘটে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণের পর হইতে ইহা আরও ব্যাপক হয়। বর্তমানে শুধু ঋণদান নহে, বিভিন্ন উৎপাদন ও বিনিময় ক্ষেত্রেও সমবায়ের ভূমিকা রহিয়াছে। এখন প্রথমে উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) **সমবায় ও কৃষিজ উৎপাদন (Co-operation and Agricultural Production)** : কৃষির ক্ষেত্রে অধিক খাদ্য উৎপাদন, সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি-জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, জমির ক্ষয় নিবারণ, জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কার্যের সহিত সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত আছে। ইহাদের মধ্যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনা (Co-operative Farming) অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঘটনা। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য পরিচালনার জন্য স্থাপিত সমিতি বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে—যথা, যৌথ কৃষিকার্য সমিতি (Joint Farming Societies), কৃষি-প্রজা সমিতি (Tenant Farming Societies) এবং উন্নত ধরনের কৃষিকার্য সমিতি (Better Farming Societies)। ইহাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ভূমি-সংস্কার প্রসংগে পরে করা হইবে।

১। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য

২। সমবায়িক সেচ

সমবায় কৃষি-সমিতি ছাড়া সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে সেচ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দিকে অগ্রণী হইল বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশ।

৩। শস্য-সংরক্ষণ সমিতি

অনেক রাজ্যে আবার জন্তু-জানোয়ার ও চোরের হাত হইতে ক্ষেতের শস্য সংরক্ষণের জন্য শস্য-সংরক্ষণ ও বেড়ানির্মাণ সমিতি (Crop Protection and Fencing Societies) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা পাহারাদার নিয়োগ এবং বেড়ানির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষেতের শস্যকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে।

৪। কৃষি-জমি ও গো-প্রজনন সমিতি

কৃষিজ উৎপাদনের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য প্রকারের সমবায় সমিতির মধ্যে উপনিবেশন (Land Colonisation), পতিত জমির পুনরুদ্ধার (Land Reclamation), জমির জোতের সংহতিসাধন (Consolidation of Holdings), গো-প্রজনন (Cattle-breeding) প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত সমবায় সমিতিসমূহই প্রধান। ইহারা সকল রাজ্যে সমভাবে প্রসারলাভ না করিলেও বর্তমানে মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে ইহাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

৫। সমবায় দুগ্ধ সমিতি

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায় নীতি বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় পন্থায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ও যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

বর্তমানে মাদ্রাজ, পশ্চিমবংগ, উত্তরপ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে দুগ্ধ ব্যবসায়ে সমবায় আন্দোলন কতকটা প্রসারলাভ করিয়াছে।

(খ) **সমবায় ও শিল্পজ উৎপাদন (Co-operation and Industrial Production)** : কৃষির ন্যায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় পন্থা বিশেষ উপযোগী। বস্তুত দরিদ্র কৃষক এবং কুটিরশিল্পীদের সমস্যা প্রায় একই প্রকৃতির।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সমবায়

কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। তাহাদের এমন কোন সম্বল নাই যাহার জামিনে তাহারা সহজে ঋণ পাইতে পারে। ফলে তাহাদিগকেও মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদির শরণাপন্নও হইতে হয়। ইহারাও কারিগরদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে স্বল্পমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। ইহা ব্যতীত কারখানাদার বা মালিক-কারিগররাও আছে। ইহারা মহাজন কিংবা ব্যবসাদার অপেক্ষাও অধিকমাত্রায় ছোটখাট কারিগরদের শোষণ করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা ও অর্থের যোগান দিয়া শিল্পীদের বেতনভুক শ্রমিকে পরিণত করে।

কুটির শিল্পীদের সমস্যা

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের জন্য নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহের অভাব কুটির শিল্পের একটি প্রধান দুর্বলতা। কুটির শিল্পী বিচ্ছিন্নভাবে অল্প পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করে বলিয়া জিনিসও ভাল হয় না এবং দামও বেশী পড়ে। তৃতীয়ত, কুটির শিল্পের উপযোগী উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করাও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ইহা সহায়সম্বলহীন কুটির শিল্পীদের আয়ত্বের বাহিরে এবং ফলে তাহাদের চিরাচরিত যন্ত্রপাতি লইয়াই কোন রকমে কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। চতুর্থত, মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের লোভ ও লাভ কারিগরদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। দ্রব্যের বিক্রয়করণ-ব্যবস্থা না থাকায় নিঃসহায় ও অজ্ঞ কারিগরদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

কিভাবে সমবায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সহায়তা করিতে পারে

এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল সমবায়। উৎপাদন, কাঁচামাল ক্রয়, অধিক মূল্যের আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উৎপাদিত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় ইত্যাদি সমস্তই সমবায় সংগঠনের দ্বারা সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে সমবায় সংগঠনই সংরক্ষিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে যে-সমস্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে তাহারাও মত প্রকাশ করিয়াছে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে পুনঃসঞ্জীবিত ও সংরক্ষিত করিতে হইলে সমবায় সংগঠন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসারসাধনের জন্য সমবায় সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।* এ-সম্পর্কে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসংগে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

শিল্প-সমবায়ের মধ্যে তন্তুবায় সমিতির প্রাধান্য

বর্তমানে ভারতে যে-সমস্ত দিকে শিল্প-সমবায় আন্দোলন প্রসারলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে বয়ন শিল্পই প্রধান। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ১১ হাজার শিল্প-সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৬ হাজারের উপর। তন্তুবায় সমিতি সমবায়িক আন্দোলনে মাদ্রাজই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। পশ্চিমবংগ, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও কেরালা রাজ্যেও তন্তুবায় সমিতিগুলিও মোটামুটিভাবে সক্রিয়।

* Second Five Year Plan--২২৯ ও ৪৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা এবং First Five Year Plan (A Summary)—অষ্টম অধ্যায়।

অন্যান্য রাজ্যে এই আন্দোলন যে বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই তাহার কারণ হইল, কোন কোন রাজ্যে প্রাথমিক সমিতিসমূহের কার্যের সমন্বয়সাধন, কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সমবায়িক প্রতিষ্ঠান নাই ; আর যে-সমস্ত রাজ্যে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন লওয়া হয় না। উৎপাদন ও বিক্রয়করণ পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত। পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে অন্য কোন প্রচেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না।

এই আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ না করিবার কারণ

(গ) সমবায় ও ভোগ্যপণ্য ক্রেতা (Co-operation and the Consumer) : ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের মধ্যে সমবায় বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হইল ব্যবহার্য দ্রব্য সুবিধা দরে ক্রয় করিয়া সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় করা। ইহাতে খাঁটি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় এবং প্রতারণার হাত এড়ান যায়।

ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভোগ্যপণ্য ক্রেতা সমিতি অতি সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছিল। যুদ্ধাবস্থায় নিত্যব্যবহার্য বহু দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া পড়ে ; চোরা কারবার আশংকাজনক রূপ ধারণ করে। এমত অবস্থায় সরকার এই সমস্ত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সমবায় সমিতির হাতে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির বণ্টনভার অর্পণ করে। ফলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী সমবায় সমিতি ও সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা এবং উহাদের ব্যবসায় আশাতীতভাবে প্রসারলাভ করিতে থাকে। এই প্রসার ১৯৫০-৫১ সালের প্রথম কয়েক মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। ইহার পর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইলে ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহকারী সমবায় আন্দোলনে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। সমিতিগুলিকে তখন সংগঠিত ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইতে হয়। জিনিসপত্রের দাম পড়িয়া যাওয়ায় অসুবিধা আরও প্রকট হইয়া উঠে। অনেক সমিতিই এই নূতন অবস্থার চাপ সহ্য করিতে পারে নাই। অবশ্য যেসব সমিতি যথাযথভাবে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিয়াছিল তাহারা নূতন দিকে ব্যবসা প্রসার করিয়া টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আসাম ও মাদ্রাজেই ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সুসংগঠিত। ঐ দুই রাজ্যে আন্দোলন গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হইয়াছে। তবে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই বলা যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে সমগ্র ভারতে ক্রেতা সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৮,০৭৭ এবং ইহাদের পণ্য বিক্রয়ের মূল্য ছিল মাত্র ৪৪½ কোটি টাকা।

ক্রেতা সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই

ভারতের ভোগ্যদ্রব্য ক্রেতা সমিতিগুলির অসফলতার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি রহিয়াছে : (১) সমিতির প্রতি সদস্যদের আনুগত্যের অভাব ; (২) সুদক্ষ পরিচালনা ও

যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাব ; (৩) পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টির প্রতি অমনোযোগ ; (৪) নগদ দামে এবং সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় সীমাবদ্ধ করিবার নীতি প্রতিপালনে উপেক্ষা।

(ঘ) **সমবায়িক বিক্রয়-ব্যবস্থা (Co-operative Marketing) :** ভারতে কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি এবং এই সকল ত্রুটি দূরীকরণে সমবায়ের কার্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে উপযোগিতা সত্ত্বেও সমবায়িক কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা এখনও বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। তবে সম্প্রতি এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।* বর্তমানে সকল প্রকারের বিক্রয়করণের সমিতির মোট সংখ্যা ২০ হাজারের কিছু বেশী হইবে। ইহার মধ্যে ২ হাজারের কিছু অধিক বিক্রয়করণ ইউনিয়ন ও ফেডারেশন (Marketing Unions and Federations) এবং বাকীগুলি প্রাথমিক বিক্রয়করণ সমিতি (Primary Marketing Societies)। কয়েকটি রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য বিক্রয়করণ সমিতিও (State Marketing Societies) আছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে সকল প্রকার বিক্রয়করণ সমিতির বিক্রীত পণ্যের মূল্য ছিল ১২ কোটি টাকার উপর।

সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার সামান্য প্রসার

বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের ইক্ষু সমিতি, বোম্বাই রাজ্যের তুলা সমিতি, বিহার রাজ্যের ইক্ষু সমিতি ও মাদ্রাজের তামাক সমিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে ফল ও শাকশব্জী বাজারিকরণের জন্য কিছু কিছু সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতি

মাদ্রাজের সমবায়িক বিক্রয়করণ আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 'নিয়ন্ত্রিত ঋণ পরিকল্পনা' (Controlled Credit Scheme)। এই পরিকল্পনা অনুসারে কৃষকদের প্রয়োজনমত কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণদান করা হয় এবং ঋণ পরিশোধ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সহিত সম্পর্কিত করা হয়। ঋণ গ্রহণের সময় কৃষককে এই চুক্তি করিতে হয় যে, স্থানীয় প্রাথমিক ঋণদান সমিতি বা সংশ্লিষ্ট বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে তাহাকে পণ্য বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সমিতির পাওনা কাটিয়া রাখিয়া বাকী অর্থ কৃষককে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা যে বিশেষ সফলতা অর্জন করিয়াছে ইহা বলা যায় না।

মাদ্রাজের নিয়ন্ত্রিত ঋণ পরিকল্পনা ও বিক্রয়করণ

সমবায় বিক্রয়করণ আন্দোলন প্রসার না হইবার কতকগুলি স্পষ্ট কারণ রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কচ্যুতভাবে বিক্রয়করণ আন্দোলনকে সফলকাম করা যায় না।

* ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ

উৎপাদকের হাত হইতে ভোক্তার হাতে পণ্য পৌঁছান পর্যন্ত যে-সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে ইহাদের সমস্তগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের উন্নতিসাধন, অধিকতর পরিমাণে অর্থসাহায্য, পণ্য গুদামজাত করিবার সুব্যবস্থা, উৎপাদিত পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পূর্বে যে-সমস্ত প্রক্রিয়ার (processing) প্রয়োজন তাহা সমবায় পন্থায় সংগঠিত করা, সুদক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমবায়িক বিক্রয়করণকে সফল করিয়া তুলিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সরকারকেও আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তত্ত্বাবধান, সুদক্ষ পরিচালনার ব্যবস্থা, সমিতির মূলধনের যোগান প্রভৃতির সাহায্যে সরকার আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারে।

অসফলতার কারণ

১৯৫৪ সালের সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় বিক্রয়করণ সম্পর্কে বিস্তৃত সুপারিশ করে। কমিটির মতে, (১) প্রাথমিক ও অন্যান্য পর্যায়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা বা উহাদের পুনর্গঠন করিতে হইবে। (২) বিক্রয়করণ ইউনিয়ন বা ফেডারেশনগুলিকে হয় আঞ্চলিক আর না-হয় পণ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। (৩) প্রাথমিক ঋণদান সমিতি ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকিবে। (৪) সমবায় বিক্রয়করণ সমিতির মাধ্যমেই পণ্য বিক্রয় করিতে হইবে এই সর্তে ঋণদান করা হইবে। (৫) সমস্ত প্রকারের বিক্রয়করণ সমিতির শেয়ার-মূলধনের অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ সরকারকে যোগান দিতে হইবে।

সমবায় বিক্রয়করণ সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

কমিটি আরও সুপারিশ করে যে বিভিন্ন সমবায়িক কাজকর্মের, বিশেষত বিক্রয়-করণ-ব্যবস্থার, সুপরিকল্পিত প্রসারসাধনের জন্য একটি 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড' (a National Co-operative Development and Warehousing Board) থাকিবে। ইহা ব্যতীত পণ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণের ও নিয়ন্ত্রিত বাজার পরিচালনার জন্য একটি 'সর্ব-ভারতীয় পণ্য-সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান' (an All-India Warehousing Corporation) এবং রাজ্যগুলিতে 'রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী' (State Warehousing Companies) থাকিবে। বড় বড় গ্রামগুলিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুদাম নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে উৎসাহিত করিতে হইবে। জাতীয় সমবায়িক উন্নয়ন ও গুদামঘর বোর্ডের পরিচালনাধীন 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল' (National Co-operative Development Fund) এবং 'জাতীয় গুদামঘর উন্নয়ন তহবিল' (National Warehousing Development Fund) নামে দুইটি তহবিল সৃষ্টি করিতে হইবে। রাজ্য সরকারগুলি যাহাতে বিক্রয়করণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মে লিপ্ত সমবায় সমিতিগুলির শেয়ার-মূলধনের যোগান দিতে পারে তাহার জন্য বোর্ড জাতীয় সমবায়িক তহবিল হইতে উহাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান

করিবে। আর জাতীয় গুদামঘর উন্নয়ন তহবিলের সাহায্যে বোর্ড সর্ব-ভারতীয় গুদামঘর প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য গুদামঘর কোম্পানীগুলিকে অর্থসাহায্য করিবে। ইহা ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (The State Bank of India) বিক্রয়করণ সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিবে।

সাধারণভাবে উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়। সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থাকে অংগীভূত করিয়া গ্রাম্য ঋণের পূর্ণাংগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল এবং জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল গঠন করা হয়; কৃষিজ পণ্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) করপোরেশন আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়; বিভিন্ন রাজ্যও পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপনের দ্বারা কার্যে অগ্রসর হয়। এ-সম্পর্কে কৃষি-ঋণ ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থার প্রসংগে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।*

(ঙ) সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি (Co-operative Housing Societies, Co-operative Insurance Societies) : উপরি-উক্ত ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ভারতে কিছু কিছু সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি, সমবায় বীমা সমিতি প্রভৃতি আছে। গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি বাস্তুহারাদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু বর্তমানে ইহারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারলাভ করিতেছে।

সমবায় বীমা আন্দোলন এ পর্যন্ত যতটুকু প্রসারলাভ করিয়াছে তাহা জীবন ও অগ্নি-বীমাতেই সীমাবদ্ধ; এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবংগ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ এই কয়েকটি রাজ্যে মাত্র বীমা সমিতিগুলি অবস্থিত। সম্প্রতি অবশ্য কয়েকটি রাজ্যে শস্য-বীমা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে মাত্র ৩০টি সমবায় বীমা সমিতি ছিল।

অন্যান্য ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠান

সমবায় সংগঠনের অন্যান্য রূপের প্রকাশ হিসাবে উন্নততর জীবনযাপন সমিতি (Better Living Societies), স্বাস্থ্য সমিতি এবং চিকিৎসা-সাহায্য সমিতি (Health Societies and Medical Aid Societies), শিক্ষা সমিতি (Educational Societies) প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। এই সকল সমিতিও অল্প সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি (Multi-purpose Co-operative Societies) ঃ কিছুদিন পূর্বে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির দিকে এই প্রবণতার মূলে মতবাদ ও প্রয়োজনীয়তা—উভয়েরই প্রভাব ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গ্রাম্য জীবনের সমস্যা একমাত্র ঋণপ্রদানের সাহায্যেই সমাধান

* ১৩৮ এবং ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

করা যায় না। গ্রামবাসীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক অংগাংগিভাবে জড়িত বলিয়া ঋণদান সমিতি তাহার কার্য কেবলমাত্র ঋণদানে সীমাবদ্ধ রাখিয়া গ্রাম্য জীবনের কোন বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং সমবায় সমিতিকে এমনভাবে সংগঠিত করিতে হইবে যাহাতে সমিতি গ্রামবাসীর আর্থিক জীবনের সমস্ত দিক তো বটেই, সম্ভব হইলে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকেরও উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই মতবাদের সহিত যোগ হয় যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বণ্টন-ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর অবস্থায় বহু সমিতিই খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যাদি বণ্টনের ভার গ্রহণ করে।

বহু-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতি প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক

যে সকল কমিশন ও কমিটি বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছে তাহার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ বিভাগ, সমবায় সম্পর্কিত মাদ্রাজ কমিটি (১৯৪০), কংগ্রেস কৃষি-সংস্কার কমিটি এবং সমবায় পরিকল্পনা কমিটির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমবায় পরিকল্পনা কমিটির মতে, প্রাথমিক সমিতিগুলিকে এমনভাবে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত করিতে হইবে যে যেন উহারা সভ্যদের সাধারণ অর্থ নৈতিক উন্নতির কেন্দ্র হিসাবে কার্য করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সমিতিগুলিকে—(১) শস্য উৎপাদনের জন্য অর্থ-সাহায্য করিতে হইবে; (২) উৎপন্ন শস্য নিকটতম সমবায়িক বিক্রয়করণ সমিতির মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৩) সার, বীজ ও চাষের যন্ত্রপাতি এবং কাপড়, লবণ, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈলের মত ভোগ্যপণ্য চাষীকে সরবরাহ করিতে হইবে; (৪) নিকটতম ডেয়ারীর জন্য দুগ্ধ সংগ্রহের প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিতে হইবে; (৬) সভ্যগণের ব্যবহার্য কৃষিযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে; এবং (৬) সর্বতো-ভাবে তাহাদের আয়বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

এই প্রকার সমিতি প্রবর্তনের সুপারিশ

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(১) গ্রাম্য মহাজন কেবল ঋণের কার্যই করে না; সে ব্যবসায় পরিচালনাও করে। ঋণগ্রহণ ব্যতীত কৃষক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি ক্রয় এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য তাহার নিকট যায়। সুতরাং মহাজন বা সাহুকরের হাত হইতে চাষীদের রক্ষা করিতে হইলে সমবায় সমিতিকে ঋণদান ব্যতীত ক্রয়বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিতে হইবে।

সপক্ষে যুক্তি:
১। এইরূপ সমিতি কৃষককে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করে

(২) এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি তাহার সভ্যদের নিকট হইতে আনুগত্য ও সহযোগিতা পাইতে পারে না—কারণ যতদিন পর্যন্ত ঋণ পাইবার আশা থাকে ততদিন পর্যন্তই তাহারা

সমিতিতে থাকে। অপরপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি সভ্যদের সহিত প্রতিনিয়ত সম্পর্ক স্থাপন এবং বিভিন্ন দিকে তাহাদের প্রকৃত উপকারসাধন করে বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিকমাত্রায় আনুগত্য পাইতে সমর্থ হয়। সুতরাং সমিতিগুলিকে বহু-উদ্দেশ্যমুখী করিয়া তোলা প্রয়োজন।

২। ইহা সভ্যদের অধিক আনুগত্য পাইতে সমর্থ হয়

(৩) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে ব্যয়সংক্ষেপ এবং সুদক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করা যায়। কারণ, সমিতির আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও কর্মপরিধি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বলিয়া কর্ম-পরিচালনার জন্য বেতনভুক দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

৩। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ ও সুদক্ষ পরিচালনা সম্ভব হয়

(৪) এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠার ধারণা সর্বতোভাবে কার্যকর করিতে হইলে কৃষকের আর্থিক উন্নতি সম্পর্কিত যতগুলি সমস্যা আছে তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইভাবে ভারতের সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করা অসম্ভব বলিলেও চলে। অসম্ভব না হইলেও এই ব্যবস্থা দ্বারা শক্তি ও সংগতি অপচয় করা হইবে।

৪। বহু সমিতি গঠন অপচয়মূলক

(৫) কৃষকের সর্বাংগীণ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সাধারণ কৃষকের শিক্ষাদীক্ষা নাই, তাহার দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ এবং জীবনযাত্রার উন্নয়ন করিবার প্রেরণা সে কোথাও হইতে পায় না। এই অবস্থায় তাহাকে বিভিন্ন ধরনের সমিতির সদস্য হইবার জন্য উৎসাহিত করা বিশেষ কঠিন। সে একই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাহার বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতে চায় এবং গ্রাম্য মহাজনের নিকট হইতে এই সুবিধা পাইতে সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কৃষকের একাধিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। অজ্ঞ রক্ষণশীল কৃষককে একসংগে বহু সমিতিতে যোগদান করান কষ্টকর

(৬) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির বিভিন্ন প্রকারের কার্য থাকায় কোন এক দিকে ক্ষতি হইলে তাহা অন্যান্য দিকের লাভের সাহায্যে পূরণ করা সম্ভব হয়।

৬। ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাও অল্প

(৭) ঋণদান সমিতিগুলির কার্য সীমাবদ্ধ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই ইহারা নিষ্প্রাণ। ইহাদের মধ্যে কর্মতৎপরতা আনয়ন এবং প্রাণ সঞ্চারিত করিবার উপায় হইল ইহাদের বহু-উদ্দেশ্যসম্পন্ন করিয়া তোলা।

৭। ঋণদান সমিতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের সম্ভাবনা

(৮) বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির আর একটি সুবিধা হইল যে, ইহার শক্তি ও সামর্থ্য অধিক হওয়ায় ইহা স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। সর্বোপরি বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিই হইল গ্রাম্য জীবনের সংস্কারসাধনের উপযুক্ত সংস্থা।

৮। ব্যাপক গ্রাম্য জীবনের সমস্যার সমাধান

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রবর্তনের বিপক্ষেও অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ১৯২৮ সালের কৃষি সম্পর্কিত রাজকীয় কমিশন (Royal Commission of Indian Agriculture) তাহার রিপোর্টে এইরূপ মত প্রকাশ করে: "নীতির দিক হইতে এক-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমিতিই হইল শ্রেষ্ঠ; এক একটি করিয়া কার্য করাই সমীচীন পন্থা।" ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিরও অবতারণা করা হইয়া থাকে: (১) ঋণদান সমিতির কার্য পরিচালনা করা যত সহজ এবং উহার নীতিগুলি যত সহজবোধ্য বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির কার্য তত সহজসাধ্য নয়; নীতিও গ্রামবাসীদের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। উপরন্তু, সুদক্ষ পরিচালকের অভাবও রহিয়াছে।

বিপক্ষে যুক্তি: নীতির যুক্তি

১। পরিচালনা সহজ-সাধ্য নয়

(২) একই সমিতির পক্ষে একাধিক কার্য সম্পাদন করিবার বিপদও আছে। এক দিকের ব্যর্থতা অন্যান্য দিকের কার্যে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।

২। এক দিকের ব্যর্থতার বিপদ

(৩) আবার বলা হয় যে, ঋণদান সমিতির অর্থ যোগান এবং সভ্যদের পারস্পরিক তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজন হয় অসীম দায়িত্ব, কিন্তু অ-ঋণদান কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় সসীম দায়িত্ব। বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিতে এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলা কঠিন। অবশ্য বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি গঠনের জন্য সকল ক্ষেত্রেই সসীম দায়িত্বের ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়।

৩। ঋণদান ও অ-ঋণদান কার্যের সমন্বয়ের সমস্যা

(৪) বহু উদ্দেশ্যসাধক সমিতির কর্মক্ষেত্র একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। ফলে সদস্যরা একে অপরের খবরাখবর জানিবে সমবায়ের এই নীতি পালন করা সম্ভব হয় না।

৪। পারস্পরিক জানা-শুনার অসুবিধা

এই প্রসংগে সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি যে-মতামত প্রকাশ করিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে, সমবায়-ব্যবস্থা যদি কেবল ঋণদান কার্য লইয়াই পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ইহার কোন সম্ভাবনা নাই; এমনকি উহা ঋণদান কার্যেও সফলতা অর্জন করিতে পারিবে না। সুতরাং সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি সমবায়িক প্রতিষ্ঠানকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলিকে অন্যান্য বিশেষ ধরনের কার্য অথবা বিক্রয়করণ প্রভৃতি কার্য গ্রহণ করিতে হইবে—এইরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ ধরনের কার্যের জন্য বিশেষ ধরনের সমিতি থাকিবে। ঋণদান এবং অন্যান্য কার্যের মধ্যে যথোপযুক্ত সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা হইবে। যে-সমস্ত অ-ঋণদান কার্যে যথেষ্ট আর্থিক ঝুঁকি রহিয়াছে তাহার দায়িত্ব প্রাথমিক সমিতিগুলির পক্ষে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। যে-সকল অ-ঋণদান কার্য প্রাথমিক সমিতি অতি সহজেই

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অভিমত

দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারে তাহার দায়িত্বই শুধু সমিতি গ্রহণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ বীজ, সার, কৃষি, যন্ত্রপাতি, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের বণ্টনভার সহজেই প্রাথমিক সমিতিগুলি গ্রহণ করিতে পারে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, যেখানে কোন সমিতি একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে দক্ষতা দেখাইয়াছে সেখানে উহার সম্ভাবনা অপরিমেয়। কিন্তু, কমিটির মতে, সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনকে একাধিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেকটি সমিতিকে নয়। এখানেও সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় কর্মীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং বিপক্ষ ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রভৃতি বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং সরকারী সাহায্য লইয়া ঋণদান ছাড়া বাজারিকরণ, সমবায়িক চাষ প্রভৃতি সমবায়িক কাজকর্ম আরম্ভ করা সমীচীন।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার যে সাড়া পড়ে যুদ্ধোত্তর যুগেও তাহা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৬-৪৭ সালে এইরূপ সমিতি ও সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯.৬ হাজার এবং ৩.৪৪ লক্ষ। ১৯৫১-৫২ সালে সমিতি ও সভ্যসংখ্যা বর্ধিত হইয়া যথাক্রমে দাঁড়ায় প্রায় ৪০ হাজার এবং ২১ লক্ষের উপর। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, রাজস্থান, মহীশূর ও পশ্চিমবংগেই এই ধরনের সমিতি অধিক প্রসারলাভ করে। তাহার পর হইতে অবশ্য বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি স্থাপনে মন্দার স্থচনা দেখা যায়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির উপরি-উক্ত স্থপারিশ অনুসারে সরকার সমবায় ঋণদানকার্যের সহিত বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংযুক্ত করিলেও ঠিক বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকে। ফলে এই প্রকার সমিতির আর বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায় না।

গতি পরিবর্তন

এই আন্দোলন একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

যাহা হউক, বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই সফল হয় নাই বলা চলে। স্যর ম্যালকম ডার্লিং বিভিন্ন বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে রাজস্থানের মাত্র কয়েকটি সমিতি ছাড়া অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে বহু-উদ্দেশ্যসাধক নহে।* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দলও (Study Team) এই উক্তি করিয়াছে যে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিগুলি প্রকৃত ক্ষেত্রে ঋণদান ছাড়া আর কোন বিশেষ কার্যই সম্পাদন করে না।**

* Sir Malcolm Darling—"Certain Aspects of Co-operative Movement in India" 1958.

** Report of the Team for Study of C. D. P. and N. E. S.... ৮৬ পৃষ্ঠা।

বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চাশা পোষণ করা যায় না। তবে বর্তমানে যে সমবায় সেবা সমিতি (Service Co-operatives) গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা এই বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতিরই ন্যায়।* সুতরাং পরিবর্তিত আকারে যে বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি অন্তত কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভবিষ্যৎ

জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Banks) : কৃষকের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী ঋণদান বা মধ্যমেয়াদী ঋপ্রণদানের (medium-term loan) ব্যবস্থা করিলেই চলে না ; তাহাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদানের সুব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যতীত সে তাহার পূর্বতন ঋণের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ এবং জমির স্থায়ী উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির পক্ষে এই সমস্ত কার্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করা সম্ভব নয়। কারণ, উহাদের কার্যকরী মূলধন সংগৃহীত হয় স্বল্পমেয়াদী আমানত বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী বা মধ্যমেয়াদী ঋণ হইতে। ইহা ব্যতীত জমিজমার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিতে হইলে জমির মূল্য বা মালিকানাস্বত্ব নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যের জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু স্বল্প সংগতিসম্পন্ন প্রাথমিক সমিতির পক্ষে ইহার ব্যবস্থা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংকের মত বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল জমি বন্ধকের ভিত্তিতে কৃষকগণকে দীর্ঘকালীন ঋণ প্রদান করা।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও জমিবন্ধকী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে জমির উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়ায় জমির স্থায়ী উন্নতিসাধনের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইতেছে। ফলে জমিবন্ধকী ব্যাংকের গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

জমিববন্ধকী ব্যাংকগুলি তিন ধরনের হয় - যথা, সমবায়িক (co-operative), বাণিজ্যিক (commercial) ও আধা-সমবায়িক (quasi-co-operative)। পুরাপুরি সমবায়িক ব্যাংকগুলি সমবায়িক নীতির উপর ভিত্তিশীল এবং ক্ষুদ্র কৃষক ও জমির মালিকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাণিজ্যিক জমিবন্ধকী ব্যাংক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয় ; আর্থিক সংগতি অধিক থাকায় ইহারা জমির বড় বড় মালিকদের ঋণপ্রদান করিতে সমর্থ হয়। আধা-সমবায়িক জমিবন্ধকী ব্যাংক সমবায়িক নীতি অনুযায়ী স্বেচ্ছামূলকভাবে সংগঠিত ব্যক্তিসংঘ হইলেও, যাহাতে প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ সম্ভব এবং ব্যাংকের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্য ঋণগ্রহণেচ্ছু নহে এমন কতিপয় বিত্তশালী ব্যক্তিকেও সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। ভারতে এই তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাংকের সংখ্যাই অধিক।

তিনপ্রকার জমিবন্ধকী ব্যাংক

---

* ১৬৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বর্তমান অবস্থা (Present Position) : জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রথমে পাঞ্জাবে সংগঠিত হইলেও সার্থকভাবে প্রথম প্রবর্তিত হয় মাদ্রাজে। যাহা হউক, ভারতে জমিবন্ধকী ব্যাংক সামান্যই প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ১২টি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল এবং প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংক ছিল মাত্র ৩২৬টি। প্রাথমিক ব্যাংকগুলির শতকরা ৭৪ ভাগের মত অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও মহীশূর—এই ৩টি রাজ্যে অবস্থিত।

জমিবন্ধকী ব্যাংকের অতি সামান্য প্রসার ও আঞ্চলিকতা অত্যধিক

পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির সদস্যসংখ্যা ৯০'৭ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৮'৫ হাজারে দাঁড়ায় এবং ঋণপ্রদানের পরিমাণ ২'৮৩ কোটি টাকা হইতে ৩'৮০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। বিক্রীত ডিবেঞ্চারের মূল্যও ১৪'৯৪ কোটি টাকা হইতে ১৬'৯৫ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

তবে দিন দিন সম্প্রসারণ ঘটিতেছে

প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকের সভ্যসংখ্যা ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩ লক্ষ ৩৩'৫ হাজারের কিছু অধিক হয়। ইহাদের ঋণপ্রদানের পরিমাণ এই দুই বৎসরের মধ্যে ১'৭৪ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২'০৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

পূর্বতন ঋণ পরিশোধ, জমির উন্নয়ন, নূতন জমি ক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি ঋণপ্রদান করিলেও ঋণ প্রধানত পূর্বতন ঋণ পরিশোধের জন্যই দেওয়া হয়। অবশ্য সম্প্রতি কতিপয় রাজ্যে জমির উন্নতিসাধন, কূপ খনন, ট্রাক্টর যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

ত্রুটি :
১। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণশোধের উদ্দেশ্যে ঋণদান

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ঋণপ্রদানের সুদের হার অত্যধিক। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির সুদের হার শতকরা ৫½ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত ছিল। একমাত্র বোম্বাই রাজ্যে মাত্র কতিপয় উদ্দেশ্যে শতকরা ৩½ টাকা সুদে ঋণপ্রদান করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের সুদ উচ্চ এবং ইহার উপর প্রাথমিক ব্যাংকগুলি ঋণদানের সময় সুদের হার আরও চড়াইয়া দেয় বলিয়াই সুদের হার এইরূপ অত্যধিক হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাংকগুলির পরিচালনা ব্যয় যথেষ্ট বলিয়া সুদের হার অধিক করিতে হয়।

২। ব্যাংকগুলির সুদের হার অত্যধিক

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির কার্যকরী মূলধনের মধ্যে নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। সুতরাং ব্যাংকগুলিকে ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং সরকার ও অন্যান্য সূত্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াই মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার মধ্যে ডিবেঞ্চারই মূলধন সংগ্রহের সর্বপ্রধান সূত্র। ১৯৫৬-৫৭ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির মোট কার্যকরী মূলধন ২১'৩২ কোটি টাকার মধ্যে ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ১৬'৫ কোটি টাকা। ঐ সালে প্রাথমিক ব্যাংকগুলির

৩। নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ স্বল্প

কার্যকরী মূলধন ১২'৭০ কোটি টাকার মধ্যে ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১'৩২ কোটি টাকা। ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকরী মূলধনের অধিকাংশ সংগ্রহ করে এবং প্রাথমিক ব্যাংকগুলি তাহাদের কার্যকরী মূলধনের জন্য কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

এই ত্রুটির প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

যাহাতে জমিবন্ধকী ব্যাংকের ডিবেঞ্চার অধিক বিক্রয় হইতে পারে তাহার জন্য সরকার সুদ এবং আসল টাকা সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার হইতে এইভাবে যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব হইতে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ডিবেঞ্চারের শতকরা ২০ ভাগ করিয়া ক্রয় করিয়া সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শেয়ার মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ যোগানের ব্যবস্থা করিতেছে।

গ্রাম্য ডিবেঞ্চার পরিকল্পনা

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সম্প্রতি আবার 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' (rural debentures) বিক্রয় করিয়া গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয়কে গ্রাম-উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবায় প্রচেষ্টাও চলিতেছে। ১৯৫৮ সালে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক আহূত সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রারগণ এবং কতকগুলি জমিবন্ধকী ব্যাংকের এক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি দুই শ্রেণীর 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' (rural debentures) বিক্রয় করিবে। প্রথম শ্রেণীর গ্রাম্য ডিবেঞ্চার ৭ বছর মেয়াদী হইবে এবং ইহাদের সুদের হার অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় করা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাম্য ডিবেঞ্চার হইবে ১৫ বৎসর মেয়াদী এবং উহা রিজার্ভ ব্যাংক ক্রয় করিবে; ইহাদের সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মধ্যে অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর ও সৌরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' বাজারে ছাড়িয়াছে। জনসাধারণের নিকট বিক্রয়োপযোগী ৭ বৎসর মেয়াদী গ্রাম্য ডিবেঞ্চারের উপর সুদের হার হইল শতকরা ৪½ হইতে ৫ টাকা আর রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট যে ১৫ বৎসর মেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় হইবে তাহার সুদ হইল শতকরা ৪ টাকা।*

৪। ঋণদান সম্পর্কে ত্রুটি

ঋণপ্রদান সম্পর্কে জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির কতকগুলি ত্রুটি রহিয়াছে। প্রথমত, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলি ঋণ মঞ্জুর করিতে অযথা বিলম্ব করে। অবশ্য জমির মূল্য নির্ধারণ এবং স্বত্বের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য ঋণদানে কতকটা দেরী হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু চেষ্টা করিলে বেশ কিছু পরিমাণে সময়সংক্ষেপ করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, স্বল্প পরিমাণ ঋণদানে জমিবন্ধকী ব্যাংক-গুলিকে অনিচ্ছুক দেখা যায়। ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী এইরূপ ব্যাংকের সাহায্য

* Reserve Bank Bulletin, July 1959.

হইতে বঞ্চিত হয়। পরিশেষে, জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের কার্যের মধ্যে কোন রকমের সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা নাই।

জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির উন্নয়নের জন্য সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে: (১) প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক থাকিবে। (২) ব্যাংকের শেয়ার-মূলধনের কমপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ সরকারকে যোগান দিতে হইবে। (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহাতে প্রাথমিক ব্যাংকগুলির শেয়ার-মূলধন সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির জমির উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য উৎপাদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে ঋণদান করা সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে। (৫) বিভিন্ন মেয়াদের ঋণদানের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদী ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিবে। যাহাতে এইগুলির বিক্রয়ের পথ সুগম হয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে (The State Bank of India) ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (৬) রিজার্ভ ব্যাংক নিজেও নির্দিষ্ট ধরনের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিবে। (৭) সরকার ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদের টাকা সম্বন্ধে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া, জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য কর্মচারীর ব্যবস্থা করিয়া, ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিষ্ট্রারি করিবার ফী হইতে অব্যাহতি দিয়া জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে সাহায্য করিবে।

জমিবন্ধকী ব্যাংক সম্পর্কে সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ

রিজার্ভ ব্যাংক ও সমবায় আন্দোলন (The Reserve Bank of India and the Co-operative Movement): সমবায় আন্দোলনের সহিত রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষিগত ঋণের সুব্যবস্থা না করিতে পারিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের সার্থকতা কোথায়? এই কারণেই রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) গঠন করা হইয়াছিল। সুতরাং যুক্তিসংগতভাবেই কার্য করা হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সমবায় আন্দোলনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইতেছে

রিজার্ভ ব্যাংক নানাভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য করিতে পারে। ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত উহা নিম্নলিখিতভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে পারিত:

প্রথমত, 'সময়োচিত কৃষিগত কাজকর্ম' ও শস্য বিক্রয়করণ ব্যাপারে অর্থসাহায্যের জন্য যে-সমস্ত হুণ্ডি বা প্রতিশ্রুতিপত্র (promissory notes) প্রস্তুত করা হইত এবং যাহা ৯ মাসের মধ্যে প্রদেয় ছিল এইরূপ বিল বা হুণ্ডির পুনর্বাট্টা অথবা উহাদের ভিত্তিতে রাজ্য ব্যাংকগুলিকে ঋণদান করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের ছিল। সরকারী

১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতা

বা ট্রাষ্টী-সিকিউরিটির ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করিতে পারিত। তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি-পত্রের ভিত্তিতেও ঋণদান করিতে পারিত। কিন্তু এই প্রমিসরি নোটের সহিত পণ্যের স্বত্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করার প্রয়োজন হইত।

১৯৫১ ও ১৯৫৩ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণপ্রদান করিবার এই ক্ষমতা বর্ধিত করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের দুইটি সংশোধনের প্রথমটি অনুসারে প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত সম্পর্কিত হুণ্ডি বা প্রমিসরি নোট ক্রয়বিক্রয় ও পুনর্বাট্টার ব্যাপারে রাজ্য সমবায়িক ব্যাংক তপশীল ব্যাংকের মতনই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। দ্বিতীয় সংশোধনের দ্বারা সময়োচিত কৃষিগত কাজকর্ম ও শস্য বিক্রয়করণের জন্য ঋণদানের মেয়াদ ৯ মাস হইতে বাড়াইয়া ১৫ মাস করা হইয়াছে।

১। রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ঋণপ্রদানের ক্ষমতাবৃদ্ধি

১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বারা মিশ্র কৃষিকার্য ও শস্য বিক্রয়করণোপযোগী করিবার পদ্ধতিসমূহের (processing) জন্যও ঋণদান করা রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়করণ সম্পর্কিত কার্যেও ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংককে রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিতে কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবারও ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ঋণের মেয়াদ ১৫ মাসের কম এবং ৫ বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

উক্ত সংশোধন ব্যতীত ঋণদান কাজকর্ম অধিক প্রশস্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পদ্ধতিগত পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। আবার যাহাতে সমবায় ব্যাংকগুলি উপরি-উক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক সমগ্র সমবায় আন্দোলন, বিশেষত রাজ্য সমবায় ব্যাংকের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি সংস্কার অনুমোদন করে। ইহার ফলে কয়েকটি রাজ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদের ব্যাপারেও রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় ব্যাংকগুলিকে সুবিধা দান করে। ইহা 'ব্যাংক রেট' (Bank Rate) অপেক্ষা শতকরা ২ টাকা কম হারে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে।*

২। রিজার্ভ ব্যাংকের পদ্ধতিগত উন্নয়ন

৩। সুদের ব্যাপারে সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সুবিধা প্রদান

দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে উহাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া গ্রামোন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' (rural deben-

৪। জমিবন্ধকী ব্যাংকের ডিবেঞ্চার ক্রয় ইত্যাদি

* বর্তমানে 'ব্যাংক রেট' শতকরা ৪ টাকা, কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সুদের হার শতকরা ২ টাকা মাত্র।

tures) পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকের 'গ্রাম্য ডিবেঞ্চার' ক্রয় করিয়া অর্থসাহায্য করিতেছে।

অন্যান্যভাবেও রিজার্ভ ব্যাংক সমবায় আন্দোলনে স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করে। রিজার্ভ ব্যাংকের যে কৃষি-ঋণ বিভাগ আছে তাহার কার্য হইল কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করা এবং সরকার ও রাজ্য সমবায় প্রতিনিধিগুলিকে পরামর্শপ্রদান করা। ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত কার্যাদি এবং রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত রাজ্য সমবায় ব্যাংকের সম্বন্ধের সমন্বয় করিবার দায়িত্বও এই বিভাগের উপর ন্যস্ত। আবার সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যের জন্য কৃষিগত ঋণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (a Standing Advisory Committee on Agricultural Credit) নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৫। রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগ কর্তৃক নানাপ্রকার সহায়তা

রিজার্ভ ব্যাংকের উদ্যোগেই আবার কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষা কমিটি (Central Committee for Co-operation Training) গঠন এবং পুণায় সমবায়িক শিক্ষাদান কলেজ (Co-operative College) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার উপর পাঁচটি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষাদান-কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। সমবায় কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা

১৯৫১ সালে গ্রাম্য ঋণ সম্পর্কে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নিয়োগ করে। ১৯৫৪ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি সমবায় আন্দোলনকে সুসংগঠিত করিবার জন্য কতকগুলি সুদূরপ্রসারী সুপারিশ করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সুপারিশসমূহকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক সম্পর্কে কমিটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হইল এইরূপ: (১) সমবায়িক ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় ও পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সরকারগুলির সহিত সহযোগিতা করিবে। যাহাতে সরকারগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার-মূলধন সরবরাহ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাংক 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' [National Agricultural Credit (Long-term Operatinos) Fund] নামক যে-অর্থভাণ্ডার সৃষ্টি করা হইবে তাহা হইতে ব্যাংক রাজ্য সরকারগুলিকে ঋণদান করিবে। (২) রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদান করিয়া যাইবে। অবশ্য রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি থাকা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে এবং উহাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অথবা সমিতিগুলিকে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবে। এই উদ্দেশ্যে 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল' [National Agricultural Credit

রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি

(Stabilisation) Fund] নামক অপর একটি তহবিলের সৃষ্টি করিতে হইবে। (৩) রিজার্ভ ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকেও হয় প্রত্যক্ষভাবে না-হয় ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। এক্ষেত্রেও আসল এবং সুদের টাকা সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে গ্যারান্টি দান করিতে হইবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই তহবিলের পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।* 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল'ও স্থাপিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে অর্থপ্রদান করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিণত করিতে পারে। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত এই তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি টাকা।

রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন (The State and Co-operation): ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন ও প্রসার উভয়ই হইয়াছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। বর্তমান সময় পর্যন্ত সমবায়ের ক্ষেত্রে যে-যৎসামান্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা। অনেকে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকাকে সুনজরে দেখেন না। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও পরিচালনা ব্যতীত ভারতীয় অবস্থায় সমবায় আন্দোলনের সফলতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই প্রসংগে সমবায়িক পরিকল্পনা কমিটির অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলন যে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই তাহার একটি প্রধান কারণ হইল রাষ্ট্রের 'নিষ্ক্রিয় নীতি'। বর্তমানে যখন রাষ্ট্র পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করিয়াছে তখন ইহা স্বাভাবিক যে, রাষ্ট্র গ্রাম্য জীবনকে পুনর্গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবে। এইজন্যই রাষ্ট্র রিজার্ভ ব্যাংকের সহযোগিতায় আন্দোলনের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত ও প্রসারিত হইয়াছে

বিভিন্ন দিক দিয়া সরকার আন্দোলনকে সাহায্য ও পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রথমত, সমবায় সমিতিগুলিকে পরিচালনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে সমবায় দপ্তরের অধীনে বহু কর্মচারীর ব্যবস্থা এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, রাজ্য সরকার সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্প সুদে ঋণদান করিয়া সাহায্য করে।

রাষ্ট্র কিভাবে সহায়তা করে

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমবায়িক ব্যাংকের শেয়ার-মূলধনের জন্য অর্থপ্রদান করিয়াছে। সমবায় আন্দোলনকে সম্যকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে অধিকমাত্রায় সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার-মূলধনের যোগান দিতে হইবে। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে এই উদ্দেশ্যেই 'জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল' সৃষ্ট করা হইয়াছে।

---

* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

চতুর্থত, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার অর্থমঞ্জুর (subsidies and grants-in-aid) করিয়া থাকে।

পঞ্চমত, যাহাতে অর্থসংগ্রহ বা ঋণসংগ্রহ সহজসাধ্য হয় তাহার জন্য সরকার ঋণ সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করিয়া নির্দিষ্ট ধরনের সমবায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে—যেমন, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির ডিবেঞ্চার বিক্রয় ব্যাপারে সরকার সুদ ও আসল টাকা সম্পর্কে গ্যারান্টি দিয়া থাকে।

ষষ্ঠত, সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নানা ধরনের আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনকে সংশোধন করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক আইনের বিভিন্ন সংশোধন, রাজ্য সরকারসমূহকে সমবায় সমিতির শেয়ার-মূলধনে অর্থ নিয়োগের অনুমতি হইল এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ইহা ব্যতীত সমবায়িক আন্দোলন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঋণ পরিশোধ সাহায্য আইন (Debt Relief Acts) প্রবর্তন করা হয়; ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে সমবায় সমিতির দাবিকে অগ্রগণ্য করা হয়।

সপ্তমত, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করিয়া থাকে। যেমন, সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয় কর, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিষ্ট্রারি করিবার ফী প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দান করিয়া থাকে।

অষ্টমত, রাজ্য সরকারগুলি সর্বক্ষণই সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই কার্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং বিশেষজ্ঞদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া রাজ্য সরকারগুলির নিকট সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করে; এবং রাজ্য সরকার-সমূহ এককভাবে বা সম্মেলনের মাধ্যমে ঐ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া সমবায় আন্দোলনের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

পরিশেষে, সমবায়িক কর্মী শিক্ষাদানেও সরকার সাহায্য করিয়া আসিতেছে। এই শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক এক সহযোগে সমবায়িক শিক্ষাদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee for Co operation Training) নিযুক্ত করিয়াছে। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে পুণার সমবায়িক শিক্ষাদান কলেজ প্রবীণ কর্মচারীদের শিক্ষাদান করিতেছে। ইহার উপর উক্ত কমিটির নির্দেশে ৫টি আঞ্চলিক সমবায়িক শিক্ষাকেন্দ্র (Regional Training Centres) এবং ৮টি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।* ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংক উভয়েই এইজন্য অর্থসাহায্য করিয়া থাকে।

সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ অনুধাবনযোগ্য। কমিটির মতে, সমবায় আন্দোলনকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত স্বার্থ-

* ১৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

সমূহের বিরুদ্ধে সফল করিয়া তুলিতে হইলে রাষ্ট্রকে পূর্বের তুলনায় অধিকমাত্রায় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে। এই সহযোগিতার দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সমবায় আন্দোলন গ্রাম্য উৎপাদন ও গ্রাম্য উৎপাদকের স্বার্থে অব্যাহতভাবে কার্য করিতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারকে অংশীদার করিয়া (১) সমবায়িক ঋণ, (২) সমবায়িক অর্থনৈতিক কাজকর্ম—যেমন, বিক্রয়করণ, (৩) গুদামঘর নির্মাণ এবং রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র শেয়ার-মূলধন যোগানে রাজ্য ব্যাংকগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক ব্যাংকগুলিতে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির বেলায় সাধারণত সরকার মোট শেয়ার-মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ অর্থ যোগান দিবে। সুপারিশগুলিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।*

রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিবিড়তরই হইত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্টের ফলে এই গতিতে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সম্প্রতি আবার সমবায় আন্দোলনের সহিত রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে। পরিকল্পিত সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা (Co-operative Farming) এবং সেবা সমবায় সমিতির (Service Co-operatives) ভিত্তিই হইবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা।

বর্তমান গতি

সমবায় আন্দোলনের সফলতা (Achievements of the Co-operative Movement) : আজ অর্ধ শতাব্দীর উপর ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছে। স্বভাবতই প্রশ্ন করা হয় যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আন্দোলন কতখানি সফলতা অর্জন করিয়াছে, কতদূর দেশের উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং কতদূরই বা সমবায় নীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে?

যাঁহারা আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে গুণকীর্তন করিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে, নৈতিক ও শিক্ষার দিক দিয়া আন্দোলন বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছে। আর্থিক দিক সম্পর্কে বলা হয় যে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সহজলভ্য হইয়াছে। কৃষক বা সমবায় সমিতিগুলির নিকট হইতে স্বল্প সুদে ঋণ পায় বলিয়া গ্রাম্য মহাজনও সুদের হার হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে গ্রাম্য মহাজনের একচেটিয়া ব্যবসাকে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীরাও মহাজনের শোষণের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত চাষীদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অভ্যাস প্রসারলাভ করিয়াছে। পূর্বতন ঋণের ভারও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। পূর্বের

আন্দোলনের কৃতকার্যতার কথা

---

* ১৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

তুলনায় কৃষকদের ভোগের জন্য ঋণগ্রহণ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের ফলে তাহারা স্বল্প দামে যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্টতর বীজ ও সার ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। সমবায় পন্থায় সেচ-ব্যবস্থা, জমির সংহতিসাধন, কৃষি-কার্য সম্পাদন, গো-প্রজনন প্রভৃতির ফলে চাষের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। সমবায় আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হইল সমবায়িক বিক্রয়করণ। ইহার ফলে চাষীরা মধ্যজীবীদের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে এবং উপযুক্ত বাজার মূল্যে পণ্যবিক্রয় করিতে পারিতেছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ইক্ষু বিক্রয়করণ সমিতি, বোম্বাই-এর তুলা বিক্রয়করণ সমিতি এবং মাদ্রাজের ধান্য ও তামাক বিক্রয়করণ সমিতি বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য পরিচালনা করিতেছে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা একেবারে উপেক্ষা করিবার নয়। হস্তবয়ন শিল্পে সমবায় আন্দোলন অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে। নৈতিক ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে বলা হয় যে, সমবায় আন্দোলনের ফলে মামলা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি হ্রাস পাইয়া কৃষকদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি প্রসারলাভ করিয়াছে। হিসাবপত্র রাখা এবং প্রমিসরি নোটে সহি প্রদান ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় শিক্ষার বিস্তারও হইয়াছে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হইবে যেন সমবায় আন্দোলন ভারতে আশাতীতভাবে সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা সমবায় সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যাদির দিকে নজর দিলেই বুঝা যাইবে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য দেশের কোন কোন অংশে সমবায় আন্দোলন কিছুটা প্রসারলাভ এবং বিভিন্ন দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বলিতে হয় যে সামগ্রিকভাবে দেখিলে সমবায় আন্দোলন উল্লেখযোগ্য কিছু করিতে পারে নাই। সমবায়িক ঋণদান আন্দোলনের ব্যর্থতা তিন দিক হইতে পরিলক্ষিত হয়।* (১) দেশের বহুস্থানেই সমবায় আন্দোলন প্রসারিত হয় নাই। (২) যে-সমস্ত স্থানে আন্দোলন প্রসারলাভ করিয়াছে সেখানেও বহুসংখ্যক কৃষক আন্দোলনের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। (৩) যাহারা সমবায় ঋণদান সমিতির সদস্যভুক্ত তাহাদের প্রয়োজনীয় ঋণের অধিকাংশই আসে সমবায় সমিতির বাহির হইতে—অর্থাৎ মহাজন, ব্যক্তিগত ব্যবসাদারের নিকট হইতে।

ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ব্যাখ্যা করিয়া সমবায় আন্দোলনের অসন্তোষজনক অবস্থা এইভাবে দেখান যাইতে পারে: (১) ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাব হইতে দেখা যায়, জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ লোক সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছে; সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা

* Rural Credit Survey, Vol.—II.

পর্যালোচনাকারী দল দেখিয়াছিল যে সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতেও শতকরা ৫০ ভাগ গ্রাম সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত হয় নাই। (২) গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, কৃষকদের মোট ঋণের মধ্যে সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ শতকরা ৩·১ ভাগ মাত্র। ঋণের শতকরা ৭০ ভাগ মহাজন এবং গ্রাম্য ব্যবসাদার যোগান দিয়া থাকে। সুতরাং চাষীরা গ্রাম্য মহাজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে এই ধারণা করা ভুল।* (৩) সমবায় আন্দোলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে চাষীদের নিকট হইতে স্বল্পহারে সুদ আদায় করা হইবে। এই বিষয়েও সমবায় আন্দোলন বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। ১৯৫৭-৫৮ সালের তথ্য হইতে দেখা যায় যে কতিপয় রাজ্যে সুদের হার ছিল শতকরা ১০ টাকার অধিক। মণিপুরে সুদের হার ছিল ২৪ টাকা। এই প্রসংগে উক্ত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দল অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে সুদের হার শতকরা ৬½ অধিক হওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই।† (৪) আবার সমবায় সমিতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকর। ঐ সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণকারী দলের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৯৫৬ সালে সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলিরই ঋণদান ও অ-ঋণদান সমিতির মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ৩১ ভাগ ছিল অকার্যকর। অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা যে ইহা অপেক্ষা আশাপ্রদ নহে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। (৫) সমবায়ের নীতি অনুসারে ঋণদানের ভিত্তি হইল কিন্তু কৃষকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা। ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণদান করা হয় অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে। সম্পত্তিকে ভিত্তি করার ফল দাঁড়াইয়াছে যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষীর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী চাষীরাই সমবায় সমিতিগুলি দ্বারা উপকৃত হয়। (৬) এইজন্যই আবার ঋণ উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করা হইতেছে কিনা তাহার দিকে নজর দেওয়া হয় না। ফলে চাষীদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা উপেক্ষিতই থাকিয়া যায়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনাকারী দল এই অবস্থার পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়া বলিয়াছে যে কৃষকের ঋণগ্রহণ যোগ্যতা অপেক্ষা যে উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করা হইতেছে তাহারই যোগ্যতা অধিক বিচার করা উচিত—অর্থাৎ উৎপাদনশীল কার্যের জন্যই যথাসম্ভব ঋণপ্রদান করা উচিত। (৭) সমিতিগুলির নিজস্ব তহবিলের অপ্রতুলতা,

ব্যর্থতার বিশ্লেষণ :

১। জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৭ ভাগ সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত

২। কৃষি-ঋণের মাত্র শতকরা ৩ ভাগ আসে সমবায় সমিতি হইতে

৩। সুদের হার অত্যধিক

৪। অনেক সমবায় সমিতি অকার্যকর

৫। সম্পত্তিকে ভিত্তি করিয়া ঋণদান করা হয়

৬। উৎপাদনশীলতার-দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না

৭। তত্ত্বাবধান ত্রুটিপূর্ণ

* ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† Report of the Team for Study of C. D. P. and N. E. S.—৮৭ পৃষ্ঠা।

অনাদায়ী এবং দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের আধিক্য প্রমাণ করে যে সভ্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের প্রসারসাধন করা সম্ভব হয় নাই এবং সমিতিগুলিতে তত্ত্বাবধানের যথেষ্ট শিথিলতা রহিয়াছে গিয়াছে।*

(৮) 'প্রকৃষ্টতর ব্যবসা' (better business) নিশ্চিত করা সমবায় আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে কৃষকের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুইটি : (ক) ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ, এবং (খ) শস্য গুদামজাতকরণ, বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়করণের সুব্যবস্থা। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে এই সমস্ত কার্যে মহাজন, ব্যবসাদার বা কারখানাদারের তুলনায় সমবায় সমিতিগুলি এক-দশমাংশ উপকারও করিতে সমর্থ হয় না। অবশ্য সম্প্রতি, বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে বিক্রয়করণ সমিতির প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে।

৮। কৃষক সমিতি অপেক্ষা মহাজনের নিকট হইতে অধিক সাহায্য পায়

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতে সমবায় আন্দোলন 'প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব্যবসা, প্রকৃষ্টতর জীবনযাপন' ('Better Farming, Better Business, Better Living') সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের একটিকেও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই। অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে বিশেষ প্রতিকূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষত শক্তিশালী স্বার্থসমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমবায় আন্দোলন যতটুকু কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে ততটুকুই প্রশংসনীয়। তবে সমবায়ের সম্ভাবনার দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে।

উপসংহার : সমবায়ের কোন লক্ষ্যই সাধিত হয় নাই

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ (Causes of Failure of the Co-operative Movement) :

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলিকে মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক (economic) এবং অন্যান্য (non-economic) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। অন্যান্য—অর্থাৎ অর্থনৈতিক নহে এরূপ কারণের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করা হয় : (১) প্রাথমিক সমিতিগুলি অকাম্যভাবে ক্ষুদ্রাকারের এবং ইহাদের কর্মপরিধিও সংকীর্ণ। ফলে সমিতির কাজকর্ম সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলির আকারও ক্ষুদ্র। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় না এবং সুদের হারও চড়া হয়। (২) কৃষি ঋণদান সমিতির অসীম দায় সমবায় আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে। (৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতিগুলি বহু-উদ্দেশ্যসাধক না হওয়ায়, বিশেষ করিয়া ঋণ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ না থাকায়, কৃষকের আর্থিক ও সামাজিক

ব্যর্থতার কারণ : অর্থনৈতিক ও অন্যান্য

অন্যান্য কারণ :
১। ক্ষুদ্রাকার সমিতি
২। অসীম দায়

* Statistical Statements relating to Co-operative Movement for 1957-58 —Prefatory Note.

জীবনের সামগ্রিক উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয় নাই। (৪) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক এবং প্রাথমিক সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব সমবায় আন্দোলনের আর একটি দুর্বলতা। কৃষি-ঋণ সংগঠন কমিটি (১৯৪৭) অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয় এবং তাহাদের সহিত কার্য পরিচালনা অকাম্য ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে; অপরপক্ষে কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীকে ঋণদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। আবার রাজ্য সমবায় ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের মধ্যেও অনেক রাজ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়।

৩। ঋণ ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

৪। বিভিন্ন পর্যায়ের সমিতির মধ্যে সহযোগিতার অভাব

(৫) শিক্ষার অভাব এবং সমবায় নীতির শিক্ষাদানের অব্যবস্থাও সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। (৬) অনেকের মতে, সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন ও প্রসারে সরকারী উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপ বর্তমান থাকায় পশ্চিমী দেশের মত ভারতে সমবায় আন্দোলন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। অপরপক্ষে সমবায় পরিকল্পনা কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, সমবায় আন্দোলনের প্রসারে মন্দ গতির অন্যতম কারণ হইল রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় নীতি। (৭) অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাব, সমবায় সমিতির কর্মচারীদের অসাধুতা, মিথ্যা হিসাব প্রদর্শন এবং হিসাব-পরীক্ষার সুব্যবস্থার অভাব, সমিতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, ঋণ আদায় সম্পর্কে শিথিলতা প্রভৃতি।

৫। শিক্ষার অভাব এবং সমবায় নীতির শিক্ষাদানের অব্যবস্থা

৬। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

৭। বিবিধ কারণ

অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণ:

উপরি-উক্ত কারণগুলি সমবায় আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত করিলেও ব্যাধির মূলে রহিয়াছে আসলে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণ।

(১) প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্যের জন্য সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার সংহতিসাধন, উন্নত ধরনের বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি, জমির মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থার দরকার হয়। এই সমস্ত কার্য সমিতির শক্তি বা আর্থিক সংগতির বাইরে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং অর্থসাহায্য ব্যতীত কোনটাই সম্পাদিত হইতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র সমবায় সংগঠনকে যথোপযুক্তভাবে আর্থিক বা অন্যভাবে সাহায্য করে নাই। (২) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রকৃষ্টতর ব্যবসা সম্ভব করিতে হইলে একদিকে যেমন ঋণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি আবার পণ্য বিক্রয়যোগ্যকরণ (processing) বিক্রয় ও গুদামজাত করিবার সুব্যবস্থাও থাকা দরকার। এই দুইটি কার্যে মহাজন ও ব্যবসাদারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে সমবায় সমিতিগুলি দাঁড়াইতে পারে না। এই দুর্বলতার অন্যতম

১। সরকারী সহায়তার অভাব

২। সমিতির সংগতির অভাব

কারণ হইল সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক সামর্থ্যের অভাব। (৩) পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, জমি ঋণগ্রহণযোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি হওয়ায় ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী সমবায় সমিতির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় না এবং সমৃদ্ধ কৃষকশ্রেণীই সমবায় সমিতিগুলিতে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকে। (৪) কুটির ও সমবায় শিল্প সংগঠন ব্যাপারেও ব্যবসায়ী ও মহাজনের অপ্রতিহত প্রতিকূলতা বর্তমান রহিয়াছে। (৫) অনেক সময় পরিচালকবর্গ নিজেদের স্বার্থে সমিতিগুলিকে পরিচালিত করে। পরিচালনা আবার অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিপত্তিশালী ধনী কৃষক অথবা মহাজনদের হাতে থাকে। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানেই বর্ণ বৈষম্য থাকায় বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে সমিতি পরিচালিত হয়।

৩। ঋণগ্রহণযোগ্যতা বিচারে ত্রুটি

৪। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেও মহাজনদের অপ্রতিহত প্রভাব

৫। সমিতির স্বার্থান্বেষী পরিচালকবর্গ

(৬) নগরাঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানীগুলির নিকট সমবায় ব্যাংকগুলি অর্থসাহায্য চাহিয়া পায় না বলিয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষিকার্যকে লাভজনক ব্যবসা বলিয়া মনে করে না।

৬। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলির সহানুভূতির অভাব

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (Suggested Remedies): সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার এই আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যাহাতে সমবায়িক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য উৎপাদন ও গ্রাম্য উৎপাদকের স্বার্থে যথাযথভাবে কার্য করিতে পারে সেইরূপ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় সমবায় আন্দোলনকে সফল করা যাইবে না। এই পন্থার মাধ্যমেই অধিক শক্তিশালী প্রতিকূল ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহকে প্রতিহত করা সম্ভব হইবে। এতদিন ধরিয়া সমবায়ের পুনর্গঠনের যে-সমস্ত চেষ্টা হইয়াছে তাহা কেবল ঋণদান-ব্যবস্থার কাঠামোর আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে ঘিরিয়াই করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে গ্রাম্য সামাজিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা বা সহরাঞ্চলের ব্যবসা ও অর্থযোগানের ব্যবস্থার সহিত সমবায়ের অসামঞ্জস্যের দূরিকরণের চেষ্টা করা হয় নাই। ফলে সমবায় গ্রাম্য জীবনের কোন প্রকৃত উপকারসাধন করিতে পারে নাই।

গ্রাম্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয় নাই।

ফলে সমবায় আন্দোলনও সফল হইতে পারে নাই

সমবায় পন্থায় কৃষক ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর উন্নতি করিতে হইলে ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লইয়া পুনর্গঠন কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সামগ্রিকভাবে ঋণদান, বিক্রয়কেন্দ্র, পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থ নৈতিক কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। তৎপূর্বে অবশ্য প্রয়োজন হইবে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বিশেষ শক্তিশালী করিয়া গঠন করিবার। ডার্লিং তাঁহার রিপোর্টে এই বিষয়টির উপরই অধিক গুরুত্ব

আরোপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।* তারপর প্রচুর অর্থ ও ব্যবসায়ী কৌশলের ব্যবস্থা করিয়া সমবায় আন্দোলনে এমন শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে যাহা ব্যক্তিগত ব্যবসায় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিকূলতাকে সহজেই অতিক্রম করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সক্রিয় হইতে হইবে সমবায় আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য। পূর্বের ন্যায় রাষ্ট্রীয় সাহায্য কেবল পরামর্শপ্রদান, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনাতেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। অর্থ, সুদক্ষ কর্মচারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও একান্তভাবে প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের সংগঠনগত ত্রুটি দূর করাও আবশ্যক।

অবলম্বনীয় পন্থা

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি একরূপ এই দৃষ্টিভংগি লইয়াই সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিতে গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit) গ্রহণের এবং সমবায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠনগত ত্রুটি দূরিকরণের সুপারিশ করিয়াছিল। এই পরিকল্পনার আলোচনা পূর্বে করা হইলেও এখানে উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে: পরিকল্পনা অনুযায়ী (১) গ্রাম্য ঋণদান, বিক্রয়করণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকারবার সমবায় পন্থায় সংগঠিত ও সম্পাদন এবং শস্যভাণ্ডার ও গুদামঘরের ব্যবস্থা করিবার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে অংশ-গ্রহণ করিতে হইবে। (২) রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির মূলধনের শতকরা অন্তত ৫১ যোগান দিবে সরকার। (৩) কেন্দ্রীয় ও বৃহদাকারের প্রাথমিক সংস্থাগুলিতেও সরকার রাজ্য ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার মূলধনের অর্থ-যোগান দিয়া অংশগ্রহণ করিবে। (৪) যাহাতে রাজ্য সরকার এইভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিল নামে সৃষ্ট তহবিল হইতে সরকারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণপ্রদান করিবে। এই তহবিল হইতেই আবার রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে এবং উহাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা সমিতিগুলিকে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবে। জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকেও রিজার্ভ ব্যাংক এই তহবিল হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। (৫) সমবায়িক বিক্রয়করণ, বাজারের জন্য শস্য প্রস্তুতকরণ, শস্যভাণ্ডার, গুদামঘর প্রভৃতি সংগঠনের জন্য সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিবে। (৬) গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হইল একটি ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যাংকের শাখা জিলায় এবং এমনকি মহকুমায় পর্যন্ত থাকিবে। ব্যাংক সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থপ্রেরণ এবং ঋণদানের সুযোগ-সুবিধা দিয়া সাহায্য করিবে। ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগসাধন গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির আর একটি সুপারিশ। কমিটি সমবায়িক শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রসারের উপরও অধিক

গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ : ১। সমবায়ের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা

এই পূর্ণাংগ পরিকল্পনার বিশ্লেষণ

ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ

* Sir Malcolm Darling—"Certain Aspects of the Co-operative Movement in India.

জোর দিয়াছে। বর্তমানে সমবায়িক শিক্ষা সংক্রান্ত যে কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee on Co-operation Training) আছে তাহার কার্য যাহাতে প্রসারলাভ করে সেইজন্য সুপারিশ করা হইয়াছে যে, ঐ কমিটির হস্তে ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংককে অধিক অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

২। সমবায়িক শিক্ষাদান

অন্যান্য নির্দেশিত সংস্কারের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। বলা হয় যে, ভবিষ্যতে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বৃহদাকারও সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদীও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান কার্যের মধ্যে অধিকমাত্রায় সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। তৃতীয়ত, শস্যের ভিত্তিতে ঋণদান করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। চতুর্থত, ঋণ অর্থের আকারে না দিয়া যতদূর সম্ভব জিনিসপত্রের আকারে প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। পঞ্চমত, জীবিকাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষককে ঋণদান করিতে হইবে। ষষ্ঠত, ঋণদান সমিতি ও বিক্রয়করণ সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। প্রাথমিক সমিতি এই সর্তে ঋণদান করিবে যে, কৃষক সংশ্লিষ্ট বিক্রয়করণ সমিতির মাধ্যমে তাহার পণ্য বিক্রয় করিবে। সপ্তমত, জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে উৎপাদনবৃদ্ধি ও জমির স্থায়ী উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। অষ্টমত, গ্রামাঞ্চলে হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রসারের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণদান করিতে হইবে। নবমত, উপযুক্ত তত্ত্বাবধান, ঋণ আদায়ের সুব্যবস্থা ও সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টির দিকে অধিক যত্নবান হইতে হইবে। সমিতিগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকিবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায়িক ব্যাংকগুলির উপর এবং হিসাব পরীক্ষা ও পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে রাজ্য সরকার। পরিশেষে, রাজ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলিকে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যক্তিবিশেষকে ঋণদান বন্ধ করিয়া ঋণদান সমিতিগুলির চাহিদাকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে।

৩। অন্যান্য অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

অবলম্বিত প্রতিবিধান (Remedies Adopted): ১৯৫৭ সালের সুরুতে স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বে উক্ত নির্দেশিত প্রতিবিধানগুলি অনেকদূর পর্যন্ত অবলম্বিত হয়।

প্রথমত, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থায় পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উহা কার্যকরকরণের ব্যবস্থা করা হয়। ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে উহার সহিত বিকানীর ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক প্রভৃতি ৮টি ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য ব্যাংককে সংশ্লিষ্টকরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংশ্লিষ্টকরণ পরিকল্পনায় ঐ ৮টি ব্যাংক ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীনস্থ ব্যাংকে (Subsidiary Banks) পরিণত হইবে।*

পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরকরণ

* ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন্ লইয়া জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘকালীন) তহবিলেরও সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ঐ তহবিলের পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।*

ঋণ ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন

রাজ্যসমূহও সমবায় উন্নয়নের জন্য পর্যায়সমন্বিত কার্যক্রম প্রস্তুত করে। দ্বিতীয়ত, ঋণদান ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি সমবায় সমিতিকে মিলাইয়া বৃহদাকার সমিতিতে পরিণত করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, সমবায় বিক্রয়-ব্যবস্থায় উন্নতি-সাধনের জন্য শস্য ও গুদামজাতকরণের উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ইহা অবশ্য গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনারই এক অংশ। চতুর্থত, উৎপাদনের ক্ষেত্রে

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায়কে গুরুত্ব প্রদান

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সমবায়ের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারিত হয় এবং তুলাতাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠনের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট হয়। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম্য ব্যবস্থার পথে চলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পঞ্চমত, সমবায় ব্যাপারে শিক্ষাদানেরও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৫

শিক্ষা-ব্যবস্থা

হাজারের উপর শিক্ষিত সমবায় কর্মী প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে পুণার সমবায় শিক্ষাদান কলেজ, পুণা রাঁচি মীরাট মাদ্রাজ ও ইন্দোরের আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র পাঁচটি এবং আটটি বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র (Special Training Centres) ছাড়াও সর্ব-ভারতীয় সমবায়িক সংঘ (All-India Co-operative Union) এবং রাজ্য সমবায়িক সংঘসমূহ সরকারী সাহায্যে সংক্ষিপ্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছে।

স্যর ম্যালকমের রিপোর্ট ও সমবায়ের ভবিষ্যৎ (Sir Malcolm's Report and Future of Co-operation) : আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়ের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়

পরিকল্পিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পিত উন্নয়নে সমবায়িক ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ হইল জাতীয় নীতির অন্যতম মূল লক্ষ্য। কৃষির প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রেই ভারতের ন্যায় দেশে সমবায়ের অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্ভাবনাকেই প্রাথমিক রূপদানের নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে গৃহীত হইয়াছে।

পরিকল্পিত উন্নয়নকার্য অবশ্য ঋণ হইতেই সুরু হইবে। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য দিকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে। প্রতিটি দিকের ব্যাপারে কিভাবে এবং কতদূর অগ্রসর

সম্প্রসারণের পদ্ধতি ও লক্ষ্য

হইতে হইবে তাহা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। প্রথমে স্থির ছিল যে (ক) প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারকে অন্তত একটি সমবায় সমিতির সদস্যপদভুক্ত করিতে হইবে; (খ) প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারকে ঋণগ্রহণযোগ্য (creditworthy) করিয়া তুলিতে হইবে; (গ) দ্বিতীয় পরিকল্পনার

* ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

শেষে প্রাথমিক কৃষিদান সমিতির সদস্যসংখ্যা ৬৫ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি করিয়া সম্ভবত ১'৫ কোটিতে লইয়া যাইতে হইবে।

নগরাঞ্চলে সমবায়

নগরাঞ্চলেও সমবায়ের প্রসার পরিকল্পনা হইতে বাদ যায় নাই। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, ব্যাংকিং, গৃহনির্মাণ, পরিবহন, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ প্রভৃতি হইল এই অঞ্চলে সমবায় সম্প্রসারণের ক্ষেত্র।

এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে বিকেন্দ্রীকৃত একক (decentralised) প্রতিষ্ঠার নির্দেশ রহিয়াছে তাহা মূলত সমবায়ের মাধ্যমেই প্রতিপালিত হইবে—ইহাই আমাদের পরিকল্পিত কার্য-ব্যবস্থার নীতি।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণের এই নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন স্যর ম্যালকম ডার্লিং। তাহার ফলে সম্প্রসারণের গতি কতকটা প্রতিহত এবং কার্যক্রম কতকটা পরিবর্তিত হয়।

ডার্লিং-এর রিপোর্ট

কলম্বো পরিকল্পনার পরামর্শদাতা (Colombo Plan Consultant) হিসাবে স্যর ম্যালকম ডার্লিংকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করিয়া আন্দোলনের সংহতিসাধন সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে অনুরোধ করা হয়।

অভিমত ও সুপারিশ
১। বিভিন্ন প্রকার ও বহুসংখ্যক সমিতি গঠন অযৌক্তিক

কৃষি সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে স্যর ম্যালকমের অভিমতগুলি হইল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার যেরূপ দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। বর্তমানে সমবায় সংগঠন অতিশয় দুর্বল। ইহার সহিত উৎপাদন, বিক্রয়করণ ও বিক্রয়যোগ্যকরণ সমিতি (manufacturing, marketing and processing societies) সংযোজন করা হইলে আন্দোলন আংশিকভাবে এবং কতকগুলি অঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। স্যর ম্যালকম দেখিয়াছিলেন যে নূতন পুরাতন সকল প্রকার সমিতিই উত্তরোত্তর বর্ধমান হারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে তিনি সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ করা অনুচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্য কৃষকদিগের দিকে চাহিয়া স্থির করা হয় নাই। ইহাতে নিম্নতর সরকারী কর্মচারিগণ উপরিওয়ালাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য সমিতির পর সমিতি স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে কৃষকদের যে কি উপকার হইতেছে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াও দেখিতেছে না।

২। রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বিতর্কমূলক পন্থা

দ্বিতীয়ত, স্যর ম্যালকমের মতে, সমবায় ঋণদান আন্দোলনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। ইহাতে আন্দোলনের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই দুইটি সমবায়ের সফলতার অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার ভুল করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথ যদি গ্রহণ করিতেই হয় তবে ইহার দ্বারা সমিতিগুলির

স্বাতন্ত্র্য যত স্বল্প ব্যাহত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত, বৃহদায়তন সমিতি গঠনের জন্য গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির যে-সুপারিশ স্যর ম্যালকমের মতে তাহাও সহসা গ্রহণীয় নহে। কারণ, ইহার অর্থ হইল রাইফিজেন আদর্শ (Raiffeisen Model) হইতে বিদায় লওয়া। রাইফিজেন আদর্শ সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশুনা এবং অসীম দায়িত্ব—বিশেষভাবে এই দুই বিষয়ই নির্দেশ করে এবং এই দুইটি বিষয়ই সমবায়বোধ (Co-operative sperit) সম্প্রসারিত করে। সুতরাং পারস্পরিক জানাশুনার অভাব থাকিলে এবং সসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইলে সমবায়বোধ ব্যাহত হইয়া সমবায় সমিতি মুনাফাকারী যন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। অবশ্য বৃহদায়তন সমিতি সম্পর্কে স্যর ম্যালকমের কোন নীতিগত আপত্তি নাই ; তবে তিনি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। মোটকথা স্যর ম্যালকম বলিতে চাহেন যে, কৃষককে প্রধানত সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াই সার্থক গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে—বাহির হইতে অর্থসংগ্রহের দ্বারা নয়।

৩। বৃহদায়তন সমিতি গঠনও বিবেচনাযোগ্য বিষয়

অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর স্বল্পকালীন, মধ্যকালীন এবং দীর্ঘকালীন কৃষি ঋণ সরবরাহের প্রয়োজন যে আছে তাহা স্যর ম্যালকম অস্বীকার করেন নাই ; কিন্তু ইহার ফলে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থার উন্নতি না অবনতি দেখা দিবে সে-বিষয়ে চিন্তা করিরাই ঋণপ্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। অনেক রাজ্যে ঋণপ্রদানের সংগে সংগে অনাদায়ী ও দীর্ঘকাল অনাদায়ী (outstanding debts and overdues) পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্তু সকল রাজ্যে আন্দোলন একই প্রকার সুসংগঠিত নহে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে একই হারে ঋণপ্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। অন্ধ্রপ্রদেশ বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে যেখানে সমবায় ঋণদান আন্দোলন একরূপ সুসংগঠিত সেখানেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুসারে সমিতির সংখ্যা ও ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করাউচিত হইবে না। অন্যান্য যে-সকল স্থানে আন্দোলন অপেক্ষাকৃত দুর্বল সেখানে লক্ষ্যে পৌছিবার সময়কে ৫ হইতে ১০ বৎসর পিছাইয়া দিতে হইবে—অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থ পরিকল্পনায় লইয়া যাইতে হইবে।

৪। সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছিবার সময় পিছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন

স্যর ম্যালকম আরও বলিয়াছেন যে সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধির লক্ষ্য (target) অপেক্ষা অনাদায়ী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যই নির্ধারণ করা উচিত। ইহার জন্য অবশ্য বলপ্রয়োগ করা চলিবে না ; করিলে আন্দোলন সর্বনাশের সম্মুখীন হইতে পারে।

আন্দোলনের পুনর্গঠনে বর্তমানে যে পুরাতন অপেক্ষা নূতন সমিতির প্রতি অধিক লক্ষ্য দেওয়া হইতেছে সেদিকে স্যর ম্যালকম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে পুনরুক্তি করা যাইতে পারে যে মিতব্যয়িতার প্রসারসাধনের দ্বারাই সমবায় আন্দোলনকে

সুগঠিত করিতে হইবে—ইহাই স্যর ম্যালকমের সুদূর অভিমত। তিনি এই মিতব্যয়িতার শিক্ষাপ্রদান বিদ্যালয় হইতে সুরু করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

৫। পরিদর্শন, হিসাব-পরীক্ষা প্রভৃতি

তারপর আছে পরিদর্শন, হিসাব-পরীক্ষা, সংরক্ষিত তহবিলের বিনিয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ। এগুলির উন্নতিসাধনও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সমবায়িক শিক্ষারও পুনর্গঠন দরকার। সারা ভারতে যখন সমাজোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং সমাজোন্নয়নের মধ্যে যখন সমবায়ের এক বিশেষ ক্ষেত্র রহিয়াছে তখন ব্লক উন্নয়ন কর্মচারীর (B. D. O.) উপর সমবায় সম্প্রসারণের বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত হইতে বাধ্য। এই কারণে অন্যান্য কর্মীর সংগে ইঁহাদেরও শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। সমবায়িক শিক্ষার পুনর্গঠন

স্যর ম্যালকমের রিপোর্ট দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমবায় সম্পর্কিত কার্যক্রমের ভিত্তি ধরিয়া নাড়া দেয়। সরকার হইতে ঘোষণা করা হয় যে, গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ভুল হইয়াছিল এবং এখন হইতে প্রধানত স্যর ম্যালকম প্রদর্শিত পথেই চলা হইবে। ফলে সুরু হয় সমবায় সম্পর্কিত কার্যক্রমের পরিবর্তনসাধন।

পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) সমবায় নীতি সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাস করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, সমবায়কে জনগণের আন্দোলন হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে গ্রাম্য সমাজকে প্রাথমিক সংস্থা হিসাবে ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সংগঠিত করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগ গ্রাম্য সমবায় ও গ্রাম পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবকে কার্যকর করিবার জন্য সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক ও রাজ্য ব্যাংকের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কার্যকরী দল (Working Group) গঠন করে। এই দলের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার রাজ্য সরকার-গুলিকে কতগুলি নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছে। অন্যতম সিদ্ধান্ত হইল যে, সাধারণত প্রাথমিক ঋণদান সমিতির এলাকা একটি গ্রাম লইয়া হইবে। ইহা ব্যতীত রাজ্যসরকার গ্রাম্য প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ করিবে না।*

সমবায় নীতির পরিবর্তনসাধনের প্রচেষ্টা

সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের আর একটি দিক হইল সেবা সমবায় সমিতি গঠন। নিম্নে এ-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operatives): সেবা সমবায় সমিতি সম্বন্ধে ধারণা একেবারে নূতন নহে। তবে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দলের 'নাগপুর প্রস্তাবের' (Nagpur Resolution) পর হইতে। নাগপুর প্রস্তাব অনুসারে তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা সমবায় সমিতি দ্বারা ছাইয়া ফেলিতে হইবে এবং

নাগপুর প্রস্তাব

* Reserve Bank Bulletin, August, 1959.

পুনর্গঠিত সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হইবে এই সেবা সমবায় সমিতিগুলি। সেবা সমবায় সমিতি স্থাপনের সংগে সংগে অবশ্য সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে আলোচনা 'ভূমি সংস্কার' অধ্যায় করা হইতেছে।

বর্তমানে সেবা সমবায় সমিতির গঠন সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা অনুসারে মোটামুটি এক একটি গ্রাম লইয়া এক একটি সমিতি গঠিত হইবে এবং উহারা বহু-উদ্দেশ্যসাধক (multi-purpose) হইবে।* বহু-উদ্দেশ্যসাধক বলিতে বুঝান হইয়াছে, সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষককে ঋণদান ছাড়াও কৃষি-যন্ত্রপাতি, ধান, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিবে; প্রয়োজনমত জলসেচ ও জমি উন্নয়নে সহায়তা করিবে; কৃষিকার্যের অনুপূরক হিসাবে ক্ষুদ্র শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে; ইত্যাদি। মোটকথা সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষি-শিল্পের সর্বতোমুখী সেবা করিবে।

সেবা সমিতির গঠন

প্রথমে ঠিক হইল যে সেবা সমবায় সমিতিগুলিতে শেয়ার মূলধনে সরকার অংশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু বর্তমানে ঐ নীতির পরিবর্তনসাধন করিয়া বলা হইয়াছে, গ্রাম পর্যায়ের কোন সমবায় সমিতিতেই সরকার শেয়ার মূলধন যোগান দিবে না; প্রধানত কৃষকের সংগতিকেই সমবায় সম্প্রসারণের কার্যে নিয়োজিত করা হইবে। তবে গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও বিবর্তনে সরকারী সাহায্য প্রধানত কেন্দ্রীয় ও শীর্ষ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমেই বণ্টিত হইবে। স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর সুপারিশ অনুসারে মুমূর্ষু সমিতিগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করা হইবে; সংগে সংগে অবশ্য নূতন সেবা সমিতি স্থাপনের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত যে সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। পরিকল্পনা মহলের ধারণা হইল যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতিরেকে সমবায়ের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল হইতে পারে না। তবে সমবায় আন্দোলন প্রধানত জনগণেরই আন্দোলন। সুতরাং ব্যাপক বেসরকারী উদ্যোগও কম প্রয়োজনীয় নহে; বরং উহাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সেবা সমিতি গঠন ও সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণে প্রধানত জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্যোগের উপরই নির্ভর করিয়াই বলিতে হইবে।

সমাজোন্নয়ন ও সমবায়ের সংযোগসাধন

সমবায় সংগঠনের আর একটি দিক হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সমবায়ের সংযোগ সংস্থাপন। এই উদ্দেশ্যে সমবায়কে সমাজোন্নয়নের মন্ত্রি-দপ্তরের অধীন করা হইয়াছে।

উপসংহার: সেবা সমবায় সমিতি গঠন, সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, কৃষি ঋণদান সমিতি পুনর্গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপরি-উক্ত কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও এখনও ঐ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য

* A I C C Economic Review April and May 1959 এবং ১৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ইস্রায়েল ও যুগোশ্লাভিয়ায় দুইটি দল (Study Teams) প্রেরিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল সিদ্ধান্ত কতদূর অপরিবর্তিত থাকিবে তাহা বলা কঠিন।* তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে তবে ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Review the working of the Village Co-operative Credit Societies. How can they made more serviceable ? (১৬৫-১৬৮ পৃষ্ঠা)

2. What do you understand by a Multi-purpose Co operative Society ? Discuss its advantages and disadvantages. Should such societies be established in large numbers ?

[ইংগিত : বহুসংখ্যক বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত কিনা এ-সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ, স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত ও সেবা সমবায় সমিতির সম্বন্ধ দেখ।...১৭৮-১৮৩ পৃষ্ঠা]

3. Show the aim and scope of the Land Mortgage Banks in India. How far have they been successful ? (C. U. B. Com. 1953) (১৮৩-১৮৬ পৃষ্ঠা)

4. What is and should be the relation of the State to the Co-operative Movement in a country like India ?

[ইংগিত : যে সম্পর্ক হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি, স্যর ম্যালকম ডার্লিং-এর অভিমত এবং পরিকল্পনা মহলের বর্তমান ধারণা।......১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা]

5. Indicate the success or otherwise of the Co-operative Movement in India. Give reasons for your answer. (১৯১-১৯৪ পৃষ্ঠা)

6. In the opinion of the All-India Rural Credit Survey Committee Co-operative Movement in India has failed. Account for this failure and suggest measures to remedy it.

[ইংগিত : পূর্ববর্তী প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের প্রথমাংশ একই। সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, ভারতে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হইল : (১) জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৬-২৭ ভাগ সমবায় আন্দোলনের সহিত সম্পর্কিত ; (২) সমবায় সমিতি কৃষি-ঋণের মাত্র শতকরা ৩ ভাগ যোগান দেয় ; (৩) সমবায় সমিতির সুদের হার অত্যধিক ; (৪) অনেক সমিতি অকার্যকর ; (৫) সমবায় সভ্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের প্রসারসাধন করিতে পারে নাই। অল্প কথায় প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থা এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাপন—এই তিনটি উদ্দেশ্যের একটিকেও ভারতীয় সমবায় আন্দোলন সার্থক করিতে পারে নাই......(১৯১-১৯৮ পৃষ্ঠা)]

7. Briefly describe the steps that are being adopted to reorganise Co-operative Movement in India.

[ইংগিত : প্রথমত, গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি নির্দেশিত গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত এবং উহাকে কার্যকর করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ঋণ ও বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিকে বৃহদাকারে পরিণত করা হইতেছিল! তৃতীয়ত, কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই সমবায়কে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান করিয়া উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছিল। চতুর্থত, সমবায়িক শিক্ষাপ্রসারের বন্দোবস্তও করা হইতেছিল। বর্তমানে স্যর ম্যালকন ডার্লিং-এর রিপোর্টের ফলে পদ্ধতিগুলি কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে এবং এখনও ঐ বিষয় বিচার-বিবেচনা চলিতেছে।... (১৯৬-১৯৯ পৃষ্ঠা)]

8. Indicate the future of the Co-operative Movement in India in the light of Sir Malcolm Darling's Report. (১৯৯-২০২ পৃষ্ঠা)

9. Write a note on Service Co-operatives. (২০২-২০৪ পৃষ্ঠা)

---

* Ooty Seminar on Planning, Sept. 1959.

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতে খাদ্য-সমস্যা

(Food Problem in India)

যাহাকে খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিক (quantitive aspect) বলে, ভারতে তাহার উদ্ভব হয় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তাহার বহু পূর্ব হইতেই অবশ্য গুণগত দিক (qualitative aspect) দিয়া খাদ্য-সমস্যা বর্তমান ছিল—অর্থাৎ তখন ভারতীয় জনগণের জন্য মোট খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকিলেও, এই খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকারক ছিল না। এখনও অবশ্য নাই।

খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিকের উদ্ভব

পরিমাণের দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উদ্ভূত হইলেও ইহা প্রকট রূপ ধারণ করে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধের পর সমস্যা সংকটরূপে দেখা দেয়। বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করা যে কি দুঃসাধ্য ও অপচয়-মূলক ব্যাপার সে-সম্বন্ধে এই সময় সাধারণ লোকেও সচেতন হইয়া উঠে। পরিমাণের অপ্রতুলতার ফলে সরকারকে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া খাদ্যের ক্ষেত্রে একরূপ পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থার (controlled economy) প্রবর্তন করিতে হয়। ফলে আপামরসাধারণের জীবনের একটা দিক হইয়া উঠে যান্ত্রিক। এই নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থা ও শৃংখলিত যান্ত্রিক জীবন হইতে আমরা বর্তমানে একপ্রকার মুক্তি পাইলেও ভারতে খাদ্য-সমস্যা অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। এখনও গুণগত দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই ; এত অল্প সময়ের মধ্যে হইতেও পারে না। পর্যাপ্তির দিক দিয়াও এই ভয় সর্বদাই রহিয়াছে যে যে-কোন সময় আমাদিগকে বর্তমানের খাদ্য-ঘাটতি হইতে প্রকৃত খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে। খাদ্য-ঘাটতির জন্য এখনও আমাদিগকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত কৃষিকার্যের জন্য যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের উপর বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল থাকিবে ততদিন খাদ্য সংকটের আশংকা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং ভারতে খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই রহিয়াছে। উপরন্তু, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এরূপ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, দেশের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইল কৃষি উন্নয়নের একটি গতিশীল কার্যক্রমের (dynamic programme of agriculture)।* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সমস্যার সংকটে রূপান্তর

খাদ্য-সমস্যা এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই

খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যা

---

* ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অনুসারে ভারতের খাদ্য-সমস্যার বিচার সকল সময়ই বর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হইবে।* ১৯৫৯ সালের মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, খাদ্য-সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভারতে খাদ্য সমস্যার আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে—সর্বদাই জনসংখ্যার গতি হইল খাদ্য সরবরাহকে ছাড়িয়া যাইবার দিকে। স্থতরাং ক্রমবর্ধমান খাদ্যোৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উপরন্তু, জনসাধারণকে প্রয়োজনমত খাদ্য সরবরাহ না করিয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা কার্যকর করা যায় না। অতএব, বিভিন্ন দিক হইতে প্রয়োজন রহিয়াছে খাদ্য-সমস্যার পর্যালোচনার।

খাদ্য-সমস্যা আলোচনার প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্তসার

ভারতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি (Nature of the Food Problem in India) : ভারতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইংগিত ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে—যথা, খাদ্য ঘাটতি ত' রহিয়াছেই, উপরন্তু আশংকা রহিয়াছে খাদ্য-সংকটের এবং যে খাদ্য ভারতীয় জনগণ সাধারণত গ্রহণ করে, পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া তাহা বিশেষ ক্রটিপূর্ণ। এখন খাদ্য-সমস্যার এই দুইটি দিক এবং ইহাদের সহিত সম্পর্কিত আরও দুইটি বিষয়—যথা, খাদ্য বণ্টন পরিচালনা ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বিশদ আলোচনা করা হইবে।

খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিক বা খাদ্য সরবরাহের অ-পর্যাপ্তি (Quantitative Aspect of the Food Problem) : বলা হইয়াছে যে, বিগত দ্বিতীয় দশকে ভারতে প্রথম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ইহার পূর্বে ভারত খাদ্য রপ্তানিই করিত; কিন্তু এখন আমদানি করে। ১৯৩৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ভারতে ১৩ লক্ষ টনের মত খাদ্য-খাটতি পড়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশবিভাগের ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ আরও ৭ লক্ষ টনের উপর বাড়িয়া যায়—কারণ অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনসংখ্যার তুলনায় অধিক চাষের জমি পাকিস্তানের অংশে পড়ে। একটি হিসাব অনুসারে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ২৩ ভাগ পাকিস্তানের অংশে পড়িলেও ধান্য ও গম চাষের মোট জমির ২৬ ভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

১৯৩৮ সালের ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার '৪০ কোটি লোকের জন্য খাদ্য-পরিকল্পনা' নামক গ্রন্থে † হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সময় স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরেও ভারতে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে মাত্র ৮৮ জনের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হইত। বাকী শতকরা ১২ জনের জন্য খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানি করিতে হইত। ১৯৪৮ সাল হইতে এই আমদানির পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশনের

দেশবিভাগের পূর্বে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হিসাব

* Second Five Year Plan—২৫৯ পৃষ্ঠা। India's food crisis and steps to meet it..

† Food Planning for Four Hundred Millions.

হিসাব অনুসারে ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ১৯৫২-৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতকে বৎসরে গড়ে ৩০ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। বর্তমানেও ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ এবং ৩২ লক্ষ টন।

আমদানির দৃষ্টিকোণ হইতে খাদ্য-সমস্যার গুরুত্ব

টাকা হিসাবে দেশবিভাগের পর হইতে এ-পর্যন্ত আমাদিগকে খাদ্য-আমদানিতে যে-পরিমাণ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবারই কথা। মোটামুটিভাবে ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ হইল ১,৪০০ কোটি টাকার মত। এই শেষোক্ত বৎসরেই (১৯৫৮-৫৯) ১৫৯ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য (cereals and cereal preparetions) আমদানি করা হয়।* যখন আমরা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির (reserve of foreign exchange) ক্ষুদ্রতম অংশও উন্নয়নমূলক কার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছি তখনই আমাদিগকে বহু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, যদি ভারতে খাদ্য-সমস্যা না থাকিত তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপকতর রূপ দেওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির সাহায্যে মূলধন-দ্রব্যাদি (capital goods) আমদানি করিয়া ইহাকে কার্যকর করা সহজেই সম্ভব হইত।

খাদ্য-সমস্যার গুণগত দিক (Qualitative Aspect of the Food Problem) : পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক অন্তত ৩,০০০ ক্যালোরি মূল্যের (caloric value) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। ভারতে গড়ে ইহা হইল ২,০০০ ক্যালোরি মাত্র। এই গড়পড়তা হিসাব প্রকৃত অবস্থার ইংগিত দেয় না কারণ বেশীর ভাগ লোক ১,২০০-১,৫০০ ক্যালোরি মূল্যের অধিক খাদ্য গ্রহণ করিতেও সমর্থ নয়।** সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শুধু পরিমাণ নহে গুণগত দিক দিয়াও খাদ্যগ্রহণে ভারত ন্যূনতম মাত্রায় পৌঁছিতে পারে নাই। উপরন্তু, দুগ্ধ এবং অন্যান্য সংরক্ষণমূলক খাদ্য (protective food) গ্রহণের পরিমাণও ভারতে অতি অল্প। ভারতের নিরামিষাশী জনগণ তাহাদের খাদ্যের স্বাভাবিক অপুষ্টিকারিতা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। অনেক সময় আবার অজ্ঞতা হেতু তাহারা যেটুকু খাদ্যগুণ আছে তাহাও অনেকাংশে অপচয় করিয়া ফেলে। ফলে সুষম খাদ্যের (balanced diet) অভাবে তাহারা অপুষ্টিজনিত নানারূপ ব্যাধি কবলিত হয়, শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় দক্ষতা হ্রাস পায়।

গুণগত দিক দিয়াও খাদ্যগ্রহণে ভারত ন্যূনতম মাত্রায় পৌঁছিতে পারে নাই

* Report on Currency and Finance, 1958-59.

** Foodgrains Enquiry Committee Report, 1957—৪০ পৃষ্ঠা।

বণ্টনগত দিক হইতে খাদ্য-সমস্যা (Administrative Aspect of the Food Problem): খাদ্য-সমস্যার বণ্টনগত দিক ইহার পরিমাণগত দিকেরই স্বাভাবিক ফল—অর্থাৎ, পরিমাণগতভাবে খাদ্য-সমস্যা আছে বলিয়া বণ্টনের দিক দিয়াও সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তাহার সমগ্রটাই বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনীত হয় না এবং বিক্রয়-ব্যবস্থাতে উৎপাদনকারী কৃষকের ভূমিকাও একরূপ নগণ্য। ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন প্রভৃতির মাধ্যমেই কৃষিজ পণ্যের বিক্রয় প্রধানত পরিচালিত হয়। এই সকল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্য মজুত করিয়া কৃত্রিমভাবে আরও খাদ্য-ঘাটতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। ফলে দাম অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায় এবং দরিদ্র জনসাধারণ অর্ধাহার ও অনাহারের সম্মুখীন হয়। এমত অবস্থায় সরকারের কর্তব্য হইল খাদ্যের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং খাদ্যশস্যের দামে স্থায়িত্ব আনয়ন করা। খাদ্যমূল্যে এই স্থায়িত্ব-করণের উপরই খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) এবং মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

অপকৃষ্ট বিক্রয়-ব্যবস্থার জন্য খাদ্য বণ্টনে ত্রুটি

মূল্যস্থায়িত্বকরণের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য-সমস্যার অর্থনৈতিক দিক (Economic Aspect of the Food Problem): মূলত ভারতের খাদ্য-সমস্যা হইল অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা। পরিমাণগত ও গুণগত দিক দিয়া ভারতে খাদ্য-সমস্যা বর্তমান রহিয়াছে। কারণ ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধির প্রধান উপাদান কৃষি হইল বিশেষভাবে অনগ্রসর এবং ভারতীয় জনগণ হইল অতিশয় দরিদ্র। যদি ভারতে শিল্পোন্নয়নের পরিমাণ পর্যাপ্ত হইত তবে কৃষির উৎপাদন স্বল্প হইলেও খাদ্য-সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করিতে পারিত না। সেই অবস্থায় গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতির ন্যায় ভারতও শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিনিময়ে বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া জনসাধারণের ভরণের ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু ভারতের শিল্পোন্নয়ন পর্যাপ্ত নয়; সুতরাং আভ্যন্তরীণ সূত্রই হইল সাধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহের প্রধান পন্থা।

মূলত ভারতের খাদ্য-সমস্যা অন্যতম অর্থনৈতিক সমস্যা

ভারতীয় জনগণ পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া উনমূল্যের খাদ্যের জন্য যে-ব্যয় করে বিশেষজ্ঞগণের মতে, তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করিলে তবেই তাহাদের পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুষ্টিকর বা সুষম খাদ্য (balanced diet) গ্রহণ করা সম্ভব। এই অভিমতের সুস্পষ্ট অর্থ হইল যে, ভারতীয় জনগণের খাদ্যের গুণগত ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর করিতে হইলে মাথাপিছু খাদ্যের জন্য ব্যয়শক্তিকে দ্বিগুণ করিতে হইবে। ইহা একরূপ মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়ার মত। বলা যায়, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে এই

সুষম খাদ্যগ্রহণের জন্য মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন

লক্ষ্যাভিমুখীই করা হইয়াছে। প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল যে, ১৯৭৭ সালের কাছাকাছি অর্থাৎ ১৯৫০ সাল হইতে ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে।* এখন আশা করা হইতেছে যে ঐ সময়ের পূর্বেই মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-সমস্যার পূর্ণ সমাধান হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘকালীন উন্নয়নের প্রশ্ন। ভরসার কথা এই যে, পথের দৈর্ঘ্য উদ্যমহীনতার সৃষ্টি না করিয়া বরং আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকগণকে উদ্যোগীই করিয়া তুলিয়াছে।

খাদ্য-সমস্যার সমাধান দীর্ঘকালীন উন্নয়নের প্রশ্ন

জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যা (Food Problem in relation to the Growth of Population)ঃ জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যা বলিতে খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিকই বুঝায়। এ-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।** তবে এখন সামান্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই শতাব্দীর গোড়া হইতে সুরু করিলে দেখা যায় যে, ১৯০১-৫১ সাল, অর্থাৎ বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে অবিভক্ত ভারতের যে-অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছে, সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৪০ লক্ষের মত বাড়িয়াছে। বাৎসরিক হিসাব ধরিলে ইহা হইল গড়ে শতকরা ১'২৫ হারে বৃদ্ধি। ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যে এই বাৎসরিক হার আবার বাড়িয়া ১'৩৩-এ দাঁড়ায়। অপরদিকে কিন্তু স্বভাবতই মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ ১৯২১ সালে ছিল ১১১ সেণ্ট; ১৯৫১ সালে ইহা কমিয়া ৮৪ সেণ্টে আসিয়া দাঁড়ায়। বর্তমানে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই মাথাপিছু পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুই প্রকার শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণও (double crop area) এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে নিয়মিত হারে কমিয়া যাইতেছে। ১৯২১ সালে মাথাপিছু এই প্রকার জমির পরিমাণ ছিল ১৩ সেণ্ট; ১৯৫১ সালে ইহা কমিয়া ১০ সেণ্টে পরিণত হয়।

জনসংখ্যার নিয়মিত বৃদ্ধি ঘটিতেছে কিন্তু মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে

সংগে সংগে যদি কৃষির পদ্ধতিগত উন্নতিসাধন (organisational improvement) করা সম্ভব হইত, তবে মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিলেও খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি পড়িত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে তাহা ঘটে নাই। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিলেও পদ্ধতিগত উন্নতির—যেমন, যন্ত্রিকরণ, বৃহদায়তনে উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে ইহার উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই বলিলেই চলে। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান ব্যাপকতরই হইতে থাকে।

কৃষির পদ্ধতিগত উন্নতি ঘটে নাই

ফলে খাদ্য যোগান ও জনসংখ্যার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে

* First Five Year Plan—২১ পৃষ্ঠা।

** ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ভবিষ্যতে এই ব্যবধানের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ১৪ আউন্স হিসাবে ধরিয়া হিসাব করা হইয়াছিল যে, খাদ্য-ঘাটতি পূরণ করিতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৭৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে। ১৩·৭১ আউন্স হিসাবে মাথাপিছু প্রয়োজনীয়তা ধরিলে মোট উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য কমিয়া ৬৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের পরিমাণ

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির মতে, পাটীগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই ব্যবধান বিশেষ আশংকাজনক নহে—কারণ এই উৎপাদনবৃদ্ধি একপ্রকার সম্ভব বলিয়াই বিবেচনা করা যাইতে পারে। বস্তুত, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্যের উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়; এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে এই লক্ষ্যের ৩৪ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা অপেক্ষাও ৩৭ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।*

খাদ্যশস্যের অনুমিত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব

কিন্তু আদমসুমারির কমিশনার পাটীগণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতেই ভবিষ্যতে বিশেষ আশংকাজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিমত পরিস্ফুটিত করিয়াছেন সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদনের ভিত্তিতে, মাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের ভিত্তিতে নহে। ১৯৫১ সালে খাদ্যশস্য, বাণিজ্যিক শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭ কোটি টন এবং জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটির মত। হিসাব করা হইয়াছে যে, বর্তমান ভোগের হারে ৩৬ কোটি লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে বাৎসরিক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনের মত কৃষিজ উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বর্তমানে ৫০ লক্ষ টনের ঘাটতি রহিয়াছে। আদমসুমারি কমিশনারের মতে, পরবর্তী কয়েক দশকে জনসংখ্যা এবং ফলে কৃষিজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিতভাবে বাড়িয়া যাইবে:

কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধিই জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য-সমস্যার প্রকৃত সমাধান নহে

সাল	জনসংখ্যা (ভগ্নাংশ বাদ দিয়া কোটিতে)	প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদন (বাৎসরিক কোটি টন)
১৯৫১	৩৬	৭·৫০
১৯৬১	৪১	৮·৫০
১৯৭১	৪৬	৯·৬০
১৯৮১	৫২	১০·৮০

* Second Five Year Plan—২৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা।

দেখা যাইতেছে যে, বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ভোগের বর্তমান হার শুধু বজায় রাখিতেই ১৯৫১ সালের ৭ কোটি টন উৎপন্নকে (প্রয়োজনীয় কৃষিজ উৎপাদন হইল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন কিন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল ৭ কোটি টন) বাড়াইয়া ১৯৬১ সালে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে লইয়া যাইতে হইবে। ইহা হইল ১৯৫১ সালের উৎপাদনের উপর শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধি।* দশ বৎসরে শতকরা ২১ ভাগ বৃদ্ধির জন্য কৃষিজ উৎপাদনের বিশেষ গতিশীল কার্যক্রম (dynamic programme of agricultural production) প্রয়োজন।

আগামী ১০ বৎসরে শতকরা ২১ ভাগ কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি প্রয়োজন

১৯৫৭ সালের খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় অধিক হইবে। বস্তুত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে এইরূপই ঘটে।** এই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও লোকের আয়বৃদ্ধির দরুন পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্যের চাহিদা শতকরা ১৫ ভাগের মত বাড়িয়া যাইবে এবং ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র খাদ্যশস্যেরই (মোট কৃষিজ উৎপাদনের নহে) মোট চাহিদা দাঁড়াইবে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টনে। অপরদিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টনের মত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। সুতরাং ১৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের ঘাটতির আশংকা রহিয়াছে। স্বভাবতই এ ঘাটতি আমদানির সাহায্যে পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে লোকের চাহিদা পূরণ ও মজুত করিবার জন্য প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন হইতে ৩০ লক্ষ টন করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কৃষি বিশেষজ্ঞের দলকে (The American Team of Agricultural Specialists) ভারতে আনয়ন করা হইয়াছিল তাহাদের মতে, খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কৃষিজ উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই দল অভিমত প্রকাশ করে যে, জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ১৯৬৬ সালের মধ্যে—অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৪৮ কোটি হইয়া দাঁড়াইবে। এখন মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ যদি ১৮ আউন্স করিয়া ধরা হয় তাহা হইলে এই জনসংখ্যাকে খাওয়াইয়া রাখার জন্যই ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে; ইহা ব্যতীত বীজ, মজুত প্রভৃতির জন্য প্রয়োজন হইবে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১১ কোটি টনে স্থির করিতে হইবে। সম্প্রতি ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি টনের কিছু অধিক। খাদ্যশস্যের

মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল

* Census of India, 1951, Vol. I, India, Part I—A Report—৯৪ ও ১৯০ পৃষ্ঠা এবং All-India Rural Credit Survey—Vol. II ১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

** ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

উৎপাদনবৃদ্ধি বর্তমান হারে চলিতে থাকিলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ২ কোটি ৮০ লক্ষের মত খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিবে। বিশেষজ্ঞ দল সুপারিশ করিয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধির হার বর্তমান শতকরা ৩·২ ভাগ হইতে বাড়াইয়া শতকরা ৮·২ ভাগে লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।*

খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ (Measures adopted to solve the Food Problem) ঃ খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে যে গতিশীল কার্যক্রম প্রস্তুত ও কার্যকর করা হইয়াছে তাহা অধিক দিনের পুরাতন নহে; ইহার সূত্রপাত হয় ১৯৫২ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হইলে। ইহার পূর্বেও অবশ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয়। প্রথমে এইগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পূর্বে অবলম্বিত প্রতিবিধান

প্রতিবিধানগুলির দ্বারা পরিমাণগত ও বণ্টনগত উভয় দিক দিয়াই খাদ্য-সমস্যাকে আক্রমণ করা হয়। কিভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, ইহার বিরুদ্ধে কি কি প্রতিবিধান অবলম্বন করা প্রয়োজন ও সম্ভব এই সকল নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯৪২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে একটি খাদ্য বিভাগ (Food Department) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইহার পর ১৯৪৩ সালে বিখ্যাত বংগীয় দুর্ভিক্ষের পর সরকার খাদ্য-সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া ইহার সমাধানকল্পে সচেষ্ট হয়।

এই সময় হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূচনার পূর্ব পর্যন্ত খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে যে-সকল প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয় মোটামুটিভাবে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, বাহির হইতে খাদ্য আমদানি, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা এবং অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান।

(ক) বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি (Import of Foodgrains) খাদ্য-সমস্যার পরিমাণগত দিকের আলোচনা প্রসংগে বাহির হইতে আমদানির কিছু আলোচনা ইতিমধ্যে করা হইয়াছে।† এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের বুভুক্ষা মিটাইবার জন্য ভারত সরকারকে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে বাহির হইতে ৯৬৫ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে গড়ে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল বৎসরে ৩০ লক্ষ টন করিয়া।

খাদ্য আমদানির পরিমাণ

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে আমদানির পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইলেও উহার পরবর্তী সময়ে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়াই চলে। ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে ভারতকে যথাক্রমে ১৪ লক্ষ ও ৩৭ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি

* India's food crisis and steps to meet it.

† ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

মন্ত্রীর এক ঘোষণা অনুসারে ১৯৫৮ সালে ৩১'৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে।

১৯৪৭ সাল হইতে সুরু করিয়া এ-পর্যন্ত খাদ্যশস্য আমদানি করিতে ভারত সরকারকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। একে বর্তমানে রহিয়াছে প্রায় সমগ্র বিশ্বেই একরূপ খাদ্যাভাব; আর তাহার উপর ভারতে নাই যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় (reserve of foreign currency)। যে-সামান্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ছিল এবং ষ্টার্লিং পাওনা (sterling balance) যেটুকু আদায় করা গিয়াছিল—উভয়ের প্রায় সমগ্রটাই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে এই 'বুভুক্ষা নিবারণ' খাতে।

খাদ্যশস্য আমদানিতে অসুবিধা

সকল সময় যে ভারত সরকার নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে পারিয়াছে, তাহাও নহে। এই সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ভারতকে ঋণ ও দান হিসাবেও খাদ্যশস্য অন্যান্য দেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

(খ) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা (Food Control and Rationing): ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষের পরই কলিকাতা ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলে এবং ভারতের অন্যান্য কতিপয় অঞ্চলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমে এই ব্যবস্থার প্রসারসাধন করিয়া স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে প্রায় ১৫ কোটি লোককে ইহার আওতায় আনা হয়।

একপ্রকার সুরু হইতেই নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা পরিচালনায় বহু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং ফলে, নানাপ্রকার দুর্নীতি ইহার আশ্রয়ে প্রসারলাভ করিতে থাকে। উপরন্তু, কৃষকদের নিকট হইতে যে নির্ধারিত দামে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হইত তাহা অনেকের অধিক উৎপাদনের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সকল কারণে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার সপক্ষে একরূপ আন্দোলন চলিতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা একপ্রকার কৃত্রিম খাদ্য-ঘাটতির সৃষ্টি করিয়াছে; অধিকাংশে ইহা হইল মনস্তাত্ত্বিক, প্রকৃত নহে। ফলে তাঁহার উপদেশ অনুসারে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ইহার ফল দাঁড়ায় ভয়াবহ। চারিদিকেই খাদ্য মজুতের হিড়িক পড়িয়া যায়; ব্যবসায়িগণ এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া অকল্পনীয়ভাবে দাম বৃদ্ধি করিতে থাকে। স্বভাবত কয়েক মাসের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত এবং পরিচালন-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিতে হয়; এবং এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে সুরু হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ।

নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা

নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল চাউলের উপর। কারণ, চাউলের ঘাটতির পরিমাণই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, ঐ সময় মজুত

চাউলের পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছিল যে, দৈনিক ৯ আউন্সের অধিক করিয়া সরবরাহ করা যাইত না। দেশের যে-যে অঞ্চলের অধিবাসিগণের নিকট চাউলই প্রধান খাদ্য তাহাদিগকে গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া ও অনুরোধ করা হইয়াছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে "জনগণের খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"*

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের আর কয়েকটি দিক

১৯৫২ সাল হইতে খাদ্য সীমান্তে প্রভূত উন্নত পরিলক্ষিত হয় এবং এই বৎসরের জুন মাসে চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন মাদ্রাজ সরকারী খাদ্য-বিনিয়ন্ত্রণ লইয়া পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষায় মাদ্রাজ সফল হওয়ায় ধীরে ধীরে বিনিয়ন্ত্রণ ভারতের অন্যান্য অংশে প্রসারলাভ করে। অবশেষে, ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই সারা ভারতব্যাপী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিলোপসাধন করা হয়। এ-সম্পর্কে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

১৯৫২ সাল হইতে খাদ্যের ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণ

(গ) **অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান (Grow More Food Campaign) :** পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্বে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানকে মোটামুটিভাবে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে: (ক) অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান (১৯৪৩-৪৮) এবং (খ) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা (১৯৪৯-৫২)। ইহার পর ১৯৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চূড়ান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানকে নূতন ও ব্যাপকতর রূপদান করিয়া ইহাকে কৃষির উন্নতির জন্য গতিশীল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযানের দুই পর্যায়: ক। অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান

১৯৪৩-৪৮ সালের মধ্যে অধিক খাদ্য ফলানর জন্য অভিযান পরিচালিত হয় তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারগুলির মাধ্যমে।

অভিযান পরিচালনার জন্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: গঠনমূলক কার্যাবলী (work schemes) এবং সরবরাহমূলক কার্যাবলী (supply schemes)। কূপ নলকূপ পুষ্করিণী বাঁধ খাল প্রভৃতির নির্মাণ ও সংস্কার, জল উত্তোলনের ব্যবস্থা, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সরবরাহমূলক কার্যাবলী বলিতে উন্নত ধরনের বীজ, সার ইত্যাদির বণ্টন বুঝাইত।† প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কৃষির উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহকেও বর্তমানে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়।

এইরূপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৪৩-৪৮ সালের অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের ব্যর্থতা ঢাকিয়া রাখা যায় নাই। এই অভিযানকে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক শস্যের জমিকে

* First Five Year Plan – ১৮৩ পৃষ্ঠা।

† India—1955 গ্রন্থের ১৭১ পৃষ্ঠা।

অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের (১৯৪৩–৪৮) ব্যর্থতা

খাদ্যশস্যের অধীনে আনয়ন করার দরুন তুলা ও পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে কৃষকগণের আয় কমিয়া যাওয়ায় খাদ্য পরিস্থিতি দিন দিন সংকটেরই সম্মুখীন হইতে থাকে। উপরন্তু, এই অভিযানের কোন নির্দিষ্ট তারিখ এবং উৎপাদনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না যে, ঐ বৎসরের মধ্যে এত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। অভিযানের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে কোন সংহতিও ছিল না। প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিশৃংখলভাবে কূপ খনন, বাঁধ নির্মাণ, বীজ ও সার সরবরাহ প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। পরিশেষে, এই অভিযান জনগণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারে নাই ; ফলে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত তাহাদের সহযোগিতাও সংযুক্ত হয় নাই। স্বভাবতই, ১৯৪৩-৪৮ সালের অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের ব্যর্থ রূপ সকলের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ব্যর্থতার কারণ

অধিক খাদ্য ফলানর এই অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইলে ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার বিশ্ববিশ্রুত বিশেষজ্ঞ লর্ড বয়েড ওরকে (Lord Boyd-Orr) এ বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করে। লর্ড বয়েড ওরের এবং ১৯৪৭ সালে পুরষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের অধীনে নিযুক্ত দ্বিতীয় খাদ্যশস্য নীতি কমিটির (The Second Foodgrains Policy Committee)* সুপারিশসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া সরকার একটি খাদ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনার মূল কথা ছিল ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে। পরে এই নির্দিষ্ট তারিখকে পিছাইয়া ১৯৫২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। এই নূতন খাদ্য পরিকল্পনায় 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা'র উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান না বলিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা (Food Self-sufficiency Drive) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

খাদ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন

খ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা

এই নূতন অভিযানে পূর্বের কার্যক্রমের সকল প্রকার বিশৃংখলাকে পরিহার করিবার জন্য এবং কার্যক্রমের মধ্যে সংহতি আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। প্রত্যেক রাজ্যে ক্রমিক বাৎসরিক খাদ্য উৎপাদনবৃদ্ধির অংকও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় ; এবং নূতন জমিতে চাষের পরিবর্তে পুরাতন জমিতেই উন্নততর প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা অধিক পরিমাণে করা হয়।

পুরাতন পদ্ধতির সহিত ইহার পার্থক্য

পুরাতন জমিতে এই অধিক প্রচেষ্টাসমন্বিত বা আত্যন্তিক কৃষিকার্য (intensive cultivation) পূর্বের ন্যায় উন্নয়নমূলক এবং সরবরাহমূলক—এই দুই প্রকার পদ্ধতিতে

* প্রথম খাদ্যশস্য নীতি কমিটি ১৯৪৩ সালে নিযুক্ত হয়। ইহারই সুপারিশ অনুসারে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান শুরু করা হয়।

বিভক্ত ছিল। জলসেচ-ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ, বীজ ও সার সরবরাহ প্রভৃতি সকলই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিকল্পনায় শস্য ছাড়া কদলী, মিঠা আলু, পেঁপে প্রভৃতি খাদ্যের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কৃষকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য শস্যোৎপাদনবৃদ্ধি প্রতিযোগিতা স্বরু করা হয়, এবং পোকামাকড়, পংগপাল, বানর, হনুমান, শৃগাল প্রভৃতির হাত হইতে শস্যরক্ষা করিবার জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রে একজন খাদ্যোৎপাদন কমিশনার (Food Production Commissioner) নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যের যথোচিত বণ্টনের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক রাজ্যে এই কার্যের জন্য একজন করিয়া খাদ্যোৎপাদন পরিচালক (Director of Food Production) নিযুক্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ছোট খাদ্য কমিটি নিযুক্ত হয়।

খাদ্যোৎপাদন কমিশনার ইত্যাদি

এইভাবে খাদ্যোৎপাদনের কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়। তৎকালীন খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীর ভাষায় বলা হয় যে, ইহার উদ্দেশ্য ছিল, "বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি" (freedom from foreign bread)।

'বৈদেশিক অন্ন হইতে ভারতের মুক্তি'

বৈদেশিক অন্নের উপর নির্ভরশীলতা হইতে এই মুক্তি নির্দিষ্ট তারিখ—১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আসে নাই। ইহার কারণানুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি (Krishnamachari Committee) নিযুক্ত করা হয়।

এই প্রচেষ্টারও ব্যর্থতা

কমিটির মতে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতার কারণ ছিল অনেকাংশে প্রাকৃতিক। আসামে ভূমিকম্প, পশ্চিমবংগ পাঞ্জাব বিহার ও উত্তর-প্রদেশে বন্যা, রাজস্থান সৌরাষ্ট্র পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টি ১৯৫১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে উপরি-উক্ত পরিমাণ হ্রাস ঘটায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া, এই অভিযানের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হইল ইহার সংকীর্ণ পরিধি। ব্যর্থতার কারণ প্রদর্শনের পর কৃষ্ণমাচারী কমিটি এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছে যে, কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে খাদ্য সীমান্তে সংকট দূরিকরণ ভারতের ন্যায় দেশে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিলেই চলে।

ব্যর্থতার কারণ

কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টাও অবশ্য ইতিমধ্যে করা হইয়াছিল—কিন্তু করা হইয়াছিল পরিকল্পনাবিহীনভাবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা চলিতে থাকাকালীন ১৯৫০-৫১ সালে তুলা, পাট ও চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য কৃষিজ উৎপাদনের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (The Integrated Production Programme) গ্রহণ করিয়া কার্যকর করা হয়। ইহাতে অনেকের দৃষ্টি খাদ্যশস্য হইতে বাণিজ্যিক শস্যের উপর পড়ে। ফলে

খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি সহসা বিশেষ ব্যাহত হয়। পরিশেষে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নের যে-কার্যক্রম তাহার অধীনে মোট কর্ষিত জমির শতকরা ৫ ভাগও আসে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ অল্প সময়ের স্বয়ংসম্পূর্ণতা যে কিরূপে সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টার সুফল

তবুও এই প্রচেষ্টা বা অভিযান কৃষিকে উন্নয়নের পথে কিছুদূর লইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর দ্বারা জলসেচ-ব্যবস্থা বিস্তৃততর হইয়াছে, নূতন চাষযোগ্য জমির সৃষ্টি হইয়াছে, বুভুক্ষু জমি বৈজ্ঞানিক সার পাইয়াছে। উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ফলে তুলা ও পাটের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ঘ) **কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম (Dynamic Programme of Agricultural Production)**: ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত চূড়ান্ত গ্রাম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টাকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কৃষির উন্নয়নের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকেই সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইহাকে ভূমির রূপান্তরের কার্যক্রম (Programme of Land Transformation) বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। আপাতত এই কার্যক্রমের কার্যকাল হইল ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত—এই দশ বৎসর বা প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের সমগ্রটা। কিন্তু পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, আদমসুমারি কমিশনারের মতে, কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি বা ভূমির রূপান্তরের প্রচেষ্টার পরিকল্পনা বর্তমানে ত্রিশ বৎসরের জন্যই করিতে হইবে, মাত্র দশ বৎসরের জন্য নহে।* পরিকল্পনা কমিশনও একথা স্বীকার করিয়াছে যে কৃষির উন্নয়নের কার্যক্রমকে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে স্থাপন করা প্রয়োজন।** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে আশা করা যায়। যাহা হউক, বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতেই কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভূমির রূপান্তরের কার্যক্রম

প্রথম পর্যায় (First Phase): পরিকল্পনাকারিগণ এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছেন যে, ভারতীয় কৃষকের জীবন এক পূর্ণাংগ জীবন। ইহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দেখার দরুন এ-পর্যন্ত কৃষিগত উন্নয়ন বা খাদ্য-সমস্যার সমাধান কোনটাই সম্ভব হয় নাই। রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে, গ্রাম্য মহাজন ও ভূস্বামিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে অশিক্ষিত, দরিদ্র কৃষকদের দ্বারা বর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা

কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের পর্যালোচনা

* ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** Second Five Year Plan—২৫৯ পৃষ্ঠা।

নিরর্থক না হইয়া পারে না। সুতরাং ব্যাধিগ্রস্ত কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষকের জীবনের পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইতে হইবে। প্রধানত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service)* দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার প্রচেষ্টা করা হইলেও জলসেচ-ব্যবস্থা, কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, কৃষিকার্যে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষণার ফলের প্রয়োগ, প্রভৃতি পুরাতন পন্থাও অবলম্বিত হইবে। গো-মহিষ, হাঁস মুরগী ইত্যাদি পালন এবং গ্রাম্য শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে কৃষির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা আনয়ন করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও সমবায় আন্দোলনকে নূতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নূতন ভূমিনীতি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কৃষি-শ্রমিকের জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

কৃষির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা, সমবায় আন্দোলনের প্রসার প্রভৃতি অন্যান্য মাধ্যম

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বা প্রথম পর্যায়ে উপরি-উক্ত কার্যক্রমকে কিন্তু প্রাথমিক-ভাবে খাদ্য-সংকটের সমাধানের লক্ষ্যাভিমুখীই করা হয়। অনুমান করা হইয়াছিল যে, ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে।

ঐ পরিকল্পনায় কৃষি, সমাজোন্নয়ন ও জলসেচ খাতে মোট বরাদ্দ করা হয় ৬৪২ কোটি টাকা বা মোট পরিকল্পনার শতকরা ২৭·২ ভাগ।** ইহার দ্বারা কৃষির উন্নয়নের কার্যক্রমকেই শীর্ষস্থান দান করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশনের মতে তৎকালীন ঘাটতিও মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতিতে এরূপ করা সম্পূর্ণ ই যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল।†

পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের কার্যক্রমকে শীর্ষস্থান দান

ফলাফল: অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টা প্রথম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হইবার বৎসরেই—অর্থাৎ ১৯৫২-৫৩ সালে ভারত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকায় শস্যোৎপাদন স্বাভাবিকই হয় এবং পর বৎসর ১৯৫৩-৫৪ সালে উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্যের উৎপাদনের এরূপ বৃদ্ধি ঘটে যে, ইহা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দিষ্ট অংককে ৭১ লক্ষ টনের মত ছাড়াইয়া যায়। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা; কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই ১·৪৭ কোটি টন অধিক বা নির্দিষ্ট অংকের ৭১ লক্ষ টন বেশী খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন হইয়াছিল ৬·৭৮ কোটি টনের মত। ১৯৫৩-৫৪ সাল খাদ্যশস্য উৎপাদনে আবার সর্বোচ্চ

১৯৫৩-৫৪ সালে আশাতীত শস্যোৎ-পাদন বৃদ্ধি

খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড

* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন (State and Agricultural Re-construction) সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

** Second Five Year Plan--৫১-৫২ পৃষ্ঠা।

† " " " " ২৫৫ পৃষ্ঠা।

দৃষ্টান্ত বা রেকর্ডের সৃষ্টি করিয়াছে—এত অধিক খাদ্যশস্য ভারতীয় ইউনিয়নে আর কখনও উৎপন্ন হয় নাই।

খাদ্যশস্যের মধ্যে উৎপাদন-বৃদ্ধিতে চাউল আর সকলকে ছাড়াইয়া যায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ২.২৫ কোটি টনের মত ধান্য উৎপন্ন হয়; ১৯৫৩-৫৪ সালে এই অংক গিয়া দাঁড়ায় প্রায় ২.৭৮ কোটি টনে। ধান্যের এই অভাবনীয় উৎপাদনবৃদ্ধির কারণ প্রধানত দুইটি: ধান্য উৎপাদনে অধিকতর কৃষি-জমি নিয়োগ, এবং জাপানী পদ্ধতিতে ধান্যের চাষ। অবশ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে মুক্তির কথাও এই প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধান্যের সর্বাধিক উৎপাদন

খাদ্যশস্যের উৎপাদন এইরূপভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহির হইতে খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ কমিয়া যায়। ১৯৫৪ সালে মাত্র ৫ লক্ষ টনের কিছু উপর খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়; এবং ইহা করা হয় সঞ্চয় বা রিজার্ভ করিবার জন্য—ঘাটতি মিটাইবার জন্য নহে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসরে আমদানি করা হইয়াছিল প্রায় ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ১৬ লক্ষ টনের মত চাউল উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহার মধ্যে অন্তত ২.৫ লক্ষ টনের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে কারণ ইহা ছিল ২-৩ বৎসরের পুরাতন চাউল এবং ইহা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহার পূর্বেই অবশ্য সরু চাউলের রপ্তানি সুরু হইয়া গিয়াছিল।

আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি সুরু

১৯৫২-৫৩ সাল হইতেই খাদ্য পরিস্থিতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় মাদ্রাজ সরকারের পদাংক অনুসরণ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করে এবং ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে খাদ্যশস্য সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের কবল হইতে মুক্ত হয়। ফলে খাদ্য-সমস্যার পরিমাণ ও বণ্টনগত দিকের একপ্রকার সমাধান ঘটে।

ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন পুনরায় কমিয়া গিয়া ৬.৫০ কোটি টনে দাঁড়ায়। তাহা হইলেও ইহা ছিল পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উৎপাদন লক্ষ্য হইতে ৩৪ লক্ষ টন অধিক। সুতরাং পরিমাণগত দিক দিয়া ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে খাদ্য-সমস্যা আর মাথা উঁচু করিতে পারে নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই সমস্যা আবার মাথা উঁচু করিয়াছে বণ্টনগত ও মূল্যের দিক দিয়া। এ-সম্বন্ধে আলোচনা একটু পরেই করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পর্যায় (Second Phase): কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায় হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর্যায়। অর্থ-ব্যবস্থার এই পর্যায়ে মূল শিল্পগুলির (basic industries) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও কৃষিকে মোটেই উপেক্ষা করা হয় নাই; বরং প্রথম পরিকল্পনার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত

দ্বিতীয় পর্যায় বলিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা বুঝায়

হিসাবে কৃষিজ উৎপাদনের গতিশীল কার্যক্রমের দ্বিতীয় দফাকে কার্যকর করিবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্যের দিক দিয়া এই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে ১ কোটি টন উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। ইহা করা হইয়াছিল নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়া : (১) মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (২) নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, (৩) মাথাপিছু খাদ্য ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, (৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের জন্য সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা, এবং (৫) খাদ্য ব্যবহারের উপর জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও বণ্টনগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান মাথাপিছু খাদ্য ব্যবহার—অর্থাৎ ১৭'২ আউন্সের হিসাব ধরিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ৭ কোটি ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছে যে ইতিমধ্যে খাদ্যব্যবহার বাড়িয়া ১৭'২ আউন্স হইতে ১৮'৩ আউন্সে দাঁড়াইবে। সুতরাং মোট খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হইবে ৭'৫০ কোটি টন—১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদন হইতে ১ কোটি টন অধিক।

পরে প্রধানত মূল্যবৃদ্ধির ফলে এই উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে অ-পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করা হয়। এবং উহাকে বাড়াইয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ধার্য করা হয়। ১৯৫৭ সালের খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি অবশ্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ বৎসরের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইবে না। কমিটি অনুমান করে যে ১ কোটি ৩ লক্ষ টনের মত অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়ত' সম্ভব হইবে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে খাদ্যের গুণগত উন্নয়নের কথাও বলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কৃষির উৎপাদনের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার ফলমূল উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় এ-কার্য করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসরের মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন পূর্বের বৎসরের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়।** কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্বের বৎসরের তুলনায় শতকরা ৯'৮ ভাগ কমিয়া যায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন, ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা হয় ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালে আবার উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ঐ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনের মত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।†

যাহা হউক, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির গতি কাম্য বিবেচিত হয় নাই। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের (National Development Council) স্থায়ী

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee, 1957—৬৯ পৃষ্ঠা।

** Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan—৩৯-৪৬ পৃষ্ঠা।

† Report on Currency and Finance, 1958-59.

কমিটি কৃষিজ উৎপাদনের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। এরূপ হইবার একাধিক কারণ রহিয়াছে। সেচসমন্বিত এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় শিথিলতা, ক্ষুদ্র ও মধ্যাকারের পরিকল্পনাসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অভাব, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাধীন অঞ্চলে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করা, উপযুক্ত সংখ্যক বীজ খামারের (seed farms) অভাব প্রভৃতির জন্যই কৃষি-উৎপাদন যথেষ্ট মাত্রায় বাড়ান সম্ভব হয় নাই। অথচ দেশের পক্ষে বৎসরের পর বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া চলা সমীচীন নয়। সুতরাং উপরি-উক্ত ত্রুটিসমূহ দূর করিয়া কৃষি-উৎপাদনকে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি এবং মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলও অনুরূপ উক্তি করিয়াছে।*

খাদ্য-সমস্যা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Food Problem and Economic Planning): অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের যোগান-বৃদ্ধির গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে যে সকল লোকদের নিয়োগ করা হইবে তাহাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্য বিশেষত খাদ্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে পরিকল্পনার কার্যাদি ব্যাহত হইতে বাধ্য। বিশেষত আমাদের দেশে ছদ্মবেকারীর সংখ্যা অনেক। ইহাদের জমি হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নকার্যে নিয়োগ করিতে হইলে খাদ্যযোগানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে বেশীর ভাগ লোক অর্ধভুক্ত, সুতরাং উন্নয়নমূলক কার্যাদিতে নিয়োগের ফলে যখন সাধারণ লোকের হাতে টাকাপয়সা যাইবে তখন খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এই চাহিদা পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ব্যাপক আকারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা টানিয়া আনিবে। আবার ভারতের মত দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারও অধিক এবং উন্নয়নমূলক কার্য প্রসারের সংগে সংগে এই বৃদ্ধির হার আরও অধিক হইবে। সুতরাং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্যও খাদ্যযোগানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।† ইহা ছাড়া ভারতের ন্যায় দেশে মূলধনের সংগতি খুব সামান্য। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্য আমদানি করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশে যদি খাদ্যাভাব থাকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করা ছাড়া উপায় থাকে না। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যায়; মূলধন-দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা সম্ভব হয় না। পূর্বোক্ত

উন্নয়নমূলক পরি-কল্পনায় খাদ্যের গুরুত্ব

---

* Report of the Foodgrains Enquiry Committee—১০৫-১১৮ পৃষ্ঠা এবং India's food crisis and steps to meet it.

† The Economics of Industrialisation—B. Datta.

মার্কিন বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্যই জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুত, ইহাই পরিকল্পনার সফলতার প্রাথমিক সর্ত।

খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক (Recent Aspect of Food Problem)ঃ খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিক বলিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনায় খাদ্যশস্যের অকল্পিত মূল্যবৃদ্ধিকেই বুঝায়। পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা শ্রী ই. পি. মুনের (E. P. Moon) ভাষায় বলা যায়, 'দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের ৬ মাসের মধ্যেই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পরিকল্পনার অনিশ্চয়তার অন্যতম সূচক।' ১৯৫৫ সালের জুন মাস হইতে যে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় তাহা ১৯৫৬-৫৭ সালে অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কতকটা স্থির থাকিলেও ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় শতকরা ১১.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালের মে মাস হইতে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা বর্ধিত হারে দেখা দিয়াছে বলা যায়।

সাম্প্রতিক দিক বলিতে কি বুঝায়

খাদ্যশস্যের এই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিরই একটা দিক। তবে পৃথক্‌ভাবে ইহার কারণসমূহকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারেঃ

মূল্যবৃদ্ধির কারণ

১। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় ১৯৫৪ ৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমিয়া যায়। ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ১৯৫৭-৫৮ সালে আবার ৫০ লক্ষ টনের মত হ্রাস পায়।*

২। পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য লোকের আর্থিক আয়ের বেশ কিছুটা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে; ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত আয়বৃদ্ধির ফলে লোকের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস কতকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহারা পূর্বে জোয়ার বাজরা মিষ্টি আলু প্রভৃতি খাইত তাহারা এখন চাউল ও গমের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

৩। ১৯৫৪ সালে খাদ্য বিনিয়ন্ত্রণ করার পর হইতে লোকের মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণও বাড়িয়া ১৪ আউন্স হইতে ১৭.২ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪। ব্যবসায়ী মহলের একাংশে ধারণা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং নিযুক্ত শ্রমিকের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না এবং মূল্যবৃদ্ধি হইতেই থাকিবে। ফলে ইহারা মাল মজুত করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে; অবস্থাপন্ন কৃষকরাও খাদ্যশস্য মজুত করিতে সুরু করিয়াছে।

৫। পরিবহনের অ-ব্যবস্থার জন্য অনেক স্থলে আঞ্চলিক বণ্টনেও বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়াছে।

৬। সরকারের ঘাটতি ব্যয় ও ব্যাংক কর্তৃক ঋণদানের পরিমাণের বৃদ্ধিও মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

---

* Report on Currency and Finance, 1958-59

খাদ্যশস্যের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির সূচনাতেই সরকার ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। প্রথমত, খাদ্যশস্যের যে রপ্তানিকার্য ১৯৫৪ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

অবলম্বিত প্রতিবিধান

দ্বিতীয়ত, খাদ্য পুনরায় আমদানি করা সুরু হয়। ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল—এই ৪ বৎসরের মধ্যে ৮৯ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়।

তৃতীয়ত, বণ্টনগত ত্রুটি দূরিকরণের ব্যবস্থাও যথাসম্ভব অবলম্বন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ (procurement) এবং বাজার হইতে খাদ্যশস্যের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যশস্য সংগ্রহকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার জন্য এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই ধান্য ও চাউলের উচ্চতম দাম বাঁধিয়া দিয়াছে।

চতুর্থত, আঞ্চলিক ঘাটতি দূরিকরণের জন্য সম্প্রতি খাদ্য-জোনের (Food Zone) সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবংগ ও উড়িষ্যাকে মিলাইয়া একটি খাদ্য-জোনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার ফলে উদ্বৃত্ত অঞ্চল উড়িষ্যা হইতে ঘাটতি অঞ্চল পশ্চিমবংগে খাদ্যশস্য সহজে আসিতে পারিবে। অপরদিকে কয়েক ক্ষেত্রে আবার ঘাটতি প্রতিরোধ করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ধান্য ও গমের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে।

পঞ্চমত, খাদ্যদ্রব্যের অপচয়মূলক ভোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছে। যেমন, ১৯৫৮ সালের পশ্চিমবংগে অতিথি নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ (West Bengal Guests Control Order, 1958) অনুসারে বিবাহ বা শ্রাদ্ধে ১০০ জনের অধিক লোককে চাউল ও গম জাত খাদ্য পরিবেশন করা যায় না। অন্যান্য উৎসবের বেলায় নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ৫০ জনের বেশী হইতে পারে না।

ষষ্ঠত, রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত সরকারী নীতিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হইতেছে। ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে (Banking Companies Act) রিজার্ভ ব্যাংককে নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ (selective and direct credit control) করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংক খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

সপ্তমত, যাহাতে মূল্য নিয়ন্ত্রিত এবং মালমজুত বন্ধ হয় তাহার জন্য উপযুক্ত আইন প্রয়োগ করা হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী আইন (Essential Commodities Act) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আইনে নির্দিষ্ট মূল্যে সরকার মজুত খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ধান্য ও চাউল, ডাইল এবং কয়েকটি নিকৃষ্ট খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আগাম ও চুক্তির কারবার (forward and specific delivery contract) বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমদানিকৃত

খাদ্যশস্য যাহাতে অধিক মূল্যে বিক্রয় না হয় তাহার জন্য সরকার আর একটি নির্দেশ জারি করিয়াছে। এই নির্দেশ অনুসারে মাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীরাই আমদানিকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে পারে।

অষ্টমত, দীর্ঘকালীন নীতি হিসাবে সরকার ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে উহা ঘোষণা করে। পরিকল্পনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি : (ক) যাহাতে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের দিক দিয়াই ন্যায্য বিবেচিত হয় এরূপভাবে খাদ্যশস্যের দাম নির্ধারণ করা ও বজায় রাখা, এবং (খ) যাহাতে ভোক্তা-প্রদত্ত মূল্যের সর্বাধিক অংশ উৎপাদকের হস্তগত হয় তাহা দেখা—অর্থাৎ মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের মুনাফার বিলোপসাধন করা। প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চাউল এবং গম লইয়াই সুরু করা হইবে এবং এই বাণিজ্যে সরকার মুনাফা করিবে না, ক্ষতিও স্বীকার করিবে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বপ্রথম উড়িষ্যাই ধান্য ও চাউল লইয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সুরু করে। বর্তমানে অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যও এ-বিষয়ে উড়িষ্যার অনুবর্তী হইতে চলিয়াছে।*

পরিশেষে, খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে সরকার অধিক নজর দিতেছে। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ছোট ও মধ্যাকারের সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির পুনরুদ্ধার, উন্নত-ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ, বীজ-খামারের (seed farms) প্রসার ও জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কৃষি-উৎপাদনাভিমুখী করিয়া তোলা হইতেছে।** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তিত লক্ষ্য ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee) : দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনা হইতেই খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণানুসন্ধান ও ইহার প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়। শ্রীযুক্ত অশোক মেটা এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বলিয়া ইহা অশোক মেটা কমিটি নামেও পরিচিত। কমিটির রিপোর্ট ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

রিপোর্টে কমিটি প্রথম পরিকল্পনার সূচনা হইতে খাদ্য পরিস্থিতি (food situation) এবং সরকারী খাদ্যনীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় (১৯৫০-৫১) ভারত খাদ্য-সমস্যায় প্রপীড়িত ছিল এবং তখন

* Report on Currency and Finance, 1958-59.

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan—৪১-৪৬ পৃষ্ঠা।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ছিল অত্যধিক। পরবর্তী দুই বৎসরে সরকারী মজুত খাদ্য বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া, অধিক উৎপাদন এবং টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়া একরূপ স্থিতিশীল হয়। তারপর ১৯৫৩-৫৪ সালে অভূতপূর্ব শস্যোৎপাদন খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে মন্দাবাজারের (depression) সূচনা করে। মন্দাবাজারের প্রতিরোধকল্পে সরকার চাউল রপ্তানি প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে সাধারণের এই ধারণাই হয় যে খাদ্যশস্যের মূল্য আর হ্রাস পাইবে না।

খাদ্য-পরিস্থিতির পর্যালোচনা

তারপর কিন্তু ১৯৫৬ সালের শেষ দিক হইতে একটি সংবাদ প্রচারের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য আবার উর্ধ্বমুখী হইতে থাকে। সংবাদটি হইল জোয়ার, বাজরা (millets) প্রভৃতির উৎপাদনহ্রাস। সরকার এই সকল শস্য মজুত করে নাই এবং মজুত গমের পরিমাণ বিশেষ অল্প—লোকের এই ধারণা থাকায় খাদ্যশস্যের মূল্য আরও বাড়িয়া যায়; এবং এই উর্ধ্বমুখী গতি সারা ১৯৫৬ সাল ধরিয়াই অব্যাহত থাকে। ১৯৫৬-৫৭ সালে শস্যের উৎপাদন আবার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই গতি রুদ্ধ হয় নাই। কমিটির মতে, ইহা চাহিদার শক্তিই (strength of the demand factors) নির্দেশ করে। ইহার পর কমিটি উক্তি করিয়াছে যে খাদ্যশস্যের মূল্যের অনিশ্চয়তা কৃষকের আয়, জীবনযাত্রার ব্যয়, উৎপাদন-ব্যয়, নিয়োগ প্রভৃতি সকল বিষয়েই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে বলিয়া ইহাকে অন্যতম গুরুতর অর্থ নৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

চাহিদার শক্তি বৃদ্ধিই বর্তমান সংকটের কারণ

বণ্টন-ব্যবস্থা ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সরকারী খাদ্যনীতির অনির্দিষ্টতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯৫১-৫৭ সালের মধ্যে খাদ্য বণ্টন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণে যাইয়া আবার আংশিক নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়া আসে। উৎপাদন কার্যক্রমের সম্পর্কে 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' হইতে সুরু করিয়া খাদ্য উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ইতিহাস আলোচনা করিয়া কমিটি বলে যে ভারতের ন্যায় অর্ধভুক্ত জনগণের দেশে আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার আদর্শ 'চলমান লক্ষ্য' (moving target) হইতে বাধ্য—কারণ জনসাধারণের আয় সামান্য বাড়িলেই ভোগের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় সত্য; কিন্তু ঐ পরিকল্পনায় প্রথমে খাদ্য উৎপাদনের উপর দৃষ্টি দিয়া পরে সমাজোন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রসমূহেও ১৯৫৪ সালের পর (বিনিয়ন্ত্রণের পর) কৃষিজ উৎপাদনের পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ের উপর অধিক লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল। ফলে প্রথম পরিকল্পনায় যত অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে পারিত ততটা সম্ভব হয় নাই। ইহার ফলেই খাদ্য পরিস্থিতি এতটা সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারী নীতির ত্রুটি

চলমান লক্ষ্য

তবু কমিটির অনুসরণে, বলা যায় এই খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মূল্য বৃদ্ধিরই একটা দিক। এই সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে প্রধানত ঘাটতি বাজেট পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

বৃদ্ধির দরুন। সাধারণের আয় নিয়মিত বাড়ার ফলে খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ও খাদ্য-স্বভাব (food habits) উভয়ই পরিবর্তিত হইয়াছে। অর্ধভুক্ত জনগণ অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, এবং যাহারা পূর্বে জোয়ার বাজরা প্রভৃতি খাইত তাহারা চাউল ও আটার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহার উপর মজুত রাখিবার ইচ্ছাও (propensity of stock) বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু যে ব্যবসায়ীরা মজুত করিতেছে তাহা নহে, সাধারণ কৃষকও মজুতের দিকে অধিক দৃষ্টি দিয়াছে। ফলে অ-কৃষিজীবী জনসাধারণের পক্ষে খাদ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে।

খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিরই একটি দিক

কমিটির পরবর্তী বক্তব্য হইল যে, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে খাদ্য-সমস্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন—কারণ যে-যে বিষয়ের উপর এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভর করে–যথা, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, পরিকল্পনার ব্যয়, ভোগের ইচ্ছা, মজুত রাখিবার ইচ্ছা ইত্যাদি—তাহারা অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল। তবে কমিটি ধরিয়া লইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন খাদ্যের চাহিদা শতকরা ১০ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে। ইহার উপর আয়বৃদ্ধির জন্য শতকরা ৪.৫ ভাগ চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মোট বর্ধিত চাহিদার পরিমাণ শতকরা ১৪-১৫ ভাগ। এই হিসাব ধরিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়

কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে উৎপাদন ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টনের মত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। সুতরাং ১৫ লক্ষ টন ঘাটতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ঘাটতি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হইবে।

অতএব পরিমাণগত দিক দিয়া খাদ্য-সমস্যা আশংকাজনক নহে; কিন্তু মূল্যের দিক দিয়া নিশ্চয়ই আশংকাজনক। খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন না করিলে সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। স্থায়িত্ব আনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কমিটি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং অবাধ বাণিজ্যের মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিষিদ্ধকরণ না হইয়া নিয়মিতকরণ হইবে (Controls should be of regulatory rather than of restrictive type)।

মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

এই নিয়মিতকরণ ধরনের নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলা বাজারে নিয়মিত খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয়, পাইকারী ব্যবসাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে খুচরা ক্রয়-বিক্রয়, উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও গম মজুত রাখা, প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্য গ্রহণের জন্য প্রচারকার্য চালাইয়া যাওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেই চলিবে। প্রয়োজনবোধে অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও পন্থা

খাদ্যশস্যের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে ভোক্তা (consumers) এবং উৎপাদক কাহারও অসুবিধা বা স্বার্থহানি না হয়। উপরন্তু, সাধারণ মূল্য নিয়ন্ত্রিত না করিয়া খাদ্যমূল্য দমিত রাখা যাইবে না। এই দুই কারণে প্রয়োজন হইল এমন একটি সংগঠনের যাহা বিভিন্ন সময়ে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

কমিটির মতে, এইরূপ সংগঠন দুই অংশে বিভক্ত হইবে—(১) একটি মূল্য স্থিতিকরণ বোর্ড (a Price Stabilisation Board), এবং (২) একটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন (a Foodgrains Stabilisation Organisation। ইহার মধ্যে প্রথমটি সাধারণ মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের জন্য নীতি নির্ধারণ করিবে; এবং দ্বিতীয়টি এইভাবে নির্ধারিত নীতির যে-অংশ খাদ্যশস্যের মূল্যের সহিত সম্পর্কিত তাহাকে কার্যকর করিবে। এই দুইটি সংগঠনের প্রত্যেকটির সহিত বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি করিয়া উপদেষ্টা পরিষদও সংযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

দুইটি সংগঠন স্থাপন প্রয়োজন

খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন হইবে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে সর্বপ্রধান কার্যকরী সংস্থা। দেশের সর্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা ও গুদামঘর থাকিবে; এবং একমাত্র ইহার নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরাই খাদ্যশস্যের কারবার করিতে পারিবে। সংগঠনের প্রধান কার্য হইবে আশংকা দূরিকরণমূলক কারবার করা (buffer stock operations) —অর্থাৎ মূল্যহ্রাসের সময় ক্রয় করা এবং মূল্যবৃদ্ধির সময় বিক্রয় করা। ইহা ছাড়াও সংগঠনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রাখিতে হইবে। সংগঠন খাদ্যশস্য ক্রয় ও মজুত রাখার ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করিলে আবশ্যিকভাবে কৃষকগণের নিকট হইতে উচিত মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ (procurement) করিতে হইবে।

নিয়ন্ত্রণের স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি বলিয়াছে যে খাদ্য বণ্টন প্রধানত ন্যায্য মূল্যের দোকানে (fair price shops), সমবায় বিক্রয়-কেন্দ্র প্রভৃতির মাধ্যমে করিতে হইবে। বর্তমানে মাথাপিছু ১২ আউন্স করিয়া গম সরবরাহ করা গেলেও বিশেষ ঘাটতির জন্য চাউল সরবরাহ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। চাউল দক্ষিণ ভারতে মাথাপিছু ৮ আউন্স করিয়া, পূর্ব ভারতে ৬ আউন্স করিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে ৪ আউন্স করিয়া সরবরাহ করা হইবে। ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে বিনা মুনাফায় বিক্রয় করিতে হইবে; এবং বিশেষ কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম দামে (at subsidised prices) খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে হইবে। উৎপাদন বিশেষ হ্রাস পাইলে বা আমদানির পরিমাণ কমিয়া গেলে বড় বড় শহরকে গণ্ডি দিয়া এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে এইসকল শহরের চাহিদা অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি না করে।

স্বল্পকালীন ব্যবস্থা

উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে যাহাতে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ না হয় তাহার জন্য 'খাদ্য-জোনে'র সৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ জোন সৃষ্ট হইলে সরকারের পক্ষে শুধু ঘাটতি অঞ্চলকে সরবরাহ করিলেই চলিবে; সমগ্র দেশকে সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে না।

স্থানীয় সাহায্যেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সর্বদা স্থানীয় ঘাটতিকে (local deficits) খুঁজিয়া বাহির করিয়া সত্বর প্রতিবিধান অবলম্বন করিবে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে গ্রাম-পঞ্চায়েৎ সমবায় সমিতিসমূহকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে শস্যগোলা স্থাপন করিবার জন্য অর্থসাহায্য করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় স্থলেই খাদ্য পরিচালনা (food administration) স্থায়ী ভিত্তিতে করিতে হইবে।

স্থানীয় ঘাটতি

কমিটির মতে, কতকগুলি অঞ্চল—যথা, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ই ঘাটতি-অঞ্চল থাকিবে কারণ এই সকল অঞ্চলে নিয়োগের অত্যল্পতার জন্য লোকের ক্রয়শক্তি কম। সুতরাং ইহাদের ক্ষেত্রে প্রধানত ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের দ্বারা নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

ঘাটতি অঞ্চল

পরিশেষে আছে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির কথা। ছোট খাট জলসেচ-ব্যবস্থা, অধিক বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি-সংস্কারকে ত্বরান্বিত করা প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। কিন্তু ইহাই পর্যাপ্ত নয়; সংগে সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সকলই বিফল হইবে।

উৎপাদনবৃদ্ধি অপরিহার্য

কমিটি আঞ্চলিক ও দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সকলকে খাদ্য-সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্বান জানাইয়াছে।

মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট (Report of the American Team of Agricultural Specialists): ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একদল মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞকে এদেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। ঐ কৃষি বিশেষজ্ঞ দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া এবং ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করে।

রিপোর্টে কৃষি বিশেষজ্ঞ দল প্রথমেই বর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির হার যে তাল রাখিতে পারিতেছে না তাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, পর্যাপ্ত খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা সমাজ-কল্যাণ ও গণতন্ত্রের আদর্শ কোনটাই সফল হইবে না।

খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির গুরুত্ব

রিপোর্টটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; দ্বিতীয় অংশে কি কি অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার কথা বলা হইয়াছে; এবং অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহের বিশদ বর্ণনা রিপোর্টের তৃতীয় অংশে করা হইয়াছে। নিম্নে রিপোর্টটির সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইল।

রিপোর্টটির তিন অংশ

কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, ভারতের জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উহা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বা ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪৮ কোটিতে পৌঁছিবে বলিয়া মনে হয়। স্বভাবতই খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তাও বর্তমান (১৯৫৮-৫৯ সাল) ৭ কোটি টন হইতে ঐ সময়ে ১১ কোটি টনে গিয়া দাঁড়াইবে অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য ১১ কোটি টনের সমস্তটাই ভোগের (consumption) জন্য প্রয়োজন হইবে না। মাথাপিছু ১৮ আউন্সের ভিত্তিতে ভোগের জন্য প্রয়োজন হইবে ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন এবং বাকী ২ কোটি ২০ লক্ষ টন প্রয়োজন হইবে বীজ, মজুত রাখা ইত্যাদির জন্য। মোটকথা, কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে যে-হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৮ কোটি ২০ লক্ষ টনের অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। অতএব, বর্তমান বাৎসরিক উৎপাদনবৃদ্ধির হার শতকরা ৩·২কে শতকরা ৮·২-এ লইয়া যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ দলের মতে, সুচিন্তিত খাদ্যোৎপাদন কার্যক্রমের অনুসরণ দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌঁছান মোটেই অসম্ভব নহে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তা

উৎপাদনবৃদ্ধির হার কি হওয়া উচিত

তারপর বিশেষজ্ঞ দল যে যে বিষয় ভারতে খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত করিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ও জলসংরক্ষণের অ-পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, বহুসংখ্যক অকর্মণ্য গো-মহিষ, কৃষিকার্যের আদিম পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি, পোকামাকড়ের উৎপাত, অসম্বদ্ধ জোত, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, অপ্রচুর ও দুর্মূল্য কৃষি-ঋণ, কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব এবং বিভিন্ন খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনার মধ্যে সংহতির অনুপস্থিতি-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞ দলের মতে, এই সকল প্রতিবন্ধকের সবগুলিই অপসারণযোগ্য।

উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক

প্রতিবন্ধকগুলি অপসারণ করার সংগে সংগে খাদ্যোৎপাদনের যে-সকল উপকরণ রহিয়াছে তাহাদেরও পর্যাপ্ত ব্যবহার করিতে হইবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে বিপুলসংখ্যক বেকার ও অর্ধ-বেকার রহিয়াছে তাহা উৎপাদন-সম্ভাবনার একটা বিরাট অংশের অপচয়ই নির্দেশ করে। এইরূপ অপচয় বন্ধ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় যে ৮ কোটির মত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিবে তাহার মধ্যে ৪½ কোটি হইবে গ্রামাঞ্চলে। সুতরাং ইহাদের কর্মসংস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের বাঁধ দেওয়া, জমি সমান করা, জল নিষ্কাশন, জলসেচ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ইহা যে শুধু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন-বৃদ্ধিতেই সহায়তা করিবে তাহা নহে, ইহাতে নিম্ন আয়বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের আয়বৃদ্ধিও ঘটিবে। উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া এইরূপ নিয়োগের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না।

উপকরণের পর্যাপ্ত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

কর্মসংস্থান ও খাদ্যোৎপাদন

বিশেষজ্ঞ দলের পরবর্তী সুপারিশ হইল যে বীজ সার ইত্যাদি সরবরাহ, ঋণদান, জলসেচ প্রভৃতি কার্যের সংহতিসাধনের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব (a high level centralised authority) থাকা প্রয়োজন। এই কর্তৃত্বের উপর খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব অর্পিত হইবে।

উচ্চপর্যায়ী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব

তারপর কৃষি বিশেষজ্ঞ দল খাদ্যশস্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কৃষককে উন্নততর বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহারে উৎসাহিত করিবার জন্যই সরকার হইতে খাদ্যশস্যের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। শুধু নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিলেই চলিবে না, কৃষক যাহাতে ঐ মূল্যে নিকটবর্তী বাজারে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বিক্রয় না করিয়া সে যদি দামবৃদ্ধির আশায় শস্য মজুত রাখিতে চায় তাহার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক শস্যগোলাও গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করিতে হইবে। দলটির মতে, খাদ্যশস্যের দাম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও উহাকে কার্যকর করার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা (a permanent agency) গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

মূল্য স্থায়িত্বকরণ

ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার স্থায়িত্ব, ন্যায্য খাজনা-ব্যবস্থা, অসম্বদ্ধ জোতের সংহতিসাধন ইত্যাদি খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলিয়া কৃষি বিশেষজ্ঞ দল জোতের ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling fixation) এবং অন্যান্য ভূমি-সংস্কার কার্য অতি দ্রুত শেষ করিতে সুপারিশ করিয়াছে।

অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবস্থা

কৃষি-ঋণের অপ্রাচুর্যহেতু খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ দল প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিকে রাজ্য সরকার হইতে ঋণদানের পরামর্শ দিয়াছে। দলটি ইহাও বলিয়াছে যে কৃষকের ঋণগ্রহণযোগ্যতার (credit worthiness) নূতন সংজ্ঞা দেওয়া উচিত—ঋণগ্রহণযোগ্যতার বিচার জমির মালিকানার ভিত্তিতে না করিয়া ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, অনুমিত উৎপাদন ইত্যাদির ভিত্তিতেই করা উচিত।

কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, বর্তমানে খাদ্যোৎপাদনের উপর সম্প্রসারণ কার্যের (extension work) কোন প্রত্যক্ষ ফল পরিলক্ষিত হইতেছে না। এইজন্য দলটি সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলি ও অন্যান্য স্থানে সম্প্রসারণকার্যের উপর অধিক গুরুত্ব স্থাপন করিতে নির্দেশ দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে খদ্যোৎপাদন কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

পরিশেষে আছে উন্নততর বীজ ও সার উৎপাদন ও বণ্টনের কথা, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ও সুপরিচালনার নির্দেশ এবং মিশ্র কৃষিকার্য (mixed farming), কৃষিকার্যের পদ্ধতির পরিবর্তন, অকর্মণ্য গো-মহিষাদির সংখ্যাহ্রাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ। দলটির মতে, বৃহৎ বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা অপেক্ষা জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার দ্বারাই বর্তমানে খাদ্যোৎপাদন

জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার

অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সার সম্বন্ধে দলটি বলিয়াছে যে বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির যথাসম্ভব যেন সার আমদানিতেই ব্যয়িত হয়।

রিপোর্টটির উপসংহার

রিপোর্টটির এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুসরণের জন্য সর্ব-ব্যবস্থা সমন্বিত কোন প্রস্তাব করা যাইতে পারে না। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে আরও নূতন ব্যবস্থার কথা উঠিবে। তবে বর্তমানে নির্বাচনমূলক এবং আত্যন্তিক (selective and intensive) কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ধান্য ও গম প্রধান খাদ্যশস্য বলিয়া কতকগুলি নির্বাচিত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহাদিগের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমানে খাদ্যোৎপাদনের যে-কার্যক্রম অনুসরণ করা হইতেছে তাহার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিবার পূর্বে উহার ফলাফল বিচার করিবার জন্য কতকগুলি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র (experimental projects) স্থাপন করিতে হইবে। ইহা না করিলে খাদ্য-সংকট দূরীভূত না হইয়া চরম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

উপসংহার : ভারতের খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি যে অস্থায়ী নয়, একবার অনুমিত কৃষিজ উৎপাদন ঘটিলেই যে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হয় না—ইহাই খাদ্য অনুসন্ধানকারী কমিটি ও মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। সুতরাং খাদ্যোৎপাদনের চলমান লক্ষ্য (moving target) নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই চলমান লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইবে ভোগ ও মজুত রাখার প্রয়োজনীয়তা উভয়ের ভিত্তিতে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত না রাখিতে পারিলে ভারতকে সর্বদাই খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন থাকিতে হইবে—কারণ কৃষিজ উৎপাদন প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহার হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূল্য স্থিতিকরণ যে অপরিহার্য তাহা উভয় দলই ঘোষণা করিয়াছে। মূল্যে স্থায়িত্ব না আসিলে শুধু যে জনসাধারণ প্রপীড়িত হইবে তাহা নহে, কৃষকও উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে না। এই মূল্য স্থায়িত্বকরণের উদ্দেশ্যেই খাদ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হইল খাদ্যশস্যের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাহাতে ভোক্তা বা উৎপাদক কাহারও অসুবিধা বা স্বার্থহানি না হয়। মূল্য স্থায়িত্বকরণ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করিবার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থাও যে প্রয়োজনীয় তাহাও সরকার স্বীকার করিয়াছে ; এবং ঘোষণা করিয়াছে যে ১৯৬০ সালের প্রথম ভাগেই ইহা গঠন করা হইবে। উভয় রিপোর্টের অন্যান্য সুপারিশের কোন্‌টি কি পরিমাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহা জানা যাইবে তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে। তবে এ-কথা ঠিক যে ঐ পরিকল্পনায় চলমান লক্ষ্যের ভিত্তিতে খাদ্যোৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে—নচেৎ খাদ্য-সংকটের জন্যই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature of Food Problem in India. (২০৬-২০৯ পৃষ্ঠা)

2. Indicate the nature of our Food Problem in relation to the growth of population. (৭৪ এবং ২০৯-২১২)

3. Review the measures that have been adopted to tackle the Food Problem.

[ইংগিত : সামগ্রিকভাবে খাদ্য-সমস্যার সমাধান বলিতে খাদ্য-সমস্যার সাম্প্রতিক দিককেও বুঝায়। সুতরাং উহার প্রতিবিধানকল্পে যে-যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে।.........২১২-২২৪ পৃষ্ঠা]

4. What is dynamic programme of Agricultural Production? Indicate its aims and achievements. (২১৭-২২১ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the recent aspect of our Food Problem. Review the measures that have been adopted to deal with it. (২২২-২২৪ পৃষ্ঠা)

6. Discuss in brief the recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee, 1957. (২২৪-২২৮ পৃষ্ঠা)

7. Briefly discuss the Report on India's food crisis by the American Team of Agricultural Specialists. (২২৮-২৩১ পৃষ্ঠা)

8. Examine the importance of increasing the production of Foodgrains in a developing country like India. (C. U. B. Com. 1958)

[ইংগিত : ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির গুরুত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। অপরিহার্য ভোগ্যপণ্যের মধ্যে খাদ্যশস্য প্রধানতম। পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া উন্নয়নমূলক কার্যে বিনিয়োগ করিয়া গেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়া সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল করিয়া দিতে পারে। উপরন্তু, দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতিকে যথাসম্ভব উন্নয়নমূলক কার্যে নিয়োগ করিবার জন্যও খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি ও মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল এই কথাই বলিয়াছে। ২২১-২২২, ২২৪-২৩১ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভূমি-সংস্কার

(Land Reforms)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল, কৃষি-জমি ও কৃষির মালিকানাই বোধ হয় জাতীয় উন্নয়নের সর্বপ্রধান সমস্যা। যেভাবে কৃষি-জমি সম্পর্কিত এই সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহার উপরই ভবিষ্যতের আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, ভূমি-সংস্কারের সহিত সম্পর্কিত ব্যবস্থাসমূহের গুরুত্বগুলি অত্যধিক—কারণ প্রথমত, ইহারা কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিষ্ঠানগত পটভূমিকার সৃষ্টি করে; এবং দ্বিতীয়ত, ইহারা বহু পরিমাণে সংখ্যাধিক জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।†

কৃষি-জমির মালিকানা সম্পর্কিত এই সমস্যার উদ্ভব হয় ব্রিটিশ আমলে বিশেষ ধরনের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার জন্য। বস্তুত, যেদিন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিল একরূপ সেইদিন হইতেই কৃষি-জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যার সূত্রপাত হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পূর্বে—অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান যুগে ভূমিকে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের (village committee) সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। ঐ সময় নৃপতি যে ভূমি হইতে আয়ের একাংশ পাইতেন তাহা ছিল সম্পূর্ণ প্রথাগত। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজ্য রক্ষার জন্যই ইহা তাঁহাকে প্রদান করা হইত।

এই ব্যবস্থার পরিবর্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাশ্চাত্য নীতি যে রাষ্ট্রই সকল প্রকার জমির মালিক, এই নীতি প্রবর্তন করে এবং দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা অনুসারে জটিল ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে যে ভূমি-সংস্কার কার্য চলিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য এই ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার প্রকৃতি ও উদ্ভবের ইতিহাসের সামান্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা ও তাহাদের উদ্ভব (Different Systems of Land Tenure and their Origin) : মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে বংগদেশে যাহারা কর-প্রজা (tax farmers) এবং রাজস্ব-সংগ্রহকারী কর্মচারী ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে তাহারা ভূমির উপর মালিকানা দাবি করিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাত্র শাসনকার্যের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া

---

* First Five Year Plan—১৮৪ পৃষ্ঠা

† Second Five Year Plan—১৭৭ পৃষ্ঠা

কোম্পানী এই সকল ব্যক্তিকে জমিদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল এবং উহাদের সহিত চিরস্থায়ীভাবে দেয় রাজস্বের বন্দোবস্ত করিল। এই সময় ভূমির উপর জনসংখ্যার কোন বিশেষ চাপ পড়ে নাই এবং নির্ভরযোগ্য রাজস্ব-প্রদানকারী কৃষি-প্রজার সংখ্যা ছিল অত্যল্প। ফলে শান্তি শৃংখলা রক্ষা এবং সহজে রাজস্ব-সংগ্রহের উপায় হিসাবে কোম্পানী এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

ক। জমিদারী ব্যবস্থার উদ্ভব

বংগদেশে চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে ইহাকে বিহার, উড়িষ্যা, বেনারস এবং মাদ্রাজের কিয়দংশে প্রসারিত করা হয়। আগ্রা ও অযোধ্যায় জমির যে যৌথ বা সাম্প্রদায়িক মালিকানার ব্যবস্থা ছিল তাহাই অপরিবর্তিত রাখা হয়। সম্প্রদায় বা 'মহাল' জমির মালিক বলিয়া পরিগণিত থাকায় এইরূপ পদ্ধতিতে 'মহালওয়ারি-ব্যবস্থা' বলা হয়। পরে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা পাঞ্জাবে প্রসারিত হয়। মধ্যপ্রদেশে মালগুজারি নামে এক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। মালগুজাররা ছিল মারাঠাদের আমলে রাজস্ব-সংগ্রহকারী প্রজা (revenue farmers)। মধ্যপ্রদেশে মালগুজারি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় দেখা গেল যে, এই মালগুজারদের অধিকার স্বীকার না করার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে। সুতরাং সমগ্র সম্প্রদায়ের পরিবর্তে মালগুজারদের সহিতই বন্দোবস্ত করা হয়; এবং ফলে কার্যক্ষেত্রে মালগুজারি-ব্যবস্থা জমিদারী ব্যবস্থারই সামিল হইয়া উঠে।

খ। রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার উদ্ভব

গ। মহালওয়ারি-ব্যবস্থার উদ্ভব

ঘ। মালগুজারি-উদ্ভব

এইভাবে উত্তর ও মধ্যভারতের অধিকাংশে জমিদারী ব্যবস্থার এবং দেশের অপর সকল অংশে রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

জমিদারী ব্যবস্থা (The Zamindary System): জমিদারী ব্যবস্থা বা বন্দোবস্তকে সাধারণত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু এইরূপ করিবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। জমিদারী বন্দোবস্ত অস্থায়ীও হইতে পারে। বস্তুত, পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে যখন ভূমি-স্বত্ব সংস্কারের কার্য সুরু হয় তখন মোট জমির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ছিল অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার অধীনে।

স্থায়ী ও অস্থায়ী

জমিদারী ব্যবস্থা সকল সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলেও, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে জমিদারী ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানত জমিদারী ব্যবস্থার পর্যালোচনা করা হয়—কারণ কৃষিজীবীর অধিকাংশ দুঃখদুর্দশা, আর্থিক ও সামাজিক অধোগতি প্রভৃতি ছিল মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (The Permanent Settlement): ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বংগদেশের তৎকালীন কর-প্রজা এবং রাজস্বসংগ্রহকারীদের জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। স্যর রিচার্ড টেম্পলের (Sir Richard Temple) মতে, ইহার ফলে বংগদেশে ব্রিটিশ ভূমি-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জমিদারগণকে কৃষকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত রাজস্বের দশ-একাদশাংশ সরকারকে প্রদান করিতে হইত। বাকী এক-একদশাংক তাঁহারা তাঁহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে ভোগ করিতেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ ক্রমশই বাড়াইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ মোটেই বাড়ে নাই। ফলে ক্রমে বংগদেশে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন 'জমিদার' নামে এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

বংগদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

যে-সকল অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কোনটিই সাধিত হয় নাই বলা চলে। প্রথমত, সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি-রাজস্ব আদায় সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু সরকারের প্রাপ্য ভূমি-রাজস্বের কোনও বৃদ্ধি ঘটে নাই। অপরদিকে কিন্তু সাধারণ কৃষক খাজনার ভারে ক্রমশ প্রপীড়িত হইতে থাকে। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিশ আশা করিয়াছিলেন যে, জমিদারগণ সমাজের স্বাভাবিক নেতৃস্থান অধিকার করিয়া সকল প্রকার সামাজিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিবেন। তাঁহার এই আশা পরিপূর্ণ না করিয়া জমিদারগণ শুধু খাজনা আদায় করিয়াছেন এবং শহরে থাকিয়া বিলাসী জীবনযাপন করিয়াছেন। জমির উন্নতির কোনও বিশেষ চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই, জমি হইতে যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহই ছিল তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে কৃষি ও কৃষিজীবীর অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া উঠিতে থাকে। উপরন্তু, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ছাড়াও অন্যান্য প্রকার মধ্যস্বত্বের উদ্ভব হয়। জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের পূর্বে প্রকৃত চাষী ও জমিদারের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। সমাজ তাহাদের নিকট হইতে কিছুই পাইত না, কিন্তু তাহারা পরভোজীর ন্যায় কৃষকশ্রেণীর স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া থাকিত। ফলে "একদিকে সামন্তপ্রথা (feudal system) এবং অপরদিকে ভূমিদাসের (serfs) অস্তিত্ব বংগদেশের ভূমি-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়।" বংগদেশের সমগ্র সমাজজীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল তাহার বর্ণনা এইভাবে করা হইয়াছে : "জমিদারগণের হস্তে সম্পত্তি সংক্রান্ত অবশিষ্ট অধিকারের সমগ্রটা ন্যস্ত করিয়া সরকার তাহাদের মর্যাদা বাড়াইয়া দেয় এবং তাহাদের আয়ের নিয়মিত বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। অপরদিকে কৃষিজীবিগণের অধিকার দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। প্রথাগত যে-নিরাপত্তা তাহাদের ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া যায় এবং ইহার স্থলে বিচারালয় কর্তৃক একরূপ অলীক রক্ষণাবেক্ষণের এবং ভবিষ্যতে সাহায্যের অস্পষ্ট প্রথা গড়িয়া উঠে। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষিজীবিগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া এবং জমিদারগণের স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া বংগদেশের গ্রাম্য সমাজের ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটায়।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরি-উক্ত কুফলসমূহ যে শুধু বংগদেশের উপরই ফলিয়াছিল তাহা নহে; বিহার, বেনারসের ন্যায় এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলও উহাদের

প্রভাব হইতে বাদ যায় নাই। বিহারে কৃষকদের উপর খাজনার বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক করা হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে বিহারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খাজনার কৃষকই ছিল ভূমি-রাজস্বভারে সর্বাধিক প্রপীড়িত।

অন্যান্য অঞ্চলে

অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা (The Temporary Zamindary System) : উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতির কিয়দংশে অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। মধ্যপ্রদেশের মালগুজারি-ব্যবস্থাও ছিল একরূপ অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার অধীনে মারাঠাদের আমলের কর-প্রজা বা মালগুজারদের জমির অস্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হইত।

মহালওয়ারি-ব্যবস্থা (The Mahalwari System) : মহালওয়ারি-ব্যবস্থা জমিদারী বন্দোবস্ত ও রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিত। মহালওয়ারি-ব্যবস্থার ভিত্তি হইল জমির যৌথ মালিকানা। একটি বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত একটি 'মহাল'-এর সহিত বন্দোবস্ত করা হইত বলিয়া এই ব্যবস্থাকে 'মহালওয়ারি' আখ্যায় অভিহিত করা হইত।

মহালওয়ারি-বন্দোবস্তের প্রকৃতি

আদিতে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা যৌথ ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা থাকিলেও ক্রমশ ইহাতে ব্যক্তিগত ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। প্রত্যেকবার ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের (assessment) সময় যৌথ অপেক্ষা ব্যক্তিগত মালিকানার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র মহালের পরিবর্তে প্রত্যেক রায়তের নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হইতে থাকে। ফলে কার্যক্ষেত্রে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা রায়তওয়ারি-ব্যবস্থারই সামিল হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার রায়তওয়ারি-ব্যবস্থায় পরিণতি

যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কিভাবে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করা যাইতে পারে মহালওয়ারি-ব্যবস্থা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইহাতে অন্যতম সমবায়িক নীতির স্বাভাবিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি স্বীকৃত হওয়ায়, মহালওয়ারি-বন্দোবস্তের অধীনে কৃষি-জোত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেই থাকে। ফলে স্বাভাবিক সমবায়িক নীতি অন্তর্হিত হয় এবং প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় সরাসরি সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকার্যকে নূতন করিয়া সংগঠিত করিবার।

এই ব্যবস্থার গুণাগুণ

রায়তওয়ারি-ব্যবস্থা (The Ryotwari System) : রায়ত ও সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই ছিল রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার অধীনে রাষ্ট্রকে জমির একমাত্র মালিক এবং রায়ত বা কৃষক দখলিকার হিসাবে গণ্য করা হইত। যতদিন পর্যন্ত রায়ত নিয়মিতভাবে ভূমি-রাজস্ব প্রদান করে ততদিন পর্যন্তই সে দখলি-স্বত্ব ভোগ করিত। ভূমি-রাজস্ব

এই ব্যবস্থার প্রকৃতি

উৎপন্ন শস্যের উপর দেয় হিসাবে ধার্য করা হইত। সময়ান্তরে জরিপ করিয়া ধার্য খাজনার হ্রাসবৃদ্ধি করা হইত।

সরকার ও রায়তের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কই রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার প্রধান গুণ। ইহাতে কোন কোন মধ্যবর্তী ভূমিদারের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রায়তগণের জমি-হস্তান্তরের ক্ষমতা ছিল বলিয়া কার্যক্ষেত্রে রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার এই সুফল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল। রায়তের দখলিকৃত জমির উত্তরোত্তর দরপত্তনি (sub-letting) শুধু কৃষি-জোতের খণ্ডিকরণের পথই প্রশস্ত করে নাই, সরকার ও কৃষিজীবিগণের মধ্যে ব্যবধানেরও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ব্যবস্থার অধীনে কৃষক ও কৃষি-জোতের অবস্থা কখনও জমিদারী ব্যবস্থার মত অত মন্দ হইয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়ত, রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ভূমি-রাজস্ব হ্রাসবৃদ্ধি করা হয় বলিয়া ইহাতে কৃষকের আর্থিক অবস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া সরকারের আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

রায়তওয়ারি-ব্যবস্থার গুণঃ

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, ইহাই কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান অপগুণ। তিনি তাঁহার "ভিক্টোরিয়ার যুগে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস"* গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সাধারণত একবার ভূমি-রাজস্বের হ্রাস করা হইলে পরবর্তী সময়ে ইহার এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, রায়ত তাহার ভার বহনই করিতে পারে না। রাজস্ব-নির্ধারণকারী সরকারী কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা অনুসারে রাজস্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় কৃষিগত সম্পদের সঞ্চয় একরূপ অসম্ভবই হইয়া উঠে; এবং ফলে কৃষি-জমির স্থায়ী উন্নয়নও কোন মতে সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, রায়তওয়ারি-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত দখলি-স্বত্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগির প্রসার ঘটাইয়া গ্রামের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক জীবনের উপর বিশেষ আঘাত হানে। ফলে ভারতের প্রাচীন গ্রাম-ব্যবস্থা আর একদিকে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিতে থাকে।"

অপগুণঃ

ভারতের ভূমি-রাজস্বের প্রকৃতি (Nature of Land Revenue in India)ঃ বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার আলোচনার পর ভারতে ভূমি-রাজস্ব কিভাবে নির্ধারিত হইত তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে যে, অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় সাময়িকভাবে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করা হইত। ভূমি-রাজস্বের নির্ধারণের সাধারণ নীতি ছিল নীট আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশকে রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা। সাধারণত জমি হইতে নীট আয় অনুমান করিয়াই লওয়া হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় প্রত্যেক জমিতে এইরূপ নীট আয় অনুমান করিয়াই লওয়া হইয়াছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নীট আয় নির্ধারণ অনুমানের পরিবর্তে পরীক্ষা দ্বারা করা হইত।

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের সাধারণ নীতি

* Economic History of India in the Victorian Age.

নীট আয়ের কত অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে গণ্য হইত? প্রাচীনকালে একমাত্র প্রথাই (custom) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিত। হিন্দু যুগে 'মোট' উৎপন্নের (gross produce) মধ্যে রাজার অংশ ছিল এক-ষষ্ঠমাংশ। মুসলমান যুগে উহা বৃদ্ধি করিয়া মোট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ ধার্য করা হয়।

ক। ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ প্রথার ভূমিকা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান শাসকগণের অনুকরণে প্রথানুযায়ীই ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করিত; কিন্তু ক্রমশ সুযোগ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার নীতি 'প্রতিযোগিতা'রও (competition) প্রবর্তন করে।

খ। প্রতিযোগিতার প্রবর্তন

এখানে পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার এই নীতি বা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য অর্থবিদ্যার নীতি অনুসারে ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা * নির্ধারিত হয় জমি ইজারা বা ভাড়া লইতে ইচ্ছুক এমন প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা। যে-জমির উর্বরতা যত অধিক লোকে সেই জমি চাষ করিতে বেশী আগ্রহান্বিত হয়—কারণ এরূপ জমিতে উৎপাদনের ব্যয়-সংকুলান হইয়া অধিক উদ্বৃত্ত (surplus) থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যদি বিশেষ তীব্র হয় তবে উদ্বৃত্তের সমগ্রটাই ভূম্যধিকারী আদায় করিয়া লইতে পারে।

প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশী শাসনের ফলে কুটির শিল্পের ধ্বংস, এদেশ হইতে কৃষিজ কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষি-জমির জন্য প্রতিযোগিতাকে ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলে। ইহার সুযোগ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিবার বন্দোবস্তের সময় পূর্বাপেক্ষা উচ্চহারে ভূমি-রাজস্ব দাবি করিতে থাকে। বন্দোবস্ত অস্থায়ী থাকার ফলে কোম্পানীর পক্ষে এই প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হইয়াছিল। কোম্পানীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারিগণও প্রতিযোগিতার সুযোগ লইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে খাজনা আদায় করিয়া লইতে থাকে।

খাজনা ও ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে প্রতিযোগিতা এরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও ইহা কখনও ভূমি-রাজস্বের একমাত্র নির্ধারক হইয়া উঠে নাই—কারণ সকল ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রথার প্রভাব কাটাইয়া উঠা কোম্পানীর পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। সুতরাং প্রথার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতার দ্বারা খাজনা নির্ধারণ ভারতের ক্ষেত্রে কখনও ঘটে নাই। উভয় নীতিই পাশাপাশি বা একসংগে কার্য করিতে থাকে।

প্রথা ও প্রতিযোগিতার সহ-অস্তিত্ব

প্রথা হইতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তন (from custom to competition) সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত না হইলেও, প্রতিযোগিতাই ক্রমে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের মুখ্য নীতি

* সাধারণত সরকারের প্রাপ্যকে 'ভূমি-রাজস্ব' (Land Revenue) ও ভূম্যধিকারীর প্রাপ্যকে 'খাজনা' (Rent) বলা হয়।

হইয়া দাঁড়ায়। ফলে কৃষিজীবী ক্রমশ হইয়া উঠে রাজস্ব-ভারে প্রপীড়িত। কুটির শিল্পাদির ধ্বংস এবং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার ক্রমশ ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলে কৃষিজীবীর পক্ষে কৃষিকার্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার উপায়ও থাকে না। ক্রম-বর্ধমান রাজস্ব জোগাইয়া সে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে থাকে।

প্রতিযোগিতার মুখ্য স্থানাধিকার ও ইহার ফল

বিভিন্ন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্ধ শতাব্দীরও পরে সরকার প্রতিযোগিতার দ্বারা ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের এই কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ার যুগ শেষ হইয়াছে এবং সরকার শোষণ হইতে শাসনে কিঞ্চিৎ মন দিয়াছে। সরকার প্রতিযোগিতার কুফল সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে আইন প্রণয়নের দ্বারা। খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সম্ভাব্যক্ষেত্রে পরিমিত করিতে চেষ্টা করাই ছিল আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এইসকল আইনের মধ্যে ১৮৫৯ সালের বংগীয় খাজনা আইন (The Bengal Rent Act, 1859), ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন (The Tenancy Act, 1885), ১৯০৮ সালের মাদ্রাজ ভূসম্পত্তি আইন (The Madras Estate Land Act, 1908) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে এই উদ্দেশ্যে আরও আইন পাস করা হইয়াছিল—যথা, ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালের আইন।

প্রতিযোগিতার কুফলের প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

গ। এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিভিন্ন আইন

এই সকল আইন পাসের পর ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা উপরি-উক্ত তিনটি নীতি—যথা, প্রথা (custom), প্রতিযোগিতা (competition) এবং আইন (legislation)—দ্বারাই নির্ধারিত হইতে থাকে। বর্তমানে এইভাবে নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের হার অত্যধিক কিনা তাহার বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে। অত্যধিক হইলে আইন প্রণয়নের দ্বারা খাজনা হ্রাসের ব্যবস্থাও করা যাইতেছে।

ভূমি-রাজস্ব প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইন দ্বারা নির্ধারিত হইত

ভূমি-রাজস্ব—খাজনা না কর? (Is Land Revenue Rent or a Tax?) এই প্রসংগে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। ইহা হইল ভূমি-রাজস্ব খাজনা না কর এই লইয়া মতদ্বৈধতা। যাঁহারা ভূমি-রাজস্বকে খাজনা বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন তাঁহারা ইহার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন: (ক) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকেই সমগ্র জমির মালিক হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কতকগুলি বিশেষ সর্তাধীনে রাষ্ট্র ব্যক্তিবিশেষকে জমি ব্যবহার করিতে দেয় মাত্র। (খ) জলসেচ-ব্যবস্থা, বনভূমি পত্তন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির দ্বারা রাষ্ট্র অনেক সময় জমির উন্নয়নের চেষ্টা করে। জমির মালিকানা যদি রাষ্ট্রের না হইত তবে ইহার উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সাক্ষাৎ মিলিত না। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির উন্নতিসাধনে সরকার কখনও সচেষ্ট হইতে পারে না। (গ) জমির মালিকানা

ভূমি-রাজস্ব—খাজনা না কর

খাজনা বলিয়া অভিহিত করার সপক্ষে যুক্তি

যখন রাষ্ট্রের তখন জমি হইতে প্রাপ্য রাজস্বকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। (ঘ) উপরন্তু, ভূমি-রাজস্ব দীর্ঘকাল বা অল্পকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে—করের ন্যায় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রতি বৎসর উহার হ্রাসবৃদ্ধি করা হয় না।

অপরদিকে যাহারা ভূমি-রাজস্ব 'কর' এই অভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের যুক্তি হইল: (ক) জমির মালিকানা ব্যক্তিবিশেষের—যদিও বা এই মালিকানা স্বল্পমেয়াদী হইতে পারে; (খ) জমির উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের মালিকানা প্রমাণিত করে না। সরকার ত' জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ব্যবস্থাও করে। বস্তুত, জমির উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অন্যতম জনকল্যাণকর কার্য মাত্র। ইহা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত; (গ) সকল প্রকার করের বাৎসরিক হ্রাসবৃদ্ধি সকল সময় সম্ভব বা কাম্য নহে। ভূমির উপর 'কর' এই শ্রেণীভুক্ত। অতএব, ইহারও বাৎসরিক হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব বা কাম্য নহে।

কর বলিয়া অভিহিত করার সপক্ষে যুক্তি

অন্যান্য যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া শুধু একটি বিষয় নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহা হইল রাষ্ট্রই জমির চূড়ান্ত মালিক কিনা? যদি রাষ্ট্রকে জমির মালিক হিসাবে গণ্য করা হয় তবে ভূমি-রাজস্বকে খাজনা হিসাবে এবং বিপরীত ঘটিলে ইহাকে কর হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

উপসংহার

ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে রাষ্ট্রকে জমির মালিক হিসাবে গণ্য করা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান যুগে জমি সম্প্রদায়ের সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য হইত। কিন্তু ইংরাজরা আসিয়া এই প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনসাধন করে। পাশ্চাত্য বিধিশাস্ত্র ও ভূমি-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে রাষ্ট্রই সকল জমির চূড়ান্ত মালিক—তাহারা এই ধারণা প্রচার করে। তদবধি ভারতে ইহাই প্রবর্তিত আছে। সাম্প্রতিককালে কেহ কেহ ইহার বিরোধিতা করিলেও সমগ্র সভ্য জগৎ রাষ্ট্রকেই সকল জমির চূড়ান্ত মালিক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং আমাদের দেশেও ইহা গ্রহণে বিরোধিতার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভূমি-রাজস্ব খাজনা—ইহা মানিয়া লইয়াই এ-পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার আলোচনা করা হইয়াছে।

ভূমি-রাজস্ব খাজনা, কর নহে

ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের সূচনা (Beginning of Land Reforms):

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা, কুটির শিল্পসমূহের অবনতি এবং বিভিন্ন উত্তরাধিকার আইনের ফলে কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থা দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইলেও বহুদিন পর্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজনীয়তা বিদেশী শাসকেরা বোধ করেন নাই। ফলে "সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষির উপর নির্ভরশীল দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা জমির উপর উত্তরোত্তর চাপ দিতে থাকে, এবং জমি ক্রমশ মহাজন ও মধ্যজীবিগণের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন পাসের দ্বারা খাজনা

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

বৃদ্ধি, উৎখাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে কৃষিজীবীর অবস্থার সামান্য উন্নতি সাধিত হইলেও, ভূমি-সংগঠনের মূল প্রকৃতি অপরিবর্তিতই থাকিয়া যায়। বলা যায় যে, ১৯৪০ সালে বংগীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশন (Bengal Land Revenue Commission) রিপোর্ট দাখিল করার পূর্ব পর্যন্ত সরকার ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা একরূপ উপলব্ধিই করে নাই।* স্বভাবতই, কোন ভূমিনীতিও নির্ধারিত হয় নাই।

ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের প্রথম প্রচেষ্টা

বংগীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে ভূমিনীতি নির্ধারণ ও ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে শুধু বংগদেশের নহে, সকল প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টিই আকর্ষিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর একটি ভয়ানক সত্য প্রকটভাবে প্রতিভাত করে। ইহা হইল ভারত খাদ্যশস্যে কোনমতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ব্যতিরেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নহে।

খাদ্য-সমস্যা ও ভূমি-সংস্কারের গুরুত্ব

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এই পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্যক্রম ভূমি-স্বত্ব সংস্কারের প্রচেষ্টাকে মন্থরগতি করিয়া তুলে। মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত কার্যক্রমের অন্যতম নীতি ছিল যে, জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপসাধন প্রভৃতির ন্যায় আপাত অনুৎপাদনশীল কার্যে কোন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পাইবে না। পশ্চিমবংগের ন্যায় অনেক প্রাদেশিক সরকার এই কার্যে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল বলিয়া তাহারা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভর করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ফলে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইবার সময় দেখা যায় যে ইতিমধ্যেই বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং পেপ্সু মধ্যবর্তী ভূমিজীবিগণের বিলোপ-সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়াছে।

স্বাধীনতার পর সংস্কারের প্রচেষ্টা

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পূর্ববর্তী সংস্কারসমূহ

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূত্রপাতে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য এইরূপ বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া সর্বপ্রথম এক সর্ব-ভারতব্যাপী ভূমি-সংস্কারের জন্য কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয় এবং সর্বাংগীণ ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হয়। এখন এই নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা

* India—1958.

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি (Land Policy under Planned Economy) : প্রথম পরিকল্পনার ভূমিনীতি অধ্যায়ের সূচনাতেই বলা হইয়াছিল, "জাতীয় উন্নয়নে জমি ও কৃষিকার্যের মালিকানার সমস্যাই মৌলিকতম সমস্যা।" ভবিষ্যতে আর্থিক ও সামাজিক সংক্রান্ত সংগঠনের প্রকৃতি ভূমি-সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির উপরই নির্ভর করিবে। একদিকে যেমন পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির যে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির হইয়াছে তাহাতে পৌছান প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সংগে সংগে ভূমিনীতির মাধ্যমে যাহাতে সম্পদ ও উপার্জনে বৈষম্য ক্রমশ তিরোহিত হয়, শোষণ অপসারিত হয়, প্রজা ও শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয় এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণ সমমর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাহাও দেখা প্রয়োজন। "এই সকল লক্ষ্যেই পৌছান হইল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের অন্যতম অপরিহার্য অংগ।" **

ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, "প্রকৃতপক্ষে ভূমি-সংস্কারের ফলাফল গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করে।" † জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নগর ও শিল্পকেন্দ্রসমূহের প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ফলে খাদ্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বৈচিত্র্যময় হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চাকাংক্ষাপূর্ণ শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমও সাফল্যের জন্য কৃষিক্ষেত্র হইতে অতিরিক্ত খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, (ক) কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষিগত সংগঠনে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণ করিতে হইবে, এবং (খ) যথাশীঘ্র সম্ভব কৃষিগত অর্থ-ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত দক্ষতা ও উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত লক্ষ্যসমূহের সব কয়টিই একরূপ ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles), মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। শোষণের সমাপ্তি, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানের সংকোচন, সকলের সমান মর্যাদা ও একই প্রকারের সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির সংগঠন হইল এই সকল নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার (Socialist Pattern of Society) ধারণাও এই দিকে পথ-নির্দেশ করে। বস্তুত, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আর্থিক উন্নয়ন সংবিধানভুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শসমূহের সহিত সংগতি রাখিয়া চলিতে বাধ্য। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি নির্ধারণ ঠিকমতই করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমিনীতি সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত

** First Five Year Plan – ৪৯ পৃষ্ঠা

† Second Five Year Plan—১৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

এই সকল মৌলিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ভূমিনীতি নির্ধারণ করা হইলেও পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, ভূমিনীতি প্রধানত পারিপার্শ্বিক অবস্থারই আপেক্ষিক হইবে—অর্থাৎ স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইহা নির্ধারণ করিতে হইবে। তবুও পরিকল্পনা কমিশন ভূমি-সংস্কারের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য এক কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। এই সাধারণ কার্যক্রমের মূল নীতিগুলি হইল :

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভূমি-সংস্কারের কার্যক্রম

(ক) ১। রাষ্ট্র এবং কৃষিজীবিগণের মধ্যে সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর অপসারণ ;

২। কৃষিজীবিগণকে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং খাজনাহ্রাসের জন্য প্রজাস্বত্ব সংস্কার ;

৩। জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (fixation of ceiling on holdings) এবং ইহার মাধ্যমে জমির পুনর্বণ্টন ;

(খ) ১। জোতের সংহতিসাধনের দ্বারা কৃষির পুনর্বাসন ;

২। ভবিষ্যতে অধিকতর অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন ;

৩। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রসার।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিবিধান তিনটির উদ্দেশ্য হইল জমির মালিকানায় বৈষম্য দূর করিয়া কৃষিগত সংগঠনকে সুদৃঢ় করা ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তিনটি বিষয়ের লক্ষ্য সাধারণভাবে গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা।

নীতিকে কতদূর কার্যকর করা হইয়াছে (Policy Implemented So Far) : ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার প্রধানত রাজ্য সরকারের কার্য। কিন্তু রাজ্য সরকার সংস্কারকার্যে যাহাতে উপরি-উক্ত নীতি পালন করিয়া চলে তাহা দেখিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একটি ভূমি-সংস্কার শাখা (a Land Reforms Wing) গঠন করা হয়। উপরন্তু, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ভূমিনীতি নির্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৯৫৪ সালে একটি প্যানেল (Panel) নিযুক্ত হয়। এই প্যানেল মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপসাধন কমিটি, প্রজাস্বত্ব কমিটি প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়া ভূমি-সংস্কারের বিভিন্ন দিকের বিচার-বিবেচনা করে। ইহার মধ্যে প্রজাস্বত্ব কমিটি (Tenancy Committee) কর্তৃক জমি যে শ্রমজীবী কৃষকের (land to the tiller) এই নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালে ভূমি-সংস্কার প্যানেলকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে।

ভূমি-সংস্কার কার্যের বিভিন্ন সংস্থা

প্রথম পরিকল্পনার পূর্বেই কয়েকটি রাজ্য মধ্যস্বত্ব বিলোপসাধনের কার্য সুরু করিয়াছিল। এই কার্য মোটামুটি সমাপ্ত হয় ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে। ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগে আসিয়া দেখা যায় যে মোট কর্ষিত জমিতে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অংশ শতকরা ৪৩ ভাগ হইতে শতকরা ৫ ভাগে পরিণত হইয়াছে। এই বাকী ৫ ভাগের মধ্যস্বত্ব বিলোপ কার্য ১৯৫৯ সালের মধ্যে সমাপ্ত করিবার কথা ছিল।*

১। মধ্যস্বত্ববিলোপ

* India—1959 এবং AICC Economic Review, June 1959

একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেক স্থলেই মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে মোট দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৬২৫ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবংগে ব্যয়িত হইবে ৭০ কোটি টাকা।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ভূমিনীতিতে প্রজাস্বত্ব সংস্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশ্য মোটামুটি দ্বিবিধ—যথা, (১) খাজনাহ্রাস; এবং (২) প্রজাকে জমির মালিকানা অধিকার প্রদান। খাজনাহ্রাস সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশ দেয় যে খাজনা কোন ক্ষেত্রেই মোট উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{৪}$-এর অধিক এবং $\frac{১}{৫}$-এর কম হইবে না। অনেক রাজ্যেই খাজনা এই দুই সীমার মধ্যে থাকায় ইহাদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কে কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় নাই। বাকিগুলিতে খাজনাহ্রাস এবং উহার উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মহীশূর, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে আইন ইতিমধ্যেই পাস করা হইয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ মানা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্থান ও বোম্বাই-এ মোট উৎপন্নের $\frac{১}{৬}$ অংশ, পাঞ্জাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং মহীশূরে $\frac{১}{১০}$ অংশ খাজনা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ফলে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে সমগ্র ভারতের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব হয় নাই। তবে রাজ্যগুলিকে এই সামঞ্জস্যবিধান করিতে পরিকল্পনা কমিশন হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রজাস্বত্ব সংস্কার

(ক) খাজনাহ্রাসের ব্যবস্থা

কৃষিজীবীকে জমিতে মালিকানা-অধিকার প্রদান করার কার্য অধিকাংশ রাজ্যই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমত প্রজাকে স্বত্বের স্থায়িত্ব প্রদান করিয়া তাহাকে উৎখাৎ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়ত, তাহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রজাবিলি জমির সম্পূর্ণটা বা একাংশ ক্রয় করিয়া লইবার অধিকারও প্রদান করা হইয়াছে।

(খ) কৃষিজীবীকে জমির চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান

স্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের আলোচনা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধ্যস্বত্বের বিলোপের ফলে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা মাত্র দুই শ্রেণীবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—(ক) যাহারা রাষ্ট্রের নিকট হইতে জমি সরাসরি বন্দোবস্ত লয়, এবং (খ যাহারা মালিকদের নিকট হইতে প্রজা হিসাবে বন্দোবস্ত লয়। বিভিন্ন রাজ্যে এই দুই শ্রেণীর স্বত্বের ক্ষেত্রেই প্রজাকে স্বত্বের স্থায়িত্বপ্রদানের জন্য আইন পাস করা হইয়াছে। আইনে মূলত 'জমি শ্রমজীবী কৃষকের' (land to the tiller) এই নীতিকে মূল লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে আইন পাস হইলেও ইহা সকল স্থানে ঠিকমত কার্যকর হইতেছে না। দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় কৃষি-জোতের মালিক প্রজাদের নিকট হইতে 'স্বেচ্ছাকৃত স্বত্বত্যাগের' (voluntary surrender) দলিল লিখাইয়া লইতেছে। সুতরাং ব স্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দারিদ্র্যহেতু কৃষকের পক্ষে প্রজাবিলি জমি ক্রয় করিয়া লইবার অধিকারও ঠিকমত ভোগ করা সম্ভব হইতেছে না। উদাহরণস্বরূপ, বোম্বাই-এ মালিক প্রজাবিলি জমির অর্ধেক পুনঃগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু বাকী অর্ধেক প্রজা ইচ্ছা করিলেই কিনিয়া লইতে পারে। দিল্লীতে প্রজা মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়া বিলিকৃত সমস্ত জমিটারই মালিক হইয়া বসিতে পারে। পাঞ্জাবে মালিক ৩০ একর পর্যন্ত জমি পুনঃগ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য সে কোন ক্ষেত্রেই ঐ পরিমাণের অধিক জমি নিজ দখলে রাখিতে পারে না। ইহা তাহার জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা। কিন্তু উপরি-উক্ত কোন রাজ্যেই কৃষকগণ এ-পর্যন্ত যতটা পরিমাণ জমি ক্রয় করিতে পারে তাহার এক-চতুর্থাংশও ক্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং এ-বিষয়েও কিছু করা দরকার।

৩। জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ

জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা ভূম্যধিকারী ও কৃষক উভয়ের বেলাতেই নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের দুইটি দিক আছে—(ক) ভবিষ্যৎ ভূমিসংগ্রহের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling on future acquisition), (খ) বর্তমান জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ (ceiling on existing holdings)।

ভবিষ্যৎ মাত্রা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও ভূমিসংগ্রহের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারিত হয় নাই। তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবংগ, এবং দিল্লী জোতের ভবিষ্যৎ মাত্রা নির্ধারণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন পাস করে। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগে যে-আইন প্রণীত হয় তাহা ১৯৫৬ সালের পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন (Land Reforms Act, 1956) নামে অভিহিত।

বর্তমান মাত্রা

১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরল, মহীশূর, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল-প্রদেশ ও পশ্চিমবংগে। অন্যান্য রাজ্যকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে এই আইন প্রণয়ন সমাধা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ কতদূর পালিত হইতেছে তাহার বিবরণ ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে আশা করা যায় যে ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে সকল প্রকার আইন প্রণয়নকার্য অন্তত ১৯৬০ সালের মধ্যে সমাপ্ত হইবে।

উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণে বিলম্বের কারণ

অর্থনৈতিক জোতের আয়তন নির্ধারণে অসুবিধাই ছিল জোতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মাত্রা নির্ধারণে বিলম্বের কারণ। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কুমারাপ্পা কমিটি (Kumarappa Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, অর্থনৈতিক জোতের কোন নির্দিষ্ট আয়তন নাই, তবে উহাকে দুইটি সর্ত পূরণ করিতে

হইবে : (ক) উহা কৃষকের যুক্তিসংগত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবে, এবং (খ) উহা হইতে অন্তত একজোড়া বলদ সমেত একটি স্বাভাবিক আয়তনের কৃষক-পরিবারের পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। কুমারাপ্পা কমিটির এই অভিমতের ভিত্তিতেই জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা যাইতেছে। এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে উর্ধ্বতন মাত্রা যেন উপরি-উক্ত অর্থে অর্থ নৈতিক জোত অপেক্ষা কম এবং 'কাম্য জোত' (optimum holding) অপেক্ষা অধিক না হয়। কাম্য জোত আয়তনে অর্থ নৈতিক জোতের মোটামুটি তিনগুণ হয়।

জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে যে-জমি পাওয়া গিয়াছে বা যাইতেছে প্রধানত ভূমিহীন কৃষিজীবিগণের মধ্যেই তাহাদের পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। পশ্চিমবংগে ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত ৬৭ হাজার একর জমি পুনর্বণ্টন হইয়াছে। ভূদান যজ্ঞের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমির সম্পর্কেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।*

জমির পুনর্বণ্টন

ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিকে আছে জোতের সংহতিসাধন, ভবিষ্যৎ অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রসার। ইহাদের মধ্যে জোতের সংহতিসাধন ও ভবিষ্যৎ অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।** এখন তৃতীয় বিষয়টি—অর্থাৎ সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থার দ্বিতীয় দিক

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য (Co-operative Farming) : ভারতে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে ধারণা প্রসারলাভ করে ১৯৪৯ সালে লক্ষ্নৌ-এ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কলাকৌশল সংক্রান্ত অধিবেশনের (Technical Meeting of the F.A.O.) পর হইতে। ঐ অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে কৃষির পুনর্বাসনের জন্য সমবায় পদ্ধতিই অবলম্বনীয় পন্থা; এই সমস্ত পদ্ধতির প্রসারকল্পে বিভিন্ন দেশের সরকারকে সকল সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ও কৌশলগত উপদেশ প্রদান করিবার সুপারিশ করা হয়।

এ-সম্বন্ধে ধারণার প্রসার

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্বন্ধে ধারণা অবশ্য নূতন নয়। ১৯৪৯ সালের বহুপূর্বেই বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন আকারে ও পরিমাণে ইহা লইয়া পরীক্ষা শেষ করিয়াছিল এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন ও উহার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, ইস্রায়েল, মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, সুইডেন এবং নয়া চীনে এই পদ্ধতির সাফল্য বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

---

* ১২০ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১১৪-১৬ পৃষ্ঠা।

উপরি-উক্ত সুপারিশের ফলে এবং বিভিন্ন দেশের আদর্শের অনুপ্রেরণায় ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার অধিকাংশই কিন্তু ব্যয়িত হয় নাই।* যাহা হউক, ঐ পরিকল্পনার শেষে ভারতে সমবায়ী কৃষি সমিতি সংখ্যা ১,৩৯৭-তে পৌছায়। ইহার মধ্যে ২৬২টি সমিতি পরিকল্পনার শেষ বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালেই গঠিত হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের জন্য ১ কোটি ৩৮½ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং ৩,০০০ এর উপর সমবায়ী কৃষি সমিতি স্থাপন করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৫৬ সালে একদল ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নয়া চীনের সমবায় কৃষি-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য প্রেরণ করা হয়। পাতিল কমিটি (Patil Committee) এই দলের রিপোর্টের পর্যালোচনা করিয়া ভারতে ব্যাপকভাবে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের সুপারিশ করে এবং সুপারিশমত কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। ফল কিন্তু ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সকল প্রকার সমবায়ী কৃষি সমিতির সংখ্যা ৩,৬৩৭-এ পৌছাইলেও কার্যক্ষেত্রে সমবায়ী মনোভাবের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। উক্ত সংখ্যার মধ্যে আবার সমবায়ী যৌথ কৃষি সমিতি (Co-operative Joint Farming Societies) বা প্রকৃত সমবায়ী কৃষি সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ১,২০০-এর মত।** স্যর ম্যালকম ডার্লিংকে উদ্ধৃত করিয়া বলা যায়, "সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি কৃষকগণকে মোটেই উৎসাহিত করিতে পারে নাই। এই ধরনের সমিতি যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্যই হইয়াছে, সমবায়ী আদর্শের অনুপ্রেরণায় নহে।" সুতরাং স্যর ম্যালকম এই বিষয়ে অতি সতর্কভাবে চলিবার পরামর্শ দেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

১৯৫৯ সালে কৃষির পুনর্গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবে (Nagpur Resolution) কিন্তু স্যর ম্যালকমের উক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই। প্রস্তাবে তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশকে সেবা-সমবায় সমিতি (Service Co-operative) দ্বারা ছাইয়া ফেলিবার এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যৌথ সমবায়ী কৃষি সমিতি (joint co-operative farms) স্থাপন করিবার কথা বলা হয়। ইহার উপর পুনর্বণ্টিত যে-সকল জমিতে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে সেখানেও সমবায়-কৃষি সমিতি গঠনের নীতি ঘোষণা করা হয়। মোটকথা, কৃষির পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হয়।

কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব ও পরবর্তী অধ্যায়

* Review of the First Five Year Plan—৩২০ পৃষ্ঠা।

** Eastern Economist, June 12, '59.

এই প্রস্তাবের পর হইতেই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য বিশেষ বিতর্কমূলক ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের যথাসম্ভব শীঘ্র সম্প্রসারণের সপক্ষে মোটামুটি মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা আজ আর সত্য নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে বিতর্ক ছিল সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কিরূপ গ্রহণ করিবে তাহা লইয়া। বর্তমানে বিতর্ক হইল সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কাম্য কিনা তাহা লইয়া।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিভিন্ন রূপ:

এই বিতর্কের বিশ্লেষণ করিয়া অভিমত প্রদান করিবার জন্য সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-কার্যের বিভিন্ন রূপের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য মোটামুটি চারি প্রকার রূপ গ্রহণ করিতে পারে—যথা, (ক) সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্য (co-operative joint farming), (খ) সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য (co operative tenant farming); (গ) সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য (co operative better farming) এবং (ঘ) সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্য (co-operative collective farming)।

(ক) যৌথ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য

প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে কতিপয় কৃষকের জোতের খণ্ডীকৃত (এবং অসম্বদ্ধও) অংশ সমবায় সমিতির অধীনে একত্রিত করিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করা হয়। প্রত্যেক কৃষক তাহার ব্যক্তিগত জমির মালিক হিসাবে উৎপন্নের কিছু অংশ পায়, কৃষি-শ্রমিক হিসাবে সে তাহার মজুরি পায় এবং মুনাফারও অংশ পায়। এই প্রকার সমবায় কৃষি-সমিতিকেই প্রকৃত সমবায় কৃষি-সমিতি বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ইহা সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার (co-operative village management) অনুরূপ।

(খ) কৃষি প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য

দ্বিতীয় বা 'কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য' পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি কৃষিকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। ইহা ইহার মালিকানায় যে-জমি থাকে তাহা কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া কৃষকগণকে ভাড়া দেয়। সংগে সংগে আবার কৃষকগণকে বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করে। কৃষকগণ সমবায় সমিতির প্রজা হিসাবে নির্দিষ্ট প্রণালীতে সুচারুভাবে কৃষিকার্য করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তরাই বা দণ্ডকারণ্যের ন্যায় যেখানে অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত বা পতিত জমির পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে বা হইতেছে সেখানেই এই প্রকার সমবায় পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু যেখানে কৃষকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিক সেখানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রশ্ন উঠে না।

(গ) উন্নত ধরনের কৃষিকার্য

তৃতীয় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের আদর্শ হইল উন্নততর কৃষিকার্য, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য নয়। ইহাতে সমবায় সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ সম্বন্ধে অবহিত করিয়া কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। অধ্যাপক রংগের (Prof. N. G. Ranga) ভাষায় বলা যায়, "পারস্পরিক সমবায়ে কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি কার্য সম্পাদন

করিবার জন্য সমগ্র কৃষিকার্যকে সমবায়ের অধীনে আনয়নের প্রয়োজন হয় না, পারিবারিক ভিত্তিতে কৃষিকার্য সম্পাদন বর্জন করিয়া নূতন পদ্ধতি গ্রহণও অপরিহার্য হইয়া উঠে না।" অতএব সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের কৃষিকার্য বলিতে কলাকৌশলের উন্নয়ন বুঝায় মাত্র। কলাকৌশলের উন্নয়ন দরিদ্র কৃষকের একলার পক্ষে সম্ভব হয় না বলিয়াই সমবায়ের পক্ষে অগ্রসর হইতে হয়।

(ঘ) সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্য

সমবায় প্রথায় সামগ্রিক কৃষিকার্য সম্পর্কে ধারণা সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে আসিয়াছে। সামগ্রিক খামার প্রথা সমবায় পদ্ধতিরই একটি রূপ। তবে কৃষি-জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকার করা হয় না। সামগ্রিক খামার প্রথায় কৃষি-জমির মালিকানা থাকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের; কিন্তু সামগ্রিক খামারকে ইহা চিরকালের জন্য অর্পণ করা হয়। সামগ্রিক খামারের অন্য সকল উপকরণ এবং ইহা হইতে উৎপন্ন ফসল সামগ্রিক খামার সংগঠনকারী কৃষকগণের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রকে দেয় কর ইত্যাদি মিটাইয়া যে নীট লভ্যাংশ থাকে তাহা শ্রমের ভিত্তিতে সামগ্রিক খামারের অংশীদারগণের মধ্যে শ্রমের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে বণ্টিত হয়।*

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা (The Need for Co-operative Farming): কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির, বিশেষ করিয়া খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং কৃষিকে লাভজনক ভিত্তিতে সংগঠিত করিবার অপরিহার্যতা সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দিকে পথ নির্দেশ করে।

১। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতকরা ২৫-৩১ ভাগ কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির এবং শতকরা ১৫ ভাগ খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির হার বর্তমান শতকরা ৩.২ ভাগ হইতে শতকরা ৮.২ ভাগে লইয়া যাইতে হইবে। কৃষি জমির দুষ্প্রাপ্যতাহেতু ব্যাপক কৃষিকার্যের সুযোগ নাই বলিয়া আত্যন্তিক ও বৃহদায়তন (intensive and large-scale) কৃষিকার্যই হইল উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার একমাত্র পন্থা; এবং বর্তমান অবস্থায় একমাত্র সমবায় পদ্ধতিতেই আত্যন্তিক ও বৃহদায়তন কৃষিকর্ম সম্পাদনের আশা করা যায়।

সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তন ও আত্যন্তিক কৃষিকার্য শুধু যে উৎপাদনবৃদ্ধিরই ব্যবস্থা করে তাহা নহে, ইহা উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস করে। বলা হইয়াছে যে অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিকার্যকে (subsistence farming) লাভজনক পেশায় পরিণত করিতে হইলে সমবায় পদ্ধতিতে সম্পাদন করা গত্যন্তর নাই। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য কৌশলগত উন্নয়নসাধন করিয়া উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করে।

২। উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা

---

* Karpinsky The Social and State Structure of the U.S.S.R.—২৪-২৬ পৃষ্ঠা

উপরন্তু, পরিমাণে কিছু কম হইলেও শিল্পের মত কৃষির ক্ষেত্রেও সুদক্ষ পরিচালনা উৎপাদনের আয়তনের (scale of production) সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। পরিচালনাগত ব্যয়সংকোচের (managerial economies) সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে হইলে বর্তমানে আমাদের দেশে সমবায় কৃষিকার্যের পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে।

৩। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসন

তৃতীয়ত, বহুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের অস্তিত্বও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এই সকল কৃষি-শ্রমিকের মধ্যে অতিরিক্ত কৃষি-জমি (surplus land) বণ্টনের নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অতিরিক্ত জমির পরিমাণ অত্যল্প বলিয়া এই সকল কৃষি-শ্রমিকের জোত অতি ক্ষুদ্র হইতে বাধ্য। উপরন্তু, তাহারা বিশেষ দরিদ্র বলিয়া কাম্য পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিই হইল প্রকৃষ্ট পন্থা।

৪। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার নির্দেশ

চতুর্থত আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অংগ হিসাবেও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন উন্নততর কলাকৌশল, জমির স্থায়ী উন্নয়ন, জলসেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি দাবি করে। এগুলির জন্য জোতের আয়তন সম্প্রসারণ অপরিহার্য। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন, জোতের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ প্রভৃতির ফলে জোতের আয়তন অনেক ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতরই হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণকার্য রহিত হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদনই অনুসরণীয় পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়।

৫। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিফলন

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অংগীভূত সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠনের নীতিও এই নির্দেশ দেয়। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ গঠন দুইভাবে করা যাইতে পারে: (ক) উৎপাদনের সমগ্র উপকরণ সামাজিক মালিকানার আয়তন করিয়া, অথবা, (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া। আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় কৃষির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জমির মালিকানা কৃষকের অন্যতম প্রধান আকাংক্ষিত বস্তু, অথচ অর্থ নৈতিক প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের অস্তিত্ব বজায় রাখা যাইতে পারে না। ফলে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যই একমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা হইয়া দাঁড়ায়। সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শোষণের বিলুপ্তিসাধন উভয়েরই অনুপন্থী ; এবং এই দুইটিই হইল সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের বিরোধিতা (Opposition to Co-operative Farming) উপরি-বর্ণিত প্রয়োজনীয়তা ও সুফল সত্ত্বেও সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছে। এই বিরোধিতাকে প্রধানত তিন দিক হইতে

দেখা যাইতে পারে (ক) রাষ্ট্রনৈতিক, (খ) অর্থনৈতিক এবং (গ) সামাজিক। রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধিতা আসিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল হইতে। ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রসারের সুযোগ লইয়া কংগ্রেস দল কৃষকদের উপর অন্যায়ভাবে প্রতিপত্তি বিস্তার করিবে। কারণ, বর্তমান অবস্থায় যে-সকল সমবায় কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির আশাতেই হইবে, সমবায়ী আদর্শের অনুপ্রেরণায় নহে।

তিন দিক হইতে বিরোধিতা :

১। রাষ্ট্রনৈতিক বিরোধিতা

এই সমবায়ী মনোভাবের অভাব সমবায় পদ্ধতিতে কৃষির প্রসারের বিরুদ্ধে অন্যতম অর্থনৈতিক যুক্তিও বটে। বলা হয় যে, সেখানে সমবায়ী আদর্শের অভাবে সমবায় কৃষি-ঋণ ব্যবস্থাই সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই সেখানে সমবায় কৃষি-পদ্ধতি যে সফলতা লাভ করিবে এরূপ আশা করা অযৌক্তিক।

২। অর্থনৈতিক বিরোধিতা

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় কৃষকগণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভংগিও সমবায় পদ্ধতির পরিপন্থী। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েত, যৌথ পরিবার প্রভৃতি যে-সকল ঐক্য এবং সমষ্টিসাধক প্রতিষ্ঠান ছিল আজ তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগির প্রসারের ফলে ভারতীয়গণ আজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এরূপ ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্যের প্রসার ঘটিতে পারে না। তৃতীয়ত, সমবায় কৃষি সমিতি সংগঠন ও পরিচালনযোগ্য লোকেরও ভারতে বিশেষ অভাব। চতুর্থত, সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তনে কৃষিকার্য করা হয় বলিয়া ইহা অল্পবিস্তর যান্ত্রিক রূপ ধারণ করিবেই। বস্তুত, কৃষির যন্ত্রিকরণের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই সমবায় পদ্ধতির পথে অগ্রসরের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণভাবেও কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা সাধারণ সমবায় সমিতির সাধ্যাতীত। পরিশেষে, কৃষির যন্ত্রিকরণের ফলে যে বহুসংখ্যক কৃষক বেকার হইয়া পড়িবে তাহাদের পুনর্নিয়োগের সমস্যা হইল এই পদ্ধতির আর একটি প্রধান অসুবিধা।

সামাজিক দিক হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে সমবায় পদ্ধতির ফলে দেশের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নির্দেশাধীন হইয়া সামগ্রিক আকার (collective form) ধারণ করিবে; কৃষিজীবিগণের স্বাতন্ত্র্য বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। সমাজতন্ত্রের আদর্শ নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও আমাদের দেশ এখনও যৌথ সম্পত্তির ধারণায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপান উচিত নহে; চাপাইতে গেলে বিপ্লব ঘটিতে পারে।

৩। সামাজিক দিক হইতে বিরোধিতা

ভারতের সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্ভাবনা (Prospects of Co-operative Farming in India): উপরি-বর্ণিত সমর্থন ও বিরোধিতার ভিত্তিতেই ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের প্রসারের সম্ভাবনা বিচার করিতে হইবে। এই প্রসংগে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য সোবিয়েত

ইউনিয়ন, নয়া চীন, ইস্রায়েল বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ অনুসরণ করা চলিতে পারে না। আমাদের কৃষকগণের অজ্ঞতা এবং বিশেষ সামাজিক অবস্থার জন্য সমবায় কৃষি-পদ্ধতির সম্প্রসারণের কার্যক্রমকে এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যে তাহা যেন দেশের সর্বত্র প্রবর্তনযোগ্য হয়। অর্থাৎ, উহা যেন বিশেষ নমনীয় (flexible) হয়। যে-সকল অঞ্চলে সমবায়িক কৃষি সুরু করা যাইতে পারে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই সকল 'পথপ্রদর্শক পরিকল্পনাগুলির' (pilot projects) উপরই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সফলতা নির্ভর করিবে। সুতরাং স্থান-নির্বাচন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

পরিবর্তনশীল কার্যক্রমে সমবায়িক কৃষির পূর্ব-বর্ণিত চারিটি রূপের মধ্যে কোনটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা চলিবে না। ভারত একটি বিশাল দেশ ; উহার বিভিন্ন অঞ্চলের পরস্পরের মধ্যে অবস্থাগত সাদৃশ্য বড় একটা নাই। সুতরাং একই প্রকার সমবায় কৃষি-পদ্ধতি চলিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যে-সকল অঞ্চলে পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসন করা হইতেছে যে সামগ্রিক পদ্ধতিতে সমবায়িক কৃষির (co operative collective farming) প্রবর্তন করা যাইতে পারে এবং অন্যান্য স্থানে সমবায় পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিকার্য, বা উন্নততর কৃষিকার্য বা কৃষি-প্রজার দ্বারা কৃষিকার্য লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান যাইতে পারে। যাহা হউক, অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বর্তমান অবস্থাকে যথাসম্ভব বজায় রাখিয়াই সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণে অগ্রসর হইতে হইবে।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি-কার্যের সম্প্রসারণে অনুসরণীয় দুইটি নীতি

অতএব, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণে দুইটি নীতিকে সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হইবে—(ক) কার্যক্রমের নমনীয়তা, এবং (খ) উহার প্রবর্তন ব্যাপারে সতর্কতা। অবশ্য সমবায় পদ্ধতিতে সামগ্রিক কৃষিকার্যই হইবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিতে হইবে। শ্রীনেহরু এইরূপ চারিটি পর্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, সমবায়িক ঋণ, সমবায়িক সেবা, সমবায়িক যৌথ কৃষিকার্য এবং সমবায়িক সামগ্রিক কৃষিকার্য।

এই পথে বিভিন্ন পর্যায়

বর্তমানে এইমতই কার্য করা হইতেছে। সমবায়িক ঋণ (co-operative credit), সমবায়িক সেবা (co-operative service) এবং সমবায়িক যৌথ কৃষিকার্য (co-operative joint farming) সুগঠিত করিয়া তবেই সমবায়িক সামগ্রিক খামার গঠনে দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

কার্যকরী দলের সুপারিশ

এ সম্পর্কে কার্যক্রম নির্ধারণ করিবার জন্য ১৯৫৯ সালেই সরকার একটি কার্যকরী দল (Working Group on Co-operative Farming) গঠিন করে। কার্যকরী দল প্রথম রিপোর্ট প্রকাশ করে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। রিপোর্টে দলটি ভারতে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সাফল্য সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করিয়াছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২০টি

'পথপ্রদর্শক পরিকল্পনা' (pilot projects) স্থাপন করিবার সুপারিশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৪০টি পরিকল্পনা বা সমিতি বর্তমান বৎসরেই (১৯৫৯-৬০) স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। দলটির মতে, এই সকল পথপ্রদর্শক পরিকল্পনা প্রধানত জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্লকসমূহের যেখানে সমবায় আন্দোলন মোটামুটি সুসংগঠিত সেইখানে স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেকটি ব্লকে গড়ে ১০টি করিয়া সমিতি স্থাপন করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য অঞ্চলেও সমবায় কৃষি-সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে পথপ্রদর্শক সমিতিগুলি ছাড়া মোট ২০ হাজারের মত সমিতি অন্যান্য অঞ্চলে স্থাপনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

সমবায় কৃষি-সমিতি সাফল্যের জন্য দলটি কয়েকটি সর্তের উল্লেখ করিয়াছে—যথা, (১) সমিতির সদস্যগণকেই গঠন-দায়িত্ব করিতে হইবে, সরকারী নেতৃত্ব এ-ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হইবে না; (২) সমস্বার্থের ভিত্তিতে যথাসম্ভব গ্রামের অধিকাংশ লোককেই সভ্যপদভুক্ত করার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। (৩) প্রত্যেকটি সমিতিকেই আত্মনির্ভর হইতে হইবে। এবং এই দিক হইতে বিচার করিয়া সমিতি আয়তন নির্ধারণ করিতে হইবে; এবং (৪) জমির মালিকানার পরিমাণে প্রশ্ন না তুলিয়া সকলকেই পরিচালনায় সমান অধিকার দিতে হইবে।

সমবায় কৃষি-সমিতির সাফল্যের সর্ত

দলটি ৫ বৎসরের জন্য জমি সমবায় সমিতির হস্তে সমর্পণের নির্দেশ দিয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানা-প্রীতিজনিত যে-প্রতিবন্ধক তাহা দূর করিবার জন্য দলটি জমি সমর্পণকারী সভ্যগণকে সমর্পিত জমির পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার প্রদানের কথা বলিয়াছে। সভ্যদের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি অবশ্য পরিচালনায় নিষ্ক্রিয় বা কার্যক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিত থাকিবে তাহাদের সভ্যপদ বাতিল করিবার পরামর্শও দলটি দিয়াছে।

মালিকানা-জনিত প্রতিবন্ধক

রিপোর্ট অনুসারে গ্রাম্য ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন হইবে সমবায় কৃষি-সমিতির কার্যক্রমের অংগীভূত। ইহাদের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মচ্যুত কৃষি-শ্রমিকের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রাম্য ও কুটির শিল্প

যন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে দলটি বলিয়াছে যে, দুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিতে হইবে—(১) যে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়, এবং (২) যে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে। এই দ্বিতীয় প্রকার যন্ত্র ব্যবহারের উপরই দৃষ্টি দিতে হইবে।

যন্ত্রিকরণ

প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ কৃষি-সমিতি গঠন করা সম্ভব নহে বলিয়া দলটি সমিতি কিছু সর্বাধিক ৪ হাজার টাকা ঋণ প্রদানের সুপারিশ করিয়াছে। সরকার যদি শেয়ার-মূলধনে অংশগ্রহণ করে তবে ইহার পরিমাণ ২ হাজার টাকার অধিক হইবে না। ইহার উপর গুদামঘর, গোয়ালঘর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সাহায্যও দেওয়া যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ ও সাহায্য

এই কার্যক্রমের ভিত্তিতে মোট ৩৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সমিতিগুলির সাহায্য বাবদ যাইবে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে ৪ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষ কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হইবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

অনুমিত ব্যয়

সাহায্য বণ্টন, ঋণ মঞ্জুরি প্রভৃতি বিষয় তদারক করিবার কেন্দ্র ও প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া পরামর্শ দান বোর্ড (Advisory Boards) গঠনের সুপারিশও দলটি করিয়াছে।

তত্ত্বাবধান

সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা (Co-operative Village Management) ঃ জোতের খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা দূর করিয়া বৃহদায়তনে কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার আর একটি পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা যাহার উপর আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা যে আমাদের ভূমি-সংস্কার ও কৃষির পুনর্গঠনের অন্যতম অংগ সে-সম্বন্ধে উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

শ্রীত্রিলোক সিং আই. সি. এস. সর্বপ্রথম তাহার 'দারিদ্র্য এবং সামাজিক পরিবর্তন' * নামক গ্রন্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। ভারতে কৃষি-জমি সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা বহুদিন হইতেই সরকার ও অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণকে বিব্রত করিয়া আসিতেছিল। খণ্ডীকৃত ও অসম্বদ্ধ জোতের প্রতিবিধানকল্পে সকলেই বৃহদায়তনে কৃষিকার্যের নির্দেশ করিলেও কোন্ পদ্ধতিতে ইহা কার্যকর করা সম্ভব হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল। কেহ বা সোবিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে সামগ্রিক খামার প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কেহ বা চিরাচরিত প্রথায় সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। মধ্যপন্থা অনুসরণ করিয়া ত্রিলোক সিং বলিলেন যে, ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা। ইহাতে সোবিয়েত দেশের মত কৃষকের জীবনের সমগ্র স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিবার প্রয়োজন হয় না; আবার ইহা সাধারণ সমবায় পদ্ধতির মত অসংহত ব্যবস্থাও নয়।

পদ্ধতিটির প্রথম প্রচার করেন শ্রীত্রিলোক সিং

বহু বিচার-বিবেচনার পর পরিকল্পনা কমিশন ত্রিলোক সিং-এর অভিমতকেই সমর্থন করে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতের পক্ষে ইহাই হইল প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কমিশনের মতে, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দ্বারা কৃষির উন্নতি করা সম্ভব হইলেও গ্রামীণ পুনর্গঠনের (rural reconstruction) প্রশ্ন ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ও বিচার করিতে হইবে। গ্রামপর্যায়ে এরূপ একটি সংগঠন অবশ্যই থাকিবে যাহা সমগ্র সম্প্রদায় হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বকে বহন ও কার্যকর করিবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতই হইল এই সংগঠন। ইহার অধীনে গ্রামের কৃষি-জমি ন্যস্ত করা হইবে এবং ইহা সকল প্রকার কৃষিগত ও

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার স্বরূপ

* Poverty and Social Change.

অ-কৃষিগত কার্য সম্পাদন করিয়া গ্রামের সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবে।* কিন্তু এই সংস্থা বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রাথমিক লক্ষ্য হইবে বৃহদায়তন কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিয়া গ্রামের কৃষি-জমি ও অন্যান্য সম্পদের পূর্ণ ও সম্যক ব্যবহার করা।

বৃহদায়তনে কৃষির দিক হইতে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই পদ্ধতি পরিচালনাকারী সংস্থা বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্দেশেই সুরু হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত কৃষি সম্পর্কিত সকল কার্য সম্পাদিত হয়। সংস্থা নির্দেশ দেয় কিভাবে এবং কি কি ফসল উৎপন্ন করা হইবে, বিশেষ বিশেষ খামারের আয়তন কি হইবে, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া উন্নত বীজের যোগান, সারের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, প্রয়োজনমত যন্ত্রাদির সরবরাহ, কৃষির পরিপূরক শিল্পের সংগঠন প্রভৃতিও হইল এইরূপ গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবার সময় এইরূপ সংস্থা ধীরে ধীরে কৃষির যন্ত্রিকরণের দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হয়। বলা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক কৃষিকার্যই (mechanized agriculture) সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য প্রয়োজন হইলে ইহা গ্রামের সমগ্র কৃষি-জমি একত্রিত করিয়া একটি মাত্র জোতে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারে; আবার কাম্য বিবেচনা করিলে এই একত্রিত জমিকে কয়েক খণ্ডে (blocks) বিভক্ত করিয়া তাহাতেও কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে। উপরন্তু, বর্তমানে বিভিন্ন খণ্ডে চাষের ব্যবস্থা করা হইলেও ভবিষ্যতে যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনে ইহাদিগকে একটি মাত্র জোতে পরিণত করিতে পারে। এইভাবে জোতের সংহতিসাধন ছাড়াও ইহা পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে।

কৃষির যন্ত্রিকরণ এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য

পরিকল্পনা কমিশনের ব্যবস্থা

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য হইল এইখানে যে, প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে সমবায়ী কৃষক ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কৃষকের জমি চিরকালের জন্য গ্রাম্য সংস্থার পরিচালনাধীনে ন্যস্ত হয়। জমি গ্রাম্য সংস্থার পরিচালনাধীনে থাকিলেও যৌথ খামারের মত কৃষকের মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকৃত থাকে যদিও বা কোন নির্দিষ্ট খণ্ডের উপর তাহার মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের সহিত ইহার পার্থক্য

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাকে যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) সহিত তুলনা করা চলে। যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক অংশীদারেরই মালিকানা তাহার অংশ (share) অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু কাহারও প্রতিষ্ঠানের কোন

* First Five Year Plan—১৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা।

নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর দাবি থাকে না। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাতে তেমনি কৃষকের অংশ নির্দিষ্ট থাকিলেও জমির কোন নির্দিষ্ট অংশের উপর তাহার দাবি থাকে না। কৃষকের মালিকানা নির্দিষ্ট বলিয়া সে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ (ownership dividend) পাইয়া থাকে এবং সে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিলে তাহার জন্য অপর সকলের মত মজুরিও পাইয়া থাকে।

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনীয়

গুণাগুণ ঃ আদর্শের দিক দিয়া সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাকে সর্বাপেক্ষা কাম্য বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাতে কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের সর্বাধিক সম্ভাবনাই রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে যৌথ খামার-ব্যবস্থার মত ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা-বৃদ্ধির সমস্যা নাই, বলপ্রয়োগের দ্বারা কৃষির সংস্কারসাধনেরও প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, ইহাতে বৃহদায়তনে কৃষিকর্ম সম্পাদিত হইয়া কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি সাধিত হইবে, আধুনিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক কৃষির মাধ্যমে উৎপাদনের ব্যয়হ্রাস করা সম্ভব হইবে। এই দুইটিই উৎপাদনের দক্ষতার পরিচায়ক ও বৃহদায়তনে উৎপাদনের লক্ষ্য। ইহা ছাড়াও এই পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার অধীনে সকলে একই সংস্থার সমমর্যাদাসম্পন্ন সভ্য হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উৎপাদনক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সকলে একই সুযোগ পাইবে। প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, ইহার ফলে সম্পত্তি বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদাজনিত সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তিরোহিত হইবে।* উপরন্তু, গ্রামস্থ সকলেই একই সংস্থার সভ্য বলিয়া গ্রামের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দূর হইবে। ইহাতে অর্থ ও শ্রমের বহু অপচয় রহিত হইবে এবং গ্রামবাসিগণ গঠনমূলককার্যে নিজেদের নিয়োগ করিতে পারিবে।

গুণ ১। ইহা আদর্শ ব্যবস্থা

২। ইহাতে বৃহদায়তনে উৎপাদনের লক্ষ্য সাধিত হয়

৩। ইহা সামাজিক ন্যায়ের অনুগামী

৪। ইহা অপচয় রহিত করে

এইভাবে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইলেও ইহাকে প্রকৃষ্ট রূপ দান করিবার জন্য পদে পদে বিচার-বিবেচনা ও পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে।* ভারতের গ্রামাঞ্চল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আবাস। যাহা কিছু ভাল তাহাকেই গ্রহণ করিবার জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত নহে। সুতরাং গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থার এই ধরনের পুনর্গঠনের কার্যে বিশেষ সতর্ক-ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। সকল সময়ই যাহাতে তত্ত্বের সহিত বাস্তব জীবনের সংগতি বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, জোতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকে একত্রিত করিয়া বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদন করিলে শ্রমের দিক দিয়া ব্যয়সংক্ষেপের (economy of labour) জন্য বহুসংখ্যক কৃষক পূর্ণ বা অর্ধ-বেকার হইয়া পড়িবে। তাহাদের নিয়োগের সমস্যা হইল সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি। এইজন্য অনেকে

প্রতিবন্ধক ঃ ১। গ্রামবাসীর অজ্ঞতা ও কুসংস্কার

২। বেকার-সমস্যা

* irst Five Year Plan—১৯৭ পৃষ্ঠা

বলেন যে এই উদ্বৃত্ত কৃষি-শ্রমিকদের জন্য বিকল্প নিয়োগের যথোচিত ব্যবস্থা না করিয়া সমবায় গ্রাম-পদ্ধতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। বামপন্থিগণ আবার এই ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজিয়া পান না। ইঁহাদের মতে, কেবলমাত্র শ্রমের জন্যই এবং শ্রমের অনুপাতে কৃষি হইতে লভ্যাংশ বণ্টিত হওয়া উচিত—মালিকানার জন্য এবং মালিকানার অনুপাতে নহে। পরিশেষে, সাধারণ সমবায় পদ্ধতি অবলম্বনের বিরুদ্ধে চিরাচরিত যুক্তিগুলিও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবতারণা করা হয়—যথা, পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত লোকের অভাব, যৌথ উদ্যোগের ত্রুটি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎকর্ষ, ইত্যাদি।

৩। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে অভিযোগ

৪। উপযুক্ত লোকের অভাব, ইত্যাদি

পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই এ-সম্বন্ধে পরিকল্পনা করিয়াছে। ফলে কমিশন সহসা কিছু না করিয়া ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থায় রূপান্তরের সময় (transition period) গ্রামস্থ সমুদয় কৃষি-জমির পরিচালনা তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে করিতে হইবে : প্রথমত, কৃষকগণ ব্যক্তিগতভাবে কিছু জমিতে কৃষিকার্য সম্পাদন করিবে ; দ্বিতীয়ত, কিছু কৃষক তাহাদের জমি স্বেচ্ছায় একত্রিত করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করিবে ; এবং তৃতীয়ত, গ্রাম্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কিছু জমি থাকিবে। ক্রমশ ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে জমির পরিমাণ কমাইয়া সম্প্রদায়গত তত্ত্বাবধানে জমির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে ; এবং পরিশেষে গ্রামস্থ সকল কৃষি-জমিই সমবায় গ্রাম ব্যবস্থার দায়িত্বে অর্পণ করা হইবে।*

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার এই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে-কার্যক্রম অবলম্বন করিতে হইবে তাহার মধ্যে আছে অধিকতর কৃষিজ উৎপাদন ; গ্রাম্য শিল্প, কৃষি-ঋণ-ব্যবস্থা, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নয়ন ; এবং সম্প্রদায়গত জীবনের (Community life) প্রসার। সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থার ফলে কৃষি-শ্রমিক বেকার বা অর্ধ-বেকার হইয়া পড়িলে গ্রাম্য শিল্পে তাহার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে। সম্প্রদায়গত জীবনের প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীকে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করা হইবে এবং উন্নততর কৃষিকার্যের সাহায্যে সমবায়ী মনোভাবের বৃদ্ধিসাধন করা হইবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা সার্থকতায় রূপান্তরিত হইবে।

পশ্চিমবংগে ভূমি-সংস্কার (Land Reforms in West Bengal) :

ভারতে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার ব্যাপারে বংগদেশকে পথিকৃৎ হিসাবে নিশ্চয়ই গণ্য করিতে হইবে। অবিভক্ত বাংলাদেশই প্রথমে ভূমি-রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করিয়া এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে স্বাধীন ভারত যখন বিভিন্ন

* First Five Year Plan—২০৭ পৃষ্ঠা

প্রদেশ বা রাজ্য ভূমি-সংস্কার কার্যে অগ্রসর হইল, পশ্চিমবংগ তখন এ-বিষয়ে পশ্চাতেই পড়িয়া রহিল। এমনকি পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার পরও পশ্চিমবংগ বেশ কিছুদিন একরূপ নিশ্চেষ্ট রহিল। অবশেষে যখন অবশিষ্ট রাজ্যসমূহও ভূমি-সংস্কারের পথে পদসঞ্চার করিল এবং কেন্দ্রীয় ভূমি-সংস্কার কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইল তখন পশ্চিমবংগকে সংস্কারক রাজ্যগুলির অনুবর্তী হইতে দেখা গেল। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবংগের বিধানসভায় বিল উত্থাপন করা হইল জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের জন্য। উক্ত বিল ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পশ্চিমবংগের আইনসভার উভয় পরিষদ কর্তৃক পাস হয় এবং ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। এই আইন ১৯৫৩ সালের ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইন (The West Bengal Estates Aquisition Act, 1953) নামে পরিচিত। আইনটি কার্যকর হয় ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল বা বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে।

পশ্চিমবংগে ১৯৫৩ সালের ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইন ও ইহার প্রবর্তন

উপরি-উক্ত আইনের মূল বিষয় হইল এইরূপ: উক্ত তারিখ হইতে কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবংগে রাষ্ট্র এবং রায়ত অথবা ভূমির অন্যান্য প্রকার ব্যবহারকারীর মধ্যে সকলপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন করা হইবে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী জমি হইতে তাঁহাদের নীট আয় অনুসারে ক্ষতিপূরণ পাইবেন। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ব্যাপারে গতিশীলতার নীতি (principle of progression) অনুসরণ করা হইবে—অর্থাৎ, নীট আয় যত অধিক হইবে, ক্ষতিপূরণের হারও তত কমিয়া যাইবে। ক্ষতিপূরণ এইভাবে দেওয়া হইবে:

মধ্যস্বত্বভোগীগণের বিলোপসাধন এই আইনের মূল কথা

ক্ষতিপূরণের হার

নীট আয়ের	প্রথম	৫০০ টাকা	অবধি	২০ গুণ হারে
" "	দ্বিতীয়	৫০০ "	"	১৮ " "
" "	পরবর্তী	১০০০ "	"	১৭ " "
" "	"	২০০০ "	"	১২ " "
" "	"	১০,০০০ "	"	১০ " "
" "	"	১৫,০০০ "	"	৬ " "
" "	"	৮০,০০০ "	"	৩ " "
" "	"	অবশিষ্টাংশের জন্য		২ " "

ক্ষতিপূরণের কিছু অংশ নগদ টাকায় এবং বাকি ঋণপত্রে দেওয়া হইবে। মধ্যস্বত্বভোগিগণের বসতবাটী, বসতবাটী সংলগ্ন জমি, অনধিক ১৫ একর অকৃষি খাস জমি, চা-বাগানের জমি, ফলের বাগানের জমি, পুষ্করিণী প্রভৃতি এবং ২৫ একর * অবধি কৃষি-জমি

* মূল আইনে ৩৩ একর নির্ধারণ করা হইয়াছিল। পরে ইহাকে সংশোধন করিয়া ২৫ একর করা হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না। তবে বসতবাটী, বসতবাটী সংলগ্ন জমি ও অকৃষি-জমি মিলিয়া মোট ২০ একরের অধিক হইতে পারিবে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধনের পর সরকার এই সকল ভূ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে, অথবা অপর কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপরও তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিতে পারে।

জমির উর্ধ্বতন মাত্রা

পশ্চিমবংগে জমিদারী প্রথার বিলোপসাধনের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল যে, বিলোপসাধনের জন্য আইন ভূমি-সংস্কারের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য—ভূমির পুনর্বণ্টন এবং কৃষিজীবীদের খাজনার ভার হ্রাস—কোনটিরই ব্যবস্থা করে নাই। সুতরাং জমিদারী বিলোপের মোট ফল দাঁড়ায় যে, জমিদারশ্রেণীর পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্বভোগী হইবে সরকার। উপরন্তু, অধিকাংশ সমালোচকের মতে, কলিকাতাকে উক্ত আইনের বহির্ভূত করিয়া রাখার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

সমালোচনা : ইহা জমির পুনর্বণ্টন ও খাজনাহ্রাস কোনটিরই ব্যবস্থা করে নাই

বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৫ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে পশ্চিমবংগ ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইনকে কার্যকর করা হয়। ফলে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশিত ভূমির বণ্টনকার্য সমাধা হয় নাই। রায়তদের পক্ষে প্রদেয় রাজস্বের লাঘব ঘটে নাই। ভূমি-স্বত্বভোগের উর্ধ্বতন মাত্রাও নির্ধারিত হয় নাই এবং কলিকাতায় মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা পুরাপুরিই প্রবর্তিত রহিয়া যায়। সুতরাং স্বভাবতই সরকারকে এই সকল কার্য সমাধায় যত্নবান হইতে হয়।

এই সকল সংস্কারকার্য-সাধনে বর্তমান সরকারী প্রচেষ্টা

ইহাদের মধ্যে কলিকাতায় মধ্যস্বত্বলোপের জন্য আইন পাসের ব্যবস্থা হইতেছে এবং জমির বণ্টনকার্য প্রভৃতির জন্য ভূমি-সংস্কার আইন (Land Reforms Act) পাস করা হইয়াছে।

পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন (West Bengal Land Reforms Act, 1956) ঃ পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন পাস হয় ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। এই আইনের উদ্দেশ্য ভূমি-সংস্কারের তিনটি প্রধান নীতিকে কার্যকর করা—যথা, (১) ভূমির পুনর্বণ্টন ; (২) ভূমির স্বত্ব ভোগ বা জমি দখলের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ ; এবং (৩) রায়তদের রাজস্বভারের লাঘব। ভূমি-স্বত্বভোগের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে পূর্বতন জমিদারদের মতই —অর্থাৎ প্রত্যেক রায়ত এবং অন্যান্য ভূমির প্রত্যক্ষ ভোগকারিগণ অনধিক ২৫ একর করিয়া কৃষি-জমি, ১৫ একর করিয়া অকৃষি-জমি এবং বসতবাটী ও উহার সংলগ্ন জমি রাখিতে পারিবে। ভূতপূর্ব জমিদারগণের মতই অকৃষি-জমি এবং বসতবাটী সংলগ্ন জমি মিলিয়া মোট ২০ একরের অধিক হইতে পারিবে না। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা অন্যান্য কৃষিজীবীর মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হইবে।

ভূমি-সংস্কার আইনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য

উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে গতিশীলতার প্রবর্তনের প্রচেষ্টা—এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা

ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন এক নূতন অধ্যায় সূচনার চেষ্টা করিতেছে। ইহা হইল গতিশীলতা (progression)। ভারতে কোন রাজ্য এখনও পর্যন্ত গতিশীল হারে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের পথে অগ্রসর হয় নাই। পশ্চিমবংগে ভূমি-রাজস্বকে নিম্নলিখিতভাবে গতিশীল করার ব্যবস্থা আইনে পরিণত করা হইয়াছে :

	রাজস্বের পরিমাণ
প্রথম ২ একর	রাজস্বের হারের শতকরা ১০ ভাগ
পরবর্তী ৩ "	" " " ১৫ "
" ৫ "	" " " ২০ "
" ৫ "	" " " ২৫ "
অবশিষ্টাংশের	" " " ৩০ "

'রাজস্বের হার' ও ইহা নির্ধারণের সূত্র

এখন 'রাজস্বের হার' (revenue rate) বলিতে কি বুঝায় বলা প্রয়োজন। রাজস্বের হার বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হইবে। প্রধানত ইহা জমির উৎপাদিকা শক্তি, গড় উৎপাদন, উৎপন্ন শস্যের বাজার দাম, জমির বাজার দাম প্রভৃতি অনুসারে নির্ধারিত হইবে। সাধারণত উৎপন্নের $\frac{১}{১০}-\frac{১}{৫}$ অংশ এবং জমির বাজার দামের শতকরা ২ ভাগ রাজস্বের হার বলিয়া ধরা হইবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, জমিদারী বিলোপের পর খাজনা (Rent) শব্দটির পরিবর্তে রাজস্ব (Revenue) শব্দটি সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইতেছে।

আইনে ভাগচাষী বা বর্গাদার এবং জোতের মালিকের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের বণ্টন সূত্রও নির্ধারিত হইয়াছে। মালিক যদি কৃষিকার্যের ব্যয় (শ্রম ছাড়া) বহন করে তবে ফসলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং ব্যয় বহন না করিলে অর্ধেক পাইবে। সুতরাং মালিক অর্ধেকের বেশী কোন ক্ষেত্রেই পাইবে না।

পশ্চিমবংগ ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ভূমি বণ্টন, রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্য এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। ১৯৫৯ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত মাত্র ৬৭ হাজার একর জমি পুনর্বণ্টিত হইয়াছে;* এবং জমির মালিক অনেকক্ষেত্রে বর্গাদারদের নিকট হইতে মোট উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশী আদায় করিতেছে। যাহা হউক ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় পশ্চিমবংগের বেলাতেও আশা করা যায় যে ভূমি-সংস্কার কার্য বাকী দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আরও ত্বরান্বিত হইবে।

* ২৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the different systems of Land Tenure that prevailed in India until recently. (C. U. B. Com. 1954) How would you classify the Land Tenures that obtain at present ?

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত : মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধনের ফলে বর্তমানে মাত্র দুই প্রকারের ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থা আছে—(১) যাহারা সরাসরি রাষ্ট্রের নিকট হইতে গ্রহণ করে, (২) যাহারা প্রজা হিসাবে মালিকদের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করে…২৩৩-২৩৭ এবং ২৪৪ পৃষ্ঠা]

2. "Rent of agricultural land in India depends on the inter-action of three forces—Custom, Competition and Legislation." Discuss the statement.

(C. U. B. Com. 1953)

[ইংগিত : ভারতে ভূমি-রাজস্ব প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইনের সম্মিলিত ফল হইলেও বর্তমানে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের ফলে আইনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে…২৩৭-২৩৯ পৃষ্ঠা]

3. Discuss the Land Policy under our Planned Economy. How far has the policy been implemented so far ? [২৪২-২৪৬ পৃষ্ঠা]

4. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricultural holdings in India. (C. U. B. Com. 1959) [২৪৩ এবং ২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা]

5. Is the land revenue a tax or rent ? Give reasons for your answer.

[২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা]

6. Briefly describe the process of Land Reforms in West Bengal.

[ইংগিত : আলোচনা ১৯৩৮ সালের ভূমি-রাজস্ব কমিশন হইতে শুরু করিয়া ভূমি-সংস্কার আইনে আসিয়া শেষ করিতে হইবে…২৫৭-২৬০ পৃষ্ঠা]

7. Examine the case for Co-operative farming in India. What methods would you suggest for the development of Co-operative farming in this country ?

(C. U. B. A. 1959) [২৪৯-২৫৫ পৃষ্ঠা]

8. Describe the main features of the system of Co-operative village management and explain the possible advantages and disadvantages of the system.

(C. U. B.A 1952) [২৫৪ ২৫৭ পৃষ্ঠা]

ষোড়শ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও কৃষির পুনর্গঠন

(The State and Agrarian Re-construction)

কৃষির সম্পর্কে ভারতে রাষ্ট্র যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা হইতে সে সম্বন্ধে একরূপ সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। তবুও রাষ্ট্রের এই ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া প্রয়োজন মনে হয়। নিম্নে তাহাই করা হইতেছে।

অর্ধোন্নত দেশের কৃষির পুনর্গঠন (Agricultural Re-construction in Underdeveloped Countries) : শিল্পের অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কৃষিই এই সকল দেশের প্রধান জাতীয় শিল্প। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিজীবী এবং মাত্র শতকরা ১০ ভাগ শিল্প হইতে জীবিকার্জন করে। বাকী অংশ চাকরি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। মোটামুটি মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকের মত অর্জিত হয় কৃষি ও অনুরূপ কর্মসমূহ হইতে। সংগঠিত কারখানা শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প হইতে সংগৃহীত হয় যথাক্রমে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ও ১০ ভাগ। বাকিটা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া যায়।

কৃষির গুরুত্ব

অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও কৃষিই সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোত, জমিদারী প্রথা ও বহুসংখ্যক কৃষকের ভূমিহীনতা, কৃষিকার্যের আদিম পদ্ধতি, কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়ের অব্যবস্থা, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির অভাব, ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে মহাজন ও ব্যবসাদারের প্রাদুর্ভাব—এইগুলিই এই সকল দেশের কৃষি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

কৃষির অনগ্রসরতা

এই সমস্ত সমস্যার সমাধান ভিন্ন কৃষির এবং স্বভাবতই ইহার উপর নির্ভরশীল জাতীয় অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করার কথা চিন্তা করা যায় না। এই কার্য যে রাষ্ট্রকেই সম্পাদন করিতে হইবে ইহাও বর্তমানের অন্যতম স্বীকৃত নীতি। বস্তুত, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষির সুসংগঠন অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক উপাদান (primary factor of development) বলিয়া পরিগণিত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়নই এই দিকেই পথিকৃতের কার্য করে। জারের সময়ে রাশিয়ায় কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ছিল ভারতেরই মত। সোবিয়েত আমলে কৃষকগণকে রাষ্ট্রাধীন যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃষির অভাবনীয় উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইয়াছে। নয়া চীন এই দিকে আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নয়া চীনে সমবায় পদ্ধতিতে অত্যল্প সময়ের মধ্যে কৃষির আশাতীত

কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

উন্নয়ন সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন কৃষিনীতি সফলতা অর্জন করিতে পারে না। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া কৃষির উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করা হইলে তবেই কৃষির উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া চীনে ইহাই করা হইয়াছে, এবং বর্তমানে সকল অর্ধোন্নত দেশই এই পথে অল্পবিস্তর পদসঞ্চার করিয়াছে বলা যায়।

ভারতের কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা

অর্ধোন্নত দেশে কৃষির সুসংগঠনের জন্য সরকারকে যে-যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার ইংগিত কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটি হইতে সহজেই পাওয়া যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ কৃষি-জোতকে একত্রিত করিয়া জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ভূমি-স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া কৃষককে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস করিতে হইবে। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিককে ভূমিদান এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণের জন্য কৃষককে গ্রাম্য মহাজনের উপর নির্ভরশীল রাখা চলিবে না। যাহাতে কৃষক সহজে এবং অল্প সুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সমবায় সমিতি গঠন, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তারপর কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। সমবায় সমিতি এ-বিষয়েও শ্রেষ্ঠ পন্থা। পর্যাপ্ত সংখ্যায় সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা হইলে ফড়িয়া, ব্যাপারী, আড়ৎদার, মহাজন প্রভৃতির মত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের পক্ষে আর মোট শস্যমূল্যের মোটা অংশ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া হাটবাজারে ওজন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শস্য মজুত রাখার জন্য গুদামঘর স্থাপন করা প্রয়োজন।

কৃষির সুসংগঠনের জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহ

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ কিন্তু বিশেষ কার্যকর হইবে না যদি-না কৃষকের মধ্যে নূতন পদ্ধতি এবং নূতন জীবন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করা যায়। এইজন্য একটি সম্প্রসারণ সেবা (extension service) গঠন করা প্রয়োজন।* এই সেবায় একদল কর্মী থাকিবে যাহারা গ্রামাঞ্চলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নবজীবনের বার্তা বহন করিয়া বেড়াইবে। সংগে সংগে অবশ্য অন্যান্যভাবেও প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। পরিশেষে কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া নূতন জীবনের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। প্রধানত এই দুই উদ্দেশ্যেই ভারতে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা গঠন করা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলি খোলা হয়। বর্তমানে অবশ্য জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য অপসারণ করিয়া উভয়কে একই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে

* ভারতে এই ধরনের কর্মী গ্রামসেবক এবং তাহাদের কার্য 'জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা' বলিয়া অভিহিত।

ভারতে কৃষি সম্পর্কে রাষ্ট্র (The State in relation to Agriculture in India) ঃ সেদিন পর্যন্ত কৃষি সম্পর্কে সরকারের নীতি ছিল নিষ্ক্রিয় স্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire*)। কারণ, সরকার ছিল বিদেশী সরকার। ইংরাজরা এদেশে আসিবার পর ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে যে-শিল্পবিপ্লব সংঘঠিত হয় তাহা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিশেষ আঘাত হানে। প্রথা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের নীতির উপর ভিত্তিশীল কৃষি-ব্যবস্থাকে হঠাৎ আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের জন্য বিদেশী সরকার কৃষি-উন্নয়নের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা করে নাই। তবে নিজস্ব স্বার্থে ও অবস্থার চাপে বিদেশী শাসক বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কার্য করিয়াছে একথা অনস্বীকার্য। ইহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলগুলির স্বার্থে ভারতে তুলা উৎপাদনের প্রচেষ্টা, দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য কৃষি-দপ্তর সৃষ্টি ইত্যাদিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই কৃষির উন্নয়নকে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি-দপ্তর (Imperial Department of Agriculture) এবং প্রদেশগুলিতে একটি করিয়া প্রাদেশিক কৃষি-দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা ঃ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার নীতি

উন্নয়নমূলক কার্যে কিছু মনোনিবেশ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সরকার উন্নয়নমূলক কার্যে আরও অগ্রসর হয়। ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাস করে এবং ১৯০৬ সালে সর্ব-ভারতীয় কৃষি কৃত্যকের (All-India Agricultural Service) সংগঠন করে। পুসাতে (Pusa) একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানও খোলা হয়। ইহার সহিত সংযুক্ত করা হয় একটি কৃষি-খামার এবং একটি কৃষি-কলেজ। স্থানে স্থানে প্রাদেশিক গবেষণাগার ও পরীক্ষামূলক কৃষি-খামারও প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কারের দ্বারা প্রদেশে কৃষিকে হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কৃষির উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয় প্রাদেশিক কৃষি-দপ্তরগুলির উপর। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য হয় কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং গাছপালা ও পশুরোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তবে প্রদেশগুলিতে অর্থের অভাবে কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই।

১৯২৬ সালে ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Indian Agriculture) নিযুক্ত করা হয়। কমিশন তাহার রিপোর্টে কৃষির উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের কৃষিনীতি সম্পর্কে বহু সুপারিশ করে। সুপারিশের অধিকাংশই গৃহীত হয়, কিন্তু ১৯২৯ সাল হইতে সুরু করিয়া বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের দরুন উহাদিগকে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

কৃষির উপর রাজকীয় কমিশন

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর সরকার কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অধিক যত্নবান হয়। কিন্তু ভূমি-স্বত্ব আইন বা ঋণ বিষয়ে সংস্কার ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করা হয় না। ইহার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্বরু হইলে ভারতীয় কৃষির দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়। অবস্থার চাপে সরকার ১৯৪৩ সালে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান স্বরু করে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন স্বফল ফলে না।

পরবর্তী যুগ স্বরু হয় দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা হইতে। স্বাধীনতালাভের পর সরকারী কৃষিনীতিও পরিবর্তিত হয়। সরকার সক্রিয়ভাবে কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়। উপরন্তু দেশবিভাগের ফলে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে সরকারকে এ-বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হইতে হয়। সরকার খাদ্য ব্যাপারে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য নূতনভাবে আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করে।* কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য ও ঋণদান করিতে থাকে। রাজ্য সরকারগুলি আবার কৃষকশ্রেণীর সাহায্যার্থে অর্থ ও ঋণ প্রদান করিতে থাকে।

খাদ্য-ঘাটতির বিরুদ্ধে অভিযান

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি (Agriculture under Planned Economy) :

মোটামুটিভাবে দেশবিভাগের তিন বৎসর পরে, ১৯৫০-৫১ সাল হইতে স্বরু হয় পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আসিয়া আমরা দেখিতে পাই অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের সহিত কৃষির সর্বাংগীণ উন্নয়নের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি অনুসারে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে সর্বপ্রধান স্থান নির্দেশ করা হয়। পরিমার্জিত হিসাবে (revised estimates) মোট ব্যয় ২,৩৫৬ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয় ৩৫৭ কোটি টাকা। ইহা মোট বরাদ্দের শতকরা ১৫ ভাগের উপর। ইহার উপর সেচ ও বন্যা নিরোধ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের শতকরা ১৭ ভাগ। অর্থাৎ কৃষি ও জলসেচ খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩২ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কৃষিকে অগ্রাধিকার দিবার সপক্ষে যুক্তি ছিল যে, অধিক খাদ্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যতিরেকে অন্যান্য দিকে প্রসারসাধন করা সম্ভব নয়। কৃষির ক্ষেত্রে পরিমার্জিত পরিকল্পনার (Revised Plan) লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৪ ভাগ, তুলার উৎপাদন শতকরা ৪৫ ভাগ, পাটের উৎপাদন শতকরা ৬৪ ভাগ, ইক্ষুর উৎপাদন শতকরা ১৩ ভাগ এবং তৈলবীজের উৎপাদন শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি করা। সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য ছিল মোট ৫ কোটি একর সেচসমন্বিত জমির পরিমাণকে বৃদ্ধি করিয়া ৭ কোটি একরের কাছাকাছি লইয়া যাওয়া।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি

* ২১৫-১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিকল্পনার ফলাফল আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে শতকরা ২৯·৬ ভাগ এবং কৃষিজ পণ্যের সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনবৃদ্ধি অনুমানমত না ঘটিলেও মোট কৃষিজ উৎপাদনের সূচকসংখ্যা (index of agricultural production) পরিকল্পনাপূর্ব সময়ের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একরের মত ; এবং ইহার ফলে মোট কর্ষিত জমির মধ্যে সেচসমন্বিত জমির শতকরা ভাগ ১৬ হইতে ১৮-র উপর আসিয়া দাঁড়ায়। পতিত জমির পুনরুদ্ধার ইত্যাদির দ্বারা নীট কর্ষিত জমির পরিমাণকে (net area sown) বাড়াইয়া ২৯ কোটি ৩৪ লক্ষ একর হইতে প্রায় ৩২ কোটি একরে লইয়া যাওয়া হয়।* পরিশেষে প্রায় ৮ কোটি জনসংখ্যা সমন্বিত ১ লক্ষ ৪০ হাজার গ্রাম সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আসে।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ঠিক করা হয় যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদনের উপর ১ কোটি টন বা শতকরা ১৫ ভাগ অধিক খাদ্যশস্য, শতকরা ২৭ ভাগ অধিক তৈলবীজ, শতকরা ২২ ভাগ অধিক ইক্ষু গুড়, শতকরা ৩১ ভাগ অধিক তুলা এবং শতকরা ২৫ ভাগ অধিক পাট উৎপাদন করা হইবে। কিছুদিন পরেই খাদ্যসংকট হেতু কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির এই লক্ষ্যসমূহের কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হয়। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টন বা শতকরা ২৫ ভাগে এবং মোট কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে শতকরা ২৮ ভাগে লইয়া যাওয়া হয়। সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য হইল আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিকে সেচসমন্বিত করা। ইহা ছাড়া অধিকতর সার ব্যবহার, সংরক্ষণকারী খাদ্য (protective food) উৎপাদনের গুরুত্ব প্রদান এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে সমগ্র গ্রামবাসীকে আনয়ন করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমানে অবশ্য সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার গঠন-পদ্ধতিও লক্ষ্যের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রাসংকটজনিত ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার যে ছাঁটকাট ও রদবদল করা হইয়াছে তাহাতে কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করিয়া ৫৬৮ কোটি টাকা হইতে ৫১০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।** খাদ্যোৎপাদন ও সামগ্রিক কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যের অবশ্য কোন পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই। তবে মনে হয় যে ব্যয়হ্রাস হেতু ঐ লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির পুনর্গঠনের জন্য অবলম্বিত পদ্ধতিসমূহ মোটামুটি একই। ইহাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) সেচ-ব্যবস্থার

* Review of the First Five Year Plan.

** উর্ধ্বতন ব্যয়ে (ceiling) অবশ্য ৫৬৮ কোটি টাকাতেই নির্দিষ্ট আছে, তবে আশংকা করা হইতেছে যে ৫১০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করা সম্ভব হইবে না।

প্রসার ও অধিক সার প্রয়োগ; (২) গো-পশ্বাদির জাতের উন্নয়ন; (৩) পতিত জমির পুনরুদ্ধার; (৪) বনভূমি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ; (৫) জোতের সংহতিসাধন, ভূমি-সংস্কার, সমবায় পন্থায় কৃষিকার্য, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রভৃতি; (৬) কৃষি-ঋণের সুব্যবস্থা; (৭) উন্নততর বীজ ব্যবহার, জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য চাষ এবং অন্যান্য পদ্ধতিগত উন্নয়ন; (৮) সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন; এবং (৯) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা।

কৃষির উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত পন্থা

ইহাদের মধ্যে প্রথম আটটি পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা বিভিন্ন অধ্যায়ে ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। এখন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পরে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্পর্কে আরও আলোচনা করা হইবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (Community Development Projects and National Extension Service): সমাজোন্নয়ন শব্দটি ব্যবহৃত হইতেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককাল হইতে। পূর্বে ইহার পরিবর্তে 'গ্রামোন্নয়ন' 'সংগঠনমূলক কার্য' ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা হইত। ইংরাজী শব্দ 'কমিউনিটি' বলিতে আবার পূর্বে ধর্মীয় বর্ণগত বা অর্থ নৈতিক সম্প্রদায় বুঝাইত। বর্তমানে কমিউনিটি শব্দটি দ্বারা সমগ্র গ্রাম্য সমাজকে বুঝান হয়। গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে জাতিধর্ম ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলেরই স্বার্থ যে এক —সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ইহাই হইল প্রতিপাদ্য বিষয়।* সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটি: (১) গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা; (২) গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ ত্রুটি দূর করা। উদ্দেশ্যদ্বয়ের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হইয়াছে: সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা "সমগ্র সমাজের সহায়তায়, এবং সম্ভব হইলে সমাজেরই উদ্যোগে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসাধন করিতে চায়; সমাজের পক্ষে উদ্যোগ সম্ভব না হইলেও উহাকে অন্তত সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে।"† এখানে 'সমাজ' (Community) বলিতে গ্রামীণ সমাজকে বুঝাইতেছে মোটকথা, গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও গ্রামীণ সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলাই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

ভারতে গ্রাম ও কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা মোটেই নূতন নহে। গুরগাঁও-এ সমাজসেবী ব্রায়নে, বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবংগের সিংগুরে সর্ব-ভারতীয় স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিদ্যার

* Report of the Team for Study of Community Projects.

† Community Development Programmes in India, Pakistan and Philippines.

(All India Institute of Health and Hygiene) প্রতিষ্ঠাতৃগণ গ্রামোন্নয়নের এবং সরকার বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও 'গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার' আদর্শকে তাঁহার গঠনমূলক কার্যক্রমের অংগীভূত করিয়াছিলেন। ইহাদের ফল কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই।

গ্রামোন্নয়নের পূর্বতন প্রচেষ্টা

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে। ঐ বৎসর সংযুক্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) সেবাগ্রাম, গোরক্ষপুর ও এটাওয়াতে, বোম্বাই-এর সর্বোদয় কেন্দ্রসমূহে এবং মাদ্রাজের ফরাকা উন্নয়ন পরিকল্পনায় গভীরভাবে গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাদের মধ্যে গোরক্ষপুর ও এটাওয়াতে কর্ম পরীক্ষামূলকভাবে সুরু করা হইয়াছিল। এই সকল প্রচেষ্টার সফলতায় উৎসাহিত হইয়া পরিকল্পনা কমিশন সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে উহার পদ্ধতির প্রবর্তন করে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত

গভীরভাবে গ্রামোন্নয়নের এই সকল প্রচেষ্টার সফলতা এবং পূর্বতন গ্রাম ও কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টার বিফলতার ফলে পরিকল্পনা কমিশন এ-বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছিল যে, কৃষকের জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত; সুতরাং বিক্ষিপ্তভাবে এই দিক বা ঐ দিকের উন্নয়নের প্রচেষ্টা বিফল হইতে বাধ্য। গ্রামীণ জীবনের যদি কাম্য সংস্কারসাধন করিতে হয়, কৃষিকে যদি সার্থকভাবে পুনর্গঠিত করিতে হয় তবে সকল দিক দিয়াই সমস্যাসমূহকে আক্রমণ করিতে হইবে, গ্রাম্য জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইতে হইবে। উপরন্তু জনসাধারণের সমবায়িক সহযোগিতার ভিত্তিতে এইরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিলে, কৃষকগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে না পারিলে ইহা সার্থক হইতে পারে না। ইহার জন্য গ্রামবাসিগণকে বুঝাইতে হইবে যে, এইরূপ প্রচেষ্টা তাহাদেরই বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। সমবায়িক ভিত্তিতে গ্রামবাসিগণের সহযোগিতা এবং উৎসাহই অবশ্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উপর চাই সংগঠন এবং প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য। এই দুইটি হইল সরকারের কার্য। সরকার অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে এবং কার্যক্রম গড়িয়া তুলিয়া প্রচেষ্টাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করিবে। পরিশেষে আছে গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীর (village-level worker) ভূমিকা। কৃষককে গ্রামোন্নয়নের কার্যে উৎসাহিত করিবে, কৃষির উন্নয়নের জন্য তাহার গৃহের দ্বারদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের বার্তা পৌছাইয়া দিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নহে—গ্রাম-পর্যায়ের কর্মী। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীই হইল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সংগঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ

গ্রাম-পর্যায়ের কর্মীর ভূমিকা

বলা হইয়াছে যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল সর্বতোভাবে গ্রাম্য জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়ন। এই সর্বাংগীণ উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল : (১) সকল প্রকার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার দ্বারা কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি, (২) গ্রাম্য পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতিসাধন ; (৩) গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধ-নিয়োগ (under-employment) সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা ; (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ; (৫) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ; (৬) আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ; (৭) উন্নততর গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা ; (৮) হস্তচালিত ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুনর্বাসন ; এবং (৯) সমবায়ের প্রসার।

উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

সংক্ষেপে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে : অল্পবিস্তর ৪৫০-৫০০ বর্গমাইল আয়তনের এবং ২ লক্ষ জনসংখ্যা ও ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর কৃষি-জমিসমন্বিত ২০০-৩০০ গ্রাম লইয়া একটি পরিকল্পনা অঞ্চল (project area) গঠিত। প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চল তিনটি উন্নয়ন ব্লকে (development block) বিভক্ত। উন্নয়ন ব্লকের গ্রামগুলি আবার পাঁচটি করিয়া এককে (units) বিভক্ত। প্রত্যেক এককভুক্ত গ্রামগুলির জন্য একজন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামসেবক বা গ্রাম-পর্যায়ের কর্মী নিযুক্ত আছে। সে-ই দ্বারে দ্বারে গ্রামোন্নয়নের বার্তা বহন করিয়া বেড়ায়, গ্রামবাসিগণকে সমবায়িক সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, মহিলা মহল প্রভৃতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করে ইত্যাদি। প্রথম প্রথম উপর হইতে নির্দেশ প্রদান করা হইলেও বর্তমানে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করার ভার পঞ্চায়েত বা জনসাধারণের সংগঠনের (people's organisation) উপর ন্যস্ত। পঞ্চায়েতের সহিত সহযোগিতা করে মহিলা মহল, সমবায় সমিতি ইত্যাদি। গ্রামসেবক পঞ্চায়েতের সহযোগেই কাজ করে।

সংগঠন

সরকারের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধান অর্থসাহায্য বণ্টন এবং পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক ব্লকে একজন করিয়া ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী (Block Development Officer) এবং প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চলে একজন করিয়া পরিকল্পনা পরিচালনা কর্মচারী (Project Executive Officer) আছেন। ইঁহাদের পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া 'জিলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি' (District Planning and Development Committee) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে জিলা কমিটির উপরে আছে একটি করিয়া রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (State Development Committee)। এই কমিটি নীতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রের কার্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব বহন করে। দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান ও নির্দেশের ভার অবশ্য রাজ্যের উন্নয়ন কমিশনারের (Development Commissioner) হস্তে ন্যস্ত। উন্নয়ন কমিশনারকে সহায়তা করিবার এবং পরামর্শ দিবার জন্য কৃষিবিদ্যা, পশুপালন ও পশু-চিকিৎসা, সমবায় ও পঞ্চায়েত, সামাজিক শিক্ষা, পথনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটিও (Technical Advisory Committee) আছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি নির্ধারিত হয় সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে। এই কার্য সম্পাদনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee) আছে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়া এই কমিটি গঠিত। পরিকল্পনা কার্যকর করিবার দায়িত্ব অবশ্য ১৯৫৬ সালে গঠিত সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Community Development) উপর ন্যস্ত। ১৯৫৯ সালে সমবায় দপ্তরের সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমবায় ও সমাজোন্নয়নকে একই কার্যক্রমভুক্ত করা হইয়াছে।

সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: মূল পরিকল্পনা এবং মিশ্র পরিকল্পনা। মূল পরিকল্পনাগুলিতে (basic projects) সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। মিশ্র পরিকল্পনাগুলি (mixed projects) ইহার উপর মধ্য ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পগুলির উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যও সম্পাদন করে।

শ্রেণীবিভাগ: মূল ও মিশ্র পরিকল্পনা

বলা হইয়াছে যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে প্রবর্তিত হয়। ২রা অক্টোবর হইল মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান আদর্শ ছিল ভারতের অগণিত গ্রামের উন্নয়ন। সুতরাং শুভদিনেই কার্যারম্ভ হয়। মাত্র ২৭,৩৮৮টি গ্রাম ও ১ কোটি ৬৭ লক্ষ জনসংখ্যা সমন্বিত ৫৫টি উন্নয়ন ব্লক লইয়া সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য সুরু করা হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে ইহা বাড়িয়া ৫৬,৮৮৭টি গ্রাম ও ৩ কোটি ৩২ লক্ষ জনসংখ্যা সমন্বিত ৩৭২টি ব্লকে দাঁড়ায়।* ১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সাত বৎসর পূর্ণ হইলে দেখা যায় যে ঐ পরিকল্পনা ৩ লক্ষ ২৯ হাজার গ্রাম সমন্বিত ২৫৫২টি ব্লকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ৬০ ভাগের কাছাকাছি ইহার অধীনে আসিয়াছে **

প্রবর্তন ও প্রসার

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণকে গ্রামসমূহের সামাজিক ও আর্থিক সংগঠনের রূপান্তরের যথাক্রমে পদ্ধতি (method) এবং এজেন্সী (agency) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। † এই এজেন্সী বা মাধ্যমের সূত্রপাত হয় অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান সম্পর্কিত কৃষ্ণমাচারী কমিটির (১৯৫২) সুপারিশের ফলে। কৃষ্ণমাচারী কমিটি গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে পল্লীবাসিগণকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি সেবামূলক সংগঠন সৃষ্টি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই

উদ্দেশ্য

* Review of the First Five Year Plan.

** Report of the Ministry of Community Development.

† First Five Year Plan—২২৩ পৃষ্ঠা।

সংগঠনের কার্য বা সেবার উদ্দেশ্য হইবে গ্রামবাসিগণকে গ্রামোন্নয়ন পরামর্শ দেওয়া ও উদ্বুদ্ধ করা। এই সুপারিশ অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকার্য সুরু করা হয় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্তনের ঠিক এক বৎসর পরে—১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে।

১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ছিল গ্রামাঞ্চলের উন্নতিসাধনে (intensive development) নিযুক্ত, কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যপ্রকৃতি ছিল অপেক্ষাকৃত অগভীর (less intensive)। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় পরামর্শ দেওয়া হইত, বীজ সার যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দ্বারা অথবা সরাসরি আর্থিক সাহায্য করা হইত; কিন্তু জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও পরামর্শই ছিল প্রধান। উৎসাহ ও পরামর্শের ফলে সেবাকেন্দ্রের বেশ কিছুটা উন্নতিসাধন হইলে পর ইহাকে পুরাপুরি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রে পরিণত করা হইত। এইভাবে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ছিল একই উন্নয়ন কার্যক্রমের দুইটি পর্যায়।* সুতরাং সমাজোন্নয়নের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা পথ প্রস্তুত করা হইত।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে পূর্বতন পার্থক্য

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই পার্থক্য দূর করিয়া জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকে সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখন জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা দ্বারা সমাজোন্নয়নের পথ প্রস্তুত করা হয় না, কোন স্থানে সমাজোন্নয়ন ক্ষেত্র খুলিবার পূর্বে দেখা হয় যে ঐ স্থানের অধিবাসীরা আত্মোন্নয়নের উপযুক্ত কি না। এক বৎসর এইভাবে পরীক্ষা করিয়া ৫ বৎসরের জন্য সমাজোন্নয়নের কার্য চালান হয়। তারপর আরও কয়েক বৎসর ধরিয়া ঐ কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান ও উহাকে সাহায্য করিয়া যাওয়া হয়।

বর্তমানে পার্থক্য অপসারিত হইয়াছে

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ছাড়াও রাজ্যগুলির গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ১০ কোটি টাকা ধরা হয়। উক্ত ৯০ কোটি টাকার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয় হয় ৪৬ কোটি টাকা।† দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২০০ কোটি টাকা। সমাজোন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বিবৃতি অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪০০ কোটি টাকার মত বরাদ্দ করা হইবে। নির্দিষ্ট লক্ষ অনুসারে ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস বা সুরু হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন কার্য সমাপ্ত হইবে—অর্থাৎ ঐ তারিখের মধ্যে দেশের সমগ্র গ্রামবাসী এই পরিকল্পনার অধীনে আসিবে।

ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যয়

---

* Second Five Year Plan—২৩৭ পৃষ্ঠা।

† Review of the First Five Year Plan.

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মূল্যায়ন (Evaluation of Community Projects and National Extention Service) : সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, গ্রামবাসীরা ইহার দ্বারা কতদূর উপকৃত হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় নিয়মিত বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা হয়। ইহার জন্য সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তরের সহিত সম্পর্কবিহীন একটি কার্যক্রম মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluation Organisation) আছে। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে এই সংগঠন তিনবার মূল্যায়নকার্য সম্পাদন করে।

তৃতীয় মূল্যায়ন

ইহার মধ্যে তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয় যে সমাজোন্নযন কার্যক্রম গ্রামবাসীদিগের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে ততটা সার্থক হয় নাই যতটা সার্থক হইয়াছিল জনগণ ও সরকারী কর্মচারীদিগের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন। "সমাজোন্নয়ন ব্লকের জনসাধারণ সমাজ উন্নয়ন পদ্ধতির কার্যকারিতায় আজ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে।"

প্রথম পরিকল্পনার ত্রুটি

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রামবাসীর দৃষ্টিভংগির প্রসারসাধনের প্রচেষ্টা অপেক্ষা পথঘাট, বিদ্যালয়, গৃহনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, জলসরবরাহ প্রভৃতির দিকেই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। রিপোর্ট অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভবিষ্যতের সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীর দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন-সাধনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এইরূপ সুপারিশই করা হয়। কারণ, এই কার্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৃষ্টি-আকর্ষক হইলেও ইহার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী।

উক্ত তৃতীয় মূল্যায়ন অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে সফলতা অতি সামান্যই হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার ফল সকল উন্নয়ন ব্লকের সকল গ্রামে সমান হয় নাই। উক্ত রিপোর্টে এই উক্তি করা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনা পরিচালকগণ (Project Officers) দৃষ্টি-আকর্ষক বাহ্যিক উন্নয়ন দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া যে সকল গ্রাম হইতে সহজেই সমাজোন্নয়নের ডাকে সাড়া পাইয়াছিলেন, সেই সকল গ্রামেই অধিকতর অর্থ ও কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ব্লকভুক্ত অন্যান্য গ্রামের মধ্যে একটা হতাশার সঞ্চার হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এইরূপ কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রিপোর্টে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ :

ভবিষ্যতে যাহাতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য আরও কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়—যথা, (১) টেকনিক্যাল বিভাগসমূহকে (technical departments) শক্তিশালী করা, (২) জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের (popular institutions) সংগঠন, এবং (৩) সম্প্রসারণ এজেন্সী, টেকনিক্যাল বিভাগসমূহ ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

পর্যালোচনাকারী দলের সুপারিশ (Recommendations of the Study Team): প্রধানত এই সকল সুপারিশের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরকরণের অসুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্যক্রমের পর্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ফলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার সংগঠনগত সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৭ সালে শ্রীবলবন্ত মেটার নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনাকারী দল (a Study Team) নিযুক্ত হয়। এই দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ঐ সালেরই (১৯৫৭) নভেম্বর মাসে। রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(১) প্রতি সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে ;

(২) কৃষির পদ্ধতিগত উন্নয়ন করিতে হইবে ;

(৩) জিলা-সংগঠনে পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে।

প্রথমটি সম্পর্কে বলা হয় যে এ-পর্যন্ত সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে প্রধানত পথঘাট নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ের উপরই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে কারণ এগুলিই বিশেষ জনপ্রিয়, সহজসাধন-যোগ্য এবং চমকপ্রদ। কিন্তু এগুলি অপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল কৃষি ও গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধিসাধন। আর্থিক সমৃদ্ধি সাধিত হইলে সমাজ-কল্যাণকর কার্যাবলী সহজেই এবং একরূপ আপনা হইতেই সম্পাদিত হইবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য ছিল যে যেখানেই জলসেচের সুবিধা আছে সেখানেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; চাউল ও গম উৎপাদনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে ; এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমবায় প্রথায় উন্নত কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয় ক্ষেত্রটিতে জিলার সংগঠনের গণতান্ত্রিককরণের (democratisation) কথা বলা হয়। প্রতি ৮০ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করিয়া 'পঞ্চায়েৎ সমিতি' থাকিবে। এই পঞ্চায়েৎ সমিতির হস্তে কৃষির উন্নয়ন, ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ, স্থানীয় শিল্প সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন প্রভৃতির ভার থাকিবে। রাজ্য সরকার মাত্র বিভিন্ন পঞ্চায়েৎ সমিতির মধ্যে সংহতিসাধনের কার্য করিয়া যাইবে—সমিতির দৈনন্দিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

ইহা ছাড়াও পর্যালোচনাকারী দল আর একটি উক্তি করে। ইহা হইল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্র পরিব্যাপ্ত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং ঐ সময়কে আরও ৩ বৎসর বর্ধিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে 'মূল্যায়ন সংগঠন' (Evaluation Organisation) দ্বারা দুইবার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দল (Evaluation Mission) দ্বারা একবার সমাজোন্নয়নের পরিকল্পনার মূল্যায়ন করা হয়। ইহার মধ্যে 'মূল্যায়ন সংগঠনের' শেষ বা পঞ্চম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে।

পঞ্চম মূল্যায়ন রিপোর্ট

প্রথমোক্ত রিপোর্টটিতে সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রগুলির গঠন ও কার্যাবলীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়। নিম্নে রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল:

বিভিন্ন ত্রুটিবিচ্যুতি ও সুপারিশ

কেন্দ্রগুলির আয়তন সম্বন্ধে রিপোর্টের বক্তব্য হইল যে গড়ে ইহারা ৭৫ হাজার করিয়া জনসংখ্যা লইয়া গঠিত। কিন্তু গঠন সম্পর্কে সুপারিশ ছিল যে, জনসংখ্যা ৬৬ হাজারের অধিক হওয়া উচিত নয়, হইলে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং কেন্দ্রগুলিকে ক্ষুদ্রতর আকারে পরিণত করা প্রয়োজন।

উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর স্বল্পতা উন্নয়ন-কেন্দ্রগুলির সফলতার পথে আর একটি বিশেষ অন্তরায়। ব্লক উন্নয়ন অফিসার (Block Development Officer) শতকরা ৪০ ভাগ কেন্দ্রেই নাই; আবার যেখানে আছে সেখানে তাঁহাদের শিক্ষা পর্যাপ্ত নহে; বিশেষজ্ঞদের অনুপাত আরও কম। সুতরাং ব্লক উন্নয়ন অফিসার ও বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও তাঁহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। সমাজোন্নয়ন সেবাকেন্দ্রগুলিতে মাথাপিছু ৩·৬০ নয়া পয়সা করিয়া ব্যয় করিবার কথা ছিল। কিন্তু হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, কার্যক্ষেত্রে মাথাপিছু ২ টাকা করিয়া ব্যয় করা হইয়াছে। দুইটি কারণে ইহা ঘটিয়াছে: (ক) বাজেটে মোট পরিকল্পিত ব্যয়ের শতকরা ৬৩ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং (খ) অধিকাংশ সময় বরাদ্দ মঞ্জুরীতে অযথা বিলম্ব ঘটিয়াছে। এই দুইটি বিষয়েরই প্রতিবিধান করা প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে যে জনগণের অংশগ্রহণের পরিমাণ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। যে-সকল কেন্দ্রের কার্যকাল ৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সেগুলিতে জনগণের শ্রম ও অন্যান্য দানের মূল্য কমিয়া শতকরা ১২০ ভাগ হইতে ৬৯ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। কেন এরূপ ঘটিয়াছে এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্লক উন্নয়ন অফিসারগণ পঞ্চায়েৎ ও সমবায় সমিতি গঠন অপেক্ষা কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ও নির্মাণকার্যের (constructional items) উপরই অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে-যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা ধানচাষের ক্ষেত্রে জাপানী পদ্ধতি অনুসরণই প্রধান। নির্মাণকার্যের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে পথ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ; কূপ খনন, বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির দিকেও কিছু কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ কার্য ঠিকমত করা হয় নাই। প্রয়োজনমত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রও (seed farm) স্থাপিত করা সম্ভব হয় নাই। উন্নততর বীজ যোগানের ক্রটি প্রধানত বীজের অপ্রতুলতার জন্য; অপরদিকে সারের যোগান ঠিক সময়মত আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া উহা বণ্টন করিতে পারা যায় নাই।

মোটামুটিভাবে দেখা গিয়াছে যে, যে-সকল স্থানে বৃষ্টিপাত প্রচুর বা সেচ-ব্যবস্থা ভালভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র সেই সকল কেন্দ্রগুলিতেই কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম সফল হইয়াছে। এই কারণে সুপারিশ করা হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাকী সময়টুকুতে এই সকল কেন্দ্রেই কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

গ্রামসেবক, বিশেষজ্ঞ এবং ব্লক উন্নয়ন অফিসারদের মধ্যে যাহাতে নিয়ত আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে এই সকল কর্মচারী সকলেই যাহাতে অংশগ্রহণ করেন তাহা দেখিতে হইবে।

বিভিন্ন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রে যে সকল পঞ্চায়েৎ স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের গঠনে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না। পঞ্চায়েতের সম্পাদক অনেক স্থানেই সরকারী কর্মচারী। যে সকল স্থানে বেসরকারী ব্যক্তিগণ ঐ পদ অধিকার করেন সেখানে তাঁহাদের গুণাবলী অতি নিম্নস্তরের। এই ক্রটির প্রতিবিধান এবং পঞ্চায়েৎগুলির আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিলে সমাজোন্নয়নের সফলতা বিশেষ ব্যাহত হইবে।

আন্তর্জাতিক দলের মূল্যায়ন

উপরি-উক্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্টে বলা হয় যে ১৯৫৫-৫৬ সালের পর হইতে ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যে ও প্রসারে বিশেষ মন্দা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ভারতে এই পরিকল্পনার সম্ভাবনা একরূপ অপরিমেয়। সুতরাং ইহার পুনর্গঠন করা আশু প্রয়োজন।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন (Reorganisation of Community Development): দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলবন্ত্রী রাও মেটা কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পুনর্গঠন করা হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ক্রটিবিচ্যুতি দূরীভূত হয় নাই, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কাম্য সার্থকতাও লাভ করে নাই। তাই বর্তমানে পঞ্চম মূল্যায়ন রিপোর্ট (Fifth Evaluation Report) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন দলের রিপোর্ট অনুসারে আবার পুনর্গঠনকার্য চলিতেছে। এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যেই সমবায়কে সমাজোন্নয়ন মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই পুনর্গঠনকার্যে নির্দেশিত ক্রটিবিচ্যুতি দূর করা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কৃষির পুনর্গঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। এই নূতন সর্বাংগীণ কার্যক্রমের মধ্যেই সমাজোন্নয়নের সফলতার

কৃষির পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের সংযোগ

সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। এ-সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ জানা যাইবে তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশিত হইলে।

মূল্যায়নের উপসংহার : গ্রাম্য ভারতকে এক বিরাট মরুভূমির সহিত তুলনা করা চলে। ইহার উপর সামান্য জলসিঞ্চন করা হইলে কিছু দিন পরে তাহার আর চিহ্ন পাওয়া যায় না। অতীতে গ্রাম্য ও কৃষির উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টার পরিণতি এইরূপই হইয়াছে। অনেকের মতে, বর্তমানে সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিয়াছে বলা চলে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ব্যাপক হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা গ্রাম্য জীবনে গভীর দাগ কাটিতে পারে নাই—গ্রামবাসীদিগকে আত্মনির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রয়োজনমত পুনর্গঠন না করিতে পারিলে এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মোটেই বর্ণনা করা যায় না।

আন্দোলন ব্যাপক হইলেও গভীর হয় নাই

প্রথম পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়নকে গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।* একবার এই পদ্ধতি কার্য সুরু করিলে ভবিষ্যতের কার্যক্রম ইহার গতিবেগ ও অভিজ্ঞতা হইতে একরূপ আপনা-আপনিই প্রস্তুত হয়। "ইহা যতই সম্প্রসারণের পথে চলে ততই পুরাতন অভাব পূরণ ও নূতন অভাব সৃষ্টি হইতে থাকে।" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে আন্দোলন যে-যে স্থানে সুরু হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেই ইহা নিশ্চল অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সংগঠনগত ত্রুটির দিক হইতে দেখা যায় যে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রাধিক্য, চমকপ্রদ কার্যে সরকারী কর্মচারীদের আগ্রহ, গ্রামসেবকের উপর মাত্রাতিরিক্ত ভারার্পণ, সমাজোন্নয়ন শিক্ষা-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বিশেষ সুস্পষ্ট। ইহার উপর বর্ণগত ও অস্পৃশ্যতাজনিত বাধা, সম্পদ ও দারিদ্র্যের সহ-অস্তিত্ব সমাজোন্নয়নের সফলতার পথে বিরাট বাধাস্বরূপ।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the problems of India's Agriculture ? What, in your opinion, should be the main lines of reorganisation of agriculture in a country like India ?
(C. U. B. A. 1946, '48, '54) [২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা]

2. Briefly indicate the role played by the State in India in relation to agriculture.

[ইংগিত : প্রথমে সংক্ষেপে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় রাষ্ট্রের ভূমিকা বর্ণনা কর। তারপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির উন্নয়নের ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার পর্যালোচনা কর।...২৬৪-২৭১ পৃষ্ঠা]

3. Indicate the main features of Community Development Projects and National Extension Service launched in this country. Explain their usefulness as instruments of rural reconstruction. (C. U. B. A. 1957) [২৬৮-২৬৯, ২৭০-২৭১পৃষ্ঠা]

4. Give your own views on the achievements and prospects of Community Projects and National Extension Service in India. (C. U. B. Com. 1959)
[২৭২-২৭৬ পৃষ্ঠা]

* ২৭০ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প

(Small-scale and Cottage Industries)

অতীত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

ভারতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অতীতে কুটির শিল্প এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিত। দেশবিদেশে তাহার শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার সমাদৃত হইত। বিদেশী পর্যটকগণ ভারতীয় শিল্পীদের কলাকৌশল ও কারুকার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন এবং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই গৌরবময় ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াই ১৯১৮ সালে শিল্প কমিশন (The Industrial Commission) মন্তব্য করে: আধুনিক শিল্প-পদ্ধতির জন্মভূমি পশ্চিম ইয়োরোপ যখন অসভ্য উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত, ভারত তখন তাহার শাসকগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য এবং শিল্পীদের কলাকৌশলের জন্য খ্যাতি অর্জন করে; এবং এমনকি পরবর্তী সময়ে যখন পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভাগ্যান্বেষী বণিকগণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করে তখনও পশ্চিমের অধিক উন্নত জাতিগুলির তুলনায় ভারতের শিল্পপ্রসার কোনক্রমেই নিকৃষ্ট ছিল না।'' প্রাচীনকালে রোম পারস্য সিরিয়া আরব প্রভৃতি দেশে ভারতের শিল্পজাত বহু দ্রব্য চালান যাইত। নিপুণ কুটির শিল্পিগণ বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করিত। প্রাচীন ভারতের তুলা পশম ও রেশমের বস্ত্র, পিতল ও কাঁসার দ্রব্য, ইস্পাত, কাগজ, সুগন্ধি দ্রব্য, কাচের সামগ্রী, অলংকার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। দিল্লীর অশোক স্তম্ভ লৌহশিল্পের এক গৌরবময় ইতিহাসের বার্তা যুগ যুগ ধরিয়া বহন করিয়া চলিয়াছে। বয়ন শিল্প সম্পর্কে রমেশ দত্ত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, "জনসাধারণের জাতীয় শিল্প ছিল বয়ন শিল্প এবং অসংখ্য স্ত্রীলোক সুতাকাটায় নিযুক্ত থাকিত।"

ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্পসমূহের অবনতি ও ইহার কারণ:

ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কারণ (Causes of Decline of Cottage Industries): অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুটির শিল্পের ধ্বংস আরম্ভ হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধ্বংসকার্য পুরাদমে চলিতে থাকে। যে সমস্ত কারণে ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হইল প্রধান:

(১) রাজদরবারের বিলুপ্তি: বিত্তশালী রাজসভাসদগণ ও অভিজাত সম্প্রদায় কুটির শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ইহাদের বহু সৌখিন দ্রব্যের চাহিদা পূরণ

করিত বিভিন্ন কুটির শিল্প। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কুটির শিল্পজাত তুলা ও রেশম দ্রব্য মুঘল রাজত্বের সময় আগ্রা দিল্লী ও লাহোরের রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি ও প্রসারলাভ করে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার হইবার পর দেশীয় রাজা ও নবাবগণ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে থাকেন এবং কুটির শিল্পেরও অবনতি ঘটিতে থাকে।

(২) প্রতিকূল বৈদেশিক প্রভাব : ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারের পর ভারতের নূতন ধনিকশ্রেণী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশী শাসকের সব কিছুকে অনুকরণ করিতে এবং বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবতই কুটির শিল্পের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিল।

(৩) বিদেশী শাসকের নীতি : ইংরাজরা বণিক সম্প্রদায় হিসাবে ভারতে আসে। বাণিজ্য প্রসারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত করে;

কোম্পানী কর্তৃক ব্রিটিশ শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য ভারতীয় শিল্পের দমন

কিন্তু শীঘ্রই ইংল্যাণ্ডের কায়েমী স্বার্থ পার্লামেন্টের সহায়তায় কোম্পানীকে তাহার নীতি পরিবর্তন করিয়া ইংল্যাণ্ডের শিল্পের জন্য ভারত হইতে স্বল্প মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ করিতে বাধ্য করে। অষ্টাদশ শতাব্দী, বিশেষ করিয়া ঐ শতাব্দীর শেষভাগ, ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্পের দমন ও ইংল্যাণ্ডের শিল্পের প্রসারসাধনের নীতি দ্বিধাহীনভাবে প্রয়োগ করিতে থাকে। যাহাতে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি ইংল্যাণ্ডের বাজারে প্রবেশ না করিতে পারে তাহার জন্য উচ্চ হারে শুল্ক বসান হয়। এই অত্যধিক শুল্কের সাহায্যেই ভারতীয় তুলা ও রেশম জাত দ্রব্য ইংল্যাণ্ডের বাজার হইতে বিতাড়িত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইংল্যাণ্ড আইন করিয়া ভারত হইতে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। অপরদিকে, ইংল্যাণ্ড হইতে আমদানিকৃত পণ্য বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করিতে পারিত। এই প্রসংগে অধ্যাপক হোরেস উইল্‌সন (Prof. Horace Wilson) যে-মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "এই প্রকারের উচ্চ হারে শুল্ক ও নিষিদ্ধকারী আইনকানুন না থাকিলে পেইজলী (Paisley) এবং ম্যানচেষ্টারের (Manchester) মিলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং বাষ্পশক্তির সাহায্য সত্ত্বেও ইহাদের চালনা করা সম্ভব হইত না।" এইভাবে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনের সাহায্যে যে যন্ত্রচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার দ্বারা উৎপাদিত তুলাজাত দ্রব্যে অচিরেই ভারতের বাজার ছাইয়া গেল। ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ড হইতে বিদেশে কাপড় রপ্তানির মোট পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ ভারতীয় বাজারেই বিক্রীত হইতে লাগিল।

(৪) যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা : ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের (১৭৭৬-১৮২০) ফলে শিল্পজগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘঠিত হয়। বৃহদাকারের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ, অধিক মূলধন নিয়োগ, উন্নততর সংগঠন, বৃহদায়তনে উৎপাদন প্রভৃতি অভূতপূর্বভাবে উৎপাদন-ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস করে। যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদি ভারতীয় বাজারে অবাধে আমদানি হইতে থাকে। প্রতিযোগিতায়

টিকিয়া থাকিতে না পারিয়া দেশীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। পথঘাটের উন্নতি ও রেলপথ নির্মাণের ফলে স্বল্প মূল্যের বিদেশী দ্রব্য সুদূর পল্লী অঞ্চলে গিয়া পৌঁছায়। ভারতীয় শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষিতে যাইয়া ভিড় করিতে বাধ্য হয়। ভারত কাঁচামাল ক্রয় এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়।

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও শিল্পবিপ্লবের ফলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হাজার হাজার তন্তুবায় ও অন্যান্য কারিগর চিরাচরিত বৃত্তি হারাইয়া পরিবর্তনের মুখে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতের সহিত ঐ সমস্ত দেশের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ সমস্ত দেশে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বৃহদায়তনের কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি দেখা দেয়। দুর্দশাগ্রস্ত কারিগরগণ অচিরেই নূতন কলকারখানায় স্থান পায় এবং শহরাঞ্চলে আসিয়া ভিড় জমায়। ভারতের দুর্ভাগ্য হইল যে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল অথচ বৃহৎ যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিল না। সুতরাং ক্ষুদ্র কুটির শিল্পিগণ নিজেদের পেশা হারাইয়া কৃষি ভিন্ন জীবনধারণের অন্য কোন অবলম্বন খুঁজিয়া পাইল না। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামাঞ্চলের দিকে তাহারা ধাবিত হইল।

ভারতে কুটির শিল্পের ধ্বংস ও কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি

ভারতে কুটির শিল্প সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত না হইবার কারণ (Causes of the Survival of the Cottage Industries in India) :

উপরি-উক্ত ধ্বংসাত্মক শক্তির মুখে পতিত হইয়াও কতকগুলি কুটির শিল্প দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কতকগুলি কারণ বর্তমান থাকার দরুনই ইহা সম্ভব হইয়াছে। প্রথমত, কারখানার শ্রমিকের তুলনায় কুটির শিল্পী অধিকতর সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কাজ করিয়া থাকে। পরিবারবর্গের সাহচর্যে স্বাধীনভাবে নিজ বৃত্তি অনুসরণের আকর্ষণ সে সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাব গৃহের আকর্ষণ এবং নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাবও কুটির শিল্পকে তাহার চিরাচরিত পেশাতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তৃতীয়ত, প্রথার প্রভাবের ফলেও অনেকে বর্ণগত পেশায় ব্যাপৃত থাকে। চতুর্থত, জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। কিন্তু কৃষিকার্য সারা বৎসর ধরিয়া চলে না; বৎসরের ৩-৪ মাস কর্মহীনভাবে কাটাইতে হয়। এই অবসর সময়ে অনেক চাষীই তাহাদের সামান্য আয়কে বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পকে অনুপূরক বা পার্শ্বজীবিকা হিসাবে অবলম্বন করে। পঞ্চমত, গমনাগমনের সুব্যবস্থা না থাকায় অনেক অঞ্চল আবার এখনও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। এই সকল অঞ্চলে যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা তীব্র না হওয়ায় অনেক কুটির শিল্প এখনও টিকিয়া আছে। ষষ্ঠত, অনেকের

১। কুটির শিল্পের অপেক্ষাকৃত সুস্থ পরিবেশ

২। বিকল্প পেশা ও নিয়োগের অভাব

৩। বর্ণগত প্রথা ও প্রভাবের ফল

৪। পার্শ্বজীবিকা হিসাবে কুটির শিল্প কৃষির অনুপূরক

মধ্যেই প্রচলিত ধারণা আছে যে, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি যন্ত্রোৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষা অধিক টেকসই। এই কারণেও অনেক ক্ষেত্রে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দেখা যায়। সপ্তমত, কুটির শিল্পীরা অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহার করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, তন্তুবায়গণ মিলজাত সূতা ও উন্নত ধরনের মাকু, রঞ্জকগণ উন্নত ধরনের রং করিবার দ্রব্যাদি, এবং দরজীরা সেলাই-এর কল প্রবর্তন করিয়া উৎপাদনের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছে। অষ্টমত, এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা কলকারখানায় প্রস্তুত করা অসম্ভব বা অসুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ, যে-সমস্ত দ্রব্য কারুকার্যখচিত অথবা যাহা কেবল স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে সেই সমস্ত দ্রব্যাদি হস্ত শিল্প বা কুটির শিল্পের সাহায্যেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। উপরন্তু, এখনও বহু শিল্পরসিক আছেন যাঁহারা পূর্বেকার শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রচার-কার্যের ফলে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কতকটা বাড়িয়াছে। পরিশেষে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে কুটির শিল্পকে সাহায্য করিতেছে। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

৫। অনেক স্থানে যন্ত্রোৎপাদিত শিল্পের প্রতিযোগিতাও তীব্র হইয়া উঠে নাই

৬। কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত টেকসই

৭। কুটির শিল্পে উন্নততর কৌশল অবলম্বন

৮। ক্ষুদ্রায়তনেই কয়েক প্রকার দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব

৯। শিল্পরসিক ও প্রচারকার্য

১০। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য

ক্ষুদ্রয়াতন ওকুটির শিল্পের সংজ্ঞা (Definitions of Small-scale and Cottage Industries) ঃ সকল প্রকারের শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (১) বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industries), (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industries) এবং (৩) কুটির শিল্প (Cottage Industries)। ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 'ইকাফে'র (ECAFE) তৃতীয় অধিবেশনে কুটির শিল্পের যে-সংজ্ঞার উল্লেখ করা হয় তাহা হইল ঃ আংশিক বা পূর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্প কারিগর সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত পরিবারের অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় পরিচালিত করে তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয় ঃ ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন এই সংজ্ঞা অনুমোদন করে।

সকল প্রকার শিল্পের শ্রেণীবিভাগ

কুটির শিল্পের সংজ্ঞা

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে কমিশন বলে যে সম্পূর্ণ এরূপ শিল্প প্রধানত ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যে পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ক্ষুদ্র শিল্পপতি বা কর্মকর্তা (entrepreneurs) মজুর নিয়োগ করিয়া ছোট কারখানায় উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। সংক্ষেপে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য

কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শ্রমিক নিয়োগ না করিয়া নিজের গৃহে চিরাচরিত পন্থায় উৎপাদনকার্য সম্পাদন করে; কারিগর নিজস্ব চেষ্টা ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল; সে অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্য লয়। এই শিল্প কারিগরের আসল পেশা নাও হইতে পারে। কৃষিকার্য বা অন্য কোন প্রধান বৃত্তির সহিত পার্শ্বজীবিকা হিসাবে ইহা পরিচালিত হইতে পারে। অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদনকার্য কারিগরের গৃহে পরিচালিত হয় না; স্বল্পায়তন কারখানায় শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদনকার্য চলে। সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ১০ জন হইতে ৫০ জনের মত শ্রমিক থাকে এবং শিল্পপতির আর্থিক সম্বলও সামান্য হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board) প্রদত্ত সাম্প্রতিক সংজ্ঞা অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শক্তিচালিত এবং সাধারণত নগরাঞ্চল বা শহরতলীতে অবস্থিত হয়। এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ গ্রামাঞ্চলেও বেশ কিছু কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ময়দা ও চাউলের কলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন-শিল্পের সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, কুটির শিল্প কিরূপ আকার ধারণ করিলে তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হইবে সে সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Cottage and Small-scale Industries): কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে (১) গ্রাম্য ও (২) পৌর—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে কতকগুলি আছে যাহা কৃষকগণ কৃষিকার্যের সংগে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে পরিচালনা করে। বৎসরের ৮ মাসের মত চাষী কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকে। এমনকি কৃষিকার্যের সময়েও সে সর্বক্ষণ কৃষিতে লিপ্ত থাকে না। এই অবসর সময়ে সে তাহার আয়বৃদ্ধি ও গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগানের জন্য নিজ গৃহের কোন-না-কোন শিল্প পরিচালনা করিতে পারে। এই প্রকারের শিল্পের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি প্রস্তুত, বেতের কার্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন শিল্প অধিক প্রসিদ্ধ। পরে হস্তবয়ন বা তাঁত শিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

শ্রেণীবিভাগ—গ্রাম্য ও পৌর

গ্রাম্য শিল্পসমূহের প্রকৃতি পরিচয়

গ্রাম্য কুটির শিল্পের মধ্যে আবার কতকগুলি শিল্প আছে যাহা গ্রামের বিভিন্ন চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করে এবং কারিগরগণ ইহাদিগকে জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করে। গ্রামে গ্রামে কামার, কুমার, ছুতার-মিস্ত্রী, তাঁতী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সমৃদ্ধশালী গ্রামগুলিতে স্বর্ণকারও থাকে। এই শিল্পিগণ গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। এক সময় ছিল যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য জীবনের ইহারা ছিল

গ্রামীণ জীবনের অংগীভূত কুটির শিল্প

অপরিহার্য অংগ। অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত এই গ্রাম্য শিল্পিগণ। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা গ্রাম্য শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। অনেক গ্রাম্য শিল্পী জীবিকার্জনের জন্য সহরাঞ্চলে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা হইলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক শিল্প দেখা যায়। শিল্পিগণ পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। গ্রাম্য শিল্পজাত অনেক দ্রব্যের চাহিদাও যথেষ্ট রহিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের স্কুমার কলাশিল্প

উপরি-উক্ত ধরনের শিল্প ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে বহু সুকুমার কলাশিল্প আছে। বাংলা, কাশ্মীর ও মহীশূর রাজ্যে রেশমশিল্প বিশেষভাবে সমাদৃত। মির্জাপুর ও বেনারসের কার্পেট-বুনন, বাংলা ও বিহারের ধাতুশিল্পও সমধিক প্রসিদ্ধ। উত্তরপ্রদেশের কাচের চুড়ি ও বাংলার সূক্ষ্ম সূচিকর্ম-বিশিষ্ট বস্ত্রাদি অন্যান্য দেশে পর্যন্ত চালান যায়। কাশ্মীরের শাল সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। মাটির খেলনা ও মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণকার্যেও বহু মৃৎশিল্পী নিযুক্ত রহিয়াছে।

গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

গ্রামাঞ্চলে যে-সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প আছে তাহার কাজকারবার প্রায় ক্ষেত্রেই বৎসরের নির্দিষ্ট সময় চলে এবং প্রধান কৃষিজ পণ্যকে বিক্রয়োপযোগী করিবার পদ্ধতির (processing) সহিত এই শিল্পগুলি সংশ্লিষ্ট। পূর্বোল্লিখিত চাউলের কল, ময়দার কল ছাড়াও ইক্ষু হইতে গুড় ও খান্দসারী প্রস্তুতের কারখানার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োগের সংস্থা হিসাবে স্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায়। সম্প্রতি অবশ্য এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

পৌর কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প: প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের নগরগুলি শিল্পকলার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে। অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা ও কারিগরদের শিল্পনৈপুণ্য নগরাঞ্চলের শিল্পকলাকে সম্প্রসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই-এর কাজ, সূচীশিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুটির শিল্প ছাপাখানা ব্যতীত নগরাঞ্চলে স্বল্পায়তন গেঞ্জীর কারখানা, যন্ত্রপাতির কারখানা প্রভৃতি বহু রকমের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও আছে। এখন তুলাতাঁত শিল্প বা হস্তবয়ন শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

তুলাতাঁত শিল্প (The Cotton Handloom Industry): কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে তাঁতশিল্প হইল সর্বপ্রধান। দেখা গিয়াছে যে, তাঁত শিল্পে ৫০ লক্ষ* লোক নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ, অন্যান্য সংগঠিত শিল্পে যতসংখ্যক লোক নিযুক্ত হয় প্রায় ততসংখ্যক লোক

তাঁতশিল্পের গুরুত্ব

* India—1959.

একমাত্র তাঁতশিল্পেই নিযুক্ত আছে। কারিগরগণের পোষ্য ব্যক্তিগণকে ধরিলে তাঁত-শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা ১ কোটির মত হইবে। সুতরাং নিয়োগের দিক দিয়া কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৩০ কোটি গজের মত তাঁতের কাপড় উৎপাদিত হয়। বলা হয় যে, ভারতের বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ পূরণ হয় এই তাঁতের কাপড়ের দ্বারা।†

উল্লিখিত গুরুত্ব সত্ত্বেও তাঁতশিল্প বর্তমানে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন। ইহা হইল কাপড়ের কলগুলির প্রতিযোগিতা। যুদ্ধাবস্থায় ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মিলে প্রস্তুত কাপড়ের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য তাঁতশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে। কিন্তু পরে মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁতশিল্প সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়। এই সংকট প্রতিবিধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ঐ সকল ব্যবস্থা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, তাঁতশিল্প যন্ত্রচালিত বস্ত্র শিল্পের তুলনায় কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে কিনা এবং ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় তাঁতশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার সপক্ষে কোন সংগত যুক্তি আছে কিনা।

যন্ত্রচালিত বস্ত্র শিল্পের তুলনায় তাঁতশিল্পের সুবিধা

কতিপয় ক্ষেত্রে তাঁতশিল্প যন্ত্রচালিত বস্ত্র শিল্পের তুলনায় কয়েকটি সুবিধা ভোগ করে। প্রথমত, তাঁতে বিভিন্ন নক্সার কাপড় যেভাবে উৎপন্ন করা যায় যন্ত্রশিল্পে তাহা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদনে তাঁত অধিক মাত্রায় সমর্থ। দ্বিতীয়ত, অতি সূক্ষ্ম সুতার কাপড় বয়নে যন্ত্রশিল্প তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁতের সূক্ষ্ম কাপড়ের চাহিদা এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। এমনকি মোটা সুতার কাপড়ের বেলায়ও মিলের পক্ষে তাঁতকে সম্পূর্ণভাবে স্থানচ্যুত করা খুব সম্ভব নয়—কারণ এরূপ তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন-ব্যয় প্রায় কাঁচা-মালের দামের সমান হয়। মাঝারি ধরনের কাপড় উৎপাদনে অবশ্য মিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তৃতীয়ত, ইহা ব্যতীত এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড় অধিক টেকসই। ফলে অনেকেই মিলের কাপড়ের পরিবর্তে তাঁতের কাপড় পছন্দ করিয়া থাকে।

তাঁতশিল্পের উপরি-উক্ত সুবিধা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিষয় আছে যাহা ঐ শিল্পের ভবিষ্যৎ বিবেচনা প্রসংগে মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁতশিল্পে অধিক মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সহজেই উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তাঁতশিল্প হইতে অসংখ্য লোক জীবিকা অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকও সামান্য উপার্জনকে বৃদ্ধি করিবার জন্য এই শিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। যে-হারে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা যে-আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে নিয়োগের

† Report of the All-India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society for the year 1958–59.

সংস্থা হিসাবে তাঁতশিল্পের মত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তৃতীয়ত, ক্রেতা হিসাবে তাঁতশিল্প প্রস্তুত সুতার চাহিদার সৃষ্টি করে।

তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ

অতএব, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ এবং ভারতীয় আর্থিক কাঠামোতে ইহার এক বিশিষ্ট স্থান অবশ্যই আছে।

তবে ইহার কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে :

তবে তাঁতশিল্পের কতকগুলি সমস্যা আছে যাহার সমাধান এই শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে মূলধনের অভাব, সংগঠনের অব্যবস্থা, বিক্রয়করণের অসুবিধা, চিরাচরিত অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতাই হইল প্রধান।

১। মূলধনের অভাব

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তন্তুবায়কে দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয়। মহাজন বা ব্যবসায়ী তাহার দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের সর্তে ব্যবসায়ী তাহাকে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে। সুতা ব্যবসায়ে নানা প্রকারের দুর্নীতি চলিতে থাকে। এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর লাভ শতকরা ৪৭ টাকা পর্যন্ত উঠে।

২। বিক্রয়করণের ব্যবস্থা

বিক্রয়করণের অসুবিধা হইল তাঁতশিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা। বিক্রয়করণের অসুবিধার জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের শোষণের পরিমাণ এখনও অধিক, ফলে তাঁত শিল্পীও উৎপাদনবৃদ্ধিতে বিশেষ উৎসাহিত হয় না।

৩। অপকৃষ্ট উৎপাদন-পদ্ধতি

তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন-পদ্ধতিও অনুন্নত এবং শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা অ-পর্যাপ্ত। ফলে উৎপন্ন দ্রব্য উৎকৃষ্ট ধরনের হয় না।

পরিশেষে আছে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা। কানুনগো কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯৬০ সালে আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য মোট ৪০০ কোটি গজ এবং রপ্তানির জন্য ১০০ কোটি গজ—এই মোট ৫০০ কোটি গজ মিলের কাপড়ের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু মিলগুলি ১৯৫৭ সালেই ৫৩৭ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করে। অপরদিকে আবার রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া মোট ৬০ কোটি গজে দাঁড়ায়। উভয়ের সমন্বিত ফলে তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতার সমস্যা সংকটে পরিণত হয়। সংকটের সমাধানকল্পে তাঁতশিল্প মিলের উৎপাদন নূতনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার দাবি জানানো হইয়াছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় তাঁতশিল্প বর্তমান অপেক্ষাও সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল। সেই সময় হইতে ইহার পুনরুদ্ধার ও প্রসারসাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এই সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে : (ক) তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, এবং (খ) সরকারী প্রচেষ্টা।

নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা ও শিক্ষা-সংগতি অনুসারে উন্নততর কলাকৌশলের প্রবর্তনই হইল তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। তাঁতশিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পে তন্তুবায়গণ ক্রেতাদের রুচি ও ফ্যাসানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বস্ত্র উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করিতেছে, উন্নত ধরনের মাকু ও তাঁত প্রবর্তন করিতেছে এবং বস্ত্রাদি রং করিবার জন্য রাসায়নিক রঞ্জন দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে। উপরন্তু, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মূলধন সংগ্রহ ও বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইতেছে।

ক। উন্নয়নকল্পে তন্তুবায়গণের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

তাঁতশিল্পের পুনরুদ্ধার উন্নয়নকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা হইল বিভিন্নমুখী। প্রথমত, তাঁতশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার জন্য ১৯৫২ সালে একটি সর্ব-ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board) গঠন করা হয় এবং ১৯৫৪ সালে এই বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তী বৎসরে খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য একটি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and Village Industries Board) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই বোর্ড শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শপ্রদান, বিক্রয়করণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কার্যকর করে। তাঁতশিল্প বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় নক্সা কেন্দ্রও আছে। দ্বিতীয়ত, তন্তুবায়গণের মধ্যে যাহাতে সমবায়িক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে সমবায় সমিতির অধীনে তাঁতের সংখ্যা ৬ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়।* তৃতীয়ত, দেশে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানি প্রসারের জন্য একটি তাঁতজাত দ্রব্য বিক্রয়করণ সমিতি (All-India Handloom Fabrics Marketing Society) গঠিত হইয়াছে। ইহার উপর সমবায় পদ্ধতিতে বিক্রয়-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য ১৯৫৩ সালে সর্ব-ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ সংগঠন (Central Marketing Organisation) স্থাপন করা হইয়াছে। এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে। বিভিন্ন শহরে ইহার শাখাও আছে। চতুর্থত, খাদি ও তাঁতশিল্পের উন্নয়নকল্পে অর্থসাহায্য করিবার জন্য উৎপন্ন মিলের কাপড়ের উপর টাকা প্রতি ২ নয়া পয়সা হারে সেস্ বা শুল্ক বসান হইয়াছে। এই সূত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থ সেস্ তহবিলে (Cess Fund) জমা হয় এবং তহবিল হইতে প্রয়োজনমত খাদি ও তাঁতশিল্পকে অর্থসাহায্য করা হয়। পঞ্চমত, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম গৃহীত নীতি অনুসারে মিল কর্তৃক ধুতি কাপড় উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে

খ। উন্নয়নকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা :

১। বিভিন্ন বোর্ড গঠন

২। সমবায়িক প্রচেষ্টার প্রসার

৩। বিক্রয়-ব্যবস্থার সংগঠন

৪। সেস্

৫। মিলের উৎপাদন সীমাবদ্ধকরণ

* Second Five Year Plan—৪৩৬ এবং ৪৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁতজাত ধুতির বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষষ্ঠত, তাঁতজাত ও খাদি দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যয়ে রেয়াৎও (rebates) দেওয়া হইতেছে। সাধারণ সময়ে এই রেয়াতের হার হইল টাকায় ৬ নয়া পয়সা বা শতকরা ৬ ভাগ। পরিশেষে, তাঁতশিল্পের উন্নতিকল্পে আরও নানাভাবে অর্থ-সাহায্য করা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ, সর্ব-ভারতীয় সুতাকাটা সমিতিকে (All-India Spinners' Association) অর্থসাহায্যের উল্লেখ করা হইতে পারে। রাজ্য সরকারগুলিও আপনাপন অঞ্চলে তাঁতশিল্পকে অর্থ ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করিতেছে।

৬। রেয়াৎ ও অর্থ-সাহায্য

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁতশিল্পের জন্য মোট ব্যয় করা হয় ১২ কোটি ২ লক্ষ টাকা এবং খাদির জন্য ব্যয়িত হয় ১২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।* উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং এই ব্যয়ের ফলে ভারতীয় তাঁতশিল্প তাহার সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে বেশ কিছুটা মুক্ত হইয়াছে। তাঁতশিল্পের উৎপাদনও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮-৫৯ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ২৩০ কোটি গজ। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদন ছিল ১৪৫ কোটি গজ। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসরে উৎপাদনবৃদ্ধি হইয়াছিল ৮৫ কোটি গজ।

প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

উৎপাদনবৃদ্ধি

খাদির উৎপাদনও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার মূল্য ১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে ১০ কোটি টাকার উপর দাঁড়ায়।

তবুও তাঁতশিল্প সম্পূর্ণ সংকটমুক্ত হয় নাই। এই শিল্পের কর্তৃপক্ষের মতে, মিলের কাপড়ের উৎপাদন-ক্ষমতা নূতনভাবে সীমাবদ্ধ না করিলে তাঁতশিল্প কখনই সংগঠিত হইয়া উঠিতে পারিবে না। সুতরাং দাবি করা হইতেছে মিলে শাড়ী ও মোটা কাপড় উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া ঐ ভার তাঁতশিল্পকে দেওয়া হউক।**

এই প্রসংগে পশ্চিমবংগে তাঁতশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ইংগিত দেওয়া যাইতে পারে। এই রাজ্যের প্রধান কুটির শিল্প এই তুলা তাঁতশিল্প। বর্তমানে পশ্চিমবংগে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার তাঁতে ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। মোট তাঁতসংখ্যার মধ্যে ৭৪ হাজার সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত এবং ৫৬ হাজার ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৬ কোটি গজের মত কাপড় উৎপাদিত হয়। পশ্চিমবংগের তাঁতশিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান হইল : (১) মূলধনের অভাব, (২) বিক্রয়করণের অব্যবস্থা এবং (৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি। এখনও অধিকাংশ তন্তুবায় অর্থ-সাহায্য, কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়করণের জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হয়।

পশ্চিমবংগের তাঁতশিল্প

পশ্চিমবংগের তাঁত-শিল্পের সমস্যা

---

* India 1959.

** The Hondloom Industry and its Problems by M. Somappa, President Handloom Fabrics Co-operative Society.

আর একটি বিশেষ অসুবিধা হইল যে তন্তুবায়গণকে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের মিলগুলি হইতে সুতা সংগ্রহ করিতে হয়। ফলে সুতার মূল্য অধিক হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও অধিক হয়।

উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা

সম্প্রতি পশ্চিমবংগের রাজ্য সরকার তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। সমবায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র (Government Sales Emporium) খোলা হইয়াছে এবং সমবায়িক শিল্প ইউনিয়নের (Co-operative Industrial Union) সহিত সংশ্লিষ্ট দোকানগুলির মারফত তাঁতজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবংগে খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড এবং একটি তাঁতশিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে

খাদি ও তাঁতশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্রের মত পশ্চিমবংগ রাজ্যেও একটি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (The West Bengal Khadi and Village Industries Board) এবং একটি তাঁতশিল্প বোর্ড (The State Handloom Board) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁতশিল্পের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করা হয়। স্থির হয় যে এই পরিকল্পনার শেষে তাঁতশিল্পের উৎপাদনকে ১৪৫ কোটি গজ হইতে ২৫০ কোটি গজে লইয়া যাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় তাঁতশিল্পের বিভিন্নদিকের উন্নতির জন্য ৫৯'৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালেই তাঁতশিল্প ২'০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিয়া ঐ লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহার ফলে তাঁতশিল্পের সমস্যা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কারণ, সংগে সংগে যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পেরও উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। আশা করা যায়, মাথাপিছু বস্ত্রের ব্যবহার বাৎসরিক ১৫ গজ হইতে অনুমিত ১৮ গজ দাঁড়াইলে এই সংকট কতকটা দূরীভূত হইবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁতশিল্পের সংরক্ষণের জন্য মিলের উপর নূতন বাধানিষেধ বসানো প্রয়োজন হইতে পারে।

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান (Place of Cottage and Small-scale Industries in Indian Economy) :

ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য এক বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিতে হইবে

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান কি হইবে তাহা লইয়া সম্প্রতি অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন তোলা হইয়াছে যে, বৃহদাকার যান্ত্রিক শিল্পের যুগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন সার্থকতা আছে কিনা? অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেও বলিতে হয় যে, ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনা করিলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে এক বিশেষ স্থান

নির্দেশ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। এমনকি অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড ও জাপানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮ লক্ষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে যাহার প্রত্যেকটির শ্রমিক-সংখ্যা হইল ১ জন হইতে ৪ জন এবং ঐ দেশের সমস্ত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শতকরা ৯২.৫ ভাগ হইল ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা। দেশের মোট শ্রমজীবীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ নিযুক্ত রহিয়াছে এই সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়ে এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়গুলির শতকরা ৩৪ ভাগ হইল ইহাদের হস্তে। মাত্র ৫ জন হইতে ৩০ জন লোক নিয়োগ করে এইরূপ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ইংল্যাণ্ডের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৯ ভাগ উৎপন্ন করে। এবং দেশের মোট নিযুক্ত ব্যক্তিদের শতকরা ২৯ জন এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৩০ জনের কম লোক নিয়োগ করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান জাপানে হইল শতকরা ৮০ ভাগ।*

শিল্পোন্নত দেশেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের নির্দিষ্ট

এখন দেখা যাউক, ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি কি কি? প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এক বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির হিসাব অনুসারে ১৯৫০-৫১ সালে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি (small enterprises) ১,৯১০ কোটি টাকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক নিয়োগ করে। অপরপক্ষে ফ্যাক্টরীগুলি (factory establishment) ঐ সালে ৫৫০ কোটি টাকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং ২৯ লক্ষ লোক নিয়োগ করে। জাতীয় আয় কমিটির এই হিসাব সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের (small enterprises) মধ্যে কুটির শিল্পগুলিকে ধরা হইলেও, ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে 'ফ্যাক্টরী' পর্যায়ে পড়ে এই রকমের ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এই শেষোক্ত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা ধরিলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য এবং নিযুক্ত লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হইবে। সরকারী হিসাব অনুসারে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হইবে অন্তত ২ কোটি।† যদি যথাযথভাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয় তবে নিয়োগবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০ লক্ষ লোকের উপর বেকার থাকিয়া যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় উহার সহিত ১ কোটি ৪০ লক্ষ বেকার সংযুক্ত হইবে। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-বেকার যে কত থাকিবে তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। এইরূপে বিরাট বেকার সমস্যার একটা মোটা অংশের সমাধান ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প প্রসারের দ্বারাই করা সম্ভব—কারণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প

ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি:

১। নিয়োগের সংস্থা হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব

* The Fiscal Commission Report (1949-50)—১০১ পৃষ্ঠা

† India, 1959

মূলধনের তুলনায় শ্রমশক্তি অধিক নিয়োগ করে; অপর পক্ষে বৃহৎ কারখানার শিল্পে অল্প লোক অধিক মূলধনের সহযোগে উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিক নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা দিতে সমর্থ। বিশেষত, শিক্ষিত বেকারদের পক্ষে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিশেষ উপযোগী।

দ্বিতীয়ত, ভারতের মূলধন সীমাবদ্ধ। অথচ বৃহৎ মূল শিল্পগুলির প্রসার ব্যতীত দেশের স্থায়ী আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং মূল শিল্পগুলিতে যাহাতে মূলধন নিয়োগ ব্যাহত না হয় তাহার জন্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ভার অধিক মূলধন-প্রয়োগকারী কারখানা শিল্পের উপর না দিয়া স্বল্প মূলধন-প্রয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর দেওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, মূল শিল্পের প্রসার ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে অধিক ক্রয়শক্তির সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে যাহাতে ভোগ্যদ্রব্য দুর্মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতি না হয় সেজন্যও কুটির ও হস্ত শিল্পের সাহায্যে অধিক মাত্রায় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২। মূলধনের স্বল্পতার যুক্তি

৩। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধানের যুক্তি

তৃতীয়ত, বর্তমানে যন্ত্রশিল্পের জন্য শিল্প-পদ্ধতি ও শিল্প-সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব রহিয়াছে। এই দিক হইতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা হইল যে, ইহাতে বিশেষ সংগঠন-দক্ষতা ও প্রয়োগ-কৌশল প্রয়োজন হয় না।

৪। সংগঠনের সরলতার যুক্তি

চতুর্থত, মাত্র কয়েকটি সহরে বা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ শিল্পগুলির কতকগুলি দুর্বলতা থাকিবেই। গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলা হয় যে, যুদ্ধের সময় শিল্পাঞ্চলের উপর আক্রমণ হইলে দেশের আর্থিক জীবনে সহজে বিশৃংখলা আসে। সমগ্র দেশব্যাপী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ছড়াইয়া দিতে পারিলে এই বিপদের সম্ভাবনা ততটা থাকে না।

৫। বিকেন্দ্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা

পঞ্চমত, বৃহৎ শিল্প কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে দেশের সম্পদ কেন্দ্রীভূত করিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে অসাম্য ও নিরবলম্ব অবস্থা প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে। অনেকের ধারণা যে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পের প্রসারের সাহায্যে এই আর্থিক বৈষম্যকে অনেক পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব হইবে। সুতরাং আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার (decentralised industrial system) সংগঠন করা হইল আশু কর্তব্য। আরও বলা হয় যে, বৃহৎ শিল্পোদ্ভবের ফলে যন্ত্র মানুষকে আজ চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার স্বাধীনতা, তাহার সৌন্দর্যবোধ, তাহার সৃষ্টির প্রেরণা ও তৃপ্তিবোধ সমস্তই অতি নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রদানব কর্তৃক নিষ্পেষিত হইতেছে। মুক্তির একমাত্র উপায় হইল শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ। বলা হয় যে, সমবায়িক সংগঠনের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থার সাহায্যে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন-ব্যবস্থাই অধিক কাম্য।

৬। আর্থিক বৈষম্য অপসারণের নির্দেশ

৭। যান্ত্রিক জীবন হইতে মুক্তির দাবি

ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। এই দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত—ইহা হইতে আয় অতি সামান্যই হয়। তা'ছাড়া বৎসরের কয়েক মাস মাত্র চাষের কার্য চলে বলিয়া চাষীর হাতে প্রচুর অবসর সময় থাকে। সুতরাং কুটির শিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষক তাহার সামান্য আয়ের বৃদ্ধি এবং অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে। উপরন্তু, কোন বৎসর শস্যফলন না হইলে কৃষক জীবনধারণের জন্য কুটির ও হস্ত শিল্পকে শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল কর্মের সুযোগ, আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা এবং গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ করিয়া তোলা।*

৮। পার্শ্বজীবিকা হিসাবে কুটির শিল্পের গুরুত্ব

বৃহদাকারে উৎপাদন সর্বক্ষেত্রেই সম্ভব বা সুবিধাজনক বা কাম্য বলিয়া মনে করা ভুল। সূক্ষ্ম সূচিকার্য, হস্তীদন্তের কাজ, কারুকার্যখচিত শাল ও বস্ত্র প্রভৃতির মত দ্রব্যাদি বৃহদায়তন কারখানায় উৎপাদন সম্ভব নয়। আবার বিড়ি প্রস্তুত, বোতাম তৈয়ারি, মক্ষিকা পালন প্রভৃতিতেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন কারখানা শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কার্য করিতে পারে। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ দ্রব্যের অংশবিশেষ অথবা কোন বিশেষ স্তরের উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সাইকেলের অংশ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে এবং পরে কারখানায় বিভিন্ন অংশের সাহায্যে সাইকেল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। সেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রসার সত্ত্বেও অধিকাংশ শ্রমিক ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকারের শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। এমনকি যে-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন বা হস্ত শিল্পের এবং বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, সে-ক্ষেত্রেও মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বিশেষ কোন অসুবিধা না থাকিলে বেকার-সমস্যার আশু সমাধানের জন্য স্বল্প মূলধন অথচ অধিক শ্রম নিয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকেই সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, হস্তবয়ন শিল্পের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।†

৯। ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক

---

* Second Five Year Plan— ৪২৯ পৃষ্ঠা।

† ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অস্তিত্ব বজায় থাকিবার কারণ আলোচনা প্রসংগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কয়েকটি সুবিধার আলোচনা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু করা হইয়াছে (২৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)। এখন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের যুক্তি হিসাবে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে।

আবার, উৎপাদন-ব্যয়ের দিক হইতে বৃহদায়তন কারখানা শিল্প এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা বিচার বিবেচনা করিবার সময় কেবল উৎপাদকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের (private cost) কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না, সমাজকে কি ব্যয়ভার বহন (social cost) করিতে হয় তাহার কথাও চিন্তা করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভংগি লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বৃহৎ কারখানা শিল্পের সামাজিক ব্যয়ভার অধিক। সহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের ফলে স্বাস্থ্য, আবাসগৃহ, বেকারত্ব নিয়োগ প্রভৃতি সংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজকে যথেষ্ট ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। সুতরাং সামাজিক ব্যয়ভারকে গণ্য করা হইলে বৃহৎ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য অনেক কমিয়া যাইবে।*

১০। ক্ষুদ্র শিল্পের সামাজিক ব্যয়ভার স্বল্প

বর্তমানে শিল্প সংক্রান্ত কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, উৎপাদকের ব্যক্তিগত ব্যয়ের দিক হইতেও অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধাই প্রমাণিত হয়। বোরসোদির (Ralph Borsodi) মত বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মোট দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে বৃহদায়তনে উৎপাদন সুবিধাজনক। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের বেলায় ব্যক্তিবিশেষ বা সমবায় সংগঠন কর্তৃক স্বল্পায়তনে উৎপাদন ব্যয়সংক্ষেপ করে।

১১। উৎপাদন-ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প

পরিশেষে, ভারতীয় ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান ও গুরুত্ব নির্দেশ করিবার সময় ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের সম্ভাবনার প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়করণের যে বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য।

১২। বিক্রয় বাজার কিন্তু ব্যাপক

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার সম্পর্কে বিচার বিবেচনার জন্য যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলটিকে (The Ford Foundation International Planning Team) ১৯৫৩ সালে ভারতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়, সেই বিশেষজ্ঞ দলও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের এই বৃহৎ বাজারের কথা উল্লেখ করে। দেশের অভ্যন্তরে গ্রামাঞ্চলে ৩০ কোটি লোক এবং সহরাঞ্চলে ৬ কোটি লোক শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের এক বিরাট বাজারের সন্ধান দেয়। দেশের বাহিরে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, এবং মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলিতে ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং বিক্রয়-ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত করিতে পারিলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার অভাব হইবে না।

* Report of the Fiscal Commission (1949-50) দ্রষ্টব্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব এবং সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়ন ও নিয়োগ সংস্থানের প্রসারসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্যের মধ্যে যে দুইটি প্রধান পন্থা অবলম্বন করা হয় তাহা হইল—(১) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসাহায্য করা ; এবং (২) খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, তাঁত শিল্প, হস্তচালিত শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতির সমস্যার বিচার-বিবেচন ও প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য কয়েকটি সর্ব-ভারতীয় বোর্ড স্থাপন করা। অধিকতর সরকারী মনোযোগ এবং এই সকল সর্ব-ভারতীয় বোর্ডের বর্ধিত কার্যের ফলে উক্ত শিল্পসমূহের অনেকগুলিতে উৎপাদন ও নিয়োগের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।*

উপসংহার

প্রথম পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প

ইহার উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) সুদক্ষ এবং সম্প্রসারণশীল অংশ হিসাবে দেখা হইয়াছে। অর্থ-ব্যবস্থার এই অংশ একদিকে কৃষি এবং অপরদিকে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত গভীরভাবে সম্পর্কিত। উপরন্তু, পরিকল্পনাধীন সময়ে কুটির ও হস্ত শিল্পের সাহায্যে প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্যাদিও উৎপাদন করিবার প্রচেষ্টা করা হইবে।† এ-সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অসুবিধা এবং তাহাদের প্রতিবিধানের উপায় (Difficulties of Cottage and Small-scale Industries and their Remedies) :

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব থাকিলেও কতকগুলি অসুবিধা বা দুর্বলতার দরুন এই শিল্পগুলি প্রসারলাভ করিতে পারিতেছে না। মূলধনের অভাব, অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি বা কলাকৌশল, বিক্রয়-করণের অব্যবস্থা, শিল্পীদের অজ্ঞতা, উপযুক্ত ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের সুব্যবস্থার অভাব হইল এই অসুবিধাগুলির মধ্যে প্রধান।

(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা : নিয়মিতভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের সুব্যবস্থা না থাকায় কারিগরদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই কাঁচামাল মিল বা কারখানা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু সময়মত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উহা পাইবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁত

প্রধান প্রধান অসুবিধা

* Second Five Year Plan—৪১৯ পৃষ্ঠা।

† „ „ „ „—৪৩১-৩৩ পৃষ্ঠা।

শিল্প মিলে বুনা সুতা ব্যবহার করিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সুতাকল নিজস্ব কাপড়ের মিলের চাহিদা সর্বাগ্রে পূরণ করে। গত যুদ্ধের সময় সুতার দুষ্প্রাপ্যতার দরুন তাঁত শিল্পের উৎপাদন বিশেষ ব্যাহত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ থাকার জন্যও কাঁচামালের মূল্য অধিক হয়; এবং ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বাড়িয়া যায়। সুতরাং শিল্পিগণকে উপযুক্ত ধরনের কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রয়োজন সমবায়িক পন্থার সাহায্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা। সমবায়িক পন্থা যে শুধু কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করে তাহাই নহে, উহাতে দামেও সুবিধা হয়।

কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধার ফলে ব্যয়বৃদ্ধি

সমবায়িক পন্থায় কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ

(২) পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব : কৃষকদের মতই কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। সম্বলহীন বলিয়া তাহারা মহাজন বা কারখানাদারের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। চড়া সুদ আদায় ব্যতীত কারখানাদার স্বল্প মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সর্তে ঋণদান করিয়া থাকে। এইভাবে শিল্পিগণ তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। অন্যান্য দেশে সমবায় সংগঠনগুলি ক্ষুদ্র শিল্পকলা সংরক্ষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতে কিন্তু শিল্প সংক্রান্ত সমবায়িক আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। অথচ এ-সম্পর্কে সমবায়িক সংগঠন ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্টতর পন্থা নাই। রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শক্তিশালী সমবায় সংগঠন গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির এই সুপারিশ বিশেষ সমর্থনযোগ্য। আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল (The Ford Foundation International Planning Team) সুপারিশ করে যে, (ক) সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে; (খ) প্রত্যেক রাজ্যেই রাজ্য অর্থ করপোরেশন (State Financial Corporation) প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (গ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে অধিক পরিমাণে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণদান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে; এবং (ঘ) সম্পত্তির ভিত্তিতে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্পর্কে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার আলোচনা একটু পরেই করা হইবে। তাহার পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের 'গ্রাম্য ও ও ক্ষুদ্র শিল্প (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) কমিটি' [The Village and Small Industries (Second Five Year Plan) Committee] যাহা সাধারণত 'কার্ভে কমিটি' (The Karve Committee) নামে সুপরিচিত এই সম্পর্কে যে-সুপারিশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। কমিটির মতে, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও শিল্পস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যে-অর্থসাহায্য করিবে তাহা রাজ্য অর্থ করপোরেশনের মাধ্যমে করা সমীচীন।

পুঁজির অভাবের ফল

পুঁজির অভাব দূরিকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দলের সুপারিশ

কার্ভে কমিটির সুপারিশ

এই করপোরেশন দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। যে-সর্তে বর্তমান শস্য-ঋণ (crop loans) দেওয়া হয় অনুরূপ সর্তে কেন্দ্রীয় সমবায়িক প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে চলতি মূলধন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংককে (The State Bank of India) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের দিকে অধিক লক্ষ্য দিতে হইবে। এই প্রসংগে স্রোফ কমিটির (The Shroff Committee) একটি মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য। সরকার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত যে-সকল দ্রব্য ক্রয় করে তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে অযথা বিলম্ব করে। ইহাতে স্বল্প সম্বলসম্পন্ন উৎপাদককে কার্যকরী মূলধন সম্পর্কে অসুবিধায় পড়িতে হয়। সুতরাং উৎপাদক যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার প্রাপ্য মূল্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্রোফ কমিটির মন্তব্য

(৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল: এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধুনিক পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই। গবেষণা ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অ-পর্যাপ্ত। বিভিন্ন শিল্পের পরিচালনাও সুসংগঠিত করা হয় নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নয়ন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইহারা মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে। সুতরাং স্বল্প উৎপাদন-ব্যয়ে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়বাজারের সম্প্রসারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই শিল্পগুলিকে সংগঠিত করিতে হইবে, আধুনিক উন্নত ধরনের ছোটখাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রবর্তন করিতে হইবে এবং দেশী ও বিদেশী বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ডিজাইন ও প্যাটার্ণের বিভিন্নতা প্রবর্তন করিতে হইবে।

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল * কয়েকটি মূল্যবান-সুপারিশ করে। এই দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে চারিটি শিল্পকলা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (Institutes of Technology) স্থাপনার প্রস্তাব করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের কলাকৌশল এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করিবে; গবেষণার ফলাফল, উন্নততর পদ্ধতি ও কলাকৌশল, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প ও কারিগরগণকে জানাইয়া দিবে। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল 'ডিজাইন' বা নক্সার উন্নয়নের জন্য 'ডিজাইন' সম্পর্কিত একটি জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করে।

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের সুপারিশ:

সম্প্রতি অবশ্য সর্ব-ভারতীয় খাদি এবং গ্রাম্য শিল্প-বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তপরিচালিত তাঁতশিল্প বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি সংস্থাগুলি শিক্ষাদান, কলাকৌশল,

* ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

ডিজাইন প্রভৃতির উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। মোটকথা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসার করিতে হইলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও ডিজাইনের প্রবর্তন, উত্তম ধরনের দ্রব্য উৎপাদন, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রদর্শনী ও প্রচারকার্যের ব্যাপক প্রসার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বিস্তারিত ও সহজলভ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনপদ্ধতির ব্যবহার কারিগরগণ যথাযথভাবে শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষা-সহ-উৎপাদন (training-cum-production) কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য গবেষণাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলির (The National Laboratories) সহিত যোগাযোগ রাখিয়া এই গবেষণাগারগুলিকে চলিতে হইবে। এই প্রসংগে মনে রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত করা অবশ্য প্রয়োজন হইলেও যন্ত্রিকরণের ফলে বেকারের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায় তাহার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা

(৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা: বিক্রয়করণের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের আর একটি প্রধান অসুবিধা। একাধিক মধ্যবর্তী ব্যবসাদারের শোষণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের নিকৃষ্টতার দরুন উৎপাদক ন্যায্য মূল্য পাইতে সমর্থ হয় না। এই অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায়িক পন্থায় বিক্রয়করণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করা। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্থাপিত জাতীয় সমবায়িক উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড, সর্ব-ভারতীয় পণ্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং রাজ্য পণ্য সংরক্ষণ কোম্পানী কৃষিজ পণ্যের সংগে সংগে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াও বিক্রয়করণের অসুবিধা অনেকাংশে দূর করিতে পারে। আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যতীতও বিদেশে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপরন্তু, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফলে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব দেশী ও বিদেশী বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাকে বিভিন্ন সম্ভাব্য পন্থায় সম্প্রসারিত করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য দেশে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়করণের অসুবিধা হইতেছে—কারণ যে-পরিমাণে এবং যে-নমুনা অনুযায়ী দ্রব্যাদি তাহারা চাহিতেছে তাহা সরবরাহ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্দিষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আবার অন্যান্য দেশের ক্রেতারা ভারতীয় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য সম্পর্কে খবরাখবর জানে না। সুতরাং অন্যান্য দেশে অবস্থিত শিল্প প্রদর্শনীগুলিতে অংশগ্রহণ, বাণিজ্য প্রতিনিধি দল আমন্ত্রণ ও প্রেরণ, বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান, ব্যাপক প্রচারকার্য প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে। উক্ত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

সমবায়িক পন্থাই বিক্রয়করণের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিকার

বিক্রয়-বাজার প্রসারের বিভিন্ন পন্থা

দল বিদেশী বাজার প্রসারের জন্য 'রপ্তানী উন্নয়ন অফিস' (Export Development Offices) প্রতিষ্ঠা করিবার সুপারিশ করে। আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী, স্থায়ী মিউজিয়াম, প্রচারকার্য প্রভৃতির মাধ্যমে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। সম্প্রতি সরকার এ-বিষয়ে সচেতন হইয়াছে। তাঁত শিল্প, খাদি ও গ্রাম্য শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি সংক্রান্ত বোর্ডগুলি বিক্রয়-কেন্দ্র, প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসারসাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সরকার তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ব্যাপারে উপযুক্ত ধরনের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করিতে পারে।

এ-সম্পর্কে সাম্প্রতিক সরকারী প্রচেষ্টা

(৫) বৃহৎ শিল্পজাত ও আমদানীকৃত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা: অনেক ক্ষেত্রে কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য (যেমন, তাঁত বস্ত্র) বৃহৎ শিল্পজাত বা বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। এই অদক্ষতা বা অক্ষমতা সর্বক্ষেত্রেই কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পের যে সহজাত দুর্বলতা তাহা নহে; বহুলাংশে ইহা হইল বহুদিনের অবহেলা ও কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতার ফল। সুতরাং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠিত করা। যে-পর্যন্ত না প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারে সে-পর্যন্ত সাময়িকভাবে বৃহৎ শিল্পগুলির উপর উৎপাদন শুল্ক (cess) বসাইয়া, কতিপয় ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনকে নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া, বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানির উপর বাধানিষেধ বসাইয়া, কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ বা ছাড় (rebates) বাদ দিয়া, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনে অর্থসাহায্য করিয়া সরকারকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হইতে হইবে।

প্রতিযোগিতার প্রতিবিধানের চূড়ান্ত ও আশু উপায়

(৬) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধন: কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক বা সাহায্যকারী সংস্থা হিসাবে কার্য করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা আংশিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার বৃহৎ শিল্পের জন্য আনুষংগিক দ্রব্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করিতে পারে—যেমন, যন্ত্রপাতির জন্য স্ক্রু, বল্টু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যেই সহজে উৎপাদিত হইতে পারে। ১৯৫৫ সালে যে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন (National Small Industries Corporation Ltd.) স্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্যতম কর্তব্য হইল ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে এই প্রকার সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা করা।

সমন্বয়সাধনের প্রকৃতি ও পন্থা

রাষ্ট্র এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (The State and Cottage & Small-scale Industries) : স্বাধীনতা লাভের পর সরকার ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহার প্রসারসাধনের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করে। ১৯৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল ভারত সরকার শিল্পনীতি সম্পর্কে যে-ইস্তাহার প্রকাশ করে তাহাতে জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage and Small-scale Industries under the First Five Year Plan) : তারপর আসিল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য এবং ক্ষুদ্রায়তন ও হস্ত শিল্প গ্রামোন্নয়ন ও নিয়োগের সংস্থা হিসাবে বিশেষ স্থান পায়। প্রাচীন শিল্পগুলির সমস্যার ভালভাবে বিচার-বিবেচনার জন্য কেন্দ্রে একটি খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কলা-কৌশলের উন্নয়ন, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি পন্থার কথা ব্যতীত পরিকল্পনায় বলা হয় যে, যেখানে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে সে-ক্ষেত্রে কুটির শিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থাগুলি হইল : (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ ; (২) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধ করা ; (৩) বৃহৎ শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক বসান ; (৪) কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা ; এবং (৫) গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতির সমন্বয়সাধন। গ্রাম্য তৈলশিল্প, তিল তৈলের সাহায্যে সাবান তৈয়ারি, ধান ভানা, তালের গুড় তৈয়ারি, হস্তনির্মিত কাগজ, মক্ষিকা পালন প্রভৃতির উন্নয়ন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্পের প্রসারের জন্য কলাকৌশলের উন্নয়ন, শিক্ষাদান, গবেষণা, অর্থসাহায্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। খেলার সরঞ্জাম, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, কাঁসা-পিতলের শিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নও পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়। সর্বক্ষেত্রে সমবায়িক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৩১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যয়িত হয় ৩৩·৬ কোটি টাকা।* এখন ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় সংক্ষেপে তাহাদের পর্যালোচনা করা যাইতে পারে।

এই সকল শিল্পের উন্নয়নকল্পে অবলম্বিত বিভিন্ন ব্যবস্থা

সমবায়িক সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ

ব্যয়-বরাদ্দ

(১) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত রাজ্য সরকারসমূহের দায়িত্ব হইলেও প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিচার-বিবেচনা ও সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কতকগুলি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রধান বোর্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

* India—1959

(ক) সর্ব-ভারতীয় খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (All-India Khadi and Village Industries Board): ১৯৫৩ সালে খাদি ও গ্রাম্য শিল্প উন্নয়নের জন্য এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাদান, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পরামর্শ প্রদান, উৎপাদন, বিক্রয়করণ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা এই বোর্ড গ্রহণ করিয়াছে।

১। বিভিন্ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা

(খ) সর্ব ভারতীয় তাঁতশিল্প বোর্ড (All-India Handloom Board): তাঁতশিল্পকে সুসংগঠিত এবং তাঁতদ্রব্য বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে এই বোর্ড ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রধানত তন্তুবায়দের মধ্যে সমবায় সংগঠন প্রসারের জন্য বোর্ড অর্থসাহায্য করে। বোর্ডের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়করণ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। একটি নক্সা বা ডিজাইন বিভাগও খোলা হইয়াছে। বিদেশী বাজারে বিক্রয় যাহাতে প্রসারলাভ করে তাহার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। গ্রামে গ্রামে বিক্রয়-কেন্দ্র খোলারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) সর্ব-ভারতীয় হস্ত শিল্প বোর্ড (All-India Handicrafts Board): হস্ত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই বোর্ডও ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। হস্তশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষত উৎপাদন এবং দেশে ও বিদেশে বিক্রয়ের প্রসারসাধন সম্পর্কে বোর্ড সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। ইহা ব্যতীত হস্তশিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান ও অর্থসাহায্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বোর্ড পরামর্শ-দান করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরে উন্নত ধরনের কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, গুণাগুণের মান নির্ধারণ, গবেষণা পরিচালনা, নূতন ডিজাইন ও প্যাটার্ণ প্রবর্তন এবং কাঁচামাল সরবরাহ সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনা বোর্ড গ্রহণ করিয়াছে। হস্তশিল্পের দ্রব্যাদিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বোর্ড দিল্লীতে একটি সর্ব-ভারতীয় মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড (Central Silk Board): ১৯৪৯ সালে এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৫২ সালে বোর্ডকে ব্যাপকতর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হয় এবং সমস্ত রেশমশিল্পকে ইহার অধীনে আনয়ন করা হয়। গত কয়েক বৎসরে রেশমশিল্প বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। অত্যধিক মূল্য ও বিদেশ হইতে আমদানির ফলে রেশমশিল্পের যথোপযুক্তভাবে প্রসার হয় না। বোর্ড কাঁচা রেশমের মূল্যহ্রাস, রেশম-শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে রেশমশিল্পের প্রসারের চেষ্টা করিতেছে। রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনাসমূহকে বিচার-বিবেচনার জন্য একটি কলাকৌশল উন্নয়ন কমিটিও (a Technical Development Committee) নিযুক্ত হইয়াছে।

(ঙ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scal eIndustries Board): ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহাদের কার্যের সমন্বয়সাধন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য সম্প্রতি এই বোর্ড সংগঠি তহইয়াছে।

(চ) নারিকেল-কাতা শিল্প বোর্ড (Coir Board): কিছুদিন পূর্ব হইতে বিদেশী বাজারে নারিকেল-কাতাজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় নারিকেল-কাতা শিল্প সংকটাবস্থায় পড়ে, এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশী ও বিদেশী বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি, উন্নত ধরনের কলাকৌশল প্রবর্তন এবং বিক্রয়করণের সুব্যবস্থা করিয়া যাহাতে এই শিল্পকে সংরক্ষিত করা যায় তাহার জন্য এই বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

পশ্চিমবংগে বিভিন্ন বোর্ড

রাজ্যগুলিকেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য অনুরূপ ধরনের বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবংগ খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (The West Bengal Khadi and Village Industries Board), রাজ্য তাঁতশিল্প বোর্ড (The State Handloom Board) এবং রাজ্য কুটির শিল্প বোর্ড (The State Cottage Industries Board) রহিয়াছে।

২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা

(২) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যাহাতে প্রসারলাভের সুযোগ-সুবিধা পায় এবং যাহাতে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে তাহার জন্য কতকগুলি নীতির প্রবর্তন করা হয়। প্রথমত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যার্থে বৃহৎ শিল্পের উপর সেস (cess) বসান হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁত ও খাদি শিল্পের উন্নয়নের জন্য মিলের কাপড়ের উপর প্রতি গজে শতকরা ২ ভাগ শুল্ক বসানর কথা পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। এইভাবে সেস হইতে প্রাপ্ত অর্থ তাঁত শিল্পের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয়।* দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে সরকার কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-প্রসারের জন্য রিবেট বা রেয়াৎ (rebates) দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়। যথা, সাধারণত তুলাতাঁত বস্ত্রের বিক্রয়ের উপর শতকরা ৬ ভাগ রিবেট বা রেয়াৎ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। খাদির ক্ষেত্রে এই রেয়াতের হার হইল অনধিক শতকরা ১৯ ভাগ। তৃতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সংরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়—যেমন, তাঁতশিল্পের প্রসারের জন্য মিলগুলি পূর্বের উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র ধুতি কাপড় উৎপাদন করিতে পারে।

৩। মূলধনের অভাব দূরিকরণের প্রচেষ্টা

(৩) প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মূলধনের অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টাও করা হয়। 'শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের' (State Aid to Industries Acts) অর্থসাহায্যের সর্তাবলীকে অধিকতর সহজ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ক্ষুদ্রায়তন ও মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নকল্পে ঋণদানের সুযোগ-সুবিধাদানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য অর্থ করপোরেশন' (State Financial Corporations) স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর

---

* ২৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এইরূপ করপোরেশনের সংখ্যা ছিল মোট ১২। রিজার্ভ ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনের শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২০ ভাগ যোগান দিয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন লিমিটেড' (National Small Industries Corporation Ltd.) নামে এক সংস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। এই করপোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল: (ক) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নিকট হইতে যাহাতে সরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটা মোটা অংশ ক্রয় করে তাহার ব্যবস্থা করা; (খ) প্রাপ্ত ক্রয়নির্দেশ যাহাতে পূরণ করিতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে ঋণদান ও কলাকৌশল বিষয়ে সাহায্য করা; (গ) যাহাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় আনুষংগিক দ্রব্যাদি বা দ্রব্যের অংশবিশেষ উৎপাদন করিতে পারে তাহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। ইহা ছাড়া যাহাতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ব্যাংক এবং অনুরূপ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সহজে ঋণ পাইতে পারে তাহার জন্য করপোরেশন গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারে।* রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন করিয়া কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়করণের সাহায্যার্থে রাজ্য সমবায়িক ব্যাংকগুলিকে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India) রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে অর্থ-সাহায্যকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়সাধনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন ও উহার কার্যাবলী

এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রথমে ৯টি নির্বাচিত অঞ্চলে 'পাইলট স্কীমের' (Pilot Scheme) প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে ঐ 'স্কীম' ৩৫টি কেন্দ্রে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে রাজ্য ব্যাংকের যেখানে যেখানে শাখা আছে সেই সকল কেন্দ্রেই স্কীমটি চালু করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে এই কার্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে সমাধা করা হইবে।

পাইলট স্কীম

(৪) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যাদির সরকারী ক্রয় যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সরকারী ক্রয়নীতির বিচার-বিবেচনার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি (Stores Purchase Committee) নিযুক্ত করিয়াছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকারের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্য সরবরাহের ভার একমাত্র গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পকেই দেওয়া হয়।

৪। ক্রয় ব্যাপারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

(৫) ভারতীয় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল ১৯৫৩ সালে ভারতে আসে এবং ১৯৫৪ সালে এক রিপোর্ট দাখিল করে।

* Report on Banking and Currency for 1954-55—৫১ পৃষ্ঠা

এই আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল চারিটি কলাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান (Regional Small Industries Service Institute or Regional Institutes of Technology), একটি বিক্রয়করণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (A Marketing Service Corporation) এবং একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (A Small Industries Corporation) স্থাপনের সুপারিশ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য হইল কলাকৌশল ও সংগঠনের উন্নয়ন, ঋণ ও অর্থ সংগ্রহ, বিক্রয়করণ, সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন, প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে সাহায্য করা। প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের সমন্বয়সাধনের ভার হইল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডের উপর।

৫। আন্তর্জাতিক দল ও উহার সুপারিশ

পরিকল্পনাধীন সময়ে মাদুরাই, বোম্বাই, কলিকাতা এবং ফরিদাবাদে চারিটি কলাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশনও স্থাপিত হয় ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি।* ইহার উপর খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়নকল্পে কলাকৌশলের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে।

(৬) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেও হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সমাজোন্নয়ন ব্লকগুলিতে একজন করিয়া 'ব্লক শিল্পোন্নয়ন কর্মচারী' (Block Industrial Development Officer) নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক ব্লকে হস্তচালিত ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন-দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত।

৬। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে প্রথম পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে মোট ব্যয়-বরাদ্দ করা হয় ৩১ কোটি টাকা; কিন্তু মোট ব্যয় হয় ৩৩·৬ কোটি টাকা। এই ব্যয় ও অন্যান্য পন্থা অবলম্বনের ফলে এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বহু পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। প্রথমত, পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁতশিল্প তাহার সংকটাপন্ন অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। কলাকৌশলের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান চারিটি নানাভাবে সাহায্য করিতেছে। বিভিন্ন বোর্ড তাহাদের বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

সরকারী ক্রয়নীতি কমিটির সুপারিশ অনুসারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের সরকারী ক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ, সরকারী অফিস প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য দিন দিন অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে। বিক্রয়-সংগঠনের উন্নতির জন্য সাধারণ বিক্রয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

* Report on Banking and Currency for 1955-56—৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Cottage and Small-scale Industries under the Second Five Year Plan) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তনের শিল্পের উন্নয়নকল্পে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা প্রথম পরিকল্পনার কার্যক্রম হইতে অনেকাংশে বৃহত্তর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে প্রধানত ১৯৫৫ সালের জুন মাসে নিযুক্ত 'গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) কমিটি' বা কার্ভে কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া। সুপারিশ করিবার সময় কার্ভে কমিটি তিনটি প্রধান লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত হয়—যথা,

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহত্তর কার্যক্রম

কার্যক্রমের তিনটি প্রধান লক্ষ্য

(ক) কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে শিল্পে নিয়োগের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে ;

(খ) পরিকল্পনাধীন সময়ে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে যথাসম্ভব নিয়োগবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইবে,

(গ) বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ-ব্যবস্থা (decentralised society) এবং ক্রমসম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

কার্যক্রমের বিশ্লেষণ

১। বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থা

বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে কেবল পদ্ধতি বা কৌশলগত পরিবর্তনই বুঝায় না। ইহার অর্থ হইল, কৌশলগত পরিবর্তন এইভাবে করিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত শিল্প একক যেন অর্থ নৈতিক কর্মসম্পাদনে সমর্থ হয়। ইহার প্রয়োজন হইল "উন্নয়নশীল ব্যাপক গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে পিরামিডের ন্যায় শিল্পগত সংগঠন।"

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে নানাভাবে রক্ষা করা হইলেও, সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হইল উক্ত বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ক্ষেত্রাংশকে (decentralised sector) স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা এবং উহাকে বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করা। সুতরাং রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র উৎপাদকগণের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান মাধ্যম হইল পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিল্পগত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় এইরূপ সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

এই অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়িক ভিত্তি

দ্বিতীয়ত, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন-কার্যক্রমের সমতার (Common Production Programme) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। ইহার জন্য তিনটি প্রধান পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছিল—যথা, (১) উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ, (২) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার সীমাবদ্ধকরণ, এবং (৩) বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের উপর সেস্ বা শুল্ক বসান। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই পন্থাগুলি

২। উৎপাদন কার্যক্রমের সমতা

বিশেষভাবে অনুসৃত হইবে। ইহার উপর সরাসরি উৎপাদনের উপর অর্থসাহায্য (subsidy on production) অথবা বিক্রয়ের উপর রেয়াৎ (rebates on sales) দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইবে। তাঁতশিল্পজাত ও খাদিদ্রব্যের উপর রেয়াতের দরুন মোট ২৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

৩। সরকারী ক্রয়নীতি

তৃতীয়ত, সরকারী ক্রয়নীতিকে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের আরও অনুপন্থী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা করা হইবে।

৪। বিক্রয়করণ ব্যবস্থার সংগঠন

চতুর্থত, সমবায় পন্থা এবং সরকারী ক্রয়নীতি ছাড়াও গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা বিক্রয়করণ ব্যবস্থাকে আরও সুসংগঠিত করা হইবে।

৫। গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার

পঞ্চমত, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহকে যথাসম্ভব এই বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার উন্নয়নে নিয়োগ করা হইবে।

৬। বাসস্থানের উন্নয়ন

ষষ্ঠত, শিল্পিগণের বাসস্থানের উন্নয়ন হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৭। ঋণ ও মূলধন সরবরাহ

সপ্তম স্থলে আছে, ঋণ ও মূলধন সরবরাহের কথা। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পিগণের পক্ষে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য স্বল্পকালীন বা চলতি মূলধন ছাড়াও সমবায়িক সমিতির শেয়ার মূলধনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইবে। এই অর্থ বা ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য প্রয়োজন হইল রিজার্ভ ব্যাংক, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রাজ্য অর্থ করপোরেশন এবং কেন্দ্রীয় সমবায়িক ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি সংহতিপূর্ণ নীতির। পূর্বোল্লিখিত 'পাইলট পরিকল্পনা'র দ্বারা ইতিমধ্যেই এই দিকে কার্যারম্ভ করা হইয়াছে।

৮। শিল্প-শিক্ষার সম্প্রসারণ

অষ্টমত, শুধু ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (গ্রাম্য শিল্প বাদ দিয়া) সম্বন্ধেও কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিল্প-শিক্ষার সম্প্রসারণের ব্যবস্থাই প্রধান। এই উদ্দেশ্যে প্রথমত, 'শিল্প-শিক্ষা সম্প্রসারণ সেবার (Industrial Extension Service) প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই সেবার কর্মিগণ কারিগর-দিগকে নূতন নূতন কলাকৌশল অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করিয়া বেড়ায়। দ্বিতীয়ত, চারিটি আঞ্চলিক শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Regional Institute of Technology) উপর ১২টি উচ্চ শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫টি শাখা প্রতিষ্ঠান এবং ৬২টি শাখা শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহার উপর ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া 'শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠান' (Institute of Technology) স্থাপন করা হইবে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় উপরি-উক্ত শিল্প শিক্ষার কেন্দ্রে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হয় এবং শিক্ষা কেন্দ্রগুলি হইতে শিক্ষার্থী বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কতকগুলি শিল্পগ উপনিবেশ (Industrial Estates) প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্মদক্ষতাবৃদ্ধি উৎপাদনে সমত

আনয়ন এবং মালমশলা ও যন্ত্রপাতির সুযোগ্য ব্যবহারের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শিল্প-উপনিবেশের উদ্দেশ্য হইল কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প একককে (small-scale units) অবস্থান বৈদ্যুতিক শক্তি, জল সরবরাহ, রেলপথ প্রভৃতি সংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। এই শিল্প-উপনিবেশের অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে কার্ভে কমিটি সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, ইহাদের স্থাপনের ফলে যেন গ্রামাঞ্চল হইতে নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বিশেষ স্থানান্তরিকরণ না ঘটে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ৯২টি শিল্প-উপনিবেশ স্থাপন করিবার কথা। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ২৭টি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। বাকী ৬৫টির স্থাপন কার্য শেষ দুই বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সুতরাং ছোট ছোট সহরের নিকটেই ইহাদের স্থাপন করা হইতেছে, নগর বা মহানগরের নিকটে নহে।

শিল্পগত সম্প্রসারণ সেবা

৯.। শিল্প উপনিবেশ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে মোট ব্যয় করা হইয়াছিল ৩১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হইয়াছে ২০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে অবশ্য অম্বর চরকার উপর কোন বরাদ্দ-ব্যবস্থা নাই। অম্বর চরকা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও বরাদ্দ এবং অম্বর চরকা লইয়া বর্তমানে যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহা সমাপ্ত হইলে ঘোষিত হইবে। সুতরাং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে মোট ব্যয়-বরাদ্দ উক্ত ২০০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া যাইবে।

ব্যয়-বরাদ্দ

অম্বর চরকা (Ambar Charka): তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া ছাপাখানার পর্যায় পর্যন্ত বাহির হয় নাই। তবে যেটুকু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার কম হইবে না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা পরিসমাপ্ত করিবার পূর্বে 'অম্বর চরকা' সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। সুতাকাটা শিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত করা এবং ইহার উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করার প্রচেষ্টায় বহুদিন ধরিয়া যে-পরীক্ষা চালাইয়া আসা হইতেছে তাহারই ফলে অম্বর চরকার জন্ম। ১৯৫৬ সালের অম্বর চরকা অনুসন্ধান কমিটি (Ambar Charka Enquiry Committee) অম্বর চরকা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। কমিটি বলে যে চরম চরকার প্রবর্তনের ফলে খাদি শিল্পের সুতা সংগ্রহের সমস্যা অনেকাংশে মিটিবে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানেরও বেশ কিছু ব্যবস্থা হইবে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে ৭৫ হাজার অম্বর চরকা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে। ঠিক হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় ১৫ কোটি গজ কাপড় অম্বর চরকার সূতা দিয়া তৈয়ারি করা হইবে। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ গজের মত কাপড় অম্বর চরকার সূতা হইতে বয়ন করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

প্রশ্নোত্তর

1. What role would you assign to cottage and small-scale industries in the economy of India ?

[ইংগিত : শিল্পোন্নত দেশের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সপক্ষে কতকগুলি বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে : (১) নিয়োগের সংস্থা হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। (২) মূলধনের স্বল্পতা এবং বৃহৎ শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ করাই সমীচীন। (৩) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবিধান হিসাবেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করা উচিত। (৪) সংগঠন-দক্ষতা ও প্রয়োগ-কৌশলের দিক হইতে কুটির শিল্পের প্রসার অপেক্ষাকৃত সহজ। (৫) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কেন্দ্রীভূত শিল্প-সংগঠনের বিপদ হইতে মুক্ত। (৬) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে আর্থিক বৈষম্যের অপসারণ বহু পরিমাণে সম্ভব। (৭) কৃষিকার্যের পরিপূরক হিসাবে কুটির ও হস্ত শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। (৮) অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কার্য করিতে সমর্থ। (৯) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সামাজিক ব্যয়ভার (social costs) অপেক্ষাকৃত কম। (১০) ব্যক্তিগত উৎপাদন-ব্যয়ও অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কম। (১১) বাজারের দিক হইতেও দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের সম্ভাবনাও রহিয়াছে যথেষ্ট। ২৮৭-২৯২ পৃষ্ঠা]।

2. On what lines and by what methods would you like to develop our cottage and small-scale industries so that they may play a useful part in India's economic development? (C. U. B. A. 1959) [২৯২-২৯৬ পৃষ্ঠা]

3. What measures have been taken by Government to help cottage and small-scale industries under our planned economy ? [২৯৭-৩০৪ পৃষ্ঠা]

4. What are the reasons for the survival of cottage and small-scale industries side by side with large-scale industries in India ? [২৭৯-২৮০ পৃষ্ঠা]

5. Examine the present position of cotton handloom industry i India. What measures have been adopted for its improvement ? [২৮২-২৮৬ পৃষ্ঠা]

6. Briefly describe the development of cottage and small-scale industries under the Second Five Year Plan. [৩০২-৩০৪ পৃষ্ঠা]

7. Discuss how far it is practicable to increase the supply of essential consumer goods in India through the encouragement of small-scale and cottage industries. (C. U: B. Com. 1958)

[ইংগিত : এইরূপ ভোগ্যপণের মধ্যে তাঁতের কাপড়, গুড়, সাবান, কাঁসা-পিতলের বাসন ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে ইহাদের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে অন্তরায়ও বহুসংখ্যক। এই সকল অন্তরায় দূর করা এক প্রকার দীর্ঘকালীন ব্যাপার; অতএব রাতারাতি ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের দ্বারা ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি বিশেষ সম্ভব হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তুলার্ত‌াত শিল্পের দ্বারা বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি মাত্র ৫০ কোটি গজ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ২৮৯-২৯২ পৃষ্ঠা]

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতে শিল্পোন্নয়ন

(Industrial Development in India)

ঐতিহাসিক পরিক্রমা (Historical Survey) : অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামো এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের শিল্প-সমৃদ্ধি বিশ্ববিশ্রুত থাকিলেও বৈদেশিক শাসনের কবলে আসিয়া ভারতীয় শিল্প-সমূহের ক্রমাবনতি ঘটিতে থাকে। রাজ-দরবারের ধ্বংস, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অনুসৃত বিশেষ নীতি, ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব, সুয়েজ খাল খনন, ভারতে পরিবহন-ব্যবস্থায় অভাবনীয় উন্নতি প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধন করিয়া এই দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে ক্রমে সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল কাঁচামাল রপ্তানি এবং উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি করা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের শেষ যুগে ভারত সম্পূর্ণভাবে ইহাই করিতে লাগিল।

প্রাচীন শিল্প-সমৃদ্ধ ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধীরে ধীরে আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠিতে দেখা গেল। ব্রিটিশ মূলধন ও তত্বাবধানে চা ও পাটকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর সংগঠিত হইল কয়লাখনি শিল্প। অপরদিকে ইংরাজ উদ্যোগীদের (entrepreneurs) অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে এদেশীয় ব্যবসায়িগণ বস্ত্র শিল্পের গোড়াপত্তন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার গোড়া-পত্তন

এইরূপে শিল্পায়ন (industrialisation) সুরু হইলে পর ইহা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই দেখা যায় যে, কাপড়ের কলের সংখ্যা ৫০-এর উপর, পাটকল ৩০-এর কাছাকাছি এবং কয়লার উৎপাদন বাৎসরিক ১০ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।

শিল্প-প্রসার

এইভাবে ভারতের শিল্পোন্নয়ন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইলেও ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তরের যে-গতি—অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অর্থ-ব্যবস্থায় যে-অবস্থান্তর তাহাতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই বলা চলে। বস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্প, কয়লাখনি শিল্প যেমন একদিকে গড়িয়া উঠিতেছিল, অপরদিকে তেমনি আবার ভারত অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ও খাদ্য রপ্তানি করিতেছিল। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ উদ্যোগীদের বিনিয়োগ রেলপথ, কয়লাখনি, পাটকল, চা, কফি প্রভৃতি সেই সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল যেগুলি হইল কাঁচামাল রপ্তানির পক্ষে প্রয়োজনীয়। কাঁচামাল রপ্তানির

শিল্পোন্নয়ন ঘটিলেও অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে নাই

সহায়ক হিসাবে ছাড়া অন্য কোনরূপে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্রিটিশ সরকার সুনজরে দেখে নাই।

১৯০৫ সাল হইতে সুরু হইল স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত জড়িত বিলাতি দ্রব্য বর্জনের নীতি অনুসরণের ফলে দেশীয় শিল্পগুলি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ১৯০৫ সাল হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) মধ্যে শক্তিচালিত তুলাতাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া চতুর্গুণ হইল, পাট-তাঁতের সংখ্যা হইল চতুর্গুণের অধিক এবং কয়লার উৎপাদন হইল প্রায় ছয় গুণ। কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়িয়া ৩ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষে দাঁড়াইল। কিন্তু তবুও "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের শিল্পায়নের জন্য সকল সরকারী প্রচেষ্টাকেই ভারত সচিবের দপ্তর (Whitehall) হইতে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছিল।"

প্রথম স্বদেশী আন্দোলন ও ভারতের শিল্প-প্রসার

ইহার পরবর্তী অধ্যায় হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ। বিশ্বযুদ্ধ যন্ত্রচালিত শিল্পজ পণ্য-সমূহের অভূতপূর্ব চাহিদার সৃষ্টি করে। একদিকে যেমন বিদেশ হইতে আমদানি বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়; অপরদিকে তেমনি মিত্রশক্তিসমূহের চাহিদাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মিত্রশক্তিসমূহের প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত, পাট, চর্ম ও পশমজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান। ফলে এই শিল্পগুলি এবং আমদানির সংকোচনের জন্য বয়ন শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করে। ক্রমে ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন ইহা উপলব্ধি করে যে, ভারতবর্ষকে শিল্পে অনুন্নত রাখা সাম্রাজ্য সংরক্ষণের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে; ব্রিটেন বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় শিল্পজ পণ্য সরবরাহের ভার ভারতকে দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধি

ব্রিটিশ সরকারের নীতি-পরিবর্তন

কিন্তু যুদ্ধ পরিসমাপ্তির সংগে সংগেই ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে বিদেশী শাসকের উৎসাহ যেন স্তিমিত হইয়া আসিল। শিল্পায়নের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার এবং নূতন নূতন শিক্ষা গঠনের প্রচেষ্টা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ ভারত সচিবের দপ্তর হইতে আসিতে লাগিল। সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্পের ন্যায় ভারতের কয়েকটি সুসংগঠিত শিল্পের সমৃদ্ধি ছাড়া শিল্পায়ন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। এই প্রসংগে ডাঃ লোকনাথন বলিয়াছেন, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত শিল্পকে সাময়িক লাভে সহায়তা করা ছাড়া ভারতকে প্রকৃত শিল্পায়নের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে কোন কিছুই করে নাই।"* যুদ্ধের সময় যে-সকল নূতন শিল্প

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মোট ফল

* Lokanathan—"Industrialisation"-এর ৬ পৃষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যুদ্ধোত্তর যুগে তাহারা অবনতি অভিমুখেই অগ্রসর হইতে লাগিল; শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিযোগিতার সম্মুখে তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তিত শিল্পনীতির ফলে প্রধান প্রধান ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশে (Major British Indian Provinces) এক একটি করিয়া শিল্পদপ্তরের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইলে শিল্প প্রাদেশিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর ১৯২১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের জন্য ফিসক্যাল স্বাতন্ত্র্যের প্রথা (Fiscal Autonomy Convention) গ্রহণ করিলে ভারত তাহার ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণের জন্য ঐ সালেই একটি ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত করে। কমিশন পরবর্তী বৎসরে যে ফিসক্যাল নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে তাহাকে 'বিচারমূলক সংরক্ষণ' (Discriminating Protection) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইলেও একথা অনস্বীকার্য যে, ইহারই আওতায় ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প এবং কাগজ শিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে। ইহার মধ্যে ভারত আবার চিনি ও দিয়াশলাই-এ একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। অপরদিকে সংরক্ষণ ব্যতিরেকেও সিমেণ্ট শিল্প ভারতের সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে একরূপ সমর্থ হয়।

প্রথম ফিসক্যাল কমিশন ও বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি

সংরক্ষণের সুফল

এই প্রসংগে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প প্রসারেও বিশেষ যত্ন লইতে থাকে। শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, সরাসরি অর্থসাহায্য করিয়া, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া তাহারা বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প গঠনে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হয়।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের প্রসার

কিন্তু শিল্পায়নের পথে ভারতের এই অগ্রসরতা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে আবার বাধাপ্রাপ্ত হইল। বাধা আসিল 'সাম্রাজ্যিক সুবিধা' (Imperial Preference) নামক বিশেষ শুল্কনীতি হইতে। এই শুল্কনীতির অধীনে ভারতের বাজারে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদিকে সাম্রাজ্যের বহির্ভূত বিভিন্ন দেশ এবং ভারতের শিল্পদ্রব্য হইতে শুল্কের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে অটোয়া চুক্তিতে (Ottawa Agreements) ভারতের উপর এই শুল্কনীতি জোর করিয়াই চাপান হয়। ফলে দ্বিতীয় দশকের শুল্কনীতির দ্বারা ভারতের শিল্পায়নের যে-পথ প্রস্তুত করা হইতেছিল তাহা আবার রুদ্ধ করার ব্যবস্থা হয়। শুল্কের ভার অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় উত্তরোত্তর বর্ধিত পরিমাণে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদি ভারতের বাজারে আমদানি হইতে থাকে। ফলে স্বভাবতই বাধিয়া উঠে ব্রিটিশ ও ভারতের শিল্পস্বার্থের মধ্যে সংঘাত।

শিল্পায়নের পথে নূতন প্রতিবন্ধক—সাম্রাজ্যিক সুবিধা

ইতিমধ্যে আবার বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার (World-wide Trade Depression) ভারতের শিল্পোন্নয়নের উপর অভূতপূর্ব আঘাত হানে। ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মধ্যে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ২২৫ কোটি টাকার মত কমিয়া যায়; কিন্তু আমদানির পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকার অধিক কমে নাই। ফলে ভারতকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত মিটাইবার জন্য স্বর্ণ রপ্তানির ব্যবস্থা করিতে হয়।

বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার ও শিল্পায়নে ব্যাঘাত

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধকসমূহ সত্ত্বেও ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ভারত ধীরে ধীরে শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এই শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে একটা ধারণা নিম্নলিখিত তথ্য হইতে পাওয়া যাইবে। শিল্পোন্নয়নের ফলে ভারত আটটি শিল্পোন্নত দেশের অন্যতম হইয়া দাঁড়ায়।* যে-শিল্পগুলি এই সময়ের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে তাহারা হইল বস্ত্র শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাগজ শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঁচ শিল্প, বনস্পতি ও সাবান শিল্প। ইহাদের মধ্যে বস্ত্রের উৎপাদন তিন গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়, কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আড়াই গুণ, ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দেশের চাহিদার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মিটাইতে থাকে এবং চিনিতে ভারত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। দিয়াশলাই, কাঁচ, বনস্পতি, সাবান প্রভৃতির উৎপাদনও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়।

প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শিল্পায়নের পথে ভারতের অগ্রসরতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে কিন্তু দেখা গেল যে, ভারতের এই শিল্পোন্নয়ন বিদেশী সরকারের প্রয়োজন ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় কোন মতেই পর্যাপ্ত নহে। উপরন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে ভারত হইতে যুদ্ধের মালমসলা অধিক পরিমাণে সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, যুদ্ধে ফ্রান্স ও অন্যান্য কতিপয় ইউরোপীয় মিত্রশক্তির অতি শীঘ্র পতন হইয়াছিল, জার্মান বোমারু বিমান ইংল্যাণ্ডের বহু কল-কারখানা ধ্বংস করিয়াছিল এবং পরিশেষে জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়াকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার নীতি স্থিরীকৃত ও ঘোষিত হইয়াছিল। এই নীতি ঘোষণার পূর্বেই অবশ্য যুদ্ধের গতি অনুসরণ করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতের শিল্প-গঠন কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইহার ফল

শিল্প-গঠন কি পদ্ধতিতে হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে গ্রেডি মিশন (Grady Mission) ভারতে আসে। গ্রেডি মিশন আসিয়া দেখিল "ভারতের খনিজ সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় না।...শিল্পসমুদয় সাধারণ ব্যবসায়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়া সেইমতই কাজ চালাইতেছে; ইহাদিগকে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবার

গ্রেডি মিশন ও শিল্প-প্রসার

* 'Our Economic Problem' – Wadia and Merchant.

সম্যক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই ; এবং দক্ষ শিল্প-শ্রমিকের অভাব ভারতের শিল্পায়নের পথে কোন গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় নয়।”

ইহার পরে ভারতের শিল্প-পদ্ধতিকে পুরাপুরি যুদ্ধাভিমুখী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। এই কারণে এবং যুদ্ধের সময়ে আমদানি হ্রাস পাওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য অনেক ছোট ছোট নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিল। মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা ও যুদ্ধের অভাবনীয় চাহিদার দরুন পুরাতন শিল্পগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

ডাঃ পি. জে. টমাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্পোন্নয়নের সংক্ষিপ্তসার এইভাবে দিয়াছেন : পুরাতন শিল্পসমূহের বিশেষ উন্নতি, নূতন কলকারখানা ও নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভারতের শিল্প-সংগঠনের ভিত্তির বিশেষ প্রসারসাধন করে। এইভাবে আমরা বিস্তৃত ভিত্তিতে শিল্পায়নের পথে উপনীত হইয়াছি এবং আশা করা যায় যে, শীঘ্রই আমরা আমাদের যন্ত্রচালিত শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা (lopsidedness) দূর করিতে পারিব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের শিল্পোন্নয়নের সংক্ষিপ্তসার

পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করিয়াছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সৃষ্ট অবস্থার দরুন পুরাতন শিল্পসমূহের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা নূতন শিল্পসংগঠনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল না।* পুরাতন শিল্পসমূহের এই পূর্ণ ব্যবহার অবশ্য জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া কাম্য বিবেচিত হইতে পারে নাই —কারণ যন্ত্রাদির প্রয়োজনীয় ক্ষয়পূরণ ও পরিবর্তনের সম্যক ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই এই পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সঞ্চিত ক্ষয়-পূরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে দেশের পক্ষে দীর্ঘদিন লাগিবে।

ঐ সময়ে ভারতের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতে জাতীয় সরকার দেশের শিল্প-ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি দূরিকরণ ও শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে একটি সুস্পষ্ট সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। ইহার পর শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের সমস্যা সমাধানকল্পে একটি শিল্প অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) স্থাপিত করা হয়। তৎপরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল নূতন ফিসক্যাল কমিশন-নিয়োগ ও নূতন সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ। তারপর আসিল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ—যাহাতে অর্থ-ব্যবস্থার সর্বাংগীণ উন্নতির সহিত স্বভাবতই জড়িত আছে শিল্পোন্নয়নের প্রশ্ন। এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায় হইতে—অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে শিল্পোন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এ-সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

স্বাধীনতার পর শিল্পোদ্যম

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়ন

* First Five Year Plan-এর ৪২১ পৃষ্ঠা।

ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি (Nature of Industrial Development in India) : ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে অর্ধোন্নত দেশের শিল্প-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই আছে শিল্পোন্নয়নের অ-পর্যাপ্তি। প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমিক সরবরাহের তুলনায় ভারতে শিল্পোন্নয়ন কোন মতেই পর্যাপ্ত হয় নাই। ইহা বিদেশী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী (Economic Imperialists) শাসকের অধীনস্থ থাকারই ফল। এই শাসক সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঔপনিবেশিক রূপদান করিয়াছিল; তাহারা এদেশ হইতে কাঁচামাল রপ্তানি ও তাহাদের নিজের দেশ হইতে এদেশে শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ আমদানির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। নিজস্ব প্রয়োজনবোধেই তাহারা আবার—যেমন দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে—কখনও কখনও শিল্পায়নে কিছু কিছু সহায়তা করিয়াছিল।

১। বৈশিষ্ট্য : শিল্পোন্নয়নের অ-পর্যাপ্তি

কারণ

দ্বিতীয়ত, বিদেশী শাসকের আমলে ভারতে শিল্পায়ন কখনও দেশের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে করা হয় নাই। ফলে ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ (unbalanced or lopsided)। দেশে মূল শিল্প (basic industries) বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই। এদিক দিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল যে ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিল্পোন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল ভোগ্য-দ্রব্যের উপর এবং মূল উৎপাদকের দ্রব্যের উৎপাদন সকল সময়ই অবহেলিত হইয়াছিল।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর হইবার পূর্বেই ভারত তুলাজাত বস্ত্র, চিনি, সাবান, দিয়াশলাই, লবণ প্রভৃতিতে একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন তখন সম্ভাব্যতার পরিসীমাতেও পৌঁছায় নাই।

২। অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প-ব্যবস্থা

অসামঞ্জস্যতার দুইটি দিক : ক। মূল শিল্পে অনগ্রসরতা

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতার আর একটি দিক আছে। ইহা হইল কয়েকটি শিল্পের অতিমাত্রায় আঞ্চলিকতা বা স্থানীয়করণ (localisation)। বস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্প, চিনি শিল্প প্রভৃতির ন্যায় ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ইহার ফলে ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে আঞ্চলিকতার অসুবি বায়; গুলি বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প-প্রতি 'কোম্পানী' কয়েকটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকিলেও কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্র ছড়া সমগ্র দেশব্যাপী। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয় নিয়াদের পত্তন হয় পায়। এইরূপ অনাবশ্যকভাবে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে বলিয়াও ইস্পাত কারখানা দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য অনেক ক্ষেত্রে হটিয়া আসি পিণ্ড (pig iron)

খ। অত্যধিক আঞ্চলিকতা

আঞ্চলিকতার কুফল

* First Five Year Plan-এর ৪২১ পৃষ্ঠা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির অভাব, শিল্প-শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত অদক্ষতা, শিল্পপতিগণের দূরদৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি হইল ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন-ব্যয়ের আধিক্যের অন্যান্য কারণ। শ্রমিকপিছু উৎপাদন হিসাব করিলে দেখা যায় যে ইহা অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উপায় নাই যে, ভারত শিল্পোন্নত হইয়া শিল্পে অনগ্রসর—ভারতের শিল্পোন্নয়ন হইল অ-পর্যাপ্ত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহাই অর্ধোন্নত দেশের শিল্প-ব্যবস্থার প্রকৃতি।

ভারত শিল্পোন্নত হইয়াও শিল্পে অনগ্রসর

তবে বর্তমানে রূপান্তর সুস্পষ্টভাবে সূচিত হইয়াছে। আমাদের সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের প্রতিও সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। গ্রামময় ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় বিস্তৃততর শিল্পগত ভিত্তির (broader industrial base) দিকে। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পগত ভিত্তি আরও বিস্তৃততর (still broader) করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিকল্পনাকারিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে জীবনযাত্রার অতি নিম্ন ও স্থিতিশীল মান, অর্ধ নিয়োগ ও বেকারাবস্থা, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধান প্রভৃতি অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কৃষির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতারই ফল। অতএব, দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমেই উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা গঠন করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ কৃষিকে উপেক্ষা করা নহে। ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে কৃষিকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলিতে পারে না। শিল্প ও কৃষিকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য করিয়াই উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা গঠনে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমানে ইহাই করা হইতেছে। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে কিছুটা উপেক্ষা করা হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর আবার সম গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Trace briefly the history of industrial development in India up to the introduction of planned economy. [৩০৬-৩১০ পৃষ্ঠা]

2. "The industrial system of India is unevenly and is in most cases inade-
পরিকা-ately developed." Elucidate. (C. U. B. Com. 1949)
শিল্পোন্নয়ন -গিত: ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে, সামঞ্জস্যপূর্ণও নহে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমিক
-নায় ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ভারতে সকল প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থার দ্বিতীয় -ঠ নাই এবং যে শিল্প-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অতিমাত্রায় আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট
-১২ পৃষ্ঠা]
উপর সবিশেষ গুরু- the nature of industrial development of an underdeveloped
করা হইতেছে। -ht of Indian conditions. (পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেখ।)

---

* First Five Yea-

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভারতের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প

(Important Manufacturing Industries of India)

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) : লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অন্যতম মূল শিল্প। ইহার উপরই দেশের সামগ্রিক শিল্পায়ন বিশেষ নির্ভর করে। ইংল্যাণ্ডে ইহাকে ভিত্তি করিয়াই শিল্প-বিপ্লব সুরু হইয়াছিল। আমাদের দেশে কিন্তু এই শিল্পের ইতিহাস হইল অতি প্রাচীন। দিল্লীর কুতব মিনারের নিকট লৌহস্তম্ভ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা আনুমানিক ৪১৯ সালে নির্মিত। কিন্তু আমাদের ইস্পাত শিল্প ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। প্রাচীন দামাস্কাসের সুবিখ্যাত তরবারি ভারতের হায়দরাবাদ অঞ্চল হইতে আমদানীকৃত ইস্পাতেই নির্মিত হইত এরূপ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগেও ভারতের ইস্পাত শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পী আঘারীয়ারা প্রায় সারা ভারতেই ছড়াইয়াছিল। কিন্তু বিদেশী যন্ত্রোৎপাদিত সুলভ বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় তাঁতীদের যেরূপ বয়নকার্য ছাড়িয়া কৃষিতে ভিড় করিতে হইয়াছিল, ঠিক সেইভাবেই আঘারীয়ারা একদিন তাহাদের বর্ণগত পেশা ত্যাগ করিয়া কৃষিকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অন্যতম মূল শিল্প

ভারতের প্রাচীন ইস্পাত শিল্প

আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা করেন জোসিয়া মার্শাল হীথ (Josiah Marshall Heath) নামক এক শিল্পোদ্যোক্তা। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। ইহার পর ১৮৭৫ সালে বাংলাদেশের কুলটিতে 'বরাকর লৌহ কারখানা' নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানায় মাত্র লৌহই তৈয়ারী হইয়াছিল, ইস্পাত তৈয়ারী হয় নাই। কিছুদিন পরে এই কোম্পানী 'বরাকর লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীর' (Barakar Iron and Steel Company) অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়; এবং পরে এই সমগ্র কোম্পানী আবার 'বংগদেশের লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী' (Bengal Iron and Steel Company) নামে পরিচিত হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা : আধুনিক পদ্ধতির সূত্রপাত

এ-পর্যন্ত কিন্তু ভারতের আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত বুনিয়াদের পত্তন হয় নাই। এই ঘটনা ঘটে ১৯০৭ সালে টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে। টাটার কারখানায় ১৯১১ সাল হইতে লৌহ পিণ্ড (pig iron)

এবং ১৯১২-১৩ সাল হইতে ইস্পাত তৈয়ারী সুরু হয়। শীঘ্রই টাটা কোম্পানী লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন-পদ্ধতিতে যুগান্তরের সূচনা করে। কিভাবে পূর্ণাংগ উৎপাদন-পদ্ধতিতে (integrated production system) ব্যয়সংক্ষেপ ও বহুল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতে তাহারই পথপ্রদর্শক টাটার লৌহ কারখানা।

আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত ভিত্তিস্থাপন: টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা

টাটার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আরও দুইটি বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়—যথা 'ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী' (The Indian Iron and Steel Co.) এবং 'মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা' (The Mysore Iron and Steel Works)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে বিদেশী প্রতিযোগিতার দরুন ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িলে উহাকে ১৯২৪ সালে ৩ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করা ছাড়াও প্রত্যক্ষ অর্থসাহায্য (bounty) করিয়াও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে সংরক্ষণ দান

সংরক্ষণের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আবার সংরক্ষণের প্রার্থনা জানায় এবং তাহা মঞ্জুর করা হয়। এইভাবে বারবার সংরক্ষণ দানের পর ১৯৩৭ সালে শুল্ক বোর্ড (Tariff Board) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই শিল্পের পক্ষে আর সাধারণ সংরক্ষণের প্রয়োজন নাই; তবে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের অন্যায্য প্রতিযোগিতা (dumping) হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে। সুতরাং যে-শুল্ক লৌহ ও ইস্পাত জাত দ্রব্যের উপর ধার্য করা হয় তাহাকে সংরক্ষণমূলক শুল্ক অপেক্ষা ডাম্পিং-প্রতিরোধকারী (anti-dumping) শুল্ক বলিয়াই অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিসংগত। এই ডাম্পিং-প্রতিরোধকারী শুল্কের মেয়াদ ১৯৪৭ সাল অবধি চলে। তারপর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে একরূপ সম্পূর্ণভাবে অবাধ বাণিজ্যের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

এই শিল্পকে ডাম্পিং হইতে সংরক্ষণ

সংরক্ষণ ও ডাম্পিং-প্রতিরোধকারী শুল্কের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের যে-উন্নতি ঘটে তাহাকে আশাতীত বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই শিল্প দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ মিটাইতে সমর্থ হয় এবং রপ্তানিও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এই উন্নতি প্রধানত টাটা কোম্পানীরই উন্নতি—কারণ অপর দুইটি কারখানা—যথা, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা—ইস্পাত তৈয়ারী সুরু করিতে করিতেই সংরক্ষণের সময় একরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল।

সংরক্ষণের ফলে এই শিল্পের আশাতীত প্রসার

এই প্রসার একরূপ টাটারই প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও অন্যান্য দিকে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। নূতন নূতন দ্রব্যাদি উৎপাদন, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইল এই সকল দিক। উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে ৭ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩½ লক্ষ টনে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই শিল্পের উন্নতি

যুদ্ধের পর কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৪৯ সালে ইহা ৯ লক্ষ টনের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫০ সাল হইতে আবার উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায়। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে সুরু হইয়াছে আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা এখন করা হইতেছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে উৎপাদন হ্রাস

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry under Planned Economy): ভারতের লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত (private sector) প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং (২) সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত (public sector) প্রতিষ্ঠানসমূহ। প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান মাত্র দুইটি—যথা, টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় চারিটি—যথা, মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং 'হিন্দুস্থান ইস্পাত' নামক সংস্থার অধীনস্থ রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের কারখানা তিনটি। প্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল পুরাতন ও নূতনের মধ্যে। পুরাতন প্রতিষ্ঠান বলিতে বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত প্রথম দুইটি এবং সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানাটিকে বুঝায়। ইহারা ইস্পাত উৎপাদন করিয়া আসিতেছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগের পূর্ব হইতে। নূতন প্রতিষ্ঠান হইল হিন্দুস্থান ইস্পাত সংস্থার অধীন রুরকেলা ভিলাই ও দুর্গাপুরের কারখানা তিনটি।

প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীবিভাগ

প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান

নূতন-পুরাতন সকল লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন-কেন্দ্রের মধ্যে টাটার প্রতিষ্ঠানই হইল সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহা শুধু ভারতের মধ্যে নহে সমগ্র কমন্‌ওয়েল্‌থের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান।* পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহার উৎপাদন-পদ্ধতি পূর্ণাংগ (integrated) এবং সংরক্ষণের আওতায় ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের যে-উন্নতি তাহা প্রধানত টাটার প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি। বর্তমানে ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় ১৫ লক্ষ টন নির্মিত ইস্পাত (finished steel)। কিছুদিন পূর্বেও ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল মাত্র ৯ লক্ষ টন। ৯ লক্ষ টন হইতে ১৫ লক্ষ টনে

১। টাটার প্রতিষ্ঠান

---

* Dr. Verrier Elerin—The Story of Tata Steel.

এই যে উৎপাদনের-ক্ষমতা বৃদ্ধি ইহা সংঘটিত হইয়াছে ভারত সরকার ও বিশ্বব্যাংক-প্রদত্ত ঋণ দ্বারা। ১৯৫৭ সালে টাটার প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ইস্পাত উৎপাদনে এই প্রতিষ্ঠান যে-কোন দুইটি প্রতিষ্ঠানের সমান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান

বর্তমান ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান (Indian Iron and Steel Co.) ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং বাংলার ইস্পাত করপোরেশন (Steel Corporation of Bengal) এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির ফল। প্রতিষ্ঠান দুইটি ১৯৫৩ সালে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান নামেই পরিচিত হয়। ইহা আসানসোলের নিকটবর্তী বার্ণপুরে অবস্থিত। সংযুক্তির পর প্রতিষ্ঠানটি মোট ৪২·৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া মোট উৎপাদন-ক্ষমতাকে ৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার এক কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের জামিনে বিশ্বব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক-প্রদত্ত ঋণে উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি ছাড়াও কিছু আধুনিকিকরণের ব্যবস্থা করিয়াছে।

৩। মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা

মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা পূর্বতন দেশীয় রাজ্য মহীশূর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়। সুতরাং মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাই হইল সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই মূল শিল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠান। অপর দুইটি লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মহীশূরের প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষুদ্র। ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল মাত্র ২৫ হাজার টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ভারত সরকার প্রদত্ত ঋণে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ১ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

৪। রুরকেলার প্রতিষ্ঠান

১৯৪৮ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বা নির্মীয়মাণ লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উড়িষ্যার রুরকেলার কারখানাই হইতেছে সর্বপ্রথম। ইহা স্থাপনের জন্য ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার ক্রুপস ও ডেমাগ (Krupps and Demag) নামে এক জার্মান শিল্প-সমবায়ের সহিত বিনিয়োগ-মূলধন ও শিল্পজ্ঞান সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পরে (১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) ঘোষণা হয় যে, জার্মান শিল্প-সমবায়ের নিকট হইতে বিনিয়োগ-মূলধন গ্রহণ করা হইবে না, প্রয়োজনীয় মূলধনের সমস্তটাই সরবরাহ করিবে ভারত সরকার। ফলে ইহা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানা-ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গণ্য হইবে।

রুরকেলার কারখানায় প্রথমে মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন নির্মিত ইস্পাত উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়। পরে উৎপাদন-ক্ষমতাকে দ্বিগুণ করিয়া

৭ লক্ষ ২০ হাজার টনে লইয়া যাওয়া হয়। কারখানা স্থাপনের ব্যয় ১৭০ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া বর্তমানে অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রুরকেলার কারখানায় প্রথম পিণ্ড লৌহ উৎপাদনকারী চুল্লীর (blast furnace) কার্যারম্ভ হয়। বর্তমানে এই কারখানা হইতে দৈনিক গড়ে ১ হাজার টন করিয়া পিণ্ড লৌহ উৎপন্ন হইতেছে এবং ইস্পাত উৎপাদন কার্যও সুরু হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে যে ১৯৬১ সালের মধ্যে কারখানাটির উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবে। তখন আবার ইহার উৎপাদন-ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়া ১০ লক্ষ টনের উপরে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশের ভিলাই (Bhilai) নামক স্থানে দ্বিতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠানটি সোবিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় স্থাপিত। কারখানা স্থাপনের (সন্নিহিত নগর বাদে) মোট অনুমিত পরিবর্তিত ব্যয় (revised estimate) হইল ১৩১ কোটি টাকা। ভিলাই কারখানার চুল্লীরও কার্যারম্ভ হয় ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে ভিলাই কারখানা হইতে ৮ লক্ষ টনের কাছাকাছি ইস্পাত উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিয়নের সহিত আর এক দফা চুক্তির বলে উৎপাদন-ক্ষমতাকে ২৫ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫। ভিলাই-এর কারখানা

সরকারী উদ্যোগে নির্মীয়মাণ তৃতীয় লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান হইল পশ্চিমবংগের দুর্গাপুরের কারখানা। ইহা ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এক ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের * সহযোগিতায় নির্মিত। সম্পূর্ণ হইলে এই কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা ৯ লক্ষ টন হইবে। –এই কারখানার প্রথম পিণ্ড লৌহ উৎপাদনকারী চুল্লীর উদ্বোধন করা হয় ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে।

৬। দুর্গাপুরের লৌহ কারখানা

বলা হইয়াছে যে রুরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরের সরকারী উদ্যোগাধীন কারখানা তিনটি হিন্দুস্থান ইস্পাত লিমিটেড নামক সংস্থার অধীনে পরিচালিত। এই সংস্থার মালিকানা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের এবং ইহার অনুমোদিত মূলধন ৩০০ কোটি টাকা।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই যে সরকারী প্রচেষ্টা ইহা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এই মূল শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপেরই ফল। এ-পর্যন্ত এই শিল্পের উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ সরকারী সহায়তা করা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে সংরক্ষণ দান করিয়া পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ইহাতে একমাত্র টাটার প্রতিষ্ঠানই বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা অথবা পুরাতন

এই মূল শিল্পের অনগ্রসরতাও ইহার কারণ

---

* প্রতিষ্ঠানটির নাম হইল Indian Steel Works Construction Company Ltd.

প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা কোনটিই আমাদের বিদেশী সরকার করে নাই। ফলে এই মূল শিল্প পশ্চাৎপদ রহিয়া সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পোন্নয়নকে ব্যাহত করিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প যে কতটা পশ্চাৎপদ তাহা একটি মাত্র তুলনামূলক আলোচনা হইতেই সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লৌহ-মাক্ষিক সঞ্চিত আছে। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চিত লৌহ-মাক্ষিকের তিন গুণেরও অধিক। অথচ ভারতে মাত্র বৎসরে ১০ লক্ষ টনের কাছাকাছি ইস্পাত উৎপন্ন হইত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ইহাকে সামান্য বৃদ্ধি করিয়া ১৩ লক্ষ টনের কিছু উপরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ইস্পাত উৎপন্ন হয় ১০ কোটি টনের উপর। জনসংখ্যার দিক দিয়া ইস্পাত উৎপাদনে যদি ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে উপনীত হইতে হয় তবে আমাদিগকে বৎসরে ২৩ কোটি টন করিয়া ইস্পাত উৎপাদন করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমাদিগকে ইস্পাত উৎপাদনে ব্রিটেনেরই সমকক্ষ হইতে হয় তবে উক্ত ১৩ লক্ষ টনের ৫২ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই শিল্প কতটা অনগ্রসর

এইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধির উপর। এই পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প ও খনিজের খাতে সরকারী ক্ষেত্রে পরিবর্তিত বরাদ্দ ৮৮০ কোটি টাকার মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য ৫১০ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়।* ইহার দ্বারা নির্মিত ইস্পাত (finished steel) উৎপাদনের ক্ষমতাকে ৪৭ লক্ষ টনে এবং প্রকৃত উৎপাদনকে ৪৩ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ইহা হইল ২৩১ শতাংশ বৃদ্ধি।** কিন্তু বর্তমানে আশংকা করা যাইতেছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২৬ লক্ষ টনের অধিক ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে উৎপাদন-বৃদ্ধি

মোট ২৬ লক্ষ টন নির্মিত ইস্পাত উৎপাদন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। সেইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ কোটি টন ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। ইহাও অবশ্য পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্র হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার এই লক্ষ্যেরই বিরোধিতা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ঐ পরিকল্পনায় ৯০ লক্ষ টনের

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan—৫ এবং ৬১ পৃষ্ঠা।

** ইস্পাত পিণ্ড (steel ingots) উৎপাদনের ক্ষমতা স্বভাবতই ইহা অপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইবে। অনুমান করা হইয়াছে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড উৎপন্ন হইবে।

অধিক ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন করিলে আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক হইবে। এই বিরোধিতার জন্য এখন পর্যন্ত ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হয় নাই।

এই প্রসংগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সরকারী শিল্পনীতি অনুসারে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে নূতন নূতন লৌহ ও ইস্পাত প্রতিষ্ঠান সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেই স্থাপিত হইবে। এই নীতি অনুসারে দামোদর উপত্যকার বোকারোতে আরও একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার কথা ছিল। বর্তমানে কিন্তু ইহার পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগাধীনে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ইহা কার্যে পরিণত হইলে সরকারী শিল্পনীতি স্বভাবতই পরিবর্তিত হইবে।

তুলাবস্ত্র শিল্প (Cotton Textile Industry) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পূর্বে প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্পের তালিকায় সর্বপ্রধান স্থানাধিকার করিত তুলাবস্ত্র শিল্প। এখন সেই স্থান অধিকার করিয়াছে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। কয়েক দিক দিয়া অবশ্য এখনও তুলাবস্ত্র শিল্পের জন্য প্রধান স্থান নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, ইহা প্রাচীনতম ভারতীয় যন্ত্রচালিত শিল্প। ১৯৫৪ সালে ইহার শতাব্দী পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এখনও পর্যন্ত বোধ হয় এই শিল্পই বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। কিছুদিনের মধ্যে অবশ্যই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এই দিক দিয়া এই শিল্পকে ছাড়াইয়া যাইবে। তৃতীয়ত, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও সর্বাধিক। শুধু তুলাবস্ত্র উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত আছে প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক।* চতুর্থত, ইহা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় পুঁজি ও উদ্যোগে সংগঠিত। পঞ্চমত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে উল্লেখযোগ্যভাবে মাত্র যে দুইটি শিল্পের উন্নয়ন হইয়াছিল, তুলাবস্ত্র শিল্প তাহার মধ্যে একটি। অপরটি হইল পাটকল শিল্প। ষষ্ঠত, ইহা শুধু প্রধান ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প নহে, অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পও বটে।

গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য :

ভারতের তুলাবস্ত্র শিল্পের ইতিহাস সুরু করিতে হয় ১৮১৮ সাল হইতে। ঐ সালে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় কাপড়ের কলটি স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরেই অবশ্যই কলটি বন্ধ হইয়া যায়। তুলাবস্ত্র শিল্পের পরবর্তী এবং প্রকৃত অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৮৫৪ সালে। এবার কেন্দ্র আর কলিকাতা নহে, বোম্বাই। বোম্বাই অঞ্চলে ধীরে ধীরে একটির পর একটি করিয়া কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে লাগিল। এইভাবে ১৮৫৪ সালে মাত্র ১টি হইতে ১৯০১ সালে কলের সংখ্যা মোট ১৬৮-তে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা : সূচনা ও অগ্রগতি

* India, 1959.

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত তুলাবস্ত্র শিল্পের এই যে অগ্রগতি ইহা অব্যাহতভাবে হয় নাই। ল্যাংকাশায়ারের স্বার্থে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলেন যে ভারতের বিদেশী সরকার ল্যাংকাশায়ারের মিলগুলির স্বার্থে ভারতীয় তুলার উন্নয়নে উৎসুক ও সচেষ্ট ছিল এবং ঐ একই কারণে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের প্রতি ইহা ছিল বিমুখ।*

অগ্রগতির পথে বাধা

তবুও তুলাবস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। ১৯০৫ সালের প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। এই সময় বাংলাদেশ, সংযুক্তপ্রদেশ (United Provinces) প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইহা হইয়া দাঁড়ায় দুইটি প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্পের একটি। বিশ্বযুদ্ধের সময় উৎপাদনের পরিমাণ দেড়গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে কাপড়ের কলের সংখ্যা ২৫০-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

প্রথম স্বদেশী আন্দোলন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অগ্রগতি

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার এই শিল্পের অবস্থা জাপানের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। তখন ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলি হইতে আমদানির উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করায় এই শিল্প কার্যত দ্বিতীয় দফা সংরক্ষিত হয়। ইহার প্রায় সংগে সংগেই সুরু হয় দ্বিতীয় স্বদেশী বা আইন অমান্য আন্দোলন। এই দুই-এর সমন্বিত ফলে আমাদের তুলাবস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি আবার সুরু হয়, যদিও জাপানী প্রতিযোগিতার ফলে এই অগ্রগতি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের অবস্থা

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে স্বভাবতই ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পে তেজী বাজারের (boom condition) সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক নূতন কাপড়ের কল স্থাপিত হইতে থাকে, উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়া বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করা হইতে থাকে এবং উৎপাদনও বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরিসংখ্যান দিয়া বলিতে গেলে, ১৯৩১ সালে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৩১৪ এবং বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ ৬৭ কোটি গজের মত। ১৯৪১ সালে কলের সংখ্যা এবং বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৩৯৬ এবং ১০৯ কোটি গজে দাঁড়ায়। ১৯৪৪ সালে কলের সংখ্যা একরূপ অপরিবর্তিত থাকিলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৪৮৫ কোটি গজে পৌছায়। ব্রিটিশ আমলে ভারতে ইহাই হইল তুলাবস্ত্র উৎপাদনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত বা রেকর্ড।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

পরাধীন ভারতের উৎপাদনের রেকর্ড

* Wadia and Merchant, Our Economic Problem.

এই অভূতপূর্ব বস্ত্রোৎপাদন কিন্তু ভারতের বস্ত্র-সংকটের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ভারতের কলগুলি যখন এত অধিক বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে তখনই ভারত বস্ত্র-সংকটের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছে; এবং বস্ত্রের এই দুর্ভিক্ষ দূরিকরণের জন্য সরকারকে নানাবিধ প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

যুদ্ধকালীন বস্ত্র-সংকট

শিল্পের দিক দিয়াও অভূতপূর্ব বস্ত্রোৎপাদন মোটেই কাম্য বিবেচিত হয় নাই। যন্ত্রপাতির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের দ্বারাই তুলাবস্ত্র শিল্পে যুদ্ধকালীন সৌভাগ্য আনয়ন করা হইয়াছিল। যন্ত্রপাতির এই ক্ষয়পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অথবা উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে মূলধনবৃদ্ধির ব্যবস্থা—কোনটিই করা হয় নাই। ফলে যুদ্ধোত্তর যুগের মন্দা বাজারে এই শিল্পকে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

যুদ্ধোত্তর যুগের মন্দা বাজার সুরু হইতে না হইতেই আসিল দেশবিভাগ। ইহার ফলে ভারতের দুইটি প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প—তুলাবস্ত্র শিল্প ও পাটকল শিল্প কাঁচামালের জন্য আমদানির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। অবিভক্ত ভারতের বর্তমান পাকিস্তানভুক্ত অঞ্চলসমূহ হইতেই প্রধানত এই দুই শিল্পে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হইত।

দেশবিভাগ ও তুলাবস্ত্র শিল্প

প্রথম প্রথম অবশ্য দেশবিভাগ তুলাবস্ত্রের ক্ষেত্রে সুফলই আনয়ন করিয়াছিল। নবসৃষ্ট পাকিস্তান ভারত হইতে বহু পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করিতেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাসজনিত (devaluation) কারণে ভারত-পাক বাণিজ্যে যে-সংকট দেখা দেয় তাহার ফলে পাকিস্তানে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানিই যে শুধু রুদ্ধ হইয়া যায় তাহা নহে, পাকিস্তান হইতে ভারতে তুলা আমদানিও বন্ধ হইয়া যায়। এই তুলার অধিকাংশ ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নোপযোগী দীর্ঘ আঁশের তুলা। স্বভাবতই মিলগুলি ঐরূপ বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। এমনকি অনেক মিলকে দরজা বন্ধও করিতে হয়। ফলে বস্ত্র শিল্প হইয়া উঠে অন্যতম সমস্যা প্রপীড়িত শিল্প (problem industry)। কাঁচা তুলার অভাবে উৎপাদন হ্রাস পাইতে পাইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৩৭১ কোটি গজে আসিয়া দাঁড়ায়।

পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য-সংকটও এই শিল্পের সমস্যা

১৯৫০-৫১ সাল হইতেই সুরু হইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে মিলে উৎপাদিত তুলাবস্ত্রের পরিমাণকে ৩৭১ কোটি গজ হইতে ৪৭০ কোটি গজে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির করা হয়। কিন্তু ১৯৫৪ সালের মধ্যেই এই নির্দিষ্ট অংক অতিক্রম করিয়া মোট প্রায় ৫০০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হয়। ইহা ১৯৪৪ সালের উৎপাদন-রেকর্ড ভংগ করে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে উৎপাদন ইহা হইতেও বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৫৩০ এবং ৫৩৪ কোটি গজে দাঁড়ায়।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উৎপাদন

তুলাবস্ত্রের এই অভাবনীয় উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইতিমধ্যে কাঁচা তুলার আমদানি সরল ও সহজ হইয়া উঠিয়াছিল; ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে কাপড়ের বিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছিল; এবং রপ্তানি ও উৎপাদন শুল্ক বিশেষ পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছিল।

উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম যুগে বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতির আর একটি সূচক হইল তুলাবস্ত্র দ্রব্যের (cotton piece goods) রপ্তানি বৃদ্ধি।

রপ্তানি বৃদ্ধি

১৯৫০ সালে ভারত মোট ৮০ কোটি টাকা মূল্যের ১২৭ কোটি গজের মত তুলাবস্ত্র দ্রব্য রপ্তানি করিয়া রপ্তানি বাণিজ্যের এই বিষয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু পরবর্তী বৎসর হইতে ব্রিটেন, জাপান, এবং শেষে নয়াচীন মধ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে তুলাবস্ত্রের রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে ভারতের রপ্তানি ক্রমশ কমিতে থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই রপ্তানির মূল্য মাত্র ৪৫ কোটি টাকার কিছু উপরে দাঁড়ায়। অপরদিকে আবার দেশে লোকপিছু বস্ত্র-ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ১৬ গজ হইতে ১৮ গজে দাঁড়াইলেও চাহিদা ততটা সম্প্রসারিত হয় নাই। এই দুই কারণের সমন্বিত ফলে মজুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত উৎপাদন কিছুটা কমিয়া ৪৯৩ কোটি গজে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ও রপ্তানি হ্রাস

১৯৪৯ সালের রপ্তানি প্রসার কমিটির (Gorwalla Export Promotion Committee) সুপারিশ অনুসারে তুলাবস্ত্র দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি রপ্তানি প্রসার পরিষদ (Export Promotion Council) স্থাপিত হয়। পরিষদ দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহে (Far Eastern Countries) তুলাবস্ত্রের বাজারের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৫৫ সালে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদলের সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন দেশে পরিষদের শাখা খোলা হয় এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির অংক ১১০ কোটি গজে নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমানে চৈনিক প্রতিযোগিতার দরুন উহা আরও কমাইয়া ৮০ কোটি গজ বা ৫২ কোটি টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। এই লক্ষ্যেও পৌঁছিতে তুলাবস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করা প্রয়োজন।

রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

ভবিষ্যতে রপ্তানির জন্য নির্দিষ্ট অংক

তুলাবস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল তিনটি—যথা, কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যা, তুলাতাঁত শিল্পের সহিত সমন্বয়ের সমস্যা এবং যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশনের (rationalisation) সমস্যা।

বর্তমান সমস্যা

প্রথমে কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় ভারতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেও লম্বা আঁশযুক্ত তুলার জন্য ভারতকে এখনও

* India, 1960.

বেশ কিছুদিন ধরিয়া অনেকাংশে আমদানির উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অবশ্য লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদনের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তবে ইহা বলা হইয়াছে যে, এই উৎপাদন বৃদ্ধি সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।* সুতরাং পর্যাপ্ত পরিমাণে লম্বা আঁশের তুলা উৎপাদন করিতে সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিবর্তে কতটা কাঁচাতুলা আমদানিতে ব্যয় করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে।

১। কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যা

তুলাতাঁত শিল্পের (cotton handloom) সহিত যন্ত্রচালিত বস্ত্র শিল্পের সমন্বয়ের সমস্যাকে উভয় শিল্পেরই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলিয়া অভিহিত করা যায়। তুলাতাঁত শিল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের আলোচনা প্রসংগে পূর্বেই করা হইয়াছে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে শুধু তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে নহে, সকল ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের বেলাতেই, ইহাদের এবং ইহাদের প্রতিযোগী বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা নির্দেশ করা হইয়াছে। পারস্পরিক উৎপাদন-ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নকল্পে যন্ত্রোৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের উপর সেস ধার্য করা, প্রভৃতি হইল এই সমন্বয়সাধনের পন্থা। এই সকলের ফলে বস্ত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের কিছু কিছু সুরাহা হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যন্ত্রোৎপাদিত বস্ত্রের উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে সামগ্রিকভাবে বস্ত্রোৎপাদন দেশের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় পর্যাপ্ত হয় নাই। এই প্রসংগে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলেন যে, ভবিষ্যতে তুলাবস্ত্র শিল্প এবং তুলাতাঁত শিল্পের সমন্বয়সাধনের কার্যক্রম দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারণ করিতে হইবে।

২। তুলাতাঁত শিল্পের সহিত সমন্বয়ের সমস্যা

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা

যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশনের সমস্যা কিছুদিন হইতে ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পকে প্রপীড়িত করিতেছে। ইহার মধ্যে প্রধান কারণ হইল বিদেশী, বিশেষ করিয়া জাপানী, চৈনিক ও পাকিস্তানী প্রতিযোগিতা। জাপানী, ব্রিটিশ প্রভৃতি বস্ত্র শিল্প আধুনিকভাবে সংগঠিত এবং চৈনিক ও পাকিস্তানী বস্ত্র শিল্প রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে নানাভাবে সহায়তা পাইয়া থাকে। ফলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প মধ্য ও দূর প্রাচ্যের রপ্তানি বাজার অনেকাংশে হারাইয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের অন্যতম পন্থা হইল ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকেও আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা। কিন্তু ভারতের বর্তমান নিয়োগ পরিস্থিতি

৩। র‍্যাসানালাইজেশনের সমস্যা

* Second Five Year Plan-এর ২৬৩ পৃষ্ঠা।

হইতেছে র‍্যাসানালাইজেশনের বিশেষ অন্তরায়। অনুমান করা হইয়াছে যে, বস্ত্র শিল্পের র‍্যাসানালাইজেশনের ফলে ৭ লক্ষ লোকের কর্মচ্যুতি ঘটিতে পারে। যখন আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হইল অধিকতর নিয়োগের ব্যবস্থা করা তখন এক দিক দিয়া প্রয়োজনীয় হইলেও বস্ত্র শিল্পের র‍্যাসানালাইজেশনের দ্বারা অত অধিক লোকের কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা সমর্থন করিতে পারা যায় কিরূপে? সুতরাং বর্তমানে তুলাবস্ত্র শিল্পের আধুনিকিকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও র‍্যাসানালাইজেশনের পথে সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কার্ভে কমিটিও (Karve Committee)* ধীরে ধীরে র‍্যাসানালাইজেশনের পথে পদসঞ্চার করিতে উপদেশ দিয়াছে।

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া কল্পনা করা যায়

তবুও দুইটি কারণে ভারতীয় তুলাবস্ত্র শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা না করিয়া থাকা যায় না। প্রথমত, ভারতে লোকপিছু বস্ত্র ব্যবহার অত্যন্ত কম। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা ছিল ১৬ গজ মাত্র। মিশর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কথা ধরিলেও এই অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ঐ দুই দেশে বাৎসরিক লোকপিছু বস্ত্র ব্যবহার হইল যথাক্রমে ১৮ গজ ও ২২ গজ। বস্ত্র-অনুসন্ধান কমিটির (The Textile Enquiry Committee) সুপারিশ অনুসারে লোকপিছু বস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ১৮ গজেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।† এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

আধুনিকিকরণের ব্যবস্থা

দ্বিতীয়ত, তুলাবস্ত্র দ্রব্যের রপ্তানি বাজারকেও বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। সুতরাং কিছু পরিমাণ র‍্যাসানালাইজেশন অপরিহার্য। বর্তমানে এই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (NIDC) তুলাবস্ত্র শিল্পকে আধুনিকিকরণের জন্য নানাভাবে সাহায্য করিয়া চলিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে আধুনিকিকরণের মোট ব্যয়ের শতকরা ২৫ ভাগ টাকা জমা দিলেই জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া দেয় এবং বাকী ৭৫ ভাগ টাকা সহজ কিস্তিতে পাঁচ বৎসরে পরিশোধ করিতে হয়। বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য অবলম্বিত অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন-শুল্ক (excise duties) হ্রাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালে সকল প্রকার বস্ত্রের উপর উৎপাদন-শুল্ক হ্রাস এবং ঐ শুল্ককে যুক্তিসিদ্ধ (rationalised) করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বস্ত্র উৎপাদনকে (total textile production) ৬৭০ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮৪০ কোটি গজে লইয়া যাওয়া স্থির হয়। এই

---

* ৩০২ পৃষ্ঠা দেখ।

† Summary of the Plan-Frame Papers-এর ৮ পৃষ্ঠা।

অতিরিক্ত উৎপাদনের মধ্যে তুলাবস্ত্র শিল্পের (cotton textile industry) ভাগে পড়ে ৫০ কোটি গজ। বাকী ১২০ কোটি গজ উৎপাদনবৃদ্ধির ভার তুলাতাঁত শিল্পের (handloom industry) উপর অর্পিত হয়। উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য তুলাবস্ত্র শিল্প খাতে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।*

উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্য

তৃতীয় পরিকল্পনায় তুলাবস্ত্রের উৎপাদন-লক্ষ্য কত হইবে তাহা এখনও (মে, ১৯৬০) জানা যায় নাই। তবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ৮০ কোটি গজ বা ৫৬ কোটি টাকার মত বস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইবে।

পাটকল শিল্প (Jute Mill Industry) : তুলাবস্ত্র শিল্পের আলোচনাকালে বলা হইয়াছে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে তুলাবস্ত্র শিল্প এবং পাটকল শিল্প—মাত্র এই দুইটিই ছিল ভারতের সংগঠিত শিল্প। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয়েরই সূত্রপাত হয় এবং উভয়েরই ক্রমোন্নতি ঘটিতে ঘটিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উভয়েই একরূপ সুসংগঠিত হইয়া উঠে।

তুলাবস্ত্র শিল্প ও পাটকল শিল্পের উদ্ভব ও প্রসারগত এইরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও গঠন ও প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে যথেষ্ট। প্রথমত, তুলাবস্ত্র শিল্প সংগঠিত হয় দেশীয় উদ্যোগ ও মূলধনে কিন্তু পাটকল শিল্পের প্রসার ঘটে বিদেশী পুঁজি ও তত্ত্বাবধানে। বর্তমানে বিদেশী পুঁজির একাংশ ভারতীয় শিল্পপতিগণের নিকট হস্তান্তরিত হইলেও তত্ত্বাবধান মূলত এখনও বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, তুলাবস্ত্র শিল্প হইল প্রধানত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প—বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু পাটকল শিল্পের গুরুত্ব হইল বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী হিসাবে। পূর্বে রপ্তানি পণ্য হিসাবে পাটজাত দ্রব্যের স্থান ছিল প্রথম। পর পর কয়েক বৎসর এই স্থান চা শিল্পকে ছাড়িয়া দিতে হইলেও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি মূল্য এখনও সকল পণ্যের মোট রপ্তানি মূল্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। তৃতীয়ত, আঞ্চলিকতার দিক দিয়া পাটকল শিল্প হইল তুলনাবিহীন। পাটকল শিল্পের ন্যায় কেন্দ্রীভূত শিল্প ভারতে আর নাই। ভারতের মোট ১১২টি রেজেষ্ট্রীভুক্ত পাটকলের মধ্যে ১০১টি কলিকাতার চারিপার্শ্বে হুগলী নদীর দুই তীরে অবস্থিত।† চতুর্থত, সংগঠন-দক্ষতাতেও পাটকল শিল্প তুলনাবিহীন। ইহা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংগঠিত শিল্প। পরিশেষে, অন্যান্য শিল্পের ন্যায় পাটকল শিল্প কখনও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। ইহা সংরক্ষণের সাহায্য ব্যতীতই প্রসারলাভ করিয়াছে।

বৈশিষ্ট্য :

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৫৮ ও ৭২ পৃষ্ঠা।

† Census of Indian Manufactures, 1956.

প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৫ সালে। ১৮৭৭ সাল হইতে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিতে থাকে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পাটকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০-এ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলের সংখ্যা ও উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। পাটকল শিল্পের এই অগ্রগতি ১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ফলে ব্যাহত হইলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবার সৌভাগ্য আনয়ন করে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা: সূচনা ও প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ইহার পরেই কিন্তু দেশবিভাগের ফলে কাঁচাপাট সরবরাহের প্রধান কেন্দ্রগুলি পূর্ব পাকিস্তানভুক্ত হওয়ায় ভারতীয় পাটকল শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথম প্রথম পূর্ব পাকিস্তান হইতে কাঁচাপাট আমদানি করার অসুবিধা প্রকট হইয়া উঠে নাই; কিন্তু ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত ভারত-পাক বাণিজ্য সংকটের ফলে ভারতীয় পাটকলের পক্ষে কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা জীবনমরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানে যে শুধু অধিক পাট উৎপন্ন হয় তাহা নহে, উৎকৃষ্ট পাটের অধিকাংশও এখানে উৎপন্ন হয়।

দেশবিভাগ ও পাটকল শিল্পের জীবনমরণ সমস্যা

পাটকল শিল্পের এই সংকটাবস্থা দূরিকরণের জন্য ভারতীয় ইউনিয়নে অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্ট জাতের পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা তীব্রভাবে করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলপ্রসূও হয়। পরে পাকিস্তানের সহিত তত্ত্বগতভাবে বাণিজ্য-সংকট দূর হইলে ঐ দেশ হইতেও পাট আমদানি চলিতে থাকে। পাকিস্তান হইতে আমদানির পরিমাণ অবশ্য ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

সকল দিক দিয়া বর্তমান অবস্থার বিচার করিয়া পাটকল শিল্পকে একটি সমস্যাপূর্ণ শিল্প (problem industry) বলিয়া বর্ণনা করা চলে। দেশবিভাগের ফলে তুলাবস্ত্র শিল্পও একটি সমস্যাপূর্ণ শিল্পে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বর্তমানে সমস্যা একরূপ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপরদিকে পাটকল শিল্প বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমস্যার সম্মুখীনই রহিয়াছে। পাটকল শিল্পের সমস্যাসমূহকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। (১) নিয়মিতভাবে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা, (২) বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমস্যা, (৩) পরিবর্তের (substitutes) সহিত প্রতিযোগিতার সমস্যা।*

বর্তমান সমস্যা:

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে ভারতীয় ইউনিয়নে চাষের পরিমাণ বাড়াইবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারত এখনও কাঁচাপাট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। পরিকল্পনার প্রাক্কালে হিসাব করা হইয়াছিল যে ভারতের পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য মোট ৭৩½ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট প্রয়োজন।† কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে ৫০ লক্ষ

১। কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা

---

* Problems of the Indian Jute Mill Industry, J. I. Jamieson.

† Second Five Year Plan-এর ২৬৪ পৃ।

গাঁইটের মত কাঁচা পাট উৎপন্ন হয়। সুতরাং হয় পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না, না হয় কাঁচা পাট যোগানের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বর্তমানে অবশ্য সকল পাটকলগুলির পূর্ণ ক্ষমতার ব্যবহার হইতেছে না বলিয়া পাকিস্তান হইতে আমদানির বিশেষ প্রয়োজন হয় না; এমনকি ১৯৫৯ সালে ভারত কিছু কাঁচাপাট রপ্তানি করিতেও সমর্থ হয়। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী বা কাম্য কোনটাই নহে। ১৯৬০ সালের মধ্যভাগ হইতে আবার কাঁচাপাটের অভাবে অনেকগুলি কল আংশিকভাবে বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয় এবং পাকিস্তান হইতে পাট আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অতএব, ভবিষ্যতে উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দেশে কাঁচাপাট উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোনমতেই পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল থাকা যুক্তিযুক্ত হইবে না—কারণ পাকিস্তান হইতে আমদানি অনেক পরিমাণে দৈব নির্ভরশীল এবং এই আমদানির মূল্যও পরিবর্তনশীল।

আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কিন্তু অনুমিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না

আভ্যন্তরীণ উৎপাদন কিন্তু অনুমিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে পাট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩ লক্ষ গাঁইটে। পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বাড়িয়া ৪২ লক্ষ গাঁইটে পরিণত হয়।* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ৫৫ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইলে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে সরবরাহ একরূপ পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু ইহাতেও পৌছান সম্ভব কিনা কে জানে! সংগে সংগে আবার কাঁচা-পাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য যে বৈদেশিক বাজার ক্রমশ হারাইতেছে তাহার অন্যতম কারণ হইল ভারতীয় পাটকলগুলি কর্তৃক নিকৃষ্ট জাতের কাঁচাপাট ব্যবহার। ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির মতে, পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাজার বজায় রাখিতে হইলে কাঁচাপাটের উৎপাদনবৃদ্ধি অপেক্ষা উহার জাত উন্নয়নের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে।**

২। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সমস্যা

ভারতীয় পাটকল শিল্পের পৃথিবীতে একচেটিয়া বাজার আর নাই। এখন পাটজাত দ্রব্যের বাজারে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী হইতেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানে পাটকল শিল্পের সম্প্রসারণ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। সম্প্রতি জাপানেও পাটকল শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানী ও জাপানী পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পাকিস্তান ও জাপান ছাড়া কয়েকটি ইয়োরোপীয় দেশও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে আমাদের প্রতিযোগী। ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির উক্তি অনুসারে এই সকল ইয়োরোপীয় দেশ বর্তমানে সংরক্ষণের মাধ্যমে পাটকল শিল্পের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি

---

* Review of the First Five Year Plan-এর ৪ পৃষ্ঠা।

** ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে প্রদত্ত বার্ষিক অভিভাষণ।

দিয়াছে। ফলে ঐ সকল দেশে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। পরিবর্ত হইতে প্রতিযোগিতার সমস্যা

তৃতীয়ত, পরিবর্ত হইতে প্রতিযোগিতাও ভারতীয় পাটকল শিল্পের সম্মুখে বিশেষ আশংকার সৃষ্টি করিয়াছে। কাগজ, তুলা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বস্তা পাটের থলি হইতে দামে অনেক সস্তা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পাটজাত দ্রব্যের পরিবর্তে ইহাদের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে।

প্রতিযোগিতার সমস্যা সমাধানের পন্থা হইল আধুনিকিকরণ

শেষোক্ত দুই প্রকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য কাঁচাপাটের জাত উন্নয়ন ছাড়াও পাটজাত পণ্যের উপর রপ্তানি শুল্কের বিলোপসাধন, ভারতীয় পাটকল শিল্পে আধুনিকিকরণ (modernisation), গবেষণার মাধ্যমে নূতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি প্রতিবিধান নির্দেশ করা হয়।

অবলম্বিত প্রতিবিধান-সমূহ

১। পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের বিলোপসাধন

ইতিমধ্যেই প্রতিবিধানগুলি মোটামুটি অবলম্বিত হইয়াছে। পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যহ্রাসের পর ১৯৫৫ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের সময়োচিত বিলোপসাধন করা হয়। ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির মতে, ইহার এবং পাকিস্তানের কাঁচাপাট রপ্তানির উপর ন্যূনতম মূল্যধার্যের সিদ্ধান্তের ফলে বাহিরের বাজারে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্য সর্বপ্রথম সার্থকভাবে উভয় প্রকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিয়াছে। পাটকলসমূহের আধুনিকিকরণের পথেও ভারত বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের সহায়তায় শতকরা ৮০ ভাগ পাটকল আধুনিকিকরণের কার্য একরূপ সমাপ্ত করিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বস্ত্র শিল্পের ন্যায় পাটকল শিল্পেরও আধুনিকি-

২। পাটকলসমূহের আধুনিকিকরণ

করণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু বস্ত্রশিল্পের মতই বর্তমান অবস্থায় সামগ্রিকভাবে নিয়োগহ্রাসের সম্ভাবনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই পাটকলগুলিকে আধুনিকিকরণ বা র‍্যাসানালাই-জেশনের পথে চলিতে হইতেছে।

৩। পাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা

ভারতে উৎপন্ন পাটের জাত উন্নয়নের ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত কিছু কিছু করা হইলেও এ-সম্পর্কে প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়তার পশ্চাতেই রহিয়া গিয়াছে। পাট বিশেষজ্ঞ কমিটি (Jute Expert Committee) এ-বিষয়ে যে-সকল সুপারিশ করিয়াছে, ভারতীয় পাটকল সংঘের সভাপতির মতে, তাহাদের কার্যকর করিবার যথোচিত ব্যবস্থা এখনও অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

গবেষণার মাধ্যমে নূতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া যাইতেছে। কলিকাতার পাট সংক্রান্ত গবেষণাগারে পশ্চিম জার্মেনী হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া পাট হইতে উন্নত ধরনের কম্বল, গায়ের কাপড় প্রভৃতি নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

৪। নূতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন

ভারতীয় পাটকল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া যে বিশেষ কঠিন তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই শিল্প হইল সমস্যা প্রপীড়িত শিল্প। সমস্যাগুলির সম্যক সমাধান না হইলে ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং এই শিল্পের বেলায় আমাদিগকে অতি সাবধানের সহিত চলিতে হইবে।

এই শিল্পের ভবিষ্যৎ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে পাটজাত দ্রব্যের (Jute Manufacturing) উৎপাদন ও রপ্তানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ সালে ১০ লক্ষ টন উৎপাদনের তুলনায় ১৯৫৬ সালে প্রায় ১১ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ১৯৫৮ সালে উৎপাদন ১০ লক্ষ ৬২ হাজার টন হইলেও রপ্তানি কমিয়া ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টনে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে উৎপাদনও আবার ১০ হাজার টনের মত কমিয়া যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাটজাত দ্রব্যের ১২ লক্ষ টন উৎপাদন ও ৮ লক্ষ টন রপ্তানির লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছান মোটেই অসম্ভব নহে।

চিনি শিল্প (Sugar Industry) : ভারতের আধুনিক চিনি শিল্প বিচারমূলক সংরক্ষণেরই (discriminating protection) দান। স্বাভাবিক সুবিধা থাকিলে একটি শিশু শিল্প সংরক্ষণের আওতায় কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সুসংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে ইহা তাহারই অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই শিল্প সংরক্ষণের দান

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে আধুনিক কয়েকটি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইলেও ১৯৩১ সাল অবধি চিনি শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। তখন পর্যন্ত ভারতের প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশ জাভা ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি হইত। এই সকল দেশের পুরাতন চিনি শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নবজাত চিনি শিল্প পারিয়া উঠিত না।

১৯৩২ সালে ভারতীয় চিনি শিল্পকে প্রথমে ৭ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ প্রদান করা হইলে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিতে থাকে। ঐ ৭ বৎসরের মধ্যে মোট উৎপাদন ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টন হইতে ১২ লক্ষ টনে পরিণত হয় এবং কলের সংখ্যা ৩১ হইতে ১৩০-এ গিয়া দাঁড়ায়। ফলে ভারত চিনিতে একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু উৎপাদন বিশেষ হ্রাস না পাওয়া সত্ত্বেও সমগ্র দেশ চিনি-দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ফলে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হয়। ১৯৫২ সাল হইতে এই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

* Second Five Year Plan-এর ৪১৫ পৃষ্ঠা।

চিনি শিল্প ১৯৫০ সাল অবধি সংরক্ষণের আওতায় ছিল। তারপর ট্যারিফ বোর্ডের (Tariff Board) সুপারিশক্রমে ইহা তুলিয়া দেওয়া হয়। সুপারিশ করিবার সময় ট্যারিফ বোর্ড উক্তি করিয়াছিল "১৮ বৎসর ধরিয়া সংরক্ষণ উপভোগ সরকার, শিল্প, সিণ্ডিকেট (Sugar Syndicate)—সকলেরই মধ্যে একরূপ সন্তুষ্টির দৃষ্টিভংগির সৃষ্টি করিয়াছে যাহা এই শিল্পের উন্নয়নের পক্ষে মোটেই সহায়ক নহে।"

বৈশিষ্ট্য :

চিনি শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা সংরক্ষণের আওতায় অল্প সময়ের মধ্যে সুসংগঠিত অন্যতম প্রধান ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্প। নিয়োগ ও মূলধন বিনিয়োগের দিক দিয়া এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহের মধ্যে ইহার স্থান তুলাবস্ত্র শিল্পের পরই। অত্যধিক আঞ্চলিকতা হইল চিনি শিল্পের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। চিনির কলগুলির অধিকাংশই উত্তর-প্রদেশ ও বিহারে অবস্থিত। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবংগ প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও এই সকল রাজ্যে উপযুক্ত সংখ্যায় চিনির কল স্থাপিত হয় নাই। তৃতীয়ত, ভারতীয় চিনি শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার কারণ হইল ভারতে উৎপন্ন ইক্ষু অপকৃষ্ট জাতের। এবং ইক্ষু অপজাতের (by-products) সম্যক ব্যবহার এখন করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। চতুর্থত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারত চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠিলেও মাথাপিছু চিনির ভোগ বাড়িয়া যাওয়ার দরুন ভারত আবার সরবরাহের জন্য কতকাংশে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।*

মাথাপিছু চিনির ভোগবৃদ্ধি কাম্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ ইহা আমাদের অপুষ্টিকর খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধিরই সূচক। ভারতে নিরামিষাশী জনগণের পক্ষে অধিকতর চিনি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

চিনি শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস এবং চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। ১৯৫১ সালের শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন [Industries (Development and Regulation) Act, 1951] অনুসারে এই শিল্পের জন্য একটি উন্নয়ন পরিষদের (Development Council) গঠিত হইয়াছে। উন্নয়ন পরিষদের সুপারিশ অনুসারে অনেক ক্ষেত্রে ইক্ষুর গুণানুসারে, ওজন অনুসারে নহে, ইক্ষুর দাম প্রদান করা হইতেছে। ইহার ফলে কৃষকগণ ইক্ষুর জাত উন্নয়নে সচেষ্ট হইয়াছে। শক্তি সুরাসার (power alcohol), কাগজ, পেষ্ট বোর্ড প্রভৃতি উৎপাদনে ইক্ষু অপজাতের উত্তরোত্তর ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে যাহাতে ইক্ষু হইতে অধিকতর রস বাহির করা যায় তাহার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে।

---

* ৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

চিনি শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণের প্রচেষ্টাও করা হইয়াছে ; কিন্তু আজ পর্যন্ত ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব এবং বিশেষ করিয়া মাদ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলে উৎকৃষ্ট জাতের ইক্ষু জন্মে। অথচ এই সকল স্থানে চিনির কল নাই বলিলেই হয়। অপরদিকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বহুসংখ্যক কলের অবস্থানগত বিশেষ কোন সুবিধা নাই। এই সকল কলকে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব স্বর্গত রফি আমেদ কিয়োদাই-এর মন্ত্রিত্বকালে নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রধানত উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিরোধিতার জন্য ইহাকে কার্যকর করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি সরকারী মহল হইতে এই নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার হইতে চিনির কল স্থানান্তরিত করিবার কোন প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের নাই। স্থানান্তরিতকরণের নীতি এরূপ পরিত্যক্ত হইলেও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়িক ভিত্তিতে নূতন নূতন স্থানে কল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

চিনি শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণের প্রচেষ্টা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী সূচনায় ১১ লক্ষ টনের কিছু অধিক চিনি উৎপন্ন হয়। এখন উহা বাড়িয়া ২১ লক্ষ টনের কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে।* ফলে বর্তমানে মাঝে মাঝে কিছু কিছু চিনি রপ্তানি করা সম্ভব হইতেছে। তবে বণ্টনের অব্যবস্থার দরুন এখনও মাঝে মাঝে চিনি-দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেছে।

বর্তমান উৎপাদন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল ২২½ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন। তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য আরও অধিক হইবে। উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমবায়িক ভিত্তিতে নূতন নূতন চিনির কল স্থাপন করা হইতেছে।

সিমেণ্ট শিল্প (Cement Industry) : স্বাভাবিক সুবিধা থাকিলে সংরক্ষণের সাহায্য ব্যতীতও যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি শিল্প সুসংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে ভারতের সিমেণ্ট শিল্প তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত। ভারতের সিমেণ্ট শিল্প বেশী পুরাতন নহে। ১৯১২-১৩ সালের পূর্বে এদেশে কোন সিমেণ্ট কারখানা ছিল না। ঐ সালে তিনটি কারখানা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া দাঁড়ায় ১০-এ।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় ইহাকেও বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় ; এবং ১৯২৪ সালে ইহা সংরক্ষণের প্রার্থনা জানায়। এই প্রার্থনা কিন্তু মঞ্জুর হয় নাই। ট্যারিফ বোর্ড সংরক্ষণ প্রদানের পরিবর্তে সিমেণ্ট কারখানাগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সুপারিশ করে। এই সুপারিশের ফলে প্রথমে একটি সমিতি (The Concrete Association), এবং পরে সিমেণ্ট কোম্পানীগুলির একটি সংঘ (The Associated Cement Companies Ltd.) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিমেণ্ট কোম্পানীগুলির এই সংঘ উৎপাদন ও বণ্টনের সমন্বয়সাধনের ভার গ্রহণ করে।

* 1960.

পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ডালমিয়া সিমেণ্ট কোম্পানীর সহিতও এই সংঘের সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সিমেণ্টের উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; কিন্তু সাধারণ লোক সকল সময় সিমেণ্ট-দুর্ভিক্ষেরই সম্মুখীন ছিল। মোট উৎপন্নের চারি-পঞ্চমাংশ যোগান দেওয়া হইত যুদ্ধের খাতে বেসামরিক কার্যের জন্য সরবরাহ করা হইত বাকী এক-পঞ্চমাংশ।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগেও সিমেণ্ট-দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটে না—কারণ সরকারী ও বে-সরকারী উভয় খাতেই নির্মাণ ও সংস্কার কার্যে সিমেণ্টের চাহিদা উৎপাদনকে বহু পরিমাণে ছাড়াইয়া যায়। বর্ধিত চাহিদার জন্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে। উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালের ১৫ লক্ষ টনের কিছু উপর হইতে ১৯৫০-৫১ সালে প্রায় ২৭ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়।*

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ

১৯৫০ ৫১ সাল হইতে স্থরু হইয়াছে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে সিমেণ্টের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ২৭ লক্ষ টন হইতে ৪৮ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছিল। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য ৪৬ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে সিমেণ্টের উৎপাদনকে প্রায় ৩ গুণ বর্ধিত করিয়া ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির করা হয়।† কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করিয়াছে যে পরিকল্পনান্তে ৯৩ লক্ষ টনের অধিক সিমেণ্ট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না।** ইহাও উচ্চাশা বলিয়া মনে হয়, কারণ ১৯৫৯ সালে মাত্র ৬৮ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়।

চাহিদা হ্রাস

উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাইলেও সিমেণ্টে ঘাটতি পড়ে নাই। কারণ, ইস্পাতের দুষ্প্রাপ্যতা ও পরিকল্পনার কতকগুলি কাজ বাদ দেওয়ার দরুন চাহিদা অনেকটা হ্রাস পায়। ফলে ১৯৫৮-৫৯ সালে সরকার কিছু সিমেণ্ট রপ্তানির ব্যবস্থা করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য রপ্তানি অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে—কারণ ঐ পরিকল্পনায় সিমেণ্টের চাহিদা বহু পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

কাগজ শিল্প (Paper Industry) : শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে কাগজের চাহিদা বিশেষ বাড়িয়া যাওয়ায় সম্প্রতি কাগজ শিল্প অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে প্রথম আধুনিক কাগজের কল স্থাপন করেন তাঞ্জোরে ১৭১৬ সালে মহাত্মা

* India, 1958, ৩২৬ পৃষ্ঠা এবং First Five Year Plan—Summary-এর ২৯ পৃষ্ঠা।

† Second Five Year Plan-এর ৫৯ এবং ৪০৭ পৃষ্ঠা।

** Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৬৭ পৃষ্ঠা।

উইলিয়ম কেরী। কিন্তু কাগজ শিল্পের প্রকৃত বুনিয়াদের পত্তন হয় ১৮৬৭ সালে হুগলী নদীর তীরে বালিতে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে। ইহার পর অল্পকালের মধ্যেই আরও কয়েকটি কাগজের কল ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল লক্ষ্ণৌ-এর কুপার মিল (Couper Mill), বাংলায় টিটাগড়ের মিল এবং দাক্ষিণাত্য কাগজের মিল (Deccan Paper Mill)।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনেরও বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে ১৯২৩ সাল অবধি মোট কলের সংখ্যা ৫ হইতে মাত্র ৬-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

১৯২৫ সালে কতিপয় শ্রেণীর কাগজকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১৯৩১ সালে ইহার বৃদ্ধি করা হয়। সংরক্ষণের ফলে কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটিতে থাকে। ১৯২৩ সালের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কাগজ ও বোর্ড কাগজের (paper and paper boards) কলের সংখ্যা ও উৎপাদন যথাক্রমে ৬ হইতে ১০ এবং ২৬ হাজার টন হইতে ৪৮ হাজার টনে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে—অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে আবার দেখা যায় যে, কলের সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ১৮-তে এবং ১ লক্ষ ১৪ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় ২ লক্ষ টন কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয় এবং ইহার বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টন কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ৪ লক্ষ ১০ হাজার টনে। এ-লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে—কারণ ১৯৫৯ সাল অবধি উৎপাদনের পরিমাণ ৩ লক্ষ টনেও পৌঁছায় নাই।

বর্তমান উৎপাদন

তবে কাঁচামালের সুবিধা ও অন্যান্য সহায়ক অবস্থার জন্য ভারতে কাগজ শিল্পের বিশেষ প্রসারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং উৎপাদনের উপরি-উক্ত লক্ষ্য কোনরূপেই উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট নহে। ভারতে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব। উপরন্তু, দেশে শিক্ষার প্রসারের সংগে সংগে কাগজের চাহিদাও বিশেষ বাড়িতেছে। অতএব, উভয় দিক দিয়াই ভারতের কাগজ শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়।

এই শিল্পের ভবিষ্যৎ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজ শিল্পের আর এক দিক দিয়া প্রসারসাধনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা হইল সংবাদপত্র মুদ্রণ কাগজ (newsprint) উৎপাদন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতে এই প্রকার কাগজ মোটেই উৎপন্ন হইত না। প্রয়োজনের সমগ্রটাই বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও ভারত সরকারের মালিকানায় 'নেপা মিল' (NEPA Mills)* প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্তমানে ২১ হাজার টনের মত সংবাদপত্র মুদ্রণের

সংবাদপত্র মুদ্রণ কাগজ উৎপাদন

* পুরা নাম National Newsprint and Paper Mills.

কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। এইদিন হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ৩০ হাজার টন কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। উপরন্ত, বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (pri vate sector) দুইটি নূতন কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে এই দুই কল দ্বারা আরও ৩০ হাজার টনের মত সংবাদপত্র মুদ্রণ কাগজ উৎপাদন সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। সুতরাং ১৯৬০-৬১ সালে এই প্রকার কাগজের মোট উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ৬০ হাজার টন।

কয়লাখনি শিল্প (Coal Mining Industry) ঃ ভারতের অন্যতম প্রধান খনিজ ও শক্তি সম্পদ হিসাবে কয়লা সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখন শিল্প হিসাবে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কয়লাখনি শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, এই শিল্প মূল শিল্পসমূহের (basic industries) অন্যতম। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসার এবং তাপজ বিদ্যুৎ (thermal power) উৎপাদনের পরিকল্পনার জন্য এই শিল্পের গুরুত্ব বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের পরিমাণের দিক দিয়া ইহাতে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। তৃতীয়ত, ইহা অন্যতম ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্পও বটে। নিয়োগের দিক দিয়াও এই শিল্পের গুরুত্ব রহিয়াছে। ১৯৫৯ সালে গড়ে দৈনিক ৩½ লক্ষের উপর শ্রমিক এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। অন্য কোন খনিজ শিল্পে এত অধিক শ্রমিক নিযুক্ত নাই। পরিশেষে, মূল ও ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহকারী শিল্প হিসাবে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নানান সমস্যায় পরিপূর্ণ।

বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

ইহা অন্যতম সমস্যা-পূর্ণ শিল্প

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়েই প্রথম খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের প্রচেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় ১৮১৪ সালে রাণীগঞ্জে। তবে এই শিল্পের প্রসার সুরু হয় ১৮৮০ সাল হইতে, ভারতীয় রেলপথের ব্যাপক নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবার পর।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

পরবর্তী যুগে রেলপথসমূহই কয়লাখনি শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা মোট উৎপন্ন কয়লার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ব্যবহার করিতে থাকে। এইভাবে কয়লাখনি শিল্পের প্রসারের সংগে সংগে কয়লার রপ্তানিকার্যও আরম্ভ হয়।

কয়লাখনি শিল্প প্রথম সংকটের সম্মুখীন হয় ১৯২৫ সালে। রেলপথগুলির কয়লাখনির মালিকানা, বৈদ্যুতিক শক্তি ও তৈলের অধিকতর সরবরাহ, শিল্পোন্নত দেশসমূহ হইতে স্বদেশ ও বিদেশের বাজারে তীব্রতর প্রতিযোগিতা প্রভৃতিই ছিল উপরি-উক্ত সংকটের কারণ। এই সংকট হইতে মুক্ত হইতে না হইতে আসিয়া পড়িল ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজার। ১৯৩৭ সাল হইতে আবার সুরু হয় ভারতীয় কয়লাখনি শিল্পের অগ্রগতি ; এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে অব্যাহতই রাখে।

* ২৩-২৫ এবং ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।

দেশবিভাগের সময় ভারতে উৎপন্ন কয়লার মোট পরিমাণ ছিল ২½ কোটি টনের মত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫১ সালে ইহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টনে গিয়া দাঁড়ায়। এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টনের মত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহাকে ২ কোটি ২০ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধি করিয়া মোট ৬ কোটি টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদন

উপরি-উক্ত ২ কোটি ২০ লক্ষ টনের মধ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) উৎপন্ন হইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (private sector) উৎপন্ন হইবে বাকী ১ কোটি টন। এই প্রসংগে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে কয়লাখনি শিল্প হইল সেই সকল শিল্পের অন্যতম যাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের অনন্য ভার (exclusive responsibility) রাষ্ট্রের।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লার উৎপাদন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে উপরি-উক্ত লক্ষ্যে পৌছান যাইবে আশা করা যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টন। উৎপাদন কতকটা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯ কোটি টন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

কয়লাখনি শিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হইয়াছিল যে ইহা পরিবহন-ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। ১৯৫১ সাল হইতে কয়লার উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলেও পরিবহনের অব্যবস্থার প্রতিকার করা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে কয়লা পরিবহন-ব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশনের সুপারিশ করা হইয়াছিল।

১। পরিবহনের সমস্যা

প্রধানত বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্যই পরিবহন-ব্যবস্থার র‍্যাসানালাইজেশন প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বিশেষ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও র‍্যাসানালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।* আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন, উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধি ও ব্যয়হ্রাস—উভয়ই সংঘটিত করে।

২। র‍্যাসানালাইজেশনের সমস্যা

তৃতীয়ত, পরিকল্পনা-পূর্ব সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের কার্যে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যুক্তিসংগত ব্যবহারের কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে ভূগর্ভে সঞ্চিত বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার এক বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

৩। যুক্তিসংগত ব্যবহারের সমস্যা

চতুর্থত, ভারতে ভাল কোক কয়লার পরিমাণ অধিক নহে। এইজন্য প্রয়োজন

* Second Five Year Plan—A Draft Oultine-এর ১১৮ পৃষ্ঠা।

কোক কয়লার পরিবর্তে অন্য প্রকার কয়লার ব্যবহারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির; এবং ইহার জন্য প্রয়োজন অন্য প্রকার কয়লার উৎপাদনবৃদ্ধির। উপরন্তু, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পরিকল্পিত প্রসারের জন্য ভাল কোক ও ধাতু নিষ্কাশক (metallurgical) কয়লার প্রয়োজন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই কারণেও অন্যান্য কার্যে কোক কয়লার ব্যবহার সংক্ষেপ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

৪। ভাল কোক কয়লার ব্যবহার-সংক্ষেপে সমস্যা

পরিশেষে, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হইল এই প্রকার কয়লার ধৌতকরণের (washing) ব্যবস্থা করা। আধুনিক পদ্ধতিতে ধৌতকরণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই প্রকার কয়লার অপচয়ের পরিমাণও কমিয়া যাইবে।

৫। ধাতু নিষ্কাশক কয়লা ধৌতকরণের সমস্যা

আজ পর্যন্ত যে-যে প্রতিবিধান অবলম্বিত হইয়াছে বা অবলম্বিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাদের সংক্ষেপ বর্ণনা এইভাবে করা যায়: পরিবহনের ত্রুটি দূর করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে পিগংল বর্ণের কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে ঐ অঞ্চলকে গণ্ডোয়ানা কয়লাখনিগুলির উপর আর ততটা নির্ভর করিতে হইবে না। অবশ্য পরিবহন-ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু র‍্যাসানালাইজেশন এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই। অপরদিকে উৎপাদন-ব্যবস্থায় র‍্যাসানালাইজেশনের কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি নিয়োগ ছাড়াও সকল প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাশাপাশি কয়লা-খনিগুলির একত্রিকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খননকালে সাজাইবার পদ্ধতিরও (stowing method) উন্নতিসাধন করা হইতেছে। কয়লার পরিবর্তে বালি ইত্যাদি দ্বারা খনির ভিতরের প্রাচীর নির্মাণ ব্যবস্থা (sand stowing method) অবলম্বনের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

অবলম্বিত প্রতি-বিধানসমূহ:

১। পরিবহনের ত্রুটি দূরিকরণ

২। উৎপাদন-ব্যবস্থায় র‍্যাসানালাইজেশন

ভাল কোক কয়লার ব্যবহার যাহাতে অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে ১৯৫২ সালে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন [Coal Mining (Conservation and Safety) Act, 1952] নামে এক আইন পাস করা হয়। এই আইন অনুসারে একজন কমিশনারের (Coal Commissioner) অধীনে একটি বোর্ড (Coal Board) স্থাপিত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে কয়লাখনি শিল্পের সমস্যাসমূহ লইয়া আলোচনা ও তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইল এই বোর্ডের কার্য। পরিকল্পনা কমিশনের অনুরোধমত ১৯৫৬ সাল হইতে রেলপথসমূহ কোক কয়লার পরিবর্তে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রকার কয়লা ব্যবহারের প্রচেষ্টা করিতেছে।

৩। ভাল কোক কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

* Second Five Year Plan-এর ৩১৯ পৃষ্ঠা।

উৎকৃষ্ট ধাতু নিষ্কাশক ও কোক কয়লার গুণগত অভিন্নতা বজায় রাখা ও ইহার অপচয় নিবারণের জন্য পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই প্রকার সকল কয়লারই ধৌতকরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্য কারগালিতে (Kargali) ধৌতকরণ কারখানা ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হইয়াছে। আর তিনটি কারখানা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। ইহা ছাড়া দুর্গাপুর প্রভৃতির কয়লা চুল্লীও উৎকৃষ্ঠ কোক কয়লা সরবরাহ করিতেছে *

৪। কয়লা ধৌতকরণের ব্যবস্থা

পরিশেষে, কয়লাখনিসমূহের পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন (a National Coal Development Corporation) গঠিত হইয়াছে। এই করপোরেশনের হস্তেই সরকারী কয়লাখনিগুলির পরিচালনভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যে এক বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

৫। জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন

শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশন (Rationalisation of Industries) : বস্ত্র শিল্প ও পাটকল শিল্পের আলোচনা প্রসংগে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন লইয়া বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে। মালিক ও পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ পুনর্গঠনের পক্ষপাতী এবং উহার প্রবর্তনের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছে; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিক-নেতাগণ র‍্যাসানালাই-জেশনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে।

এই সকল যুক্তির পর্যালোচনা করিবার পূর্বে জানা প্রয়োজন যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন বা র‍্যাসানালাইজেশন কাহাকে বলে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিল্পে প্রবর্তন করিয়া শ্রম, মালমশলা ও সময়ের ব্যয়সংক্ষেপ করাই হইল যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রয়োজন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আধুনিকিকরণ, উপযুক্ত সংগঠনের সাহায্যে শ্রম ও কাঁচামালের সম্যক ব্যবহার এবং উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগগ্রহণ।

র‍্যাসানালাইজেশন কাহাকে বলে

যাহারা ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের সুপারিশ করে তাহাদের যুক্তি হইল এইরূপ : প্রথমত, অনেক ক্ষেত্রে, যন্ত্রপাতি পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ভিন্ন এই সকল শিল্পের উন্নতিবিধানের উপায়ান্তর নাই। যেমন, তুলাবস্ত্র শিল্প সম্পর্কে বলা হয় উহার যন্ত্রপাতি প্রায়ই এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ক্রয় হইয়াছে এবং উহা বর্তমানে একপ্রকার

সপক্ষে যুক্তি

---

* ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলাবস্ত্র কমিটি (Cotton Textile Committee) এবং ১৯৫৪ সালের পাট শিল্প অনুসন্ধান কমিশন (Jute Enquiry Commission) যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও আধুনিকিকরণের উপর বিশেষ জোর দেয়। কয়লাখনি শিল্পেও ১৯৫১ সালে কয়লা শিল্প সম্পর্কিত কার্যকরী দল (Working Party on Coal Industry) অধিকতর মাত্রায় যন্ত্রিকরণের সুপারিশ করে। দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, সাম্প্রতিককালে শ্রমিক-সংঘগুলির শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রমিক উন্নয়নমূলক আইনকানুন অধিক মাত্রায় প্রবর্তিত হইয়াছে। ফলে শ্রম-ব্যয় অত্যধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে হইলে যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এবং আধুনিকিকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার কথা চিন্তা করিয়াও শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। ইহা না করা হইলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। সম্প্রতি পাট শিল্পের ক্ষেত্রে পাকিস্তান, জাপান, ব্রেজিল, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু ইহাই নয়; পাটের পরিবর্ত-দ্রব্যের (substitutes) ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলাবস্ত্রের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাজারে জাপান ও অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আধুনিক উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদনের উন্নয়ন না করিতে পারিলে বৈদেশিক বাজারে টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়িবে। রপ্তানি প্রসার কমিটিও রপ্তানি শিল্পগুলির ক্ষেত্রে অতি আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছে।

অপরদিকে শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের বিরোধিতা করা হয়। ইহাদের যুক্তি হইল যে, এই পুনর্গঠনের ফলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। ইহা ব্যতীত ভারতে মূলধনের অপ্রাচুর্য রহিয়াছে। কিন্তু শ্রম সহজলভ্য। এ-অবস্থায় অধিক যন্ত্রিকরণের পথে অগ্রসর না হইয়া অধিক পরিমাণে শ্রম ব্যবহার করা সমীচীন।

বিপক্ষে যুক্তি

শ্রমিকদের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের প্রতি ভীতি সম্পূর্ণ অমূলক নয়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, পুনর্গঠনের ফলে যে লাভ হয় তাহার সমস্তটাই শিল্প-মালিক নিজে ভোগ করিতে চেষ্টা করে। তা'ছাড়া যুক্তিসংগত পুনর্গঠনের ফলে সমূহ বেকার হইয়া পড়িবার আশংকা আছে। যদিও দীর্ঘকালীন সুবিধা-সুযোগের চিন্তা করিলে শ্রম-নিয়োগ না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যাইবে কারণ উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইলে দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে এবং শিল্পের প্রসার ঘটিবে।

যাহা হউক, এই তর্কবিতর্কের মধ্যে না যাইয়া বলা যায় যে ভারতীয় কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে, যেমন তুলাবস্ত্র ও পাটকল, যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; কিন্তু পুনর্গঠনকার্যে অতি সতর্কতার সহিত এবং পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে; এবং দেখিতে হইবে যে ইহার ফলে যেন কর্মরত শ্রমিক বেকার না হইয়া পড়ে। ইহার জন্য বিকল্প নিয়োগ-ব্যবস্থা করিয়া অতিরিক্ত শ্রমিকদের কর্মের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্পষ্টই বলা হয় যে,

অবলম্বনীয় পন্থা —

পুনর্গঠনের ফলে যেখানে বেকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেখানে উহা শ্রমিকদের সংগে পরামর্শ করিয়া প্রবর্তিত হয়, যেখানে শ্রমিকদের কার্যের অবস্থাদির উন্নতিসাধন করা হয় এবং যেখানে পুনর্গঠনের সুযোগ-সুবিধা অধিকাংশ শ্রমিকরা ভোগ করিতে পায় সেখানেই যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয়সরকারের শ্রমদপ্তর যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন সম্পর্কে এক চুক্তিপত্র রচনা করিয়াছে। এই চুক্তিপত্রে র‍্যাসানালাইজেশন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে এমন কোন যান্ত্রিক পরিবর্তন করিতে হইলে মালিককে শ্রমিক-সংঘকে নোটিশ দিতে হইবে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বুঝাপড়া হইলে তবেই পুনর্গঠন করা যাইবে। অতিরিক্ত শ্রমিক যাহাতে চাকরি পায় তাহার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, বিকল্প নিয়োগ, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই চুক্তি সত্ত্বেও র‍্যাসানালাইজেশন লইয়া মাঝে মাঝে শিল্প-বিবাদ দেখা যায়। এইরূপ বিবাদের সংখ্যা তুলাবস্ত্র ও পাটকল শিল্পেই অধিক।

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of the Iron and Steel Industry in India. What measures are being taken to develop it under our Planned Economy ?

(৩১৩-৩১৯ পৃষ্ঠা)

2. Give a short account of the Cotton Textile Industry of India and state its problems. (C. U. B. Com. 1949) (৩১৯-৩২৫ পৃষ্ঠা)

3. Consider in brief the present position and future prospects of the Jute Industry in India. (C. U. B. A. 1952, '58 ; B. Com. 1950) (৩২৬-৩২৯ পৃষ্ঠা)

4. What are the main problems of the Jute Mill Industry in the present times. What measures would you suggest to improve the competitive position of the industry in the world market ? (C. U. B. A. 1959, '60) (৩২৬-৩২৯ পৃষ্ঠা)

5. Give a brief account of the Sugar Industry in India. (৩২৯-৩৩২ পৃষ্ঠা)

6. Indicate the problems and prospects of (a) Coal Mining Industry, (b) the Paper Industry in India. (৩৩২-৩৩৭ পৃষ্ঠা)

. What policy would you advocate in respect of the rationalisation of industries in India ? Give reasons for your answer.

(C. U. B. Com. 1958) (৩৩৭-৩৩৯ পৃষ্ঠা)

বিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও শিল্প

(The State and Industries)

বিদেশী শাসনের আমলে শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র যে-ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে সে-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখন জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি ও শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক যুগে কোন ক্ষেত্রেই দ্রুত শিল্পোন্নয়ন রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও সোবিয়েত ইউনিয়নের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকার সংরক্ষণ ও করনীতির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করিয়াছে, অগ্রণী হইয়া বিদেশী মূলধন আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। জাপানও রাষ্ট্রকে শিল্পায়নের ধর্মপিতা (god-father) বলিয়াই গণ্য করা হয়। আর সোবিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্র আদিম পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দলপতির (patriarch) মত শিল্পোন্ননের পরিকল্পনা প্রণয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্যকর করা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই করিয়াছে এবং করিতেছে।

কোন দেশেই দ্রুত শিল্পোন্নয়ন রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে ঘটে নাই

কৃষি বনাম শিল্প (Agriculture *V* Industry) : এইভাবে রাষ্ট্রীয় উৎসাহ ও উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে শিল্পায়ন সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়ায় ভারতীয় অর্থবিদ্যাবিদ মহলে এ-ধারণা স্বভাবতই দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে, পর্যাপ্ত শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত এ-দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সম্যক সমাধান সম্ভব নহে। ভারতীয় জনগণের অর্থ নৈতিক মুক্তির পথ শিল্পায়নাভিমুখেই প্রসারিত।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সেদিন পর্যন্ত বিদেশী শাসকবর্গ ও স্বনামধন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ ইহার বিপরীত ধারণাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। লর্ড কেনস্ (Lord Keynes) প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত প্রতিযোগিতার জন্য ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত কিনা? ডাঃ ভেরা এ্যানস্টী (Dr. Vera Anstey) ভারতে ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ইহার ফলে সর্বসাধারণের শোষণের দ্বারা এক মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধির কার্যই সাধিত হইবে।

ভারতের শিল্পায়ন সম্বন্ধে সন্দেহ

১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বাজারের পর অবাধ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক

---

* ৩০৬-৩১০ পৃষ্ঠা দেখ।

সহযোগিতার নীতি এরূপ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হইলে ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশসমূহের শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ইহা অর্থবিদ্যাবিদগণ উপলব্ধি করিতে থাকেন যে, শিল্পায়নের দ্বারা এই সকল দেশের জনগণের ক্রয়শক্তির (purchasing power) বৃদ্ধিসাধন না করিলে শিল্পোন্নত দেশগুলির শিল্প-সংগঠন অবনতির পথে পদার্পণ করিতে বাধ্য।

অর্ধোন্নত দেশসমূহে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি

যুদ্ধোত্তর যুগে এই দৃষ্টিভংগিই প্রসারিত হইয়া অর্ধোন্নত দেশসমূহের (Underdeveloped Countries) উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করে। আধুনিক অর্থ-বিদ্যাবিদগণের মতে, অর্ধোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য কৃষির সুসংগঠন এবং শিল্পোন্নয়ন উভয়ই প্রয়োজন। এই সকল দেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলিয়া একমাত্র কৃষির সুসংগঠনের দ্বারাই জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসাধন সম্ভব হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কৃষির উন্নয়ন বিশেষভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন।

শিল্পোন্নয়ন অর্ধোন্নত দেশসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংগ

দ্বিতীয়ত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকে সুসংগঠিত করা হইলে বহুসংখ্যক কৃষক কর্মহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব।*

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন রিপোর্টে এই কথা বারবার বলা হইয়াছে। একটি রিপোর্টে আছে যে, অর্ধোন্নত দেশসমূহের যেগুলিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিজীবী জনসাধারণ রহিয়া গিয়াছে সেগুলিতে শিল্পায়ন দ্বারা এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার নিয়োগের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কৃষিগত উন্নয়নের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নহে। "প্রধানত এই কারণে কতকগুলি, বিশেষ করিয়া এশিয়ার, অর্ধোন্নত দেশে শিল্পোন্নয়ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক বিষয়।" † ডাঃ রোজেনষ্টাইন রডানকে (Dr. Rosenstein Rodan) উদ্ধৃত করিয়াও বলা যায় যে, "কৃষিতে অতিরিক্ত বলিয়া পরিগণিত জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনয়ন করাই হইল বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনীতির লক্ষ্য।"

ডাঃ রোজেনষ্টাইন রডানের এই উক্তি শিল্পায়নের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। শিল্পায়ন বলিতে কৃষিকে উপেক্ষা করা বুঝায় না, কৃষির উন্নয়নও বুঝায়। ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও কৃষি পরস্পরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। উভয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। ডাঃ ষ্ট্যালি (Dr. Eugene Staley) বলেন, "কৃষির উন্নয়ন ও শিল্পায়নকে কোন দীর্ঘকালীন কার্যক্রমে পরস্পর হইতে পৃথক্ বা পরস্পরবিরোধী বলিয়া কল্পনা করা যায় না। .....শিল্পায়ন হইল আয়বৃদ্ধির সূচক এবং

উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক

* Lewis,—The Principles of Economic Planning-এর ১২৪ পৃষ্ঠা।

† "Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries', U. N. Report, May, 1951.

কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়ক।" শিল্পায়ন ব্যতিরেকে এইরূপ দেশকে চিরকালই কাঁচামাল রপ্তানি ও নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিয়া অর্ধোন্নতই থাকিতে হইবে।

সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা লইয়া মতদ্বৈধতার অবকাশ বর্তমানে আর নাই। ভারতের প্রয়োজনাতিরিক্ত কৃষিজীবিগণকে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত করিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভারতের জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইয়া এ-কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—কারণ অর্ধোন্নত দেশে জনগণের স্বল্প ক্রয়শক্তির জন্য পুঁজিপতিগণ শিল্প-প্রসারে বিশেষ অগ্রসর হয় না।* এই প্রসংগে ইহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, শাসনাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই জাতীয় সরকার এই নির্দেশ গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্যকর করিবার প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

ভারতের জাতীয় সরকার এই নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছে

জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি (Industrial Policy of the National Government): জাতীয় সরকার যে ভারতের শিল্পায়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে ইহা সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের সরকারী শিল্পনীতি ঘোষণায়। এই ঘোষণায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার (mixed economy) পূর্ণ ইংগিত দেওয়া হয়; এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে সরকার পর পর কয়েকটি গঠনমূলক কার্য সম্পাদন করে—যথা, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে শিল্পগত করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) গঠন, ১৯৪৯ সালে নূতন ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ, ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি। ইহার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে উক্ত ঘোষিত শিল্পনীতির পরিমার্জনা (revision) করা হয়। এখন প্রথমে ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মূল শিল্পনীতির পর্যালোচনা করিয়া পরে পরিমার্জিত শিল্পনীতির বিচার-বিশ্লেষণ করা হইবে।

শিল্পায়নে সরকারের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ঘোষণা

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইংগিত

মূল শিল্পনীতি (Original Industrial Policy): জাতীয় সরকারের পক্ষে ১৯৪৮ সালে মূল শিল্পনীতি ঘোষণা করেন তৎকালীন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী স্বর্গত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই ঘোষণাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য, (২) শিল্প-নীতির উদ্দেশ্য, (৩) শিল্পক্ষেত্রের বিভাগ, (৪) শিল্পক্ষেত্রের রাষ্ট্রভুক্ত অংশের পরিচালন-ব্যবস্থা, (৫) বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, (৬) শিল্পসমূহের অবস্থান নির্ধারণ, (৭) শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ, (৮) বৈদেশিক মূলধন, সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প।

ঘোষণার বিভিন্ন অংশ

---

* Regnar Nurkse, "Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries."

(১) শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য (General Objective of Industrialisation): শিল্পায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, ভারত ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ-সংগঠনের পথে পদার্পণ করিয়াছে। ইহার জন্য অন্যান্যের মধ্যে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির উপাদানসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আবার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

সমতার ভিত্তিতে উন্নততর আর্থিক জীবন

(২) শিল্পনীতির উদ্দেশ্য (Objective of Industrial Policy): জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও ইহার যথাযথ বণ্টনের দ্বারা সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক উন্নয়নকে ঘোষিত শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, কেবলমাত্র বণ্টনের দিকে দৃষ্টি দিলে দারিদ্র্যকেই বণ্টন করা হইবে। সুতরাং গতিশীল জাতীয় নীতির লক্ষ্য হইবে—উৎপাদনের বিচ্যুতিবিহীন বৃদ্ধি এবং ন্যায্য বণ্টন। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই শিল্পক্ষেত্রে সরকারের অনুপ্রবেশের প্রশ্ন বিচার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অবস্থায় সম্ভব না হইলেও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবস্থায় তাহার পরিধি ক্রমশ বিস্তার করিয়া চলিবে।

উত্তরোত্তর উৎপাদন-বৃদ্ধি ও ন্যায্য বণ্টন

ইহার জন্য শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশ

(৩) শিল্পক্ষেত্রের বিভাগ (Division of the Industrial Field): শিল্পোন্নয়ন ও শিল্প-ব্যবস্থার পরিচালনা হইবে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের যৌথ দায়িত্ব। সরকারের দায়িত্ব শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পর্যায়ের হইবে। ফলে শিল্পসমুদয় বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইবে। মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত চারিটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছিল।

(ক) রাষ্ট্রের একচেটিয়া এলাকাধীন (Exclusive State Monopoly): এই শ্রেণীভুক্ত শিল্প ছিল মাত্র তিনটি—যথা, অস্ত্রশস্ত্রাদি উৎপাদন, আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ এবং রেলপথের মালিকানা ও পরিচালনা। ইহার উপর জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্র যে-কোন শিল্পকে শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে আনয়ন করিতে সমর্থ ছিল।

(খ) রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রাংশ (State-controlled Sphere): শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে ছিল কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, বিমানপোত নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, খনিজ তৈল এবং টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারের কতিপয় যন্ত্র ইত্যাদি। এই পর্যায়ভুক্ত শিল্পসমূহের মধ্যে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ১০ বৎসরের জন্য—অর্থাৎ, ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত বেসরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিতে দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। অবশ্য এই সময়ের মধ্যেই সাধারণের স্বার্থে সরকার ইহাদের যে-কোনটির অধিগ্রহণ করিতে পারে। উপরন্তু এই ক্ষেত্রাংশভুক্ত নূতন কোন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব হইবে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের। উপরি-উক্ত ১০ বৎসর পর বেসরকারী

মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি নির্ধারণ করা হইবে।

(গ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণ ক্ষেত্রাংশভুক্ত শিল্পসমূহ (Industries subject to State Regulation and Control): শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে আছে চিনি, তুলা ও পশম বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, লবণ, যন্ত্রাদি উৎপাদনের শিল্পসমূহ প্রভৃতি। এগুলি বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইলেও এগুলি সম্বন্ধে সরকার অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণের নীতি অনুসরণ করিবে। প্রয়োজন হইলে ইহাদের উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি, ইহাদের অবস্থান সম্বন্ধে নির্দেশ দিবে, ইত্যাদি।

(ঘ) শিল্পক্ষেত্রের বাকী অংশ (The Rest of Industrial Field): শিল্পক্ষেত্রের বাকী অংশ থাকিবে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী উদ্যোগাধীনে। এই অংশেও প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটিতে পারে।

(৪) শিল্পক্ষেত্রের রাষ্ট্রভুক্ত অংশের পরিচালন-ব্যবস্থা (Management of Industries in the Public Sector): রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত এবং উদ্যোগাধীন শিল্পসমূহের পরিচালনা সাধারণত সরকারী করপোরেশন (Public Corporation) দ্বারাই সম্পাদিত হইবে।

সরকারী করপোরেশন দ্বারা পরিচালনা

(৫) বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (Regulation of Industries in the Private Sector): শিল্পক্ষেত্রের ব্যক্তিগত অংশভুক্ত শিল্পসমূহের যথাযোগ্য উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে।

(৬) শিল্পসমূহের অবস্থান নির্ধারণ (Location of Industries): সমগ্র দেশের স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত—যেমন, চিনি, লবণ, ভারী রসায়ন প্রভৃতি শিল্পগুলির অবস্থান সম্বন্ধে সরকার নির্দেশ দিবে। অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠন প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক স্থানে করিতে হইবে, ইত্যাদি।

(৭) শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ (Labour-Capital Relations): শিল্পোন্নয়ন এবং শিল্প-ব্যবস্থার সুপরিচালনার জন্য শ্রমিক ও মূলধন-মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পূর্ণভাবেই অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের সকল কারণ দূরীভূত করিতে হইবে। এবং শ্রমিক যাহাতে ধীরে ধীরে শিল্প-পরিচালনায় উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মজুরিবৃদ্ধি, বাসস্থানের উন্নতি প্রভৃতি দ্বারা শ্রমিকের আর্থিক কল্যাণের পথও প্রশস্ত করিতে হইবে।

(৮) বৈদেশিক মূলধন, সংরক্ষণ এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প (Foreign Capital, Tariff and Small-scale & Cottage Industries): বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছিল যে, যে-সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত থাকিবে সাধারণভাবে তাহাদের

বৈদেশিক মূলধন

মালিকানার অধিকাংশ হইবে ভারতীয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাহাতে ভারতীয়রা শিল্পজ্ঞান শিক্ষা ও উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায় তাহাও দেখিতে হইবে।

ফিসক্যাল নীতি

ফিসক্যাল নীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল, অন্যায্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ এবং দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির উপাদান-সমূহের যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য নূতনভাবে প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করিতে হইবে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে নীতি

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প যে নূতন জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থার এক বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিবে সে-সম্বন্ধেও ঘোষণার সুস্পষ্ট উক্তি করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে এই সকল শিল্প এবং বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিতে হইবে—তাহা না হইলে শেষোক্ত শিল্পসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের কাম্য প্রসার ঘটিতে পারিবে না। এই সমন্বয়সাধনের পন্থা হিসাবে সমবায়কেই (co-operation) নির্দেশ করা হইয়াছিল।

মূল শিল্পনীতির মূল্যায়ন (Evaluation of the Original Industrial Policy)ঃ সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় সরকারের উপরি-উক্ত মূল শিল্পনীতি স্বাধীন ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম এক সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire*) হইতে বিদায় লইয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশ অথচ নির্ধারিত ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে বেসরকারী উদ্যোগের অবস্থিতির অনুমতিকেই মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলে। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গেলে বলা যায়, উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অস্তিত্বই (co-existence of public and private enterprise) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা পরিচালিত হয় না। ইহা বিশ্বাস করে যে, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিবার জন্য উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। যেখানে বেসরকারী উদ্যোগে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা কাম্যভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হয় না সেখানে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইয়া সংগঠন ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানে বেসরকারী উদ্যোগ কার্যকর, সেখানে অবশ্য ইহাকে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে এইরূপ উদ্যোগের ক্ষেত্র হইবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া সরকার এই নিয়ন্ত্রণকার্য পরিচালনা করিয়া যাইবে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা একদিকে ধনতন্ত্রবাদ ও অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই-এর মধ্যপথ দিয়া চলে। ইহা ব্যক্তিগত উদ্যোগের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করে না। জাতীয়

স্বার্থে যতটা প্রয়োজন বেসরকারী ক্ষেত্রের ততটা সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রের ততটা সম্প্রসারণই ইহার লক্ষ্য। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র এই সংকোচন ও সম্প্রসারণের কার্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায়, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র (public sector) ক্রমশই প্রসারিত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র (private sector) ক্রমশই সংকুচিত হইতে থাকে।

ইহা ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যপথ দিয়া চলে

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদের (evolutionary socialism) পথ। ধনতন্ত্রবাদের ত্রুটিসমূহ দূরিকরণার্থে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ, বিশেষ করিয়া ইংল্যাণ্ড ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি (Scandinavian Countries), এই পথে চলিয়াছে। মোটামুটিভাবে তাহারা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও ব্যবসায়ের জাতীয়করণ করিয়া ইহাদিগকে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছে, এবং নানাবিধ উপায়ে শ্রমিকের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট আছে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তনমূলক সমাজ-তন্ত্রবাদের পথ

ভারত ইহা অপেক্ষা আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার বণ্টন, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা ছাড়াও ইহা দেশের সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৯৪৮ সালে মূল শিল্পনীতি ঘোষণায় শিল্পোন্নয়নের সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যেই এই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ইংগিত দেওয়া হয়। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে এই পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রই আছে।

ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

ভারতের ন্যায় দেশের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রই অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ সন্দেহ নাই। প্রথমত, এই উদ্যোগের ক্ষেত্রের উপরই অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সংহতিসাধনের দায়িত্ব বিশেষভাবে ন্যস্ত থাকে। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত মুনাফার প্রবৃত্তি দ্বারা। সুতরাং যে-ক্ষেত্রে আশু মুনাফালাভের সম্ভাবনা নাই, বেসরকারী উদ্যোগ সেখানে অগ্রসর হয় না। অপরদিকে মুনাফার সম্ভাবনা থাকিলে বেসরকারী উদ্যোগ আর কিছু বিচার করে না। ফলে অকাম্য দ্রব্য উৎপাদন, প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি জাতীয় ক্ষতি সাধিত হইতে থাকে। সরকারী উদ্যোগ এই একটি হইতে মুক্ত। উহা সমাজের লাভক্ষতির দিক হইতেই সকল বিষয় বিবেচনা করে, সমাজের দিক হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়েই উদ্যোগী হয় এবং আশু মুনাফার সম্ভাবনা না থাকিলেও পিছাইয়া আসে না। এইভাবেই অর্থ-ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা (lopsided-ness) দূর হয়। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ইহাই করা হইতেছে।

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের গুরুত্ব :

১। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র অর্থ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা দূর করে

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রের মুনাফা ভোগ করে পুঁজিপতিগণ। ইহাতে সমাজে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মুনাফা কিন্তু জনকল্যাণে ব্যয়িত হয়। অতএব, সমাজ কল্যাণব্রতী (Social Welfare States) রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ব্যাপক করিতে হইবে। উপরন্তু, কর্মসংস্থান (employment) ইত্যাদির দ্বারা জনকল্যাণবৃদ্ধির জন্যও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থারও লক্ষ্য এই অভিমুখে।

২। উহা ধনবৈষম্য হ্রাস করে

তৃতীয়ত, অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ (growth) বেসরকারী উদ্যোগের দ্বারা মোটেই সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। বেসরকারী উদ্যোগের পক্ষে কাম্য পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধন ও শিল্পকৌশল (industrial know-how) সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালানোও সম্ভবপর হয় না। বৈদেশিক মূলধনকে প্রবেশের অবাধ অধিকার দিলে হয়ত' কিছুটা শিল্পোন্নয়ন ঘটিতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে মুনাফা বিদেশে যায় বলিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিল্প-ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় এবং পরোক্ষভাবে দেশ অধীন হইয়া পড়ে। সুতরাং সম্প্রসারণ-অভিমুখী অর্থ-ব্যবস্থাকে (growth oriented economy) সরকারী উদ্যোগের উপরই নির্ভর করিতে হয়। সরকারই প্রয়োজনীয় দেশী ও বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (state trading) চালায়, ইত্যাদি। ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে অনুরূপ ভূমিকাই প্রদান করা হইয়াছে।

৩। উহা অর্থ-ব্যবস্থার সম্যক সম্প্রসারণ সম্ভব করে

পরিশেষে, ভারতের ন্যায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল সম্প্রসারণ ও জনকল্যাণবৃদ্ধির পথে সকল প্রতিবন্ধক দূর করা। ভারতেও এই প্রতিবন্ধক দূরিকরণের ভার সরকারের বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের উপর ন্যস্ত।

৪। উহা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ঘোষণা কোন শ্রেণীকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। একদিকে ভারতীয় পুঁজিপতিগণ এই আশা করিয়াছিলেন যে, ভারত স্বাধীন হইবার সংগে সংগেই ভারতীয় পুঁজি ও উদ্যোগের উপরে ব্রিটিশ প্রবর্তিত যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও নিয়ন্ত্রণ ছিল তাহা সকলই অপসারিত হইবে এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার ফলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সমগ্র ক্ষেত্রটাই ভারতীয়দের একচেটিয়া অধিকারে আসিবে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থকগণ আশা করিয়াছিলেন যে, জাতীয় সরকারের অধীনে সকল প্রকার শিল্পোদ্যোগ রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া সমাজতান্ত্রিকতার ভিত্তি স্থাপন করা হইবে। স্বভাবতই

সমালোচনা :

১। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ঘোষণা প্রথমে কোন শ্রেণীকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা এই দুই বিরুদ্ধ আশাবাদীশ্রেণীর কোনটিকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়ত, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ঘোষণা ভারতীয় পুঁজিপতিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯৫৬ সালে শিল্পনীতির পরিমার্জনা সেই সন্ত্রাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। মূল শিল্পনীতিতে শিল্পক্ষেত্রের যে অংশকে 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন' (State-controlled Sphere) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, সেই অংশের বেসরকারী মালিকানাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানা ও উদ্যোগাধীন থাকিবারই কথা। ইহার পর ইহাদের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিয়া সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা হইবে। ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্রাংশভুক্ত নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান একমাত্র সরকারী উদ্যোগেই সংগঠিত হইবে। ১০ বৎসর পরে জাতীয়করণের সম্ভাবনা এবং ১০ বৎসরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সহিত প্রতিযোগিতা 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন' শিল্পক্ষেত্রাংশে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়া আসিতেছিল। পুঁজিপতিগণ এইরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মূলধন-সংরক্ষণ (capital maintenance), সুপরিচালনা প্রভৃতিতে লাভ কি—যখন ১০ বৎসর পরে এই প্রতিষ্ঠানগুলির রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার সমধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে? ১০ বৎসরের মধ্যেও রাষ্ট্রের অধিকার রহিয়াছে এই সকল প্রতিষ্ঠানের যে-কোনটিকে বা সকলকে নিজ মালিকানায় আনিবার। এই দুই কারণে যে শিল্পক্ষেত্রের এই অংশে ব্যক্তিগত উদ্যম বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার উপর আবার ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতির ফলে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও জাতীয়করণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারী উদ্যোগ ব্যাহত হওয়ার পরিমাণ যে বাড়িয়াছে তাহাও অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

২। ইহা ভারতীয় পুঁজিপতিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল

তৃতীয়ত, বেসরকারী উদ্যোগাধীন শিল্পক্ষেত্রের (private sector) সকল অংশে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সকল সময়ই অল্পবিস্তর বর্তমান থাকিবে। ইহাকেও শিল্পপতিগণ ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহারা বিনিয়োগ ও উদ্যোগের পথে অতি সতর্কতার সহিত পদসঞ্চার করিতেছেন।

৩। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ

চতুর্থত বলা হয় যে, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা পুরাপুরি ধনতান্ত্রিক বা সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালনা হইতে কঠিনতর। প্রথমোক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার কার্যে অতি নিপুণতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনের কাম্য বণ্টনকার্য সহজে সম্পাদিত হয় না। এই প্রসংগে ১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছে—"শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অনুপ্রবেশের

৪। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা কঠিন কার্য

সীমা একদিকে রাষ্ট্রের পরিচালন-ক্ষমতা এবং অপরদিকে ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিদের আপেক্ষিক দক্ষতার মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়াই নির্ধারণ করিতে হইবে।" এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, জাতীয় সরকারের শিল্পনীতি এই প্রকারের সমন্বয়সাধনের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। তাই আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হইতে পারে নাই।

৫। আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হয় নাই

উপসংহারে বলা যায়, প্রায় দুই শত বৎসরের বিদেশী শাসনের পর মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাকেই ভারতের পক্ষে প্রকৃষ্ট শিল্পনীতি বলিয়া গণ্য করা চলে। পূর্ণ ধনতন্ত্রবাদ বা স্বাতন্ত্র্যনীতির (*laissez faire*) দিন শেষ হইয়াছে। বর্তমান জগতের গতি হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা অল্প-বিস্তর পরিকল্পিত রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহার পুরাপুরি পরিকল্পিত রূপ দান করা যায় না। পুরাপুরি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার মত শাসনযন্ত্র ও সংগতি—কোনটাই বর্তমানে রাষ্ট্রের নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে "অনুন্নত দেশে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন উন্নত দেশে প্রবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয় হইলেও অনেক বেশী দুরূহ কার্য।"* সুতরাং প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া ইহার প্রবর্তন এবং দুরূহ বলিয়া ইহার সীমা নির্ধারণ করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের জাতীয় সরকার তাহাই করিয়াছে। বিবর্তনমূলক ধারায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে সমাজতন্ত্রীধরনের সমাজ-ব্যবস্থার (Socialistic Pattern of Society) প্রবর্তনই ইহার চরম লক্ষ্য। ভারতীয় পার্লামেণ্ট এই লক্ষ্য প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করিয়াছে।

উপসংহার:

বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় সরকার ঠিক পথেই চলিয়াছে

মূল শিল্পনীতিকে কার্যকরকরণ (Implementation of the Original Industrial Policy): ১৯৪৮ সালে ঘোষিত শিল্পনীতিকে কার্যকরকরণের উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে—যথা, ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের (Industrial Finance Corporation) প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৯ সালে নূতন ফিসক্যাল কমিশনের নিয়োগ, ১৯৫০-৫১ সাল হইতে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি। ইহার পর ১২টি জাতীয় গবেষণাগার (National Laboratories)** প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পসংক্রান্ত গবেষণাকার্য এবং সরকারী ক্ষেত্রে (public sector) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপন-কার্য সুরু করা হয়। কিন্তু শিল্পনীতিতে ঘোষিত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয় ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ)

অবলম্বিত পন্থাসমূহ:
১। শিল্পগত অর্থ করপোরেশন ইত্যাদি
২। শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা
৩। শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫১

* W. A. Lewis, The Principles of Economic Planning—Appendix II.

** বর্তমানে জাতীয় গবেষণাগারের সংখ্যা হইল ২১।

আইনে [Industries (Development and Regulation) Act, 1951]। উদ্দেশ্যের পরিচায়ক হিসাবেই আইনটিকে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা হইল সরকারের দ্বারা শিল্পসমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য আইন। এই সকল শিল্প বেসরকারী ক্ষেত্রাংশভুক্ত। সুতরাং এই ক্ষেত্রের শিল্প-ব্যবস্থার যথাযোগ্য উন্নয়ন ও যথাপ্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই এই আইন পাস করা হইয়াছে। আইনটি ১৯৫২ সালের মে মাস হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে।

১৬২টি শিল্প এই আইনের অধীন

প্রথমে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে প্রধানত পূর্বোক্ত খ ও গ শ্রেণীর অন্তর্গত ৩৭টি শিল্পকে তালিকাভুক্ত করিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইহাদের উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। বর্তমানে ১৬২টি শিল্প ইহার আওতায় আসিয়াছে।*

ক। নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই আইনের ব্যবস্থা

সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ব্যবস্থা হইল যে, তালিকার অন্তর্গত শিল্পগুলির প্রত্যেক পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে রেজেষ্ট্রিভুক্ত হইতে এবং প্রত্যেক নূতন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ, স্থান পরিবর্তন প্রভৃতির জন্যও লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে। লাইসেন্স প্রদানকালে সরকার প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান, আয়তন প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি পালনীয় সর্ত আরোপ করিতে পারিবে। কতিপয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে এবং দোষত্রুটির প্রতিবিধানের জন্য নির্দেশ দান করিতে পারিবে। নির্দেশ পালন করা না হইলে প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী উদ্যোগাধীনে আনয়ন করিতে পারিবে।

খ। উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা

উন্নয়ন সম্পর্কে ব্যবস্থা হইল যে, তালিকাভুক্ত বিভিন্ন শিল্পের জন্য একটি করিয়া উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) এবং সামগ্রিকভাবে এই সকল শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ (a Central Advisory Council of Industries) প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ অবিলম্বেই প্রতিষ্ঠিত হইবে; কিন্তু বিভিন্ন শিল্পের জন্য উন্নয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনমত করা হইবে।

নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করিবার জন্য একটি লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটি (Licencing Committee) গঠন করা হইবে।

আইনকে কার্যকর-করণ

শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের বিধান অনুসারে ১৯৫২ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ২৭। সদস্যগণ হইলেন শিল্প, শ্রম, ভোগ্যপণ্য ক্রেতা (Consumers) এবং প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধি।

আইনানুসারে একটি লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটিও স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা

---

* India—1960.

বাণিজ্য ও শিল্প, অর্থ, রেলপথ ও উৎপাদন মন্ত্রিদপ্তরসমূহ এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত।

চিনি, ভারী রসায়ন, পশম বস্ত্রাদি, কৃত্রিম সিল্ক, বাইসাইকেল, ঔষধপত্রাদি (pharmaceutical), কৃত্রিম সার, হালকা ও ভারী বৈদ্যুতিক শিল্প, লৌহবিহীন ধাতু (non-ferrous metals) প্রভৃতি শিল্পের জন্য উন্নয়ন কাউন্সিলও গঠন করা হইয়াছে।

শিল্পনীতি কার্যকরকরণের আর একটি মাধ্যম হইল জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Development Corporation)। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা দূরিকরণই ইহার উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, যে-সকল শিল্পের উন্নয়ন সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে সাধারণত সংঘটিত হয় না অথচ যাহাদের উন্নয়ন শিল্প-ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্যতার জন্য প্রয়োজনীয়, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন মূলধন সরবরাহ ও অন্যান্য উপায়ে তাহাদের সংগঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

পরিমার্জিত শিল্পনীতি (Revised Industrial Policy): ১৯৫৬ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু মূল শিল্পনীতির পরিমার্জনা ঘোষণা করেন। ঘোষণায় ১৯৪৮ সালের মূল শিল্পনীতির প্রকৃতি বর্ণনা করার পর বলা হয়, 'উক্ত শিল্পনীতির ঘোষণার পর হইতে আজ পর্যন্ত ৮ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।' ইতিমধ্যে ভারতে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও সমাপ্ত হইয়াছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য হিসাবে পার্লামেন্ট কর্তৃক সমাজতন্ত্রীধরনের সমাজের (Socialistic Pattern of Society) ধারণা গৃহীত হইয়াছে, ইত্যাদি। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় শিল্পনীতি নূতন করিয়া নির্ধারণের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই নূতন নীতি সংবিধানের উদ্দেশ্য, সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা এবং বিগত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।

শিল্পনীতি পরিমার্জনার কারণঃ

সংবিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়বিচারের (justice) প্রতিষ্ঠা এবং সকলকে সুযোগের সমতা প্রদান করা। উপরন্তু, উৎপাদনের উপাদানসমূহ যাহাতে কয়েক জনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া সাধারণের স্বার্থের হানি না করে রাষ্ট্রকে তাহাও দেখিতে হইবে।* মোটকথা, সংবিধান অনুসারে সমাজতন্ত্রবাদের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সংবিধানের এই নির্দেশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবের মাধ্যমে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে।

সংবিধানের নির্দেশ ও সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসার

রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য হিসাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ এবং দ্রুত

* সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি।

উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং সুস্পষ্ট নির্দেশই দেয় যে, সমস্ত মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং সাধারণের উপযোগী সেবামূলক কার্যসমূহ (public utility services) সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেই থাকিবে। অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্প এবং যে-সকল শিল্পে বর্তমান অবস্থার বিনিয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব তাহারাও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিবে।

সুতরাং রাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণের জন্য রাষ্ট্রের এই কার্যক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণ করা এবং ইহা যে যে শিল্পোন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে যত্নবান হইবে তাহাও নির্বাচন করা প্রয়োজন।

শিল্পসমূহের নূতন শ্রেণীবিভাগ ঃ

বিভিন্ন দিকের বিচার করিয়া সরকার শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শিল্প সম্বন্ধে সরকারী ভূমিকা হইল বিভিন্ন পর্যায়ের। এই যে শ্রেণীবিভাগ ইহাকে সম্পূর্ণ কঠোরতার সহিত অনুসরণ করা হইবে না। প্রয়োজনমত এক শ্রেণীভুক্ত কোন শিল্প অন্য শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হইতে পারে এবং একই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে সরকার বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। শিল্পগুলিকে শ্রেণীবিভক্তিকরণের জন্য সরকার দুইটি তালিকা (schedules) প্রস্তুত করিয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে আছে ১৭টি শিল্প। এগুলির উন্নয়ন হইবে অনন্যভাবে সরকারী দায়িত্বে। এই তালিকার মধ্যে প্রধান প্রধান শিল্প হইল ঃ অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরক্ষার অন্যান্য উপকরণ ; আণবিক শক্তি; লৌহ ও ইস্পাত ; কয়লা এবং প্রস্তরীভূত কয়লা ; খনিজ তৈল ; লৌহ-মাক্ষিক, মাংগানিজ-মাক্ষিক, জিপসাম প্রভৃতি খনি হইতে উত্তোলন ; বিমানপোত, জাহাজ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যন্ত্রপাতি নির্মাণ ; রেলপথ ও বিমানপথ ; বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ; ইত্যাদি।

১। প্রথম তালিকাভুক্ত শিল্প

দ্বিতীয় তালিকায় আছে ১২টি শিল্প। এগুলি ক্রমশ সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে চলিয়া আসিবে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ প্রথম তালিকাভুক্ত হয় নাই এরূপ এবং অন্যান্য কয়েকটি ছাড়া সকল প্রকার খনিজ শিল্প, কতিপয় যন্ত্রপাতি, রসায়ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক দ্রব্য (intermediate products), রাসায়নিক সার, মোটর ও জাহাজ চলাচল ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত শিল্প

অন্যান্য সকল শিল্প বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রাধীন থাকিবে। প্রথম তালিকাভুক্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন অনন্যভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হইলেও অস্ত্রশস্ত্রাদি, আণবিক শক্তি এবং রেলপথ ও বিমানপথ ছাড়া অন্যান্যের বেলায় একচেটিয়া সরকারী অধিকার ঘোষণা করা হয় নাই। অবশ্য ইহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সকল নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে একমাত্র সরকার। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীনে রহিয়া গিয়াছে তাহাদের ঐ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়া হইবে।

৩। অন্যান্য শিল্প

যে-সকল বেসরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ অনুমোদন করা হইয়াছে তাহাদের সম্প্রসারণেও বাধা দেওয়া হইবে না।

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির বেলায় সরকার নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গেলেও, ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণকে সরকারী সহযোগিতায় বা এককভাবে শিল্পক্ষেত্রাংশের উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ করিতে সুযোগ দেওয়া হইবে।

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সমবায়িক ভিত্তি

শিল্পক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশ বেসরকারী উদ্যোগাধীন থাকিলেও সরকারের পক্ষে এই শ্রেণীভুক্ত কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পথে কোনই বাধা থাকিবে না। পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে বেসরকারী উদ্যোগের এই ক্ষেত্রে (private sector) শিল্পসংগঠন সমবায়িক ভিত্তিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নানাভাবে সহায়তা করিবে।

কুটির ও গ্রাম্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ

কুটির ও গ্রাম্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপর ঘোষণায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বৃহদায়তন শিল্পগুলির প্রতিযোগিতা হইতে এই শিল্পগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে প্রভেদাত্মক করনীতি, প্রত্যক্ষ অর্থসাহায্য, বৃহদায়তন উৎপাদনকে সীমাবদ্ধকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রদান করা হইবে। তবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।*

বৈদেশিক মূলধন

ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারী নীতির কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

নূতন শিল্পনীতি পুরাতন নীতির পরিমার্জিত রূপ মাত্র

পরিমার্জিত শিল্পনীতির মূল্যায়ন (Evaluation of the Revised Industrial Policy) : ১৯৫৬ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৪৮ সালের মূলনীতির পরিমার্জিত রূপ মাত্র। বস্তুত, ইহা পরিমার্জিত শিল্পনীতি (Revised Industrial Policy) নামেই অভিহিত। পরিমার্জিত নীতি মৌলিক সূত্র হইতে বিদায় লইতে পারে না। ভারতের শিল্পনীতিও লয় নাই। অনেকে বিপরীত ধারণা পোষণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ছাড়া আর কোন পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই। ইহাতে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের বিলোপসাধনের ইংগিতই নাই। ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (objects) এবং লক্ষ্যের (targets) সহিত যতটা পরিমাণ সংগতিপূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে ততটাই স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে। এবং যে-যে শিল্পে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগেই অবস্থিত থাকিবে সেখানে কোন প্রভেদাত্মক বা অন্যায় ব্যবহার করা হইবে না।

---

* ২৯৯-৩০০ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিমার্জিত শিল্পনীতি জাতীয়করণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলে নাই তবে জাতীয়করণ অপেক্ষা উন্নয়নের উপরই যে সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে চায়, ইহা সামগ্রিকভাবে ঘোষণাতে প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং বর্তমানে জাতীয়করণের ভয়ে ভীত হইবার কিছু নাই।

জাতীয়করণ অপেক্ষা নূতন শিল্পোন্নয়নের উপরই অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মূলনীতি সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অস্তিত্বের (co-existence) উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছাড়াও ঘোষণার একটি নূতন কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইল একই শিল্পের ক্ষেত্রে উভয় উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা। অন্তত, আমাদের বর্তমান উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় যেখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার সংগতিই অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ সেখানে এই সহযোগিতাকে অপরিহার্য বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। পরিমার্জিত শিল্পনীতি এখানে প্রয়োজনীয় কার্যই সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু এই নীতি ঘোষণা করা এক ব্যাপার আর নীতির প্রয়োগ হইল ভিন্ন ব্যাপার। নীতির প্রয়োগে সরকারকে উভয়প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্কতার সহিত পথ চলিতে হইবে। না হইলে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত সমগ্র পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা

শিল্পের জাতীয়করণ (Nationalisation of Industries) : শিল্পের জাতীয়করণের প্রশ্ন সরকারী শিল্পনীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সরকারী শিল্পনীতি রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সরকারের ধারণা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত। সরকার যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী হয় তবে ইহা শিল্পক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (*laissez faire*) প্রয়োগ করিবে। সুতরাং তখন জাতীয়করণের কোন প্রশ্ন বা সমস্যা নাই। অপরদিকে সরকার যদি সমাজতন্ত্রবাদ বা সমগ্রবাদের (collectivism) পথে চলে তবে ইহা শিল্প-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে সচেষ্ট হইবে ; এবং ফলে তখন জাতীয়করণের সমস্যাও দেখা দিবে।

জাতীয়করণের প্রশ্ন শিল্পনীতির সহিত সম্পর্কিত

ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রাভিমুখী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং জাতীয়করণ হইল আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, জাতীয়করণের পথে কি গতিতে চলা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে জাতীয়করণ সম্বন্ধে কিছুটা তত্ত্বগত আলোচনা করিতে হয়। নিম্নে তাহাই করা হইতেছে।

জাতীয়করণ বলিতে বুঝায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনার অবসান এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনার প্রতিষ্ঠা। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে—উভয় দিকেই

যুক্তি আছে। যুক্তিগুলির কয়েকটি হইল তত্ত্বগত, বাকিগুলি ব্যবহারিক। তত্ত্বগত যুক্তিগুলি আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয়করণকে সমর্থন করে। এই দিক দিয়া বলা হয় যে, সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণই (greatest good of the greatest number) হইল রাষ্ট্রের আদর্শ। সুতরাং রাষ্ট্র পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইতে দিতে পারে না। শিল্প-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। না হইলে সর্বাধিক সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

জাতীয়করণের সপক্ষে যুক্তি :

দ্বিতীয়ত, এই কারণেই আর এক দিক দিয়া জাতীয়করণের প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত শিল্প-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় একমাত্র মুনাফালাভের প্রবৃত্তি (profit motive) দ্বারা। যেখানে মুনাফা নাই ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণের উদ্যোগের সন্ধানও সেখানে মিলে না। সুতরাং মুনাফার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনের পরিমাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এই হ্রাসবৃদ্ধি কল্যাণের সূচক নাও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মদ্য উৎপাদনকে লওয়া যাইতে পারে। মদ্য উৎপাদন করিয়া অধিক মুনাফা হইলে শিল্পপতিগণ অধিক উৎপাদনেই মনোযোগী হইবেন; সমাজের ক্ষতির কথা একবারও চিন্তা করিবেন না। বস্তুত, ব্যক্তির হস্তে উৎপাদন-ব্যবস্থা সমর্পিত রাখিলে অকল্যাণকর দ্রব্য অকাম্যভাবে উৎপন্ন হয় এবং কাম্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। সুতরাং বৃহত্তর আর্থিক কল্যাণের (economic welfare) জন্য প্রয়োজন হইল শিল্প-ব্যবস্থার জাতীয়করণের।

তৃতীয়ত, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, বেসরকারী পরিচালনাধীন শিল্প-ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পপতিগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বহু শ্রম, অর্থ ও উৎসাহের অপচয় ঘটে। অনেক সময় আবার প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিবার জন্য অবৈধ দুর্নীতিমূলক পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। শিল্প-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে ইহার কোনটিরই অবকাশ থাকে না।

চতুর্থত, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়; কিন্তু বেসরকারী মালিকানাধীন শিল্প একমাত্র মুনাফা-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া ইহা কোনমতেই সম্ভব নহে। ভারতের খনিজ শিল্পের উদাহরণ দিয়া বলা যায় যে, অতীতে আমাদের খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ উত্তোলন ও রপ্তানি অনেকাংশে খনিজ শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন থাকারই ফল।

পঞ্চমত, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকিকরণের জন্যও অনেক শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রয়োজন হয়। মুনাফার দিক দিয়া উচিত বিবেচিত না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতি কখনই আধুনিকিকরণের পথে পদসঞ্চার করিবে না; সরকার কিন্তু দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের কথা চিন্তা করিয়াই এই পথে অগ্রসর হইতে পারে। উপরন্তু, আধুনিকিকরণ উচিত বিবেচিত হইলেও ব্যক্তিগতভাবে

শিল্পপতির সংগতিতে না কুলাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজন হয়।

ষষ্ঠত, জাতীয়করণ শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা (lopsidedness) দূর করিবার অন্যতম মাধ্যম। এই কারণেই ইহার প্রয়োজন হইতে পারে। যে প্রয়োজনীয় শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাম্যভাবে গড়িয়া না উঠার ফলে শিল্প-ব্যবস্থা সামঞ্জস্যহীন হইয়া রহিয়াছে তাহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া তাহার প্রসারসাধন করাই কর্তব্য। বলা যায় যে ভারতের শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা এই নীতি অনুসরণ না করারই ফল।

সপ্তমত, ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে জনমতের চাপে ও আদর্শের অন্তঃপ্রেরণায় সরকারের পক্ষে শ্রমিকের প্রতি অধিকতর ন্যায্য ব্যবহার করিতে হয়। ফলে শিল্প-সীমান্তে সংঘর্ষের পরিমাণ কম হয়। শ্রমিকেরও কল্যাণ সাধিত হয়।

পরিশেষে, অল্পবিস্তর পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা হইল বর্তমান সভ্য জগতের নীতি।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে কিছু-না-কিছু জাতীয়করণ বুঝায়

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা বলিতেই কিছু-না-কিছু শিল্পের জাতীয়করণ বুঝায়। সুতরাং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণের সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। শুধু প্রশ্ন হইল জাতীয়করণের মাত্রা লইয়া। ইহা অবশ্য নির্ভর করে পরিকল্পনার প্রকৃতির উপর। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার জাতীয়করণের এই মাত্রা সুস্পষ্টভাবে শিল্পনীতিতে ঘোষণা করিতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তাহাই করা হইয়াছে।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি :

জাতীয়করণের বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে তাহার কতকগুলি হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন মাত্র। বলা হয় যে, শিল্প-ব্যবস্থা বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত বলা হয় যে, গণতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা হইল দক্ষতাবিহীন, মন্থরগতি ও অপচয়পূর্ণ। সরকারী পরিচালনা বলিতে বুঝায়—সরকারী কর্মচারীদিগের দ্বারা পরিচালনা মাত্র। এই সকল কর্মচারীর রুটিন-প্রীতি ও উদ্যোগের অভাব সর্বজনবিদিত। অপরিবর্তনীয় কার্যক্রমকে অনুসরণ করিতে পারিলেই দক্ষতার পরিচয় দেওয়া হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। উপরন্তু, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় তাঁহাদের পদোন্নতি কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে চাকরির দৈর্ঘ্যের উপর। ফলে সরকারী উদ্যোগাধীন থাকিলে শিল্পগত দক্ষতা (industrial efficiency) পদে পদে ব্যাহত হয়।

তৃতীয়ত, সরকারী পরিচালনাধীনে আসিলেই যে শিল্পটিকে জনকল্যাণসাধনে নিয়োজিত করা হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেরও পরিচালনা করা হয় লাভক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ভারতের রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগের মাসুল এরূপভাবে ধার্য করা হয় যাহাতে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়।

চতুর্থত, ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে মূলধন-সংগঠনের সমস্যাও (problem of capital formation) অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। শিল্পের জাতীয়করণের ব্যাপকনীতি গ্রহণ করিলে মূলধন-সংগঠন ব্যাহত হইতে বাধ্য। এই কারণে অনেকের অভিমত হইল যে, জাতীয়করণের পথে বিবেচনার সহিত চলা উচিত।

পরিশেষে, আমাদের ন্যায় অর্ধ-শিল্পোন্নত দেশে এই প্রশ্নের বিচার সর্বাগ্রে করা উচিত যে, সরকার নূতন শিল্প-সংগঠনে ইহার সংগতি নিয়োগ করিবে, না প্রতিষ্ঠিত শিল্পের জাতীয়করণের দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রীয় সংগতি শিল্পপতিগণ অপেক্ষা অধিক হইলেও ইহা সীমাহীন নহে। বরং ভারতের ন্যায় দেশে এই সীমা বিশেষ-ভাবে নির্দিষ্ট। সুতরাং জাতীয়করণ ও নূতন শিল্প-সংগঠনের মধ্যে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়কেই বর্তমানে গ্রহণ করিতে হইবে। অনেকের মতে, এই অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়টি হইল নূতন শিল্প-সংগঠন, জাতীয়-করণ নহে।

অনেকের মতে, জাতীয়করণের পরিবর্তে নূতন শিল্প-সংগঠনের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া উচিত

উপসংহার: ভারতের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বিবর্তনমূলক। ইহার অধীনে রাষ্ট্র সহসা সকল শিল্প-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত না করিয়া ধীরে ধীরে জাতীয়করণের কার্যে অগ্রসর হইবে—সরকারের মূল ও পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে এইরূপ ইংগিতই দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি জাতীয়করণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলে নাই। কিন্তু শিল্পের জাতীয়করণ অপেক্ষা উন্নয়নের উপরই যে সরকার সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে চায় ইহা সামগ্রিকভাবে শিল্পনীতি ঘোষণাতে প্রতিভাত হইয়াছে। সংগে সংগে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের শিল্পনীতিও বিবর্তনমূলক। ১৯৪৮ সালের ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৫৬ সালে পরিমার্জিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা আরও পরিবর্তিত হইতে পারে। সুতরাং জাতীয়করণের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া কঠিন। তবে এইটুকু বলা যায়, জাতীয়করণ ভারতের বর্তমান শিল্প-নীতির কোন মৌলিক সূত্র নহে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার লক্ষ্য দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং শিল্প-ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য যে-পরিমাণ জাতীয়করণ প্রয়োজন সেই পরিমাণ জাতীয়করণের নীতিই বর্তমানে অনুসৃত হইবে—তাহার অধিক নহে।

জাতীয় উৎপাদন পরিষদ (National Productivity Council): ১৯৫৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একটি উৎপাদন ডেলিগেশন (Production Delegation) জাপানে প্রেরিত হয়। ডেলিগেশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৮ সালে সরকার শিল্পপতি, শ্রমিক এবং অন্যান্যের প্রতিনিধি লইয়া একটি জাতীয় উৎপাদন পরিষদ (a National Productivity Council) গঠিত হইয়াছে। পরিষদের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে স্থানীয় সংস্থা (local councils) এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক দপ্তর (regional directorate) প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের মধ্যে উৎপাদন-চেতনার সঞ্চার করা এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আধুনিকতম কলাকৌশলের প্রবর্তন করা।

পরিষদ ১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৩০টি স্থানীয় সংস্থা এবং কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও বাংগালোরে পাঁচটি আঞ্চলিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Make out a case for industrialisation of India. (৩৪০-৩৪২ পৃষ্ঠা)

2. Comment on Original Industrial Policy of the Government of India as announced in 1948. (C. U. B. Com. 1955) (৩৪২-৩৪৫ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the steps that have been taken for the implementation of the Industrial Policy of the Government. (C. U. B. Com. 1955) (৩৪৯-৩৫১ পৃষ্ঠা)

4. Briefly discuss the Revised Industrial Policy of the Government of India. (C. U. B. Com. 1957)

[ইংগিত: ১৯৫৬ সালে ঘোষিত শিল্পনীতি ১৯৪৮ সালের মূল শিল্পনীতির পরিমার্জিত রূপ মাত্র। সুতরাং ইহাকে এইভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পরিমার্জনার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সংকোচনসাধন করা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সহযোগিতা, বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সমবায়িক ভিত্তি এবং কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংরক্ষণ হইল এই পরিমার্জিত শিল্পনীতির অন্যান্য সূত্র।...৩৫১-৩৫৪ পৃষ্ঠা]

5. Elucidate the main features of the Industrial Policy of the Government of India as enunciated from time to time. (C. U. B. Com. 1959)

(৩৪২-৩৪৫ এবং ৩৫১-৩৫৪ পৃষ্ঠা)

6. What is a Mixed Economy ? Write a short note on the importance of the public sector in the Indian economy. (৩৪৫-৩৪৭ পৃষ্ঠা)

7. Do you advocate nationalisation of Indian Industries ? Give reasons for your answer. (C. U. B. A. 1948, '49, '57) (৩৫৪-৩৫৭ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the policy of the Government of India regarding nationalisation of Industries.

[ইংগিত: জাতীয়করণের নীতি সরকারের শিল্পনীতির সহিত সম্পর্কিত। পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার জাতীয়করণ অপেক্ষা নূতন শিল্পগঠন ও পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের উপরই অধিক দৃষ্টি দিবে। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যসাধন, দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং শিল্প-ব্যবস্থায় সামঞ্জস্যতা আনয়ন করিবার জন্য সরকার যে-কোন সময় যে-কোন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারে।...

(৩৫৪ ও ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

একবিংশ অধ্যায়

ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি

(Fiscal Policy of the Government of India)

ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতির* ইতিহাসের ছুইটি অধ্যায় আছে—ব্রিটিশ আমলের ফিসক্যাল নীতি এবং জাতীয় সরকারের ফিসক্যাল নীতি। ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে তত্ত্বের দিক দিয়া ফিসক্যাল নীতির তত্ত্ব কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

ফিসক্যাল নীতির ছুইটি অধ্যায়

সুচিন্তিত ও সুপরিচালিত ফিসক্যাল নীতি শিল্পোন্নয়নের অন্যতম প্রধান সহায়ক। এই উক্তি বিশেষ করিয়া কৃষিপ্রধান অর্ধোন্নত দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শিল্পসমৃদ্ধির উপাদানসম্পন্ন অথচ কৃষিপ্রধান হইয়া আছে এরূপ দেশে সুচিন্তিতভাবে সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিয়া কার্যকর করিলে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে এবং অর্থ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা (lopsidedness) দূর করে। এই প্রসংগে অধ্যাপক পিগু (Prof. A. C. Pigou) বলিয়াছেন, "কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধাসমূহ রহিয়াছে সেখানে উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণের দাবি বিশেষভাবে প্রবল।" বস্তুত, সংরক্ষণ ব্যতিরেকে কৃষিপ্রধান অর্ধোন্নত দেশ হয়ত' কখনই শিল্পোন্নত হইতে পারিবে না—চিরকালই তাহাকে কাঁচামাল রপ্তানি ও যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানি করিতে হইবে।

ফিসক্যাল নীতির গুরুত্ব :

সংরক্ষণের উপযোগিতা

সংরক্ষণ ছুইভাবে দেওয়া যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে দেশীয় শিল্পকে সরাসরি অর্থসাহায্য (subsidy or bounty) করা হয় এবং দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে বিদেশী পণ্যের উপর সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করা হয়। উভয় পদ্ধতিতেই দেশী ও বিদেশী পণ্যের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য হ্রাস পায় বা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। ফলে দেশের বাজারে দেশীয় পণ্য বিদেশী পণ্যের সহিত সহজেই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে।

সংরক্ষণের ছুই পদ্ধতি : সরাসরি অর্থসাহায্য ও সংরক্ষণ শুল্ক ধার্যকরণ

এইভাবে উভয় পদ্ধতি দেশী ও বিদেশী পণ্য মূল্যের মধ্যে সমতা আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেও উভয়ের অর্থনৈতিক ফলাফল একই নহে। সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করা হইলে প্রপীড়িত হয় ভোগ্যপণ্য ক্রেতারা (consumers)—কারণ বর্ধিত শুল্কের ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়। অপরদিকে জাতীয় কোষাগার হইতে শিল্পকে সরাসরি অর্থসাহায্য করিলে শ্রেণী হিসাবে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের কোন বর্ধিত মূল্যভারই বহন করিতে হয় না ; ভার বহন করিতে

উভয় পদ্ধতির ফলাফল কিন্তু এক নহে

---

* 'ফিসক্যাল' (fiscal) শব্দটি দ্বার্থবোধক। ইহার দ্বারা শিল্প-সংরক্ষণ (rotection) নীতি বুঝাইতে পারে, আবার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়াদিও বুঝাইতে পারে। এই পরিচ্ছেদে শব্দটি প্রথম অর্থে—অর্থাৎ শিল্প-সংরক্ষণের অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে।

হয় সামগ্রিকভাবে করদাতাদিগকে। তাহাদের প্রদত্ত করেই বিশেষ ভোগ্যপণ্য ক্রেতারা শ্রেণী হিসাবে সুবিধা ভোগ করে। আবার সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করা হইলে সরকারের আয় হয়; কিন্তু সরাসরি অর্থসাহায্য করিলে সরকারকে সাধারণ তহবিল হইতে ব্যয় করিতে হয়।

স্বতরাং সংরক্ষণ প্রদানে সরাসরি অর্থসাহায্যের পদ্ধতি নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অবলম্বিত হয় না: (ক) যে-ক্ষেত্রে এইরূপ অর্থসাহায্য অতিমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী—অর্থাৎ সামান্য কিছুদিন সরকারী অর্থসাহায্য ভোগ করিলেই শিল্পটি সক্ষমভাবে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে; (খ) যেখানে শিল্পটি অপরাপর শিল্পের জন্য উৎপাদকের দ্রব্যাদি (producers' goods) উৎপন্ন করে এবং এই উৎপাদকের দ্রব্য ব্যবহারকারী শিল্পগুলি মূল্যাধিক্য বহন করিতে অক্ষম; (গ) যেখানে শিশু শিল্পটির উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সংরক্ষণ শুল্কের ফলে সংকুচিত হইতে বাধ্য এবং ভবিষ্যতে মূল্য-হ্রাস ঘটিলেও চাহিদার প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ আশা করা যায় না; (ঘ) যেখানে সংরক্ষণের দ্বারা কোন শিল্পদ্রব্যের আর মূল্যবৃদ্ধি ঘটান ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের দিক দিয়া উচিত বিবেচিত হয় না।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থসাহায্যের পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে

সংরক্ষণের সপক্ষে সাধারণত যে-সকল যুক্তির অবতারণা করা হয় তাহার মধ্যে শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি, জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি এবং শিল্প-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তিই হইল প্রধান।

সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি:

(ক) শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument): তত্ত্বগত অর্থনীতির দিক দিয়া অবাধ বাণিজ্যের সমর্থন সহজেই করা চলে। বাধাবিহীনভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিলে সকলের জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হয় এবং ফলে বিশ্বজনীনভাবে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। কিন্তু জার্মান অর্থবিদ্যাবিদ লিষ্ট (Frederick List) দেখাইয়াছেন যে, অবাধ বাণিজ্যের এই নীতি সবেমাত্র শিল্পায়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এইরূপ দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। এইরূপ দেশে অনেক শিশু শিল্প থাকে যাহাদিগকে শিল্পোন্নত দেশের পুরাতন শিল্পগুলির সহিত সম্মুখ প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়া দিলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য। স্বতরাং শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে লালন করিতে হইবে, বাল্যাবস্থায় তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করা যাইতে পারে। এইজন্য লালা হরকিষেণলাল সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন "শিশুর পরিচর্যা কর, বালককে রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বয়ঃপ্রাপ্তকে মুক্ত করিয়া দাও" (Nurse the baby, protect the child and free the adult)।

এই যুক্তিই প্রবলতম

(খ) জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি (Argument for National Self-sufficiency): সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তিগুলির মধ্যে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি

হইল দুর্বলতম। বর্তমান সভ্য জগতে মানুষের অভাব এত বিরাট, বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল যে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। উপরন্তু, যাঁহারাই শিল্পদ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি অনুসরণ করিতে চাহেন তাঁহারাই আবার সাধারণত রপ্তানি প্রসারের সপক্ষে। কিন্তু এই দুইটি বিষয় যে পরস্পরবিরোধী ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে চাহেন না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় (barter) বলিয়া অভিহিত করা যায়। সুতরাং অধিক রপ্তানি করিলে অধিক আমদানির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অধিক রপ্তানি বাণিজ্য পরস্পরের সহিত মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। তবে কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রধানত প্রতিরক্ষার (defence) জন্য প্রয়োজনীয় এবং জাতীয় জীবনে অপরিহার্য দ্রব্যাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যাভিমুখেই চলা উচিত। অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অপরিহার্য দ্রব্যাদির জন্য অপর দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া নানা দিক দিয়া বিশেষ বিপজ্জনক।

এই যুক্তিই দুর্বলতম

কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য করা যাইতে পারে

(গ) শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি (Diversification of Industries Argument): শিল্প-ব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যতা (lopsidedness) দূরিকরণের অন্যতম উপায় হইল সংরক্ষণের সাহায্যে কয়েকটি শিল্প গঠন করা। সুতরাং এ-যুক্তি মূল্যবান। কিন্তু এই পন্থা অবলম্বনেও বিশেষ সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। সামগ্রিকভাবে অর্থ-ব্যবস্থার উপর ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নূতন শিল্প গঠন বা প্রসারের জন্য সংরক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

এই যুক্তি মূল্যবান কিন্তু ইহা অবলম্বনে সতর্কতা প্রয়োজন

অন্যান্য যুক্তি

সংরক্ষণের সপক্ষে অন্যান্য যুক্তিও আছে—যথা, ইহা জাতীয় আয়বৃদ্ধি করে, নিয়োগ ও মজুরি বৃদ্ধি করে, ইত্যাদি।

উপসংহার

বর্তমানে অবশ্য উপরি-উক্ত যুক্তিতর্কের বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না। এই প্রসংগে ১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছে যে, শিল্প-সংরক্ষণের নীতি আর তত্ত্বগতভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা নির্ধারিত হইবার প্রয়োজন নাই। অবাধ বাণিজ্য না সংরক্ষণ—এই লইয়া যে-বিতর্ক বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে আজ আর তাহার কোন মূল্য নাই। অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ হইতেই বর্তমানে সংরক্ষণের বিষয় বিচার করিতে হইবে-দেখিতে হইবে যে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণের মোট ফলাফল কি হয়।

বিচারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection): ১৯২১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ফিসক্যাল স্বাতন্ত্র্যের নীতি গৃহীত হইলে ঐ সালেই ভারত সরকার প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করে। ইহার পূর্বে অবশ্য ভারতে সংরক্ষণের সপক্ষে জনমত বিশেষ প্রবল হওয়া সত্ত্বেও ভারতের বিদেশী সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতিকেই

লক্ষ্য করিয়া বসিয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ ভারতের জন্য যে ফিসক্যাল নীতির সুপারিশ করেন তাহাকে 'বিচারমূলক সংরক্ষণ' (Discriminating Protection) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'বিচারমূলক' শব্দটির অর্থ হইল যে, সকল শিল্পকেই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইবে না। সংরক্ষণ প্রদান করিবার সময় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে কোন্ কোন্ শিল্প সংরক্ষণের উপযুক্ত। অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, যে-সকল শিল্প ফিসক্যাল কমিশন নির্ধারিত কয়েকটি সর্ত পূরণ করিতে পারিবে মাত্র তাহাদিগকেই সংরক্ষণের সুবিধা প্রদান করা হইবে; অন্যথায় মাত্র কতকগুলি সংগঠনগত দুর্বল ও দক্ষতাবিহীন শিল্পকে অস্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ দেওয়া হইবে। সংরক্ষণ রহিত অবস্থায় একদিন-না-একদিন অস্বাভাবিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই শিল্পগুলির পতন হইতে বাধ্য। তখন মূলধন-মালিকের বিশ্বাস নষ্ট হইবে; শ্রমিকের ক্ষেত্রেও অব্যবস্থা সূচিত হইবে—কারণ শ্রমিক অন্যান্য সুসংগঠিত শিল্প হইতে এই সকল অসংগঠিত শিল্পে আকর্ষিত হইবে; এবং ফলে পরিশেষে সমগ্র শিল্প-ব্যবস্থাই ব্যাহত হইবে। তাই সংরক্ষণ প্রদানের পূর্বে প্রয়োজন হইল গভীরভাবে বিচার-বিবেচনার। যে-শিল্পগুলি কয়েকটি সর্ত পূরণ করিতে পারিবে মাত্র তাহাদিগকেই সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে—অন্যান্য শিল্পকে নহে।

'বিচারমূলক' শব্দটির অর্থ

সংরক্ষণকে বিচারমূলক করিবার কারণ

প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নির্ধারিত মূল সর্ত ছিল সংখ্যায় তিনটি :

বিচারমূলক সংরক্ষণের মূল সর্তাবলী

(ক) শিল্পটিকে স্বাভাবিক সুবিধাভোগ করিতে হইবে—যথা, অফুরন্ত কাঁচামালের সরবরাহ, সুলভ শক্তির নৈকট্য—যথা, প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান, ব্যাপক আভ্যন্তরীণ বাজার ইত্যাদি।

(খ) শিল্পটি এমন হইবে যে, সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার উন্নয়ন মোটেই সম্ভব নয় অথবা জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে যত দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন তত দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব নয়।

(গ) শিল্পটি এমন হইবে যে, শেষ পর্যন্ত ইহা বিনা সংরক্ষণেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে।

ফিসক্যাল কমিশনের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, পরিকল্পিত সংরক্ষণ সর্বক্ষেত্রেই ক্ষণস্থায়ী হইবে এবং মাত্র সেই সকল শিল্পকে ইহা প্রদান করা হইবে যেগুলি শেষ পর্যন্ত বিশ্বের বাজারে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। অবশ্য যে-সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার সম্ভাবনা আছে সেগুলির পক্ষে সংরক্ষণের দাবি বিশেষ প্রবল।*

অন্যান্য সর্ত

সমগ্র আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটান ছাড়াও আরও দু'একটি কারণে কোন শিল্প সংরক্ষণের জন্য বিশেষ দাবি করিতে পারে—যথা, ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (Law of

* (First) Fiscal Commission Report-এর ৪৫ পৃষ্ঠা।

Increasing Returns) যে-সকল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে-সকল শিল্প জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য, যে-সকল শিল্প অপর শিল্প সংগঠনের সহায়ক বা মূল শিল্প এবং যে-সকল শিল্পকে বিদেশী বাউন্টি-প্রাপ্ত (bounty-fed) শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে।

সংরক্ষণ শুল্কের হার এরূপভাবে নির্ধারিত হইবে যেন দেশীয় শিল্পের উৎপাদন-ব্যয় ও বিদেশী শিল্পের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সমতা আসে। যতদিন পর্যন্ত দেশীয় শিল্পের পক্ষে বিদেশী শিল্পের সমকক্ষ হইবার জন্য প্রয়োজন ততদিনই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে—কোন ক্ষেত্রেই চিরকালের জন্য নহে। মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে—যথা, যে-সকল শিল্পের পণ্য অপর শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং যে-ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের উপর সংরক্ষণ শিল্পের ভার অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়—সরাসরি অর্থসাহায্য দ্বারা সংরক্ষণের সুপারিশ করা হইয়াছিল।

সংরক্ষণ শুল্কের হার ও সংরক্ষণের মেয়াদ

দুইটি ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থসাহায্য

উপরি-উক্ত নীতিসমূহ অনুসারে কোন শিল্প সংরক্ষণের আওতায় আসিতে পারে কিনা সে-বিচার করিবে একদল বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত একটি শুল্ক বোর্ড (Tariff Board)। শুল্ক বোর্ড সংরক্ষণের সময় এবং সংরক্ষণ শুল্কের হারও নির্ধারণ করিবে।

শুল্ক বোর্ড

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রকৃতি (Nature of the Policy of Discriminating Protection) : প্রথম ফিসক্যাল কমিশন অনুমোদিত বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইয়াছে। ফিসক্যাল কমিশনেরই সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বলেন "সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের প্রধান সুপারিশকে এইভাবে সর্তাধীন করা হইয়াছে যে ইহার উপযোগিতাই ব্যাহত হইতে বাধ্য।" বস্তুত, সর্তগুলি এত কঠিন ছিল যে, অধিকাংশ শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণের প্রার্থনা জানানও সম্ভব ছিল না।

সমালোচনা :
১। ইহাকে কঠিন সর্তাধীন করা হইয়াছিল

বিচারমূলক সংরক্ষণের মূল সর্ত তিনটির বিশ্লেষণ করিলে এই অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কমিশন সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্প-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিতে পারে নাই। সংরক্ষণকে কঠিন সর্তাধীন করিলে কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে কিন্তু ইহাতে শিল্প-ব্যবস্থা সুসংগঠিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত হয় না।

২। ইহা সামগ্রিকভাবে শিল্প-ব্যবস্থার সহায়ক হয় নাই

তৃতীয়ত, ফিসক্যাল কমিশন একটি স্থায়ী শুল্ক বোর্ড (a Permanent Tariff Board) প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার পরিবর্তে প্রয়োজনমত সাময়িক শুল্ক বোর্ড (*ad hoc* Tariff Board) গঠন করা হইত। ফলে শুল্ক বোর্ডের কার্যে ছিল নিরবচ্ছিন্নতার বিশেষ অভাব।

৩। অস্থায়ী শুল্ক বোর্ড বিশেষ উপযোগী হয় নাই

চতুর্থত, সংরক্ষণের পরিপূরক ব্যবস্থায়—যথা, রেলপথে অনুকূল মাশুল, শিল্প সংক্রান্ত গবেষণা, শিল্পজ্ঞান শিক্ষার প্রসার, সরকার হইতে সরাসরি অর্থসাহায্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ কোন সুপারিশ ফিসক্যাল কমিশনের রিপোর্টে করা হয় নাই। এহেন অবস্থায় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির পক্ষে যে কতদূর কার্যকর হওয়া সম্ভব ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মোটকথা ব্রিটিশ স্বার্থের সহিত যথাসম্ভব সংগতি বজায় রাখিয়াই প্রথম ফিসক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিয়াছিল। ইহা কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যদের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, "আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতের শিল্পে অনগ্রসরতা কোনমতেই ভারতীয় জনগণের অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য নহে; ইহা বিরামহীন দমন নীতির দ্বারা, প্রতিকূল শুল্কনীতির দ্বারা জনগণের স্বভাবজাত শিল্প-প্রতিভাকে নিষ্পেষিত করিয়া সংঘটিত করা হইয়াছে।"*

৪। সংরক্ষণের পরিপূরক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয় নাই

ব্রিটিশ স্বার্থের সহিত সংগতি রাখিয়াই এই সংরক্ষণ নীতি নির্ধারিত হইয়াছিল

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির ফলাফল (Effects of the Policy of Discriminating Protection): ১৯২৩ সালে শুল্ক বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৩ সাল হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ইহার নিকট ৫১টি সংরক্ষণের প্রার্থনা অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হয়। ইহার মধ্যে সংরক্ষণের নূতন প্রার্থনা, পুনঃপ্রদানের প্রার্থনা, সংশোধনের প্রার্থনা, প্রবর্তিত রাখার প্রার্থনা প্রভৃতি সবই ছিল। যে-সকল শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প (paper pulp industry) এবং দিয়াশলাই শিল্পই প্রধান। ইহার মধ্যে ভারতের দুইটি প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্প—যথা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, এবং তুলাবস্ত্র শিল্প সংরক্ষণের জন্যই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়, চিনি শিল্প সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণের আওতাতেই গড়িয়া উঠে; এবং কাগজ ও দিয়াশলাই শিল্পের শৈশবাবস্থায় সংরক্ষণের সাহায্য বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

সুফল: ১। সংরক্ষণের ফলে কয়েকটি শিল্প গঠিত হয়

বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফল এইভাবে দেখা যায়: ১৯২৩ সাল হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯) সুরু পর্যন্ত ইস্পাতের উৎপাদনবৃদ্ধি পাইয়াছিল প্রায় ৮ গুণ, তুলাবস্ত্রের উৎপাদন প্রায় ২½ গুণ, কাগজের উৎপাদন ২ গুণের কাছাকাছি, দিয়াশলাই-এর উৎপাদন প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ; এবং চিনিতে ভারত একরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল।

২। কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ উৎপাদনবৃদ্ধিও ঘটে

অপর দিকে কিন্তু কতিপয় উল্লেখযোগ্য শিল্পকে বিভিন্ন অজুহাতে সংরক্ষণের সহায়তা প্রদান করা হয় নাই। ভারী রসায়নের (heavy chemicals) মত গুরুত্বপূর্ণ মূল

* (First) Fiscal Commission-Report-এর ১৮০ পৃষ্ঠা।

শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করা হইয়াছিল এই অজুহাতে যে ভারতে আভ্যন্তরীণ গন্ধকের যোগান পর্যাপ্ত নহে। অনুরূপভাবে অপরিষ্কৃত সোডার (soda ash) অভাব কাঁচ শিল্পের বেলায় সংরক্ষণ না-মঞ্জুর করার পক্ষে বিশেষ কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক আদারকারের (Prof. B. P. Adarkar) মতে, এই সকলের ফলে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রতিকূল প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কুফল : ১। বিভিন্ন অজুহাতে অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় নাই

প্রয়োগের দিক দিয়া বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতিকে 'সংরক্ষণ করিতে বিচারহীন অস্বীকারে'র (indiscriminate refusal to protect) নীতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই অভিযোগকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা না গেলেও বলিতে হয় যে, বিচারমূলক সংরক্ষণের ফলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শিল্প সুসংগঠিত হইতে পারিয়াছে ; এবং ইহার ফলে ভারতে শিল্পায়নের পথ কিছুটা প্রস্তুত হইয়াছে।

সংরক্ষণের বিচারহীন অস্বীকারের নীতি

কিন্তু অপরদিকে আবার দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের অভিমত সমর্থন করিয়া বলা যায় যে, বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফলে মাত্র কয়েকটি শিল্প সুসংগঠিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি হইয়াছে অধিকতর অসামঞ্জস্যপূর্ণ (lopsided)।

২। বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি শিল্পপদ্ধতির অসামঞ্জস্যতার অন্যতম কারণ

যুদ্ধকালীন ফিসক্যাল নীতি (Fiscal Policy during the War) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইবার কিছুদিন পরেই ভারতীয় শিল্পসমূহের পক্ষে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা একরূপ লোপ পায়। বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে একপ্রকার স্বাভাবিক সংরক্ষণের (natural protection) অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। শিল্পপতিগণ এই স্বাভাবিক সংরক্ষণের সুযোগে নূতন নূতন শিল্প সংগঠনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই ভয় সর্বদাই ছিল যে, যুদ্ধোত্তর যুগে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা এই সকল নব-সংগঠিত শিল্পের ধ্বংসসাধন করিবে। অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠিত বলিয়া তাহারা বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্ত তিনটি পূরণ করিতে পারিবে না ; ফলে অবাধ প্রতিযোগিতায় তাহারা ভাসিয়া যাইবে। এই সকল নব-সংগঠিত শিল্প যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের দিক দিয়া বিশেষ মূল্যবান ছিল। সুতরাং সরকারের পক্ষে শিল্পপতিদের উপরি-উক্ত আশংকা অপনয়ন করা একরূপ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে ১৯৪০ সালে সরকার ঘোষণা করে যে, যুদ্ধোত্তর যুগে নব সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-দাবি বিচার করা হইবে বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্তের দিক দিয়া নহে, সুসংগঠনের দিক দিয়া। অর্থাৎ, যুদ্ধোত্তর যুগে যে-সকল নবোদ্ভূত শিল্প সুসংগঠিত অবস্থায় থাকিবে তাহারা বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্তাবলী পূরণ করিতে সমর্থ হউক বা না-হউক তাহাদের সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে—এই আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছিল। এইভাবে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করা হয়।

যুদ্ধকালীন স্বাভাবিক সংরক্ষণের অবস্থা

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন ঘোষণা

এই ঘোষণা অনুসারে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে সরকার দুই বৎসরের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন শুল্ক বোর্ড নিযুক্ত করে। বোর্ডকে নিম্নলিখিত সর্তাধীনে শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়:

অন্তর্বর্তীকালীন শুল্ক বোর্ড ও সংরক্ষণের নূতন সর্ত

(১) শিল্পটি যেন সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত হয়, (২) (ক) স্বাভাবিক ও অর্থ নৈতিক সুবিধা এবং আনুমানিক ও প্রকৃত উৎপাদন-ব্যয়ের দিক দিয়া শিল্পটি এমন হয় যেন ইহা অল্প সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা অন্যপ্রকার রাষ্ট্রীয় সহায়তা ব্যতীত উন্মুখ প্রতিযোগিতার বাজারে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, অথবা (খ) শিল্পটি এমন হয় যেন জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া ইহাকে সংরক্ষণ বা অন্যপ্রকার রাষ্ট্রীয় সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় এবং এইরূপ সংরক্ষণ বা সহায়তার ব্যয় যেন অধিক না হয়।

যে-সকল নব-গঠিত শিল্প উপরি-উক্ত সর্ত দুইটিকে পূরণ করিতে পারিবে তাহাদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। সংরক্ষণের পরিপূরক হিসাবে প্রয়োজনমত অন্য প্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্যও অনুমোদন করা হইয়াছিল।

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি পরিত্যাগ ও নূতন নীতি গ্রহণ

সংরক্ষণের জন্য এই যে-নূতন ঘোষণা ও নির্দেশ ইহা বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি হইতে বিদায় গ্রহণেরই সূচক। বলা যায়, ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন নীতি গৃহীত হয়।

নূতন ফিসক্যাল নীতি (The New Fiscal Policy): ১৯৪৫ সালে নির্ধারিত নূতন ফিসক্যাল নীতিও বর্তমানে পুরাতনের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। বর্তমানে নূতন ফিসক্যাল নীতি বলিতে বুঝায় ১৯৪৯ সালের ফিসক্যাল কমিশন বা দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতি।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা অনুসারে সরকার এই নূতন বা দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী। সুতরাং ইহা কৃষ্ণমাচারী কমিশন নামেও পরিচিত।

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন

কৃষ্ণমাচারী কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ভারার্পণ করা হয়: (ক) বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগের ফলাফল বিশ্লেষণ করা; (খ) স্বাধীন ভারতের জন্য এক দীর্ঘকালীন ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ করা; এবং (গ) এই নীতিকে কার্যকর করার মাধ্যমে সুপারিশ করা।

এই কমিশনের উপর কার্যভার

১৯৫০ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয় যে, সংরক্ষণ শিল্পোন্নয়নের অন্যতম পন্থা মাত্র। ইহা দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার (develop-

ment planning) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইবে। যতদিন পর্যন্ত না এই পরিকল্পনা গৃহীত ও কার্যকর হয় ততদিন পর্যন্ত সকল প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পকে (all defence and strategic industries) সংরক্ষিত করিতে হইবে—তা এই সংরক্ষণের ব্যয়ভার যাহাই হইক না কেন। মূল শিল্পের (basic industries) ক্ষেত্রে শুল্ক কমিশন (Tariff Commission) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সর্তাধীনে সংরক্ষণের বিষয় বিচার-বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণের সুপারিশ করিবে। এই সকল শিল্পের সংরক্ষণের জন্য চিরকালের মত কোন অপরিবর্তনীয় সর্তাবলী নির্ধারণ করা যায় না। অন্যান্য শিল্পের বেলায় স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা এবং উৎপাদনের ব্যয়ের বিচার করিয়া যদি প্রতীয়মান হয় যে, শিল্পটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই চালাইয়া যাইতে পারিবে, অথবা ইহা এমন একটি শিল্পী যাহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়াই প্রয়োজন এবং দেশের উপর সংরক্ষণের ব্যয়ভার অতিরিক্ত নহে—তবে ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

কমিশনের সুপারিশের সংক্ষিপ্তসার

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহের বিশ্লেষণ এইভাবে করা যায়: (১) স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ নীতি (safe-guarding or defensive type of protection) হইতে বিদায় লইয়া উন্নয়ন-মূলক (developmental type of protection) সংরক্ষণের প্রবর্তনই হইল কৃষ্ণমাচারী কমিশনের প্রধান সুপারিশ। দেশের সর্বাংগীণ অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ধারণার সহিত কোনরূপ সংগতিসাধন না করিয়াই প্রথম ফিসক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত বা প্রপীড়িত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করা। সংহতভাবে ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের পথ প্রস্তুত করা ইহার লক্ষ্য ছিল না। ফলে দেশে কয়েকটি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু শিল্প-পদ্ধতি হইয়াছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বভাবতই এই পুরাতন নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই পরিবর্তন বা সংশোধন হইল বর্তমান ফিসক্যাল নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমান নীতি দেশের সর্বাংগীণ আর্থিক উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রকার জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। এই উদ্দেশ্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারী শিল্প অপেক্ষা মূল শিল্পের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইবে; প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে পুরাতন অপেক্ষা নূতন শিল্পকেই সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

সুপারিশসমূহের বিশ্লেষণ

উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ

(২) জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া প্রতিরক্ষামূলক ও সমরোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পসমূহের গুরুত্ব কোনমতেই লঘু করিয়া দেখা যায় না। তাই কৃষ্ণমাচারী কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছে যে, ব্যয়ভার যাহাই হউক না কেন, সংরক্ষণের মাধ্যমে ইহাদের সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রতিরক্ষামূলক শিল্প-সমূহকে যে-কোন ব্যয়ভারে সংরক্ষিত করিতে হইবে

(৩) সামগ্রিকভাবে শিল্পোন্নয়নই যখন চূড়ান্ত লক্ষ্য তখন মূল শিল্পসমূহের সংগঠন অপরিহার্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই কারণে ইহাদের সংরক্ষণের জন্য কোন অপরিবর্তনীয় সর্তাবলী নির্ধারণ করা যায় না। অবস্থা অনুসারে ইহাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সর্তাবলী, সংরক্ষণের সময় ও সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ধারিত করিতে হইবে। এই নির্ধারণের ভার ন্যস্ত থাকিবে একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশনের (a Permanent Tariff Commission) উপর।

মূল শিল্পসমূহের সংরক্ষণ অপরিহার্য

(৪) অপরাপর শিল্পের বেলায় জাতীয় স্বার্থ, স্বাভাবিক সুবিধা, উৎপাদন-ব্যয়, সংরক্ষণের ব্যয়ভার, সংরক্ষণের সময় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণ প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। তবে সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় স্বার্থই হইল মূল লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই সকল সময় বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

সংরক্ষণ নীতি জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচিত হইয়া প্রযুক্ত হইবে

জাতীয় স্বার্থ মূল লক্ষ্য বলিয়া অপরাপর বিষয়ের বিশ্লেষণে নমনীয়তা অবলম্বন করিতে হইবে—যথা,

(ক) বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির মত স্বাভাবিক সুবিধা বলিতে সকল প্রকার স্বাভাবিক সুবিধা বুঝা যাইবে না। যদি কোন শিল্পের আভ্যন্তরীণ বাজার, শ্রমিক সরবরাহ প্রভৃতির সুবিধা থাকে, তবে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায় না—মাত্র এই অজুহাতে ইহার সংরক্ষণের দাবি অস্বীকার করা যাইবে না।

স্বাভাবিক সুবিধার অর্থ

(খ) আভ্যন্তরীণ চাহিদা বলিতেও দেশের সমগ্র চাহিদা বুঝা যাইবে না। যদি কোন শিল্প দেশের সমগ্র চাহিদার এক বিশেষ অংশও মিটাইতে সমর্থ হয় তবে শিল্পটিকে সংরক্ষণ প্রদান করা যাইতে পারে।

আভ্যন্তরীণ চাহিদার অর্থ

(গ) আবার সকল সময় আভ্যন্তরীণ চাহিদার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না; ভবিষ্যতের রপ্তানি বাজারেরও দিকে নজর রাখিতে হইবে। যদি কোন শিল্পের পক্ষে পণ্য যুক্তিসংগত পরিমাণে বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার সম্ভাবনা থাকে তবে শিল্পটির অনুকূলে সংরক্ষণ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সংরক্ষণের বিষয় বিচার করিবার সময় রপ্তানি বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে

(৫) যে-সকল শিল্প সংরক্ষিত শিল্পজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরক সংরক্ষণ (compensatory protection) প্রদান করা যাইতে পারে।

ক্ষতিপূরক সংরক্ষণ

(৬) জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে কৃষিজ দ্রব্যকেও সংরক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সময় কোন মতেই পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না; এবং সরকার কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা এই পাঁচ বৎসর সময়কে সংক্ষেপিত করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ

সংরক্ষণ ও অন্তঃশুল্ক

(৭) সাধারণভাবে সংরক্ষিত শিল্পসমূহের উপর অন্তঃশুল্ক (excise duties) ধার্য করা হইবে না।

(৮) সংরক্ষণ শুল্ক হইতে কিছুটা আহরণ করিয়া একটি উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) সৃষ্টি করিতে হইবে ; এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই তহবিল হইতে সরাসরি অর্থসাহায্য (subsidies) প্রদান করিয়া প্রত্যক্ষভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উন্নয়ন তহবিল ও অর্থ-সাহায্য

সংরক্ষণের পরিপূরক ব্যবস্থাসমূহ

(৯) সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে অধিক পরিমাণে মূলধন সরবরাহ, শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহনের অধিকতর সুবিধা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(১০) সংরক্ষণ প্রদান যেমন সরকারের কর্তব্য, তেমনি অপরদিকে সংরক্ষিত শিল্পসমূহেরও দায়িত্ব রহিয়াছে সম্ভবমত দক্ষতা বজায় রাখিবার এবং সমাজবিরোধী কার্য হইতে বিরত থাকিবার। প্রত্যেক সংরক্ষিত শিল্পকে যুক্তিসংগত মূল্যনীতি (price policy) ও উৎপাদন-পদ্ধতি (production system) অনুসরণ করিতে হইবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মান উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

সংরক্ষিত শিল্পসমূহের দায়িত্ব

(১১) ফিসক্যাল নীতি পরিচালিত হইবে আইন দ্বারা সংগঠিত একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশনের (Tariff Commission) মাধ্যমে। পূর্বের মত ক্ষণস্থায়ী শুল্ক বোর্ড (*ad hoc* Tariff Board) হইলে চলিবে না। এই স্থায়ী শুল্ক কমিশনের কার্যপরিধি হইবে পূর্বতন শুল্ক বোর্ড হইতে ব্যাপকতর। পূর্বের মত সংরক্ষণের প্রার্থনার বিচার-বিবেচনা এবং অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াও ইহা প্রয়োজন হইলে স্বীয় উদ্যোগে যে-কোন সংরক্ষিত শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলাফল অনুসন্ধান করিতে পারিবে। কমিশন এই অনুসন্ধানের রিপোর্ট নিয়মিত-ভাবে সরকারের নিকট পেশ করিবে। রিপোর্টে ফলাফলের ব্যাখ্যা ছাড়াও কমিশনের সুপারিশসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকিবে। উপরন্তু, কমিশন সংরক্ষণ সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে গবেষণা চালাইয়া যাইবে। কমিশনকে সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রত্যেক আবেদনের বিচার যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পাদন করিতে হইবে ; এবং সরকারের পক্ষেও কমিশনের সুপারিশসমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিলে চলিবে না।

স্থায়ী শুল্ক কমিশন

পূর্বতন শুল্ক বোর্ড হইতে ইহার পার্থক্য

সংরক্ষণ আবেদনের সত্বর বিচার

নূতন ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ Application of the New Fiscal Policy) : ফিসক্যাল নীতি সম্বন্ধে কৃষ্ণমাচারী কমিশনের সুপারিশ সরকার গ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সালে শুল্ক কমিশন গঠন করিবার জন্য শুল্ক কমিশন আইন (Tariff Commission Act, 1952) পাস করে। শুল্ক কমিশনের সদস্যসংখ্যা অনধিক পাঁচ জন। ইহাদের মধ্যে একজন সভাপতি

শুল্ক কমিশনের গঠন

মনোনীত হন। এই মনোনয়ন এবং সকল সদস্যেরই নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। শুল্ক কমিশন ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্য সুরু করিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শুল্ক কমিশনের কার্যাবলী পূর্বতন বোর্ডের কার্যাবলী হইতে ব্যাপকতর। কমিশন সরকারের নির্দেশে সংরক্ষণের সকল প্রকার আবেদন লইয়া বিচার-বিবেচনা করা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করিতে পারে। এমনকি যে-সকল শিল্প এখনও উৎপাদনকার্য সুরু করে নাই তাহাদের সম্বন্ধেও সুপারিশ করিতে পারে। পূর্বতন শুল্ক বোর্ড অনধিক তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে পারিত; বর্তমানে শুল্ক কমিশনের বেলায় এরূপ কোন বাধানিষেধ নাই। ইহা যে-কোন পরিমাণ সময়ের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ করিতে পারে। ইহা একপ্রকার শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বিভিন্ন ফলাফল—যথা, উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপন্ন দ্রব্যের মান ও মূল্য লইয়া অনুসন্ধান করিতে পারে। ইহা দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা সমন্বিত। প্রয়োজন হইলে ইহা সাক্ষী তলব করিতে এবং সাক্ষ্য উপস্থাপিত করিতে বাধ্য করিতে পারে।

কার্যাবলী

সংগঠনের পর শুল্ক কমিশনের হস্তে পূর্বতন শুল্ক বোর্ডের বিচারাধীন ছিল—এইরূপ অনেক আবেদন আসে। কমিশন ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ২১টি অনুসন্ধানকার্য সম্পাদন করে। ইহার মধ্যে সংরক্ষণের নূতন আবেদন, সংরক্ষণ প্রবর্তিত রাখার আবেদন, মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রভৃতি সকলই ছিল। ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত ইহা মোট ৬৬টি শিল্পের সংরক্ষণ সংক্রান্ত আবেদনের বিচার করে।*

এই সময়ের মধ্যে যে-সকল নূতন শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা লাভ করে তাহাদের মধ্যে মোটরগাড়ী শিল্প (automobile industry), প্ল্যাসটিক শিল্প, কসটিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, বল-বিয়ারিং (ball-bearing), এঞ্জিনিয়ারের ইস্পাত ফাইল (engineers' steel files), পিত্তল নির্মিত বৈদ্যুতিক বাতিধার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে-সকল নূতন শিল্প সংরক্ষণ হইয়াছে

উপসংহারঃ যে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণমাচারী কমিশন নূতন ফিসক্যাল নীতি প্রণয়ন করিয়া গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিল তাহা আজ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় পার হইয়া তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হইতে চলিয়াছে। এই তৃতীয় পর্যায় বা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা আরও ব্যাপকতর শিল্পগত ভিত্তি (still broader industrial base)। এই ব্যাপকতর শিল্পগত ভিত্তি রচনায় নূতন ফিসক্যাল নীতির উপযোগিতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে—এ আশা করা মোটেই অযৌক্তিক নহে।

* Report on Currency & Finance for 1956-57, 1957-58 & 1958-59.

প্রশ্নোত্তর

1. Critically examine the nature and working of Discriminating Protection in respect of Industrial Development of India. (৩৬১-৩৬৫ পৃষ্ঠা)

2. "The Indian Fiscal Commission 1949-50 approached their task from a new angle and laid down new principles of protection." Elucidate the statement. (C. U. B. A. 1953)

[ইংগিত : ১৯২২-২৩ সালের ফিসক্যাল কমিশন যে-সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছিল তাহাকে প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ (safeguarding or defensive type of protection) বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত বা প্রপীড়িত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করা। সুসংহতভাবে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের পথ প্রস্তুত করার লক্ষ্য ইহার ছিল না। এই প্রকার সংরক্ষণ নীতি হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লইয়া দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত সংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করাই ছিল দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের (১৯৪৯-৫০) উদ্দেশ্য। ইহা যে সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ করিয়াছে তাহাকে উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ (developmental type of protection) বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই উন্নয়নমূলক সংরক্ষণের সর্তাবলী হইল পুরাতন বিচারমূলক সংরক্ষণের সর্তাবলী হইতে একেবারেই পৃথক্। ৩৬৬-৩৬৯ পৃষ্ঠা]

3. Elucidate the principles laid down by the Indian Fiscal Commission of 1949-50 regarding the grant of industrial and agricultural protection in the country. (৩৬৬-৩৬৯ পৃষ্ঠা)

4. Discuss the functions of the Tariff Commission. How do they differ from those of the previous Tariff Board ? (৩৬৯ পৃষ্ঠা)

5. Write a short note on the Fiscal Policy adopted by the Government after 1949-50. (C. U. B. A. 1959 ; B.Com. 1960) (৩৬৬-৩৭০ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের সমস্যা

(Problem of Industrial Finance in the Private Sector)

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধনের সমস্যা একটি গুরুতর সমস্যা

পুরাপুরি পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে শিল্পগত সরবরাহের কোন সমস্যা নাই বলিলেই চলে—কারণ এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিকল্পনা সম্ভাব্য পরিমাণ অর্থসংগ্রহের ভিত্তিতেই করা হয়। কিন্তু আমাদের মত মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে (private sector) মূলধন সরবরাহের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার সম্যক সমাধান ব্যতিরেকে দেশের শিল্পোন্নয়ন কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং এই সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পসমূহের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Financial Needs of Industries in the Private Sector) : ভারতীয়গণ যে শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া ঝুঁকি লইতে চায় না ইহা একটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় পুঁজির এইরূপ সন্দিগ্ধ প্রকৃতি ভারতের শিল্পোন্নয়নকে অনেকাংশে ব্যাহত করিয়াছে—শিল্পায়নের সূত্রপাত হইতেই শিল্পসমূহ মূলধন সংগ্রহের সমস্যায় প্রপীড়িত হইয়াছে।

ভারতীয় পুঁজির সন্দিগ্ধ প্রকৃতি

তত্ত্বগতভাবে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দুই প্রকার মূলধনের প্রয়োজন হয়—যথা, প্রাথমিক মূলধন (initial capital) এবং চলতি মূলধন (working capital)। প্রাথমিক মূলধনের প্রয়োজন হয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎপাদন সুরু করিবার পূর্বেই কারখানার জন্য জমি, কারখানা এবং অন্যান্য গৃহাদি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই প্রাথমিক মূলধনের পর্যায়ভুক্ত। ইহা দীর্ঘকালের জন্য প্রয়োজন হয় বলিয়া ইহাকে দীর্ঘকালীন (long-term or block) মূলধনও বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের মূলধন প্রয়োজন হয় দৈনন্দিন উৎপাদনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য। বর্তমানের জন্য কাঁচামাল ক্রয়, অদূর ভবিষ্যতের জন্য কাঁচামাল গুদামজাত রাখা, শ্রমিককে মজুরি প্রদান, বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন তাহা এই চলতি মূলধনের পর্যায়ভুক্ত।

প্রয়োজনীয় মূলধনের শ্রেণীবিভাগ—প্রাথমিক ও চলতি মূলধন

চলতি মূলধন দীর্ঘকাল ধরিয়া আবদ্ধ থাকে না। উৎপন্ন পণ্য বিক্রীত হইলেই ইহা অর্থে রূপান্তরিত হয় এবং তখন প্রয়োজন হইলে মূলধন সরবরাহকারীর ঋণ পরিশোধ করা চলে। ঋণ পরিশোধ করা বা মূলধন ফেরৎ দেওয়া হইলে পরবর্তী সময়ে উৎপাদনের জন্য আবার মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইভাবে চলতি মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে আবর্তন করিতে থাকে বলিয়া ইহাকে আবর্তনকারী বা পৌনঃপুনিক মূলধনও (circulating capital) বলা হয়।

এখন দেখা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয়গণ কোন্ কোন্ সূত্র হইতে এই দুই ধরনের মূলধন সংগ্রহ করে।

ভারতীয় শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের চিরাচরিত সূত্রসমূহ (Traditional Sources of Industrial Finance in India) : বর্তমানে বেসরকারী ক্ষেত্রভুক্ত ভারতীয় শিল্পসমূহ যে যে সূত্র হইতে মূলধন সংগ্রহ করে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—চিরাচরিত (traditional) এবং নবসৃষ্ট (newly created)। এই চিরাচরিত সূত্রসমূহের অ-পর্যাপ্তির জন্যই সরকারী উদ্যোগ ও উৎসাহে নূতন সূত্রসমূহের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং প্রথমেই চিরাচরিত সূত্রসমূহের প্রকৃতির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সূত্রসমূহের শ্রেণীবিভাগ—চিরাচরিত ও নবসৃষ্ট

দীর্ঘকালীন মূলধনের চিরাচরিত সূত্র :

প্রাথমিক বা দীর্ঘকালীন মূলধন সংগ্রহের চিরাচরিত সূত্র প্রধানত তিনটি : অংশ বা শেয়ার বিক্রয়, ডিবেঞ্চার বিক্রয়, এবং সরকার হইতে ঋণ।

১। শেয়ার বা অংশ বিক্রয়

দীর্ঘকালীন মূলধনের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় শেয়ার বা অংশ বিক্রয় দ্বারা। প্রধানত দুই প্রকারের শেয়ার বিক্রয় করা হয়—সাধারণ শেয়ার (ordinary shares) এবং সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার (preference shares)। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে পাটকল শিল্পই সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার বিক্রয় করিয়া সর্বাধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

২। ডিবেঞ্চার বিক্রয়

ডিবেঞ্চারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নহে

মূলধন সরবরাহের কার্যে ডিবেঞ্চার এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সামগ্রিকভাবে কলিকাতার যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়লব্ধ অর্থ মোট ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি টাকার কিছু উপর। বোম্বাই-এ অবশ্য ডিবেঞ্চারের পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকার মধ্যে ১৭½ কোটি টাকা।* তাহা হইলেও শিল্পক্ষেত্রে অর্থসংগ্রহের সূত্র হিসাবে ডিবেঞ্চারকে স্বচ্ছন্দেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অভিহিত করা চলে। ইহার অবশ্য নানা কারণ আছে। প্রথমত, শিল্পগত অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation) প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা এ-দেশে ছিল না। দ্বিতীয়ত, ডিবেঞ্চার শেয়ারের মত বাজারে সর্বদা বিক্রয়যোগ্য নহে বলিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি উহা লইতে চাহে না। তৃতীয়ত, বিক্রয় বাজারে ডিবেঞ্চারকে সরকারী ঋণপত্রের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে হয়।

৩। সরকার হইতে ঋণ—পরিমাণ অত্যল্প

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও সরকারী ঋণকে শিল্পগত প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সূত্র বলিয়া গণ্য করা যাইত না। শিল্পসমূহকে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য আইনের (State Aid to Industries Acts) দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু মূলধন সংগ্রহ করা হইয়াছে বটে, তবে ইহা পরিমাণে এত অল্প যে ইহার দ্বারা শিল্পগত মূলধন-সমস্যার একাংশও সমাধান হয় নাই। অবশ্য সম্প্রতি সরকার টাটা কোম্পানী, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রভৃতিকে দীর্ঘকালীন মোটা ঋণদান করিয়াছে। কিন্তু সরকারী ঋণ হইলেও ইহা শিল্পগত মূলধন সংগ্রহের চিরাচরিত সূত্র নহে—সাম্প্রতিক সূত্র মাত্র। সুতরাং ইহার আলোচনা বর্তমান প্রসংগে করা চলিতে পারে না।

চলতি মূলধনের চিরাচরিত সূত্র :

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে চলতি বা পৌনঃপুনিক মূলধন সরবরাহের সূত্রসমূহ হইল সংখ্যায় প্রধানত চারিটি : সাধারণের নিকট হইতে আমানত, পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত, দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ঋণ এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে ঋণ।

---

* Central Banking Enquiry Committee Report, Vol. I-এর ৩৩১ পৃষ্ঠা।

সাধারণের নিকট হইতে আমানত (public deposits) বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলির মূলধন সংগ্রহের এক বিশেষ সূত্র। এই সূত্রের সন্ধান দেশের অন্যান্য অংশে মিলে না। বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলে এই সূত্র হইতে বহু পরিমাণে চলতি মূলধন সংগৃহীত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ বিপজ্জনক। প্রথমত, মিল-মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত আমানত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় তাঁহারা এই অল্পকালীন ঋণ দীর্ঘদিনের জন্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেন। পরিশেষে অনেক সময় দেখা যায় যে, সামান্য গুজবেও আমানতকারীরা টাকা উঠাইয়া লইতে ব্যস্ত হইয়াছে। এই কারণে এই সকল আমানতকারীকে 'সুসময়ের বন্ধু' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

১। সাধারণের নিকট আমানত

পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে (private deposits) বুঝায় ম্যানেজিং এজেন্ট, অন্যান্য শিল্পপতি এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে আমানত। এই সকল আমানতকারী সুসময়ের বন্ধু না হইলেও এই পদ্ধতির একটি বিশেষ ত্রুটি আছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত সাধারণের অগোচরে কখন শেয়ারে পরিণত হইয়াছে।

২। পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত

দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়িগণ শিল্পগত চলতি মূলধন সরবরাহের এক উল্লেখযোগ্য সূত্র। কিন্তু ইহাদের সুদের হার এত চড়া যে শিল্পপতিগণ গত্যন্তরবিহীন না হইলে এই সূত্র হইতে ঋণসংগ্রহ করিতে চাহেন না। অথচ সাধারণভাবে তাঁহারা গত্যন্তরবিহীন বলিয়া এই সূত্র হইতেই তাঁহাদের মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়।

৩। দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী

পরিশেষে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ হইতেও অনেক ক্ষেত্রে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক এই প্রকার ঋণদান বিষয়ে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করে এবং ঋণও অতি অল্প সময়ের জন্য প্রদান করে। ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে ইহাদের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংক

শিল্পগত অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্যা (Traditional Problem of Industrial Finance)ঃ উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, শিল্পগত অর্থসংগ্রহের পরম্পরাগত সমস্যা হইল মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যা বা পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন সংগ্রহের সমস্যা। অন্যান্য কারণের মধ্যে সুসংগঠিত মূলধন বাজারের (Capital Market) অভাবের দরুন ভারতে শিল্পোন্নয়ন সর্বদাই ব্যাহত হইয়াছে। শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া যে সামান্য পরিমাণ প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা অধিকাংশ সম্ভব হইয়াছে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য। ইহা একরূপ সর্বজনবিদিত যে প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্টদের নাম জড়িত না থাকিলে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ একপ্রকার অসম্ভই। প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্টরাও পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ

প্রধান সমস্যা অপ্রতুলতার সমস্যা

করিতে পারেন না। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা প্রাথমিক মূলধন এইভাবে সংগ্রহ করা হয় যে, শিল্প-সংগঠনের প্রাথমিক কাজ মিটিয়াও চলতি মূলধন হিসাবে কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকে। ভারতে কিন্তু এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক কার্যাদির জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হয় না। ফলে এদেশে শিল্পপতিগণকে চলতি মূলধনের একটা অংশকে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখিতে হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া এই পদ্ধতি বিশেষ অবাঞ্ছনীয় কারণ ইহা বিপজ্জনক।

চলতি মূলধন সংগ্রহের পদ্ধতির ত্রুটি

দেখা গিয়াছে, চলতি মূলধনও বিশেষ সুলভ ও ত্রুটিবিহীন নহে। সাধারণের নিকট হইতে আমানত চলতি মূলধন সংগ্রহের একটি বিশেষ বিপজ্জনক সূত্র হইলেও ইহার উপর বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিকে নির্ভর করিতে হয়। পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ঋণ ও চলতি মূলধন সংগ্রহের কাম্য সূত্র নহে। শিল্পপতিগণের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণ যে-ঋণদান করেন তাহা অনেক সময় শেয়ারে রূপান্তরিত হইয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ইঁহাদের করতলগত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের দৃষ্টিভংগি সম্পূর্ণ হতাশব্যঞ্জক। এই দৃষ্টিভংগিকে 'আমাকে ছুঁইও না' (touch me not) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ছুঁইতে না পারিয়া শিল্পপতিগণ দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের নিকট যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই শেষোক্ত সূত্র হইতে ঋণের সুদের হার এত বেশী যে অনেকে ঋণ করিতে গিয়াও ফিরিয়া আসেন।

রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা

পরিশেষে, শিল্পগত অর্থ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে শিল্পগত মূলধন সরবরাহে রাষ্ট্রের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না বলিলেই চলে। শিল্পে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য আইন (State Aid to Industries Acts) অনুসারে সরকার মাঝে মাঝে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাথমিক মূলধন সরবরাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এতই অল্প যে তাহার দ্বারা শিল্পগত অর্থ সরবরাহের সমস্যার একাংশেরও সমাধান হয় নাই। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ বিশেষ করিয়া জাপানের সহিত তুলনায় ভারতে রাষ্ট্রের এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল।

ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশন (Industrial Finance Corporation of India): ভারতের শিল্পক্ষেত্র এই পরম্পরাগত অর্থ সরবরাহের সমস্যা সমাধানের জন্য নানা পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছিল—যথা, পর্যাপ্তসংখ্যক শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগ ট্রাষ্ট (Investment Trust) প্রতিষ্ঠা, শেয়ার-বিক্রয় বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পুনর্গঠন ও মিশ্র ব্যাংকিং-এর (mixed banking) প্রসার, শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। অবশেষে স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির (Central Banking Enquiry Committee) সুপারিশ যে শিল্পগত অর্থ করপোরেশন প্রতিষ্ঠাই প্রথম অনুসরণযোগ্য পন্থা তাহাই গ্রহণ করিয়া ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গঠন ঃ করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ইহা প্রত্যেকটি এককালীন দেয় ৫ হাজার টাকার মূল্যের ২০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত। মাত্র প্রতিষ্ঠান-সমূহই অর্থ করপোরেশনের শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। স্বভাবতই বর্তমানে মোট বিলিকৃত মূলধন অর্থাৎ ৫ কোটি টাকার শেয়ারের সমগ্রটাই কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার শেয়ার মূলধনের মূল্য এবং শতকরা ২½ হারে লভ্যাংশের জামিন হইয়া থাকে। আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত অর্থের (reserve) ৫ গুণ পর্যন্ত ঋণ করিবার ক্ষমতা করপোরেশনের ছিল। ১৯৫৮ সালের এক সংশোধন দ্বারা ইহাকে ১০ গুণ করা হইয়াছে। এই ঋণ সাধারণত ডিবেঞ্চার ও বণ্ডের মাধ্যমে করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের সম্বন্ধেও গ্যারান্টি প্রদান করিয়া থাকে। বর্তমানে এই বণ্ড ও ডিবেঞ্চার সাধারণেও ক্রয় করিতে পারে। করপোরেশন একাদিক্রমে অন্যূন দশ বৎসরের জন্য সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারে। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে বিশ্ব ব্যাংক হইতেও ঋণ করিতে পারে।

মূলধন

ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের পরিচালনভার ১২ জন পরিচালক লইয়া সংগঠিত একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। ইহাদের মধ্যে ৪ জন কেন্দ্রীয় সরকার ও ২ জন রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা নিযুক্ত এবং বাকী ৬ জন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক প্রভৃতি শেয়ার ক্রেতাগণ দ্বারা নির্বাচিত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৪ জনের মধ্যে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং একজন সহকারী ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে পরিচালকমণ্ডলীকে কার্য করিতে হয়। নির্দেশ অমান্য করিলে সরকার বোর্ড ভাঙিয়া দিয়া করপোরেশনের পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারে।

পরিচালনা

কার্য ঃ ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশন সসীম দায়সম্পন্ন সাধারণ যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Public Limited Companies) এবং সমবায় সমিতির যেগুলি পণ্য উৎপাদন অথবা খনিজ দ্রব্য অথবা শক্তি সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে এবং জাহাজী কোম্পানীদিগকে (shipping companies) মূলধন সরবরাহ করিতে বা সরবরাহে সাহায্য করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ইহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি ঋণদান করিতে পারে বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারে। এই ঋণ বা ডিবেঞ্চারের মূল্য পরিশোধ সর্বাধিক ২৫ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, করপোরেশন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির অবলেখনের (underwriting) কার্য করিতে পারে। এই কার্য সম্পাদনে যে-সকল শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ইহার হস্তগত হইবে অনধিক ৭ বৎসরের মধ্যে তাহা হস্তান্তরিত করিয়া ফেলিতে হইবে। তৃতীয়ত, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ টাকার বাজার হইতে যে-ঋণ সংগ্রহ করে তাহার সময় ২৫ বৎসরের অধিক না

মূলধন সরবরাহ

অন্যান্য কার্য

হইলে করপোরেশন সেই সকল ঋণ সম্পর্কে গ্যারাণ্টি প্রদান করিতে পারে। চতুর্থত, ১৯৫৮ সালের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ভারতীয় আমদানিকারিগণ বিদেশ হইতে ধারে মাল কিনিলে করপোরেশন ঐ সম্বন্ধেও গ্যারাণ্টি প্রদান করিতে পারে। জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ উপযুক্ত জামানত দিতে না পারিলেও যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা কোন তপশীলী ব্যাংক বা রাজ্য সমবায় ব্যাংক গ্যারাণ্টি প্রদান করে তবে করপোরেশন ঐ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করিতে পারে।

সুদের হার বর্তমানে শতকরা ৭ টাকা

করপোরেশন প্রথমে ঋণের উপর শতকরা ৫½ হারে সুদ লইত; পরে ইহাকে বৃদ্ধি করিয়া প্রথমবারে শতকরা ৬ টাকায়, দ্বিতীয়বারে শতকরা ৬½ টাকায় এবং তৃতীয়বারে (১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে) শতকরা ৭ টাকায় লইয়া যায়। সুতরাং বর্তমানে সুদের হার শতকরা ৭ টাকা। চুক্তিমত ঋণ পরিশোধ করিলে শতকরা ½ টাকা হারে সুদ হইতে বাদ দেওয়া হয়।*

আইনের সংশোধন ও করপোরেশনের কার্য-পরিধি বৃদ্ধি

প্রথমে ১৯৫১ সালে এবং পরে ১৯৫৩, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৮ সালে শিল্পগত অর্থ করপোরেশন আইনের সংশোধন করা হয়। প্রথম সংশোধনের ফলে ইহার কার্যপরিধি বৃদ্ধি পায় এবং ইহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। পূর্বে ইহা ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণদান করিতে পারিত না; এখন এই ঊর্ধ্বতন মাত্রা ১ কোটি টাকায় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে জাহাজী কোম্পানীগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ভুক্ত ছিল না। ১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বারা তাহাদের এই পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। উপরন্তু ইহা স্থির করা হইয়াছে যে, নবসৃষ্ট বিশেষ রিজার্ভ তহবিলে (Special Reserve Fund) যে-পর্যন্ত না ৫০ লক্ষ টাকা মজুত হয় ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংক তাহাদের লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে না। এই লভ্যাংশ ঐ বিশেষ তহবিলে জমা হইবে। ১৯৫৫ সালের সংশোধন দ্বারা করপোরেশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষ বা ১৯৫৮ সালের সংশোধন দ্বারা করপোরেশনের ঋণগ্রহণের ক্ষমতা আদায়ীকৃত মূলধন ও সঞ্চিত তহবিলের ৫ গুণ হইতে ১০ গুণ করা হইয়াছে এবং উহাকে ভারতীয় আমদানিকারিগণের সপক্ষে গ্যারাণ্টি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

দেনাপাওনা

শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের ১৯৫৮-৫৯ সালের কার্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইহার মোট পাওনার (assets) পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। মোট দেনার (liabilities) মধ্যে শেয়ার-মূলধন এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ কোটি এবং ২৯ কোটি টাকার কিছু উপর। ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত করপোরেশন সাধারণের নিকট হইতে কোন আমানত গ্রহণ বা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করে নাই।

---

* **Reserve Bank Bulletin, October, 1959.**

কার্যসম্পাদন ও সমালোচনা ঃ ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত—এই ১১ বৎসরে শিল্পগত অর্থ করপোরেশন ৩০০টি ঋণের আবেদন অনুমোদন করিয়া মোট ৬৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ঋণদান করে। যে-সকল শিল্পকে ঋণদান করা হইয়াছে তাহার মধ্যে চিনি শিল্পই প্রধান। ইহা ছাড়া তুলাবস্ত্র শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, রসায়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং মোটরগাড়ী শিল্পও আছে।* নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও আধুনিকিকরণের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। ভারতীয় আমদানিকারিগণের সপক্ষে গ্যারাণ্টি প্রদানের কার্যে করপোরেশন বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার কারণ হইল আমদানি-নিয়ন্ত্রণ হেতু আমদানিকারিগণের নিকট হইতে অনুরোধের অভাব।

১১ বৎসরের কার্যবিবরণী

নানা দিক দিয়া শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে শিল্পগত অর্থ করপোরেশন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ইহা বৃহদায়তন শিল্পসমূহকেই লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে। মধ্যায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ ইহার নিকট হইতে কোনরূপ সহায়তা পাইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শিল্পগত অর্থ করপোরেশন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইলেও ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র। ইহার ঋণদানের সংগতির পরিমাণ অত্যল্প। তৃতীয়ত, করপোরেশন প্রদত্ত ঋণের সুদের হার অত্যধিক। চতুর্থত, কার্যসম্পাদনেও করপোরেশনের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম করপোরেশনকে ন্যূনতম শতকরা ২½ হারে লভ্যাংশ প্রদান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা এরূপ ঋণপ্রদান করিয়াছে যাহা শেষ পর্যন্ত বিরাট ক্ষতিতে পরিণত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, সোদপুরের কাঁচের কারখানাকে (Sodepur Glass Works Ltd.) ঋণদানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার করপোরেশন নিজস্ব কার্যালয়ের খসড়া প্রস্তুতিকার্যে প্রায় ১½ লক্ষ টাকা নষ্ট করিয়াছে।

অভিযোগ ঃ
১। ইহা মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়ক নহে
২। ভারতের ন্যায় দেশের পক্ষে ইহা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান
৩। সুদের হার অত্যধিক
৪। কার্যসম্পাদনে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা গিয়াছে

কার্যসম্পাদনে এই সব ত্রুটির জন্য ১৯৫২ সালে পার্লামেণ্টে শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ফলে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর সভাপতিত্বে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি করপোরেশনের ঋণপ্রদান ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব, অন্যান্য প্রকার দুর্নীতি, কার্যসম্পাদনে অনাবশ্যক বিলম্ব, জটিলতা প্রভৃতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইহার পুনর্গঠনের জন্য সুপারিশ করে। ইহার ফলে ১৯৫৫ সালে করপোরেশন আইনের নানাভাবে সংশোধন করা হয়।

অভিযোগের ফলে করপোরেশন আইনের সংশোধন

* Reserve Bank Bulletin, October, 1959.

অন্যতম সংশোধন দ্বারা অবৈতনিক আংশিক সময়প্রদানকারী (part-time) সভাপতির পদকে বেতনভোগী পুরা সময়প্রদানকারী (whole-time) সভাপতির পদে পরিণত করা হইয়াছে এবং আর একটি সংশোধন দ্বারা ইহাকে মর্টগেজীকৃত সম্পত্তি লীজ দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৫৬-৫৭ সালের কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। এই সকলের ফলে করপোরেশনের কার্যসম্পাদনে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। উহা দিন দিন উহার নীট মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে নীট মুনাকার পরিমাণ ছিল ১২'২৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা যথাক্রমে ২৮'২০ লক্ষ এবং ৩৫'৩৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ইহার ফলে করপোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট ডিভিডেণ্ড প্রদানের দরুন যে ঋণ করিয়াছিল তাহার অধিকাংশ মিটাইয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে।

সাম্প্রতিক উন্নতি

উপসংহার : শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের যে-সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু অযৌক্তিকতা রহিয়া গিয়াছে। প্রথমত, করপোরেশন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে-সমালোচনা করা হয় তাহা মোটেই যুক্তিসংগত নহে। স্পষ্টতই শিল্পগত অর্থ করপোরেশন একটি বৃহদায়তন জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্পসমূহকে মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। মধ্যায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের মূলধনের সমস্যা ইহার পরিধিভুক্ত নহে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহকে এই ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য ছোট ছোট শিল্পগত অর্থ করপোরেশন, মধ্যায়তন শিল্পসমূহকে মূলধন যোগাইবার জন্য পুনঃ অর্থসরবরাহ করপোরেশনের (Refinance corporation) ন্যায় বিশেষীকৃত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে ইহাই করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের ঋণদানের সংগতি অত্যল্প সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সমালোচনাও যৌক্তিকতার সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছে।

অভিযোগের মূল্যায়ন

ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা করপোরেশনের পরিধিভুক্ত নহে

এই শ্রেণীর সমালোচকগণ শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের প্রকৃত ভূমিকা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। করপোরেশন বর্তমান মূলধন বাজারের অনুপূরক (supplement) মাত্র—ইহার পরিবর্ত (substitute) নহে। যে-সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাজার হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না তাহাদের সহায়তা করাই ইহার কার্য। করপোরেশনের বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত মেননের (Mr. K. R. K. Menon) ভাষায় বলা যায় যে, করপোরেশন "সেই সকল প্রতিষ্ঠানকেই ঋণদান করিয়াছে যাহারা মূলধন বিনিয়োগের আধিক্য ও মুনাফার স্বল্পতার জন্য সাধারণ ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী জনসাধারণের নিকট হইতে প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই"। এবং ভবিষ্যতে এই পন্থাই অবলম্বন করা হইবে। উপরন্তু বলা যায়, যে-দেশে মূলধন সরবরাহ ব্যাপারে ঋণের ভূমিকা

ইহা মূলধন বাজারের অনুপূরক, পরিবর্ত নহে

লইয়া আর বলিবার কিছুই নাই যে-দেশে এই পথে সতর্কতার সহিতই পদক্ষেপ করা ভাল।

বাজারের তুলনায় সুদের হার অধিক নহে

সুদের হার সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাজারের তুলনায় ইহা মোটেই অধিক নহে। সুদ সম্বন্ধে ইহা সাধারণ বাণিজ্যিক নীতি—বাজারে চলতি হার অনুসরণ করিয়াছে মাত্র।

ইহার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনা অনেকাংশেই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে

অন্যান্য কর্পোরেশনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে-সকল সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা পুরাপুরি না হইলেও অধিকাংশে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। শিল্পগত অর্থ কর্পোরেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যদি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়, নানাপ্রকার দুর্নীতির আবাসস্থল হয় তবে জাতীয় জীবনের প্রগতি ব্যাহত হইতে বাধ্য। এইজন্য যে-সকল সংশোধন করা হইয়াছে তাহা ছাড়াও কর্পোরেশনের কার্যাবলীর উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা উচিত। জীবনবীমা কর্পোরেশনের বিনিয়োগ ব্যাপারে দুর্নীতি প্রকাশের পর সরকারের পক্ষে ইহা অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেই চলে।

পরিশেষে, আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিল্পগত কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার সময় মূলধন বাজারের অনুপূরক হিসাবে ইহার কার্যাবলীর সাফল্য একরূপ স্বীকার করিয়া পরিকল্পিত হইলেও, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার বর্তমান পর্যায়ে ইহা আর অনুরূপ বিবেচিত হইতেছে না। সুতরাং প্রয়োজন হইল কর্পোরেশনের অর্থসংস্থানের সম্প্রসারণ। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ১৪ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৮ সালে কর্পোরেশন এই ঋণ গ্রহণ করিয়া ১৯৫৯ সালে উহার একাংশ পরিশোধ করে। ১৯৬১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালের সংশোধন দ্বারা ইহার ঋণগ্রহণের ক্ষমতাকে যে বিস্তৃত করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন (State Financial Corporations): শিল্পগত অর্থ কর্পোরেশনের পক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আঞ্চলিক শিল্পসমূহকে মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব নহে বলিয়া রাজ্যসমূহকে তাহাদের নিজস্ব অর্থ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ১৯৫১ সালে এক বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। ইহা রাজ্য অর্থ সরবরাহকারী কর্পোরেশন আইন (State Financial Corporations Act) নামে পরিচিত। এই আইনের দ্বারা রাজ্যসমূহ তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন করিবার অধিকারী হয়।

প্রয়োজনীয়তা

এই আইনের বলে ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সমেত মোট ১৩টি রাজ্যে অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ইহাদের সংখ্যা কমিয়া

রাজ্যের সংখ্যা ১১-তে দাঁড়ায়। ইহার উপর ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে মণিপুর রাজ্যের কর্পোরেশনটি প্রতিষ্ঠিত হইলে সংখ্যা ১২ তে পরিণত হয়। ইহার উপর ঐ একই প্রকৃতির মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশনকে (Madras Industrial Investment Corporation) ধরিলে বলা যায় যে জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া সকল রাজ্যেই একটি করিয়া রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনগুলি সাধারণত নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন যন্ত্রপাতির

মূলধন ও কার্যাবলী পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য ৫০ হাজার টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধনের জন্যও ঋণ প্রদান করা হয়। সুদের সর্বাধিক হার শতকরা ৭ টাকা। কর্পোরেশনগুলির শেয়ার-মূলধন যোগাইয়া থাকে সাধারণত রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানীর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। জনসাধারণের নিকট বণ্ড বিক্রয় করিয়াও কর্পোরেশনগুলি মূলধনের একাংশ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশনগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন ১৯৫৪ সাল হইতে কার্য শুরু করিলেও এই রাজ্যে অর্থ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ কেন্দ্র হইতে আসে নাই। ১৯৫১ সালেই

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পগুলির সম্প্রসারণের পথে নানাপ্রকার অসুবিধার বিচার-বিবেচনা ও এই সকল অসুবিধার প্রতিকার নির্দেশের জন্য একটি (N. N. Law Committee) নিযুক্ত করিয়াছিল। এই কমিটি অন্যান্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একটি শিল্প অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপনের সুপারিশ করে। ১৯৫১ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন পাস হইলে রাজ্য সরকার উপরি-উক্ত কমিটির সুপারিশকে কার্যকর করিতে অগ্রসর হয় এবং ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস হইতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন কার্য শুরু করে।

এই রাজ্য কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি টাকা এবং প্রাথমিকভাবে বিক্রীত মূলধন (initially issued capital) ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। প্রাথমিকভাবে

মূলধন আদায়ীকৃত মূলধনের ৩০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল রাজ্য সরকারের নিকট হইতে, এবং বাকী ২০ লক্ষ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। পরে কর্পোরেশন মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণকে বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি টাকায় লইয়া গিয়াছে এবং এই বর্ধিত মূলধন যোগান দিয়াছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি। ১৯৬০ সালে বণ্ড বিক্রয় করিয়া কর্পোরেশন ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। বর্তমানে কর্পোরেশনের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি টাকা।*

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের অংশীদারগণের

* ১৯৬০ সালের জুন মাসে প্রাপ্ত সংবাদপত্রের খবর।

(shareholders) মূলধন ও লভ্যাংশের জামিনদাতা। শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ গ্যারাণ্টি দেওয়া আছে—অর্থাৎ, বিনিয়োগকারিগণ শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ পাইবেই। তবে কখনও শতকরা ৫ টাকার অধিক হারে লভ্যাংশ বণ্টন করা হইবে না। শেয়ারের মত বণ্ড সম্পর্কেও রাজ্য সরকার গ্যারাণ্টি প্রদান করিয়া থাকে।

মূলধন ও লভ্যাংশ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের গ্যারাণ্টি

এই রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশনের পরিচালনভারও অন্যান্যের মত একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। বোর্ড একজন সভাপতি ও একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমেত মোট ১০ জন পরিচালক লইয়া গঠিত। ৯ জন পরিচালক রাজ্য সরকার ও বাকী একজন প্রথানুযায়ী ভারতীয় শিল্পগত অর্থ করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত।

পরিচালনা

অতীতে বিভিন্ন রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশন অনেক ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় প্রতিনিধি বা ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশনের (IFC) সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে একই শিল্প-প্রতিষ্ঠান একই সংগে রাজ্য সংস্থা ও সর্ব-ভারতীয় সংস্থার নিকট ঋণের আবেদন করিয়াছে এবং উভয় করপোরেশনই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটিকে ঋণ প্রদান করিয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ঠিক হইয়াছিল যে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ-গ্রহণেচ্ছু প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজ্য করপোরেশনের নিকট আবেদন পেশ করিবে। বর্তমানে আবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে বিশেষ ক্ষেত্রে সর্ব-ভারতীয় সংস্থাটি ১০ লক্ষ টাকার কম ঋণও প্রদান করিবে এবং রাজ্য করপোরেশনগুলি ১০ লক্ষ টাকা অধিক ঋণও প্রদান করিতে পারে।

বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে কার্যক্ষেত্রের বণ্টন

বলা হইয়াছে যে রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশনগুলি 'সাধারণত' ২৫ হাজার টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। ঋণ ২৫ হাজার টাকার কম হইলে উহা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শিল্প-দপ্তর। কয়েকটি রাজ্যে এই ঋণপ্রদানের এজেন্ট হিসাবে কার্য করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশন। এইভাবে শিল্প-ঋণ প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে কর্মক্ষেত্র বণ্টিত হইলেও অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। কারণ, দেখা গিয়াছে যে নব-প্রতিষ্ঠিত পুনঃ অর্থ সরবরাহ করপোরেশন (Refinance Corporation) এবং রাজ্য অর্থ সরবরাহ করপোরেশন অনেক ক্ষেত্রে একই প্রতিষ্ঠানকে ঋণপ্রদান করিয়াছে। সুতরাং আর একবার কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্যা (Recent Problem of Industrial Finance)ঃ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর হইতে শিল্পগত মূলধন সংগ্রহের সমস্যা এক নূতন রূপে দেখা দিয়াছে। এ-পর্যন্ত শিল্পগত মূলধনের সমস্যা ছিল অপ্রতুলতার সমস্যা, বিনিয়োগ-ইচ্ছার অভাবের সমস্যা। ইহার উপর সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থায় দেখা দিয়াছে প্রতিযোগিতার সমস্যা—সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের

প্রতিযোগিতার নূতন সমস্যা

মধ্যে প্রতিযোগিতার সমস্যা। মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যাও নূতন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতে শিল্পোন্নয়নের সুরু হইতে যে-যে শ্রেণী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই হয় আজ অবলুপ্ত না-হয় সঞ্চয়হীন। সুতরাং বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের (private sector) পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে নূতন নূতন মূলধন সরবরাহের সূত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার। জাতীয় এবং রাজ্য শিল্পগত অর্থ করপোরেশনগুলি ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের এই নূতন অভাবের একাংশও মিটাইতে পারিতেছে না।

মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যার নূতন রূপ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পটভূমিকায় ভারতের শিল্পগত মূলধনের এই সাম্প্রতিক সমস্যার বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। মূল পরিকল্পনায় বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের জন্য (কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বাদ দিয়া) প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ ৭২০ কোটি টাকা* হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। পরিকল্পনায় অনুমান করা হইয়াছিল যে ইহার মধ্যে ৬২০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণ ৫ বৎসরের মধ্যে চিরাচরিত সূত্রসমূহ হইতে ঐ পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের আশাকে সম্পূর্ণ দুরাশা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নবসৃষ্ট জাতীয় ও রাজ্য অর্থ করপোরেশনসমূহও যে তাঁহাদিগকে এ-বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য সহায়তা করিতে পারিবে সে-বিষয়েও তাঁহারা নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। বরং তাঁহারা যুক্তিসংগতভাবেই এই আশংকা করিয়াছিলেন যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের প্রচেষ্টার ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধনের ঘাটতির পরিমাণ উক্ত ১০০ কোটি (৭২০ কোটি – ৬২০ কোটি) টাকা অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মূলধন সংক্রান্ত এই সাম্প্রতিক সমস্যা সমাধানের নূতন কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের পক্ষে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়নের কার্যে অংশীদার হওয়া সম্ভব হইবে না। সরকার যদি এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই না করে তবে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বিলোপসাধনই সরকারের উদ্দেশ্য অর্থাৎ, সরকার মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতে বিদায় লইয়া সম্পূর্ণ সমগ্রবাদী অর্থ-ব্যবস্থা (collectivist economy) প্রবর্তন করিতে চায়।

সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা

সরকার কি সমগ্রবাদী অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চায়?

১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে আরও কিছুদিন মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখার আশ্বাস দেওয়া হইলেও, শিল্পপতিগণের এই অভিযোগ যে অনেকাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সমাজতন্ত্রাভিমুখী অর্থ-ব্যবস্থায় ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে শিল্পোন্নয়ন শিল্পগত গণতান্ত্রিকতার ধারণা

* নূতন বিনিয়োগ ৫৭০ কোটি টাকা এবং পুনর্নবিকরণ (replacement) ও আধুনিকিকরণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা।

ছড়াইয়া পড়িবার পূর্বেই সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং এই সকল দেশের পক্ষে মূলধন-গঠনে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিল্পোন্নয়নের সুফল মুষ্টিমেয় লোকে ভোগ করার ফলে তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্বভাবতই তাহারা অধিকতর মূলধন সরবরাহ করিতে পারিয়াছিল। উপরন্তু, ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারা বিভিন্ন ইয়োরোপীয় শক্তি তাহাদের মূলধনের বুনিয়াদ ব্যাপক ও সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের অন্যতম কারণ হইল নিগ্রো শ্রমিকের শোষণ। বর্তমান জগতে কিন্তু শিল্পোন্নয়নের জন্য এরূপ পরিস্থিতির কল্পনাই করিতে পারা যায় না। বর্তমানে শিল্পায়নাভিমুখী সকল দেশেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমাইয়া আনিয়া অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের রূপ দিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয়কারী শ্রেণীর সাক্ষাৎ বর্তমানে আর বিশেষ মিলে না। সামাজিক দাবি মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত করভার বহন করিয়া ব্যক্তি বা শ্রেণীর হস্তে আজ আর উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকে না বলিলেই চলে। সম্প্রতি অক্সফোর্ডের পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (Oxford Institute of Statistics) দেখাইয়াছে যে, যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে বীমা প্রভৃতির ন্যায় চুক্তির মাধ্যমে ছাড়া ব্যক্তিগত কোনরূপ সঞ্চয়ই আর হয় না। ভারতে দেশীয় রাজন্যবর্গের অপসারণ, জমিদারী প্রথার বিলোপ প্রভৃতি একে ত' সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারী শ্রেণীর অবসান ঘটাইয়াছে; ইহার উপর আবার জীবনযাত্রার ব্যয়ের অত্যধিক বৃদ্ধি ও অভূতপূর্ব করভার সাধারণ লোকের সঞ্চয়ের সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে আমাদের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় মূলধন-গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সঞ্চয় একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে মূলধন-গঠনে অসুবিধা

বর্তমানে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ সকল দেশেই অত্যল্প

ভারতে বর্তমানে প্রয়োজনীয় সঞ্চয় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে

দ্বিতীয়ত, যাহা কিছু সঞ্চয় বর্তমানে হয় তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য সরকার ও ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণের প্রতিযোগিতা লাগিয়া আছে। শিল্পপতিগণের অভিযোগ হইল ইহাই যে, ক্ষীয়মাণ সঞ্চয়ের অধিকাংশই যদি সরকার নিজ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে টানিয়া লয় তবে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সংগৃহীত হয় কোন্ সূত্র হইতে? সরকার যে শুধু ঋণের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তাহা নহে, নিজ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের জন্য কর-পদ্ধতিকেও (system of taxation) পুনর্গঠিত করিয়াছে। বর্তমানে কর-পদ্ধতি সরকারের দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ এবং বৈষম্য দূরিকরণেরই মাধ্যম মাত্র নহে, ইহা পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের যন্ত্রও বটে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের জন্য এইভাবে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তাহার উপর লাগিয়া আছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে প্রতিযোগিতা

সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা (Governmental Attempt for solving the Problem): শিল্পপতিগণ উপরি-উক্ত প্রকার অভিযোগ করিয়া আসিতেছিলেন প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই—কারণ তখন হইতেই এই প্রতিযোগিতার সমস্যা দেখা দিয়াছিল। ফলে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রাংশে মূলধনের অসুবিধার বিচার-বিশ্লেষণ করিবার এবং প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৩ সালে রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধক্রমে ব্যাংক ব্যবসায়িগণের একটি কমিটি নিযুক্ত করে। শ্রী এ. ডি. শ্রোফ্ ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। সুতরাং ইহা শ্রোফ্ কমিটি নামে পরিচিত।

শ্রোফ্ কমিটি কর্তৃক সমস্যা বিচার

কমিটির প্রধান কার্য ছিল কিভাবে বর্তমান সঞ্চয়ের পরিমাণকে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রাভিমুখী করা যায় তাহা নির্দেশ করা। কিভাবে অধিকতর মূলধন-গঠন (capital formation) করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবার ভার কমিটির উপর দেওয়া হয় নাই। কমিটি প্রথমে মিশ্র ব্যাংকিং-এর (mixed banking) সম্ভাবনা লইয়া আলোচনা করে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকসমূহ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘকালীন ঋণ দান করে। আলোচনায় দেখা যায় যে, ভারতে মিশ্র ব্যাংকিং-এর সম্ভাবনা বিশেষ নাই—কারণ অনুসন্ধানের সময় অধিকাংশ ব্যাংকই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহ করিবার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে।

কমিটির অভিমত ও সুপারিশ

এইভাবে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিলেও শ্রোফ্ কমিটি পরোক্ষ পদ্ধতির সুপারিশ করে। ব্যাংক কর্তৃক শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ, ইহাদের জামিনে ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অর্থ করপোরেশনসমূহের শেয়ার ও বণ্ড অধিক পরিমাণে ক্রয় প্রভৃতি হইল পরোক্ষ পদ্ধতির জন্য নির্দেশিত পন্থাসমূহ। কমিটি এই প্রসংগে আর একটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করে। ইহা হইল, ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুব্যবস্থা বা অবলেখনের (underwriting) কার্য করিবার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের নেতৃত্বাধীনে প্রধান প্রধান ব্যাংকের একটি সিণ্ডিকেট বা কনসর্টিয়াম (consortium) গঠন করা। কিন্তু পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ এই সুপারিশের মূলে কুঠারাঘাত করে।

দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহ করিতে সমর্থ না হইলেও ব্যাংকগুলি যাহাতে স্বল্পকালীন মূলধন সরবরাহ করিতে পারে তাহার জন্য বিল বাজারের (bill market) সংগঠন ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসায়ের বিস্তারের জন্য সুযোগ-সুবিধাপ্রদানের সুপারিশ করা হয়।

কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, বীমা কোম্পানীগুলির সম্পত্তি (assets) রক্ষণের নিয়মাবলীর পরিবর্তনসাধন করা হইলে ইহারা শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহ করিতে পারিবে। শিল্পগত অর্থ করপোরেশনকেও এই দিক দিয়া অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলা যাইতে পারে। ইহাদের ঋণদানের পদ্ধতির মধ্যে সরলতা

আনয়ন করিতে হইবে এবং পার্লামেণ্টকে ইহার দৈনন্দিন কার্যপরিচালনায় হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

মূলধন সরবরাহের চিরাচরিত সূত্রগুলি কিভাবে অধিকতর উপযোগী হইতে পারে সে-সম্বন্ধে আলোচনার পরে শ্রোফ্ কমিটি বিলিকরণ প্রতিষ্ঠান (Issue Houses), বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Investment Trusts), একক প্রতিষ্ঠান (Unit Trusts) প্রভৃতির ন্যায় কয়েকটি বিশেষ সংগঠন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ইহা সরকারী উদ্যোগাধীন শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (Industrial Development Corporation), ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন শিল্পগত ঋণ এবং বিনিয়োগ করপোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation) প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সরকারী প্রস্তাবকে অনতিবিলম্বে কার্যকর করিবার জন্য সুপারিশ করে। ১৯৫৪ সালে মূল শিল্পনীতির উপর যে সরকারী বিবৃতি (White Paper on Industrial Policy) বাহির হয় তাহাতে ঘোষণা করা হয় যে, উভয় প্রতিষ্ঠানই গঠন করা হইবে; এবং কিছু পরে উভয়ই গঠিত হয়। ইহার পর আবার ১৯৫৮ সালের জুন মাসে মধ্যায়তন শিল্পসমূহকে মূলধন সরবরাহ করিবার জন্য পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন (Refinance Corporation) স্থাপিত হয়।

কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান সংগঠনের সুপারিশ

নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন (National Industrial Development Corporation) ঃ এই করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে। ইহার উদ্দেশ্য "পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার আনুষংগিক শিল্পগুলিকে মূলধন দিয়া সাহায্য করা।"* ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায় যে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় যে-সকল শিল্পের উন্নয়ন সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে সাধারণত সাধিত হয় না অথচ যাহাদের উন্নয়ন শিল্প-ব্যবস্থায় সুসামঞ্জস্যতার জন্য প্রয়োজনীয়, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন মূলধন সরবরাহ দ্বারা সেই সকল শিল্পের গঠন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। ঋণপ্রদান ব্যাপারে ইহা শিল্প-যন্ত্রপাতির ন্যায় মূলধন-দ্রব্য (capital goods) উৎপাদনকারী এবং ফিল্ম, রবার, এলুমিনিয়ম প্রভৃতির ন্যায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্পের দাবি অগ্রগণ্য বিবেচনা করে। নূতন শিল্প গঠনের প্রস্তাব কার্যকর করিবার সময় ইহা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে লভ্য সকল প্রকার শিল্প-উপাদান (industrial equipment), অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। এই সকল ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ঘাটতিটুকুই মাত্র সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে পূরণের ব্যবস্থা করে। যে-সকল শিল্প-সংগঠনের ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনুপূরক শিল্প গড়িয়া উঠে এই করপোরেশন

উদ্দেশ্য

কার্যাবলী

* Report on Currency and Finance, 1954-55.

সেই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠাও করিতে পারে। ইহা ছাড়া করপোরেশন কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত শিল্প-ঋণ বণ্টনের এজেন্ট হিসাবে কার্য করে।

করপোরেশনটি একটি ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান (Private Limited Company) হিসাবে গঠিত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা এবং বর্তমানে বিলিকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। বিলিকৃত মূলধনের সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছে। করপোরেশন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া নিজ আর্থিক সংগতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। কার্যকরী মূলধনের বাকি টাকা সরকার হইতে ঋণ বা সাহায্য হিসাবে গৃহীত হয়।

গঠন

১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত কার্যসম্পাদন হইতে জানা যায় যে, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন শিল্প-যন্ত্রপাতি, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, এবং প্ল্যাসটিক, ঔষধপত্র প্রভৃতি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক দ্রব্য (intermediate products) উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের উপরই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। পাটকল ও বস্ত্রশিল্পের পুনর্বাসন ও আধুনিকিকরণের কার্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষ ঋণ (special loans) প্রদান করিতেছে তাহা এই করপোরেশনের এজেন্সীর মাধ্যমেই করা হইতেছে। ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত করপোরেশন বস্ত্র শিল্পকে ৩·০৫ কোটি টাকা এবং পাটকল শিল্পকে ৩·৩৮ কোটি টাকা ঋণপ্রদান করিয়াছে।* প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার শতকরা ৪½ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে পাটকল ও বস্ত্র শিল্পের জন্য ২০-২৫ কোটি টাকা এবং বাকিটা নূতন ভারী ও মূল শিল্প সংগঠনে ব্যয়িত হইবার কথা।

কার্যসম্পাদন

ভারতের শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation of India, Ltd.)ঃ জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের (National Industrial Development Corporation) কার্য হইল শিল্প-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যতা দূর করা—শিল্প-সংগঠনের শূন্য স্থানগুলি পূরণ করা। ইহা সরকারী ও বেসরকারী—উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন দিয়া সহায়তা করে। ইহার নিজস্ব সংগতির পরিমাণ অতি সামান্য। ফলে ইহার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগের দৃষ্টিকোণ হইতে মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি না। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল ভারতীয় ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন।

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব

আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে। সরকারী সহায়তা ও উৎসাহ পাইলেও ইহাকে বেসরকারী

* Report on Currency and finance, 1958-59.

উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান (privately sponsored institution) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য হইল বেসরকারী শিল্প-ক্ষেত্রাংশভুক্ত উদ্যোগকে সহায়তা করা। সাধারণভাবে বলিতে পারা যায়, (১) এইরূপ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকিকরণ; (২) এইপ্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী উভয়প্রকার মূলধনের অধিকতর অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান; (৩) শিল্পগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ প্রদান; এবং (৪) বিনিয়োগ বাজারের সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা—ইহার প্রধান কার্য। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, ভারতের শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন (১) ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘকালীন ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান করে; (২) নূতন শেয়ার ও বণ্ডের মাধ্যমে বাজার হইতে অর্থসংগ্রহ করে; (৩) শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের অবলেখনের (underwriting) কার্য সম্পাদন করে; (৪) ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগকারিগণের মূলধনের জামিন হয়; (৫) মূলধন যাহাতে দ্রুত আবর্তিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে; এবং (৬) শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা ও শিল্পকৌশলগত উপদেশ দেয় এবং সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত ব্যক্তি সংগ্রহে সহায়তা করে।

প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

করপোরেশনের অনুমোদিত শেয়ার-মূলধন ২৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সাধারণ শেয়ারের মূল্য হইল ৫ কোটি টাকা। বাকী ২০ কোটি টাকার শেয়ারকে কোনরূপ পর্যায়ভুক্ত করা হয় নাই (unclassified)। বর্তমানে ৫ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ারই বিলি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২ কোটি টাকার শেয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, করপোরেশনের কতিপয় পরিচালক ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ক্রয় করিয়াছেন; ১ কোটি টাকার শেয়ার লইয়াছে কয়েকটি বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks) ও কয়েকটি কমনওয়েলথ্ বীমা কোম্পানী (Commonwealth Insurance Companies); এবং ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার লইয়াছেন কয়েকজন মার্কিন পুঁজিপতি ও করপোরেশন। বাকী ১½ কোটি টাকার শেয়ার বাজারে বিক্রয় করা হয়।

শেয়ার-মূলধন

করপোরেশন শেয়ার বিক্রয় ছাড়াও অন্যান্য সূত্র হইতে কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ করে। এই সকল সূত্রের মধ্যে ভারত সরকার প্রদত্ত ঋণ ও বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত ঋণই প্রধান। এ-পর্যন্ত ভারত সরকার নিজস্ব তহবিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত খাদ্য-ঋণ বাবদ মোট ২৭·৫ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে। বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হইল ৯·৫২ কোটি টাকা।

কার্যকরী মূলধন

প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাস) হইতে ১৯৫৯ সালের শেষ পর্যন্ত—এই ৫ বৎসরের মধ্যে করপোরেশন ২০·৪০ কোটি টাকার ঋণের আবেদন মঞ্জুর করে। ইহার মধ্যে ১৯৫৯ সালেই মঞ্জুরীর পরিমাণ ছিল ৮·৪১ কোটি টাকা। যে যে শিল্প সহায়তা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে কাগজ, রসায়ন, ঔষধপত্র, বৈদ্যুতিক

দ্রব্য, বস্ত্র, চিনি, ধাতু-মাক্ষিক, কাঁচ, রেয়ন, রবার, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি প্রধান।

কার্যসম্পাদন

আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য অবলেখন (underwriting), শেয়ার ক্রয় এবং সরাসরি ঋণপ্রদান—এই তিনটি পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অবলেখনের কার্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অবলেখনের জন্য করপোরেশন শিল্পগত অর্থ-করপোরেশন (IFC), জীবনবীমা করপোরেশন প্রভৃতির সহিত সহযোগিতা স্থাপন করিয়াছে। ১৯৫৯ সালে অবলেখনের পরিমাণ ছিল ১'৯৩ কোটি টাকা।*

শিল্প পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন (Refinance Corporation for Industry) : বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রভুক্ত মধ্যায়তন শিল্পসমূহের জন্য ঋণ সরবরাহ-ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিবার জল্পনা-কল্পনা কিছুদিন যাবৎ চলিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার একটি পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়া দেশের ১৫টি বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও জীবনবীমা করপোরেশনকে ইহার অংশীদার হইবার জন্য আহ্বান জানায়। অবশেষে ১৯৫৮ সালের জুন মাসে পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠা

পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশনের সদর কার্যালয় বোম্বাই-এ অবস্থিত। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর ইহার পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি। তিনি, রিজার্ভ ব্যাংকের সহকারী গভর্ণর, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও জীবনবীমা করপোরেশনের সভাপতি এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলির ৩ জন প্রতিনিধি লইয়া পরিচালকমণ্ডলী গঠিত। করপোরেশন ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী হিসাবে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে।

গঠন

করপোরেশনের প্রাথমিক শেয়ার মূলধন ১২½ কোটি টাকা। প্রয়োজনবোধে ইহাকে বৃদ্ধি করা হইবে। এই ১২½ কোটি টাকার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংকের অংশ ৫ কোটি টাকা এবং জীবনবীমা করপোরেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ২½ কোটি টাকা করিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণের মাধ্যমে যে খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছিল তাহা বেচিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ২৬ কোটি টাকা করপোরেশনের হস্তে কার্যকরী মূলধন হিসাবে প্রদান করা হইবে। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ইহা হইতে ১০ কোটি টাকা ঋণপ্রদান করা হইয়াছে। ফলে কার্যকরী মূলধন ২২½ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। উক্ত ঋণ ৩০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

মূলধন

শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংকগুলি যে ঋণপ্রদান করিয়া থাকে তাহার বিরুদ্ধে করপোরেশন পুনরায় ঋণপ্রদানের সুযোগ দান করে। অর্থাৎ, ঐ ঋণপত্র জমা রাখিয়া ব্যাংকগুলি করপোরেশনের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু এইভাবে গৃহীত ঋণকে পুনরায় মধ্যায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে

কার্য

* Reserve Bank Bulletin, April 1960.

অর্থসরবরাহ কার্যে নিযুক্ত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলি ৩-৭ বৎসরের জন্য এবং ৫০ লক্ষ টাকা অবধি ঋণ পাইতে পারে। ব্যাংকগুলি যাহাতে এইরূপ পুনঃঅর্থসরবরাহের কার্য করিতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইনের প্রয়োজনীয় ধারাগুলির সংশোধন করা হয়।

মধ্যায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলিতে সেই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকেই বুঝান হইতেছে যাহাদের মোট সংগৃহীত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ মিলিয়া ২½ কোটি টাকার অধিক নহে। করপোরেশনের ঘোষিত অনুসারে ব্যাংকগুলি প্রধানত উৎপাদনবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ঋণপ্রদান করে।

প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত করপোরেশন ১৯টি আবেদন মঞ্জুর করিয়া ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ঋণপ্রদান করে। করপোরেশনের সভাপতির মতে ইহা অত্যল্প। এই কারণে করপোরেশনের কার্যাবলীর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে (১) অংশীদার ব্যাংকগুলি ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে পুনঃঅর্থসরবরাহের সুযোগ দেওয়া হইবে, (২) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত সংহতিপূর্ণ সকল শিল্পকেই এই সুযোগ দেওয়া হইবে, এবং (৩) ব্যাংকগুলি যে বর্তমানে শতকরা ১-১½ অধিক সুদে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ দিতে বাধ্য তাহা হইতে তাহাদের অব্যাহতি দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব বর্তমানে বিচারাধীন আছে। উপরন্তু, করপোরেশন আন্তর্জাতিক অর্থসরবরাহ করপোরেশন (International Finance Corporation) প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের ব্যবস্থাও করিতেছে।*

জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প করপোরেশন (National Small Industries Corporation, Ltd.) : ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের মূলধন সংগ্রহের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ-সম্পর্কে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসংগে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।**

উপসংহার : শিল্পগত অর্থ করপোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এবং শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন যে তাহাদের বর্তমান সংগতি ও কার্যপরিধিতে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রাংশে মূলধন সরবরাহের পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না একথা পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী সুসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের (organised industries) জন্য মোট প্রয়োজনীয় অর্থ ৭২০ কোটি টাকার মধ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠান (পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন বাদে) ও সরকারী সূত্র হইতে মাত্র ৬০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করিবার

মূলধন সরবরাহ কার্যে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহ পর্যাপ্ত নহে

* Reserve Bank Bulletin, Ma 1960

** ৩০০ পৃষ্ঠা দেখ।

আশা করা হইয়াছে। সেইজন্য পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হইয়াছিল "বিশেষ করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার হ্রাসমান ভূমিকার জন্য নূতন মূলধনের বাজার সুসংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আরও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন হইতে পারে"।* আরও ব্যাপকতর তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতেই ব্যক্তিগত শিল্প-ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী নূতন প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতির সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। সরকারী মহল হইতে এই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের মূলধন-সমস্যা সমাধানের সকল প্রচেষ্টাই করা হইবে। অতএব, শিল্পপতিদের সরকারী প্রতিযোগিতার ভয়ে ভীত হইবার কারণ নাই। প্রসংগত, আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরিকল্পিত শিল্প-পদ্ধতির অসামঞ্জস্যতা দূর করিবার জন্য কেন্দ্রের অনুসরণে রাজ্যসমূহও বর্তমান উন্নয়ন করপোরেশন (Development Corporations) প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে। এইজন্য পশ্চিমবংগেই প্রথম রাজ্য উন্নয়ন করপোরেশন আইন পাস হয়; পরে আরও কয়েকটি রাজ্য পশ্চিমবংগের অনুবর্তী হইয়াছে।

সুতরাং নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইতে পারে

পশ্চিমবংগে রাজ্য উন্নয়ন করপোরেশন

ভারতে মূলধন-গঠন (Capital Formation in India):

ভারতের ন্যায় দেশে মূলধন সরবরাহের সমস্যা মূলধন-গঠনের সমস্যার (problem of capital formation) সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত ও উন্নয়নমূলক হওয়ায় বর্তমানে এই দ্বিতীয় সমস্যাটির গুরুত্ব বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগের পূর্বে মূলধন-গঠনকে দেখা হইত শুধু বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টিকোণ হইতে; এবং শিল্পোদ্যোগও ছিল তখন মূলত ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ হইতে মূলধনের দাবি তখন ক্রমবর্ধমান থাকিলেও এই বৃদ্ধির হার অধিক ছিল না। কিন্তু বর্তমানের উন্নয়ন-ব্যবস্থায় এ-সকলই পরিবর্তিত হইয়াছে। শিল্প-সংগঠনের জন্য বর্তমানে মূলধনের দাবি করিতেছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ—উভয়ই; এবং এই দাবির পরিমাণ হইল পরিকল্পনাপূর্ব সময় অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। স্বভাবতই মূলধন-গঠনের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধন-গঠন সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি

মূলধন-গঠনের অর্থ (Meaning of Capital Formation): এককথায় মূলধন-গঠন বলিতে বুঝায় বিনিয়োজিত অর্থের সাহায্যে মূলধন-দ্রব্য (capital goods) উৎপাদন বা সংগ্রহ (acquisition) করা। এই গঠনকার্যকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে: (১) সঞ্চয়ের সৃষ্টি; (২) সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত করা; এবং (৩) বিনিয়োজিত অর্থ দ্বারা উৎপাদকের দ্রব্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করা।

মূলধন-গঠনের তিনটি পর্যায়

* Second Five Year Plan – A Draft Outline-এর ১১ পৃষ্ঠা।

দেখা যাইতেছে, সঞ্চয়ের সৃষ্টিই মূলধন-গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। ইহা নির্ভর করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর। সঞ্চয়ের ক্ষমতা আবার আয়ের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে আয় যত বেশী হইবে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ততই বাড়িয়া যাইবে। সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়িলেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা না বাড়িতে পারে। শেষোক্ত বিষয় মানসিক প্রেরণার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগ তহবিলে রূপান্তরিত করা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যথা, সাধারণ লোকের স্বভাব, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা (opportunities of investment) ইত্যাদি। তৃতীয় বিষয়টির জন্য প্রয়োজন হইল দেশে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের অবস্থান অথবা বাহির হইতে উৎপাদনের দ্রব্য আনয়ন করিবার সুযোগ-সুবিধা। এখন আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে মূলধন-গঠনের এই তিনটি পর্যায়ের পর্যালোচনা করা হইতেছে।

পর্যায়গুলির বিশ্লেষণ

ভারতে মূলধন-গঠনের অবস্থা (State of Capital Formation in India): আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধন-গঠনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইলেও মূলধন-গঠনের অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে মূলধন-গঠনের হার ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে—অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪'৯৪ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র শতকরা ৬ ভাগের কিছু উপর আসিয়া দাঁড়ায়।* উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা ছাড়িয়া দিলেও যে-দেশে জনসংখ্যা বাৎসরিক শতকরা ১'৩৭ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই দেশে এই পরিমাণ মূলধন-গঠন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে বাৎসরিক মূলধন-গঠনের হার মোট জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ২০ ভাগ হওয়া উচিত। অধ্যাপক লুই-এর মতে, যে-দেশ কোনপ্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ব্রতী হইয়াছে তাহার পক্ষে মোটামুটি জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ মূলধন-গঠনই যুক্তিসংগত বাৎসরিক হার।** ভারতের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে জীবনযাত্রার মান যদি বাৎসরিক শতকরা ১½-২ হারে বাড়াইতে হয় তবে ভারতকে জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ১২ ভাগ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।† জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশ অবশ্য তাহাদের শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চহারে সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন করিয়াছিল। এই উচ্চ হারের কথা বর্তমানে ছাড়িয়া দিয়া শুধু যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হারের (জাতীয় আয়ের শতকরা অন্তত ১২ ভাগ) দিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ কারণ বর্তমানে আমাদের মূলধন-গঠনকে ব্যাহত করিতেছে।

ভারতে মূলধন-গঠনের বৃদ্ধির হার অতি সামান্য

---

* Review of the First Five Year Plan-এর ৯ পৃষ্ঠা।

** W. A. Lewis, Principles of Economic Planning.

† ,, ,, ,, The Theory of Economic Growth -এর ২০৮ পৃষ্ঠা।

ভারতে মূলধন-গঠনের প্রতিবন্ধক (Factors that hinder Capital Formation in India)ঃ মূলধন-গঠনের যে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে ভারতে তাহাদের প্রত্যেকটি ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, বর্তমানে সাধারণের সঞ্চয়ের ক্ষমতা অতি সামান্য। সঞ্চয় আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র। আমাদের মাথাপিছু আয় এত অল্প যে তাহা ন্যূনতম জীবনধারণের মানের (minimum subsistence standard) পক্ষেও পর্যাপ্ত নহে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ইহা ছিল ২৯৪ কোটি টাকা।* এ-ক্ষেত্রে কাম্য হারে সঞ্চয়ের আশা করিতে পারা যায় কিরূপে? উপরন্তু, বর্তমানের মূল্যাধিক্য ও করভার সাধারণের পক্ষে যেটুকু সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল তাহাকেও একরূপ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে, ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের (personal savings) পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে উপেক্ষণীয়। অবশ্য এই শেষোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব যে বর্তমানে একমাত্র ভারতেই হইয়াছে তাহা নহে। সাম্প্রতিক যুগে ইহা একপ্রকার বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আজিকার দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ছাড়া অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে ব্যক্তিগত সঞ্চয় শিল্পে মূলধন সরবরাহ করে না বলিলেই চলে। ব্যক্তিগত যা-কিছু সঞ্চয় এই সকল দেশে বর্তমানে সম্ভব হয় তাহার মাধ্যম হইল জীবনবীমা প্রভৃতির ন্যায় চুক্তি (contract)।** ভারতে কিন্তু চুক্তির মাধ্যমেও সঞ্চয়ের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় নগণ্য। যে মধ্যবিত্তশ্রেণী পূর্বে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অধিকাংশ সরবরাহ করিত, জাতীয় সম্পদের বণ্টন-পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে এ-ক্ষমতা তাহাদের আজ চলিয়া গিয়াছে। পূর্বের তুলনায় আজ জাতীয় সম্পদের একটা মোটা অংশ গিয়া পড়িয়াছে কৃষিজীবী ও শিল্প-শ্রমিকদের হস্তে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর সঞ্চয়ের ক্ষমতা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং ভারতে যে মূলধন-গঠনকার্যের প্রাথমিক পর্যায় অধিকতর সমস্যা-প্রপীড়িত থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

ভারতে মূলধন-গঠনের প্রত্যেকটি পর্যায় ত্রুটিপূর্ণ

১। ভারতে সঞ্চয়ের ক্ষমতা অতি সামান্য

সাধারণের সঞ্চয় ছাড়াও আজ শিল্পগত সঞ্চয় পদে পদে ব্যাহত হইতেছে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ, শিল্পের জাতীয়করণের ভীতি ও শিল্পের উপর করভার শিল্পোদ্যোগকে ব্যাহত করিতেছে। ফলে শিল্পপতিগণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা উভয়ই কমিয়া যাইতেছে।

শিল্পপতিগণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে

মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা কমিয়াছে; কৃষিজীবী ও শিল্প-শ্রমিকদের ক্ষমতা বাড়িলেও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায় নাই। ইহার উপর যুদ্ধোত্তর যুগে সংক্রামকভাবে ব্যাংক ফেল পড়া, বহু যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাওয়া, সম্প্রতি জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের

২। বিনিয়োগের পরিমাণ আরও সামান্য

* Preliminary Estimate of National Income for 1958-59.

** ৩৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।

রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সাধারণকে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ ব্যাপারে বিশেষ সাবধানী করিয়া তুলিয়াছে।

শিল্পপতিগণের যতটা বিনিয়োগের ক্ষমতা বর্তমান আছে তাহারও পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না ফটকা বাজার প্রভৃতির জন্য। এই সকলের সামগ্রিক ফল হইল যে, দেশের সকল সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগযোগ্য তহবিলে রূপান্তরিত হইতে পারিতেছে না।

বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের সুব্যবস্থাও ভারত আজ পর্যন্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেদিন পর্যন্ত সরকার মূল শিল্প-সংগঠনে কোন মনোযোগ দেয় নাই। এবং শিল্পপতিগণ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিয়াই চলিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ ছাড়া সমগ্র পৃথিবীতেই মূলধন-দ্রব্যের অভাবের জন্য বাহির হইতেও এইরূপ দ্রব্যাদি আনয়ন দ্বারা মূলধন-গঠনের সহায়ক ছিল না। এইজন্য ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন এই উক্তি করিয়াছিল যে, আমাদের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সমস্যার সহিত সংযুক্ত হইয়া শিল্পে মূলধন-দ্রব্যের অভাব আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই এই সমস্যা সুরু হইয়া বর্তমানে সম্পূর্ণ সংকটে পরিণত হইয়াছে। ফলে সরকারকে উন্নয়নকার্যের জন্য মূলধন-দ্রব্যের আমদানিতে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিতে হইতেছে।

৩। বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নাই

অবলম্বনীয় প্রতিবিধানসমূহ (Remedial Measures): প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে মূলধন-গঠনের সমস্যা অন্যতম দীর্ঘকালীন সমস্যা; সুতরাং দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। প্রায় দুইশত বৎসরের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদীর শক্তির অধীনস্থ থাকার ফলে যে-সকল অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, স্বল্পকালীন ভিত্তিতে তাহাদের সমাধানের প্রচেষ্টা করিলেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। উপরন্তু, মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিচালনা অতি কঠিন কার্য। এরূপ অর্থ-ব্যবস্থার সকল কার্যই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে এখন এমন প্রতিবিধান নির্দেশ করা প্রয়োজন যে, উভয় প্রকার উদ্যোগই যেন সুসম্পাদিত হইয়া পরিকল্পনাকে সার্থকতায় রূপান্তরিত করে।

ইহা দীর্ঘকালীন সমস্যা

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিবিধান নির্দেশ করিতে হইবে

প্রথমে সঞ্চয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ লোকের নিজ উদ্যোগে সঞ্চয়বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ নাই। বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় জাতীয় আয় কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যবৃদ্ধির দরুন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয়ের সুযোগের সম্প্রসারণ তদনুসারে ঘটিবে না। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষি ও অনুরূপ কর্মসমূহ হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা

সাধারণের সঞ্চয় বৃদ্ধির বিশেষ সুযোগ নাই

১৭½ ভাগ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়।* এই বৃদ্ধির অনুপাতে সঞ্চয়ও যে বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশা করা অযৌক্তিক—কারণ যে শ্রেণীর আয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্যে সঞ্চয়ের স্বভাব এখনও গড়িয়া উঠে নাই। তবে শিল্পপতি, ঠিকাদার প্রভৃতির আয়বৃদ্ধিজনিত সঞ্চয়ের ক্ষমতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং সাধারণের সাধারণ সঞ্চয় ও শেষোক্ত শ্রেণীর অতিরিক্ত সঞ্চয়ের উপযুক্ত বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর জন্য ব্যাংকের সুযোগ-সুবিধা (banking facilities) ও ব্যাংকিং স্বভাবের বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন অর্থসরবরাহকারী করপোরেশনের ন্যায় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইবে।

১। সুতরাং বিনিয়োগের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে

ব্যাংকের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সাধারণের সঞ্চয়ের জন্য পর্যাপ্ত নহে। ইহার উপর স্বল্প পরিমাণের সঞ্চয়ের (small savings) জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে, সাধারণকে, বিশেষত গৃহকর্ত্রীদের, স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিলে এবং প্রাইজবণ্ডের ন্যায় নূতন নূতন পন্থার উদ্ভাবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে সম্ভাব্য সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা যাহাতে তাঁহাদের অর্থ লইয়া ফটকা খেলা, আগাম ব্যবসায় (forward trading) ও অন্যান্য স্পেকুলেশনের কার্য না করে তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন পাস ও তাহাকে কঠোরতার সহিত কার্যকর করিতে হইবে।

২। স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিতে হইবে

৩। স্পেকুলেশনের কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে

বিনিয়োগবৃদ্ধির আর একটি পন্থা হইল মূল্যবান ধাতুর প্রতি আমাদের দেশের লোকের সাধারণ আকর্ষণকে হ্রাস করা। ডাঃ ভবতোষ দত্ত দেখাইয়াছেন যে, ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে ভারতে ১,৮৫০ কোটি টাকার মত স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত আছে।** ইহার মধ্যে একটা মোটা অংশকে মূলধন-গঠনের কার্যে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে।

৪। মূল্যবান ধাতুর প্রতি লোকের আকর্ষণ কমাইতে হইবে

ইহার পর মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প-সংগঠনের প্রতি নজর দিতে হইবে। আমদানি বাণিজ্যকে যথাসম্ভব উৎপাদনের দ্রব্য আমদানিতে নিয়োজিত করিতে হইবে।

৫। মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন ও আমদানির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালে সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির (All-India Rural Credit Survey Committee) রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বে গ্রামাঞ্চল হইতে সঞ্চয় সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব

---

* Review of the First Five Year Plan-এর ৮ পৃষ্ঠা।

** B. Datta, Economics of Industrialisation.

প্রথম বিপদ বৈদেশিক মূলধনের রাষ্ট্রনৈতিক রূপ লইয়া। সাধারণত বৈদেশিক মূলধনের সংগে আসে বৈদেশিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ। ক্রমে বিদেশীরা সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। অর্থ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিলে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়ে। মিশর ও চীন দেশে এইরূপই ঘটিয়াছিল। ভারতেও বৈদেশিক পুঁজিপতিরা কায়েমী স্বার্থের (vested interests) সৃষ্টি করিয়া ভারতের মুক্তির পথের সবিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মূলধন আহ্বানের ফলে দেশ শিল্প-ব্যবস্থায় বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে পারে। এমনকি জাতীয় প্রতিরক্ষার দিক দিয়া অপরিহার্য মূল শিল্পগুলিও (basic industries) বিদেশীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিতে পারে। এরূপ ঘটিলে দেশের স্বাধীনতা ও শিল্পোন্নয়ন উভয়ই ব্যাহত হইতে বাধ্য। ভারতের ক্ষেত্রে প্রথম ফিসক্যাল কমিশন তাহার রিপোর্টে বলিয়াছিল যে, রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হইবার ভয়ে অধিকাংশ ভারতীয় বৈদেশিক মূলধনের আমদানিকে সুনজরে দেখিত না।

তৃতীয়ত, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে শিল্পোন্নয়ন ঘটিলে এই শিল্পোন্নয়নের ফলের একটা মোটা অংশ মুনাফা ও পারিশ্রমিক হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায়। উপরন্তু, বিদেশীরা শুধু মুনাফার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করিতে থাকে। ফলে, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনমত সংরক্ষিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে খনিজ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অরণ্যসম্পদের বিচারহীন ধ্বংস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধনের 'অবদান'।

চতুর্থত, বৈদেশিক মূলধনের গুণ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, ইহার সহিত আসে উন্নত বৈদেশিক শিল্পকৌশল, উন্নত পরিচালন-ব্যবস্থা। কিন্তু দেখা যায় যে, বিদেশীরা এই শিল্পকৌশলের দ্বার দেশীয় লোকদের নিকট রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। পরিচালন-ব্যবস্থাতেও তাহাদের অংশীদার করিয়া লয় না। পরাধীন ভারতে বিদেশী পুঁজি পরিচালিত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়দের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা হইত। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা তখন নিয়ম অপেক্ষা ব্যতিক্রম বলিয়াই বিবেচিত হইত। ভারতীয়গণকে শিল্পজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে নানাভাবে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখাই ছিল বিদেশী পুঁজিপতিগণের নীতি। উপরন্তু, উন্নত শিল্পকৌশল আমদানি করিবার জন্য বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করিয়া আনিবার প্রয়োজন হয় না। সোবিয়েত ইউনিয়ন শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে বৈদেশিক শিল্পকৌশলকে আমদানি করিয়াছিল, কিন্তু বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করে নাই। এই কারণে প্রথম ফিসক্যাল কমিশন সুপারিশ করিয়াছিল যে, বিদেশ হইতে যেন শুধু শিল্পকৌশলই আমদানি করা হয়।

বৈদেশিক মূলধনের উপরি-উক্ত যে-বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহা এই প্রকার মূলধনের সহিত নিয়ন্ত্রণজড়িত থাকিলেই প্রযোজ্য। অন্যভাবে বলা যায়, সমালোচনা বৈদেশিক মূলধনের

বিরুদ্ধে নহে, বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণবিহীন বৈদেশিক মূলধন যদি পাওয়া যায় এবং যদি আভ্যন্তরীণ মূলধন সরবরাহের হার পর্যাপ্ত না হয় তবে বৈদেশিক মূলধন আমদানি করিতে আপত্তি থাকিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। মুনাফা ও পারিশ্রমিক হিসাবে দেশের বাৎসরিক আয়ের একটি অংশ বাহিরে চলিয়া যাইবে সত্য; কিন্তু ইহা সত্বেও মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণেই আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় বৈদেশিক মূলধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে আমাদের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ক্ষুদ্রতর হইত; ফলে জাতীয় আয়বৃদ্ধির নির্দিষ্ট অংকও অপেক্ষাকৃত অল্প হইত।

উপসংহার

ভারতে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ (Estimates of Foreign Capital invested in India): স্বাধীনতার পর ভারত অর্থ-ব্যবস্থার সর্বাংগীণ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলে এ-দেশে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ করিবার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ফলে, রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের ভিত্তিতে বৈদেশিক মূলধনের পুংখানুপুংখ জরিপকার্য সম্পাদন করে। ইহার পর হইতে বৈদেশিক বিনিয়োগের নিয়মিত হিসাব করিয়া আসা হইতেছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগের জরিপকার্য

এই বিভিন্ন হিসাবের ফলে দেখা যায় যে ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাংক-ব্যবসায় বাদে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ২৫৬ কোটি টাকা হইতে ৫৭১ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।* এই বিনিয়োগবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হইল বিশ্বব্যাংক (IBRD) হইতে প্রদত্ত ঋণ। ১৯৪৮ সালে ভারতের বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশ্বব্যাংক হইতে কোন ঋণ পায় নাই। ১৯৫৮ সালে ঐ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ কোটি টাকায়।

প্রথম জরিপ অনুসারে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারতের 'ব্যবসায়-বাণিজ্যে' মোট বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের ২৫৬ কোটি টাকার মধ্যে ব্রিটেনের অংশ ছিল ২০৬ কোটি টাকা বা মোট বিনিয়োজিত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগের কাছাকাছি। ইহার পর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট ১১ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায় যে মোট ৫৭১ কোটি টাকার মধ্যে ব্রিটেনের বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৯৮ কোটি টাকায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগের পরিমাণ ৬০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন

বিভিন্ন সময়ে বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাপ ও শ্রেণীবিভাগ

* Reserve Bank Bulletin, June 1959 and April 1960.

মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ও দেশগত শ্রেণীবিভাগ বুঝাইবার জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া হইল :

ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ (হিসাব কোটি টাকায়)

	ব্রিটেন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	অন্যান্য দেশ	বিশ্বব্যাংক	মোট
১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন	২০৬	১১	৩৯	—	২৫৬
১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর	৩৭৭	৪০	৩৬	৩	৪৫৬
১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর	৩৯৮	৬০	৪১	৭২	৫৭১

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে অন্যান্য দেশের বিনিয়োগের পরিমাণ সেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। আবার বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগবৃদ্ধির হারই সর্বাপেক্ষা অধিক। বিশ্বব্যাংক ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক (Export-Import Bank), আন্তর্জাতিক অর্থসরবরাহ করপোরেশন (International Finance Corporation) প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারতের বেসরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা ঋণপ্রদান সুরু করিয়াছে। ১৯৫৮ সাল অবধি অবশ্য বিশ্বব্যাংক ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ পাওয়া যায় নাই। আর একটি স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল যে, উক্ত সকল অংকই খাতায় লিখিত মূল্যে (book value) নির্ধারিত। ইহাদের বাজার-দাম অনেক বেশী। অনুমান করা হইয়াছিল, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বিনিয়োজিত ২৫৬ কোটি টাকার বাজার-দাম ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে। অনুরূপভাবে, ১৯৫৮ সাল অবধি বিনিয়োজিত ৫৭১ কোটি টাকা মূলধনের বাজার-দাম ১ হাজার কোটি টাকার কম হইবে না।

উপরি-উক্ত সকল অংক খাতায় লিখিত মূল্যের হিসাবে নির্ধারিত

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয় : নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগ (portfolio type of investment) এবং প্রত্যক্ষ বা

নিয়ন্ত্রণসহ বিনিয়োগ (direct type of investment)। সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগের উদাহরণ। বিদেশী পুঁজিপতি এগুলি ক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করে না। অপরদিকে বিদেশী ব্যবসায় বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন হইল প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ শেয়ার (ordinary shares) ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ এই দুই-এর মধ্যবর্তি স্থান অধিকার করে। এই প্রকার শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা বিদেশী পুঁজিপতি যদি নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করে তবে ইহা প্রত্যক্ষ বিনিময় বলিয়া পরিগণিত হইবে। নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ না করিলে ইহা নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগের পর্যায়ভুক্ত হইবে। বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি হইতে ঋণ ও নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের বেসরকারী মোট বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধন ৫৭১ কোটি টাকার মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪৩৬ কোটি টাকা; বাকী ১৩৫ কোটি টাকা ছিল নিয়ন্ত্রণবিহীন বিনিয়োগ। এই ১৩৫ কোটি টাকার মধ্যে বিশ্বব্যাংক-প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী।

বৈদেশিক মূলধন দুই প্রকৃতির—নিয়ন্ত্রণ-বিহীন ও প্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অধিকাংশই উৎপাদন-ক্ষেত্রে (manufacturing sector) নিয়োজিত। নিম্নে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময়ের বণ্টন-প্রকৃতি দেওয়া গেল :

ক্ষেত্রানুসারে বৈদেশিক বিনিয়োগ (হিসাব কোটি টাকায়)

	১৯৪৮ সাল ৩০শে জুন	১৯৫৬ সাল ৩১শে ডিসেম্বর	১৯৫৮ সাল ৩১শে ডিসেম্বর
১। উৎপাদন-ক্ষেত্র (Manufacturing)	৯৩	২৩৮	৩৩৯
২। বাণিজ্য (Trading)	৪৩	২৭	৩০
৩। রোপণ শিল্প (Plantation)	৫২	৮৭	৯৬
৪। অর্থ-সরবরাহ (Financial Business)	৭	২৭	২৩
৫। পরিবহন (Transport)	৩১	৪০	৪৭
৬। খনিজ (Mining)	৭	১০	১২
৭। বিবিধ (Miscl.)	২৩	২৭	২৪
মোট	২৫৬	৪৫৬	৫৭১

ছকটির পরিশিষ্ট হিসাবে বলা প্রয়োজন যে উৎপাদন-ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আবার পাটকল ও পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণই অধিক এবং রোপণ শিল্পের মধ্যে চা-বাগানই প্রথম স্থানাধিকার করে।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি (Policy of the Government of India regarding Foreign Capital) : দেখা গেল যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের বেসরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে (private sector) বিনিয়োজিত বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ৩১৫ কোটি টাকার (৫৭১ − ২৫৬ = ৩১৫) মত বৃদ্ধি পাইয়াছে।* ১৯৫৯ সালের গতি হইতেও দেখা যায় যে উহা বৃদ্ধির দিকে। এখন প্রশ্ন হইল, এই বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় কিনা? বাঞ্ছনীয় হইলে পর্যাপ্ত কিনা? এবং ইহা কি কোন বিশেষ নীতি অনুসরণের ফল? প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইলে ঐতিহাসিক পরিক্রমায় বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির পর্যালোচনা করিতে হয়।

ভারতে বৈদেশিক মূলধনের বৃদ্ধি কাম্য এবং পর্যাপ্ত কিনা

বলা যায়, ১৯২১ সালের পূর্বে—অর্থাৎ প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হইবার পূর্বে ভারতে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা সম্বন্ধে নীতি-নির্ধারণের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। সাধারণ ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি—যথা, কাঁচামাল ও শ্রমিকের প্রাচুর্য, আভ্যন্তরীণ বিরাট বাজার অথচ আধুনিক ব্যবসায় সংগঠনের অভাব প্রভৃতি ইংরাজ ও স্কচ বিনিয়োগকারিগণকে স্বভাবতই এদেশে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল; এবং মূলত তাহাদের মূলধন ও উদ্যোগেই প্রাথমিকভাবে এদেশের আধুনিক শিল্পসমূহের সংগঠন হইয়াছিল। পরে ভারতীয় মূলধন ও উদ্যোগ শিল্প-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করিতে থাকিলে দেশীয় ও বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে এক স্বাভাবিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়; এবং ফলে প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারী নীতি নির্ধারণ ও ঘোষণা করিবার। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন প্রথম বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে নীতি ঘোষণার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করে। কমিশন সংখ্যাধিক্যে এই অভিমত প্রদান করে যে, ভারতীয়গণ বৈদেশিক মূলধনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেও দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য ইহার আমদানিতে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা চলিবে না। কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ দল অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিয়া তিনটি সুস্পষ্ট সর্তের নির্দেশ করে যাহা পূরিত হইলে তবেই ভারতে বৈদেশিক মূলধন অনুপ্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমত, এইরূপ সমস্ত বৈদেশিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে ভারতে সমিতিবদ্ধ (incorporated) এবং ভারতীয় টাকায় মূলধন অনুমোদন করিয়া ভারতে রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইতে হইবে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

১. ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন

* সরকারী খাতে বৈদেশিক মূলধনের আমদানির আলোচনা এখন করা হইল না। ইহা মুদ্রা ও বিনিময় এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রসংগে করা হইবে। তবে প্রয়োজনীয় বলিয়া এই অধ্যায়ে স্থানে স্থানে উহার উল্লেখ দেখা যাইবে।

দ্বিতীয়ত, এইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে এক যুক্তিসংগত অংশ ভারতীয়গণের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। তৃতীয়ত, এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় শিক্ষানবীসীদিগকে (apprentices) সংগত পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

২। ১৯২৫ সালের বৈদেশিক মূলধন কমিটি

১৯২৫ সালের বৈদেশিক মূলধন কমিটি (External Capital Committee) ফিসক্যাল কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের উপরি-উক্ত অভিমত সমর্থন করিয়া সুপারিশ করে যে, ভারতীয় শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না দিলে ঐ সকল বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ (direct protection) বা বাউন্টি (bounty) প্রদান করা হইবে না।

দুঃখের বিষয় উপরি-উক্ত সুপারিশসমূহের কোনটিই ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করে নাই। অপরদিকে বরং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে (Government of India Act, 1935) ভারতে ব্রিটিশ-প্রজাদের (British Subjects) মূলধন ও স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতমূলক ধারাই সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল।

৩। ১৯৪৬ সালের পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ড

ইহার পর ১৯৪৬ সালে নিযুক্ত পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ড (Planning Advisory Board) এই অভিমত প্রকাশ করে যে সাধারণভাবে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। "মূল শিল্পগুলি ত' বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবেই, এমনকি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ বাধা সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।"*

৪। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সর্তাবলী

এই বিষয়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) পরিকল্পনা উপদেষ্টা বোর্ডকেও ছাড়াইয়া যায়। ইহাতে ভারতে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের উপর কঠিন সর্তাবলী আরোপ করে। কয়েকটি সর্ত হইল: সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) ছাড়া জাতীয় পরিকল্পনার জন্য কোন অংশে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত হইবে না; কোন মূল বা অপরিহার্য শিল্পে বৈদেশিক মূলধন থাকিতে পারিবে না। এই প্রকার মূলধন বর্তমানে যে-সকল বিশেষ সুবিধা (concessions) ভোগ করিতেছে তাহার অবসান অনতিবিলম্বেই ঘটাইতে হইবে। সরকারের অনুমতি এবং পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষের (Planning Authority) নির্দিষ্ট সর্তাধীনে ব্যতীত বৈদেশিক মূলধন কোন প্রতিষ্ঠানেই বিনিয়োজিত হইতে পারিবে না; বর্তমানে অপরিহার্য শিল্প, খনিজ শিল্প প্রভৃতিতে বিনিয়োজিত সমস্ত বৈদেশিক মূলধনকে যথাসম্ভব শীঘ্র রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে, ইত্যাদি।†

* Report of the Planning Advisory Board-এর ১৭ পৃষ্ঠা।

† Report of the National Planning Committee-এর ৪০-৪১ পৃষ্ঠা।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এই অভিমত ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় সমর্থন করা হয়। শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, দেশের শিল্পোন্নয়নের বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও মাত্র নির্দিষ্ট সর্তাধীনে এই প্রকার মূলধনকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়তা করিতে দেওয়া যাইতে পারে।*

৫। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন (১৯৪৯-৫০) বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও ইহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কমিশনের মতে, সরকারী উদ্যোগের যে-ক্ষেত্রকে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি পরিহার করিবার জন্য গড়িয়া তোলা হইতেছে সেই ক্ষেত্রে এবং বেসরকারী উদ্যোগের যে-ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদনের পথ প্রস্তুত করা হইতেছে এবং যে-ক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন ও সংগঠন পর্যাপ্ত নহে—মাত্র সেখানেই বৈদেশিক মূলধনকে সক্রিয় থাকিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। উপরন্তু, যেখানে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন সেখানে এই প্রকার মূলধন বিশ্বব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাংক (Export-Import Bank of the U. S. A.) প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ-পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইবে। যেখানে মূলধন ছাড়া শিল্পজ্ঞান আমদানিরও প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে প্রত্যক্ষ মূলধন আমদানি করা যাইতে পারে—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা নিয়ন্ত্রণসহ মূলধন (direct type of investment) আমন্ত্রণ ও আমদানি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৬। দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশের উপর এরূপ সর্তাবলী আরোপ করিলেও মূলত ইহা এইপ্রকার মূলধনকে আহ্বান করিতেই উপদেশ দেয়। কমিশন রিপোর্টের এই প্রসংগ এই বলিয়া শেষ করে যে, সরকারী নীতি এরূপভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যেন প্রবেশেচ্ছু বৈদেশিক মূলধনের আগমনের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্ট ও সংরক্ষিত হয়।

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগি

বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে সরকারের এইরূপ কতক পরিমাণে পরিবর্তিত দৃষ্টিভংগি পরিবর্তিত পরিস্থিতিরই ফল। ইতিমধ্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছিল যে, আভ্যন্তরীণ মূলধন-গঠন ও যোগান প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া ১৯৪৯ সালের ৬ই জুন তারিখে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, "আমাদের অর্থ-ব্যবস্থা বিদেশীর করতলগত থাকার জন্যই অতীতে জাতীয় স্বার্থে বৈদেশিক মূলধনের পরিধি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং বর্তমানে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইবে

৭। ১৯৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান ও আশ্বাসবাণী

* ৩৪৪-৩৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া সর্বাধিক পরিমাণে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মূলধনের ব্যবহার।" ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলেন যে যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয়গণের হস্তেই থাকিবে তবুও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈদেশিকগণের হস্তেও এই নিয়ন্ত্রণভার সমর্পিত রাখা যাইতে পারে। যদিও উচ্চ পদসমূহে ভারতীয়গণের নিয়োগই হইবে সাধারণ নীতি—তবুও প্রয়োজনবোধে এই সকল পদে বিদেশীর নিয়োগে সরকার আপত্তি করিবে না। উপসংহারে শ্রীনেহরু বলেন, "ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নে গঠন ও সহযোগিতামূলক ভূমিকায় বৈদেশিক মূলধনের দান ভারত সরকার সানন্দেই গ্রহণ করিবে।"

সরকারের অন্যান্য মুখপাত্র বিশেষ করিয়া অর্থমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী বারংবার প্রধান মন্ত্রীর উপরি-উক্ত আশ্বাসবাণীর প্রতিধ্বনি করেন।

৮। পরিকল্পনা কমিশনের আহ্বান

পরিকল্পনা কমিশন ইহারই অনুসরণ করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনকে সাদর আহ্বান জানায়। পরিকল্পনায় বলা হয়, "বর্তমান অবস্থায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মূলধনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। শিল্পকৌশল ও উৎপাদনের দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করিবে বলিয়া বৈদেশিক মূলধনের বাধাবিহীন আগমনকে সাদর অভ্যর্থনা জানান যাইতে পারে। সরকার ত' বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে নিম্নলিখিত আশ্বাসবাণী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছে—যথা,

(ক) সাধারণ শিল্পনীতির প্রয়োগে বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রভেদাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না; (খ) দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময় অবস্থার (foreign exchange position) সহিত সংগতিপূর্ণভাবে বিদেশী পুঁজিপতি-দিগকে তাঁহাদের মুনাফা প্রেরণ করিতে এবং মূলধন ফিরাইয়া লইয়া যাইতে সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করা হইবে; (গ) এই সকল প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।"*

বর্তমান নীতি (Present Policy) ঃ ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে, নীতি হিসাবে বৈদেশিক মূলধনের বিরোধিতা হইতে এই যে সাদর আহ্বানে রূপান্তর ইহা পরিবর্তিত পরিস্থিতিরই ফল। আমাদের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ মূলধন কোনমতেই পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং আমাদিগকে বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করিতে হইবেই। কিন্তু এই সম্পর্কে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনিয়মিতভাবে বৈদেশিক মূলধন ভারতে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন আভ্যন্তরীণ মূলধনের পরিপূরক (supplementary) হইবে, পরিবর্ত (substitutes)

* **First Five Year Plan**-এর ৪৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা।

নহে। যে-ক্ষেত্রে দেশীয় মূলধন, উদ্যোগ ও শিল্পকৌশলের অভাবের দরুন উৎপাদন এবং উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্যকভাবে পরিচালিত হইতেছে না অথবা নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না অথবা বর্তমান শিল্পগুলি দেশের চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না—সে-ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সর্তে বৈদেশিক মূলধনকে আহ্বান করিয়া আনা যাইতে পারে। সর্তটি হইল "নীতি হিসাবে মালিকানা এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের অধিকাংশ পরিমাণ থাকিবে ভারতীয়গণের হস্তে।" তবে কতিপয় ক্ষেত্রে এই নিয়মেরও যে ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে ১৯৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে তাহার আভাষ দেওয়া হয়।* এই ব্যতিক্রম হিসাবেই তৈল শোধনাগার স্থাপন ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান বার্মাশেল এবং মার্কিন প্রতিষ্ঠান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম ও ক্যালটেক্সকে কিছু বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের তৈল শোধনাগার তিনটির মালিকানা ভারতীয় নহে; ভারতীয় কোম্পানী আইন এবং শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের মূল ধারাগুলিও উহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। ২৫ বৎসরের মধ্যে উহাদের রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক এখন সুস্পষ্টভাবে বলা যাইতে পারে যে, বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে ইহাই হইল বর্তমানে ভারত সরকারের নীতি। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে সরকারের এই নীতির কোনরূপ পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই।† প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই পরিমার্জিত শিল্পনীতির ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংকট-জনিত কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা দেখা গেলেও বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের এই নীতির কোন পরিবর্তনসাধন করা হয় নাই।

এই নীতির প্রতিফলন

বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে ভারত সরকারের এই নীতির একটি প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতীয় ও বৈদেশিক মূলধনের যৌথ উদ্যোগে সংযুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান (industrial combine) স্থাপনে। মোটরগাড়ী নির্মাণের জন্য বিড়লা নাফিল্ড সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান (Birla-Nuffild Combine), মোটরলরী নির্মাণের জন্য টাটা-ড্যামলার-বেঞ্জ অংশীদারী কারবার (Tata-Daimlar-Benz Partnership), রঙের মালমসলা উৎপাদনের জন্য টাটা-ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের অংশীদারী কারবার (Tata-Imperial Chemical Industries Partnership), বাইসাইকেল নির্মাণের জন্য সেন-র্যালে অংশীদারী কারবার (Sen-Raleigh Partnership) প্রভৃতি হইল ইহারই উদাহরণ। ইহা ছাড়া সরকার নিজেও বৈদেশিক মূলধনের সহিত সহযোগিতায় নানাপ্রকার কারখানা স্থাপন করিয়াছে এবং স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছে। এ-সম্পর্কে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

---

* ৪০৪-৪০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† ৩৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

কিন্তু উপরি-উক্ত আশ্বাসবাণী ও সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে বৈদেশিক মূলধনের আমদানি আশানুরূপ হয় নাই। ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যে ৩১৫ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মূলধন ভারতে বিনিয়োজিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই ছিল বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ এবং কতিপয় ক্ষেত্রে পুনর্মূল্য নির্ধারণের (revaluation) ফল।* ইহা ছাড়া বিশ্বব্যাংক হইতে ১২ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছিল। বিশ্বব্যাংক হইতে ঋণ বাদ দিয়া নীট মূলধনের আগমন (net inflow of capital) ধরিলে উহা মাত্র ১০০ কোটি টাকার মত হইবে।

বৈদেশিক মূলধনের আমদানি আশানুরূপ হয় নাই

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ১০০ কোটি টাকা বৈদেশিক বিনিয়োগ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সাল অবধি অবশ্য নীট বিনিয়োগের হার ১০০ কোটি টাকার কিছু অধিক হয়, কিন্তু উহার মধ্যে বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত ঋণ ১২ কোটি টাকা ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগের ঘাটতি সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ দ্বারা পূরণ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অনুরূপ করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য থাকিবে না।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the traditional sources of Industrial Finance in India. Point out the defects in each of them. (৩৭২-৩৭৪ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the traditional problem of Industrial Finance in India. What steps have been taken to deal with it ?

[ইংগিত: উত্তর হিসাবে ভারতের শিল্পগত অর্থ করপোরেশন ও রাজ্য অর্থ সরবরাহকারী করপোরেশনসমূহের কার্যাবলী বর্ণনা কর।...৩৭৪-৩৭৭ এবং ৩৮০-৩৮২ পৃষ্ঠা]

3. Describe the organisation and functions of the Industrial Finance Corporation of India and comment upon its working.
(C. U. B. A. 1955, '59 ; B. Com. 1952, '56) (৩৭৫-৩৮০ পৃষ্ঠা)

4. Indicate the organisation, functions and role of the State Financial Corporation with special reference to that of West Bengal. (C.U.B.A. 1950) (৩৮০-৩৮২ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the recent problem of Industrial Finance and discuss the Governmental attempt for solving it.

[ইংগিত: ভারতের শিল্পগত মূলধনের সাম্প্রতিক সমস্যা হইল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে প্রতিযোগিতার সমস্যা। মূলধনের অপ্রতুলতার সমস্যাও নূতন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয়

* Reserve Bank Bulletin, Nov. 1955 এবং Dec. 1957 এবং Taya Zinxin, Foreign Capital in India—৩৮ পৃষ্ঠা।

পরিকল্পনার সূচনায় করনীতির পরিবর্তন এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংগতির অবস্থা বিশেষ মন্দা হওয়ার জন্য এই অপ্রতুলতায় সমস্যা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রপীড়িত করিতেছে এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।

সমস্যার সমাধান হিসাবে প্রথম সরকারী প্রচেষ্টা হইল শ্রোফ্ কমিটি নিয়োগ। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন এবং শিল্পগত ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, ইহারা পর্যাপ্ত প্রতিবিধান নহে। সুতরাং অন্যান্য পন্থাও অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে।...৩৮২-৩৯০ পৃষ্ঠা]

6. Give an account of the special agencies that have been set up in India after World War II for providing long-term finance to private industry.

(C. U. B. A. 1958, '59 ; B. Com. 1957, 58, '59) (৩৭৫-৩৮২ এবং ৩৮৬-৩৯০ পৃষ্ঠা)

7. Consider the financial problems of small and medium scale industries in India and discuss the measures that have been adopted in recent years to solve these problems. (C. U. B. A. 1960 ; B. Com. 1960)

[ইংগিত : ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পসমূহের অর্থসংগ্রহের সমস্যা দূর করিবার জন্য রাজ্য অর্থসরবরাহের করপোরেশনসমূহ ও পুনঃ অর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শিল্পে রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্যের নিয়মাবলী সহজ করা হইয়াছে, শিল্পগত অর্থ করপোরেশন প্রভৃতিও বর্তমানে এই ঋণ প্রদানে অগ্রসর হইয়াছে।...৩৮০-৩৮২ এবং ৩৮৯-৩৯১ পৃষ্ঠা দেখ।]

8. Indicate the problem of Capital Formation in India. What remedial measures would you suggest ? (৩৯১-৩৯৬ পৃষ্ঠা)

9. Give an evaluation of the policy of the Government of India regarding Foreign Capital. (৪০২-৪০৭ পৃষ্ঠা)

10. Do you favour the employment of Foreign Capital in developing our Industries ? Give reasons for your answer.

[ইংগিত : বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করিয়া আমাদের বর্তমান মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিতভাবে বৈদেশিক মূলধনের আমদানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইংগিত দিতে হইবে।...৩৯৬-৩৯৯ পৃষ্ঠা]

11. Examine the case for encouraging the flow of Foreign Capital in India in recent years. (C. U. B. A. 1957) (৪০২-৪০৭ পৃষ্ঠা)

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শিল্পগত পরিচালনা

(Industrial Management)

ভারতে শিল্পগত অর্থসরবরাহের সমস্যার আলোচনা প্রসংগে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উল্লেখ করা হইয়াছে।* মূলত তাহার মাধ্যমেই এ-দেশের শিল্প-ব্যবস্থা এখনও পরিচালিত হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় এ-দেশেরও বেসরকারী ক্ষেত্রের বৃহদায়তন শিল্পগুলি যৌথ মূলধনের ভিত্তিতে সংগঠিত। কিন্তু ইহাদের দৈনন্দিন পরিচালনভার সাধারণত ঐ যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হস্তেই ন্যস্ত থাকে না—ন্যস্ত থাকে 'ম্যানেজিং এজেণ্টস্' নামে অভিহিত এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে। এখন আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও অস্তিত্বের কারণ কি? ইহার সংগঠন-পদ্ধতি কি? ইহা কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করে? ইহা কাম্য কিনা? ইত্যাদি।

ভারতে শিল্পগত পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা (The Managing Agency System): ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উদ্ভব হয় গত শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইহার উদ্ভবের কারণ ঐতিহাসিক। ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ যখন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এ-দেশে মূলধন নিয়োগ স্বরু করেন তখন তাঁহারা একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সমস্যাটি হইল পরিচালনার সমস্যা। বিদেশস্থ তাঁহাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কাহারা করিবে? স্বদেশ হইতে মূলধন প্রেরণ করা যায়, শিল্প-সংগঠনের ব্যবস্থা করা যায়—কিন্তু দৈনন্দিন পরিচালনাকার্য ত' কাম্যভাবে সম্পাদন করা যায় না। ফলে এই কার্য গিয়া পড়িল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূতপূর্ব কর্মচারিগণ দ্বারা সংগঠিত 'এজেন্সী হাউস' (Agency Houses) নামে অভিহিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনাকার্য সম্পাদন করিতে করিতে ক্রমে মূলধন সরবরাহের দায়িত্বও গ্রহণ করে। শেষোক্ত দায়িত্ব পালন তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল কারণ তাহারা ঐ সময় ব্যাংক-ব্যবসায়েও নিযুক্ত ছিল। এই 'এজেন্সী হাউস' কথা হইতেই 'ম্যানেজিং এজেন্সী' কথাটির উৎপত্তি। সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ম্যানেজিং এজেণ্টগণ স্বীয় উদ্যোগে নূতন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নিজেদের এজেন্সী-কার্যের পরিধি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, তাঁহারা তাঁহাদের উদ্যোগে সৃষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে নিজেদেরই নিয়োগ করেন। ক্রমে মূলধন, উদ্যোগ ও সুযোগ্য পরিচালকের অভাবে প্রপীড়িত ভারতীয় শিল্পপতিগণও এই প্রথার

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উদ্ভব

ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার প্রসার

* ৩৭৪-৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

মোহে আকর্ষিত হইয়া পড়েন ; এবং অবশেষে ইহা ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় একপ্রকার বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করে।

সংগঠন ও কার্যাবলী (**Organisation and Functions**) : ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানসমূহ আদিতে অংশীদারী কারবার (partnership) এবং ঘরোয়া যৌথ ব্যবসায়ের (Private Limited Companies) ভিত্তিতে গঠিত হয়। আর্থিক সংগতি ও ব্যবসায়ে উদ্যোগসম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তি মিলিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেন। সম্প্রতি কিন্তু ইহা যৌথ ব্যবসায়ের (Joint Stock Companies) ভিত্তিতেও গড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমানে প্রায় সকল পুরাতন ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানই সসীম দায়যুক্ত প্রতিষ্ঠানে (Limited Liability Companies) পরিণত হইয়াছে। প্রখ্যাত এজেন্সী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানী (Andrew Yule & Co.), ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি (Mackinon Mackenzie), গিলেন্ডারস্ আরবুথ্নট এণ্ড কোম্পানী (Gillanders Arbuthnot & Co.) প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারা যায়।

সংগঠন

কয়েকটি প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান নূতন শিল্পের পথিকৃৎ হিসাবে কার্য করে। কোন নূতন শিল্প স্থাপন সম্ভব এবং কাম্য কিনা সে-সম্বন্ধে ইহা গবেষণা করে। গবেষণার ফল সপক্ষে হইলে ইহা শিল্প-সংগঠনে অগ্রণী হয়। ভারতের পাটকল শিল্প, চা-বাগান শিল্প এবং কয়লাখনি শিল্পের পথপ্রদর্শক হইল ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হিসাবে দৈনন্দিন কার্যের অধিকাংশও সম্পাদন করেন—যথা, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগ করা, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অন্যান্য দেশে এই সকল কার্য সম্পাদিত হয় বেতনভোগী ম্যানেজার বা মুখ্য পরিচালক (Managing Director) দ্বারা ; তৃতীয়ত, শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সরবরাহ করা ম্যানেজিং এজেন্টের অন্যতম মুখ্য কর্তব্য। এই মূলধন স্বল্প ও দীর্ঘ —উভয়কালীন ভিত্তিতেই সরবরাহ করা হয়। এজেন্সী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন বা স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া এবং দীর্ঘকালীন ঋণদান করিয়া। তাহারা স্বল্পকালীন মূলধন সরবরাহ করে হয় নিজস্ব তহবিল হইতে না-হয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণদানের জামিন হইয়া। এ-সম্পর্কে আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

কার্যাবলী :

১। গবেষণা ও শিল্প-সংগঠন

২। দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনা

৩। মূলধন সরবরাহ

সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-সংগঠকের (entrepreneurs) যাহা কাজ এ-দেশে ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাই সম্পাদন করেন। কি উৎপাদন হইবে, কোথায় উৎপাদন করা হইবে এবং কিভাবে উৎপাদন করা হইবে—শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই তিনটি মৌলিক বিষয় নির্ধারণ

কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার

করে পরিচালকমণ্ডলী নহে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান। উৎপাদনের পর বিক্রয়ব্যবস্থাও করে এই প্রতিষ্ঠান। বণ্টনের (distribution) ভারও একরূপ ইহার হস্তেই ন্যস্ত।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার মূল্যায়ন (An Evaluation of the Managing Agency System): ভারতের শিল্পোন্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভূমিকার বর্ণনা ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন এইভাবে করিয়াছে: বিগত ৭৫ বৎসর ধরিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা ভারতীয় শিল্পসমূহকে যে-সেবা করিয়াছে তাহা অতুলনীয়। শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে উদ্যোগ বা মূলধন—কোনটিরই প্রাচুর্য ছিল না তখন ম্যানেজিং এজেন্টগণ উভয়ই সরবরাহ করিয়াছিলেন; এবং ভারতের তুলাবস্ত্র শিল্প, পাটকল শিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতির ন্যায় সুসংগঠিত শিল্প তাহাদের বর্তমান অবস্থার জন্য বহুসংখ্যক প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের গঠনোদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানের নিকট ঋণী।

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন কর্তৃক এই প্রথার ভূমিকা বর্ণনা

অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেণ্ট বলেন, অতীতে ম্যানেজিং এজেন্টগণ অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। অগ্রণী হইয়া শিল্প-সংগঠন করা ছাড়াও তাঁহারা মন্দা বাজারের সময় বহু শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।* বস্তুত, তুলাবস্ত্র ও পাটকল শিল্প প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিলুপ্তই হইত যদি-না তাহাদের ক্ষতি ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিজেরা বহন করিতেন। তৃতীয়ত, মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভূমিকা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। যে-দেশে মূলধন-বাজার সুসংগঠিত নহে, যে-দেশে মূলধনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হইল সাধারণ সন্দিগ্ধতা সে-দেশে ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতির ভূমিকা লঘু করিয়া কোনমতেই দেখা যায় না। প্রাথমিক মূলধন হইতে সুরু করিয়া দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য পৌনঃপুনিক মূলধনের অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে ম্যানেজিং এজেন্টগণের মাধ্যমে বা তাঁহাদের নিকট হইতে। সরকারী হিসাব অনুসারে ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিজেরাই মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকার মূলধন সরবরাহ করিয়াছিলেন। অপরদিকে আবার তাঁহাদের নাম ও উদ্যোগের জন্যই বাজার হইতে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় এবং আমানত দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

গুণ: ১। শিল্প-সংগঠন ২। শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা

৩। মূলধন সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

চতুর্থত, একই ধরনের বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান একই ম্যানেজিং এজেন্সীর হস্তে থাকায় একক পরিচালনার (unified management) বহু সুবিধা ভোগ করা গিয়াছে। পরিচালনার এই সুবিধা হইল প্রধানত ব্যয়সংক্ষেপের (economies) দিক দিয়া। ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রথার জন্য আভ্যন্তরীণ (internal) ও বাহ্যিক (external) উভয় প্রকার ব্যয়সংক্ষেপই সম্ভব হইয়াছে। বহুল পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবেষণা,

৪। একক পরিচালনার সুবিধা

---

* Wadia & Merchant, Our Economic Problem-এর ১৬শ অধ্যায়।

প্রচারকার্য, সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি হইল ইহাদের উদাহরণ। উপরন্তু, প্রয়োজনের সময়ে এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান হইতে অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ঋণদান, সাধারণ সময়ে এক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন অপর প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

গুণাবলীর সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষিপ্তসার হিসাবে বলিতে পারা যায়, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য ভারতে শিল্পোদ্যোগের সরবরাহ হইয়াছে, সুদক্ষ পরিচালনা সম্ভব হইয়াছে, মন্দা বাজারের সময় শিল্পগুলি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, নিয়মিত মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয়প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ সংঘটিত হইয়াছে।

ত্রুটি

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থার অন্যান্য প্রথা ও পদ্ধতির ন্যায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাও অবিমিশ্র সুফল প্রসব করে নাই। ভারতের শিল্পোন্নয়নে ইহার অবদান অনন্যসাধারণ হইলেও এই প্রথার ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারা যায় না। ১৯৩৬ সালের পূর্বে প্রধান ত্রুটি বিশেষভাবে নিহিত ছিল ইহার বংশানুক্রমিক রূপের মধ্যে। ম্যানেজিং এজেন্টদের এই বংশানুক্রমিক রূপ আবার ভারতীয় এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই ছিল প্রকটভাবে প্রতিভাত। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলি চিরকালই বাহির হইতে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অংশীদার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু

১। প্রথার বংশানুক্রমিক রূপ

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালনার অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষানুক্রমিক সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। উদ্যোগী সুদক্ষ পরিচালকের পুত্র যে সুদক্ষ হইবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানে পরিচালনার মান কমিয়া গিয়াছে। ডাঃ সরোজকুমার বসু বলেন যে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে পিতার আসনে অধিষ্ঠিত পুত্রের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে তাঁহার উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। তাঁহারা যে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করেন তাহারাও এই বিষয়ে সমান অজ্ঞ। অন্যান্য বিষয়েও এই ম্যানেজিং এজেন্টগণের অজ্ঞতা অনুধাবন করিতে বেশী দূর যাইতে হয় না।*

২। পরিচালকবর্গের নিষ্ক্রিয়তা

দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সাধারণ পরিচালকবর্গ (directors) অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। ম্যানেজিং এজেন্টগণই যখন গুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলি সম্পাদন করেন তখন পরিচালকবর্গ বা ম্যানেজারের করিবার বিষয় সামান্যই থাকে। মূল বিষয়গুলির দায়িত্ব তাঁহাদের হস্তে থাকে না বলিয়া এই সামান্য বিষয়গুলিতে পরিচালকবর্গ স্বাভাবিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন না। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাদের ম্যানেজিং এজেন্টের মুখ চাহিয়া চলিতে হয়।

---

* Dr. S. K. Basu, Industrial Finance in India (1953 Edition)-এর ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা।

তৃতীয়তঃ, ডাঃ লোকনাথনের ভাষায় বলা যায়, "ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার জন্য অর্থ শিল্পের ভৃত্য না হইয়া প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"* ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার ম্যানেজিং এজেণ্টদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হয় প্রধানত ম্যানেজিং এজেণ্টগণের মূলধন সরবরাহের ক্ষমতার জন্য, তাঁহারা পরিচালনায় সুদক্ষ বলিয়া নহে। আবার ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তনসাধন করাও হয় মূলত ঐ কারণে। বারংবার ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তনসাধন করিলে সুপরিচালনা ব্যাহত হইতে বাধ্য। এই কারণেই বোম্বাই-এর বহুসংখ্যক কাপড়ের কলের পতন ঘটিয়াছিল।

৩। অর্থ শিল্পের প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে

চতুর্থত, একই ম্যানেজিং এজেন্সীর হাতে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার থাকার দরুন নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়—যথা, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিপদে পড়িলে তাহার প্রতিক্রিয়া অন্যগুলিতেও দেখা দিতে পারে; সকল প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য করা ম্যানেজিং এজেণ্টদের সংগতিতে না কুলাইতে পারে; ম্যানেজিং এজেণ্টগণ পরিচালনায় সুদক্ষ না হইলে বহুপ্রকারের অপচয় দেখা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে যে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান শুধু ম্যানেজিং এজেন্সীর অপারগতা বা অক্ষমতার জন্য বিপদে পড়িয়াছে।

৪। একক পরিচালনার অসুবিধা

পঞ্চমত, ম্যানেজিং এজেণ্টগণ অনেক সময় মূল ব্যবসায়ের অনুপূরক কার্যেও (subsidiary) লিপ্ত হন। ইহার ফলে মূল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বিপদ ঘনাইয়া আসিতে পারে। অনেক সময় আবার ম্যানেজিং এজেণ্টদের স্পেকুলেশনের কার্য তাঁহাদের পরিচালনাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে সংকটের সম্মুখীন করিয়া তুলে।

৫। ম্যানেজিং এজেণ্টগণের অনুপূরক কার্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য বিপদ

ষষ্ঠত, ম্যানেজিং এজেণ্টগণ যে-পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তাহারও নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। অফিস-পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ (office allowance) লওয়া ছাড়াও তাঁহারা নির্দিষ্ট হারে বিক্রয় বা উৎপাদনের অংশও লইয়া থাকেন। অভিযোগ হইল যে, অফিস পরিচালনার জন্য যে-অর্থ তাঁহারা লন তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং বিক্রয় বা উৎপাদনের যে-অংশ তাঁহারা লন তাহা অযৌক্তিক। বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশ দাবি করিবার সপক্ষে কোনই যুক্তি নাই—কারণ বিক্রয় হইলেই যে মুনাফা হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদনের উপর কমিশন আরও অযৌক্তিক। ইহাতে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই ম্যানেজিং এজেণ্টগণ উৎপাদনের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন। ফলে অত্যধিক এবং অপকৃষ্ট জাতের উৎপাদন হয়। যে-ক্ষেত্রে এজেণ্টগণ মাত্র মুনাফার অংশ লইয়া থাকেন সে-ক্ষেত্রেও ইহা অত্যধিক

৬। তাঁহারা অযৌক্তিকভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন

* P. S. Lokanathan, Industrial Organisation in India

বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময় আবার তাঁহাদিগকে কাঁচামাল ক্রয় ইত্যাদির উপরও কমিশন লইতে দেখা যায়। ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিকের আলোচনার উপসংহার হিসাবে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বলিয়াছেন, "সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই কমিশনকে অত্যধিক বলিয়া বর্ণনা করা কোনমতেই অযৌক্তিক হইবে না।"*

৭। এই প্রথা নানা দুর্নীতির সহিত সংযুক্ত প্রমাণিত হইয়াছে

সপ্তমত, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা নানারূপ দুর্নীতির সহিত সংযুক্ত। আইনের চক্ষু এড়াইয়া নিজেদের সুবিধামত হিসাবরক্ষা, প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থকে শেয়ারে রূপান্তরিত করা, প্রভৃতি দুর্নীতি ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে।

৮। এই প্রথার জন্য শিল্পগত ক্ষমতা বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে

পরিশেষে, এই প্রথার দরুন শিল্পগত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র কয়েক জনের হস্তে। ১৯৫১ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, এণ্ড্রু ইউল, ম্যাক্‌লিয়ড (Mcleod), মার্টিন ও ডালমিয়ার ম্যানেজিং এজেন্সীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫০, ৪০, ২৬ এবং ৩৪টি। আমাদের সংবিধান যখন অর্থ-ব্যবস্থায় সম্পদ ও সুযোগের কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিয়াছে † তখন উপরি-উক্ত পরিস্থিতিকে সমর্থন করিতে পারা যায় কিরূপে ?

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার সংস্কার (Reforms of the Managing Agency System) : প্রধানত অংশীদারদের সমিতির (Shareholders' Association) আন্দোলনের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার উপরি-উক্ত ত্রুটিসমূহ যথাসম্ভব দূরিকরণার্থে ১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইনের (Companies Act, 1936) সংশোধন করা হয়। সংশোধনের ফলে যে-সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা হইল এইরূপ : (১) ব্যাংকিং বা বীমা কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত করা চলিবে না। (২) ২০ বৎসরের অধিককালের জন্য কোন ম্যানেজিং এজেন্টকে নিযুক্ত করা যাইবে না ; এমনকি 'বর্তমান' এজেন্সীদেরও কার্যকালের অবসান ঐ একই সময়ের মধ্যে ঘটিবে। অবশ্য কার্যকলাপ সমাপ্ত হইলে তাহাদের পুনর্নিয়োগ করা যাইতে পারে। (৩) ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত অথবা দেউলিয়া প্রমাণিত হইলে ঐ ২০ বৎসর সময়ের মধ্যেই যে-কোন সময়ে তাহাদের অপসারণ করা যাইতে পারে। (৪) এজেন্টদের নিয়োগ, অপসারণ ও নিয়োগের সর্তাবলীর পরিবর্তন অংশীদারগণের সম্মতি-সাপেক্ষ হইবে। (৫) কোম্পানী আইনের এই সংশোধনের পরে নিযুক্ত

১৯৩৬ সালের কোম্পানী আইনের সংশোধন

* Wadia and Merchant, Our Economic Problem-এর ১৬শ অধ্যায়।

† ভারতীয় সংবিধানের ৩৯ (গ) অনুচ্ছেদ।

ম্যানেজিং এজেন্টগণ পারিশ্রমিক হিসাবে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ (office allowance) এবং নীট মুনাফার (net profit) একাংশ পাইবেন। কি হারে এই নীট মুনাফা হিসাব করা হইবে আইনে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়। (৬) একই ম্যানেজিং এজেন্সীর অধীনে কোন প্রতিষ্ঠান অপর কোন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ-প্রদান করিতে বা ঋণের জামিন হইতে পারিবে না। অনুরূপভাবে একই ম্যানেজিং এজেন্সীর অধীনস্থ কোন প্রতিষ্ঠান অপর কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। (৭) চলতি হিসাবে (current account) ব্যতীত ম্যানেজিং এজেন্টগণকেও কোন প্রকার ঋণদান করা চলিবে না। (৮) পরিশেষে, কোন ম্যানেজিং এজেন্ট অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর এক-তৃতীয়াংশের অধিক সদস্যকে মনোনীত করিতে পারিবে না।

ইহা কাম্য সংস্কার-সাধনে সমর্থ হয় নাই

সমালোচনা: ১৯৩৬ সালের সংশোধন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার দোষত্রুটি কতকাংশে দূর করিলেও ইহার কাম্য সংস্কারসাধনে সমর্থ হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, পারিশ্রমিক সম্বন্ধে সংশোধনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে সংশোধন পাস হইবার পরে নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্টগণ চুক্তি অনুসারে পারিশ্রমিক পাইবেন। ইহার ফলে সংশোধনের পূর্বে নিযুক্ত এজেন্টগণ পূর্বের মতই অযৌক্তিকভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন। আবার এক-একবারের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সীর জীবনকাল ২০ বৎসরে নির্দিষ্ট করিয়া ইহার পুরুষানুক্রমিক রূপের (hereditary character) পরিবর্তন-সাধনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রতি ২০ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে, ম্যানেজিং এজেন্সীর পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা। কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টগণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকিতেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাম্য বিবেচিত হইলেও এজেন্সীর পরিবর্তন করা অংশীদারগণের পক্ষে সম্ভব হইত না। উপরন্তু, এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইবার পথে কোন বাধা ছিল না। ফলে সময় সময় এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তিগণের হস্তে গিয়া পড়িত।

এই কারণে ১৯৫৬ সালে আমূল সংস্কার

এই সকল কারণের জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার আমূল সংস্কার—এমনকি বিলোপসাধনেরও দাবি করা হয়। এই দাবির বিচার-বিবেচনার্থে ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সরকার একটি কোম্পানী আইন কমিটি (Company Law Committee) নিয়োগ করে। ইহা 'ভাবা কমিটি' (Bhaba Committee) নামেও পরিচিত। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ভাবা কমিটি তাহার বহু সুদূরপ্রসারী সুপারিশসমন্বিত রিপোর্ট প্রদান করে। রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে আইন রচনা করা হয়। আইনটি ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাস হয়।

ইতিমধ্যে সরকার ১৯৫১ সালে কোম্পানী আইনের আর একটি সংশোধন পাস করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে চেষ্টা করে। এই সংশোধনের দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে এজেন্সীর সকল প্রকার পরিবর্তন এমনকি ইহার প্রথম ও পুনর্নিয়োগ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে সম্পাদন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত ভাবার সভাপতিত্বে কোম্পানী আইনের উপর একটি উপদেষ্টা কমিশনও (Advisory Commission on Company Law) নিযুক্ত করা হয়।

অন্তবর্তী সংশোধন

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন (Companies Act, 1956): ১৯৫৫ সালের কোম্পানী আইনকে কার্যকর করা হইয়াছে ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে। কোম্পানী আইনের ম্যানেজিং এজেন্সীর সম্পর্কে ব্যবস্থাসমূহ মোট ৫৪টি ধারায় (৩২৪ হইতে ৩৭৭) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান ব্যবস্থা হইল এইরূপ :

১। কয়েক ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী নিষিদ্ধকরণ

নিয়োগের নিষিদ্ধকরণ : সরকারী নির্দেশিত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিল্প ও ব্যবসায়ে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিবেই না এবং এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানের সকল ম্যানেজিং এজেন্সীর অবসান ৩ বৎসর অথবা ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে ঘটিবে। কোন ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে পারিবে না।

২। নিয়োগ সম্বন্ধে অংশীদারদের ও সরকারের ক্ষমতা

নিয়োগ ও নিয়োগকাল : যে-সকল প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিতে পারিবে সেখানে নিয়োগ, পুনর্নিয়োগ বা নিয়োগের সর্তাবলীর পরিবর্তন এক সাধারণ সভায় কোম্পানীর অংশীদারগণ দ্বারা অনুমোদন করিয়া লইতে হইবে। তাহার পরও ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে।

অনুমোদন করিবার সময় সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে প্রস্তাবিত নিয়োগ সাধারণের স্বার্থের অনুকূল কিনা, যাঁহাকে নিয়োগ করা হইতেছে তিনি যোগ্য এবং সরকার নির্ধারিত সর্তাবলী পূরণ করেন কিনা।

৩। পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ

সাধারণ ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সীর নিয়োগকাল এক-একবারে ১০ বৎসর করিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে, তবে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পূর্বে কখনও ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল না সেখানে এই সময় ১৫ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে কোন ম্যানেজিং এজেন্ট ১০টির বেশী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতে পারিবে না।

পরিচালনার অবসান ও গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন : কয়েক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও ম্যানেজিং এজেন্টের পরিচালনার অবসান ঘটিতে পারে—যথা, নিজে দেউলিয়া

হইলে, এজেন্সা প্রতিষ্ঠান বা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া গেলে, এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালক ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্তত ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিবে ইত্যাদি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তি যদি এজেন্সা প্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়িত হন তবে এজেন্সীর কার্যের অবসান ঘটে না। উপরন্ত, পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ এক সাধারণ প্রস্তাব (ordinary resolution) দ্বারা প্রবঞ্চনা অথবা বিশ্বাসভংগের জন্য এবং এক বিশেষ প্রস্তাব (special resolution) দ্বারা অবহেলা বা কুপরিচালনার জন্য ম্যানেজিং এজেন্টকে অপসারিত করিতে পারে।

৪। কয়েক ক্ষেত্রে পরিচালনার অবসানের ব্যবস্থা

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রের (constitution) যে-কোন পরিবর্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ। উত্তরাধিকার সূত্রে এজেন্ট-পদে অধিষ্ঠানের ব্যবস্থা গঠনতন্ত্রে থাকিলে তাহা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫। গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে সরকারী নিয়ন্ত্রণ

পারিশ্রমিক : ম্যানেজিং এজেন্টের পারিশ্রমিকের নীট মুনাফার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না। ইহার অধিক পারিশ্রমিকের জন্য অংশীদারগণের বিশেষ সমর্থন ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। কোন আর্থিক বৎসরের জন্য পারিশ্রমিক ততক্ষণ প্রদান করা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত-না চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত, পরীক্ষা এবং সাধারণ সভায় পেশ করা হয়। পরিচালনার জন্য ভাতা (office allowance) বলিয়া কিছুই থাকিবে না, তবে এজেন্সী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকিলে সেই অর্থ পাইতে অধিকারী হইবে।

৬। পারিশ্রমিক সীমাবদ্ধকরণ

১৯৫৯ সালের সরকারী ঘোষণা অনুসারে ১৯৬০ সাল হইতে যে-সকল ম্যানেজিং এজেন্সী সরকার নূতন করিয়া অনুমোদন করিবে তাহার প্রত্যেকটিতেই স্ল্যাব পদ্ধতিতে (slab scale) পারিশ্রমিকের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। অর্থাৎ, ম্যানেজিং এজেন্টরা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ১০ ভাগ, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকার উপর শতকরা ৯ ভাগ ইত্যাদি হারে পারিশ্রমিক পাইবেন।

১৯৫৯ সালের ঘোষণা

ম্যানেজিং এজেন্ট বা তাঁহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে ক্রয় বা বিক্রয় এজেন্ট নিযুক্ত হইতে অথবা এই সূত্রে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দেশের বাহিরে এই প্রকার এজেন্সীকার্য করিবার জন্য পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের সমর্থন প্রয়োজন হইবে। আবার ম্যানেজিং এজেন্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সহিত ৫ হাজার টাকার অধিক মূল্যের মাল সরবরাহ, পণ্য বিক্রয় ইত্যাদির চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিলে এইরূপ চুক্তিও সাধারণ অংশীদারগণ দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

৭। এজেন্সী কার্যের নিয়ন্ত্রণ

ক্ষতিপূরণ : ম্যানেজিং এজেন্ট যদি পুনর্গঠন, সংযুক্তিকরণ ইত্যাদির জন্য পদত্যাগ করিয়া পরে আবার পুনর্গঠিত কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হন অথবা যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন তাহা হইলে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। অনুরূপভাবে এই আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী ম্যানেজিং এজেন্ট যদি পদত্যাগ করেন অথবা পদচ্যুত হন তাহা হইলেও কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। যে-ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সে-ক্ষেত্রে ইহা অনতিবাহিত সময়টুকু অথবা সর্বাধিক তিন বৎসরের জন্য দেওয়া যাইতে পারে।

৮। ক্ষতিপূরণের সংকীর্ণতর পরিধি

ক্ষমতা সীমাবদ্ধকরণ : কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালিত এক প্রতিষ্ঠানের অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ রহিত করা হইয়াছে। পরিচালক মনোনয়ন সম্পর্কে বিধি হইল যে, পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সংখ্যা ৫ এর অধিক হইলে দুইজন এবং ৫-এর কম হইলে একজনের বেশী পরিচালককে ম্যানেজিং এজেন্ট মনোনীত করিতে পারিবেন না।

৯। পরিচালক মনোনয়নের ক্ষমতা সীমাবদ্ধকরণ

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ : ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন সর্বপ্রথম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। এই দুই পদাধিকারীর কার্যাবলী অনেকটা ম্যানেজিং এজেন্টগণের কার্যেরই অনুরূপ। ফলে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোম্পানী আইনের ম্যানেজিং এজেন্সী সংক্রান্ত প্রায় সকল ধারাই এই দুই পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যতিক্রমগুলি হইল : (ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কেহই ম্যানেজিং এজেন্ট হইতে পারে কিন্তু সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইতে পারে মাত্র প্রতিষ্ঠানই, ব্যক্তি নহে।

১০। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদকে স্বীকৃতিদান

(খ) একই প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্সী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ একসংগে কাজ করিতে পারিবেন না।

(গ) সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোন শিল্প বা ব্যবসায়ে সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ রহিত করিতে পারে।

(ঘ) সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ কোন পরিচালক মনোনীত করিতে পারেন না।

পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা সমর্থিত না হইলে সম্পাদকগণ কোম্পানীর পক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ের এজেন্ট হিসাবে কার্য করিতে পারেন না।

সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষগণকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা নীট মুনাফার শতকরা ৭½ ভাগের অধিক হইতে পারে না।

সমালোচনা : ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের মূল বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল দুইটি। প্রথমত, আইন অনুসারে সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রচার করিবে যে কোন্ কোন্ শিল্পের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী থাকিতে পারিবে না। সুরুতেই এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় নাই বলিয়া সকল শিল্পই সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইয়াছে।

প্রত্যেক ম্যানেজিং এজেন্ট ও শিল্পপতি আশংকা করিতেছিলেন যে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহাদের শিল্পেরই নাম উঠিবে। ফলে উদ্যোগ ব্যাহত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, কোন ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক ১০টি শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ করিতে পারিবে। আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে ইহাকে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবিধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু এক শ্রেণীর মতে, বর্তমানে আর্থিক ক্ষমতা যে অকাম্যভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তাহার জন্য ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান ততটা দায়ী নহে, যতটা দায়ী হইল বিভিন্ন আর্থিক ও সংগঠন স্বার্থের পারস্পরিক অংগীভূত অবস্থা (interlocking of managerial and financial interests)। বর্তমানে বিভিন্ন যৌথ মূলধন প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকিং কোম্পানী একই পরিচালনাধীনে থাকে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত উহার উপর আবার জীবন-বীমা কোম্পানীও থাকিত। এই দিক দিয়া যখন কিছু করা হয় নাই তখন মাত্র ম্যানেজিং এজেন্সী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বাঁধিয়া দিয়া আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে কতটা কি করা যাইবে তাহা সন্দেহের বিষয়। আর এক শ্রেণীর মতে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে অবলম্বনীয় প্রকৃত প্রতিবিধান হইল ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের মূলধন ইত্যাদির সীমাবদ্ধকরণ, পরিচালনযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ নহে।

১। সকল প্রতিষ্ঠানকেই সন্ত্রস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে

২। আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিবিধান অবলম্বন করা হয় নাই

উপসংহার : বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে ম্যানেজিং এজেন্সী সম্বন্ধে একরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার কেহই করে না যে, আমাদের বর্তমান শিল্পগত সংগঠনের মূলে রহিয়াছে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা। প্রখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্টগণের তত্ত্বাবধানেই আমাদের প্রধান প্রধান যন্ত্রচালিত শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে এই প্রথা যে নানা দিক দিয়া ত্রুটিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। শ্রোফ্ কমিটি (Shroff Committee) ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার গুণকীর্তনের পর এই উক্তি করিয়াছিল যে, ম্যানেজিং এজেন্টের কুপরিচালনা ও সুযোগের অসদ্ব্যবহার বহু ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটাইয়া বিনিয়োগকারীশ্রেণীর বিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়াছে। ফলে শেষ পর্যন্ত মূলধন-সংগঠনই ব্যাহত হইয়াছে। উপরন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজাভিমুখী অর্থ-ব্যবস্থা আর্থিক কেন্দ্রিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে বাধ্য। অথচ বর্তমান অবস্থায় এই প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের সপক্ষেও অভিমত দিতে পারা যায় না। সুতরাং যে-দিক দিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণের কর্তৃত্বের সংকোচন করিয়া প্রথার সংস্কারসাধন করা হইয়াছে তাহা সমালোচনার উর্ধ্বে না হইলেও কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভবিষ্যতে হয়ত' মূলধন নিয়োগের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি পন্থাও অবলম্বন করিতে হইবে।

উপসংহার

সংস্কার সমালোচনার উর্ধ্বে না হইলেও কাম্য হইয়াছে

বলা যায়, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা আজ জীবন-মরণ পরীক্ষার সম্মুখীন। সমাজ-তন্ত্রাভিমুখী মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা কি ভূমিকা গ্রহণ করে বোধ হয় শুধু ইহাই দেখিবার জন্য ইহার অস্তিত্ব এখনও বজায় রাখিতে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভবিষ্যৎ ইহার নিজের উপরই নির্ভর করিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংস্কৃত প্রথা (reformed system) যদি কল্যাণকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করিতে পারে তবেই ইহা বাঁচিয়া থাকিবে। অন্যথায় ইহার বিলোপসাধনের সংগে সংগে ভারতের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা আজ জীবন-মরণ পরীক্ষার সম্মুখীন

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the merits and defects of the Managing Agency System.

(৪১১-৪১৪ পৃষ্ঠা)

2. "Although, in the initial stage, the Managing Agency System played an important role in the development of industries in India, it has several drawbacks." Discuss.

(৪১১-৪১৪ পৃষ্ঠা)

3. Discuss the present system of Industrial Management in India. Give an idea of the reforms of the system in recent times. (C. U. B, Com. 1955 ; B. A. 1953)

[ইংগিত : ভারতে শিল্পগত পরিচালনা প্রধানত ম্যানেজিং এজেন্সী পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। ম্যানেজিং এজেন্সীর সংগঠন, কার্যাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ১৯৩৬ সাল এবং ১৯৫৬ সালের সংশোধন বর্ণনা কর।...(৪০৯-৪১১, ৪১৪-৪১৫, এবং ৪১৬-৪১৮ পৃষ্ঠা)

4. Briefly discuss the recent reforms of the Managing Agency System. What do you think to be its future ?

[ইংগিত : ১৯৩৬ এবং ১৯৫৬—উভয় সালের সংস্কার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতামতের জন্য উপসংহার দেখ। (৪১৪-৪১৯ পৃষ্ঠা)

5. Give your own evaluation of the part played by the Managing Agency System in India's economic development. (C. U. B. Com. 1959 ; B. A. 1960)

(৪১১-৪১৪ এবং ৪১৯-৪২০ পৃষ্ঠা)

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সরকারী উদ্যোগাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান

(Industrial Projects in the Public Sector)

ঘোষিত শিল্পনীতির অনুসরণে সরকার উত্তরোত্তর শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত শিল্প-সংস্থার পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে এইরূপ সরকারী উদ্যোগাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরিকল্পনার (planning) পর্যালোচনা প্রসংগে পরে করা হইবে। এই অধ্যায়ে মাত্র বর্তমান সরকারী উদ্যোগাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। নিম্নলিখিতগুলিই হইল সরকারী উদ্যোগাধীন প্রধান প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান :

ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠা

১। **সিন্ধ্রির সার তৈয়ারির কারখানা (Sindhri Fertilizers & Chemical Factory) :** এই কারখানা ১৯৫১ সালে ঘরোয়া যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Private Limited Company) হিসাবে স্থাপিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা হইল সরকারী মালিকানাভুক্ত। স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় ছিল ২৮ কোটি টাকা। পরে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার সম্প্রসারণের জন্য আরও ৮½ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বর্তমানে এই কারখানা এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। ইহা বিহারে অবস্থিত। এই কারখানা হইতে প্রধানত অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট (ammonium sulphate) ও নাইট্রোজেন সার উৎপন্ন হয়। উভয় প্রকার সার মিলিয়া উৎপাদন-ক্ষমতা ৫ লক্ষ টনের উপর।

২। **অন্যান্য সার উৎপাদন পরিকল্পনা (Other Fertilizers Projects) :** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নাংগল, নিভেলি এবং রুরকেলায় আরও তিনটি সার তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে নাংগল ও রুরকেলার কারখানা স্থাপনের কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। নাংগল ও রুরকেলার কারখানা হইতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ১.৫০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার উৎপন্ন হইবে।*

৩। **চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা (Chittaranjan Locomotive Works) :** ইষ্টার্ণ রেলপথের ভূতপূর্ব মিহিজাম ষ্টেশনের নিকটে ১৯৪৮ সালে এই কারখানা স্থাপিত হয়। স্থাপনের ব্যয় হইল প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এই কারখানায় প্রস্তুত রেলইঞ্জিন ১৯৫০ সালে লাইনে বাহির হয়। কারখানায় ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে মোট ৯০ খানি ইঞ্জিন প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছিল। তাহার পর হইতে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে এই

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইঞ্জিন নির্মাণ

---

* ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

কারখানায় ৩৩৭টি রেলইঞ্জিন নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া ২০০-এর মত অতিরিক্ত বয়লার নির্মিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে চিত্তরঞ্জনের কারখানা হইতে বৎসরে ৩০০ খানি করিয়া ইঞ্জিন নির্মাণের লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে। ইহা সম্ভব হইলে ভারত কিছু কিছু রেলইঞ্জিন রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে।*

৪। **পেরাম্বুরের রেলকোচ নির্মাণের কারখানা (Integral Coach Factory at Perambur):** মাদ্রাজ সহরের অনতিদূরে পেরাম্বুর নামক স্থানে ভারতীয় রেলপথের উপযোগী যাত্রীবাহী ও মালবাহী সম্পূর্ণ ইস্পাতের কোচ নির্মাণের জন্য এই কারখানা ১৯৫২ সালের জুন মাসে স্থাপিত। ইহার উদ্বোধন কিন্তু করা হয় ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। এই কারখানাও এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। প্রথম বৎসরে ইহা সুইজারল্যাণ্ড হইতে আমদানিকৃত অংশের (parts) সমবায়ে ২০টি কোচ নির্মাণ করে। তাহার পর হইতে ইহা উত্তরোত্তর ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে এখান হইতে প্রতি বৎসরে ৩৫০টি সম্পূর্ণ ইস্পাত নির্মিত কোচ বাহির হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোচ নির্মাণ

৫। **টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখানা (Indian Telephones Industries, Ltd.):** কারখানাটি ব্যাংগালোর সহর হইতে অনতিদূরে কৃষ্ণরাজপুরম নামক স্থানে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারখানাটিতে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত ৪½ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের আটোম্যাটিক টেলিফোন ও ইলেকট্রিক কোম্পানী (Automatic Telephone & Electric Company) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাতেই কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় প্রধানত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ লাইন ও টেলিফোন-যন্ত্র নির্মিত হয়। ইহা হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩৫ হাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ লাইন এবং ৫০ হাজার টেলিফোন-যন্ত্র নির্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৪০ হাজার ও ৬০ হাজারে দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে।

৬। **টেলিফোনের তারের কারখানা (The Hindusthan Cables Factory):** পশ্চিমবংগের রূপনারায়ণপুরে কারখানাটি অবস্থিত। ১৯৫৪ সাল হইতে কারখানাটিতে কাজ সুরু হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ইহা হইতে ৫২৫ মাইল তার উৎপন্ন হয়। সম্প্রসারণ ব্যবস্থার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ হাজার মাইল সাধারণ তার এবং ৩০০ মাইল সহ-আক্ষিক তার (co-axial) উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

---

* **India, 1960.**

৭। **জাহাজ নির্মাণের কারখানা (The Hindusthan Ship-building Yard)**: ১৯৪১ সালের ২১শে জুন তারিখে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রচেষ্টায় তদানীন্তন মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টম (বর্তমানে অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম) বন্দরে কারখানাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে এই কারখানায় নির্মিত প্রথম জাহাজ 'জল-ঊষা' সমুদ্রবক্ষে ভাসান হয়। ১৯৫২ সালের ১লা মার্চ তারিখে ভারত সরকার কারখানাটির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং ইহার পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য একটি ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য

বর্তমানে মোট শেয়ারের ⅔ অংশ হইল ভারত সরকারের। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কারখানার জন্য মোট ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই সময়ের মধ্যে কারখানাটি বৎসরে গড়ে ৫০ হাজার টনের মত (50,000 GRT) জাহাজ নির্মাণ করিতে থাকে; এবং ১৯৫৮ সালের জুন পর্যন্ত ইহা মোট ১৯ খানি জাহাজ নির্মাণ করে। এই জাহাজগুলির ওজন হইল মোট ১ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন ক্ষমতাকে বৎসরে ৫০ হাজার টন হইতে ৯০ হাজার টনে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে প্রায় ১০ কোটি টাকা।

৮। **বিমান নির্মাণ কারখানা (The Hindusthan Aircraft Factory)**: ১৯৪০ সালে এই কারখানাটি সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রচেষ্টায় ব্যাংগালোর সহরের অনতিদূরে স্থাপিত হয়। যুদ্ধের সময় ইহা ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হইত। যুদ্ধের পরে ভারত সরকার ইহাকে সম্পূর্ণ ক্রয় করিয়া লইয়া ইহার পরিচালনভার প্রতিরক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত করে। কারখানাটিতে ছোট ছোট বিমান ছাড়াও রেলগাড়ীর যাত্রীবাহী বগি নির্মিত হয়।

৯। **যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা (Hindusthan Machine Tools Factory)**: কারখানাটি ব্যাংগালোরের নিকটবর্তী জলহালি (Jalahalli) নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা স্থাপন করা হইয়াছে কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবার জন্য। স্থাপনের তারিখ ও ব্যয় হইল যথাক্রমে ১৯৫৩ সালের ১লা মার্চ ও ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। কারখানাটির পরিচালনাকার্যের জন্য ভারত সরকার একটি সুইস প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহাতে আরও ২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিবার কথা ছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যেই এই বিনিয়োগ সমাপ্ত হয়। বর্তমান কারখানাটি হইতে ৩ কোটি টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি নির্মিত হয়।

১০। **সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের কারখানা (The National Instruments Factory)**: কলিকাতা সহরে জরিপ সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি মেরামত করিবার জন্য

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৬১ পৃষ্ঠা এবং India 1960.

১৯৩০ সালে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহাকেই সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের কারখানায় রূপান্তরিত করা হয়। কারখানাটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন কারখানা, বিমানপোত প্রভৃতির জন্য ২৫০ প্রকারের সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মিত হয়। সম্প্রতি চশমার কাচ উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

১১। গৃহ নির্মাণ উপকরণের কারখানা (The Hindusthan Housing Factory): নূতন দিল্লীর নিকটে জংপুরা নামক অঞ্চলে এই কারখানা ১৯৫৩ সালের ২৭শে জানুয়ারী সীমাবদ্ধ বা ঘরোয়া যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। কারখানাটির অর্ধেক শেয়ার ভারত সরকারের এবং অপর অর্ধেক হইল সুইস-ভারতীয় একটি শিল্পসংঘের (industrial combine)।* ১৯৫৩ সালের শেষ ভাগ হইতে কারখানাটিতে গড়ে বাৎসরিক ১ কোটি টাকা মূল্যের গৃহ নির্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে।

১২। পেনিসিলিন কারখানা (Hindusthan Antibiotics Factory): কারখানাটি পুণা সহরের নিকটে পিম্প্রিতে অবস্থিত। ভারত সরকার ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংঘের (WHO) মধ্যে সহযোগিতামূলক চুক্তির ফলে ইহা ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে এই কারখানা হইতে ৬৭ লক্ষ মেগা ইউনিট পেনিসিলিন উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২ কোটি ৪০ লক্ষ মেগা ইউনিট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। পেনিসিলিন ছাড়াও প্যালুড্রিন, সালফা জাতীয় ঔষধ এখানে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ১৫ হাজার কিলোগ্রামের মত ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনও উৎপন্ন হইবে। সম্প্রসারণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ হইল ১ কোটি টাকা।

১৩। ডি. ডি. টি. কারখানা (D. D. T. Factories): ভারত সরকার ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে সহযোগিতামূলক চুক্তির ফলে ১৯৫৫ সালে দিল্লীতে প্রথম ডি. ডি. টি. কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে কারখানাটি হইতে মাত্র ৩০০ টন ডি. ডি. টি. উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই কারখানায় উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কেরালায় নূতন কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার ফলে এই পরিকল্পনার শেষে মোট ২ হাজার ৫ শত টন ডি. ডি. টি উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

১৪। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপাদনের কারখানা (National Newsprint & Paper Mills): সংক্ষেপে কারখানাটি 'নেপা মিল' নামে অভিহিত। ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।† ইহা মধ্যপ্রদেশ ও ভারত সরকারের সংযুক্ত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইতে বর্তমানে বৎসরে ৩০ হাজার টনের মত সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। আশা করা হইয়াছে যে,

* শিল্পসংঘটির নাম হইল Basakta Singh Wallenborg, Ltd.

† ৩৩৩-৩৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এই মিল এবং অন্য যে দুইটি মিল স্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে এই প্রকার কাগজ বৎসরে ৬০ হাজার টনের উপর উৎপন্ন হইবে।

১৫। **অন্যান্য নূতন কারখানা :** সরকারী পরিচালনায় অন্যান্য কারখানার মধ্যে রুরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা তিনটিই প্রধান। এই কারখানা তিনটি সম্বন্ধে আলোচনা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের আলোচনা প্রসংগে পূর্বেই করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিহারে একটি পোর্সিলিন দ্রব্যাদি নির্মাণের কারখানা, উত্তরপ্রদেশে সরকারের সিমেণ্ট কারখানা নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবে। এই পরিকল্পনাধীন সময়েই সোবিয়েত সরকারের সহযোগিতায় একটি ভারী যন্ত্র নির্মাণ কারখানা, একটি কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং একটি চশমার কাঁচের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি অনুসারে ভূপালে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সহযোগিতায় একটি ভারী ফাউণ্ড্রী স্থাপিত হইতেছে। পরিশেষে, গৌহাটী ও বারৌণীতে যে তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হইতেছে তাহা হইল সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের প্রথম দুইটি তৈল শোধনাগার। লৌহ কারখানা তিনটি ছাড়া উক্ত অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই এগুলির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।*

সরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-পরিচালনা (Industrial Management in the Public Sector) : সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে এক-একটি করপোরেশন গঠন করা হইয়াছে—যথা, হিন্দুস্থান ইস্পাত, প্রাইভেট লিমিটেড ইত্যাদি। শিল্প-পরিচালক সংগ্রহের জন্য একটি শিল্পগত পরিচালক-সংগঠন (industrial pool) সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই পরিচালক-সংগঠন বা পুল হইতে প্রয়োজনমত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিচালক সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক করপোরেশন কার্য পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের নিকট দায়ি থাকে। মন্ত্রিদপ্তর আবার যথাক্রমে পার্লামেন্ট বা বিধানমণ্ডলের নিকট দায়ি থাকে।

শিল্পগত পরিচালক-সংগঠন

প্রশ্নোত্তর

1. Give a brief account of Industrial Projects in the Public Sector.

(৪২১-৪২৫ পৃষ্ঠা)

---

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৬২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শিল্প-শ্রমিক

(Industrial Labour)

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Industrial Labour of India) : ভারতে এখনও স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক দল গড়িয়া উঠে নাই। শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী বসবাসকারী শ্রমিকের সংখ্যা কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও অধিকাংশ শিল্প-শ্রমিক গ্রামাঞ্চল হইতেই আসে। এইভাবে গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার আসল কারণ হইল প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থার চাপ, সহরের আকর্ষণ নয়।* অধিকাংশ শ্রমিক ভূমিহীন এবং চাকরির সন্ধানেই তাহারা শিল্পাঞ্চলের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। গ্রামের সংগে তাহাদের সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয় না। সুযোগ-সুবিধা পাইলেই তাহারা আপনাপন গ্রামে ফিরিয়া যায়। কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করিবার জন্য যে তাহারা গ্রামে আসে এই ধারণা ঠিক নয়; বিশ্রাম, আত্মীয়-স্বজনের সংগে দেখাশুনা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রভৃতিতে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা প্রধানত গ্রামে আসে।†

১। স্থায়ী শিল্প-শ্রমিকের অভাব

গ্রামের সংগে শ্রমিকের নিবিড় সম্পর্ক

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে কার্যে অনুপস্থিতির হারও অধিক। বোম্বাই, কানপুর ও অন্যান্য স্থানে দেখা গিয়াছিল যে, অনুপস্থিতির শতকরা হার ১২-১৪ জন। এই ব্যাপক অনুপস্থিতির জন্য কার্য পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধা হয় এবং উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনুপস্থিত ও অনিয়মিত শ্রমিকদের কার্য চালাইবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করিতে হয়। শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শ্রমিক দল গঠনের অভাব এবং গ্রামাঞ্চলে ফিরিয়া যাইবার অভ্যাস বা প্রয়োজনীয়তা কতকটা ইহার জন্য দায়ী। কারখানাগুলিতে কার্যের সন্তোষজনক সর্তাদির ফলেও কতকটা এইরূপ হইয়া থাকে।

২। কার্যে অনুপস্থিতির উচ্চ হার

তৃতীয়ত, ভারতীয় শ্রমিক দল বিভিন্ন ভাষাভাষী ও আচার-ব্যবহারবিশিষ্ট লোক লইয়া গঠিত। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা এবং উৎপাদনকার্য বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়।

৩। শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার অভাব

চতুর্থত, আশ্চর্যজনক মনে হইলেও ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল শ্রমিকের অ-পর্যাপ্তি। জনসংখ্যা অগণিত হইলেও এ-দেশে দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহে বিশেষ অভাব দেখা যায়। অবশ্য সম্প্রতি শিল্পগত শিক্ষাদান-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের ফলে কতকটা অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

৪। দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচুর্য

---

* The Report of the Royal Commission on Indian Labour, 1931.

† The Report of the Labour Investigation Committee, 1946-এর ৭১ পৃষ্ঠা।

পরিশেষে বলা হয় যে, ভারতীয় শ্রমিক অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় অনেক কম দক্ষ। অর্থাৎ, অন্যান্য উন্নত দেশের শ্রমিকদের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিলেও উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। এ-সম্পর্কে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

৫। ভারতীয় শ্রমিকের নিম্ন উৎপাদন-ক্ষমতা

গ্রামের সংগে সম্পর্ক কাম্য কিনা ? (Is Village Nexus Desirable ?) : পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের সংগে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে। এই প্রসংগে ১৯৩১ সালের শ্রম সম্পর্কিত রয়াল কমিশনের মত হইল, গ্রামের সহিত শ্রমিকের যোগাযোগ কোন প্রকারে ব্যাহত না করাই সমীচীন, বরং উহাকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু শ্রম অনুসন্ধান কমিটির (Labour Investigation Committee) ধারণায় বর্তমান অবস্থায় এই অভিমত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রামের সহিত শ্রমিকের সম্পর্কের প্রশ্ন দুই দিক হইতে বিচার করা যায়। প্রথমত, গ্রামকে স্বল্প সময়ের জন্য বিশ্রামের স্থান হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, গ্রামকে অসহায় অবস্থায় শ্রমিকের আশ্রয়স্থল হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। প্রথম উদ্দেশ্যের জন্য ছুটির সময় স্বল্প ভাড়ায় গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিককে সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তামূলক (social security) অবলম্বন হিসাবে গ্রামের সহিত সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার সক্রিয় প্রচেষ্টাকে কোন ক্রমেই অনুমোদন করা যায় না। ইহার পরিবর্তে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিসাধনের দ্বারা সহরাঞ্চলকে শ্রমিকের নিকট আকর্ষণীয় করার চেষ্টাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কারখানায় কাজের সর্ত, বাসগৃহ, মজুরি, খাদ্যপুষ্টি প্রভৃতির উন্নতি এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যে-পর্যন্ত এই সমস্তের সম্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব না হইবে সে-পর্যন্ত শ্রমিক গ্রামকে শেষ অবলম্বন বলিয়া মনে করিবেই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে অধিকাংশ শ্রমিকই ভূমিহীন এবং বর্তমানে যৌথ পরিবার ও বর্ণভেদ প্রথা ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় আর্থিক নিরাপত্তার আশ্রয় হিসাবে গ্রামের খুব একটা গুরুত্ব নাই।*

ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা (Efficiency of the Indian Labour) : ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ প্রায়ই আনয়ন করা হয়। বলা হয় যে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের শ্রমিক কোন নির্দিষ্ট সময়ে যতটা পরিমাণ কার্যসম্পাদন করিতে পারে ভারতীয় শ্রমিক তাহা পারে না। এই অভিযোগ প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারের তুলনামূলক হিসাব এবং যুক্তিও প্রদর্শিত হয়। যেমন, বলা হইয়াছে যে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের

অদক্ষতার অভিযোগ

* The Report of the Labour Investigation Committee, 1946-এর ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা।

মিলগুলির বয়ন বিভাগে একজন বালিকা শ্রমিক ভারতীয় কাপড়ের মিলের ৬ জন শ্রমিকের সমান কার্য করিতে সমর্থ। আবার হিসাব দেখান হইয়াছে যে যখন ১ হাজার মাকু (spindles) পরিচালনার জন্য ভারতে ২২ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তখন ল্যাংকাশায়ার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলগুলিতে প্রয়োজন হয় যথাক্রমে ৬·৭ ও ৪·৫ শ্রমিক।* কয়লাখনিগুলির বেলায় দেখান হইয়াছে যে প্রত্যেক শ্রমিকের বাৎসরিক গড়পড়তা উৎপাদন ভারতবর্ষে ১৩১ টন, গ্রেট ব্রিটেনে ২৫০ টন, আমেরিকায় ৭৮০ টন এবং ট্রান্সভালে ৪২৬ টন। ইস্পাত শিল্পে জে. আর. ডি. টাটার হিসাব অনুসারে ১৯৪৯ সালে মাসে গড়ে প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদনের হার ছিল ½ টন এবং মার্কিন শ্রমিকের ছিল ৫ টন।

একদিকে যেমন এই সমস্ত হিসাবে দেখাইয়া ভারতীয় শ্রমিকের অদক্ষতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অপরদিকে আবার যুদ্ধকালীন গ্রেডি মিশন (The Grady Mission) এবং শ্রম অনুসন্ধান কমিটি প্রভৃতি মত প্রকাশ করিয়াছে যে অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা কম নয়। গ্রেডি মিশন বলিয়াছে, ভারতীয় কারখানাগুলিতে আলোর যথেষ্ট অভাব থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকরা ৬৫ সেণ্টের মত দৈনিক মজুরিতে চমৎকার যন্ত্রপাতি উৎপাদন করিতেছে এবং জামসেদপুরের টাটা ইস্পাত কারখানার শ্রমিকের উৎপাদনের হার আমেরিকার পিটস্‌বার্গ কারখানাগুলির শ্রমিকদের উৎপাদনের হার হইতে কম নহে। শ্রম অনুসন্ধান কমিটির মতে, ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে অদক্ষতার যে-অভিযোগ করা হয় তাহা অধিকাংশই ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন।

কিন্তু গ্রেডি মিশন ও শ্রম অনুসন্ধান কমিটির মতে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন

এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে শ্রমিকের উৎপাদন-দক্ষতার সঠিক তুলনামূলক বিচার করিতে হইলে শ্রমিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। শ্রমিক ব্যতীত কার্যের সর্ত, যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির প্রকৃতির উপরও শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। যদি দুই দেশের শ্রমিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিভিন্নতা থাকে তবে তাহাদের উৎপাদনেও বিভিন্নতা প্রকাশ পাইবে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় শ্রমিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার—অর্থাৎ কার্যের সর্ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি, পরিচালকবর্গের দক্ষতা ইত্যাদি অন্যান্য দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট। ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতার তুলনামূলক পরিমাপ করিবার সময় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কারণে আমরা এই বিচারটি করি না। ইহা ব্যতীত আর একটি বিষয়ও আমরা ভুলিয়া যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যন্ত্রপাতির তুলনায় শ্রমিক নিয়োগ ব্যয়বহুল; অপরপক্ষে ভারতে শ্রমিকের তুলনায় যন্ত্রপাতি নিয়োগ ব্যয়বহুল। এই অবস্থায় আমেরিকার মত দেশে প্রত্যেকটি শ্রমিকের সহিত অধিক যন্ত্রপাতি জুড়িয়া দিয়া

শ্রম-দক্ষতার তুলনামূলক বিচার কিভাবে করিতে হইবে

* Economic Survey of Asia and the Far East, 1950-এর ৭ পৃষ্ঠা।

তাহার নিকট যতটা সম্ভব কার্য আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ভারতে স্বল্প পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়ার সুবিধা থাকায়, স্বল্প যন্ত্রপাতির সহিত অধিক শ্রম নিয়োগ করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগান হয় না।* এইজন্যই ভারতে একজন শ্রমিক অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক মাকু বা তাঁত পরিচালনা করিয়া থাকে।

উপসংহার : ভারতীয় শ্রমিক স্বভাবতই অদক্ষ নহে

সুতরাং, ভারতীয় শ্রমিক স্বভাবতই নিকৃষ্ট ধরনের একথা সত্য নহে। ঠিক একই প্রকারের কার্যের সর্ত, পরিচালন-দক্ষতা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেখা যাইবে ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় কোন অংশে কম নয়।† অতএব ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় তাহার জন্য শ্রমিককে সম্পূর্ণভাবে দায়ী না করিয়া অন্যান্য যে-সমস্ত উপাদানের উপর উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে তাহাদের উন্নয়নের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে।

এখন সকল দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক যে ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা কোন কোন কারণে ব্যাহত হইয়া থাকে।

ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদন কম হইবার কারণ :
১। মানসিক শক্তির অভাবের যুক্তি

প্রথমত, বলা হয় যে, উদ্ভাবনী শক্তি বা মানসিক উৎকর্ষ জাতিগত বৈশিষ্ট্যের (racial qualities) উপর নির্ভর করে। একথা সত্য হউক বা না-হউক, ইহা বোধ হয় বলিলে ভুল হইবে না প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয়রা বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিল্পকৌশল প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে।

২। জলবায়ু

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর দেশের জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব থাকে। ভারতের জলবায়ু অধিক পরিশ্রমের অনুকূল নহে। অতিশয় গ্রীষ্মতাপ এবং বর্ষা ঋতুতে স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া শ্রমিকদের মধ্যে সহজেই ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি লাগিয়াই আছে। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মশক্তির অভাব ও অকালমৃত্যু ঘটে। তবে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই অসুবিধাগুলি দুরপনেয় নয়। যেমন, তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কারখানাগুলিতে গ্রীষ্মতাপের অসহ্য অবস্থার অবসান করা সম্ভব এবং ব্যাধির প্রতিরোধ উপশমের ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিককে অকাল মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানির হাত হইতে রক্ষা করা সাধ্যাতীত নহে।

তৃতীয়ত, শ্রমিকের দক্ষতার উপর তাহার মজুরির প্রভাবও যথেষ্ট। মজুরির পরিমাণ দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়। এই জীবনযাত্রার মান আবার

* Graham Hutton, We Too Can Prosper.

† The Report of Labour Investigation Committee, 1946-এর ৩৮২ পৃষ্ঠা।

কর্মশক্তি ও উৎপাদন-ক্ষমতাকে প্রভাবান্বিত করে। ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের মজুরি সুস্থ ও সবল জীবনযাপনের পক্ষে অপ্রচুর। দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিজনগণের প্রতিপালনের দুশ্চিন্তা ও খাদ্যপুষ্টির অভাব সহজেই শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে পংগু করিয়া দেয়, এবং নানাপ্রকারের ব্যাধি ও হীন-স্বাস্থ্য তাহার দেহকে আশ্রয় করিয়া বসে। বলা হয় যে, শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অভাবই হইল স্বল্প মজুরির প্রকৃত কারণ। কিন্তু আবার ইহাও বলা যায় যে, স্বল্প মজুরিই কর্মদক্ষতার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে, যে-সকল স্থানে উপযুক্ত মজুরি প্রদানের দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা হইয়াছে সে-সকল স্থানে শ্রমিকের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আমেদাবাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বেও বোম্বাই-এর শ্রমিকের তুলনায় আমেদাবাদের শ্রমিকের উৎপাদনের পরিমাণ কম ছিল; এবং তাহারা বোম্বাই-এর শ্রমিক অপেক্ষা গড়ে কম উৎপাদন করিত। কিন্তু সম্প্রতি আমেদাবাদের শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় দেখা গিয়াছে যে তাহারা বোম্বাই-এর শ্রমিকগণ অধিক উৎপাদন করিতেছে।*

৩। স্বল্প মজুরি

চতুর্থত, ভারতীয় শ্রমিককে যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লইয়া কার্য করিতে হয় তাহা মোটেই উৎকৃষ্ট ধরনের নয়। স্বভাবতই শ্রমিকের উৎপাদন-দক্ষতা ব্যাহত হয় এবং তুলনামূলকভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়।

৪। নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও স্বল্প উৎপাদনের কারণ

পঞ্চমত, কারখানাগুলির আভ্যন্তরীণ পরিবেশ অধিক উৎপাদনের অনুকূল নহে। প্রায় কারখানাতেই আলোবাতাস অপ্রচুর, অধিক গ্রীষ্ম বা অধিক শীতের হাত হইতে শ্রমিককে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই। শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদির ত্রুটিও রহিয়াছে যথেষ্ট। পানীয় জল, স্বল্প মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা, স্নানাগার প্রভৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ কারখানা উদাসীন। সংশ্লিষ্ট শিল্প হইতে যে-সমস্ত ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যেও শৈথিল্য দেখা যায়। স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা করিবার বা ঔষধাদি সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা অনেক কারখানাই করে না। অবশ্য সম্প্রতি সরকার এইগুলির প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতেছে।

৫। কারখানাগুলির পরিবেশও অধিক উৎপাদনের অনুকূল নয়

ষষ্ঠত, শিল্প-শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহাদির অভাব শ্রমিকের দক্ষতার আর একটি প্রধান অন্তরায়। অধিকাংশ স্থানেই শ্রমিকরা অস্বাস্থ্যকর বস্তি প্রভৃতিতে বসবাস করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে এক দিকে যেমন তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হয়, অপরদিকে তেমনি নৈতিক চরিত্রেরও অবনতি ঘটে। অধুনা সরকার এ-বিষয়েও দৃষ্টি দিতেছে।

৬। স্বাস্থ্যকর বাসগৃহাদির অভাবও উৎপাদনশক্তি ব্যাহত করে

* D. R. Gadgil, Regulation of Wages and the Problem of Industrial Labour in India-এর ৮৫ পৃষ্ঠা।

সপ্তমত, শিল্প-শিক্ষা বা কারিগরি দক্ষতার (technical skill) অভাব ও নিরক্ষরতা শ্রমিকের অদক্ষতার আর একটি কারণ। কারখানাগুলিতে নিরক্ষরতা দূরিকরণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলন বহুদিন হইতেই হইয়া আসিতেছে। মালিক এবং শ্রমিক উভয়েরই উদাসীনতার জন্য বিশেষ কোন সুফল ফলে নাই। বর্তমানে কারিগরি দক্ষতাপ্রসারের ব্যবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নয়।

৭। শিক্ষার অভাব আর একটি প্রতিবন্ধক

পরিশেষে, শিল্প-পরিচালনার মধ্যেও যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে যাহার জন্য শ্রমিকের কর্মদক্ষতা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। সর্বত্র না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প-পরিচালকবর্গের অদূরদর্শিতা, অসহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিভংগি ও ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা শিল্পোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে স্বল্প খরচায় অধিক উৎপাদনের মূলে রহিয়াছে সুদক্ষ পরিচালনা।

৮। শিল্প-পরিচালনার ত্রুটি শ্রম-দক্ষতা হ্রাস করে

উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির কথা স্মরণ করিয়াই শ্রম অনুসন্ধান কমিটি মন্তব্য করিয়াছে, "যখন দেখি যে অন্য দেশের তুলনায় এদেশের কার্যের সময় অধিক, বিশ্রামের ব্যবস্থা স্বল্প, শিল্পগত শিক্ষার সুযোগ অ-পর্যাপ্ত, খাদ্য ও কল্যাণকর ব্যবস্থাদি নিকৃষ্ট এবং মজুরির হার নিম্ন, তখন আমরা তথাকথিত অদক্ষতার কারণ হিসাবে শ্রমিকের স্বাভাবিক বুদ্ধি বা ক্ষমতার অভাবকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না"।

শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নের পন্থা (Measures for Improving Efficiency of Labour)ঃ শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নেয় জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে মালিক, সরকার এবং শ্রমিক নেতাদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। প্রথমত, সাধারণ ও শিল্প শিক্ষার (technical education) ব্যাপক প্রসারের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

১। সাধারণ ও শিল্প-শিক্ষার প্রসার

দ্বিতীয়ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে। ফ্যাক্টরী আইনে আলোবাতাস ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিভিন্ন নিয়মাবলী আছে। ঐগুলি যাহাতে যথাযথভাবে বলবৎ করা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে নিয়মিত-ভাবে পরিদর্শকগণ কারখানা পরিদর্শন করেন এবং কারখানাগুলিতে কার্যের সর্তাদি মানবোচিত হয় তাহা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শ্রমিক-কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ প্রতিটি কারখানাতেই বিশেষভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন।

২। সুস্থ ও সবল আভ্যন্তরীণ পরিবেশ

তৃতীয়ত, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। বিশেষত, শিল্পগত ব্যাধির (occupational diseases) প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কারখানা বা খনিগুলিতে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা এবং আঞ্চলিক হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক।

৩। স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা

চতুর্থত, শ্রমিকদের খাদ্যপুষ্টির প্রতি যত্ন লইতে হইবে। অবশ্য খাদ্যপুষ্টির প্রশ্ন দেশের খাদ্য-সমস্যার সহিত জড়িত। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য 'ক্যান্টিনে'র ব্যবস্থা করিয়া স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইরূপ 'ক্যান্টিনগুলি' শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রিয়। এই ক্যান্টিন-ব্যবস্থার সাহায্যে একদিকে যেমন খাদ্যপুষ্টির সমস্যাকে কতকাংশ সহজ করা যাইতে পারে, অপরদিকে তেমনি মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য গৃহে গমনাগমন হইতে অব্যাহতি দিয়া সময়সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। ডাঃ আকরয়ড (Dr. Aykroyd) ক্যান্টিনগুলির উপযোগিতা অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন যে, উপযুক্তভাবে ক্যান্টিনগুলির প্রসারসাধন করিতে পারিলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যপুষ্টি সত্যই উন্নতিলাভ করিবে।*

৪। খাদ্যপুষ্টি

পঞ্চমত, শ্রমিকদের দক্ষতার সহিত সম্পর্কিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল শ্রমিকদের বাসগৃহের সমস্যা। কয়েকটি স্থান ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বসবাস করিতে হয়। এই বস্তিগুলি যে মানুষের মোটেই বসবাসযোগ্য নয় তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গৃহাভাবের ফলে শ্রমিক পরিজনবর্গের সহিত স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনযাত্রার সুস্থ পরিবেশ হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং শ্রমিকদের জন্য অধিকসংখ্যক উপযুক্ত ধরনের গৃহনির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে মালিক, সরকার ও পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। গৃহনির্মাণ সম্পর্কে যে-সমবায় আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে তাহাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থসাহায্য এবং ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।**

৫। বাসগৃহের সুবন্দোবস্ত

ষষ্ঠত, শ্রমিকের আয়বৃদ্ধি ব্যতীত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির কোন আশা নাই। ভারতীয় সংবিধানে জীবনধারণোপযোগী মজুরি নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। যে-সমস্ত শিল্পে মজুরির হার অত্যল্প সে-সমস্ত স্থানে মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্বনিম্ন মজুরি আইন পাসের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মজুরির ন্যূনতম হার ধার্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ-আইন এখনও ব্যাপকভাবে কার্যকর হয় নাই। উপরন্তু, কিভাবে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা যায় তাহাও এক সমস্যা। অবশ্য এ-ব্যাপারে একদিকে যেমন শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন, তেমনি অপরদিকে তাহার উৎপাদনশীলতার কথাও মনে রাখিতে হইবে। সর্বনিম্ন মজুরির পরে

৬। আয়বৃদ্ধি

* The Report of the Bombay T. L. E. Committee.

** 'Labour in the Plan' [The Publications Section].এর ১৮-২১ পৃষ্ঠা এবং Second Five Year Plan-এর ৫৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা ।

উৎপাদনানুযায়ী মজুরি প্রদানের পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। উৎপাদন-ক্ষমতাকে নানাভাবে বৃদ্ধি করিয়া তাহার মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টাও করিতে হইবে। শ্রম-উৎপাদন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে এ-দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

উৎপাদনশীলতা পরিষদ গঠন

দেশব্যাপী উৎপাদনবৃদ্ধির মনোভাব সৃষ্টি ও উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (National Productivity Council) নামে ১৯৫৮ সালে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের ১১ জন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদ গঠিত। কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী পরিষদের সভাপতি। ১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই পরিষদ বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রে ৩০টি স্থানীয় পরিষদ (local councils) এবং কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কানপুর ও বাংগালোরে পাঁচটি আঞ্চলিক দপ্তর (regional directorates) স্থাপন করিয়াছে।*

৭। পরিচালনার উন্নয়ন

সপ্তমত, সুদক্ষ পরিচালনা যাহাতে নিশ্চিত হয় তাহার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। 'শিল্পাভ্যন্তরীণ' শিক্ষা (training within industry) প্রবর্তনের দ্বারা তত্ত্বাবধান বা পরিচালনদক্ষতার উন্নতিসাধন করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আমেদাবাদ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষামূলক কার্য চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে ইহাতে বিশেষ সুফল ফলে।

উৎপাদনশীলতার স্বার্থে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও উহার বিপদ

এই শ্রম উৎপাদনশীলতার শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের (rationalisation) প্রশ্নও অংগাংগিভাবে জড়িত। অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্তমানে ভারতে বেকারাবস্থা যে-ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ইহাতে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। সুতরাং যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সীমাবদ্ধভাবে র‍্যাসানালাইজেশনের কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এই নীতিই ঘোষিত হইয়াছে।** ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন দ্বিতীয় পরিকল্পনার নীতিকে সমর্থন করিয়া অভিমত প্রকাশ করে যে পুনর্গঠনের সময় ছাঁটাই বা মজুরি হ্রাস করা চলিবে না। র‍্যাসানালাইজেশনের ফলে যে সুবিধা পাওয়া যাইবে তাহা যেন শ্রমিক, মালিক ও সমাজ সমভাবে ভোগ করিতে পায়।†

---

* ৩৫৭-৩৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** Second Five Year Plan-এর ৫৮১ পৃষ্ঠা।

† West Bengal Labour Gazette, August, 1957.

অষ্টমত, শ্রমিকদের মধ্যে ঋণগ্রস্ততা তাহাদের স্বাস্থ্য ও দক্ষতার উপর প্রতিক্রিয়া বিস্তার না করিয়া পারে না। তাহাদের আয়ের একটা অংশ ঋণের খাতে চলিয়া যায়; ফলে স্বভাবতই তাহাদিগকে সাংসারিক ব্যয়সংকোচ করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতা বা অদূরদর্শিতা দায়ী হইলেও ঋণগ্রস্ততার মূল কারণ হইল আয়ের অপ্রতুলতা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা। যাহা হউক, ঋণগ্রস্ততার হাত হইতে শ্রমিককে সংরক্ষণ করিতে হইবে। আয়বৃদ্ধি, আইন প্রণয়ন ও সমবায়ের ব্যাপক প্রবর্তনের সাহায্যে এই সমস্যার পূর্ণাংগ সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।*

৮। শ্রমিকের ঋণগ্রস্ততার প্রতিকার

নবমত, ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শিল্পাঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যায় স্থায়ী শ্রমিক দল গড়িয়া উঠে নাই। অতএব নানাভাবে শিল্পাঞ্চলের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া শ্রমিকদিগকে শিল্পকেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট করিতে হইবে।

৯। শিল্পাঞ্চলের আকর্ষণ বৃদ্ধি

দশমত, অধিক মাত্রায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক (social security) ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া শ্রমিককে বৃদ্ধাবস্থা বা অন্যান্য অকাম্য অভাবাবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

১০। সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা

পরিশেষে, ভারত বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। অতএব শ্রমিকদের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে যে, এই বিরাট পরিকল্পনা তাহাদের স্বার্থে পরিচালিত এবং শিল্পনীতি নির্ধারণে তাহাদের মতামতের মূল্য রহিয়াছে। শিল্পের সহিত তাহাদের একাত্মবোধ জাগাইতে না পারিলে শ্রমিক তাহার কর্মশক্তির সম্ভাবনাকে কার্যকর করিবে না। সুতরাং শ্রমিককে ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এ-সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

১১। শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনায় অংশপ্রদান

শিল্প-সম্পর্ক (Industrial Relations): শিল্প-সম্পর্ক বলিতে বুঝায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক। আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার মালিক হইল দুই শ্রেণীর—সরকার ও ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিগণ। সুতরাং শ্রমিকের সংগে দুই প্রকার মালিকেরই সম্পর্কের আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনা প্রধানত করা হয় শিল্পক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা শিল্প-বিরোধের দিক দিয়া। নিম্নে তাহাই করা হইতেছে।

শিল্প-বিরোধ (Industrial disputes): শিল্পক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পোৎপাদনবৃদ্ধির একটি প্রধান সর্ত। শ্রমিককে যথাসম্ভব স্বল্প মজুরি দিয়া উৎপাদনের ব্যয়সংক্ষেপ করাই মালিকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি;

---

* Report of the Rege Committee-৩৬৯ পৃষ্ঠা

অপরপক্ষে শ্রমিকদের চেষ্টা হইল মজুরির হার বৃদ্ধি ও কার্যের সুবিধাজনক সর্ত আদায় করা। এই দুই দলের বিপরীতগামী স্বার্থের ফলেই দেখা দেয় শিল্পজগতে সংঘর্ষ ও বিশৃংখলা। কিন্তু ক্রমাগত যদি মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে তবে দেশের সামগ্রিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, ইহার ফলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়; এবং ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায়, শ্রমিকদেরও দুর্দশা বাড়িয়া যায়, তাহাদের আয় কমিয়া যায়; এবং অনেক ক্ষেত্রেই কর্মরত শ্রমিকগণ কর্মচ্যুত হইয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সুতরাং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ককে সহজ, সরল ও শান্তিপূর্ণ করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষত ভারত যখন পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে তখন শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহযোগিতার মনোভাব উদ্রেকের জন্য সকলপ্রকার প্রচেষ্টাই করা কর্তব্য। উদার দৃষ্টিভংগি ও উপযুক্ত সংগঠনের সাহায্যে শিল্প-বিরোধের সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করা হইলে সুফল ফলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শান্তিপূর্ণ শিল্প-সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা

ভারতে শিল্প-বিরোধের গতি (Trends in Industrial Disputes in India): শিল্প-বিরোধ বহু পূর্ব হইতে দেখা দিলেও উহা ব্যাপক আকার ধারণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তারপর বিশ্বযুদ্ধের সুরু অবধি শিল্প-বিবাদ সমতালে চলিতে থাকে। যুদ্ধের মধ্যে কতকটা হ্রাস পাইলেও যুদ্ধ অবসান এবং স্বাধীনতালাভের সংগে সংগে শিল্প-বিরোধ আবার বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দেখা যায় যে, স্বাধীনতালাভের বৎসরেই সর্বাধিকসংখ্যক শিল্প-বিবাদও উহার ফলে সর্বাধিক ক্ষতি হয়। ঐ সালে বিরোধের সংখ্যা ছিল ১,৮০০-র উপর এবং ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ কার্যের দিন (man-days)। শিল্প-বিরোধের এইরূপ অভূতপূর্ব বৃদ্ধির মূলে ছিল বিভিন্ন কারণ যথা, স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে শ্রমিকদের আগ্রহ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের আর্থিক দুর্দশা, যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি অপসারিত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সুবিধা, ইত্যাদি।

শিল্প-বিরোধ বৃদ্ধি ও ইহার কারণ

অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সরকার সাময়িক 'শিল্পীয় শান্তি চুক্তির' (Industrial Truce Agreement) সাহায্যে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করে। ইহা ব্যতীত শ্রমিক আন্দোলনের ফলে মজুরিও কতকটা বৃদ্ধি পায়, এবং সংগে সংগে শিল্প-বিরোধ আইনকানুনগুলির মাধ্যমে কার্যকরীভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। এই সমস্তের ফলে শিল্পগত সম্পর্কে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ১৯৫৫ সালে কিন্তু অবস্থা আবার অবনতির দিকে যায় এই কারণে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে শিল্প-সম্পর্কের উন্নতির জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহাদের মধ্যে শিল্পে নিয়মানুবর্তিতার ব্যবস্থা (Code of Discipline), বিভিন্ন শ্রমিক-

সংঘের মধ্যে সুসম্পর্ক নির্ধারণের প্রচেষ্টা (Code of Conduct), শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনায় অধিকার প্রদান, শিল্প-বিরোধ আইনের সংশোধন, বেতন কমিশন (Pay Commission) নিয়োগ ইত্যাদিই প্রধান। ইহাদের ফলে ১৯৫৯ সালে আবার শিল্প-বিবাদ বেশ কিছু প্রশমিত হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে শিল্প-বিরোধের অবস্থা অনুধাবনের জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া হইল:

শিল্প-বিরোধ ১৯৪৭-৫৯*

সাল	বিরোধের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা (হাজারে)	বিরোধের ফলে কার্যের দিন নষ্ট হইয়াছে (হাজারে)
১৯৪৭	১,৮১১	১৮,৪১	১৬৫,৬৩
১৯৪৮	১,২৫৯	১০,৬০	৭৮,৩৭
১৯৪৯	৯২০	৬,৮৫,৪৬৫	৬৬,০০,৫৯৫
১৯৫০	৮১৪	৭,১৯,৮৮৩	১,২৮,০৬,৭০৪
১৯৫১	১,০৭১	৬,৯২	৩৮,১৯
১৯৫২	৯৬৩	৮,১০	৩৩,৩৭
১৯৫৩	৭৭২	৪,৬৭	৩৩,৮৩
১৯৫৪	৮০৪	৪,৭৭	৩৩,৭৩
১৯৫৫	১,১৬৬	৫,২৮	৫৬,৮০
১৯৫৬	১,২০৩	৭,১৫	৬৯,৯২
১৯৫৭	১,৬৩০	৮,৮৯	৬৪,২৯
১৯৫৮	১,৫২৪	৯,২৯	৭৭,৯৮
১৯৫৯ অক্টোবর মাস পর্যন্ত	১,২৩৬	৫,৩৩	৪৬,৮৫

শিল্প-বিরোধের কারণ (**Causes of Industrial Disputes**): শিল্প-বিরোধের অন্যান্য কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণই হইল প্রধান। শ্রম-কমিশনের কথা উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট ঘটে নাই যাহার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান নাই। অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে প্রথমেই আসে মজুরি ও বোনাসের প্রশ্ন। গত বিশ্বযুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপরদিকে শ্রমিকদের মজুরি পূর্বের তুলনায়

১। শিল্প-বিরোধের প্রধান কারণ হইল অর্থনৈতিক—মজুরিবৃদ্ধি ও বোনাস আদায়ের জন্য আন্দোলন

* Indian Labour Gazette, January 1960.

বৃদ্ধি পাইলেও উহা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। স্বভাবতই শ্রমিকরা মজুরিবৃদ্ধি ও বোনাস বা লভ্যাংশের জন্য আন্দোলন করিতে থাকে এবং ফলে দেখা দেয় শিল্প-বিরোধ। বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি মজুরিবৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শ্রমিকের পক্ষে অকাম্য হয়। কারখানা আইনের নিয়মকানুনগুলিও অনেক ক্ষেত্রে মালিকগণ মানিয়া চলেন না। শ্রমিকরা অধিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য মালিকের সহিত বিরোধে লিপ্ত হয়। অত্যধিক সময় শ্রম করানর জন্যও বহু শিল্প-বিরোধ হইয়াছে। বর্তমানে অবশ্য কারখানা আইনে কার্যের সময় সপ্তাহে অনধিক ৪৮ ঘণ্টায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়ত, ছাঁটাই ও শ্রমিকের আচরণের প্রশ্ন লইয়াও শিল্প-বিরোধ দেখা দেয়। মালিক শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিবার অবাধ অধিকার দাবি করে; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে।

২। কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ, অত্যধিক শ্রম ইত্যাদি

৩। ছাঁটাই ও শ্রমিক আচরণের প্রশ্ন লইয়াও শিল্প-বিরোধ দেখা দেয়

চতুর্থত, শ্রমিকদের মধ্যে একটা সাধারণ অসন্তোষ ও হতাশার ভাবও রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল তাহাদের আর্থিক দুরবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, নিয়োগের অস্থায়িত্ব বেকারাবস্থা এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব। যে-কোন সময় এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। বিশেষত বর্তমানে শ্রমিকরা তাহাদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর সচেতন এবং শ্রমিক-সংঘকে শক্তিশালী করিয়া নিজেদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায় করিয়া লইতে আগ্রহশীল।

৪। শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ অসন্তোষ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ

অনেক সময় শ্রম-বিরোধের পশ্চাতে রাষ্ট্রনৈতিক কারণও বর্তমান থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক সময় শ্রমিকদের ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু শিল্প-মালিকরা যেভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে তাহা ঠিক নহে। কোন অর্থনৈতিক কারণে অসন্তোষ বর্তমান না থাকিলে মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ব্যাপক ধর্মঘট সাধারণত হয় না। শ্রম-কমিশন বহু পূর্বে যে-উক্তি করিয়া গিয়াছে তাহা বর্তমান অবস্থাতেও প্রযোজ্য। কমিশন বলিয়াছে, "ধর্মঘট ব্যাপারে শিল্পের সহিত অসম্পর্কিত কারণগুলিকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় ঐগুলি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়······ব্যবসায়-বাণিজ্য, জাতীয়তাবাদ বা কমিউনিষ্ট মতবাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হয়ত' আন্দোলনকারীরা শ্রমিকদের প্ররোচিত করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় নাই।"

৫। রাষ্ট্রনৈতিক কারণ—ইহা অর্থনৈতিক কারণের উপর নির্ভরশীল

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে-সকল শিল্প-বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার মোটামুটি শতকরা কত ভাগ কোন্ কোন্ কারণের জন্য তাহা নিম্নের ছকটি হইতে বুঝা যাইবে :

বিভিন্ন কারণ	শতকরা হার
মজুরি ও ভাতা	৩২·০
বোনাস	৭·০
ছাঁটাই, শ্রমিকের আচরণ ইত্যাদি	৩৫·০
ছুটি ও কার্যের সময়	১০·০
অন্যান্য কারণ	১৬·০
	১০০·০

শিল্প-বিরোধের প্রতিরোধ এবং মীমাংসা (Prevention and Settlement of Disputes) : শিল্পে শান্তিরক্ষাকল্পে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। প্রথমত, শ্রমিক ও মালিক উভয়ের সম্মতিক্রমে শিল্প-বহির্ভূত কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যস্থতা বা সালিসির (arbitration) মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, স্বেচ্ছামূলক আপোষের (voluntary conciliation) ব্যবস্থা থাকিতে পারে। যেমন, দৈনন্দিন ছোটখাট বিরোধগুলি মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিষদ সহজেই মিটাইয়া ফেলিতে পারে—এমনকি ব্যাপক শিল্প-বিরোধকেও প্রতিরোধ করিতে পারে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শিল্প-আদালত বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে সালিসী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শিল্প-বিরোধ প্রতিরোধ ও মীমাংসার বিভিন্ন উপায়

শিল্প-বিরোধ আইন (Industrial Disputes Acts) : ১৯২১ সালে বাংলায় ও বোম্বাই-এ শিল্প-বিরোধ দূরিকরণের উপায় সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হয়। বাংলার কমিটি আইনের মাধ্যমে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে এবং সংযুক্ত 'কার্য-সংসদের' (Works Committees) সাহায্যে বিবাদ-মীমাংসার জন্য সুপারিশ করে। বোম্বাই কমিটি মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া 'অনুসন্ধান কোর্ট' (Courts of Enquiry) গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা : ১। বোম্বাই ও বাংলায় সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা

১৯২৮-২৯ সালের মধ্যে শিল্প-বিরোধের অবস্থায় বিশেষ অবনতি ঘটে। ফলে ১৯২৯ সালের ভারতীয় শিল্প-বিরোধ আইন পাস হয়। এই আইনটিতে যে-ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: স্থানীয় সরকার এবং যে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রেল-কোম্পানী নিয়োগকর্তা সে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট যে-কোন বিষয়কে 'অনুসন্ধান কোর্ট' (Court of Enquiry) অথবা 'আপোষ বোর্ডের (Board of Conciliation) নিকটে পেশ করিতে পারিত। বিবদমান দল দুইটি ঐরূপ করিবার জন্য আবেদন জানাইলে সরকারকে এই পন্থা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইত।

২। ১৯২৯ সালের শিল্প-বিরোধ আইন

অনুসন্ধান কোর্ট ও আপোষ বোর্ড

অনুসন্ধান কোর্ট এক বা একাধিক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইত। আপোষ বোর্ডে একজন নিরপেক্ষ সভাপতি (Chairman) এবং দুই বা চার জন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা দুই দলের প্রতিনিধি থাকিতেন; অথবা মাত্র একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইতে পারিত।

অনুসন্ধান কোর্টের কার্য ছিল যে-সমস্ত বিষয় উহার নিকট পেশ করা হইত তাহার অনুসন্ধান করা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করা। অপরপক্ষে আপোষ বোর্ড দুই দলের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিত, এবং এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইলে বোর্ড নিয়োগকারী সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিত।

১৯২৯ সালের এই আইনটিতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান (public utility concerns) এবং অন্যান্য শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। জনস্বার্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মালিকের ১৪ দিনের নোটিশ না দিয়া কোন ধর্মঘট করা যাইত না। ১৯২৭ সালের ব্রিটিশ শিল্প-বিরোধ আইনের অনুকরণে রচিত ভারতীয় আইনটিতে সাধারণ ধর্মঘট বা সাধারণ কারখানাবন্ধকে (lock-out) নিষিদ্ধ করা হয়।

ধর্মঘটের অধিকারকে সীমাবদ্ধকরণ

এই আইনটির তীব্র সমালোচনা করা হয়। শ্রম সম্পর্কিত রয়াল কমিশন মন্তব্য করে যে, ভারতীয় আইনটি গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবস্থার অধিক মূল্যবান অংশকে পরিহার করিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশকে গ্রহণ করিয়াছে।* বিবাদ সুরু হইতে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার সাহায্যে মীমাংসা করিবার জন্য কোন আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা এই আইনে করা হয় নাই; অবশ্য ১৯৩৮ সালে 'আপোষ-কর্মচারী' (Conciliation Officers) নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

আইনটির ত্রুটি: বিবাদ-মীমাংসার কোন আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করা হয় নাই

* The Report of the Royal Commission on Indian Labour-এর ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

ঐ সালেই বোম্বাই-এ যে শিল্প-বিবাদ আইনটি পাশ করা হয় তাহাতেই প্রথম ভারতে 'শিল্প-আদালত' (Industrial Court) প্রবর্তিত হয়। ধর্মঘট কিংবা কারখানা বন্ধ করিবার পূর্বে নোটিশ প্রদান প্রভৃতি কতকগুলি পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়।

৩। ভারতে প্রথম 'শিল্প-আদালত' প্রবর্তন

ইহার পর ১৯৪৬ সালে বোম্বাই-এর শিল্প-সম্পর্ক আইন পাস হয়। এই আইনে আবশ্যিকভাবে সালিসির ব্যবস্থা করা হয়। জনশৃংখলা ব্যাহত অথবা সর্বসাধারণের বিশেষ অসুবিধা বা সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইবার আশংকা আছে বলিয়া মনে করিলে সরকার, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে-কোন বিবাদকে শিল্প-আদালতের (Industrial Court) নিকট পেশ করিতে পারিত।

৪। ১৯৪৬ সালের বোম্বাই-এর শিল্প-সম্পর্ক আইন ও আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থা

সর্ব-ভারতীয় দিক হইতে দেখিলে ১৯২৯ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের (Trade Disputes Act, 1929) পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্প-সংঘর্ষ সংক্রান্ত কোন আইনই পাস করা হয় নাই। যুদ্ধের সময় শিল্প-বিবাদ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ব্যাপক আপৎকালীন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষা নিয়মাবলী (Defence of India Rules) অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিরক্ষা, জনশৃংখলা সংরক্ষণ, জনসাধারণের নিরাপত্তা, সম্যকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা প্রভৃতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধকে নিষিদ্ধ করিতে পারিত।*

যুদ্ধের সময় শিল্প-বিবাদ নিয়ন্ত্রণ

১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন (Industrial Disputes Act, 1947) ঃ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই শিল্প-বিবাদ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিল্প-বিরোধ আইন (Industrial Disputes Act, 1947) প্রবর্তন করে। এই কেন্দ্রীয় আইনটি উল্লিখিত ১৯৪৬ সালের বোম্বাই-এর আইনের অনুকরণে রচিত হয়। শিল্প-বিবাদ প্রতিরোধ (prevention) এবং মীমাংসা (settlement) উভয়ের ব্যবস্থাই এই আইনের দ্বারা করা হয়। আইনের প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইল এইরূপ :

বিরোধ প্রতিরোধ ও মীমাংসা উভয়ের ব্যবস্থা

(১) মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যাহাতে আলাপ-আলোচনার মনোভাব গড়িয়া উঠে তাহার জন্য 'কার্য-সংসদ' (Works Committees) গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই 'কার্য-সংসদ' মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। ১০০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এমন যে-কোন শিল্প-মালিককে কার্য-সংসদ গঠন করিবার নির্দেশ প্রদান করা যাইতে পারে। বলা হয় যে 'কার্য-সংসদ' আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া দৈনন্দিন বিবাদগুলির

ক। কার্য সংসদের মাধ্যমে প্রতিরোধ

* The Indian Labour Year Book (1952 53)-এর ১৭০ পৃষ্ঠা।

মীমাংসা করিয়া শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করিবে। (২) এই আইন অনুসারে আবার সংশ্লিষ্ট সরকার বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে আপোষ কর্মচারী (Conciliation Officers) নিয়োগ এবং আপোষ বোর্ড (Boards of Conciliation), অনুসন্ধান কোর্ট (Court of Enquiry) ও শিল্প ট্রাইব্যুনাল (Industrial Tribunals) গঠন করিতে সমর্থ হয়।

খ। অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে মীমাংসা

১৯৪৭ সালের শিল্প-বিবাদ আইনে উক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে তিন পর্যায়ে শিল্প-বিবাদ প্রতিরোধ ও মীমাংসার ব্যবস্থা হয় যথা—প্রথম পর্যায়ে কার্য-সংসদের মাধ্যমে বিরোধ প্রতিরোধের (prevention) প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় পর্যায়ে আপোষ কর্মচারী ও আপোষ বোর্ডের মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলক সালিসির (voluntary arbitration) ব্যবস্থা এবং তৃতীয় পর্যায়ে শিল্প-ট্রাইব্যুনাল আদালতের মাধ্যমে আবশ্যিক সালিসির (compulsory arbitration) ব্যবস্থা।

বিবাদ মীমাংসার তিনটি পর্যায় : ১। প্রতিরোধ, ২। স্বেচ্ছামূলক সালিসি, ৩। আবশ্যিক সালিসি,

শিল্প-বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দিলেই কার্য-সংসদ সক্রিয় হইয়া উঠে ; উহা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-বিবাদ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করে। প্রতিরোধ সম্ভব না হইলে আপোষ কর্মচারী দুই পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করে। আপোষ কর্মচারীর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইলে সরকার আপোষ বোর্ডের মাধ্যমে মিটমাটের আর একবার চেষ্টা করিতে পারে। আপোষ বোর্ডও বিফলকাম হইলে বিবাদটি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রথমে উহাকে অনুসন্ধান কোর্টের নিকট এবং পরে সংগৃহীত তথ্যাদি সহ শিল্প-আদালতের নিকট প্রেরণ করা হয়। শিল্প-আদালতের নিষ্পত্তি রায় (award) বাধ্যতামূলক। এইজন্যই শিল্প-আদালতের বিচারকে 'আবশ্যিক সালিসি' বলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সরকার অবশ্য ৩০ দিনের মধ্যে এই রায়কে প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তন করিতে পারে।

জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান (public utility services) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিবাদ আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সকল বিবাদকেই আপোষের জন্য সরকারকে পেশ করিতে হয়; কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বেলায় সরকারের স্বাধীনতা রহিয়াছে। তবে যে-ক্ষেত্রে দুই পক্ষই বিবাদকে বোর্ড কিংবা কোর্ট বা ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আবেদন জানায় সে-ক্ষেত্রে সরকার উহা করিতে বাধ্য থাকে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট কিংবা কারখানা বন্ধের নোটিশ দেওয়া হইলে সরকার উহাকে বাধ্যতামূলকভাবে ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রেরণ করে।

আইনে জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধ সম্পর্কে আইনে কতকগুলি বাধানিষেধ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া

আছে। প্রথমত, উপযুক্ত পদ্ধতিতে নোটিশ না দিয়া অথবা বিবাদ আপোষ কর্মচারীর বিবেচনাধীনে থাকাকালীন জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ করা বেআইনী। দ্বিতীয়ত, যখন কোন বিষয় সম্পর্কে আপোষ বোর্ড অথবা শিল্প ট্রাইব্যুনালের বিচার-বিবেচনা চলিতে থাকে অথবা যখন কোন চুক্তি বা রায় কার্যকর থাকে তখন কোনপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ করা যায় না।

ধর্মঘট ও কারখানা বন্ধ সম্পর্কে বাধা-নিষেধ

১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের চার দফা সংশোধন

১৯৪৭ সালে পাস হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত উপরি-উক্ত আইনটির বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা হইয়াছে। প্রথমত, ১৯৪৯ সালের শিল্প-বিবাদ (ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী) আইন [Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949] দ্বারা ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানী সম্পর্কে বোর্ড, কোর্ট বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হস্ত হইতে লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণ হইল ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা ব্যাপারে ঐক্যসাধন করা।

১। ১৯৪৯ সালের ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী সংক্রান্ত সংশোধন

দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ সালের শিল্প-বিরোধ (আপিল-ট্রাইবুনাল) আইন (Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 1950] দ্বারা আপিল-ট্রাইব্যুনাল (Appellate Tribunal) সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন শিল্প আদালত, কোর্ট, শিল্প মজুরি বোর্ড প্রভৃতির রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই আপিল-ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাইত।* ১৯৫০ সালের এই আইনটি পাস করিবার মূলে ছিল দুইটি কারণঃ (ক) বিভিন্ন রাজ্যের ট্রাইব্যুনালগুলি পরস্পরবিরোধী রায় প্রদান করিতেছিল বলিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতেছিল; এবং (খ) আপিল করিবার কোন উচ্চতর সংস্থা না থাকায় ট্রাইব্যুনালগুলি যথেচ্ছভাবে কার্য করিতে সুযোগ পাইত।

২। ১৯৫০ সালে আপিল-ট্রাইব্যুনালের প্রতিষ্ঠা ও ইহার কারণ

১৯৫৩ সালে শিল্প-বিরোধ আইনটির আর এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন অনুসারে ৫০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্তকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাময়িক শ্রমিক ব্যতীত অন্য শ্রমিককে বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া, বসাইয়া রাখিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। আবার ন্যূনতম এক বৎসরব্যাপী অবিচ্ছিন্নভাবে কার্য করিতেছে এমন কোন শ্রমিককে এক মাসের নোটিশ বা তদ্‌পরিবর্তে এক মাসের মজুরি এবং যে কয় বৎসর সে কার্য করিয়াছে সেই কয় বৎসরের জন্য প্রতি ১৫ দিনের বেতন না দিয়া ছাঁটাই করা যায় না।

৩। ১৯৫৩ সালের সংশোধন

* ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা এই আপিল-ট্রাইব্যুনাল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিল্প-বিরোধ আইনটির উপরি-উক্ত তিন দফা সংশোধন সত্ত্বেও শিল্প-বিবাদ প্রতিরোধ ও মীমাংসার সামগ্রিক ব্যবস্থা নানাভাবে সমালোচিত হয়। প্রথমত, সমগ্র দেশে একপ্রকারের আইন প্রচলিত ছিল না। ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য আইন প্রণয়ন করিয়াছিল। ফলে শিল্প-বিরোধ আইনে বিভিন্নতা এবং বিশৃংখলা দেখা গিয়াছিল।

সমালোচনা: ক। সমগ্র দেশে এক প্রকারের আইন প্রচলিত না থাকার দরুন বিশৃংখলা

দ্বিতীয়ত, আবশ্যিকভাবে সালিসির ব্যবস্থা অকাম্য বলিয়া মনে করা হয়। যুদ্ধ বা তদনুরূপ সময়ে আবশ্যিক মীমাংসার ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা হইলেও অন্যান্য সময়ে ঐ ব্যবস্থার সমীচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। বলা হয় যে, ইহাতে স্বেচ্ছামূলকভাবে বিবাদ মীমাংসার মনোভাব গড়িয়া উঠে না; এবং সুস্থ ও সবল শ্রমিক-সংঘও প্রসারলাভ করে না। বরঞ্চ ইহাতে ট্রাইব্যুনাল আদালতের নিকট মামলা করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সর্বদা মনোমালিন্যের ভাব বর্তমান থাকায় শিল্পজগতে আবহাওয়া দূষিত হইয়া পড়ে।

খ। আবশ্যিকভাবে মীমাংসার ব্যবস্থা শিল্প-শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে

তৃতীয়ত, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহায়সম্বলহীন শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিবাদ জানাইবার একমাত্র অবলম্বন হইল ধর্মঘট। এই ধর্মঘটকে অকার্যকর করিয়া আইন শ্রমিকদের প্রতি অবিচার করিয়াছে, তাহাদের অসহায় অবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।* পরিশেষে সালিসির জন্য শিল্প-সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব হওয়ায় অনেক সময় সালিসীদের রায় অবান্তর হইয়া পড়ে।

গ। অন্যান্য ত্রুটি

সরকারও ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিবাদ আইনটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে উহা ১৯৫০ সালে একটি ব্যাপক শিল্প-সম্পর্ক বিল (Industrial Relations Bill) রচনা করিয়া আইনে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। শ্রমিক এবং মালিক উভয়ই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া যাওয়ায় বিলটি নষ্ট হইয়া যায়। ১৯৫২ সালে শ্রীভি. ভি. গিরি শ্রমদপ্তর গ্রহণ করিবার পর ভারত সরকারের শ্রমনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভংগি কতকটা পরিবর্তিত হয়। গিরির মতে, শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার পরিবর্তে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও যৌথ চুক্তির (collective bargaining) আশ্রয় করাই সমীচীন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিলও রচনা করেন; কিন্তু ১৯৫৪ সালে পদত্যাগ করায় আর কিছু হইয়া উঠে নাই। ইহার পর পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করে "বিবাদ-মীমাংসার জন্য যথাসম্ভব পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং স্বেচ্ছামূলক সালিসির আশ্রয়ই গ্রহণ করা হইবে এবং এ-পর্যন্ত "শিল্প-বিরোধ মীমাংসার যে-ব্যবস্থা

শ্রমনীতি সম্পর্কে সরকারী দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন

* Wadia & Merchant, Our Economic Problem-এর ২৩শ অধ্যায়।

রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত জটিল"। সুতরাং ১৯৪৭ সালের শিল্প আইনের আর একবার সংশোধন করিয়া পদ্ধতিতে সরলতা আনয়ন করা প্রয়োজন। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের আর এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন আইন ১৯৫৬ সালের শিল্প-বিরোধ (সংশোধন ও অন্যান্য ব্যবস্থা) আইন [Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1956] নামে পরিচিত। এই আইন চালু করা হয় ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে।*

৪। ১৯৫৬ সালের সংশোধন

১৯৫৬ সালের শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইন (Industrial Disputes Amendment Act, 1956) : বলা হইয়াছে যে আইনটির পুরা নাম হইল "শিল্প-বিরোধ (সংশোধন ও অন্যান্য ব্যবস্থা) আইন"। এই আইনের দ্বারা ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের চতুর্থ দফা সংশোধন করা হইয়াছে। সংশোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ৩টি : (১) শিল্প-আদালত প্রভৃতি কর্তৃক বিরোধ-নিষ্পত্তির (adjudication) ব্যবস্থাতে সরলতা আনয়ন করা ; (২) শিল্প আপিল-ট্রাইব্যুনালের বিলোপসাধন করা ; (৩) শ্রমিক স্বার্থের সহিত সংগতি বজায় রাখিয়া ১৯৪৭ সালের আইনের ৩৩ ধারা সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি দূর করা। আইনটির প্রধান প্রধান ব্যবস্থার বর্ণনা নিম্নলিখিতভাবে করা যাইতে পারে :

সংশোধনের মুখ্য উদ্দেশ্য

প্রধান প্রধান ব্যবস্থা

১। শ্রমিকের ব্যাপকতর সংজ্ঞা

প্রথমত, শ্রমিকের (workman) সংজ্ঞা ব্যাপকতর করিয়া সকল টেক্‌নিক্যাল ও ব্যবস্থাপক কর্মচারীদের (technical and supervisory personnel) ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২। আপিল-ট্রাইব্যুনালের বিলোপ

দ্বিতীয়ত, ১৯৫০ সালের শিল্প-বিরোধ (আপিল-ট্রাইব্যুনাল) আইনকে বিলুপ্ত করিয়া আপিল-ট্রাইব্যুনালগুলির বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

তৃতীয়ত, ইহার পরিবর্তে তিন পর্যায়ের শিল্প-আদালত (three tier system of Labour Courts) গঠন করা হইয়াছে। প্রথমে আছে কতকগুলি শ্রমিক-আদালত (Labour Courts)। ইহাদের কার্য হইল আইনের দ্বিতীয় তপশীলভুক্ত (second schedule) বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা। এই সকল বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে আছে স্থায়ী নির্দেশের (standing orders) অধীনে নিয়োগকর্তার বরখাস্ত ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা, ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারের আইনগত দিক প্রভৃতি।

৩। তিন পর্যায়ের আদালত

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে কতকগুলি শিল্প-ট্রাইব্যুনাল (Industrial Tribunals)। এই সকল ট্রাইব্যুনাল দ্বিতীয় ও তৃতীয় তপশীলভুক্ত বিষয়সমূহ—যথা, মজুরি, কার্যের সময়, বোনাস, রাশ্যানালাইজেশন, ছাঁটাই প্রভৃতি লইয়া বিরোধের মীমাংসা করে।

* Report of the Minister of Labour and Employment for 1959-60

পরিশেষে, এই বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে একটি জাতীয় শিল্প-ট্রাইব্যুনাল (a National Industrial Tribunal)। এই আদালত দুই প্রকার শিল্প-বিরোধের মীমাংসা করে: (ক) সরকারের মতে, যে-সকল শিল্প-বিরোধ, জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ; (খ) যে-সকল শিল্প-বিরোধের ফলে একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

উক্ত তিন পর্যায়ের শিল্প-আদালতের কোনটিতেই আপিলের ব্যবস্থা নাই বলিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিচারক নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

বিচারপতিগণের যোগ্যতা

অন্যূন ৭ বৎসর সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা অন্যূন ৫ বৎসরের শিল্প-আদালতের সভাপতির কাজ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই নূতন শিল্প-আদালতের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা হইবে। শিল্প-ট্রাইব্যুনালের সভাপতিগণ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে অথবা শিল্প আপিল-ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে অন্যূন ২ বৎসর কার্য করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইবেন।

৪। স্থায়ী নির্দেশের পরিবর্তনসাধন

চতুর্থত, স্থায়ী নির্দেশেরও (standing orders) কতকগুলি পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। বর্তমানে ২১ দিনের নোটিশ না দিয়া কোন নিয়োগকারী শ্রমিকের কার্যের অবস্থা সংক্রান্ত কোন পরিবর্তনসাধন করিতে পারিবে না। আবার পূর্বে একমাত্র নিয়োগকারী স্থায়ী নির্দেশ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করিতে পারিত; বর্তমানে শ্রমিককেও ঐ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

৫। ৩৩ ধারার সংশোধন

পঞ্চমত, ১৯৪৭ সালের আইনের ৩৩ ধারাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া রচনা করা হইয়াছে। মূল আইন অনুসারে শিল্প-বিরোধের জন্য আপোষ বা মীমাংসার প্রচেষ্টা চলিতে থাকাকালীন নিয়োগকর্তা কোন কারণেই শ্রমিককে স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে বিরোধের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এই কারণে নিয়োগকর্তা বিরোধের মীমাংসা চলিতে থাকা অবস্থাতেও শ্রমিকের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদন করিয়া লইতে হয়। বলা হইয়াছে যে নূতন ব্যবস্থার ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মানুবর্তিতা বৃদ্ধি পাইবে।

ষষ্ঠত, নিষ্পত্তি রায় (awards) সম্পর্কিত ধারাগুলিও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এইরূপ রায় প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ইহাদের কার্যকর করিতে হইবে। সরকার কিন্তু রায়ের পরিবর্তন বা রায়কে বাতিল করিতে সমর্থ।

৬। নিষ্পত্তি রায়

নিষ্পত্তি রায় সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন আদালতে তোলা যাইবে না।

৭। সালিসি

পরিশেষে, কিন্তু এ-ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে বিবদমান পক্ষদ্বয় বিরোধ-মীমাংসার জন্য লিখিতভাবে স্বেচ্ছামূলক সালিসির আবেদন করিতে পারে। এইরূপ আবেদন পাইলে সালিসি কর্মচারী সালিসির ব্যবস্থা করিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯৫৬ সালের শিল্প-বিবাদ সংশোধন আইন চালু করা হয়

ঐ মাসের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে। অবশ্য যে-সকল মামলা ইতিমধ্যে চলিতেছিল তাহা শেষ করিবার জন্য ইহার পরও আপিল-ট্রাইবুনাল কিছুদিন কার্য করিতে থাকে। পরে ১৯৫৯ সালের ১লা জুন হইতে ঐ ট্রাইবুনাল সম্পূর্ণ উঠিয়া যায়। নূতন সালিসি-ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আদালত (Labour Courts) গঠন ছাড়াও বোম্বাই, ধানবাদ ও দিল্লীতে শিল্প ট্রাইব্যুনাল এবং এলাহাবাদে জাতীয় শিল্প ট্রাইবুনাল স্থাপন করা হইয়াছে।

আইনটি কার্যকরকরণ

সমালোচনা: শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইনও বিশেষ কোন দিক দিয়া সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। প্রথমত, টেক্‌নিক্যাল ও ব্যবস্থাপক কর্মচারিদের 'শ্রমিক' পর্যায়ভুক্ত করার ফলে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে—কারণ এই সকল কর্মচারী নিয়োগকারিগণেরই একাংশ।

১। শ্রমিকের ব্যাপকতর সংজ্ঞা ত্রুটিপূর্ণ

দ্বিতীয়ত, আপিল-ট্রাইবুনাল উঠাইয়া দিয়া শিল্প-বিরোধের পদ্ধতিকে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহার দ্বারা ন্যায়বিচার ব্যাহত হইয়াছে। এখন বিবদমান পক্ষ দুইটি একটিমাত্র আদালতের চূড়ান্ত বিচার মানিয়া লইতে বাধ্য। ইহা অবশ্য বলা যায় যে আপিলের ব্যবস্থা থাকাকালীন শ্রমিক অপেক্ষা মালিকই ইহার সুবিধা অধিক ভোগ করিত। তবুও আপিল-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

২। আপিল-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রহিত করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই

তৃতীয়ত, ৩৩ ধারার পরিবর্তনসাধন করিয়া বিরোধ চলিতে থাকাকালীন নিয়োগকর্তাকে শ্রমিকের বিরুদ্ধে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শ্রমিক-স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

৩। শ্রমিক-স্বার্থ ব্যাহত হইতেছে

চতুর্থত, নিষ্পত্তি রায়ের পরিবর্তন করিবার যে-ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আদালতের বিচারের সংশোধন শাসন বিভাগ করিবে কেন?

৪। নিষ্পত্তি রায় পরিবর্তনের ক্ষমতা সমর্থনযোগ্য নহে

অপরদিকে সংশোধন আইনটির যে কোন একটি সমর্থনযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা হইল বিবাদের যে-কোন পর্যায়ে স্বেচ্ছামূলক সালিসির (voluntary arbitration) ব্যবস্থা। বলা যায় যে, এই ব্যবস্থাটি ছাড়া ১৯৫৬ সালে শ্রম-বিরোধ সংশোধন আইনে শ্রীযুক্ত গিরির দৃষ্টিভংগি বিশেষ প্রতিফলিত হয় নাই। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশনের উক্তি যে 'সংশোধন কাম্য পথেই করা হইয়াছে' তাহা সমর্থন করা যায় না।*

কিন্তু সালিসির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য

উপসংহার

---

* Second Five Year Plan-এর ৫৭৫ পৃষ্ঠা।

আবশ্যিক সালিসির ব্যবস্থা কাম্য কিনা? (Is Compulsory Arbitration Desirable?): আবিশ্যিক সালিসির ব্যবস্থাকেই ১৯৪৭ ও ১৯৫৬ সালে শিল্প-বিবাদ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন, আবশ্যিক সালিসি কাম্য কিনা? এই প্রশ্নের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বিপক্ষে যুক্তি

বিপক্ষে যুক্তিগুলি হইল এইরূপ: (১) শিল্পজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে স্বেচ্ছামূলক পারস্পরিক চুক্তি বা মীমাংসার উপর নির্ভর করিতে হইবে। আবশ্যিক মীমাংসার দ্বারা শান্তিপূর্ণ শিল্প-সম্পর্ক স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না; এই ব্যবস্থায় মনোমালিন্যের মনোভাব সর্বদা বর্তমান থাকিবেই। অতি তুচ্ছ কারণেও বিবদমান দলগুলি আদালতের আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিবে। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা এই যুক্তিকেই সমর্থন করে। (২) শ্রমিক-সংগঠন ও আন্দোলন আবশ্যিক মীমাংসার ব্যবস্থার ফলে সুস্থ ও সরলভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। শ্রমিক-সংগঠনের প্রধান ভিত্তি ঐক্য। সামগ্রিক স্বার্থের জন্য সমবেতভাবে আন্দোলন চালান এবং সংগ্রাম করিবার ফলেই ঐক্যভাব সুদৃঢ় হয়। কিন্তু আবশ্যিক সালিসি বা বিচার-ব্যবস্থা এই ঐক্যভাব গড়িয়া উঠিবার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। (৩) আবশ্যিক সালিসি বা বিচার-ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের যে আদর্শ আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার সহিত এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ।

সপক্ষে যুক্তি

অপরদিকে আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে: (১) ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে শিল্প-বিবাদ চলিতে দেওয়া হইলে উৎপাদন ও উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। বিশেষত অত্যাবশ্যক জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্পগুলির উৎপাদনকার্য ব্যাহত হইলে জনসাধারণের দুর্দশা বাড়িয়া যাইবে। (২) স্বেচ্ছামূলক সালিসি-মীমাংসার ব্যবস্থাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের। কিন্তু ভারতে সুদক্ষ শক্তিশালী শ্রমিক-সংগঠন এখনও গড়িয়া উঠে নাই। (৩) শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদও যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতারা নিজেদের স্বার্থের প্ররোচনায় কার্য করে। ফলে শিল্প-জগতে শান্তির পরিবর্তে বিশৃংখলারই সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থে আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার ব্যবস্থাই কাম্য।

উপসংহার: সপক্ষে যত যুক্তিই প্রদর্শিত হউক না কেন ইহা অনস্বীকার্য যে, পুরাপুরিভাবে আবশ্যিক বিচার-মীমাংসার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং জরুরী অবস্থায় এই ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য হইলেও অন্যান্য শিল্পে বা সময়ে এই ব্যবস্থাকে শিল্প-বিবাদ সমাধানের প্রকৃত পন্থা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই ব্যবস্থার ফলে যে শ্রমিক-সংগঠন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং স্বেচ্ছামূলক বিচার-মীমাংসার উপরই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

শিল্পে শান্তিরক্ষাকল্পে অবলম্বিত অন্যান্য ব্যবস্থা (Other Measures for Promotion of Industrial Peace) : শিল্পে শান্তিরক্ষা কল্পে শিল্প-বিবাদ মীমাংসা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা, (২) পরোক্ষ ব্যবস্থা। প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা বলিতে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ (Worker's Participation in Management) শিল্পে নিয়মানুবর্তিতা আনয়ন (Code of Discipline), বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা—এই তিনটিই প্রধান। পরোক্ষ ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় শ্রমকল্যাণ ও শ্রমিকের আর্থিক-অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা—যথা মজুরি বৃদ্ধি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বাসগৃহ ইত্যাদি। নিম্নে অবলম্বিত প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ লইয়া আলোচনা করা হইতেছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থা

শ্রমিকের পরিচালনায় অংশগ্রহণ (Worker's Participation in Management) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প পরিচালনা ব্যাপারে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয়, ইহার ফলে উৎপাদন প্রসারলাভ করিবে, শ্রমিকরা শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থায় তাহাদের ভূমিকা উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং তাহাদের আত্মবিকাশের প্রেরণা পূরণ হইবে। বস্তুত, শিল্প-জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শ্রমিকদের শিল্প-পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিতে দিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের অনুসন্ধান দল (Study Group) পশ্চিমী দেশে এই অংশগ্রহণ বব্যস্থা কিভাবে কার্য করে তাহা অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালে শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিরা মিলিয়া এই সুপারিশগুলির বিচার-বিবেচনা করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশগ্রহণের নীতিতে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে যথাসম্ভব কার্যকর করিতে হইবে। ফলে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ২৩টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশীদার করা হয়। ১৯৬০ সালে আরও ১৫টিতে এই নীতি কার্যকর হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

নিয়মানুবর্তিতা এবং বিভিন্ন শ্রমিক-সংঘের মধ্যে সম্পর্ক (Code of Discipline and Code of Conduct) : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুসৃত শ্রমনীতি অনুসারে শিল্পে শান্তি আনয়নের জন্য কতকগুলি নিয়মানুবর্তিতার ধারা রচনা করা হয়। শ্রম সম্মেলন (Labour Conference) এবং স্থায়ী শ্রম কমিটি (Standing Labour Committee) কর্তৃক ধারাগুলি সমর্থিত হইয়াছে। যাহাতে পারস্পরিক বুঝাপড়া এবং সহযোগের মাধ্যমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়, যাহাতে অযথা আদালতের দ্বারস্থ হইতে না হয় সেই আবহাওয়ার সৃষ্টিই এই সকল ধারার উদ্দেশ্য। আশা করা হইয়াছে যে এই নিয়মানুবর্তিতার ধারাগুলির মাধ্যমে একদিন শিল্প-গণতন্ত্র (Industrial Democracy) প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১৯৫৮ সালের জুন মাস হইতে নিয়মানুবর্তিতার ধারাগুলিকে কার্যকর করা হইয়াছে।

নিয়মানুবর্তিতার ধারা

১৯৫৮ সালের মে মাসে নৈনীতালে বিভিন্ন সর্ব-ভারতীয় শ্রমিক সংঘগুলি তাহাদের নিজেদের মধ্যে যাহাতে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহার জন্য কয়েকটি ধারা রচনা করিয়াছে। ইহার ফলে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সংঘর্ষের দরুন শিল্প-বিবাদের আশংকা কিছুটা কমিবে আশা করা যায়।

বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সম্পর্ক

শ্রমিক সংঘ (Trade Unions) : ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংঘের প্রসার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। বহুপূর্ব হইতেই ভারতে শ্রমিক সংঘ গঠনের প্রচেষ্টা চলিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক আন্দোলন সুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের এই মন্থর গতির মূলে রহিয়াছে সংঘবদ্ধভাবে সমস্বার্থসাধন করিবার দৃঢ় মনোভাবের অভাব। যখন উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা হইতে বিচ্যুত হইয়া একদল সহায়সম্বলহীন শ্রমজীবী গড়িয়া উঠে তখনই শ্রমিক-সংঘ গঠনের পথ প্রস্তুত হয়। গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি দেশে যেমনভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শ্রমিক দল গঠিত হইয়াছিল ভারতে তেমন হয় নাই। ভারতীয় শ্রমিক বহুদিন পর্যন্ত গ্রামের জমিজমার সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি অবশ্য শিল্পের উপর জীবিকার্জনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল শ্রমিক দল গড়িয়া উঠিতেছে। শিল্পবিস্তারের ফলে নানা প্রকার সমস্যাও আসিয়া দেখা দিতেছে এবং শিল্প-শ্রমিকগণও সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের মন্থর গতির কারণ

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয় ১৮৯০ সালে। ঐ বৎসর বোম্বাই মিল শ্রমিক সংঘ (Bombay Millhand's Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর ১৯০৫ সালে কলিকাতায় মুদ্রক সংঘ (Printers' Association) এবং বোম্বাই-এ ১৯০৭ সালে ডাক ইউনিয়ন ও ১৯১০ সালে কামগড় হিতবর্ধক সভা গঠিত হয় তারপর আসিল প্রথম মহাসমরের ঢেউ। যুদ্ধাবসানে চারিদিকে অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে মালিকশ্রেণী মুনাফাশিকার করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছিল অপরদিকে মজুর মূল্যাধিক্যের চাপে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ইহার সহিত আসিয়া যুক্ত হইল ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব। মজুরিবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে বস্ত্র শিল্প শ্রমিকরা এক সংঘ গঠন করে। ইহার পর দেশের অন্যান্য বহু স্থানে শ্রমিক সংঘ গঠিত হইল। কিন্তু প্রথম দিকে এই সংঘগুলি ধর্মঘট সংগঠনকারী কমিটি ভিন্ন কিছুই ছিল না। শ্রমিক আন্দোলন প্রসারে আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের (ILO) ভূমিকাও উপেক্ষা করিবার নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন (International Labour Conference) প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য কেন্দ্রীয়

ভারতে শ্রমআন্দোলনের সূত্রপাত

প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All-India Trade Union Congress) নামে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯২০ সালের পর আর্থিক দুর্দশা, কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের আন্দোলন ও ধর্মঘটের সফলতার ফলে শ্রমিক আন্দোলন বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট ইংল্যাণ্ডের প্রথাগত আইনকে (Common Law) অনুসরণ করিয়া এক রায় প্রদান করেন যে, শ্রমিক সংঘগুলি অবৈধ ষড়যন্ত্র মাত্র। ইহাতে শ্রমিক আন্দোলনের অসুবিধা হইয়া পড়ে। ইহার পর যাহাতে শ্রমিক সংঘগুলি আইনগত স্বীকৃতি-লাভ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতে থাকে। পাঁচ বৎসর চেষ্টার পর ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস হয় এবং শ্রমিক সংঘগুলির রেজিষ্ট্রারী করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথমদিকে সংঘগুলি অল্পসংখ্যায় রেজিষ্ট্রারীভুক্ত হইলেও ক্রমশ উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইত্যবসরে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ ও কলহ দেখা দেওয়ায় আন্দোলনের গতি মন্থর হইয়া পড়ে। ১৯২৯ সালে শ্রম সংক্রান্ত রয়াল কমিশন বয়কট করিবার ব্যাপার লইয়া অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিভক্ত হইয়া যায়। এবং ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (National Trade Union Federation) গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বুঝাপড়া হয় এবং একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রাখিবার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই চুক্তি সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধকে সমর্থন করা হইবে কিনা এই প্রশ্নে আবার ভাঙন ধরে। শ্রী এম. এন. রায় এবং শ্রীযমুনাদাস মেটা যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (Trade Union Federation) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

শ্রম আন্দোলনের প্রসার

আইনগত স্বীকৃতির অভাবে শ্রম আন্দোলনের অসুবিধা

১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনে শ্রমিক সংঘগুলির স্বীকৃতিলাভ

দলাদলির ফলে শ্রমিক সংঘগুলির মধ্যে ভাগাভাগি

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা শ্রমিক সংঘ আন্দোলন প্রসারে বিশেষ সহায়তা করে। ১৯৪৬ সালে শ্রমিক বিক্ষোভ চরমে উঠে। ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘট যেভাবে সফল হয় তাহাতে আন্দোলন বেশ কিছুটা শক্তি অর্জন করে। নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ঐ যুদ্ধোত্তর যুদ্ধে শ্রমিক সংঘের প্রসার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। ১৯৩৯ সালে রেজিষ্ট্রীভুক্ত শ্রমিক সংঘ ও উহাদের সদস্যসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৬৭ এবং ৫·১ লক্ষ; ১৯৫৭-৫৮ সালে ঐ সংখ্যা দুইটি যথাক্রমে দাঁড়ায় ১০,০৪৫-এ এবং ৩০·১৫ লক্ষে।*

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে শ্রম-বিক্ষোভ বৃদ্ধি

* Indian Labour Journal, January, 1960.

সম্প্রসারণ সত্ত্বেও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ও মতবিরোধ বহু পূর্ব হইতে চলিতেছিল তাহার অবসান ঘটে নাই। ১৯৪৭ সালে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কংগ্রেসপন্থী সংঘগুলি এবং কংগ্রেস নেতাদের একটি সভা আহ্বান করেন ; এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (Indian National Trade Union Congress) নামে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। আবার সমাজতন্ত্রী দল যখন কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন তাহারা হিন্দুস্থান মজদুর পঞ্চায়েত (Hindusthan Mazdoor Panchayat) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। পরে ১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবারের (Indian Federation of Labour) সংগে মিলিত হইয়া হিন্দ মজদুর সভা (Hind Mazdoor Sabha) নামে পরিচিত হয়। ইহা ব্যতীত অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কচ্যুত আর একটি দল ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস (United Trades Union Congress) নামে অপর একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্ত ভাগাভাগির ফলে স্বভাবতই শ্রমিক আন্দোলন কতকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত উপরি-উক্ত চারিটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ও সদস্যসংখ্যা যাহা ছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :*

বিভিন্ন দলীয় কেন্দ্রীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অন্তর্ভুক্ত সংঘগুলির সংখ্যা	মোট সদস্যসংখ্যা
ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	৭২৭	৯,১০২২১
হিন্দ মজদুর সভা	১৫১	১,৯২,৯৪২
অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	৮০৭	৫,৩৭,৫৬৭
ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস	১৮২	৮২,০০১
	১,৮৬৭	১,৭২২,৭৩১

ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের অসুবিধা (Difficulties of the Trade Union Movement in India) : ভারতীয় শ্রমিক সংঘ আন্দোলন অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের আন্দোলনের পর্যায়ে পৌছাইতে পারে নাই। যে-সমস্ত কারণে আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত, ভারতে এখনও স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠে নাই।** শিল্পাঞ্চল হইতে

* India,—1960.

** ৪২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

গ্রামে এবং গ্রাম হইতে আবার শিল্পাঞ্চলে গমনাগমন সদাসর্বদাই চলে। ইহা ব্যতীত এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যোগদান অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। ফলে এই সমস্ত অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অধুনা অবশ্য স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের অবসর সময়ের অভাব এবং দারিদ্র্য হইল আর একটি অসুবিধা। আন্দোলনে যতটা অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন সময়াভাবে শ্রমিকরা তাহা করিতে পারে না এবং যে-সামান্য মজুরি পায় তাহা হইতে সংঘের চাঁদা দিতেও তাহাদের কষ্ট হয়। অবশ্য সংঘবদ্ধ হওয়ার মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিলে কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহারা সময় ও অর্থ দিয়া সংঘকে শক্তিশালী করিয়া তুলিত।

তৃতীয়ত, ভাষাগত, জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য-সাধন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

চতুর্থত, মালিকশ্রেণী প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংঘের বিরোধিতা করিয়া থাকে এবং সর্বতোভাবে উহাকে পংগু করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অথচ শক্তিশালী শ্রমিক সংঘই শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক।

পঞ্চমত, শিক্ষার অভাব এবং অদৃষ্টবাদ শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। অশিক্ষার দরুন শ্রমিকদের সঠিকভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না; ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

ষষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রে সংঘগুলির কার্যপরিচালনায় গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তমত, শ্রমিক সংঘগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ধর্মঘট এবং আন্দোলন চালাইবার সংস্থা হিসাবে কার্য করে। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, তাহাদের চিকিৎসা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা প্রভৃতি সেবামূলক কার্যাদি কদাচিৎ করিয়া থাকে। এই সীমাবদ্ধ কার্যের দরুন সংঘগুলি শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের উদ্রেক করিতে পারে নাই।

পরিশেষে, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি প্রধান অসুবিধা হইল যে যাঁহারা আন্দোলনের পরিচালনা ও নেতৃত্ব করেন তাঁহারা বাহিরের লোক, শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন। এই সমস্ত পেশাদারী নেতা হইলেন আইন ব্যবসায়ী অথবা সমাজ সেবক। শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে তাঁহারা শ্রমিক-সমস্যাগুলি যতটা উপলব্ধি করিতে পারিতেন বর্তমান অবস্থায় ততটা তাঁহাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। অনেক সময় তাঁহারা একাধিক সংঘ পরিচালনা করিবার ফলে কোনটির প্রতিই সম্যক দৃষ্টি দিতে সমর্থ হন না। ইহা ব্যতীত অনেক শ্রমিক-নেতাই নিজেদের স্বার্থসাধন অথবা বিশেষ কোন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রমিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা আভ্যন্তরীণ। ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে শ্রমিক আন্দোলন প্রসারের পথে বাহির হইতে বহু বাধা-বিপত্তি আসিয়াছে। যেমন, মালিকশ্রেণী কোন সময়ই শ্রমিক আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন নাই। সরকারও অনেকক্ষেত্রে মালিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহত করিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান প্রতিবাদ

সম্প্রতি অবশ্য অবস্থার কতকটা উন্নতি লইয়াছে। বর্তমানে শ্রমিকরা তাহাদের অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন ; তাহারা সংঘ গঠন করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আগ্রহান্বিত। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিও সংঘগুলির শক্তিবৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিতেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ থাকায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনও শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যে-সমস্ত আইন পাস করিয়াছে তাহাতেও শ্রমিক সংঘগুলিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রমিক আন্দোলনের কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে

অবলম্বনীয় প্রতিবিধান (Suggested Remedies) : শ্রমিক আন্দোলনের যে-সমস্ত দুর্বলতার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেই শ্রমিক সংঘগুলি শিল্পজগতে উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে ; এবং ফলে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতিকার হিসাবে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :

প্রথমত, শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে ; আলাপ আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতি এই শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সংঘগুলির কার্যের গণ্ডি প্রসারিত করিতে হইবে। সেবামূলক কার্যের মধ্য দিয়া শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ যোগাইতে হইবে।

তৃতীয়ত, আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শ্রমিকের মধ্যে উপযুক্ত লোক বাহির করিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারের ফলে ইহা করা সম্ভব হইবে।

চতুর্থত, শ্রমিক আন্দোলনের কার্যে যাঁহারা লিপ্ত হইবেন তাঁহাদিগকে শ্রমিক সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

পঞ্চমত, শ্রমিক সংঘগুলির কার্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতে হইবে।

ষষ্ঠত, যাহাতে সংঘগুলির আর্থিক অবস্থা কতকটা সচ্ছল হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিশেষে, মালিকশ্রেণীর দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনও প্রয়োজন। তাঁহাদের ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে সুসংগঠিত শ্রমিক সংঘ থাকিলেই শ্রম-বিবাদের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ-মীমাংসার সুবিধা হয়।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারের ঘোষিত শ্রমনীতি অনুসারে উক্ত প্রতিবিধানগুলির প্রায় সকলই অবলম্বিত হইয়াছে বা হইতেছে। শিক্ষার প্রসারের দ্বারা আভ্যন্তরীণ নেতা গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে, সেবামূলক কার্যের গণ্ডি প্রসারিত হইতেছে এবং সংঘের আর্থিক সংগতিবৃদ্ধি ও মালিক কর্তৃক সংঘের স্বীকৃতিলাভের জন্য নূতন আইন পাসের ব্যবস্থা চলিতেছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমিক সংঘ

শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত আইন (Trade Union Legislation) :

১৯২৬ সালে প্রথম শ্রমিক সংঘ আইন

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার দিকে শ্রমিক সংঘগুলি আইনগত কতকগুলি অসুবিধা ভোগ করিত। এমনকি ১৯২১ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্ট শ্রমিক সংঘকে বেআইনী ষড়যন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে।* বহু চেষ্টার পর ১৯২৬ সালে শ্রমিক সংঘ আইন (Trade Union Act, 1926) পাস হয়। ১৯২৮ সালে এবং ১৯৪২ সালে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা হইলেও ১৯৪৭ সালের পূর্বে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ১৯৪৭ সালে এক সংশোধন আইনের দ্বারা প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক সংঘকে মালিক কর্তৃক স্বীকার করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৭ সালের সংশোধন

সংশোধিত ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইনটির প্রধান প্রধান ধারা নিম্নে বিবৃত হইল :

প্রধান প্রধান ব্যবস্থা :

(১) যে-কোন শ্রমিক সংঘের ৭ বা ততোধিক সদস্য রেজিষ্ট্রারের নিকট সংঘকে রেজিষ্ট্রারীভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে। রেজিষ্ট্রারীভুক্ত সংঘের পরিচালকগণের অন্তত অর্ধেককে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে হইবে।

(২) রেজিষ্ট্রারীভুক্ত ইউনিয়নের সদস্য ও পরিচালকগণ সংঘের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে-সমস্ত চুক্তি করিবেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ফৌজদারী দায়ে অভিযুক্ত করা যাইবে না। শিল্প-বিবাদের স্বার্থে কোন কার্য করা হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা রুজু করা যায় না।

(৩) সংঘের সাধারণ তহবিলের অর্থ যে-সমস্ত বিষয় আইনে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই বিষয়ের জন্যই মাত্র ব্যয় করা যায়। তবে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপের একটি আলাদা তহবিল সৃষ্ট করা যাইতে পারে। সংঘকে রেজিষ্ট্রারের নিকট বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে হয়।

---

* ৪৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

মালিকের নিকট স্বীকৃতি আদায়

(৪) কোন সংঘকে মালিক অস্বীকার করিবার ফলে বিবাদ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বন্দর, খনি প্রভৃতির বেলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিবাদের বিচার-বিবেচনার জন্য শ্রম-আদালত (Labour Court) গঠন করিতে পারে। শ্রম-আদালতের আদেশে মালিককে সংশ্লিষ্ট সংঘকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তবে স্বীকৃত হইবার জন্য সংঘকে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হয়ঃ (ক) সংঘকে রেজিষ্ট্রারীভুক্ত হইতে হইবে; (খ) সংঘের সাধারণ সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত থাকিতে হইবে; (গ) সংঘটিকে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইতে হইবে; (ঘ) সংঘের নিয়মকানুন সংশ্লিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত করিবে না; (ঙ) ধর্মঘট ঘোষণা করিবার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে; (চ) প্রত্যেক ছয় মাসে একবার করিয়া অন্তত সংঘের কার্যকরী কমিটির সভা আহ্বান করিতে হইবে।

স্বীকৃতির সর্তাবলী

স্বীকৃতি প্রত্যাহারের ব্যবস্থা

(৫) আইনে অন্যায় কার্যাবলী সম্পর্কেও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যায় কার্য অনুষ্ঠানের অভিযোগে সংঘের স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হইতে পারে। অন্যায় কার্য বলিতে নিম্নলিখিতগুলিই বুঝায়ঃ (ক) অবৈধ ধর্মঘটে অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ; (খ) সংঘের কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অবৈধ ধর্মঘটের সমর্থন বা উহাতে উস্কানি প্রদান; (গ) সংঘের পরিচালক কর্তৃক মিথ্যা বিবরণী পেশ। অনুরূপভাবে মালিক যদি শ্রমিক সংগঠনে বা পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে, অথবা সংঘের কার্যে অংশগ্রহণ বা আইনত কোন অনুসন্ধানকার্যে সাক্ষ্যপ্রদান বা অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য কোন শ্রমিকের প্রতি বিভেদকরণ করে, অথবা যদি স্বীকৃত কোন সংঘের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতে নারাজ হয় তাহা হইলে সে অন্যায় কার্য অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী হইবে; এবং তাহার ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

মালিকের বেআইনী কার্যের শাস্তি

শ্রমিক সংঘ আইনের ত্রুটি (Defects of the Trade Union Act): উপরি-উক্ত আইনটির দুইটি বিশেষ ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। (১) আইনটি বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত শ্রমিক সংঘের রেজিষ্ট্রারীভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে নাই; কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া সংঘগুলিকে রেজিষ্ট্রারীভুক্ত হইতে উৎসাহিত করিয়াছে মাত্র। (২) ইহা ব্যতীত সাধারণ তহবিল এবং রাষ্ট্রনৈতিক তহবিলের মধ্যে যে-পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ, সংঘের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী এবং অন্যান্য কার্যাবলী অংগাংগিভাবে জড়িত, একেকে অপর হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা সম্ভব হয় না। ইহার দ্বারা অন্যায্যভাবে সাধারণ তহবিলের অর্থব্যয় সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দুইটি প্রধান ত্রুটি

শ্রমিক সংঘগুলি যাহাতে সুসংগঠিত হইতে পারে তাহার জন্য ১৯৫০ সালে পার্লামেণ্টে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া যাওয়ায় উক্ত বিলটি নাকচ হইয়া যায়। আবার একটি বিল উত্থাপন সম্পর্কে সরকার বিচার-বিবেচনা করিতেছে। এ-সম্পর্কে পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে।* এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শ্রমমন্ত্রীদের ত্রয়োদশ অধিবেশনে (Labour Ministers' Conference, 13th Session) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার শ্রমনীতি অনুসারে শ্রমিক সংঘ আইনের সংস্কারের সুপারিশ করা হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সুপারিশকে শীঘ্রই কার্যকর করা হইবে।

শ্রমিক সংক্রান্ত আইন (Labour Legislation) : প্রথম প্রথম সংগঠিত শিল্পের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রমিক আইন রচিত হয়।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

শ্রমিক আইন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন বহুদিন পর্যন্ত অনুভূত হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন (ILO) প্রতিষ্ঠার পর সরকারের দৃষ্টিভংগির কতকটা পরিবর্তন হয় এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কতকগুলি আইন রচিত হয়। ১৯৩৭ সালে প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর হইতেই শ্রমিকদের সমস্যাগুলির প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইতে থাকে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি শ্রমিক সংক্রান্ত বহু আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এই সমস্ত আইন ব্রিটিশ ভারতের সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। ছোটখাট শিল্প অথবা অনিয়ন্ত্রিত শিল্পে (unregulated industries) নিযুক্ত বহু শ্রমিকই এই সমস্ত আইনের দ্বারা উপকৃত হয় নাই। ইহা ছাড়া ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি উভয়ই শ্রম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। ইহাতে শ্রম-আইন এবং নিয়মকানুনগুলিতে বিভিন্নতা দেখা দেয়। এই বিভিন্নতা দূরিকরণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অনুভূত হইতে থাকে। উপরন্তু, যুদ্ধ-প্রচেষ্টার স্বার্থে শ্রমিক ও মালিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৪২ সালে সরকার, মালিক এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি লইয়া আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের অনুকরণে গঠিত ত্রিদলীয় শ্রম-সংগঠন (Tripartite Labour Organisation) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই সংগঠনের কার্য হয় : (ক) একই প্রকার শ্রম আইন প্রবর্তনে সাহায্য করা ; (খ) শিল্প-বিবাদ মীমাংসার উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করা ; এবং (গ) শিল্প-বিক্ষোভের বিচার-বিবেচনা করা। এই ত্রিদলীয় সংগঠনের প্রচেষ্টায় শ্রম আইন বেশ কিছুটা প্রসারলাভ করে।

শ্রম আইনের উন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টা

স্বাধীনতালাভের পর, বিশেষ করিয়া অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর, শ্রম-সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতে থাকে। যাহাতে সমগ্র দেশব্যাপী একই প্রকারের আইন প্রচলিত হয় এবং যাহাতে শ্রমিকদের স্বার্থ অধিক মাত্রায় সংরক্ষিত হয়

* ৪৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

তাহার জন্য নানা প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে শ্রম সম্পর্কে বহু আইন ও সংশোধন পাস করাও হয়। তৎসত্ত্বেও এখনও শ্রমিকদের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে স্বীকার করা হইয়াছিল যে 'এখনও শ্রম উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।' তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালেও এ-অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই বলা চলে।*

এখন শ্রমিক সংক্রান্ত প্রধান প্রধান আইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যাইতে পারে। শ্রমিক আইনগুলিকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) কার্যের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন; (খ) মজুরি প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন; (গ) সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন; এবং (ঘ) শ্রমিক সংঘ ও শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত আইন।

শ্রমিক সংক্রান্ত বিভিন্ন শ্রেণীর আইন

ইহাদের মধ্যে শ্রমিক সংঘ ও শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত আইনগুলির আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

(ক) কার্যের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন (Legislation regarding Conditions of Work, etc) :

কার্যের সর্তাদি সংক্রান্ত আইন বলিতে বুঝায় বিভিন্ন কারখানা আইন, খনি সংক্রান্ত আইন, পরিবহন সংক্রান্ত আইন, রোপণ শিল্প সংক্রান্ত আইন এবং দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) **কারখানা আইন (Factories Acts):** প্রথম কারখানা আইন পাস হয় ১৮৮১ সালে। এই আইনে ৭ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের কারখানায় নিয়োগ এবং ৭ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের বালক বালিকাদের দৈনিক ৯ ঘণ্টার অধিক সময় শ্রম করান নিষিদ্ধ করা হয়। ইহার পর ১৮৯১ সাল, ১৯১১ সাল এবং ১৯২২ সালে কারখানা সংশোধন করিয়া শিশু-শ্রমিক ও স্ত্রী-শ্রমিক নিয়োগ সম্বন্ধে বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের কার্যের সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

১। প্রথম কারখানা আইন, ১৮৮১

২। বিভিন্ন সংশোধন

১৯২৯ সালে শ্রম সংক্রান্ত রয়াল কমিশন (Royal Commission on Indian Labour) নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বহু মূল্যবান সুপারিশ করে এবং তদনুযায়ী ১৯৩৪ সালের কারখানা আইন পাস করা হয়। এই আইনে শিশু-শ্রমিকের কার্যের সময় হ্রাস করা হয় এবং কারখানাগুলিকে সাময়িক (seasonal) এবং স্থায়ী (perennial) এই দুই ভাগ করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের কার্যের সময় সাময়িক কারখানাগুলিতে সপ্তাহে সর্বাধিক ৬০ ঘণ্টায় এবং স্থায়ী কারখানাগুলিতে সর্বাধিক ৫৮ ঘণ্টায় নির্দিষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত

৩। ১৯৩৪ সালের কারখানা আইন

* Industrial Labour in India, ILO Publication

বিশ্রামস্থান, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি অপরাপর কতকগুলি সুবিধা-সুযোগ প্রদান করিবার জন্য এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে ১৯৪৬ সালে এই আইনের সংশোধন দ্বারা সাময়িক এবং স্থায়ী কারখানায় বয়স্ক শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময় যথাক্রমে ৫৪ এবং ৪৮ ঘণ্টা কার্য করা হয়।

১৯৪৮ সালের কারখানা আইন (The Factory Act, 1948) : অবশেষে ১৯৪৮ সালে সরকার একটি ব্যাপক কারখানা আইন পাস করে। পূর্ববর্তী আইনগুলিকে পরিবর্তিত করিয়া এই আইনে শ্রমিক সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান আইনটির অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

৪। ১৯৪৮ সালের ব্যাপক কারখানা আইন

পরিধি (Scope) : যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান শক্তি (power) ব্যবহার করে এবং ১০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে তাহারা সকলেই এই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শক্তি ব্যবহৃত হয় না এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যদি ২০ বা ততোধিক শ্রমিক কার্য করে তাহা হইলে উহাদের বেলাও এই আইন প্রযুক্ত হইবে। শক্তি ব্যবহৃত হউক বা না-হউক এবং শ্রমিকের সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, উৎপাদনকার্য চলিতেছে এমন সমস্ত স্থানে এই আইনকে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া হইয়াছে।

কোন্ কোন্ কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ (Health, Safety and Welfare) : স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শ্রমিক-কল্যাণ সম্পর্কে আইনে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আলো-বাতাস, ময়লা নিষ্কাশন, তাপ নিয়ন্ত্রণ, গ্রীষ্মকালে শীতল পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দিষ্ট নির্দেশ আইনে দেওয়া আছে। কারখানায় শ্রমিকপিছু কতটা করিয়া স্থান থাকিবে সে-সম্পর্কে আইনে ধারা নিবদ্ধ আছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিপজ্জনক বাষ্প ও বিস্ফোরক, অতি ভারী দ্রব্য উত্তোলন, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশও রহিয়াছে।

আইনে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি

আইনটি শ্রমিক কল্যাণকর ব্যবস্থাদিও করিয়াছে। প্রাথমিক চিকিৎসা, ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার, শিশুসন্তান রাখিবার স্থান প্রভৃতি সম্পর্কে আইনে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৫০০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এমন সমস্ত কারখানাকে শ্রমিক-কল্যাণ কর্মচারী (Welfare Officers) নিয়োগ করিতে হয়।

অল্পবয়স্কদের নিয়োগ (Employment of Young Persons) : কারখানায় নিয়োগের ন্যূনতম বয়স করা হইয়াছে ১৪-১৫ বৎসর হইতে। ১৮ বৎসরের শ্রমিক কিশোর (adolescents) বলিয়া গণ্য। কার্য করিতে সমর্থ বলিয়া রেজিষ্ট্রীভুক্ত ডাক্তার প্রমাণপত্র না দিলে কোন শিশু বা কিশোরকে কারখানায় নিয়োগ করা যায় না ; এবং প্রমাণপত্র মাত্র এক বৎসরের জন্য কার্যকর থাকে।

১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের নিয়োগ বেআইনী

শ্রমের সময় (Hours of Work): এই আইনে প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রমের সময় সর্বাধিক দৈনিক ৯ ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশু ও কিশোরদের কার্যের সময় উহার অর্ধেক। রাত্রে নারী ও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে অতিরিক্ত সময় (overtime) শ্রমের জন্য সাধারণ মজুরির হারের দ্বিগুণ মজুরি প্রদান করিতে হয়।

রাত্রে শিশু ও নারী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ

মজুরিসহ ছুটি (Leave with Wages): আইনে মজুরিসহ সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির ব্যবস্থা আছে। প্রাপ্য ছুটি ভোগ করিবার পূর্বে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইলে অথবা সে কার্য পরিত্যাগ করিলে মালিককে তাহার প্রাপ্য ছুটির দরুন মজুরি দিতে হয়।

সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির ব্যবস্থা

শিল্পগত ব্যাধি প্রভৃতি (Occupational Diseases): নির্দিষ্ট রকম দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটিলে অথবা আশংকাজনক শারীরিক আঘাত পাইলে অথবা শ্রমিকরা শিল্পগত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে ম্যানেজারকে ঐ সম্পর্কে সংবাদাদি জানাইতে হয়। যে ডাক্তার শিল্পগত ব্যাধির চিকিৎসা করিবে তাহাকেও মুখ্য কারখানা পরিদর্শকের (Chief Inspector of Factories) নিকট রিপোর্ট প্রদান করিতে হয়। দুর্ঘটনা অথবা শিল্পগত ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করিতে পারে।

কারখানা আইনের ফলাফল: কারখানা আইনগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কার্যের সর্ত, নিরাপত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে যে-রকম ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে তাহাদের কর্মদক্ষতা ও অবস্থার উন্নতি না হইয়া পারে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কারখানা আইন হইতে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় নাই। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে এই কারখানা আইন না থাকিলে যাহা সম্ভব হইয়াছে তাহাও সম্ভব হইত না। আশানুরূপ উন্নতি সাধিত না হইবার একাধিক কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, কারখানা পরিদর্শন বা তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে কারখানা আইনের নির্দেশগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় না। মালিকরা যত রকমভাবে পারে আইন এড়াইয়া চলে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমিকরা অজ্ঞতা ও সংগঠনের অভাবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে অপারগ। সুতরাং কারখানা আইনে যতটা সুযোগ-সুবিধা তাহাদের দেওয়া হইয়াছে তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে না।

কারখানা আইনের ফল আশানুরূপ হয় নাই, কারণ:

১। কারখানা পরিদর্শনের সুব্যবস্থার অভাব

দ্বিতীয়ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশের কিছুটা উন্নতি হইলেও শ্রমিকদের বাসগৃহাদির প্রতি এখনও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ফলে ইহারা একরূপ পূর্বের মতই শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বসবাস করিয়া কর্মদক্ষতা বজায় রাখা সম্পূর্ণ কঠিন।

২। বাসগৃহের উন্নতির অভাব

তৃতীয়ত, কর্মদক্ষতা জীবনধারণের মানের উপর নির্ভরশীল। তাহারা যে মজুরি পায় তাহা দুর্মূল্যের বাজারে সুস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং মাত্র কারখানা আইনের দ্বারা কারখানার আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি-সাধন করিলেই শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উন্নতি হইবে না। ইহা ব্যতীত কর্মদক্ষতার উন্নতির জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কারিগরি শিক্ষা, সুদক্ষ পরিচালনা, মালিকের উদার দৃষ্টিভংগির প্রসার প্রভৃতিও প্রয়োজন।

৩। পর্যাপ্ত মজুরির অভাব

(২) **খনি সংক্রান্ত আইন (Mines Act):** খনিতে কার্যের সর্তাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বপ্রথম আইন প্রণীত হয় ১৯০১ সালে। এই আইনে খনি পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরে এই আইনের স্থান অধিকার করে ১৯২৩ সালের ভারতীয় খনি আইন (The Indian Mines Act, 1923)। এই আইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ-মূলক ব্যবস্থাদির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৪৮ সালে নূতন ফ্যাক্টরী আইন পাস হইলে খনি আইনেরও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এইজন্য ১৯৫২ সালের খনি আইন পাস করা হয়। এই আইনটি সকল খনির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আইনে খনি-শ্রমিকদের কার্যের বয়স এবং কার্যের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারখানা আইনের মত ইহাতেও ছুটি ও বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। খনির নীচে রাত্রে নারী-শ্রমিক নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কে ব্যবস্থা কারখানা আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ। ১৯৪৮ সালে কয়লা খনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং বোনাস পরিকল্পনা আইন (Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948) প্রণয়ন করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছে। আর একটি আইন দ্বারা কয়লা ও অভ্র খনিতে শ্রমিক-কল্যাণ তহবিল গঠন করা হইয়াছে। গৃহনির্মাণ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য এই তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হয়। ইহা ব্যতীত ১৯৪১ সালের খনি সংক্রান্ত প্রসূতি কল্যাণ আইনে (Mines Maternity Benefit Act, 1941) প্রসূতিদের সুবিধার ব্যবস্থাও আছে।

১। ১৯২৩ সালের খনি আইন

২। ১৯৫২ সালের খনি আইন

৩। কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বোনাস আইন

৪। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি

(৩) **পরিবহন সংক্রান্ত আইন (Transport Legislation):** ১৯৩০ সালের সংশোধিত রেল আইন [The Indian Railways (Amendment) Act, 1930] অনুসারে সবিরাম শ্রমিকদের সপ্তাহে অনধিক ৮৪ ঘণ্টা এবং অন্যান্য শ্রমিকদের ৬০ ঘণ্টা শ্রম করান যাইত। ১৯৫১ সালে ভারত সরকার কতকগুলি নূতন নিয়মকানুন* প্রবর্তন

১। রেলওয়ে শ্রমিক আইন

* The Railway Servant's (Hours of Employment) Rules, 1951

করে। এই নূতন নিয়মকানুনে রেলকর্মচারীদের নিম্নলিখিত চারিশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—(১) অতি পরিশ্রমী (Intensive), (২) সবিরাম (Essentially Intermittent), (৩) অবিরাম (Continuous) এবং বহির্ভূত (Excluded)। অতি পরিশ্রমীদের সর্বাধিক সাপ্তাহিক শ্রম করিবার সময় হইল ৪৫ ঘণ্টা, সবিরাম কার্যরত শ্রম কর্মচারীদের ৭৫ ঘণ্টা এবং অবিরাম কার্যরত কর্মীদের ৫৪ ঘণ্টা। মোটরগাড়ী চালকদের নিয়োগ, কার্যের সময়, বিশ্রামের সময় ইত্যাদি ১৯৩৯ সালের মোটর যানবাহন আইনের (The Mortor Vehicles Act. 1939) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ডক শ্রমিকদের জন্য ১৯৪৪ সালে যে-ভারতীয় ডক শ্রমিক আইন (The Indian Dock Labourers Act, 1944) পাস হয় তাহা ১৯৪৮ সালে কার্যকর করা হয়। এই আইনে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত ১৯৪৮ সালের ডক শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) আইন [The Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948] দ্বারা ডক শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরি, শিক্ষা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

২। মোটরযান শ্রমিক আইন

৩। ডক শ্রমিক আইন

(৪) **রোপণ শিল্প সংক্রান্ত আইন** (**Plantations Legislation**): ১৯৫১ সালে যে রোপণ শিল্প শ্রমিক আইন (The Plantations Lobour Act, 1951) পাস করা হয় তাহা চা কফি রবার এবং সিনকোনা রোপণ শিল্পের বেলায় প্রযোজ্য। এই আইনটিতে শ্রমিকের বয়স, কার্যের সময়, বিশ্রাম ছুটি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া চিকিৎসা, বাসগৃহ ইত্যাদি সম্পর্কেও নিয়মকানুন প্রবর্তিত করা হইতেছে।

(৫) **দোকান ও আপিস সংক্রান্ত আইন** (**Shops and Offices Acts**): কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪২ সালের সাপ্তাহিক ছুটি আইন (Weekly Holidays Act) দোকান রেঁস্তোরা বা থিয়েটারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা করে। বর্তমান প্রায় সকল রাজ্য সরকারই দোকান ও আপিস সংক্রান্ত নিজস্ব আইন পাস করিয়াছে। বাংলাদেশের আইন অনুসারে দিনে ১০ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা কার্যের সর্বাধিক সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রাত্রি ৮টার সময় দোকান বন্ধ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। কর্মচারীদের বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থাও এই আইনে করা হইয়াছে।

১৯৪২ সালের সাপ্তাহিক ছুটি আইন

বাংলাদেশের আইন

(খ) মজুরি সংক্রান্ত আইন (Legislation in respect of Wages): মজুরি সংক্রান্ত আইন বলিতে বুঝায় মজুরি প্রদান এবং ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি ধার্যকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন বা প্রণয়নের প্রচেষ্টা।

মজুরি প্রদান (Payment of Wages) : মজুরি প্রদান সম্পর্কে পূর্বে নানা দুর্নীতি চলিত। মজুরি দিতে দেরী করিয়া এবং নানা অজুহাতে মজুরি কাটিয়া লইয়া মজুরদের হয়রান ও শোষণ করা হইত। এই অবস্থার অবসানকল্পে ১৯:৬ সালে ভারত সরকার 'মজুরি প্রদান আইন' (The Payment of Wages Act, 1936) প্রণয়ন করে। পরে এই আইনের সংশোধন করা হয়। সংশোধিত মজুরি প্রদান আইন কারখানা, রেলপথ, রোপণ-শিল্প, খনি ও ডকে নিযুক্ত যে-সমস্ত ব্যক্তি ৪০০ টাকা বা তাহার কম বেতন বা মজুরি পায় তাহাদের বেলাতেই প্রযোজ্য। রাজ্য সরকারগুলি এই আইনকে অন্য যে-কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করিতে পারে। আইনটির ফলে মজুরি প্রদানে অযথা বিলম্ব করা যায় না, মজুরি হইতে অন্যায়ভাবে জরিমানা কাটা যায় না এবং জরিমানা হইতে প্রাপ্ত অর্থ শ্রমিক-কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতে হয়। তবে বাড়ীভাড়া, কার্যে অনুপস্থিতি, সমবায় সমিতির প্রাপ্য আদায় প্রভৃতির দরুন মজুরি হইতে টাকা কাটিয়া লওয়া যায়।

১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান আইন

ন্যূনতম মজুরি (Minimum Wages) : মজুরির উপর শ্রমিকদের জীবন-ধারণের মান নির্ভর করে। জীবনধারণের মানের উপর আবার কর্মদক্ষতা অনেকখানি নির্ভরশীল। ভারতীয় শ্রমিকের মজুরি যে প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই পর্যাপ্ত নহে তাহা সকলেই স্বীকার করে। যুদ্ধের সময় মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মূল্যবৃদ্ধির সংগে উহা সমান তাল রাখিতে পারে নাই। যুদ্ধের পর অনেক ক্ষেত্রেই মালিকরা আবার মজুরি হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য বহুদিন পূর্বেই আন্দোলন সুরু হয়। কানপুর শ্রম অনুসন্ধান কমিটি (The Cawnpur Labour Enquiry Committee), বোম্বাই বস্ত্রশিল্প শ্রম অনুসন্ধান কমিটি (The Bombay Textile Labour Enquiry Committee) মজুরিবৃদ্ধি ও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করে। শ্রম সংক্রান্ত রয়াল কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, যে-সমস্ত শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা প্রয়োজন সেই সমস্ত শিল্প সম্পর্কে আইন পাস করা যাইতে পারে। ১৯২৮ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্র সংগঠিত শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিতে সম্মত হইলেও ভারত সরকার উহাতে কোন সম্মতি প্রদান করে নাই। ভারতীয় শিল্প-মালিকরাও এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধা দেয়।

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের জন্য আন্দোলন

অবশেষে ১৯৪৫ সালে ত্রিদলীয় শ্রম সম্মেলন (Tripartite Labour Conference) ন্যূনতম মজুরি আইন প্রণয়নের নীতিকে সমর্থন জানায় এবং ১৯৪৬ সালে ঐ উদ্দেশ্যে এক বিলও উত্থাপিত হয়। অবশেষে ১৯৪৮ সালে ন্যূনতম মজুরি আইন (The Minimum Wages Act, 1948) পাস হয়। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট শিল্পে ও কৃষিতে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিয়া দিতে পারে। এই

১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন—ইহার ব্যবস্থা

শিল্পগুলির মধ্যে আছে চাউলের কল, ময়দার কল, তামাকের কারখানা, চর্ম-শোধন কারখানা প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে অন্যান্য শিল্পেও এই আইন প্রয়োগ করিতে পারে। প্রত্যেক পাঁচ বৎসরের মধ্যে ন্যূনতম মজুরির হারের পুনর্বিবেচনা করা হইবে। নির্দিষ্ট শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য যে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা হইবে মালিক তাহা অপেক্ষা কম মজুরি দিতে পারিবে না।

যে যে শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা চলিবে

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরির পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরামর্শ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কমিটি ও সাব-কমিটি এবং পরামর্শদান বোর্ড নিয়োগ করিতে পারে। আবার রাজ্য পরামর্শদান বোর্ডগুলির কার্যের সমন্বয়সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদান বোর্ড (a Central Advisory Board) গঠন করা যাইতে পারে। বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে পরামর্শদান বোর্ড ও কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে।

পরামর্শদানের জন্য কমিটি বোর্ড প্রভৃতি

১৯৫৪ সালের ন্যূনতম মজুরি (সংশোধন) আইনে (Minimum Wages Amendment Act, 1954) নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত রাজ্যকে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিতে হইবে। ইহার ফলে কতকগুলি রাজ্য আইনকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। পশ্চিমবংগে চাউলের কল, ময়দার কল, তেলের কল, পথনির্মাণ-কার্য, চর্ম-শোধন কারখানা প্রভৃতির বেলায় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়। কিন্তু উক্ত তারিখ অতিবাহিত করার পর দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কারণে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। প্রধানত, এই কারণেই ১৯৫৭ সালে ন্যূনতম মজুরি আইনের আর এক দফা সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনে বলা হয় যে ১৯৫৯ সালের মধ্যে কৃষি সমেত সকল প্রকার শ্রমিকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি আইনকে প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৫৯ সালের মধ্যে তালিকাভুক্ত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা সম্ভব হয় নাই।*

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের সময়বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৮ সালের আইনের ব্যবস্থা অনুসারে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ধার্য ন্যূনতম মজুরির পুনর্বিবেচনাও সকল ক্ষেত্রে করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ ঐ আইন অনুসারে পাঁচ বৎসরের পর আর পুনর্বিবেচনা করা যায় না। ১৯৫৭ সালের সংশোধন দ্বারা এই অসুবিধাও দূর করা হইয়াছে। বর্তমানে পাঁচ বৎসর পরেও পুনর্বিবেচনা করা যায়। সংশোধিত আইনটির অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে মজুরির হার পুনর্নির্ধারণ (revision) পদ্ধতিতে সমতা আনয়ন করা, ন্যূনতম মজুরি আদায় ব্যাপারে দাবি-কর্তৃপক্ষকে (claims authority) অধিকতর ক্ষমতা প্রদান, আইনভংগ-

মজুরির হারের পুনর্বিবেচনার সময়বৃদ্ধি

অন্যান্য ব্যবস্থা

* Report of the Ministry of Labour and Employment, 1959-60.

কারীর বিরুদ্ধে শাস্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, এবং সরকারী ঠিকাদারদের ঠিকমত মজুরি প্রদানে বাধ্য করা।*

ন্যূনতম মজুরি আইন প্রয়োগ ব্যাপারে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে মজুরি আইন ও উহার নিয়মকানুনকে মানিয়া চলিতে চায় না এবং ধার্য মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি দিয়া থাকে। অনেক সময় আবার মালিক ধার্য মজুরি না দিয়াও শ্রমিকদের নিকট হইতে লিখাইয়া লয় যে তাহারা নির্দিষ্ট হারেই মজুরি পাইয়াছে। মালিকরা মজুরি সংক্রান্ত কাগজপত্রাদিও রাখে না; ফলে আইনভংগ করিয়াছে কিনা তাহা ধরাও কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক সরকারের সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে, নিয়মিতভাবে সরকারী ইনস্পেক্শন করা হইলে এবং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য ও শিক্ষাবিস্তার করা হইলে এই দুর্নীতি অনেক পরিমাণে রোধ করা সম্ভব হইবে।

ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করার পথে বাধা

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের নীতি (Principles or Norms of Minimum Wage Fixation): ন্যূনতম মজুরি ধার্য ব্যাপারে আর একটি বিবেচ্য বিষয় হইল যে উহা কোন্ নীতির উপর ভিত্তি করিয়া স্থির করা হইবে। এই সম্পর্কে ট্রাইবুনালগুলি (Tribunals) যে-সকল রায় প্রদান করিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ন্যায্য মজুরি কমিটির (Fair Wages Committee) মতামতই গৃহীত হইয়াছে। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য যাহা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন তাহাই ন্যায্য মজুরি এবং অন্য কোন বিষয় বিচার না করিয়া তাহা শ্রমিককে দিতেই হইবে।** ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে (The Fifteenth Indian Labour Conference) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য কতকগুলি নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ভারতের সর্বত্র ঐ নীতিগুলি প্রয়োগ করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। এখন সম্মেলনের নীতিগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

ন্যূনতম মজুরি ধার্যের নীতি

উপরি-উক্ত ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ বলেন যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পথে অনেক অসুবিধা আছে। ন্যূনতম মজুরি ধার্যের কোন মান না থাকায় সালিসি-মীমাংসা করা কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য সঠিকভাবে নীতি বা মান স্থির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সম্মেলনে স্থির হয় যে ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজনভিত্তিক (needbased) হইবে এবং মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবে। এই উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মজুরি ধার্যের ব্যাপারে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিবার সুপারিশ করা হয়:

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মান

* Indian Labour Gazette—December, 1956,

** ,, ,, ,, February. 1957.

(১) ন্যূনতম মজুরি হিসাব করিবার সময় ধরিতে হইবে যে প্রত্যেক শ্রমিকের সংসারে শ্রমিককে ধরিয়া মোট ৪ জন করিয়া লোক আছে; (২) প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের যতটা ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বলিয়া ডাঃ আকরয়েড (Dr. Akroyd) অভিমত দিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই ন্যূনতম খাদ্যের হিসাব করিতে হইবে;* (৩) মাথাপিছু ১৮ গজের ভিত্তিতে প্রত্যেক সংসারে বৎসরে ৭২ গজ কাপড় প্রয়োজন ধরিতে হইবে; (৪) সরকারী শিল্প গৃহ-পরিকল্পনায় (Industrial Housing Scheme) যে ন্যূনতম জায়গার কথা বলা হইয়াছে তাহার জন্য যতটা ভাড়া প্রয়োজন তাহা ন্যূনতম মজুরির হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে; (৫) জ্বালানি, বাতি ও অন্যান্য ব্যয় মোট ন্যূনতম মজুরির শতকরা ২০ ভাগ বলিয়া ধরিতে হইবে।

নীতিগুলি কার্যকর করার ব্যবস্থা

এই নীতিগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রমিকদের দুরবস্থা কতকটা লাঘব করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য শ্রমিকদের সহযোগিতা পাইতে হইলে নীতিগুলির ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি ধার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে কর্তৃপক্ষ নীতিগুলিকে মানিয়া লইয়া যাহাতে ন্যূনতম মজুরি উহাদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি দেয়। পশ্চিমবংগ সরকার ন্যূনতম মজুরি ধার্যের সময় এই নীতিগুলি অনুসরণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। বিভিন্ন বোর্ড এবং কমিটিও নীতিগুলির ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি ধার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরে অবশ্য নীতিগুলি ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হইতে থাকে।

নীতিগুলি প্রবর্তনের বিরোধিতা

হিসাব করিয়া দেখান হয় যে এই নীতি অনুসারে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা হইলে উহা স্থান বিশেষে দাঁড়াইবে ১১০ টাকা হইতে ১৫০ টাকায়। বর্তমান অবস্থায় এই হারে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হইলে অনেক শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন হইবে। ইহার ফলে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ঐ নীতি কার্যকর করিলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কারণ, উহার ফলে যে-পরিমাণ ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে সে-পরিমাণ অর্থসংস্থান করা সম্ভব হইবে না। আরও বলা হইয়াছে, মজুরিবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যাইবে ও জিনিপত্রের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষত, বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় ও মূল্যবৃদ্ধি পাইলে রপ্তানি সম্প্রসারণ সম্ভব হইবে না উপসংহারে বলা যায়, ন্যূনতম মজুরি ধার্য করা সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে না, তবে ধার্যের ব্যাপারে উপরি-উক্ত নীতি কতদূর প্রযোজ্য তাহার আর একবার বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন।

* ডাঃ আকরয়েডের মতে একজন সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে ২,৭০০ ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন।

ন্যায্য মজুরি (Fair Wages) : ন্যূনতম মজুরি ধার্যের প্রশ্নের সহিত জড়িত রহিয়াছে ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন। ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, শ্রমিকরা যাহাতে সুস্থ সবল ও সহজ জীবনযাপন করিতে পায় তাহার জন্য আইন প্রণয়ন বা উপযুক্ত অর্থনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র শ্রমিকদের জীবনধারণোপযোগী মজুরি প্রদানের চেষ্টা করিবে।* ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের উপযোগিতা অনস্বীকার্য; কিন্তু ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়। যাহাতে উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা যায়, যাহাতে শ্রমিকরা পরিজনবর্গ লইয়া কতকটা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরি প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে-সমস্ত শিল্পে মজুরি শোচনীয়ভাবে স্বল্প সেখানে উন্নতির পথে প্রথম সোপান হইল ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে বাঁচিয়া থাকিবার মত ব্যবস্থা করা। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পরবর্তী ধাপ হইল সর্বত্র ন্যায্য মজুরি (fair wages) প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও বলা হইয়াছিল যে, শ্রমিকরা যাহাতে বর্ধিত হারে প্রকৃত মজুরি (real wages) পায় তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরি-নীতি প্রবর্তিত করা প্রয়োজন; এবং এই নীতির মূল ভিত্তি হইবে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ন্যায্য অংশ শ্রমিকদের প্রদানের ব্যবস্থা করা।** দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয় যে ন্যায্য মজুরিতে শ্রমিকদের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।† বস্তুত, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ন্যায্য মজুরিতে শ্রমিকের অধিকারকে অস্বীকার করিতে পারে না।

ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়

জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়নের জন্য ন্যায্য মজুরি প্রদানের ব্যবস্থাও করিতে হইবে

বলা যায়, স্বাধীনতার পর হইতেই সরকার ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সালে শিল্প শান্তি সম্মেলন (Industrial Truce Conference) ন্যায্য মজুরি সম্পর্কে সুপারিশ করে। ফলে ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় পরামর্শদান কাউন্সিল ন্যায্য মজুরি প্রদানের প্রশ্ন বিচার-বিবেচনার জন্য একটি কমিটি (Fair Wages Committee) নিয়োগ করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি ন্যায্য মজুরি বিলও উত্থাপন করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলটি আইনে পরিণত হয় নাই।

ন্যায্য মজুরি কমিটি

এই প্রসংগে ন্যায্য মজুরি কমিটির (Fair Wages Committee) মতামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। কমিটির মতে, যাহাতে জাতীয় আয়ের সম্প্রসারণ ব্যাহত না

* রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি—সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদ।

** First Five Year Plan-এর ৫৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা।

† Second Five Year Plan-এর ৫৭১-৭৮ পৃষ্ঠা।

হয় মূলত, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে (factors of production) জাতীয় আয় বণ্টন করিতে হইবে। কিন্তু বৈষম্যমূলক বণ্টন মূলধন গঠন ও জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহায়ক হইলেও, সামাজিক ন্যায়ের দিক হইতে উহা মোটেই কাম্য নহে; অপরপক্ষে প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনানুযায়ী দিতে হইবে (each according to his need)—এই নীতি অনুসারে জাতীয় আয় বণ্টনের সাম্যমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইলে মোট জাতীয় আয় দ্রুত হ্রাস পাইবে। সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করিয়াই ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

কমিটির মতে, ন্যায্য মজুরি কিভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে

'ন্যায্য মজুরি' বলিতে কি বুঝায় সেই সম্পর্কে কমিটির অভিমত হইল যে উহা 'জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি'র (living wage) হার হইতে কম হইবে কিন্তু 'ন্যূনতম মজুরি'র (minimum wage) হার হইতে অধিক হইবে। এখন আবার প্রশ্ন উঠে যে 'জীবনধারণোপযোগী মজুরি'র সংজ্ঞা কি? শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য যাহা নিতান্তই প্রয়োজন তাহাকে বলা হইয়াছে ন্যূনতম মজুরি, আর উন্নতধরনের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাকে বলা হইয়াছে 'জীবনধারণোপযোগী মজুরি'।

ন্যায্য মজুরি সম্বন্ধে কমিটির ধারণা

ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সকল শ্রমিকের উন্নত জীবনমানের উপযোগী মজুরি প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে যাহাতে শ্রমিকদের জীবনে কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা ন্যায্য মজুরি ধার্যের মাধ্যমে করিতে হইবে। এই ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা হইবে যথাক্রমে 'ন্যূনতম মজুরি' ও শিল্পের মজুরি প্রদানের সামর্থ্য (the capacity of the industry to pay)। এই দুই সীমার মধ্যে থাকিয়া মজুরি ধার্য করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে: (১) শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা, (২) প্রচলিত মজুরির হার, (৩) জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও বণ্টন, এবং (৪) দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট শিল্পের স্থান।

ন্যায্য মজুরির নিম্নতম ও উচ্চতম সীমা হইল যথাক্রমে ন্যূনতম মজুরি ও শিল্পের সামর্থ্য

নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট শিল্পের সামর্থ্যই হইবে শিল্পের মজুরি-প্রদানের মাপকাঠি। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ইহাই হইল ন্যায্য মজুরি ধার্য ও কার্যকরণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। সামগ্রিকভাবে কোন শিল্পের যাহা ন্যায্য মজুরি বলিয়া বিবেচিত তাহা প্রদানের ক্ষমতা থাকিলেও 'প্রান্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি'র (marginal units) জন্য মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সুতরাং পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থার সহিত রাখিয়া এই প্রান্তিক এককগুলির সংযুক্তিকরণের সুপারিশ করা হয়।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরি

* **Second Five Year Plan**-এর ৫৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা।

ঐ পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ব্যাপারে আরও তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়—যথা, (১) মজুরি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক ; (২) ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থায় মজুরি প্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রমিকদের আশা ; এবং (৩) ন্যায্য মজুরি ধার্য না হওয়া পর্যন্ত মজুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে শিল্প-সংঘর্ষ।

মজুরি ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাপারে বলা হয় যে, ন্যূনতম মজুরির ঊর্ধ্বে উপার্জন নিশ্চয়ই উৎপাদনের আপেক্ষিক হইবে। অর্থাৎ, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে তবেই মজুরি বাড়িবে। ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থায় মজুরি প্রাপ্তি সম্পর্কে শ্রমিকদের আশা সম্বন্ধে বক্তব্য হইল যে, মজুরি কমিশন (Wage Commission) সময়ান্তরে ইহা নির্ধারণ করিয়া থাকিবে ; এবং মজুরি কমিশনের কাজ সহজ করিবার জন্য অবিলম্বেই মজুরি সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ন্যায্য মজুরি ধার্য না হওয়া পর্যন্ত মজুরি সংক্রান্ত শিল্প-সংঘর্ষ মীমাংসার ভার ত্রিদলীয় (tripartite) মজুরি বোর্ড (wage boards) হস্তেই দেওয়া উচিত।

পরিকল্পনার ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের ভিত্তি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ন্যায্য মজুরি ধার্যের উপরি-উক্ত নীতি মোটামুটি গ্রহণ করা হয়। নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার তুলাবস্ত্র, সিমেন্ট ও চিনি শিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মজুরি বোর্ড (Central Wage Boards) গঠন করে। বোর্ডগুলির কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে।

উপসংহারে বলা যায়, ন্যায্য মজুরি সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। সুতরাং উহাকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতকটা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় অনেকাংশে কার্যকর করিতেই হইবে। নচেৎ, পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

(গ) সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইন (Social Security Legislation)ঃ মাত্র আইনের দ্বারা মজুরি নির্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা বা দুর্ঘটনার চিন্তা হইতে শ্রমিককে রক্ষা না করিতে পারিলে তাহার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব হইবে না। যে-কোন সময় সে পীড়িত হইতে পারে, যে-কোন সময় কারখানায় তাহার দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে এবং যে-কোন সময় সে বেকার হইয়া পড়িতে পারে। এই সমস্ত অবস্থায় শ্রমিককে সাহায্যের ব্যবস্থা করা শুধু মানবোচিত কার্যই নয়, উৎপাদনের স্বার্থেও কাম্য। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমনীতির মূলসূত্র হইল শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। ভারতে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। অবশ্য ইহার কারণও আছে। পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক চেতনা যেভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে আমাদের দেশে তাহা হয় নাই। ঐ সকল দেশে শ্রমিকরা বিনা

শ্রমিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

এ-বিষয়ে ভারত পশ্চাৎপদ

দোষে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলে সমাজ তাহাদের দায়িত্ব বহন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিকরা সুসংগঠিত এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। ফলে মালিকশ্রেণী এবং রাষ্ট্রকে বাধ্য হইয়া শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। যাহা হউক, ভারতেও সম্প্রতি সমাজ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি কিছু কিছু প্রবর্তিত হইতেছে।

১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (The Employees' State Insurance Act, 1948) প্রণীত হওয়ার পূর্বে ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (The Workmen's Compensation Act, 1923) এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রসূতি কল্যাণ আইনে (Maternity Benefit Acts) কিছু কিছু সমাজ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করা হয়। শেষোক্ত এই দুইটি আইন যে-সমস্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন প্রযুক্ত হইবে সেই সমস্ত অঞ্চলে কার্যকর হয় না, কারণ রাষ্ট্রীয় বীমা আইনেই ক্ষতিপূরণ এবং প্রসূতি কল্যাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(১) শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (The Workmen's Compensation Act): ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনটির একাধিকবার সংশোধন করা হইয়াছে। সর্বশেষ সংশোধন করা হয় ১৯৫৯ সালে। এই ক্ষতিপূরণ আইন অনুসারে কার্যব্যপদেশে দুর্ঘটনার ফলে কোন শ্রমিক অসমর্থ বা পংগু হইয়া পড়িলে অথবা তাহার মৃত্যু ঘটিলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। শিল্পগত ব্যাধির দ্বারা পংগু হইলেও শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারে। কেরাণী ও পরিচালনাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য যে-সমস্ত শ্রমিক ৪০০ টাকার নিম্নে বেতন পায় তাহাদের বেলাই এই আইন প্রযোজ্য। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতির গুরুত্বের উপর নির্ভর করে।

এই আইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই

শ্রমিকগণ এই আইনের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই, কারণ অধিকাংশ শ্রমিকই তাহাদের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহা ছাড়া শিল্পগত ব্যাধির ক্ষেত্রে এই আইন একপ্রকার অকার্যকরই রহিয়া গিয়াছে।

(২) প্রসূতি কল্যাণ আইন (Maternity Benefit Acts): বিভিন্ন রাজ্য সরকার আইন পাস করিয়া নারী-শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম প্রসূতি কল্যাণ আইন পাস করে বোম্বাই সরকার। ইহার পর অন্যান্য অঞ্চলে অনুরূপ আইন পাস হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের আইন ছাড়াও তিনটি কেন্দ্রীয় আইনে প্রসূতি কল্যাণের ব্যবস্থা আছে। আইন তিনটি হইল ১৯৪১ সালের খনি প্রসূতি কল্যাণ আইন (Mining Maternity Benefit Act, 1941) শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (Employees State Insurance Act, 1948) এবং ১৯৫১ সালের রোপণ শিল্প-শ্রমিক আইন (Plantation Labour Act, 1951)।

প্রসূতি-কল্যাণের জন্য যাহাতে সকল অঞ্চল ও সকল শিল্পক্ষেত্রে একই রকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহার জন্য একটি নূতন কেন্দ্রীয় আইন পাসের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(৩) **শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইন (Employees' State Insurance Act):** ১৯৪৮ সালের শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা আইনে (The Employees' State Insurance Act, 1948) যে বীমা পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। এরূপ ব্যাপক পরিকল্পনা পূর্বে করা হয় নাই এবং যথাযথভাবে কার্যকর করা হইলে ইহাতে শ্রমিকেরা প্রকৃতই উপকৃত হইবে। স্থির করা হইয়াছিল যে এই আইনটিকে প্রথমে কতকগুলি মনোনীত অঞ্চলে প্রয়োগ করিয়া পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত করা হইবে। এই ব্যবস্থায় মালিকপক্ষ হইতে আপত্তি উঠে। তাঁহারা বলেন, যে-সমস্ত অঞ্চলে আইনটি কার্যকর করা হইবে সে-সমস্ত অঞ্চলের মালিকদের অর্থপ্রদান করিতে হইবে বলিয়া অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পের তুলনায় তাঁহাদের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে। প্রধানত এই আপত্তির দরুনই ১৯৫১ সালে আইনটির এক সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন অনুসারে পরিকল্পনার জন্য দেশের সকল শিল্প-মালিককেই অর্থপ্রদান করিতে হয়। তবে যে-সমস্ত অঞ্চলে বীমা পরিকল্পনাকে চালু করা হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলে মালিকদের উচ্চতর হারে অর্থপ্রদান করিতে হয়। বীমা আইনটির প্রধান প্রধান ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল:

সামাজিক নিরাপত্তার পথে বৃহৎ পদক্ষেপ

১৯৫১ সালের সংশোধন

পরিধি (Scope): এই আইন যে-সমস্ত শক্তিচালিত স্থায়ী কারখানায় ২০ বা ততোধিক শ্রমিক কার্য করে সেই সমস্ত কারখানার বেলায় প্রথমে প্রযুক্ত হইবে। সংশ্লিষ্ট সরকার অবশ্য যে-কোন প্রতিষ্ঠানের বেলায় আইনটিকে প্রয়োগ করিতে পারে। ৪০০ টাকার নিম্নে যে-সমস্ত শ্রমিক এবং কেরানী মজুরি বা বেতন পায় তাহারাই এই আইনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

সাহায্য (Benefits): আইনে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে:

(ক) পীড়িতাবস্থায় সাহায্য (Sickness Benefit): পীড়িত অবস্থায় বীমাকারীদের নগদ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা এই আইনে করা হইয়াছে। ৩৬৫ দিনে সর্বাধিক ৫৬ দিনের জন্য এই সাহায্য পাওয়া যায়। দৈনিক সাহায্যের হার হইল সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের গড়পড়তা দৈনিক মজুরির অর্ধেক। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্য নির্দিষ্ট স্থানে চিকিৎসা করাইতে হইবে।

(খ) প্রসূতিদের সাহায্য (Maternity Benefit): এই আইন শ্রমিক প্রসূতিদেরও অর্থসাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অর্থসাহায্যের হার হইল দৈনিক

১২ আনা। সন্তান প্রসবের ৬ সপ্তাহ পূর্ব হইতে সন্তান প্রসবের পর ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত এই সাহায্য দেওয়া হয়।

(গ) অকর্মণ্য অবস্থায় সাহায্য (Disablement Benefit): কার্যব্যপদেশে কোন দুর্ঘটনার ফলে যদি কোন শ্রমিক সাময়িক বা স্থায়ীভাবে, সম্পূর্ণ বা অংশত অকর্মণ্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে হয়। সাময়িক অকর্মণ্যতার দরুন ঐ সময়ের জন্য অর্ধেক গড়পড়তা মজুরির হারে অর্থসাহায্য পায়। আর স্থায়ী বা সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতার জন্য সারাজীবন ঐ হারে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে।

(ঘ) পোষ্যদের সাহায্য (Dependents Benefit): কোন বীমাকারী শ্রমিকের কার্যব্যপদেশে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানরা নির্দিষ্ট হারে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে।

(ঙ) চিকিৎসার স্থবিধা (Medical Benefit): বীমাকারী শ্রমিক অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করে। বিনামূল্যে ডাক্তার, ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা এই বীমা পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। ব্যাধি কঠিন হইলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি এবং রোগীর বাড়ীতে ডাক্তার প্রেরণ করা হয়। যাহারা সুদূর গ্রামে বাস করে তাহাদের জন্য ভ্রমণশীল ডিস্‌পেন্সারীর (mobile dispensary) প্রবর্তন করা হইয়াছে। এমনকি বীমা করপোরেশন সম্ভব মনে করিলে বীমাকারী শ্রমিকদের পরিজনবর্গের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে পারে।

পরিচালনার ভার রাষ্ট্রীয় বীমা করপোরেশনের হস্তে ন্যস্ত

পরিচালনা ও অর্থ (Administration and Finance): এই বীমা পরিকল্পনার পরিচালনা শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা করপোরেশন (The Employees' State Insurance Corporation) নামে সংস্থার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই করপোরেশন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী, এবং কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, মালিক, শ্রমিক, চিকিৎসক ও সংসদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত।

রাষ্ট্রীয় বীমা তহবিল ও উহার গঠন

পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য যে-অর্থ প্রয়োজন হয় তাহা শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা তহবিল (The Employees' State Insurance Fund) হইতে আসে। এই তহবিল শ্রমিক ও মালিক যে-অর্থ প্রদান করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যে-অর্থ মঞ্জুর বা সাহায্য করে তাহা লইয়া গঠিত। আয় অনুযায়ী বীমাকারী শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বীমার হার নির্দিষ্ট হইয়াছে। মালিকদের বেলায় তাহারা যে মোট মজুরি প্রদান করে তাহার শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করিতে হয় তবে যে-সমস্ত অঞ্চলে পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে সেখানে মালিকদের উচ্চতর হারে অর্থ প্রদান করিতে হয়।

পরিকল্পনাটিকে সর্বপ্রথমে ১৯৫২ সালে কানপুর ও দিল্লীতে চালু করা হয়। পরে অন্যান্য রাজ্যেও উহাকে প্রসারিত করা হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত ২৯১/২ লক্ষের মত লোক এই পরিকল্পনার অধীনে আসে। আশা করা হইয়াছে যে ১৯৬১ সালের মধ্যে পরিকল্পনাটি সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত হইবে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণভাবে বীমাধীন শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারী স্থাপিত হইবে।*

পরিকল্পনাটির প্রসার

(৪) **শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনা (Employees' Provident Fund Scheme)**: সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়। পরে এই অর্ডিন্যান্সের স্থান পূরণ করে ১৯৫২ সালের শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন (The Employees' Provident Fund Act, 1952)। বর্তমানে এই আইনকে বয়ন, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, কাগজ, সিগারেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, দিয়াশলাই, চিনি প্রভৃতি ৩৯টি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অবশ্য এই সকল শিল্পে যে-সমস্ত কারখানা ৫০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে তাহারাই এই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানাসমূহকে পরিকল্পনাটির অধীনে আনিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত কারখানা অথবা তিন বৎসর ধরিয়া চালু হয় নাই এমন কারখানার বেলায় আইনটি প্রযোজ্য নহে। এই আইনানুসারে মালিককে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে শ্রমিকদের মজুরি এবং দুর্মূল্য ভাতার শতকরা ৬১/৪ ভাগ হারে অর্থ প্রদান করিতে হয়: শ্রমিকরাও ঐ পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। তবে শ্রমিকরা ইচ্ছা করিলে শতকরা ৮১/৩ ভাগ পর্যন্ত অর্থ প্রদান করিতে পারে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের পরিচালনার ব্যয় মালিককে বহন করিতে হয়।

১৯৫২ সালের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন

পরিধি

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের গঠন

পরিকল্পনার প্রসার

১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত ৭,৪৫১টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠান এবং ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক এই পরিকল্পনাধীনে আসে।* মোটামুটি আর ৬-৭ লক্ষ শ্রমিককে এই পরিকল্পনাধীনে আনয়ন করিলেই উহা সকল শিল্প-শ্রমিকের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইবে। আশা করা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই এ কার্য সমাপ্ত হইবে।

* Depart of the Ministry of Labour and Employment for the year 1959-60

এই পরিকল্পনা ব্যতীত কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্য বোনাস ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা ভারত সরকার করিয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।* ১৯৫৬ সালের এক সংশোধন দ্বারা এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ব্যবস্থাকে রোপণ শিল্প ও অন্যান্য খনি শিল্পে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে।

কয়লাখনির প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও বোনাস পরিকল্পনার সম্প্রসারণ

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমনীতি (Labour Policy under Planned Economy): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রবর্তিত শ্রম আইন-গুলিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিবার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সম্মিলিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-বিবাদের মীমাংসা এবং শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বীমা ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনা প্রভৃতি সংক্রান্ত আইনগুলিকে কার্যকর-করণ; কারখানা, খনি ও রোপণ শিল্পে কার্যের সর্তাদির উন্নতি-সাধন; শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মসূচী গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত উৎপাদন সম্পর্কিত নানা সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান (Central Labour Institute) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে সরকার, শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতায় উক্ত প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করিবার ব্যবস্থাও করা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রমনীতি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রমিক সম্পর্কে নীতির কোন বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই; তবে সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার নীতি অবলম্বনের দরুন কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরিকল্পনায় বলা হয়, শ্রমিক যে তাহার ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করিতেছে ইহা তাহার পক্ষে অনুভব করিবার প্রয়োজন আছে, এবং এই কারণে শিল্পগত গণতন্ত্রের (industrial democracy) সৃষ্টি হইল সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজের অন্যতম মূল সর্ত।†

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রমনীতি

সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় শিল্প-ক্ষেত্র (public sector) সম্প্রসারিত হওয়ায় এই ক্ষেত্রে কার্যের সর্তাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়—কারণ সরকারী শিল্পক্ষেত্রের কার্যের সর্তাদিই হইবে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রের (private sector) কার্যের সর্তাদির আদর্শ। সুতরাং পরিকল্পনা কমিশন উপযোগী শ্রমনীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে একটি প্রতিনিধিমূলক শ্রম সম্পর্কিত প্যানেল (panel) গঠন করে। এই প্যানেল নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে:

শ্রম সম্পর্কিত প্যানেলের সুপারিশ

---

* ৪৭২ পৃষ্ঠা দেখ।

† Second Five Year Plan-এর ৫৭২ পৃষ্ঠা

(১) আইনের সাহায্যে শ্রমিক সংঘগুলিতে শিল্প-বহির্ভূত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস এবং সংঘের কর্মচারীদের ভীতি প্রদর্শনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে; নিজস্ব তহবিলের সাহায্যেই সংঘগুলিকে আর্থিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে এবং আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত নীতি

শিল্প-বিবাদ সম্পর্কিত নীতি

(২) বিবাদ-মীমাংসার জন্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং স্বেচ্ছামূলক সালিসি-ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। সরকার মাত্র চরম অবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবে।

(৩) শিল্প-বিবাদ আইনে শ্রম-বিবাদ সংক্রান্ত রায় বা সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার বর্তমান অবস্থা যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য একটি স্থায়ী শিল্প ট্রাইবুনাল (a Standing Industrial Tribunal) গঠন করা প্রয়োজন।

(৪) সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা (The Joint Consultative Machinery) সমস্ত পর্যায়ে ভালভাবে কার্য করিতেছে না—যেমন, কার্য-সংসদগুলির (Works Committees) কার্য মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। সুতরাং আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।

(৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে শিল্প-বিবাদ হ্রাস পাইবে এবং অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। অতএব প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিচালনা পরিষদ (a Council of Management) গঠন করা প্রয়োজন। এই পরিষদ আর্থিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করিতে পারিবে।

শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ

(৬) যাহাতে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরিনীতি প্রবর্তিত করিতে হইবে। একদিকে উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করা যেমন প্রয়োজন, অপরদিকে আবার শ্রমিকরা যাহাতে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ন্যায্য অংশ পায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। উৎপাদনের সহিত মজুরিপ্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে; তবে মজুরির একটা ন্যূনতম হার নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

উৎপাদনানুযায়ী মজুরিপ্রদান

(৭) সমস্ত শিল্পেই মজুরিসংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য ত্রিদলীয় মজুরি বোর্ড (Tripartite Wages Board) অনতিবিলম্বে গঠন করা প্রয়োজন।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড

(৮) কর্মচারী বা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পরিকল্পনাকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

(৯) কার্যের সর্তাদির উন্নতির জন্য বিভিন্ন আইনকে যথাযথভাবে কার্যকর করিতে হইবে। পরিবহন, দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে কার্যের সর্তাদি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থা

(১০) বোম্বাই-এ যে কেন্দ্রীয় শ্রম সংস্থা (The Central Labour Institute) গঠিত হইয়াছে তাহার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় করিতে হইবে।

শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

(১১) বিভিন্ন রাজ্যে অধিক সংখ্যক শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র (Welfare Centres) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং শ্রমিক ও মালিক সংগঠন এবং সরকার এই শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্রগুলির পরিচালনা করিবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

ব্যয়-বরাদ্দ

প্যানেলের উপরি-উক্ত সুপারিশগুলির অধিকাংশই পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত হইয়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পরিকল্পনার শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে কার্যক্রম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত: শ্রমিক সংঘকে সুসংগঠিত করা, প্রধানত পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সালিসি-ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিল্প সম্পর্কে উন্নতিসাধন করা, শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা আনয়ন করা, প্রথমে ন্যূনতম মজুরি এবং পরে ন্যায্য মজুরি ধার্যকরণ, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতর ব্যবস্থা, র‍্যাসানালাইজেশন সম্বন্ধে সতর্কতা, প্রায় ২০ হাজার অধিক শিক্ষার্থীকে শিল্প শিক্ষা প্রদান করা, নিয়োগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জাতীয় নিয়োগ সংস্থার (National Employment Service) প্রসার, শিল্প শ্রমিক সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণা, ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাসগৃহাদির উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রম-অনুসন্ধান। বাসগৃহ ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৯ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রমও অনুরূপ হইবে ঘোষণা করা হইয়াছে। তবে এই পরিকল্পনার কারিগরি শিক্ষা ও বাসস্থান ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

শ্রম-কল্যাণ (Labour Welfare): শ্রম-কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনার সুরুতেই শ্রম-কল্যাণের অর্থ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা প্রয়োজন।

শ্রম-কল্যাণের সংস্থা

আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টের সংজ্ঞানুসারে শ্রম-কল্যাণ হইল শিল্পাভ্যন্তরীণ বা শিল্পের সন্নিহিত স্থানে সংগঠিত সেই সমস্ত কল্যাণকর কার্য ও সুযোগ-সুবিধা যাহার ফলে শ্রমিকরা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কার্য করিতে পারে এবং তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধিত হয়। অর্থাৎ শ্রমিকদের নৈতিক মানসিক শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিকের উন্নতি-

† The Report of the II ILC Asian Regional Conference-এর ৩ পৃষ্ঠা।

বিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শ্রম-কল্যাণকর কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ক্যান্‌টিন, বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ, যাতায়াতের সুবিধা, বাসগৃহাদির ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, সমবায় প্রতিষ্ঠান, নারী-শ্রমিকদের জন্য শিশুরক্ষার স্থান, প্রসূতি-কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রম-কল্যাণের অন্তর্গত।

শ্রম-কল্যাণের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। প্রথমত, শ্রম-কল্যাণকর কার্যাদি শিল্পে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সহায়ক। রাষ্ট্র ও মালিকরা কল্যাণকর ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিলে তাহাদের প্রতি শ্রমিকরা বিরূপ মনোভাব পোষণ করিবে না; এই ধারণা হইবে যে রাষ্ট্র ও মালিক তাহাদের কল্যাণের বিষয়ে নির্লিপ্ত নয়। শিল্পে শান্তিরক্ষার পক্ষে এই মনোভাবের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

শ্রম-কল্যাণের গুরুত্ব : ১। ইহা শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক

দ্বিতীয়ত, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির অভাবে স্থায়ী ও দক্ষ শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং অবিলম্বেই প্রয়োজন হইল পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নয়নের ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের। বাসগৃহ, সমবায়-সংগঠন, ক্যান্‌টিন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, পেন্‌সন, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করা হইলে শিল্পাঞ্চলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী গঠিত হইবে। ফলে কার্যে অনুপস্থিত ও কর্মস্থল পরিত্যাগের হারও হ্রাস পাইবে।

২। ইহা শ্রমিক গঠনের সহায়ক

তৃতীয়ত, মানবতার প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও সামাজিক দিক হইতে শ্রম-কল্যাণের মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। যথা, নিঃসংগ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপনের ফলে শ্রমিকরা নানাপ্রকার আবিলতার দিকে সহজেই আকৃষ্ট হয়; বাসগৃহ ও আমোদ-প্রমোদের সুবন্দোবস্ত করিয়া এই অবনতির হাত হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। আবার চিকিৎসা, প্রসূতিকল্যাণ প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং শিশুমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হয়। শিক্ষাবিস্তারের ফলে শ্রমিকদের মানসিক উৎকর্ষ ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রম-কল্যাণ বিভিন্ন দিক হইতে সমাজের কল্যাণ সাধিত করে।

৩। ইহা সামাজিক কল্যাণ বর্ধিত করে

এই প্রসংগে আমাদের একটি বিষয় স্মরণ করা প্রয়োজন। শ্রমিকদের প্রকৃত কল্যাণ করিতে হইলে উপযুক্ত মনোভাব লইয়া কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মালিকরা শ্রমিক সংঘগুলিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে ঐগুলিকে ব্যবহার করে; তাহারা সুযোগ-সুবিধা দান ব্যাপারে শ্রমিক সংঘের অন্তর্গত এবং অন্যান্য শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের সংঘ পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করে। শ্রমিকদের কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ অধিক প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। পরিণামে এই মনোভাব উভয় পক্ষেরই স্বার্থ বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে।

শ্রমিকের প্রকৃত কল্যাণের জন্যই কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করিতে হইবে

ভারতে যে-সমস্ত কল্যাণকর ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) যে-সকল কল্যাণ ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হইয়াছে; এবং (২) যে-সকল ব্যবস্থাদি মালিকরা স্বেচ্ছায় প্রবর্তন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রমিকরা নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছু কিছু শ্রম-কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

ভারতে প্রবর্তিত শ্রমকল্যাণ-ব্যবস্থা:

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে সরকার শ্রম-কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। ভারত সরকার যুদ্ধের সময় সক্রিয়ভাবে শ্রম-কল্যাণ প্রসারের চেষ্টা করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের উৎসাহবর্ধন। স্বাধীনতালাভের পর ভারত যখন কল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করিল তখন স্বাভাবিকভাবে শ্রম-কল্যাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার ফলে বহু প্রকারের শ্রম-কল্যাণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা সম্ভব হইয়াছে। কয়লাখনি ও অভ্রখনিগুলিতে শ্রম-কল্যাণ তহবিল (Labour Welfare Funds) প্রতিষ্ঠা, প্রধান প্রধান শিল্পে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড গঠনের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের জন্য সমাজ নিরাপত্তামূলক ও গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার প্রবর্তন, ফ্যাক্টরী, খনি ও রোপণ শিল্পে কার্যের সর্তাদি মানবোচিত করিবার জন্য আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রভৃতি কল্যাণকর ব্যবস্থাদির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর শ্রম-কল্যাণের সম্প্রসারণ

বিভিন্ন শ্রম-কল্যাণ তহবিল

কয়লাখনি শ্রম-কল্যাণ তহবিলের (The Coal Mines Labour Welfare Fund) সাহায্যে কয়লাখনির শ্রমিক ও তাহাদের পরিজনবর্গের চিকিৎসা, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ, ভ্রাম্যমাণ ক্যান্টিন, চলচ্চিত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থসংগ্রহ করা হয় কয়লা প্রেরণের উপর শুল্ক বসাইয়া।

কয়লাখনির মত অভ্রখানির জন্যও শ্রম কল্যাণ তহবিল (Mica Mines Welfare Fund) রহিয়াছে এবং অনুরূপ উপায়ে এই তহবিলের অর্থ সংগ্রহ করা হয়। চিকিৎসার বন্দোবস্ত, নিরক্ষরতা দূরিকরণ, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা প্রভৃতি শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যাদির জন্য তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হয়।

১৯৫১ সালের রোপণ শিল্প শ্রম আইনে (Plantations Labour Act, 1951) বিধান রহিয়াছে যে সকল রোপণ শিল্পকে শ্রমিকদের জন্য আবাসগৃহ এবং হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সারির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন, ১৯৫২ সালের খনি আইন প্রভৃতির মাধ্যমেও শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারখানা আইনে ক্যান্টিন, শিশু রক্ষণাবেক্ষণের স্থান, বিশ্রামের স্থান, স্নানাগার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। খনি আইনেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত রাজ্য সরকারগুলি নানাভাবে শ্রম-কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিতেছে। বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে শ্রম-কল্যাণ তহবিল গঠনের নিমিত্ত আইন প্রণীত হইয়াছে। শরীরচর্চা, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির জন্য শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগে এই ধরনের অনেকগুলি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং শ্রমিকদের জন্য বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য ডিস্‌পেন্‌সারি রহিয়াছে।

রাজ্য সরকারগুলির শ্রম-কল্যাণ প্রচেষ্টা

অনেক স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের উদ্যোগে শ্রম-কল্যাণের সুবন্দোবস্ত করিয়াছে। টাটার লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী, দিল্লীর কাপড় ও জেনারেল মিল (The Delhi Cloth and General Mills), মাদ্রাজের বাকিংহাম ও কার্ণাটিক মিল, কানপুরের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ও জে. কে. ইণ্ডাষ্ট্রিজ, নাগপুরের এম্প্রেস্ মিল, মাদুরা মিল, আমেদাবাদের ক্যালিকো মিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রম-কল্যাণ প্রচেষ্টা

শ্রম-কল্যাণের একটি বিশেষ দিক হইল শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহাদির সুবন্দোবস্ত করা। সম্প্রতি এদিকেও সরকার মনোনিবেশ করিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য ও ঋণ প্রদানের নীতি গৃহীত হয়। ১৯৫২ সালে যে 'সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প গৃহনির্মাণ' (Subsidised Industrial Housing) পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে গৃহনির্মাণের ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সাহায্য এবং বাকী অর্থ ঋণ হিসাবে দেওয়া স্থির করে। মালিক ও শ্রমিকদের সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলিকে গৃহনির্মাণের ব্যয়ের জন্য শতকরা ২৫ ভাগ সাহায্য করা হয়। ইহা ব্যতীত ঋণদানেরও ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হয়। মালিক এবং সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে অধিকমাত্রায় গৃহনির্মাণ কার্যে অগ্রণী হয় তাহার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই উদ্দেশ্যে যে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয় সে-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।* খসড়া তৃতীয় পরিকল্পনা হইতে জানা যায় যে ঐ পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হইবে।

শ্রমিকের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা

প্রশ্নোত্তর

1. What are the characteristics of Industrial Labour in India? Is village nexus desirable?

[ইংগিত: ভারতীয় শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য হইল: (১) স্থানীয় শিল্প-শ্রমিকের অভাব; (২) কার্যে অনুপস্থিতির হার অধিক; (৩) শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার অভাব; (৪) দক্ষ শ্রমিকের অপ্রাচুর্য এবং (৫) নিম্ন উৎপাদন-ক্ষমতা।...৪২৬-৪২৭ পৃষ্ঠা।]

* ৪৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

2. Discuss the causes of comparative inefficiency of Indian labour. Suggest measures for removing the inefficiency. (C. U. B. Com. 1948, '50)

[ইংগিত: ভারতীয় শ্রমিক স্বভাবতই নিকৃষ্ট ধরনের নহে। তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা স্বল্প হইবার জন্য প্রধানত দায়ী হইল তাহার প্রতিকূল পারিপার্শিক অবস্থা এবং কার্যের সর্তাদি। যাহাই হউক ভারতীয় শ্রমিকের অদক্ষতায় যে-সমস্ত কারণ প্রদর্শিত হয় তাহা হইল: (১) মানসিক উৎকর্ষ বা উদ্ভাবনী শক্তির অভাব; কিন্তু এই অভিযোগ সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না; (২) ভারতের জলবায়ু অধিক পরিশ্রম ও অধিক উৎপাদনের অনুকূল নহে; (৩) ভারতীয় শ্রমিকের মজুরি সুস্থ সবল জীবনযাপনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে; (৪) ভারতীয় শ্রমিক নিকৃষ্টতর যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল লইয়া কার্য করে; (৫) কারখানাগুলির পরিবেশ ও অধিক উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে; (৬) অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ; এবং (৭) নিরক্ষরতা ও শিল্প-শিক্ষার অভাব।

শ্রমদক্ষতা উন্নয়নের পন্থাসমূহ: (১) সাধারণ ও শিল্প-শিক্ষার বিস্তার; (২) কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতিসাধন; (৩) চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা; (৪) খাদ্যপুষ্টির উন্নয়ন; (৫) পর্যাপ্ত পরিমাণে বাসগৃহ নির্মাণ; (৬) শ্রমিকদের আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টা; (৭) শ্রম-উৎপাদন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা; (৮) তত্ত্বাবধান বা পরিচালন-ক্ষমতার উন্নতিসাধন; (৯) শ্রমিকদের ঋণভার হ্রাস; (১০) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির প্রবর্তন; এবং (১১) শ্রমিককে পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট করা.........

এবং ৪২৭-৪৩১, ৪৩১-৪৩৪ পৃষ্ঠা।]

3. Discuss the causes of Industrial Disputes in India. What measures have been taken to promote industrial peace in the country? (C. U. B. A. 1951, '52, '57 ; B. Com. 1951, '52) (৪৩৬-৪৩৭, ৪৩৮-৪৪৯ পৃষ্ঠা।)

4. Discuss the causes of Industrial Disputes in recent years in India. How far would you favour compulsory arbitration as a means of settling such disputes at the present time? (C. U. B. A. 1954. '57 ; B. Com. 1953, '56)
(৪৩৬-৪৩৮, ৪৪৩, ৪৪৫-৪৪৬ পৃষ্ঠা)

5. Describe and comment on the measures adopted by the Government to settle industrial disputes in India. (C. U. B. Com, 1960) (৪৪০-৪৪৮পৃষ্ঠা)

6. Examine the causes of recent Labour unrest in India. Comment on the measures that have been adopted for promoting industrial peace in the country.

(C. U. B. A. 1958, '60) (৪৩৬-৪৩৮, ৪৪০-৪৪৬ পৃষ্ঠা)

7. What measures have been taken in recent years to provide social security to industrial workers? Give your answer with special reference to Employees' State Insurance Scheme. (C. U. B. A. 1953)

[ইংগিত: ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমা আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রসূতি-কল্যাণ আইনে কিছু কিছু সমাজ-নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে যে-সমস্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইবে সেই সমস্ত অঞ্চলে শেষোক্ত দুইটি আইন প্রযুক্ত হইবে না। কারণ বীমা পরিকল্পনার মধ্যেই প্রসূতি-কল্যাণ ও শ্রমিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বীমা পরিকল্পনা সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। এই পরিকল্পনায় পীড়িত অবস্থায়, অকর্মণ্য অবস্থায়, প্রসূতিদের এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটিলে শ্রমিকদের পোষ্যদের প্রতি অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিনামূল্যে চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

সম্প্রতি আবার শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বোনাস পরিকল্পনা এবং ১৯৫২ সালের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।......

এবং ৪৬৮-৪৭৩ পৃষ্ঠা]

8. Trace the growth of the Trade Union Movement in India. (C. U. B. Com. 1957) Suggest measures for removing the obstacles to the development of Trade Unionism in this country.

[ইংগিত: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাগুলি হইল—(১) স্থায়ী শিল্প-শ্রমিকের অভাব; (২) শ্রমিকের দারিদ্র্য ও অবসর সময়ের অভাব; (৩) শ্রমিকের মধ্যে ঐক্যের অভাব; (৪) শিক্ষার অভাব ও অদৃষ্টবাদ; (৫) মালিক শ্রেণীর বিরোধিতা; (৬) গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব; (৭) সংঘগুলি ধর্মঘটের সংস্থা হিসাবেই কার্য করে; এবং (৮) শ্রমিক নেতৃবর্গ বাহিরের লোক এবং ৪৪৯-৪৫১, ৪৫১-৪৫৪ পৃষ্ঠা]

9. Would you advocate minimum wages for industrial workers in India? Discuss the principles that may be followed in fixing minimum Wage. (C. U. B. A. 1959; B. Com. 1958) (৪৬২, ৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠা)

10. Write a short note on the policy of the Government regarding fair wages to industrial workers. (৪৬৬-৪৬৮ পৃষ্ঠা)

11. What, according to you, are the norms that should be followed by the wage-fixing authorities in calculating the Minimum Wage? (৪৬৪-৪৬৫ পৃষ্ঠা)

12. Give in brief the labour policy and programme of the Government of India under our planned economy.

[ইংগিত: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শ্রম সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে: (১) শ্রমিক সংঘগুলিতে শিল্পবহির্ভূত ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। উহাদের আর্থিক দিক হইতে শক্তিশালী ও আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। (২) বিবাদ-মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা ও স্বেচ্ছামূলক সালিসি-ব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। (৩) শ্রম-বিবাদ সম্পর্কিত রায় বা সিদ্ধান্তকে সম্যকভাবে কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) সমস্ত পর্যায়ে যাহাতে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা ভালভাবে কার্য করে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। (৫) শিল্প-পরিচালনা ব্যাপারে শ্রমিকরা যাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহার জন্য প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন। (৬) যাহাতে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য উপযুক্ত মজুরি নীতি প্রবর্তিত করিতে হইবে। (৭) মজুরি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য ত্রিদলীয় মজুরি বোর্ড প্রবর্তন করা প্রয়োজন। (৮) কর্মচারী বা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। (৯) কার্যের সর্তাদির উন্নতিসাধনের জন্য আইনকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। (১০) শ্রমিক মালিক ও সরকারের যুগ্ম পরিচালনায় শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্রের প্রসারসাধন করিতে হইবে।

পরিকল্পনায় শ্রমিক সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত: শ্রমিক সংঘগুলিকে সংগঠিত করা, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সালিসি-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্কে উন্নতিসাধন করা, প্রথমে ন্যূনতম এবং পরে ন্যায্য মজুরি ধার্যকরণ, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপকতর ব্যবস্থা, শিল্প-শিক্ষার ব্যাপকতর ব্যবস্থা, নিয়োগ সংগঠনের প্রসার, শিল্প-শ্রমিক সম্বন্ধে অধিকতর গবেষণা, বাসগৃহাদির উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকার শ্রম অনুসন্ধান। পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ বায় হইল ৭৯ কোটি টাকা (বাসগৃহের জন্য ৫০ কোটি এবং অন্যান্য খাতে ২৯ কোটি টাকা।......এবং ৪৭৩-৪৭৫ পৃষ্ঠা]

13. What do you mean by Labour Welfare? What measures have been taken to promte the welfare of Industrial Labour in India?

[ইংগিত: আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের রিপোর্ট অনুসারে শ্রম কল্যাণ বলিতে বুঝায় শিল্পাভ্যন্তরীণ বা শিল্পের সন্নিহিত স্থানে সংগঠিত সেই সমস্ত কল্যাণকর কার্য ও সুযোগ-সুবিধা যাহার ফলে শ্রমিকেরা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কার্য করিতে পারে—যাহাতে তাহাদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল দিকের উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টাকেই শ্রম-কল্যাণ বলিয়া অভিহিত করা যায়।......এবং ৪৭৫-৫৭৮ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পরিবহন

(TRANSPORT)

অর্ধোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবহনের গুরুত্ব (Importance of Transport in an Underdeveloped Economy) : ইংরাজ কবি কিপলিং পরিবহনকে সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পরিবহন সভ্যতার বাহন ও সূচক উভয়ই। ইহা অজানাকে জানাইয়া, দূরকে নিকট বন্ধু করিয়া তুলিয়া সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থায় অকল্পনীয় পরিবর্তনসাধন করে। ভারতের ন্যায় দেশে গ্রামসমূহের স্বতন্ত্রতা, জনগণের রক্ষণশীলতা, শ্রমের অচলতা এবং ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয়-ব্যবস্থার কারণ হইল পরিবহনের অব্যবস্থা। আবার জাতীয় প্রতিরক্ষা, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ প্রভৃতির দিক দিয়াও পরিবহনের গুরুত্বকে কোন অংশে ন্যূন করিয়া দেখা যায় না। রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিলে পরিবহনকে রাষ্ট্রের স্নায়ুমণ্ডলী বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

অর্ধোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় পরিবহনের গুরুত্ব আরও অধিক। পরিবহনের অব্যবস্থা অর্ধোন্নত দেশসমূহের অস্তিত্বের অন্যতম কারণ ; এবং পরিবহনের সুব্যবস্থাকে উন্নয়ন-পরিকল্পনার (development planning) অন্যতম প্রধান উপাদান বলিয়া গণ্য করা হয়। পরিবহন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে সামাজিক মূলধন গঠন (social capital formation) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এইরূপ সামাজিক মূলধন গঠনের মাধ্যমেই আমাদিগকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বর্তমানে ইহাই করা হইতেছে।

সামাজিক মূলধন গঠন

ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থা (Indian Transport System) : ভারতের বর্তমান পরিবহন-ব্যবস্থা প্রধানত ব্রিটিশ আমলের সৃষ্টি। ব্রিটিশ আমলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে চলাচলের উল্লেখযোগ্য উপায় হিসাবে মাত্র কয়েকটি দীর্ঘ রাজপথ ছিল এবং সিন্ধু ও গংগা নদীর অধিকাংশ অংশ বাণিজ্যিক জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তারপর লর্ড ডালহৌসীর সময়ে গোড়াপত্তন হয় আধুনিক পরিবহন-ব্যবস্থার।

বর্তমানে ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থা বলিতে রেলপথ, রাজপথ, আভ্যন্তরীণ জলপথ, সমুদ্রপথ এবং বিমানপথ বুঝায়। এগুলির আলোচনা করিতে হইলে সংগে সংগে মোটরযান চলাচল, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতির আলোচনাও করিতে হয়। আলোচনা রেলপথ হইতে সুরু করা হইবে।

বর্তমান পরিবহন-ব্যবস্থা

রেলপথ (Railways) : রেলপথ ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ইহাকে যথার্থই জাতির জীবনরেখা বলিয়া বর্ণনা করা চলে। প্রায় ১,১০০ কোটি টাকার মত বিনিয়োজিত মূলধন এবং প্রায় ৩৫ হাজার মাইল দৈর্ঘ্য লইয়া ভারতীয় রেলপথ হইল বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। উপরন্তু, ইহাকে জাতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় অন্যতম মূলভিত্তি বলিয়াও গণ্য করিতে হইবে।* দৈর্ঘ্যের দিক দিয়া ভারতীয় রেলপথ পৃথিবীতে চতুর্থ এবং এসিয়ায় প্রথম স্থানাধিকার করে। নিয়োগ-সংস্থা হিসাবেও ইহার সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ১১ লক্ষের উপর লোক ভারতীয় রেলপথে নিযুক্ত।**

ভারতে রেলপথের গুরুত্ব

ভারতে রেলপথ নির্মাণ (Construction of Railways in India) : ভারতে রেলপথ নির্মাণের ইতিহাস হইল একরূপ বৈচিত্র্যময়। রেলপথ কখনও বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কখনও বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নির্মিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মাণের বিভিন্ন সময়ে সরকার বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন প্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছে।

১৮৪৪ সালে সর্বপ্রথম দুইটি রেলপথ—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হইলেও ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রকৃত ইতিহাস সুরু করিতে পারা যায় ১৮৫৩ সাল হইতে। ঐ সালে লর্ড ডালহৌসীর এক পত্র প্রেরণের ফলেই ভারতে রেলপথ স্থাপনের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। পত্রটিতে বর্ণিত মুখ্য বিষয়গুলি ছিল এইরূপ : (১) রেলপথ নির্মাণের ফলে ভারতের কাঁচামাল সহজেই ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করা যাইবে। (২) ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের ভাল বিক্রয়-বাজারও ভারতে রহিয়াছে; রেলপথ নির্মাণের দ্বারা ইহাকে সুসংগঠিত করা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে রেলপথ দ্বারা দেশের অভ্যন্তরের সহিত বন্দরগুলির যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। (৩) ভারতে রেলপথ নির্মাণের ভার ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরই ন্যস্ত করা উচিত।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

লর্ড ডালহৌসীর সুপারিশ অনুসারে সরকার ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রথমে আটটি ব্রিটিশ কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির সর্তানুসারে কোম্পানীগুলিকে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয় এবং কোম্পানী কর্তৃক বিনিয়োজিত মূলধনের উপর সরকার শতকরা ৪·৫-৫ হারে সুদ দিতে প্রতিশ্রুত থাকে। প্রতিশ্রুত হার অপেক্ষা কোম্পানীগুলি যদি অধিক মুনাফা লাভ করিত তবে অতিরিক্ত মুনাফার অর্ধেক সরকারকে দিতে হইত। নির্মাণের পর ২৫ বৎসর অতিবাহিত হইলে যে-কোন রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবার অধিকার সরকারের ছিল।

পুরাতন প্রতিশ্রুতি-প্রথা

---

* Second Five Year Plan-এর ৪৬০ পৃষ্ঠা।

**India—1959.

কোম্পানীগুলি প্রতিশ্রুত হারের অধিক মুনাফা লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় এই প্রতিশ্রুতি-প্রথা—যাহা পুরাতন প্রতিশ্রুতি-প্রথা (Old Guarantee System) বলিয়া অভিহিত—সরকারের পক্ষে গুরুতর আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়। সেইজন্য ১৮৬৯ সালে সরকার ইহা হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় অর্থে রেলপথ নির্মাণের ভার গ্রহণ করে। নানা অসুবিধার জন্য ১০ বৎসরের মধ্যেই আবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণের নবগৃহীত নীতি পরিত্যক্ত হয়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে রেলপথ নির্মাণ

অতঃপর প্রতিশ্রুতি-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। এবারে চুক্তির সর্ত সরকারের পক্ষে অনুকূল করিয়া নির্ধারণ করা হইল। প্রতিশ্রুত সুদের হার শতকরা ৩·৫-এ নির্ধারণ করা হইল এবং অতিরিক্ত মুনাফার তিন-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। এই নূতন প্রথা নব প্রতিশ্রুতি-প্রথা (New Guarantee System) বলিয়া অভিহিত।

নব প্রতিশ্রুতি-প্রথা

বিংশ শতাব্দীর সুরু হইতেই ভারতীয় রেলপথসমূহ বেশ মোটা রকমের মুনাফা করিতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সরকার রেলপথের পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য কয়েকটি কমিটি নিযুক্ত করে। ইহার মধ্যে অন্যতম হইল এ্যাক্ওয়র্থ কমিটি (Acworth Committee)। এই এ্যাক্ওয়র্থ কমিটির সুপারিশ অনুসারে নীতি হিসাবে সরকার রেলপথ পরিচালনা ও নির্মাণের দায়িত্ব স্বীয় হস্তে গ্রহণ করে। ফলে ধীরে ধীরে কোম্পানী পরিচালিত রেলপথগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হইতে থাকে।

রাষ্ট্র কর্তৃক রেলপথ পরিচালনা ও নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ

দেশবিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ৪০·৫ হাজার মাইল রেলপথের মধ্যে প্রায় ৩৪ হাজার মাইল ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িলেও দেশের কয়েকটি অংশের মধ্যে রেলপথ সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে কয়েকটি রেলপথ স্থাপনকার্য অনতিবিলম্বেই সুরু করিতে হয়। ইহার মধ্যে আসাম-লিংক ও মুখেরিয়ান-পাঠানকোট (Mukherian-Pathankot) লাইনই হইল প্রধান। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার মাইলের কাছাকাছি নূতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে।* এ-সকলই সম্পাদিত হইয়াছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীনে। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মূল শিল্পনীতি অনুসারে রেলপথ রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে। ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে (Revised Industrial Policy) ইহারই পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

দেশবিভাগ ও নূতন রেলপথ নির্মাণ

শিল্পনীতি অনুসারে রেলপথ সরকারের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে

ভারতে রেলপথ নির্মাণের ফলাফল (Effects of Railways in India): ভারতে রেলপথের গুরুত্ব অনুধাবন করিবার ফলে এ-ধারণা করিয়া

* India—1959.

বসিলে ভুল করা হইবে যে রেলপথ আমাদের দেশে অবিমিশ্র আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। একদিকে রেলপথ নির্মাণ যেমন শিল্প ও কৃষিতে বিপ্লব সংঘটিত করিয়া দেশের সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থায় রূপান্তর আনয়ন করিয়াছে, অন্যদিকে ইহা তেমনি নানা অনিষ্টসাধনও করিয়াছে। এখন অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশে এই ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইতেছে।

রেলপথ ভারতে অবিমিশ্র আশীর্বাদ বহন করিয়া আনে নাই

বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করে। ভারতে ইহার ব্যবহার শিল্প ও কৃষি—উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লব সংঘটিত করে। বস্তুত, এসিয়ার মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কারকে কাজে লাগাইয়া রেলপথ নির্মাণে অগ্রসর হয়। ইহার ফলে এই কৃষিপ্রধান দেশে সর্বপ্রথম সংঘাত আসে কৃষির উপর। বিপ্লবের ফলে কৃষিতে রূপান্তর ঘটিতে থাকে। পূর্বে কৃষি ছিল জীবিকানির্বাহের সূত্র ; বর্তমানে ইহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাণিজ্যের মাধ্যম। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রেলপথ স্থাপনের জন্য কৃষি বাণিজ্যিক রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে ভারতীয় কৃষকেরা প্রধানত বিক্রয়ের জন্য শস্য উৎপাদন করে, নিজের ব্যবহারের জন্য নহে। রেলপথ মারফৎ এই সকল কৃষিজ পণ্য গ্রামাঞ্চল হইতে দেশের অন্যান্য স্থানে ও বন্দরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তারপর বন্দর হইতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিদেশে চালান দেওয়া হয়। সুতরাং বর্তমানে ভারতীয় কৃষিকার্য বিশ্বের বাজারের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবং ইহা রেলপথ স্থাপনেরই ফল।

সুফল :

১। কৃষির বাণিজ্যিক রূপ ধারণ

শিল্পের ক্ষেত্রে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, রেলপথের জন্য শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তনে উৎপাদন-ব্যবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগও ইহার ফলে উন্নত হইয়াছে। রেলপথের বিস্তৃতির ফলে শিল্পসমূহের পক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সুলভে কাঁচামাল আমদানি করা এবং দেশের ব্যাপকতর বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে। রেলপথ স্থাপন ভারতের শিল্পোন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রেরণা যোগাইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কয়লাখনি শিল্প প্রভৃতি রেলপথগুলিকে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিয়া বিশেষ লাভবান হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতে রেলপথ স্থাপনই কয়লাখনি শিল্পের গোড়াপত্তন করে। আমাদের রেলপথগুলি বিরাট পরিমাণে দেশের অরণ্যজাত দ্রব্যের ব্যবহারও করিয়া থাকে।

২। শিল্পোন্নয়নে সহায়তা

ভারতে রেলপথ স্থাপন দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য—উভয়েরই পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার ফলে বহু সুসংগঠিত বাজারের সৃষ্টি হইয়াছে। রেলপথ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে বহন করিয়া এই সকল বাজারে লইয়া আসে। পণ্য আবার রপ্তানিযোগ্য হইলে তাহা বন্দরের দিকে লইয়া যাওয়া যায়। অপরদিকে আমদানিকৃত এবং দেশের শিল্পাঞ্চলে উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে রেলপথ দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছাইয়া দেয়।

৩। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

ভারতে রেলপথ স্থাপন দুর্ভিক্ষের প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাইয়াছে। রেলপথ মারফৎ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অঞ্চলে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্য দ্রুত সরবরাহ সম্ভব হওয়ায় দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ হইয়াছে। ফলে দুর্ভিক্ষের ভয়াল-ভয়ংকর মূর্তি আর নাই। দুর্ভিক্ষ বর্তমানে আর খাদ্যের দুর্ভিক্ষ (food famines) নহে, ইহা অর্থের দুর্ভিক্ষ (money famines)।

৪। দুর্ভিক্ষের রূপান্তর

রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতেও রেলপথ স্থাপনের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের দ্বারা ভারতীয় রেলপথ জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি সম্ভব করিয়াছে। ভারতের সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থারও অন্যতম মূলভিত্তি হিসাবে রহিয়াছে ভারতীয় রেলপথ। বহু শতাব্দী পরে এদেশে রাষ্ট্রনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সূত্রে গ্রথিত যে 'মহাভারতে'র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে তাহাতে রেলপথের দান একরূপ অপরিমেয় বলিলেই চলে।

৫। জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি

রেলপথ ভারতের সমাজজীবনেও আলোড়ন আনিয়াছে। দূরদূরান্তরে গমনাগমন সহজসাধ্য এবং পাশ্চাত্য উদার ভাবধারার প্রসার সম্ভব করিয়া ভারতীয় রেলপথ বর্ণভেদ সংক্রান্ত কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতা হইতে উৎপন্ন প্রাচীন পদ্ধতি ভাঙিয়া ফেলিতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

৬। সমাজজীবনে আলোড়ন

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রেলপথ হইতে সরকারের যথেষ্ট পরিমাণে আয় এবং ইহাদের সাহায্যে সরকারী প্রচারকার্যেও বিশেষ সুবিধা হয়।

৭। সরকারী আয়বৃদ্ধি ও প্রচারকার্যে সুবিধা

এখন চিত্রের অপরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, রেলপথ ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্প ধ্বংস করিয়াছে, জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি করিয়াছে, ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঔপনিবেশিক রূপদান করিয়াছে, ভারতকে ম্যালেরিয়ার মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিয়াছে, প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করিয়াছে কিন্তু নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই।

কুফল :

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, প্রাচীন ভারত কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। রেলপথ নির্মাণের ফলে বিদেশী যন্ত্রোৎপাদিত সুলভ পণ্যসমূহ এদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে এই সকল কুটির শিল্প ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এইভাবে ভারতের প্রাচীন কুটির শিল্পসমূহের অবলুপ্তিতে ভারতীয় রেলপথের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রহিয়াছে।

১। প্রাচীন কুটির শিল্পের ধ্বংস

ভারতীয় শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে এদেশের কাঁচামাল বিদেশে চালান হইতে থাকে। রেলপথসমূহই ইহাদের বহন করিয়া বন্দরে লইয়া যায়। ফলে ভারত হইয়া দাঁড়ায় কাঁচামাল রপ্তানি ও উৎপন্ন দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্র। এইরূপ বহির্বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক (colonial) বহির্বাণিজ্য বলে। এই ঔপনিবেশিক বহির্বাণিজ্যের ফলে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের বহু পরিমাণ ধ্বংস ঘটিয়াছে।

২। ঔপনিবেশিক বহির্বাণিজ্য

তৃতীয়ত, কুটির শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভূতপূর্ব কুটির শিল্পী কৃষিতে যাইয়া ভিড় করিতে বাধ্য হয়। ফলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং মাথাপিছু কৃষি-জমির পরিমাণ কমিতে থাকে। আয়ের বিকল্প সূত্রের অভাবে কৃষির ক্ষেত্রে অর্ধ-নিয়োগের (under-employment) সমস্যাও দেখা দেয়। এইভাবে অর্থ-নৈতিক জীবনে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া ফেলিয়া ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়।

৩। কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধি

চতুর্থত, ভারতে রেলপথ নির্মাণ কখনও পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয় নাই। রেলপথগুলির জন্য নির্মিত বাঁধ বৃষ্টির জল নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলিকে বন্ধ করিয়া অনেক অঞ্চলে, বিশেষত পশ্চিমবংগে, এনোফিলিস মশার জন্মগ্রহণের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এইজন্য ম্যালেরিয়াকে 'ভারতীয় রেলপথের দান' বা ভারতীয় রেলপথ প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপরন্তু, রেলপথের বাঁধের জন্য স্বাভাবিক জলনিকাশ ব্যাহত হওয়ায় বন্যার প্রকোপও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার।

৪। ম্যালেরিয়া ও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি

৫। বৈদেশিক মূলধন-জনিত ত্রুটি

ভারতে রেলপথ স্থাপিত হয় বৈদেশিক মূলধনের দ্বারা। সুতরাং বৈদেশিক মূলধনের কিছু ত্রুটি ইহার সহিত গভীর-ভাবে জড়িত।

পরিশেষে, রেলপথ স্থাপন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় আলোড়ন আনয়ন করিয়াছে সত্য কিন্তু সংগে সংগে ইহা সামাজিক নিরাপত্তা (social security) সমস্যাও সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা বর্ণভেদ প্রথাকে শিথিল করিয়াছে, যৌথ পরিবারের ভিত্তিতে নাড়া দিয়াছে কিন্তু নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সামাজিক নিরাপত্তার এই সকল প্রাচীন পদ্ধতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের স্থলে নূতন কিছু গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং এই দিক দিয়া সামগ্রিক মূল্য নির্ধারণে ভারতে রেলপথ স্থাপনকে 'আশীর্বাদ' বলিয়া কোনমতেই গ্রহণ করা চলে না।

৬। সামাজিক নিরাপত্তার সমস্যার উদ্ভব

ভারতে রেলপথ স্থাপনের যে-কুফল তাহার অধিকাংশের জন্য দায়ী হইল বিশেষ নির্মাণপদ্ধতি ও নির্মাণনীতি। যদি পরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেশের উন্নতি-সাধনের জন্য রেলপথ নির্মাণ করা হইত তবে নির্মাণজনিত বহু ত্রুটিই দূর হইত। সুতরাং রেলপথ নির্মাণে কোন অন্তর্নিহিত ত্রুটি নাই। বৈদেশিক শাসনের কয়েকটি ত্রুটি ভারতীয় রেলপথের সহিত গভীরভাবে জড়িত রহিয়াছে মাত্র। যদি অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের উদ্দেশ্যে রেলপথ নির্মাণ করা হইত, তবে ভারতের এতটা অর্ধোন্নত রূপ কখনই থাকিত না। তাহা করা হয় নাই বলিয়াই রেলপথ স্থাপনের কুফল বর্ণনা করিতে হয়।

উপসংহার

স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতিসাধন (Railway Development in Free India) : ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, দেশবিভাগের ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ৪০.৫ হাজার মাইল রেলপথের মধ্য হইতে প্রায় ৩৪ হাজার মাইল ভারতের অংশে পড়ে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, দেশবিভাগের ফলে দেশের কয়েকটি অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কয়েকটি রেলপথ নির্মাণকার্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সুরু করিতে হয়।* ইহার পরে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও কয়েকটি নূতন রেলপথ স্থাপন এবং উৎপাটিত রেলপথের পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এ-সম্বন্ধে কিছু পরেই আলোচনা করা হইতেছে।

কিন্তু স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতিসাধন বলিতে শুধু নূতন রেলপথ স্থাপনই বুঝায় না। বরং ইহার অধিক বুঝায় যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় রেলপথের পুনর্বাসন।

প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথ সংক্রান্ত কর্মসূচীতে পুনর্বাসনই ছিল প্রধান বিষয়

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয় রেলপথসমূহের সম্মুখে গভীরতম সমস্যা হইল পুনর্বাসন ও সরঞ্জাম সরবরাহের সমস্যা। বিগত ২০ বৎসর ধরিয়া ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ভারতীয় রেলপথসমূহের সাজ-সরঞ্জামের অত্যধিক ব্যবহার করিয়া আসা হইতেছিল। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সময় তাহাদের আয় কমিয়া যাওয়ায় অবপূর্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। অবশ্য ১৯৩৭ সাল হইতে রেলপথসমূহ ধীরে ধীরে মন্দাবাজারের কবলমুক্ত হইয়া ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আরম্ভ করিতেছিল, এমন সময় বাধিয়া উঠিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ; এবং ফলে স্বভাবতই এই পদ্ধতি হইল ব্যাহত।

যুদ্ধের সময় বহু পরিমাণ রেললাইন মালগাড়ী রেলইঞ্জিন প্রভৃতিকে দেশের বাহিরে যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ২৬টি শাখা লাইনকে উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইয়াছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়েকটি রেলওয়ে কারখানাকে যুদ্ধের মালমসলা উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থাকে ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে হয় ; এবং এইভাবে বাকী কাজ অস্বাভাবিকভাবে উত্তরোত্তর বর্ধিত আকার ধারণ করিতে থাকে।

যুদ্ধের পরেই আসিল দেশবিভাগ। ইহার ফলে ভারত হইতে উত্তর-পশ্চিম রেলপথের (N. W. Railway) সহিত চলিয়া গেল সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে কারখানাগুলি। অনুরূপভাবে অবিভক্ত ভারতের বাংলা-আসাম রেলপথের খণ্ডিকরণ, ভারত ডোমিনিয়নের আসাম রেলপথের জন্য কোন কারখানা বা দেশের অবশিষ্টাংশের সহিত কোন সংযোগ রাখিল না। করাচী বন্দর ভারত হইতে বিচ্যুত হওয়ায় নূতন কান্দলা বন্দরের সৃষ্টি করিতে এবং কান্দলা-দিসা (Kandala-Deesa) নামক নূতন রেলপথ স্থাপন কার্য আরম্ভ করিতে হইল।† উপরন্তু, যুদ্ধোত্তর যুগে ও দেশবিভাগের ফলে

* ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† First Five Year Plan-এর ৪৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

যাত্রী ও মাল চলাচলের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি রেলপথসমূহের দক্ষতার উপর অকল্পনীয় চাপ দিতে থাকিল।

এহেন পরিস্থিতিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ সুরু হইল। পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ করা হয় ৪০০ কোটি টাকা কিন্তু ব্যয় হয় ৪৩২'০৭ কোটি টাকা।*

প্রথম পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতিসাধন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যসূচীর মধ্যে নূতন রেলপথ স্থাপন, উৎপাটিত রেলপথ পুনঃস্থাপন, ছোট রেললাইনকে বড় লাইনে পরিবর্তন, ইঞ্জিন নির্মাণ ও সংগ্রহ, কোচ নির্মাণ ও সংগ্রহ, মালগাড়ী নির্মাণ ও সংগ্রহ, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের অধিকতর সুবিধা প্রদান, মোকামার নিকট গংগা নদীতে পুল নির্মাণ এবং কলিকাতার নিকট লাইনকে বৈদ্যুতিকিকরণ হইল প্রধান। নূতন রেলপথের মধ্যে ১৯৫২ সালে কান্দলা-দিসা রেলপথ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী সময়েই মুখেরিয়ান-পাঠানকোট লাইন খোলা হয়। ইহা ছাড়া অনেক ছোট-খাট লাইন স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে মোট ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে এবং স্বাধীনতার পর হইতে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত মোট নূতন রেলপথ স্থাপনের পরিমাণ হইল ১ হাজার মাইলের কাছাকাছি। এ-সম্বন্ধে অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।†

১। নূতন রেলপথ স্থাপন

২। উৎপাটিত রেলপথকে পুনঃস্থাপিত করণ প্রভৃতি

নূতন রেলপথ নির্মাণ ছাড়াও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ৪৩০ মাইলের মত উৎপাটিত রেললাইনকে পুনঃস্থাপিত এবং ৪৬ মাইলের মত ছোট লাইনকে (narrow gauge lines) বড় লাইনে (broad gauge lines) পরিবর্তিত করা হয়। চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যেই ৩৩৭টি ইঞ্জিন নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। পেরাম্বুরের কোচ নির্মাণ কারখানা ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে কার্য সুরু করে। ইহা ছাড়া টাটার ইঞ্জিন তৈয়ারি কারখানা (Tata Locomotive Engineering Company) ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ১৭০ খানির মত ছোট ছোট রেলইঞ্জিন নির্মাণ করে। ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে রেলপথসমূহ দেশ ও বিদেশ হইতে মোট ১৫ শতের উপর ইঞ্জিন, ৪'৫ হাজারের উপর যাত্রীবাহী কোচ এবং ৬১ হাজারের উপর মালবাহী গাড়ী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ইহা ছাড়া পুরাতন সাজ-সরঞ্জামের পরিবর্তন-সাধন অনেকাংশে করা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া রেলওয়ে পরিবহন-ব্যবস্থায় যুদ্ধপূর্ব যুগের পরিচালন-দক্ষতা (operational efficiency) কতকটা

৩। ইঞ্জিন নির্মাণ

৪। কোচ নির্মাণ

৫। ইঞ্জিন, কোচ প্রভৃতি সংগ্রহ

৬। পরিচালন-দক্ষতা বৃদ্ধি

* Review of the First Five Year Plan-এর ২৩১ পৃষ্ঠা।

† ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ফিরিয়া আসে ; এবং ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় রেলপথসমূহের যাত্রী ও মাল পরিবহনের ক্ষমতা শতকরা ২৪·৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়।*

৭। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সুবিধা

পরিচালন-দক্ষতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভ্রমণকে অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ করিয়া তোলার প্রশ্ন। অবশ্য অধিক পরিমাণে যাত্রীবাহী কোচ সরবরাহ করিতে পারিলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভ্রমণ আরামপ্রদ হইয়া উঠে। কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থাও—যথা, তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বৈদ্যুতিক পাখা সংযুক্ত করা, দূরগামী যাত্রীদের জন্য রাত্রে শয়নের ব্যবস্থা, বড় বড় ষ্টেশনে বিশ্রামাগার নির্মাণ ইত্যাদি—করা প্রয়োজন। পরিকল্পনায় এই সকল ব্যবস্থা রেলপথের উন্নতিসাধনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; এবং ১৯৫০-৫১ সাল হইতে বৎসরে ৩ কোটি টাকা করিয়া এই খাতে বরাদ্দ করা হইতেছে।

৮। মোকামার পুল নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক ট্রেণ-চলাচলের ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়েই আবার উত্তর বিহারের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য মোকামার নিকট গংগা নদীর উপর পুল নির্মাণ, কলিকাতার নিকটবর্তী লাইনের বৈদ্যুতিকিকরণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই দুই পরিকল্পনার মধ্যে মোকামার পুল নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিসনে বৈদ্যুতিকিকরণ কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৮ সাল হইতে কলিকাতা-বর্ধমান মেন লাইন ও তারকেশ্বর লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন-চলাচল করিতেছে।

৯। অন্যান্য নূতন লাইন স্থাপন পদ্ধতি

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য যখন সুরু হয় তখন এই দুই পরিকল্পনার কার্য ছাড়াও ৪২৭ মাইল নূতন রেলপথের নির্মাণ বা পুনরুদ্ধারকার্য এবং ৫২ মাইল ছোট লাইনের বড় লাইনে পরিবর্তনকার্য চলিতেছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতিসাধন (Railway Development under the Second Five Year Plan) : খসড়া পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেলপথসমূহের পক্ষে প্রধান কার্য হইবে যাত্রী ও মালপত্রের জন্য যাতায়াতের বর্ধিত চাহিদা মিটান।** পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে, এই সময়ের মধ্যে মালপত্রের গমনাগমন ৬·১ কোটি টনের মত বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৮·১ কোটি টনে পৌছিবে। এই ৬·১ কোটি টনের মধ্যে রেলপথ দ্বারা মাত্র ৪·২ কোটি টন বহন করা সম্ভব হইবে। ইহা প্রতি বৎসর শতকরা ৩ ভাগ হারে অধিক যাত্রী বহন করিবে।†

১। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য যাত্রী ও মালপত্র চলাচলের বর্ধিত চাহিদা মিটান

* Review of the First Five Year Plan-এর ২৩০-৩৫ পৃষ্ঠা।

** Second Five Year Plan—A Drafts Outline-এর ১৪৩ পৃষ্ঠা।

† Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা।

যাত্রী গমনাগমনের পরিকল্পনায় যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যাত্রী গমনাগমনের যে-চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে (শতকরা ৬·৭ ভাগ) তাহা মিটাইবারই ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, গাড়ীতে ভিড়ের চাপ কমাইবার ব্যবস্থা করা ত' দূরের কথা।

২। দ্বিতীয় প্রধান লক্ষ্য নূতন রেলপথ স্থাপন

পরিকল্পনায় রেলপথসমূহের সম্মুখে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল নির্মীয়মাণ লৌহ ও ইস্পাত কারখানাসমূহের ন্যায় শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কয়লাখনি প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নূতন রেললাইন পাতা। এই নূতন রেললাইনের পরিমাণ ৫০০ মাইলের মত হইবে। ইহা ছাড়াও আছে উদয়পুর-হিম্মৎনগর রেলপথ, ঝাঁদ-কান্দলা রেলপথ, টিলডাংগা-ফরাক্কা রেলপথ, বিমলাগড়-কিরিবুরু রেলপথ ইত্যাদি। ইহাদের নির্মাণকার্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্থরু হইলেও সমাপ্ত হইবে তৃতীয় পরিকল্পনায় গিয়া। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে গুণা-উজ্জয়িনী এবং বক্তিয়ারপুর-রাজগিরের লিংক-লাইন পত্তনের কার্য সমাপ্ত হইবে।

৩। সাজ-সরঞ্জামের পুনর্ণবিকরণ

রেলপথের সাজ-সরঞ্জামের পুনর্ণবিকরণ (renewal) ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে আরও উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইবে। পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে ২২ শতের উপর ইঞ্জিন, ১ লক্ষ ৭ হাজারের মত মালগাড়ী (wagons) এবং ১১ হাজারের উপর যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে আশা করা হইয়াছে। ইহাদের কিছু কিছু অংশ পুরাতনের পরিবর্তনসাধনে নিযুক্ত হইবে। এই পরিবর্তনসাধনের ফলে পুরাতন ইঞ্জিনের পরিমাণ শতকরা ১৮ ভাগ, পুরাতন মালগাড়ীর পরিমাণ শতকরা ৮·৫ ভাগ এবং পুরাতন যাত্রীবাহী কোচের পরিমাণ শতকরা ১০·৫ ভাগ হ্রাস করা সম্ভব হইবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে রেল-ইঞ্জিন, যাত্রীবাহী কোচ প্রভৃতির অধিকাংশ এখন ভারতেই নির্মিত হইতেছে।

৪। পুরাতন রেললাইনেরও পুনর্ণবিকরণ

দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পুরাতন রেললাইনের পুনর্ণবিকরণের (renewal of obsolete track) ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত পুরাতন লাইনের স্থানে নূতন লাইনের স্থাপনকার্য যে-পরিমাণ বাকী পড়িবে তাহা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় এইরূপ স্থাপন-কার্য—উভয় মিলিয়া মোট ১৩ হাজার মাইলের মত হইবে। ইহার মধ্যে বৎসরে গড়ে ১৬ শত মাইল করিয়া মোট ৮ হাজার মাইল পুরাতনের স্থলে নূতন লাইন পাতা হইবে।

৫। বৈদ্যুতিক ট্রেন-চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি

ইহার পর আছে বৈদ্যুতিক ট্রেন-চলাচলের ব্যবস্থা এবং প্রায় ১৬ শত মাইল রেলপথে একটির স্থলে দুইটি করিয়া লাইন পাতা (double line) ও প্রায় ২৬৫ মাইল ছোট লাইনকে (metre gauge) বড় লাইনে (broad gauge) পরিবর্তন। মূল পরিকল্পনায় মোট ৮২৬ মাইল রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন-চলাচলের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু বর্তমানে

অর্থসংস্থানের অসুবিধার জন্য দুইটি লাইনকে বাদ দিবার কথাবার্তা চলিতেছে। উন্নত ধরনের সংকেত-ব্যবস্থা (signalling) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেলপথের উন্নতি-সাধনের আর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য।

৬। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধা ও কর্মচারিগণের কল্যাণ

তারপর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধা এবং রেলওয়ে কর্মচারিগণের কল্যাণের প্রতি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অন্যান্য সুবিধার মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর বিলোপসাধনের নীতি ও নূতন ধরনের দূরগামী ট্রেনের প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য ৬৬ হাজারের মত নূতন গৃহ, ১৩টি হাসপাতাল এবং ৭৫টি চিকিৎসালয় নির্মাণ করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবহন ও সংসরণ (Transport and Communication) খাতে মোট ১,৩৮৫ কোটি টাকা বা শতকরা ২৯ ভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে রেলপথসমূহের অংশে পড়ে মোট ৯০০ কোটি টাকা। অবশ্য রেলপথের অবপূর্তি ভাণ্ডারের (Railway Depreciation Fund) ২২৫ কোটি টাকার কথা ধরিলে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ ১,১২৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।* রেলওয়ে বোর্ডের হিসাব অনুসারে ইহা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় ছাঁটকাট

বর্তমানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছাঁটকাটের ফলে এই বরাদ্দ খাতেও সামান্য কমাইয়া ১,১২১.৫ কোটি টাকা করা হইয়াছে। উপরন্তু, রেলওয়ে বোর্ডের হস্তে যে ৪২৫ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা সমর্পণ করিবার কথা ছিল তাহা হইতে ৪৮ কোটি টাকার মত কমাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই দুই-এর ফলে রেলওয়ে উন্নয়নকার্যের কিছু কিছু ছাঁটকাট করিতে হইয়াছে। ইহা একরূপ ঠিক হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কয়েকটি লাইনের বৈদ্যুতিকিকরণ, মিটার গেজ লাইনের বগি নির্মাণের কারখানা স্থাপন এবং পেরাম্বুরের কারখানার সম্প্রসারণ কার্য স্থগিত রাখা হইবে।**

বৈদেশিক ঋণ

ভারতীয় রেলপথের নিজস্ব সংগতি ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ অর্থ অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হওয়ায় রেলপথের উন্নয়নের জন্য ১৯৫৭ সালের সুরু হইতে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে এ-পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯) বিশ্বব্যাংক হইতে ৮৩ কোটি টাকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন ঋণ তহবিল (Development Loan Fund) হইতে ৩৬ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গিয়াছে।‡ শীঘ্রই ২৪ কোটি টাকার মত আর একটি ঋণ পাইবার আশা আছে।

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৭৮ পৃষ্ঠা।

** Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা।

‡ রেলমন্ত্রীর বাজেট-বক্তৃতা—১৯৫৯।

ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিন্যাস (Regrouping of Indian Railways) : স্বাধীন ভারতে রেলপথের উন্নতির আলোচনা প্রসংগে রেলপথের পুনর্বিন্যাসের আলোচনা না করিলে চলে না—কারণ এই পুনর্বিন্যাস-কার্য সংঘটিত করা হইয়াছে প্রধানত পরিচালন-দক্ষতায় (operational efficiency) উন্নতিসাধনের জন্য।

পুনর্বিন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য

পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে সর্বপ্রথম পরিকল্পনা রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে। ঐ সময় ভারতীয় রেলপথ এইভাবে বিভক্ত ছিল: পূর্ব-ভারতীয় রেলপথ (৪,৩৮০ মাইল), জি. আই. পি. রেলপথ (৩,৫৬০ মাইল), বোম্বাই-বরদা-মধ্যভারত রেলপথ (৩,৪০০ মাইল), বাংলা-নাগপুর রেলপথ (৩,৩৮০ মাইল), অযোধ্যা-ত্রিহুত রেলপথ (৩,০৭০ মাইল); মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথ (২,৯৩০ মাইল), দক্ষিণ-ভারতীয় রেলপথ (২,৩৫০ মাইল), পূর্ব-পাঞ্জাব রেলপথ (১,৮৭০ মাইল) এবং আসাম রেলপথ (১,২৪০ মাইল)। ইহা ছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যসমূহের বিভিন্ন রেলপথ ভারতীয় রেলপথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। ফলে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছিল।

পুনর্বিন্যাসের পূর্বে রেলপথসমূহ

ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় রেলপথ অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে বিভিন্ন রেলপথের দৈর্ঘ্য উপরি-উক্ত বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব-ভারতীয় রেলপথের ন্যায় অতি দীর্ঘ রেলপথও ছিল ; আবার সংগে সংগে পূর্ব-পাঞ্জাব ও আসাম রেলপথের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র রেলপথও ছিল। অবিভক্ত ভারতে এই শেষোক্ত রেলপথ দুইটি অবশ্য অতি ক্ষুদ্র ছিল না ; দেশবিভাগের ফলেই তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হয়। নবসংযুক্ত ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যগুলির রেলপথসমূহ আবার ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রেলপথের পরিচালন-ব্যয় ছিল অত্যধিক। উপরন্তু, ইহাদের জন্যই বিভিন্ন রেলপথের মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি আনয়ন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই কারণে রেলওয়ে বোর্ড ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা করে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। এবং এক বৎসরের মধ্যে তৎকালীন পুনর্বিন্যাসের কার্য সমাপ্ত হয়।

পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনার হেতু

পুনর্বিন্যাসের ফলে প্রথমে ৬টি জোন (zone) সৃষ্ট হয়—যথা, (১) উত্তর রেলপথ, (২) উত্তর-পূর্ব রেলপথ, (৩) দক্ষিণ রেলপথ, (৪) মধ্য রেলপথ, (৫) পশ্চিম রেলপথ এবং (৬) পূর্ব রেলপথ। পরে ১৯৫৫ সালে পূর্ব রেলপথকে দুই ভাগ করিয়া পূর্ব রেলপথ এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ—এই দুইটি জোনের সৃষ্টি করায় মোট জোনের সংখ্যা ৭-এ পরিণত হয়। আবার ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী হইতে উত্তর-পূর্ব রেলপথের কিছু অংশ লইয়া উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ নামক অষ্টম জোনের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পুনর্বিন্যাসের ফলে সৃষ্ট প্রথম ৬টি এবং বর্তমানে ৮টি জোন

উত্তর রেলপথের সদর কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। ইহা ভূতপূর্ব পূর্ব-ভারতীয় রেলপথের কয়েকটি বিভাগ (Division), ই. পি. রেলপথ, যোধপুর ও বিকানীর রেলপথ এবং বোম্বাই-বরদা-মধ্যভারত রেলপথের কিছু অংশ লইয়া গঠিত হয়। উত্তর-পূর্ব রেলপথের সদর কার্যালয় উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে অবস্থিত। ইহা ভূতপূর্ব অযোধ্যা-ত্রিহুত রেলপথ এবং ভূতপূর্ব আসাম রেলপথের কিছু অংশ লইয়া গঠিত।* দক্ষিণ রেলপথ ভূতপূর্ব দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথ, মহীশূর রাজ্য রেলপথ এবং মাদ্রাজ ও দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র রেলপথ লইয়া গঠিত। সদর কার্যালয় মাদ্রাজে। মধ্য ও পশ্চিম রেলপথ উভয়েরই সদর কার্যালয় বোম্বাই-এ। মধ্য রেলপথ ভূতপূর্ব জি. আই. পি. রেলপথ, নিজাম রাজ্য রেলপথ এবং যোধপুর, সিন্ধিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রেলপথের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে। পশ্চিম রেলপথে আছে ভূতপূর্ব বোম্বাই-বরোদা-মধ্যভারত রেলপথ, সৌরাষ্ট্র ও রাজস্থানের রেলপথসমূহ। পূর্ব রেলপথের সদর কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। এই রেলপথ প্রথমে ভূতপূর্ব পূর্ব-ভারতীয় রেলপথের কিছু অংশ, বাংলা-নাগপুর রেলপথের সমগ্রটা এবং দেশবিভাগের ফলে বাংলা-আসাম রেলপথের যে অংশটুকু ভারতীয় ইউনিয়নে পড়িয়াছিল তাহার শিয়ালদহ বিভাগ লইয়া গঠিত হয়। পরে (১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে) ইহা হইতে ভূতপূর্ব বাংলা-নাগপুর রেলপথকে পৃথক্ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ গঠন করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথেরও সদর কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত। বলা হয় যে রুরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার জন্যই দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথকে পৃথক্ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। এই কারণে ইহাকে 'ইস্পাত কারখানা রেলপথ' (Steel Plants Railway) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। নবসৃষ্ট অষ্টম জোন বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সদর কার্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে আসামের পাণ্ডু শহরে। এই রেলপথের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ মাত্র ১৭ শত মাইল। ঘোষণা করা হয় যে প্রতিরক্ষা, পরিচালনা ও শাসনতান্ত্রিক কারণে ক্ষুদ্রতম হইলেও এই জোনের সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই আটটি রেলপথের বিবরণ

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গুরুত্ব

পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধ সমালোচনা কিন্তু নানাভাবে করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি হইল যে, পুনর্বিন্যাসের ফলে পরিচালন-দক্ষতা হ্রাস পাইয়াছে। এই সমালোচনা করা হইয়াছে বিভিন্ন বণিক সংঘের পক্ষ হইতে। উত্তরে কর্তৃপক্ষ বলেন যে, এই অভিযোগ নিতান্ত সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যেই পুনর্বিন্যস্ত রেলপথের দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে; ফলে এই অভিযোগও তখন আর শুনা যাইবে না।

একটি বিরুদ্ধ সমালোচনা

রেলপথের আয়-ব্যয় বলিতে কি বুঝায়

রেলপথের আয়-ব্যয় (Railway Finance) : ভারতীয় রেলপথের আয়-ব্যয় বলিতে দুইটি বিষয় বুঝায়: (১) রেলপথসমূহের সামগ্রিক আয় ও ব্যয় এবং ইহার ফলে রেলপথ পরিচালনায়

* বাকী অংশ ৮ম জোন বা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের অধীন হইয়াছে।

লাভ-ক্ষতি, এবং (২) রেলপথের আয়-ব্যয়ের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের সম্পর্ক। এই দুইটি বিষয়েরই আলোচনা কিছু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় করা প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রেলপথ পরিচালনার ফলে সরকারের বিরাট ক্ষতি হয়। ১৮৫৮-৯৮ সালের মধ্যে এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৮ কোটি টাকা। ইহার পর হইতে রেলপথসমূহ লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং ইহা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার পর্যন্ত বজায় থাকে। ইহার পর ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত রেলপথসমূহের আয় এত কমিয়া যায় যে, ইহাদের পক্ষে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নির্দিষ্ট সুদ প্রদান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

রেলপথের পরিচালনার লাভ-ক্ষতি

ইতিমধ্যেই ১৯২৪ সালে এ্যাক্ওয়র্থ কমিটির (Acworth Committee) সুপারিশ অনুসারে রেলপথসমূহের আয়-ব্যয়কে সাধারণ আয়-ব্যয় (general finances) হইতে পৃথক্ করা হইয়াছিল এবং প্রতি বৎসর একটি পৃথক্ রেলওয়ে বাজেটও প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

সাধারণ বাজেট হইতে রেল বাজেটের পৃথকিকরণ

এ্যাক্ওয়র্থ কমিটি নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য রেলপথের আয়-ব্যয়কে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য আয়-ব্যয় হইতে পৃথকিকরণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলঃ রেলপথ হইল অন্যতম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং যে-নিয়মাবলী সরকারের অন্যান্য বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত তাহা রেলপথের ক্ষেত্রে সম্যকভাবে প্রযোজ্য না-ও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্যান্য বিভাগের বেলায় ৩১শে মার্চের মধ্যে বরাদ্দ অর্থের যে-অংশ ব্যয় করিতে না পারা যায় তাহা বাতিল হইয়া যায়। রেলপথসমূহের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযুক্ত করিলে বিশেষ অসুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া রেলপথসমূহের পক্ষে ক্ষয়-ক্ষতিপূরণের অবপূর্তি তহবিলের (Depreciation Fund) উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রেলপথসমূহের আয়-ব্যয় সরকারের সাধারণ আয়-ব্যয়ের সহিত জড়িত থাকিলে সম্যক বাণিজ্যিক হিসাবরক্ষণের অভাবে ইহা সম্ভব হয় না। সুতরাং পরস্পরকে পৃথক্ করা প্রয়োজন।

পৃথকিকরণের পর সাধারণ ও রেলপথের আয়-ব্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ১৯২৪ সালের পৃথকিকরণ প্রথা (Seperation Convention, 1924) দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

এই প্রথা অনুসারে রেলসমূহের পক্ষে সরকারকে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বাৎসরিক শতকরা ১ টাকা হারে 'ডিভিডেণ্ড' এবং তিন কোটি টাকার অতিরিক্ত লাভের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করিতে হইত। প্রতিরক্ষা প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় যে-সমস্ত লাইনে (strategic lines) ক্ষতি হইত তাহা বহন করিত সরকার। এই প্রথা দ্বারা একটি অবপূর্তি তহবিল (Depreciation Fund) এবং সঞ্চয় তহবিলেরও (Reserve Fund) সৃষ্টি করা হয়। অবপূর্তি তহবিলে প্রতি বৎসর বিনিয়োজিত মূলধনের $\frac{1}{60}$ ভাগ জমা রাখিতে হইত এবং দাবি-দাওয়া মিটাইয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা সঞ্চয় তহবিলে জমা হইত।

১৯২৪ সালের পৃথকিকরণ প্রথা এবং সাধারণ ও রেল বাজেটের মধ্যে সম্বন্ধ

অবপূর্তি ও সঞ্চয় তহবিল

বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার সুরু হওয়া পর্যন্ত পৃথকিকরণ প্রথায় কার্য বেশ ভালভাবেই চলিয়াছিল। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ হারে অর্থপ্রদান করিতে বা জমা রাখিতে রেলসমূহ কোন বিশেষ অসুবিধাই ভোগ করে নাই। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত রেলসমূহের আয় এত কমিয়া যায় যে, ইহাদের পক্ষে বিনিয়োজিত মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ডিভিডেণ্ড প্রদান করিবার জন্য প্রথমে সঞ্চয় তহবিলের উপর হাত দিতে হয়, পরে আয় আরও কমিয়া গেলে সুদপ্রদান বন্ধ রাখিতে হয়।

বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার ও প্রথা পালনে রেলপথসমূহের অসুবিধা

১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে আবার রেলপথসমূহের আয়বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে ইহা অকল্পনীয় অংকে গিয়া দাঁড়ায়। আয়বৃদ্ধির দরুন রেলপথসমূহ ১৯৪২-৪৩ সালের মধ্যেই সমস্ত বকেয়া পাওনা মিটাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে যাহাতে ইহারা সাধারণ রাজস্ব খাতে অধিকতর অর্থপ্রদান করিতে পারে তাহার জন্য প্রথার পুরাতন ব্যবস্থাকে স্থগিত রাখিয়া উদ্বৃত্ত অনুসারে অর্থপ্রদানের নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ

১৯২৪ সালের প্রথায় এই ব্যবস্থা ছিল যে, সময়ান্তরে ইহার পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইবে। ফলে যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯৪৯ সালে কুঞ্জরু কমিশনের (Kunzru Commission) সুপারিশ অনুসারে প্রথাটির বিচার-বিশ্লেষণের পর ইহার পরিবর্তে এক নূতন প্রথা গ্রহণ করা হয়। ইহা ১৯৪৯ সালের রেলওয়ে প্রথা (The Railway Convention, 1949) নামে পরিচিত।

কুঞ্জরু কমিটি ও ১৯৪৯ সালের নূতন ব্যবস্থা

১৯৪৯ সালের প্রথাকে ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে কার্যকর করা হয়। এই প্রথার প্রধান প্রধান ব্যবস্থা হইল: (ক) রেলপথসমূহের আয়-ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় পৃথকই থাকিবে; কিন্তু রেলপথসমূহ বিনিয়োজিত মূলধনের উপর বাৎসরিক ৪ টাকা হারে নির্দিষ্ট ডিভিডেণ্ড কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করিবে। (খ) অবপূর্তি তহবিলে (Depreciation Fund) প্রতি বৎসর অন্তত ১৫ কোটি টাকা করিয়া জমা রাখিতে হইবে। (গ) একটি নূতন রেলপথ উন্নয়ন তহবিল (A Railway Development Fund) সৃষ্টি করিতে হইবে। এই তহবিলের অর্থ যাত্রীদের সুবিধা, শ্রমিকদের কল্যাণ এবং প্রাথমিকভাবে অনুৎপাদনশীল পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে। বর্তমানে যে উৎকর্ষসাধক তহবিল (Betterment Fund) আছে তাহাকে কিছুদিন পরে এই উন্নয়ন তহবিলের সহিত মিশাইয়া এক করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রতি বৎসর তিন কোটি টাকা করিয়া যাত্রীদের সুবিধা প্রদানার্থে ব্যয় করিতে হইবে। (ঘ) রাজস্ব-ব্যয় ও মূলধন-ব্যয়ের (revenue and capital expenditure) মধ্যে সম্বন্ধ নূতন করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

রেলপথ উন্নয়ন তহবিলের সৃষ্টি

উৎকর্ষসাধক তহবিল

১৯৪৯ সালের প্রথাকে পরিমার্জিত (revised) প্রথা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পরিমার্জনার ফলে প্রকৃতই রেলপথসমূহের সাধারণ আয়-ব্যয়ের মধ্যে উন্নতি সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট নির্দিষ্ট অর্থ পাইতে থাকে এবং রেলপথসমূহও তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হয়। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। রেলপথসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দিষ্ট হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করায় আইনের চক্ষে সাধারণ করদাতা হইয়া দাঁড়ায় রেলপথের মালিক।

১৯৪৯ সালের প্রথার ফলাফল

১৯৪৯ সালের প্রথা ১৯৫০-৫১ সালে যখন কার্যকর হয় তখন ঠিক ছিল যে, উহা পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকিবে। স্বভাবতই ৪ বৎসর পরে ইহার বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন উঠে। ১৯৫৪ সালে এই কার্য সমাধা করা হয় এবং ১৯৪৯ সালের প্রথার সামান্য পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে এই পরিবর্তন কার্যকর করা হইয়াছে। পরিবর্তনের ফলে যে-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা ১৯৫৪ সালের পরিমার্জিত প্রথা (Revised Convention, 1954) নামে অভিহিত।

১৯৫৪ সালের পরিমার্জিত প্রথা

পরিমার্জনার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। নির্দিষ্ট ডিভিডেণ্ড প্রদানে ব্যতিক্রম

(ক) রেলপথসমূহ বিনিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করিলেও কয়েক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করিতে হইবে—যথা, যেখানে নূতন লাইন পাতা হইয়াছে, যেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে বিনিয়োগ (over-capitalisation) করা হইয়াছে, ইত্যাদি।

২। অবপূর্তি তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি

(খ) ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় রেলপথসমূহের পক্ষে অবপূর্তি তহবিলে অর্থপ্রদানের পরিমাণকে বৃদ্ধি করিয়া ১৫ কোটি টাকা হইতে ৩৫ কোটি টাকায় লইয়া যাইতে হইবে।

৩। রেলপথ উন্নয়ন তহবিল হইতে কয়েক প্রকারের ব্যয়

(গ) যাত্রীদের সুখ-সুবিধাকার্যে বাৎসরিক ৩ কোটি টাকা করিয়া ব্যয় করা ছাড়াও ৩ লক্ষ টাকার অধিক সমস্ত অনুৎপাদনশীল পরিকল্পনার ব্যয় রেলপথ উন্নয়ন তহবিল (Railway Development Fund) হইতে করা হইবে।

ভবিষ্যৎ পরিমার্জনা

এই পরিমার্জিত প্রথা ৫ বৎসর—অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মার্চ—অবধি বলবৎ থাকিবার কথা ছিল। বর্তমানে উহার সময়কাল আরও ১ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ১৯৬১ সালের মার্চ অবধি লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উপসংহার : সাধারণ বাজেট ও রেলওয়ে বাজেটের মধ্যে ১৯৫৪ সালের পরিমার্জিত প্রথা দ্বারা যে-সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে তাহা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই করা হইয়াছে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় রেলপথসমূহের পক্ষে

উত্তরোত্তর উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে। এইজন্য ইহাদের হস্তে প্রয়োজনমত অর্থ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নূতন লাইন এবং অতিরিক্ত পরিমাণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একই হারে ডিভিডেণ্ড প্রদান করিয়া গেলে প্রয়োজনীয় অর্থে ঘাটতি পড়ে। তাই এই দুই ক্ষেত্রে নিম্ন হারে ডিভিডেণ্ড ধার্য করা হইয়াছে। যাহাতে রেলপথসমূহ ছোট ছোট অনুৎপাদনশীল পরিকল্পনা তাহাদের নিজস্ব তহবিল হইতেই করিতে পারে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনে প্রথাকে পরিমার্জিত করা হইয়াছে

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে রেলপথসমূহের আয় হ্রাস পাইলেও ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে উহা বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট আয় হয় ৩৯৪ কোটি টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে ইহাকে ৪১২ কোটি টাকায় ধরা হইয়াছে। তবে সংগে সংগে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটায় উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৫৬-৫৭ সালে উদ্বৃত্ত ছিল ২০ কোটি টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা কমিয়া ১৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় মাহিনা কমিশনের (Pay Commission) সুপারিশে রেল কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি করিতে হইলে উদ্বৃত্ত আয়ও হ্রাস পাইবে আশংকা করা যাইতেছে। সুতরাং নানাভাবে আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে।*

উদ্বৃত্ত হ্রাসের দরুন রেলপথসমূহের আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

রেলপথের মাসুল (Railway Rates): ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির উপর রেলপথের মাসুল-নীতির গুরুত্ব অত্যধিক। মাসুল-নীতি সহায়ক হইলে শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি সমৃদ্ধ হয়; আবার মাসুল-নীতি পরিপন্থী বা প্রভেদাত্মক হইলে উহারা ব্যাহত হয়।

মাসুল-নীতির গুরুত্ব

ব্রিটিশ যুগে শেষোক্ত ব্যাপারটিই ঘটিয়াছিল। ভারতে রেলপথসমূহ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদেশীর তত্ত্বাবধানে থাকায় রেলপথের মাসুল এইভাবে নির্ধারিত হইয়াছিল যে, ইহা দেশের স্বার্থসাধন করার পরিবর্তে ইহাকে ক্ষুণ্ণই করিয়াছিল। যে-সকল কোম্পানী ভারতীয় রেলপথসমূহ পরিচালনা করিত তাহারা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন মাত্রা-সাপেক্ষে যে-কোন মাসুল ধার্য করিতে পারিত। প্রথম যুগে এই সকল কোম্পানী ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নয়নে বিশেষ উৎসুক ছিল। সুতরাং তাহারা এরূপভাবে মাসুল ধার্য করিত যাহাতে প্রধান প্রধান বন্দর অভিমুখে এবং বন্দর হইতে মাল-চলাচল বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে সংগঠিত শিল্পগুলিকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। উদাহরণস্বরূপ, চিনির উপর মাসুলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য চিনির উপর যে-হারে মাসুল দিতে হইত তাহা আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বহনের মাসুল অপেক্ষা স্বল্প ছিল। এইরূপ প্রভেদাত্মক ব্যবস্থার দরুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বড় বড় বন্দরের নিকট কেন্দ্রীভূত

ব্রিটিশ যুগে পরিপন্থী মাসুল-নীতির ফল

* বাজেট বক্তৃতা—১৯৫৯।

হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। শিল্পপতিগণ স্বভাবতই বন্দর হইতে এবং বন্দরাভিমুখী মাল-চলাচলের মাস্থলের স্বল্প হারের সুবিধা লইবার জন্য বন্দরাঞ্চলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে থাকেন। ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থায় দেখা দেয় অত্যধিক আঞ্চলিকতা।

আর এক উপায়ে শিল্পোদ্যোগে ব্যাঘাত

আর এক উপায়েও রেলপথের মাস্থল নির্ধারণ নীতি শিল্পোদ্যোগকে ব্যাহত করিয়াছে। কোম্পানীর আমলে বিভিন্ন রেলপথ যখন কোন মাল বহন করিত তখন প্রত্যেক কোম্পানী মালটি তাহার নিজস্ব লাইনে যতটুকু যাইবে তাহার উপরই হিসাব করিয়া মাস্থল ধার্য করিত। ফলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি দূরত্বের সুবিধা না পাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত; এবং স্বভাবতই তাহাদের পক্ষে দূরে মাল প্রেরণ করিবার ইচ্ছা থাকিত না।

মাস্থল-ট্রাইব্যুনাল গঠনের সুপারিশ

এই সকল কারণের জন্য রেল-মাস্থল নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন চলিতে থাকে। ফলে এ্যাকওয়র্থ কমিটি ইংল্যাণ্ডের অনুসরণে একটি রেলপথের মাস্থল-ট্রাইব্যুনাল (Railway Rates Tribunal) গঠন করিতে সুপারিশ করে। সরকার কিন্তু এই সুপারিশকে কার্যকর করে নাই—কারণ সরকারী মহলের অভিমত ছিল যে, একটি স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে রেল-মাস্থল ধার্য করা হইলে আর্থিক স্বার্থ (financial interest) ব্যাহত হইতে পারে। সুতরাং ইহার পরিবর্তে ১৯২৬ সালে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র একটি রেলপথের মাস্থল উপদেষ্টা কমিটি (Railway Rates Advisory Committee) নিযুক্ত হয়।

কিন্তু মাস্থল উপদেষ্টা কমিটি গঠন

১৯৪৯ সালে ট্রাইব্যুনাল গঠন

রেলপথের মাস্থল উপদেষ্টা কমিটি জনপ্রিয়তা বা উপযোগিতা—কোন দিক দিয়াই কাম্য বিবেচিত হয় নাই। তাই স্বাধীনতার পর সরকার এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে। ১৯৪৯ সালে ইহা ঘোষিত হয় যে, সরকার এবার একটি ট্রাইব্যুনালই গঠন করিবে; এবং ঐ সালেই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়।

ট্রাইব্যুনালের সংগঠন ও কার্যাবলী

রেলপথের মাস্থল ট্রাইব্যুনাল বর্তমানে একজন সভাপতি ও দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারকদের মধ্য হইতেই সদস্যগণকে মনোনীত করা হয়। মাস্থল সংক্রান্ত সমস্ত অযৌক্তিকতার প্রশ্ন বিবেচনা করাই হইল ট্রাইব্যুনালের কার্য। রেলপথগুলিকে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হয়।

১৯৪৮ সালে রেল-মাস্থল গঠনের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা হইল ১৯৪৮ সালে রেল-মাস্থলের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন* (Rationalisation of Railway Rates Structure)। যুক্তিসিদ্ধভাবে পুনর্গঠিত রেল-মাস্থল যাত্রী ও মাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা পূর্বের সকল প্রকার প্রভেদাত্মক ব্যবস্থা দূর করা হইয়াছে। এখন মাস্থল ধার্যের

* India—1959-এর ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

ব্যাপারে সকল রেলপথকেই একটি সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং মাল-চলাচল ব্যাপারে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

১৯৫৫ সালে দূরবীক্ষণ-মূলক হার প্রবর্তন

১৯৫৫ সালে এপ্রিল মাস হইতে দূরবীক্ষণমূলক হার (telescopic rates) যাত্রী ও মাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে ভ্রমণ বা বহনের দূরত্ব যত বাড়িয়া যায় মাসুলের হারও তত কমিয়া যায়।

যাত্রী মাসুলের উপর কর

ইহার পর ১৯৫৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে যাত্রী-মাসুলের উপর কর ধার্য করা হইয়াছে। ১৬ মাইল হইতে ৩০ মাইল পর্যন্ত শতকরা ৫ টাকা হারে, ৩১ মাইল হইতে ৫০০ মাইল পর্যন্ত শতকরা ১৫ টাকা হারে এবং ৫০০ মাইলের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে যাত্রীদিগকে কর দিতে হয়।

মালপত্রের মাসুল-হারের পুনর্গঠন

মালপত্রের উপর মাসুল সম্পর্কে অনুসন্ধান সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫৫ সালে একটি কমিটি (Freight Structure Enquiry Committee or Mudaliar Committee) নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে রিপোর্ট প্রদান করে। রিপোর্টে বিভিন্ন মালপত্রের উপর বিচারমূলক পার্থক্যকরণের ভিত্তিতে (on the basis of selective variation) মাসুল-হারের সংস্কার করিতে সুপারিশ করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে কিন্তু এবিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। পরে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস হইতে কমিটির সুপারিশ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া মালপত্রের মাসুলের হার পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ব্যবস্থায় খাদ্যের উপর মোট মাসুলের হার কমান হইয়াছে এবং তাঁত-শিল্পজাত দ্রব্য, খাদি, পুস্তক প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। এই মাসুল-হার এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে যে স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে রেলপথ অপেক্ষা রাজপথেই মালপত্র বহন করা সুবিধাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন মাসুল-হারের ফলে রেলপথের বাৎসরিক আয় ১১ কোটি টাকার উপর বাড়িয়া গিয়াছে।

ব্রিটিশ আমলে রাজপথ ও পথ পরিবহন অবহেলিত হইয়াছিল

রাজপথ (Roads) : ভারতের ন্যায় দেশে গ্রাম্য অর্থ-ব্যবস্থার প্রসারসাধন এবং রাজ্য ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্যের দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য রাজপথ এবং পথ পরিবহনের (road transport) গুরুত্বকে কোনমতেই লঘু করিয়া দেখা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে রেলপথ নির্মাণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে রাজপথ নির্মাণ এবং পথ পরিবহন ও উন্নয়নের কার্য অনেকাংশে অবহেলিত হইয়াছিল। ফলে ভারতের রাজপথ-পদ্ধতি (road system) এবং পথ পরিবহন-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হইতে পারে নাই। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় রাজপথের পরিমাণ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ভারতে ১২ হাজার মাইল জাতীয় রাজপথ (National Highways) সমেত ৯৭ হাজার মাইলের মত পাকা সড়ক (metalled roads) এবং ১ লক্ষ ৪৭ হাজার মাইল কাঁচা সড়ক (unmetalled roads) ছিল।*

* Second Five Year Plan-এর ৪৭৬ পৃষ্ঠা।

জাতীয় রাজপথের পর আছে রাজ্যের রাজপথ (State Highways), জিলার সড়ক (District Roads) এবং গ্রাম্য সড়ক (Village Roads)।

বলা হইয়াছে, ভারতের রাজপথ-পদ্ধতি দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। তুলনামূলকভাবে আয়তনের দিক দিয়া ব্রিটেনে ভারত অপেক্ষা ১০ গুণ, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ গুণ অধিক রাজপথ আছে।

ভারতের রাজপথ-পদ্ধতি পর্যাপ্ত নহে

রাজপথের এই অপর্যাপ্তি সেদিন পর্যন্ত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে রাজপথকে প্রাদেশিক বিষয়ে পরিণত করিয়া উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে এই কর্তব্য সম্যকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় নাই। এই কারণে ১৯২৮ সালে নিযুক্ত রাজপথ উন্নয়ন কমিটি (Road Development Committee) কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজপথ উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে এবং একটি কেন্দ্রীয় পথ উন্নয়ন তহবিল (a Central Road Fund) সৃষ্টির সুপারিশ করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৯ সালে পেট্রোলের উপর অতিরিক্ত কর (surcharge) ধার্য দ্বারা উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করা হয় এবং প্রদেশগুলিকে ইহা হইতে অর্থসাহায্য প্রদান করা হইতে থাকে। ইহার পর ১৯৪৩ সালে নাগপুরে মুখ্য বাস্তুকারদের (Chief Engineers) একটি সম্মেলন হয়। সম্মেলনে ২০ বৎসরের জন্য রাজপথ উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনাটি নাগপুর পরিকল্পনা (Nagpur Plan) নামে পরিচিত। পরিকল্পনা অনুসারে ঐ সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত কোন কৃষি-অঞ্চল রাজপথ (main road) হইতে ৫ মাইলের অধিক দূরে থাকিবে না। কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৭ সালের জাতীয় রাজপথগুলির (National Highways) নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

রাজপথের উন্নয়ন

নাগপুর পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়ন খাতে মোট ১০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে জাতীয় রাজপথগুলির উন্নয়নের জন্য ছিল ২৭ কোটি টাকা এবং অন্যান্য রাজপথ ও রাজপথ সংক্রান্ত গবেষণা খাতে ছিল ৭৭ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়ন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হইয়াছিল যে, ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যেই নাগপুর পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশকে কার্যকর করা সম্ভব হইয়াছে।* প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় রাজপথে ৭৪৬ মাইলের মত সংযুক্তিসাধন (construction of missing links), ৫ হাজার মাইল রাজপথের উন্নয়ন এবং ৩৩টি বড় বড় পুল নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আন্তঃরাজ্য রাজপথ (Inter-State Roads), অর্থনীতির দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ প্রভৃতির প্রভূত

১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে নাগপুর পরিকল্পনার লক্ষ্যের এক-তৃতীয়াংশে পৌছান সম্ভব হয়

* Second Five Year Plan—A Draft Outline-এর ১৪৬ পৃষ্ঠা।

উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। জাতীয় রাজপথ ছাড়া অন্যান্য প্রকার রাজপথের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে সর্বসমেত ২৬ হাজার মাইলের মত।

কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণা প্রতিষ্ঠান

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়েই ১৯৫২ সালে একটি কেন্দ্রীয় রাজপথ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (a Central Road Research Institute) স্থাপন করা হয়। পরিকল্পনায় ইহার জন্য ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। রাজপথ সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলগত সমস্যার গবেষণা করাই ইহার কার্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়ন প্রস্তাব

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজপথ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২৭১ কোটি টাকার কাছাকাছি। ইহার মধ্যে ২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় রাজপথ তহবিল হইতে পাওয়ার কথা ছিল। এই পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সূচিত জাতীয় রাজপথের নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্য সমাপ্ত করা, ৭০০ মাইলের মত জাতীয় রাজপথের সংযুক্তিসাধন, ৪০টি বড় বড় পুল নির্মাণ, ৩·৫ হাজার মাইল জাতীয় রাজপথের উন্নয়ন এবং ৩ হাজার মাইল পথ ব্যাপকতর করার কথা ছিল। পরে ১,২০০ মাইল নূতন জাতীয় রাজপথ নির্মাণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। জাতীয় রাজপথ ছাড়া কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ১ হাজার মাইল অন্যান্য রাজপথ নির্মাণ, ২ হাজার মাইল রাজপথের পর্যায় উন্নয়ন (upgrading) করা এই পরিকল্পনার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যসমূহের কর্মসূচীর মধ্যে ২১ হাজার মাইল উঁচু এবং ৩৭ হাজার মাইল নীচু রাজপথের নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল। আশা করা হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে নাগপুর সম্মেলনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের একরূপ কাছাকাছি পৌছান সম্ভব হইবে।*

উন্নয়ন সম্ভাবনা

বর্তমানে অবশ্য এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। অনুমান করা যাইতেছে যে সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময়ে রাজপথ উন্নয়নের জন্য ২২০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। এই ব্যয়ে যতটা সম্ভব ততটা উন্নয়নই সংঘটিত হইবে। ইহার মধ্যে আবার ইস্পাতের দুষ্প্রাপ্যতা পুল নির্মাণকার্য ব্যাহত করিয়া সম্ভাব্য উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা করিবে।**

গো-মহিষযান

পথ পরিবহন (Road Transport)ঃ মোটরযান এবং গো-মহিষযান হইল ভারতের পথ পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। স্বাধীন ভারতে গো-মহিষযানের সংখ্যা এবং ইহাতে বিনিয়োজিত মূলধন সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অবিভক্ত ভারতে এইরূপ যানের সংখ্যা ছিল ৮৭ লক্ষ এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ২৬১ কোটি টাকা। ইহাও অনুমান করা হইয়াছে যে, এই পরিবহন শিল্পে ১ কোটি লোক ও ২ কোটি গো-মহিষ নিযুক্ত ছিল। ভারতের ন্যায় দেশে অল্প দূরত্বের জন্য পরিবহন-ব্যবস্থা হিসাবে গো-মহিষযানের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহার

---

* Second Five Year Plan-এর ৪৭৬ পৃষ্ঠা এবং India—1959.

** Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan.

সংখ্যাবৃদ্ধির সুপারিশও করা চলে না এই কারণে যে, লৌহ-চক্রসমন্বিত যান পথের, বিশেষ করিয়া কাঁচা সড়কের, প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিসাধন করে। যদি লৌহ-চক্রের পরিবর্তে রবার-নির্মিত চক্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায় তবে সময় ও অর্থের অপচয় এবং পথের ক্ষতিসাধন রহিত হইয়া গো-মহিষযানের উপযোগিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশানুসারে রবার-নির্মিত চক্রের উপযোগিতা লইয়া পরীক্ষা চালান হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে উন্নত ধরনের একপ্রকার প্রশস্ততর লৌহ-চক্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে।

গো-মহিষযানের উপযোগিতাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

ভারতে এসিয়ার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় মোটরযান আছে। তাহা হইলেও জনসংখ্যার তুলনায় ইহার পরিমাণ অত্যল্প। ভারতে মোটরযানের পরিমাণ হইল ১ হাজারেরও অধিক লোকপিছু একটি করিয়া। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে এই অনুপাত হইল যথাক্রমে ৩ ও ১৫—অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৩ জন লোকপিছু একখানি এবং ইংল্যাণ্ডে প্রতি ১৫ জন লোকপিছু একখানি করিয়া মোটরযান আছে।

মোটরযান

মোটরযানের এই স্বল্পতার কারণ হইল দেশের দারিদ্র্য এবং মোটরযান ও তৈলের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা। মোটরযান শিল্প আমাদের দেশে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বভাবতই চাহিদার তুলনায় ইহার উৎপাদন একরূপ নগণ্য। তৈলের দিক দিয়া বলিতে গেলে, তিনটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও অপরিশ্রুত তৈলের জন্য আমরা এখনও বিদেশের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এখনও বহুদিন যে মোটরযানের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হইবে না তাহা সহজেই অনুমেয়। দারিদ্র্যের দরুন চাহিদার পরিমাণও বহুদিন উন্নত দেশসমূহের মত হইতে পারিবে না।

অপর্যাপ্তি ছাড়াও বহুদিন ধরিয়া মোটরযান পরিবহন অসংগঠিত অবস্থায় ছিল। ইহার ফলে রেলপথ ও মোটরযান পরস্পরের সহিত অপচয়মূলক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। সুতরাং অন্যান্যের সহিত মোটরযান পরিবহনের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ১৯৩৯ সালে মোটরযান আইন (Motor Vehicles Act, 1939) পাস হয় এবং ইহার অধীনে মোটরযান-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে আঞ্চলিক পরিবহন সংস্থা (Regional Transport Authority) প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোটরযান পরিবহনের অসংগঠিত অবস্থা

যুদ্ধোত্তর যুগ হইতে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার পর হইতে, রাষ্ট্রীয় পরিবহনের প্রতি ঝোঁক দেখা গিয়াছে। বর্তমানে একরূপ সকল রাজ্যেই সরকারী উদ্যোগাধীনে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত মোটর-চলাচলের ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই ব্যবস্থা হইল প্রধানত যাত্রী পরিবহনেরই ব্যবস্থা। ১৯৫০ সালের

রাষ্ট্রীয় পরিবহন

পথ পরিবহন করপোরেশন আইন (Road Transport Corporation Act, 1950) অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে রেলপথ, রাজ্য সরকার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের প্রতিনিধি লইয়া পথ পরিবহন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই তিন কর্তৃপক্ষের কার্যের মধ্যে সংগতিসাধনই করপোরেশনের উদ্দেশ্য।*

পথ পরিবহন করপোরেশন

এই প্রসংগে মোটরযান চলাচল-ব্যবস্থার জাতীয়করণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। জাতীয়করণ দ্বারা রাষ্ট্রীয় পরিবহন-ব্যবস্থার সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

মোটরযান-চলাচল জাতীয়করণ

(১) রাষ্ট্রীয় পরিবহন অধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় এবং এই প্রকার চলাচল-ব্যবস্থা বৃহদায়তনে পরিচালনা করা হয় বলিয়া নানাপ্রকার ব্যয়সংক্ষেপ (economies) সম্ভব হয়।

সপক্ষে যুক্তি

(২) যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়।

(৩) ইহাতে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে।

(৪) পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য রাজ্যসমূহ রাজপথের উন্নতিতে সম্যক যত্ন লইতে থাকে।

(৫) মোটরযান চলাচল-ব্যবস্থা সরকারী উদ্যোগাধীন থাকিলে রেলপথের সহিত সংহতিসাধনকার্য সহজ হয়।

(৬) পথ পরিবহন সরকারী কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে নিয়োগের পরিমাণ (volume of employment) বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী পরিবহন-ব্যবস্থা হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহা হইতে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা যাইতে পারে :

বিপক্ষে যুক্তি

(১) অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত পথ পরিবহনের পরিচালনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না।

(২) রাষ্ট্রীয় পরিবহনের যে-মুনাফা দেখান হয় তাহা বেসরকারী মহলের অভিযোগ অনুসারে হইল সম্পূর্ণ কৃত্রিম। রাষ্ট্রীয় পরিবহনকে নানাপ্রকার কর হইতে রেহাই দিয়াই ইহার সৃষ্টি করা হয়। বেসরকারী মহল হইতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় পরিবহনকে যদি বেসরকারী পরিবহনের মত কর দিতে হইত তবে মুনাফার পরিবর্তে ঘাটতিই দেখা দিত।

(৩) রাষ্ট্রীয় পরিবহনে অযথা অপচয় হয়। এই অর্থে পথ পরিবহন-ব্যবস্থার বহুমাত্রায় প্রসারসাধন করা যাইতে পারে।

(৪) উপরন্তু, রাষ্ট্রীয় পরিবহন-ব্যবস্থা একচেটিয়া কারবার বলিয়া শিল্প-সংঘর্ষের ফলে পরিচালনা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতে হয়। পরিচালনা বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকিলে এই আশংকা থাকে না।

* India—1958-এর ৩৮৫ পৃষ্ঠা।

(৫) পরিশেষে পরিকল্পনা কমিশনের মতে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রসার চলাচল-ব্যবস্থার উপর এরূপ চাপ দিতেছে যে মাত্র রেলপথসমূহের পক্ষে এই চাহিদা মিটান মোটেই সম্ভব নহে। সুতরাং পথ পরিবহন-ব্যবস্থার প্রসারসাধন করিতেই হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবহন কোনমতেই বর্তমান পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং পথ পরিবহনকে বেশ কিছুদিন বেসরকারী মালিকানা ও পরিচালনাধীনে রাখা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত

সকল দিক বিচার করিয়া জাতীয়করণের নীতি হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ সুপারিশ করিয়াছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মালপত্র বহন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা চলিবে না। যাত্রীবহন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ হইল, ইহাকে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের সংগতি অনুসারেই রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে—হঠাৎ কিছু করা যুক্তিযুক্ত হইবে না; এবং যে পরিমাণে জাতীয়করণের নীতি অনুসৃত হইবে না সেই পরিমাণে বেসরকারী উদ্যোগীদের মোটর চলাচল-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের জন্য সুযোগ দিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের মোটর চলাচল-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য ১২ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।* ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে পথ সামগ্রিকভাবে পরিবহনের যাত্রী ও মালপত্র বহনের ক্ষমতা শতকরা ২৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যসমূহের জন্য প্রাথমিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৬·৫ কোটি টাকা। বর্তমানে ইহাকে হ্রাস করিয়া ১১ কোটি টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। এই ১১ কোটি টাকার মধ্যেও আবার ১০·৫ কোটি টাকার মত ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।**

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

রাজপথ বনাম রেলপথ (Roads *vs* Railways) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাজপথ ও রেলপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা আমাদের পরিবহন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে কমিটি নিয়োগ ও বিভিন্ন প্রতিবিধান অবলম্বিত হইয়াছিল। তবুও সমস্যা মিটে নাই। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে সমস্যা আবার মাথা তুলিয়াছে। ফলে এ-সম্পর্কে আলোচনাও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা

রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে অর্থাৎ রেলওয়ে পরিবহন ও মোটর চলাচল-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা আশংকাজনক অবস্থা ধারণ করে বিগত তৃতীয় দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের সময়। ইহার ফলে রেলপথসমূহের আয় ভীষণ কমিতে থাকে; মোটর চলাচল-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বিশেষ লাভ হয় না। অপরদিকে কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে এমন অনেক অঞ্চল পড়িয়া থাকে যাহাতে রেলপথ নির্মাণ বা মোটর চলাচলের ব্যবস্থা কোন কিছুই করা সম্ভব হয় না।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা :

* Review of the First Five Year Plan-এর ২৩৮ পৃষ্ঠা।

** Appraisal and Prospects, and Reappraisal of the Second Five Year Plan.

এমত অবস্থায় তত্ত্বগত প্রশ্ন উঠে যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে রেলপথ নির্মাণ বা রাজপথ নির্মাণ—কাহার সপক্ষে অভিমত প্রদান করা যাইবে? তত্ত্বের দিক দিয়া বলা হয়, ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে অদূর ভবিষ্যতে এরূপভাবে রেলপথ স্থাপন করা যাইবে না, যাহাতে পরিবহনের সমগ্র চাহিদা মিটান সম্ভব হইতে পারে। পশ্চাৎভূমির (hinterland) সহিত বন্দর ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রসমূহের সংযোগসাধন করিবার জন্য বহুসংখ্যক রাজপথের সৃষ্টি করিতেই হইবে। এই সকল রাজপথ দেশের অভ্যন্তর হইতে মালপত্র ও যাত্রী বহন করিয়া লইয়া আসিয়া রেলপথে সরবরাহ করিবে। রেলপথ ও রাজপথের নির্মাণকার্যে এই পরিকল্পিত পদ্ধতিতেই অগ্রসর হইতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, পরিবহন ক্ষেত্রের একাংশে রেলপথ ও রাজপথ পরস্পরের বিকল্প ব্যবস্থা ও পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতামূলক; কিন্তু অপর অংশে উভয়ে পরস্পরের সহায়ক ও অনুপূরক। যাহাতে উভয়েই পরস্পরের সহায়ক ও অনুপূরক হয় সেইভাবেই ভবিষ্যতে এই দুই প্রকার পরিবহন-মাধ্যমের প্রসারসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে সংহতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বগত আলোচনা ও ভবিষ্যতের নীতি ছাড়াও তৎকালীন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সমস্যা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন হয়। এইজন্য ১৯৩২ সালে মিচেল-কার্কনেস কমিটি (Mitchel-Kirkness Committee) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। কমিটি মোটরযানের প্রতিযোগিতা হইতে রেলপথসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য মোটর চলাচল-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করে। এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় সংসরণ উপদেষ্টা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে নির্দেশ দেয়। কমিটির আর একটি সুপারিশ অনুসারে রাজপথ-রেলপথ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে রেলপথগুলি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মোটর চলাচলের ব্যবস্থাও করিবে।

মিচেল-কার্কনেস কমিটির সুপারিশ

মিচেল-কার্কনেস কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর হইবার কিছুদিন পরে ১৯৩৭ সালে ওয়েজউড্ কমিটি (Wedgwood Committee) ইহার ফলাফল বিচার করে। বিচারে কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে মোটর চলাচল নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে নূতন সংহত নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ভার দিয়া রাখিলে চলিবে না। ওয়েজউড কমিটির আর একটি সুপারিশ ছিল যে রেলপথসমূহকে মোটর চলাচল-ব্যবস্থায় পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে—মাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নহে। উপরন্তু, সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রেলপথ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত মোটর চলাচল-ব্যবস্থার মধ্যে সংহতিসাধন করিতে হইবে।

ওয়েজউড্ কমিটির সুপারিশ

ওয়েজউড্ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইন (Motor Vehicles Act, 1939) নূতন করিয়া প্রণীত হয়। এই আইনাধীনে

অনুমতি ব্যতীত মোটরযান চলাচলকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। অনুমতি প্রদানকেও আবার বিশেষ সর্ত-সাপেক্ষ করা হয়। ফলে, মোটর চলাচলও রেলপথের মত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

মোটর চলাচল-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

কিন্তু শুধু মোটর চলাচল-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিলেই বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বৃহত্তর উদ্দেশ্য হইল রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া সামগ্রিকভাবে পরিবহন-ব্যবস্থাকে অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলা এবং সকল সম্ভাব্য অপচয় নিবারণ করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবহন-ব্যবস্থার উপর অভূতপূর্ব চাপের জন্য সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই যুদ্ধোত্তর যুগের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় তাহা আবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থায় পরিবহনের উন্নয়ন এবং অপচয় নিবারণও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে করিতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে এই প্রচেষ্টাই করা হইতেছে।

বর্তমানে মোটর চলাচল নিয়ন্ত্রণই পর্যাপ্ত নহে

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সকল রাজ্যেই পথ পরিবহন করপোরেশন (Road Transport Corporation) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই করপোরেশনের অংশীদার হইবার জন্য রেলসমূহের হস্তে মোট ১০ কোটি টাকা ন্যস্ত করা হইয়াছে। রাজ্য সরকার, রেলপথ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকদের লইয়া গঠিত করপোরেশন রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিভিন্ন রাজ্য ইতিমধ্যে এইরূপ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।* সংহতিসাধন কার্যের জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি কেন্দ্রীয় পরিবহন বোর্ড (Central Transport Board) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বাংগীণ সমন্বয়সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখাই ইহার কার্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যক্রম: ১। পথ পরিবহন করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা ২। কেন্দ্রীয় পরিবহন বোর্ড প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃরাজ্য মোটর চলাচলের সংহতিসাধনের ব্যবস্থাও করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে মোটরযান আইনের [The Motor Vehicles (Amendment) Act, 1956] সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইন অনুসারে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এক আন্তঃরাজ্য পরিবহন কমিশন (Inter-State Transport Commission) গঠিত হইয়াছে। কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পরিবহন-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও সংহতিসাধন সম্পর্কে কোন বিরোধের উদ্ভব হইলে তাহার মীমাংসা করে; এবং দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে যাত্রী ও মালবাহী মোটর চলাচলের পারমিট প্রদান করে।

৩। আন্তঃরাজ্য মোটর চলাচল নিয়ন্ত্রণ—আন্তঃরাজ্য পরিবহন কমিশন

পরিবহন-ব্যবস্থার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এ-সম্পর্কে একটি কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ইহা অনুসৃত হইতেছে। ইহাতে রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে সমন্বয়সাধন ছাড়াও

* ২৩ পৃষ্ঠা।

নৌ-চলাচলের সহিত সমন্বয়সাধনের ব্যবস্থা আছে। তবে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ১৯৫৮-৫৯ সালের পূর্বে রেলপথ ও মোটরযানের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ঐ সাল হইতে ঐ প্রতিযোগিতা আশংকাজনক রূপ ধারণ করিয়াছে।* সুতরাং পরিবহন-ব্যবস্থার সামগ্রিক সমন্বয়সাধনের প্রশ্নের মধ্যে প্রধান স্থানাধিকার করিয়াছে এই প্রতিযোগিতা নিবারণের প্রচেষ্টা। এ-সম্বন্ধে আরও আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষে করা হইতেছে।

জলপথের বিভাগ

জলপথ (Waterways)ঃ ভারতের জলপথকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) আভ্যন্তরীণ জলপথ ও (২) সমুদ্রপথ। সমুদ্রপথ আবার দুইভাগে বিভক্তঃ (ক) উপকূল বাণিজ্যপথ, এবং (খ) বৈদেশিক বাণিজ্যপথ।

আভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব কমিয়া আসিতেছে

আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways)ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ জলপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিত। ইহার পর হইতে রেলপথ স্থাপন, সেচ-কার্যের জন্য নাব্য নদী হইতে জল অপসারণ প্রভৃতি কারণে ভারতের পরিবহন-ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। এখন মাত্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে পরিবহনকার্য অনেকাংশে জলপথে পরিচালিত হয়। অনুমান করা হইয়াছে, ভারতে প্রায় ৫,০০০ মাইলের উপর নদীপথকে শক্তিচালিত পোত চলাচলের উপযোগী করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার

তবে নাব্য নদীপথের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে

স্থলে বর্তমানে মাত্র ১,৫৫০ মাইল নদীপথ এইরূপ নৌবাহ্য। ইহার উপর অবশ্য ৩,৫০০ মাইল নদীপথ বড় বড় দেশী নৌকা যাতায়াতের উপযোগী।** খাল খনন ও পলিমাটি উদ্ধার দ্বারা সকলপ্রকার নাব্য নদীপথের পরিমাণকে বহুগুণ বর্ধিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বিশেষ ব্যয়বহুল ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

নাব্য নদীপথের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রথম প্রচেষ্টা—গংগা-ব্রহ্মপুত্র বোর্ড

এই পরীক্ষা চালাইবার সর্বপ্রথম ব্যবস্থা করা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গংগা-ব্রহ্মপুত্র জলপথ পরিবহন বোর্ড (Ganga-Brahmaputra Water Transport Board) স্থাপন করিয়া। এই বোর্ড এখন গংগা নদীর অববাহিকার উচ্চতর অংশে (Upper Ganga Region) এবং ব্রহ্মপুত্রের কয়েকটি উপনদী বিধৌত অঞ্চলে দুইটি পরিকল্পনা লইয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। গংগানদীর অববাহিকা অঞ্চলে চলাচলের জন্য নূতন পোত নির্মাণ করা হইয়াছে এবং ১৯৫৮ সালের শেষের দিক হইতে পরীক্ষামূলকভাবে ইহাদিগকে চালানও হইতেছে। ইহা ছাড়া এই পরিকল্পনায় অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও কেরল এই তিনটি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের জন্য একটি নূতন বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

* রেলমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা, ১৯৫৯।

** India—1959.

আভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাকিংহাম খাল ও ৪৩ লক্ষ টাকা পশ্চিম উপকূলের খালগুলির (West Coast Canals) জন্য ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে ইহাকে হ্রাস করিয়া ১ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আবার অনুমান করা হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না।* সুতরাং এই পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ জলপথের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে না তাহা একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দ

উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যপথ (Coastal and Oceanic Trade) : ব্রিটিশ আমলে জলপথে ভারতের বাণিজ্য পরিবহন করা বিদেশী, বিশেষ করিয়া ইংরাজ, কোম্পানীগুলির একচেটিয়া অধিকার ছিল। তারপর নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতীয়গণ পরিবহন-ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে থাকে। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকারের নীতি ও প্রত্যক্ষ সাহায্যের ফলে তাহারা সকলপ্রকার জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থায় এক বিশেষ অংশ অধিকার করিয়া ফেলে।

জলবাণিজ্যে ভারতীয়গণের স্থানাধিকার

প্রথম পরিকল্পনার শেষে ভারতের উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যপথে মোট ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টনের মত ভারতীয় জাহাজ চলাচল করিত।** প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে মোট ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টনের মত। সুতরাং ঐ কয় বৎসরে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল মোট ৯০ হাজার টনের মত। কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল এই পরিমাণকে ৬ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার। সুতরাং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অবশ্য বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনায় যে-সকল জাহাজ জলে ভাসান হইবে তাহারা অনেকাংশে প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী সময়ে নির্মিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ধরিলে প্রথম পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছান সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রদান করিতে পারা যায়।

প্রথম পরিকল্পনায় জাহাজ-চলাচলের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভবপর হয় নাই

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩ লক্ষ টনের মত জাহাজী শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির ছিল। ইহার জন্য ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, ঐ অর্থে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টনের অধিক জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না; এবং পরিকল্পনার উক্ত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য আরও ৪৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। এই কারণে সম্প্রতি একটি জাহাজ চলাচল উন্নয়ন তহবিল (Shipping Development Fund) গঠন করা হইয়াছে। তবে এই তহবিল হইতে পরিকল্পনাধীন সময়ে ৯ কোটি টাকার কিছু অধিক মাত্র পাওয়া যাইবে

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ২৯ পৃষ্ঠা।

** Review of the First Five Year Plan-এর ২০৯ পৃষ্ঠা।

বলিয়া ধরা হইয়াছে।* সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার পূর্বে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছান যাইবে না।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের দুইটি প্রধান লক্ষ্য ছিল : (ক) ভারতীয় জাহাজ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ভারতের উপকূল-বাণিজ্যপথের চাহিদা মিটান এবং প্রয়োজনমত রেলপথ হইতে পরিবহনকে জলপথে স্থানান্তরিত করা ; (খ) সমুদ্রপারের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের অংশগ্রহণের অনুপাত উত্তরোত্তর বর্ধিত করা।

জাহাজ-চলাচল নীতি নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, ১৯৪৭ সালে নিযুক্ত জাহাজ-চলাচল নীতি-নির্ধারণ কমিটি (Shipping Policy Committee) অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে :

(ক) ভারতের উপকূলে জাহাজ-চলাচলের একচেটিয়া অধিকার ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে দিতে হইবে ;

(খ) ব্রহ্মদেশ, সিংহল অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সহিত বাণিজ্য-পণ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয় জাহাজেই পরিবাহিত হইবে ;

(গ) দূরবর্তী দেশগুলির বাণিজ্যের শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজ-গুলিকে বহন করিতে হইবে।

জাহাজ-চলাচল কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫১ সালে উপকূল বাণিজ্যপথের একচেটিয়া অধিকার ভারতীয়দের জন্য সংরক্ষিত করা হয় এবং বর্তমানে ভারতের সমগ্র উপকূল-বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য লক্ষ্যে পৌছিতে যে এখনও অনেক দেরী আছে তাহা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উক্ত লক্ষে পৌছিবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে জাহাজী শক্তিকে ৯ লক্ষ টনের উপরে লইয়া যাইবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইহাকে ৭ লক্ষ টনের বেশী লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

সুপারিশের কয়েকটি লক্ষ্যে পৌছিতে এখনও বিলম্ব আছে

যাহা হউক, পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের দিকে লক্ষ্য করিয়া ১৯৫৮ সালের বাণিজ্য জাহাজ-চলাচল আইনে (Merchant Shipping Act, 1958) অনুসারে ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি জাতীয় জাহাজ-চলাচল বোর্ড (National Shipping Board) গঠন করা হইয়াছে। জাহাজ-চলাচলের উন্নতিসাধন ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করাই ইহার কার্য।

জাতীয় জাহাজ-চলাচল বোর্ড

জাতীয় জাহাজ-চলাচলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হইল পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় জাহাজ-চলাচল করপোরেশনের (Eastern and Western Shipping

---

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan-এর ৮০ পৃষ্ঠা।

Corporations)। পূর্ব ও পশ্চিমী দেশগুলিতে ভারতীয় জাহাজ-চলাচলের পরিমাণ-বৃদ্ধিই এই দুই করপোরেশনের লক্ষ্য।*

বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports and Harbours): ভারতের ৩,৫০০ মাইল দীর্ঘ উপকূলরেখায় মাত্র ৬টি প্রধান বন্দর (major ports) আছে। ইহারা হইল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্, কোচিন এবং কান্দলা। ইহাদের মধ্যে কান্দলা হইল নবনির্মিত। প্রথম পরিকল্পনার শেষে বন্দরসমূহের সামগ্রিক ক্ষমতা (total handling capacity) ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ টনের মত।

প্রধান বন্দরসমূহের সামগ্রিক ক্ষমতা

প্রথম পরিকল্পনার কর্মসূচী

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্দরসমূহের উন্নতিসাধনের জন্য মোট ৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল:

(ক) কান্দলা বন্দরের নির্মাণকার্য সমাধা করা;
(খ) তৈল শোধনাগারসমূহের জন্য বন্দরের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা;
(গ) কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ বন্দরের সম্প্রসারণ করা;
(ঘ) প্রধান প্রধান বন্দরের পুনর্বাসন ও আধুনিকিকরণের ব্যবস্থা করা;
(ঙ) অপ্রধান বন্দরগুলির কয়েকটির উন্নয়ন দ্বারা মোট বন্দর-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ ও ব্যয়

প্রথম পরিকল্পনায় বন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও মোট ব্যয় হয় ২৭ কোটি টাকা।** তবে ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে যে-সকল কার্যারম্ভ হইয়াছিল তাহা অনেকাংশে অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম ও ব্যয়-বরাদ্দ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল: (ক) প্রথম পরিকল্পনার অসমাপ্ত কার্যাবলী সমাপ্ত করা; এবং (খ) দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার উত্তরোত্তর চাহিদা মিটাইবার জন্য বন্দরগুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকিকরণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে মোট ৪৩·৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার উপর বন্দরসমূহের নিজস্ব তহবিল হইতে প্রাপ্তির সম্ভাবনা ধরিয়া মোট ব্যয় ৮০ কোটি টাকায় ধার্য করা হয়। পরিকল্পনায় বিশেষ বিশেষ বন্দরের উন্নয়নকল্পে এইভাবে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়: বোম্বাই-এর জন্য ২৯ কোটি টাকা, কলিকাতার জন্য ২০ কোটি টাকা, কান্দলার জন্য ১৪ কোটি টাকা, মাদ্রাজের জন্য ৯ কোটি টাকা এবং কোচিনের জন্য ৪ কোটি টাকা। ভারতের ১৫০টি অপ্রধান বন্দরের (minor ports) মধ্যে ১৮টির উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়।

* অষ্ট্রেলিয়া, দূর প্রাচ্য এবং পশ্চিমের সহিত জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থার জন্য ১৯৫০ সালে সিন্ধিয়ার উদ্যোগে পূর্বদেশীয় জাহাজ-চলাচল করপোরেশন (Eastern Shipping Corporation) স্থাপিত হয়। পরে ১৯৫৬ সালে করপোরেশনটি ভারত সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করে। ঐ ১৯৫৬ সালেই পারস্য উপসাগর, লোহিত সমুদ্র ও ভারত-পোল্যাণ্ডে জাহাজ-চলাচলের জন্য দ্বিতীয় করপোরেশনটি (Western Shipping Corporation) প্রতিষ্ঠিত হয়।

** Review of the First Five Year Plan-এর ২৪০ পৃষ্ঠা।

পরিকল্পনায় বন্দর ও পোতাশ্রয় উন্নয়নের জন্য উক্ত বরাদ্দ বিশ্বব্যাংকের নিকট হইতে ঋণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিচার করিয়াই নির্ধারণ করা হইয়াছিল। বিশ্বব্যাংক মোট ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের মত ঋণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা মাদ্রাজ ও কলিকাতা বন্দরের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে। সুতরাং ইহা পর্যাপ্ত নহে। ফলে বন্দর ও পোতাশ্রয় উন্নয়নের কার্যক্রম হইতে কয়েকটি পরিকল্পনা বাদ দিতে হইয়াছে, এবং অনুমান করা হইয়াছে যে, মোট ৬১.৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করা সম্ভব হইবে না। যাহা হউক, ইহার ফলে বন্দরসমূহের সামগ্রিক ক্ষমতা (total handling capacity) ২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে।

আকাশপথ (Airways)ঃ ১৯২০ সালে ভারত সরকার সর্বপ্রথম আকাশপথে ভারতের নিজস্ব বেসামরিক বিমান চলাচলের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই এবং কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে বিমান চলাচল-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেসামরিক বিমান চলাচলের কার্যারম্ভ হয় ১৯২৪-২৫ সালে। ইহার পর হইতে ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থা অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

আকাশপথের গুরুত্ব বৃদ্ধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া দেশবিভাগের পর হইতে, বেসামরিক বিমান চলাচলপথে উৎসাহ ও কর্মোদ্যম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সাল হইতে প্রথম পরিকল্পনার সূচনা পর্যন্ত এই খাতে মোট ৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। ১৯৪৯ সালে ভারতের বড় বড় শহরের মধ্যে বিমানযোগে চিঠিপত্র প্রেরণের এক পূর্ণাংগ পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়।

১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন ছিল। বিমান পরিবহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিমান কোম্পানীগুলি কিন্তু দিন দিন ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছিল। ফলে সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থসাহায্য করিতে হইতেছিল। এই কারণে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালে রাজাধ্যক্ষ কমিটি (Rajadhyaksha Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি নিম্নলিখিত কারণে বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থার জাতীয়করণের সুপারিশ করেঃ

বিমান চলাচল-ব্যবস্থার জাতীয়করণ

জাতীয়করণের কারণ

(ক) কয়েকটি বিমান কোম্পানী এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল যে তাহারা ক্ষতি সহ্য করিতে না পারিয়া বিমান চলাচল বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল;

(খ) বেসামরিক বিমান চলাচলকে দেশের প্রতিরক্ষার অংগ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে;—সুতরাং ইহার পরিচালনভার রাষ্ট্রের হস্তেই থাকা উচিত;

(গ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিমানপথে পরিবহনের পর্যাপ্ত উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়;

(ঘ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে আধুনিকিকরণেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে না ;

(ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইবে।

রাজাধ্যক্ষ কমিটির সুপারিশ অনুসারে সরকার ১৯৫৩ সালে বিমানপথ পরিবহন আইন (Air Corporation Act, 1953) দ্বারা বেসামরিক বিমান চলাচল-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার পরিচালনভার নব-সংগঠিত দুইটি করপোরেশনের উপর ন্যস্ত করা হয়। একটির নাম হইল ভারতীয় বিমানপথ করপোরেশন (Indian Airlines Corporation)। ইহা আভ্যন্তরীণ বিমান-পথসমূহের পরিচালনা করে। অপরটি ভারতের আন্তর্জাতিক বিমানপথ (Air Indian International) নামে অভিহিত। ইহা ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বিমান চলাচল-ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ১৯৫৩ সালের বিমানপথ পরিবহন আইন অনুসারে ১৯৫৫ সালে একটি বিমান পরিবহন পরিষদও (Air Transport Council) গঠিত হইয়াছে।

বর্তমান পরিচালন-ব্যবস্থা

১৯৫৩ সাল হইতে বিমান পরিবহনের পরিমাণ একরূপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় বেসামরিক বিমাতপোত ১ কোটি ৯০ লক্ষ মাইলের মত উড়িয়াছিল। ১৯৫৮ সালে এই পরিমাণ আসিয়া দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ মাইলে। যাত্রীর সংখ্যাও ঐ সময়ের মধ্যে ৪ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৭ লক্ষে পরিণত হয়।*

বিমান পরিবহনের পরিমাণবৃদ্ধি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসামরিক বিমান চলাচল উন্নয়ন খাতে ৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে-সকল উন্নয়নমূলক কার্যারম্ভ করা হইয়াছে তাহা সমাপ্ত করিতে মোট ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তবে পরিকল্পনার অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে মোট ব্যয় করা হইবে ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ ইহাই হইল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ অর্থ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়ন-ব্যবস্থা

বর্তমানে বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের হস্তে মোট ৮৪টি এরোড্রোম (aerodromes) আছে। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ১৯টি এরোড্রোম নির্মিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ৮টি নূতন এরোড্রোম নির্মাণ করা হইবে। ইহাতে বড় বড় সহরকে বিমানপথের সহিত সংযোগসাধনের নীতির কার্যকরকরণ অনেকাংশে সমাপ্ত হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আছে আধুনিক ধরনের বিমানপোত সংগ্রহ, বিমান চালনায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যাপকতর ব্যবস্থা, বিমান কারখানার সম্প্রসারণ প্রভৃতি।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি অনুসারে ভবিষ্যতে বিমান চলাচল-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সরকারের একচেটিয়া অধিকারেই থাকিবে।

* India—1959.

পরিবহন-ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন (Co-ordination of Transport) : রেলপথ ও রাজপথের সমন্বয়সাধনের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, পরিবহন-ব্যবস্থার সামগ্রিক সমন্বয়সাধন আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক নীতি।* দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই মৌলিক নীতিকে এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে : অপচয়মূলক দ্বৈতকরণ (duplication) নিবারণার্থে পরিবহনের সকল মাধ্যমের সংহতিসাধন সম্পূর্ণভাবে অপরিহার্য।† এই উদ্দেশ্যে রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে সংহতিসাধন ছাড়াও রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের মধ্যে সংহতিসাধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শেষোক্ত সংহতিসাধনকার্য হইল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি বিশেষ সমস্যা। এই অঞ্চলে যৌথ ষ্টীমার কোম্পানীগুলি বহু পরিমাণে মালপত্র বহন করে।

রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের মধ্যে সমন্বয়-সাধন

রেলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথের সংহতিসাধনের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৫ সালের জুন মাসে একটি বিশেষ কমিটি (Rail-Sea Co-ordination Committee) নিযুক্ত হয়। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে। অন্যান্যের মধ্যে কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করে :

(ক) উপকূল বাণিজ্য ও সন্নিহিত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাহাজী শক্তির পরিমাণকে ৪·১২ লক্ষ টনে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার দ্বারা উপকূল বাণিজ্যে ৪০ লক্ষ টনের মত মালপত্র বহন করা সম্ভব হইবে।

(খ) রেলপথ হইতে জলপথে মালপত্র বহন স্থানান্তরিত করিবার সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) মালপত্র বহন রেলপথ ও জলপথের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) উপকূল বাণিজ্যপথে মালপত্রের ভাড়ার যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (rationalisation) করিতে হইবে।

রেলপথ-জলপথ কমিটির উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়া কার্যকর করার ব্যবস্থা হইতেছে। রেলপথ ও রাজপথের মধ্যে প্রতিযোগিতা আশংকাজনক রূপ ধারণ করায় কিভাবে ইহা নিবারণ করা যায় সে সম্বন্ধেও বর্তমানে বিশেষ আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। তবে সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the economic and social effects of Railways in India. (৩-৬ পৃষ্ঠা)
2. Discuss Railway Regrouping in free India.

[ইংগিত : রেলপথের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা, পুনর্বিন্যাসের ফলে উদ্ভূত ভারতের রেলপথ পদ্ধতি (Railway System) এবং ইহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।......(১২-১৩ পৃষ্ঠা)]

---

* ২৬-২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† Second Five Year Plan-এর ৪৭৪ পৃষ্ঠা।

3. Write a note on Railway Finance. (C. U. B. Com. 1954)

[ইংগিত : ঐতিহাসিক পটভূমিকার সামান্য উল্লেখ করিয়া ১৯৪৯ সালের প্রথা ও ১৯৫৪ সালে ইহার সংশোধনের পর্যালোচনা কর।......(১৩-১৭ পৃষ্ঠা)]

4. Critically examine the terms of the new separation convention in connection with Railway Finances. (C. U. B. Com. 1953, '55) (১৫-১৬ পৃষ্ঠা)

5. Give a brief account of Railway Development under our planned economy. (৮-১১ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the relative advantages of the Development of Roads and Railways in India. What is the nature of competition between Road-Rail Transport in India? How would you bring about a better co-ordination between them? (২৪-২৭ পৃষ্ঠা)

7. Describe the programme of Road and Road Transport development under our planned economy. Is nationalization of transport necessary and desirable?

[ইংগিত : প্রশ্নের ১ম অংশের জন্য রাজপথ ও পথ পরিবহন উভয়ের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।......(২১-২৪ পৃষ্ঠা)]

8. Describe the efforts made to build up a mercantile marine in India in the post-war period. Indicate in this connection the programme in the Second Five Year Plan. (২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

9. Write a note on the nationalisation and development of Civil Aviation in free India. (৩১-৩২ পৃষ্ঠা)

10. Write a note on co-ordination of transport under our planned economy. (২৬-২৭, ৩৩ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বহির্বাণিজ্য

(FOREIGN TRADE OF INDIA)

ঐতিহাসিক পরিক্রমা প্রাচীন যুগ

অতি সুদূর অতীতেও ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। খৃষ্টপূর্ব যুগে বহুদিন হইতে মিশর রোম গ্রীস আরব ইরাণ চীন প্রভৃতি দেশ এবং ভারতের মধ্যে এক সমৃদ্ধিশালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠে।

মুসলমান যুগ

মুসলমান রাজত্বের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃংখলার দরুন ভারতের সমুদ্র-পথে বাণিজ্যের প্রসার কতকটা ব্যাহত হইলেও পরে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশ সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডি-গামা কর্তৃক উত্তমাশা হইয়া ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর ইউরোপের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ জাতি ভারতে বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই বিজয়ী হয়।

প্রথম দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শিল্পপ্রসারে উৎসাহ প্রদান করে এবং ভারতও ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে। কিন্তু অচিরেই ইংল্যাণ্ডের শিল্পস্বার্থসমূহ ভারতীয় দ্রব্যাদি আমদানির বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থরু করে। ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ভারত হইতে আমদানি নিষিদ্ধ করা হয় এবং কয়েক ক্ষেত্রে ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বসান হয়। শিল্প-বিপ্লবের পর ভারত হইয়া দাঁড়ায় স্থলভ মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ এবং ইংল্যাণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার। এইভাবে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যে দেখা দেয় এক বিশেষ পরিবর্তন ; পূর্বে যে-সকল দ্রব্যাদি ভারত হইতে রপ্তানি করা হইত তাহা এখন আমদানি করা হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেখা যায় যে ভারত চাউল গম চা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ও তুলা তৈলবীজ পাট চর্ম প্রভৃতি কাঁচামাল রপ্তানি এবং লৌহ, বয়ন, কাঁচ শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও রেলপথের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতেছে।

ব্রিটিশ যুগ

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রবর্তন

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হইল স্থয়েজ খাল খনন। ইহার ফলে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের দূরত্ব হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া ভারতে রেলপথ নির্মাণের ফলে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত বৃহৎ বৃহৎ বন্দরের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সমস্ত স্থযোগ-স্থবিধা হওয়ায় ভারতের বহির্বাণিজ্য দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে।

স্থয়েজ খাল খনন, ভারতে রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতির ফলে বহির্বাণিজ্যের প্রসার

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই প্রসার কতকটা অব্যাহত ছিল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইহা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য বন্ধ হওয়া, মালবাহী জাহাজের অভাব, যুদ্ধমান দেশগুলিতে ক্রয়শক্তির অবনতি প্রভৃতি কারণে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য উভয়ের পরিমাণই হ্রাস পায়। ১৯১৩-১৪ সালে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮৩ কোটি টাকা এবং ২২৪ কোটি টাকা। ১৯১৮-১৯ সালে ইহাদের পরিমাণ হইয়া দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৩ কোটি টাকা এবং ১৬০ কোটি টাকা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ—ভারতের বহির্বাণিজ্যে ব্যাঘাত

তবে একদিক দিয়া ভারতের উপকারও সাধিত হয়। যুদ্ধাবস্থার চাপে ভারত শিল্পপ্রসারের পথে কতকটা অগ্রসর হয়। ভারত লৌহ ও ইস্পাত, তুলা, চর্ম, পাট প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে থাকে। অপরপক্ষে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যাদি পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণে আমদানি হইতে থাকে।

যুদ্ধাবস্থায় ভারতে শিল্পপ্রসার

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে ভারতের বহির্বাণিজ্য আশাতীতভাবে প্রসারলাভ করে। বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারতীয় রেলপথের অপর্যাপ্তি ও টাকার বিনিময়-মূল্য (exchange value)

অত্যধিক হওয়ার দরুন ভারত এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অপরদিকে ভারতের আমদানিও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভারতীয় বাজারে বিদেশী যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতা—বিশেষত জাপানের প্রতিযোগিতা—তীব্রতর হইতে থাকে। ফলে ১৯২০-২২ সালে সর্বপ্রথম ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (unfavourable balance of trade) দেখা দেয়। ১৯২৩ সালের পর আবার ভারতের রপ্তানিবাণিজ্য উন্নতি লাভ করে এবং পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

যুদ্ধাবসানের পর

প্রথম প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

তারপর ১৯২৯ সাল হইতে সুরু হয় বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার যাহার ফলে দ্রব্যমূল্য দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং ভারতীয় বহির্বাণিজ্য এক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। শিল্পজ দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজ দ্রব্যেরই মূল্য অধিক হ্রাস পাইয়াছিল। সুতরাং ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশেরই দুর্দশা চরমে উঠে। ভারতের আমদানি ও রপ্তানি উভয়েরই দ্রুত অবনতি ঘটে। কিন্তু আমদানির তুলনায় রপ্তানিতে অবনতি ঘটে অধিক। বাধ্য হইয়া ভারতকে বৈদেশিক প্রাপ্য বিশেষত 'হোম চার্জে'র (Home Charges) খাতে দেয় অর্থ মিটাইবার জন্য স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হয়। দেখা যায় যে, ১৯৩০-৩৮ সালের মধ্যে ৩৫০ কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ এদেশ হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার ও ভারতের বহির্বাণিজ্যের দুর্দশা

১৯৩৪ সালের পর হইতে আবার অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। এই উন্নতির মূলে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ কর্তৃক পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা (Recovery Plans) গ্রহণ, কাঁচামাল উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ এবং আসন্ন যুদ্ধের আশংকায় বিভিন্ন দেশ কর্তৃক সমরায়োজনের জন্য অধিক ব্যয়। ইহা ছাড়া ১৯৩২ সালের অটোয়া চুক্তির (The Ottawa Pact) এবং ১৯৩৪ সালের ভারত-জাপান ব্যবসায় চুক্তি (The Indo-Japaneese Trade Agreement) প্রভৃতিও ভারতের বহির্বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে কতকটা সহায়তা করে। কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার ফলে ভারতের রপ্তানির মূল্যও বৃদ্ধি পায়। দেখা যায়, ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের পণ্য ব্যবসায়ে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের (balance of trade in merchandise) পরিমাণ ৩ কোটি টাকা; ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালে আবার দেখা দিল মন্দা। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ের মন্দা গতিরই প্রতিক্রিয়া। উপরন্তু জাপান চীনের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানে ভারতীয় কাঁচা তুলার চাহিদা হ্রাস পাইয়াছিল। যাহা হউক ১৯৩৮-৩৯ সালে চারিদিকে সমর-প্রস্তুতির হিড়িক লাগিয়া যায় এবং বিভিন্ন দেশের সরকার সমরোপকরণের জন্য অধিক ব্যয় করিতে থাকে। ফলে দ্রব্যমূল বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে।

মন্দাবাজারের পর ক্রমোন্নতি

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি (Nature of India's Foreign Trade before World War II) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে যে পরিবর্তন আসে তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে যুদ্ধপূর্ব যুগের ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, যুদ্ধপূর্ব যুগে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ব্রিটেনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ সালের পূর্বে ভারতের আমদানির শতকরা ৬৩ ভাগ আসিত ব্রিটেন হইতে। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাজ্যের অংশ ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সালে দেখা যায়, ভারতে মোট আমদানির শতকরা ৩৩ ভাগ আসিতেছে যুক্তরাজ্য হইতে। এই হ্রাস সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের অংশই ছিল সর্বাধিক। এই প্রাধান্যের মূলে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় কারণই ছিল। অন্যান্য দেশে শিল্পোন্নতির বহু পূর্বেই ইংল্যাণ্ডে শিল্পপ্রসার ঘটে। ইহা ব্যতীত বিদেশী শাসক রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাবলে ভারতীয় বাজার নিজের আয়ত্তাধীনে রাখিতে সমর্থ হয়। রপ্তানির ক্ষেত্রেও অন্যান্য দেশের তুলনায় যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য হয় সর্বাধিক। ১৯১৩-১৪ সালের পূর্বে ভারত হইতে মোট রপ্তানির শতকরা ২৩·৪ ভাগই ব্রিটেনে প্রেরিত হইত। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৪৪ ভাগে দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য বজায়ই থাকে।

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য :

১। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে ব্রিটেনের প্রাধান্য

দ্বিতীয়ত, গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের। কৃষিজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া ভারত শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রপ্তানির শতকরা ৭০ ভাগের মত ছিল খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল। ১৯৩৮-৩৯ সালেও অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। আমদানি ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং এমনকি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেও ভারতের আমদানির শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক ছিল শিল্পজাত সামগ্রী লইয়া গঠিত। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশনের (Fiscal Commission) সুপারিশ অনুযায়ী বিচারমূলক সংরক্ষণের (Discriminating Protection) নীতি গ্রহণ করার পর লৌহ ও ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প সীমাবদ্ধভাবে প্রসারলাভ করে। ইহার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি ক্রমশ হ্রাস পাইলেও আমদানির অধিকাংশই ছিল শিল্পজাত দ্রব্য। ১৯৩৮-৩৯ সালেও মোট আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ ছিল শতকরা ৬৩ ভাগের মত। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। যে-সকল ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাইতে থাকে ভারতের সেই সকল শিল্পক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য বিদেশী মালিক প্রবেশ করিতে বিশেষ সচেষ্ট হয়।

২। ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের

উদাহরণস্বরূপ, দিয়াশলাই শিল্পে সুইডেনের শিল্পজোটের ভূমিকা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, যুদ্ধপূর্ব যুগে পণ্য ব্যবসায়ে একরকম নিয়মিতভাবেই ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল (favourable balance of trade in merchandise) হইত। প্রত্যক্ষভাবে ভারত যত মূল্যের সামগ্রী আমদানি করিত তাহার অধিক মূল্যের সামগ্রী রপ্তানি করিত। এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সাহায্যেই ভারত বৈদেশিক প্রাপ্য মিটাইতে সমর্থ হইত। হোম চার্জের দরুন তাহাকে প্রতি বৎসর ৩০-৫০ কোটি টাকার পাওনা মিটাইতে হইত। অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইলে ভারতকে স্বর্ণ প্রেরণ করিয়া প্রাপ্য মিটাইতে হইত।

৩। পণ্য ব্যবসায়ে নিয়মিতভাবে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইত

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধপূর্ব ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইত প্রধানত বিদেশী শাসকের স্বার্থের অনুকূলে, ভারতীয় শিল্পস্বার্থের অনুকূলে নয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চিরাচরিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা একপ্রকার অব্যাহতভাবেই প্রচলিত রাখা হয়।* ইতিমধ্যে শিল্পপ্রসারের পথে ভারত কতকটা অগ্রসর হইলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যেও কতকটা পরিবর্তন আসে। ১৯৩০ সালের পর ক্রমশ ভারত শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি হ্রাস করিয়া শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা ও যন্ত্রপাতি অধিক পরিমাণে আমদানি করিতে থাকে।

৪। ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী শাসকের স্বার্থে পরিচালিত হইত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের বহির্বাণিজ্য (World War II and India's Foreign Trade) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের বহির্বাণিজ্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে অবশ্য নানাপ্রকার অসুবিধা আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধের অগ্রগতির সংগে সংগে রপ্তানির ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যে-সমস্ত পরিবর্তন আসে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল ঃ

প্রথমত, ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় অনুকূল হয়। উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধন-দ্রব্য উভয়ের আমদানিই বিশেষভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফলে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারত নিয়মিত অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ভোগ করিতে থাকে। ইহার ফলে ভারত তাহার ষ্টার্লিং-ঋণ পরিশোধ করিয়াও ১,৭০০ কোটি টাকার উপর ষ্টার্লিং জমাইতে সমর্থ হয়।

যুদ্ধের দরুন বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঃ
১। পূর্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

দ্বিতীয়ত, ভারতের আমদানি-রপ্তানির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। পূর্বে ভারত প্রধানত অন্য দেশগুলিকে খাদ্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিত এবং বিদেশ হইতে

* India—1957.

শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানি করিত। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশের বাজারে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাইতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় শিল্পগুলি দেশে উৎপন্ন কাঁচামাল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে থাকায় বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি স্বভাবতই কমিতে থাকে। ১৯৩৮ সালে মোট রপ্তানির মধ্যে কাঁচামাল ছিল শতকরা ৪৪.৩ ভাগ। ১৯৪৫ সালে উহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় শতকরা ৩১.৭ ভাগে।

২। রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিবর্তন

আমদানির ক্ষেত্রে কাঁচামালের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে মোট আমদানির মধ্যে কাঁচামালের শতকরা ভাগ ২৩.৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪.০ হয়। অপরদিকে ঐ সময়ে আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের শতকরা ভাগ ৬১ হইতে হ্রাস পাইয়া শতকরা ৩৫.৬ ভাগে দাঁড়ায়।

৩। আমদানির ক্ষেত্রে পরিবর্তন

তৃতীয়ত, যুদ্ধের সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতিরও (direction) পরিবর্তন হয়। যুদ্ধের ফলে শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যদিও ভারতের বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছিল তবু পূর্বের তুলনায় আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই ঐদেশের সংগে বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়। অপরদিকে অন্যান্য দেশের সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক উন্নতিলাভ করে। বিশেষত, সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলির বাজারে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় হইত। যুদ্ধাবস্থায় ঐ সমস্ত দেশের বাজারে উপরি-উক্ত দেশগুলির বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যাদি স্থান পাইতে থাকে। ইহা ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রসারলাভ করিতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধের চাপে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে।

৪। দেশানুযায়ী গতির পরিবর্তন

দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য (Indian Foreign Trade after the Partition) ঃ যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে দেশবিভাগ, দেশের শিল্পপ্রসার এবং অন্যান্য সমস্যা। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যে অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা দিয়াছিল তাহা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তির সূচক ছিল না।* আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যুদ্ধের সময় কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভবের ফলেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে অধিক অনুকূল উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে এই সকল অবস্থা অন্তর্হিত হওয়ায় আবার বহির্বাণিজ্যে মন্দগতি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির দরুন রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য

দেশবিভাগ ও অন্যান্য কারণে পরিবর্তন ঃ

* India—1956.

যেভাবে বৃদ্ধি পায় তাহাতে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হয়। যুদ্ধের সময় ভারত যে-সমস্ত দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিত তাহা এখন অন্যান্য স্থান হইতে সংগ্রহ করা সহজলভ্য হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, পাটজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাগজ ও তুলা হইতে নির্মিত পরিবর্ত দ্রব্য (substitutes) অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সুতা ও অন্যান্য তুলাজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় এবং রেড়ির বীজ ও তৈলের চালান একপ্রকার বন্ধই হইয়া যায়।

১। বিদেশে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস

দেশবিভাগ বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পূর্বে ভারত কাঁচা-তুলা, কাঁচাপাট, তৈলবীজ, চর্ম প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিত এবং নিজস্ব চাহিদা মিটাইয়াও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিত। কিন্তু দেশবিভাগের পর এই সমস্ত কাঁচামালের ঘাটতি দেখা দেয়। একদিকে যেমন এই সকল দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি এই সকল কাঁচামাল ব্যবহারকারী শিল্পগুলির উৎপাদনও ব্যাহত হয়। ভারতকে নিজস্ব শিল্পের জন্য অন্যান্য দেশ হইতে এই সকল কাঁচামাল আমদানি করিতে আরম্ভ করিতে হয়। দেশবিভাগের ফলে আর একটি সমস্যাও আসিয়া দেখা দেয়। দেশের একটা বৃহদাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় খাদ্যসীমান্তেও অবস্থার অবনতি হয়। ফলে বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। উপরন্তু, যুদ্ধকালীন বাধানিষেধের পর ভোগ্যদ্রব্যের আমদানিও বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং শিল্প-প্রসারের পথে সগ্রসর হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি, শিল্পের মালমসলা প্রভৃতি আমদানি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত নিয়মিত প্রতিকূল হইতে থাকে। নিম্নলিখিত ছকটি* হইতে দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের একটা মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায়:

২। দেশের আমদানি বৃদ্ধি

৩। খাদ্য আমদানি

৪। নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

(হিসাব কোটি টাকায়)

সাল	মোট আমদানি	মোট রপ্তানি	বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত
১৯৪৮-৪৯	৬৪৩·৮৪	৪৫৮·৭২	—১৮৫·১৪
১৯৫০-৫১	৬৫০·৩	৬৪৬·৮	—৩·৫
১৯৫৫-৫৬	৭৬১·৪	৬৪০·২	—১২১·২
১৯৫৬-৫৭	১০৯৯·৫	৬৩৫·২	—৪৬৪·৩
১৯৫৭-৫৮	১২০৪·২	৫৯৪·৭	—৬০৯·৫
১৯৫৮-৫৯	১০৪৬·৫	৫৭৬·১	—৪৭০·৪

* Report on Currency and Finance for the year 1958-59 হইতে গৃহীত।

সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of India's Foreign Trade in Recent Years):

প্রথমত দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি টাকার মত। ১৯৪৮-৪৯ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১,১০০ কোটি টাকার উপরে দাঁড়ায়। এই বৃদ্ধির মূলে ছিল অধিক পরিমাণে খাদ্য আমদানি ও আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি। ইহা ব্যতীত অবিভক্ত ভারতে যাহা ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দেশবিভাগের পর তাহা হইয়া দাঁড়ায় বহির্বাণিজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কাঁচাপাট ও তুলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তারপর আসিল কোরিয়ার যুদ্ধের ঢেউ। যাহার ফলে ১৯৫১-৫২ সালে বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী দুই বৎসরে অবশ্য বহির্বাণিজ্যের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে। সরকার কর্তৃক মূল্যহ্রাসের নীতি অবলম্বন, বিনিয়োগকার্যে হ্রাসপ্রাপ্তি, কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকের পর ব্যবসায় মন্দগতি, ১৯৫৩ সালে আমেরিকায় মন্দাবাজার, খাদ্যসীমান্তে উন্নতি, আমদানির উপর বাধানিষেধ প্রভৃতির ফলেই ঐরূপ অবস্থা হয়। ইহার পর আবার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ফলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বর্তমান বৈশিষ্ট্য ঃ
১। মোট বহির্বাণিজ্যের মূল্যবৃদ্ধি

উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ফলে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি ভারতের বহির্বাণিজ্যের গঠন এবং প্রকৃতিতেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্তন ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনেরই সূচনা করে। ভারত এখন আর প্রধানত কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ নহে; রপ্তানির একটা মোটা অংশ বর্তমানে শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া গঠিত। আমদানির ক্ষেত্রেও বিদেশী শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে এবং শিল্পপ্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশবিভাগের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে আমদানি হইতে থাকে। আমদানির প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরায় নাই। ১৯৫৮-৫৯ সালেই ১৫৯ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়।

২। বহির্বাণিজ্যের গঠন ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঃ
(ক) আমদানি বাণিজ্য—কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য আমদানি

কাঁচাতুলা ও কাঁচাপাট পূর্বে প্রধানত রপ্তানি করা হইত; কিন্তু দেশবিভাগের পর এই সকল কাঁচামালের আমদানি করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ১৯৫১-৫২ সালে ১৩৭·১৮ কোটি টাকার কাঁচাতুলা আমদানি করা হয়। আভ্যন্তরীণ তুলার উৎপাদন উন্নতিলাভ করায় পরবর্তী সময়ে কাঁচাতুলার আমদানি ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। তাহা হইলে এখনও ভারত বেশ কিছু টাকার লম্বা আঁশের কাঁচাতুলা আমদানি করিয়া থাকে। বেসরকারী খাতে ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৮ কোটি টাকার কাঁচাতুলা আমদানি করা হয়।

কাঁচাপাটের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। দেশের উৎপাদনের উন্নতি হওয়ায় কাঁচাপাটের আমদানি হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে ৬৭·০৮ কোটি

টাকার কাঁচাপাট আমদানি করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে বেসরকারী খাতে কাঁচাপাটের আমদানির মূল্যের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬'৪৪ এবং ২'৬৫ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালে ভারত প্রথম কাঁচাপাট রপ্তানি করে।

শিল্পোৎপাদনের অন্যান্য কাঁচামাল ও মালমসলাও ভারত আমদানি করিয়া থাকে। খনিজ তৈল, কাঁচা পশম, কৃত্রিম রেশম সুতা, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও চর্ম আমদানিতে বিশেষ স্থান অধিকার করে। তৈল আমদানি ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে; এবং গত ৭-৮ বৎসরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে ৭০-৮০ কোটি টাকার তৈল আমদানি করা হয়। কাঁচা পশম আমদানি করা হয়, কারণ শিল্পে উত্তম ধরনের কাঁচা পশমের যে চাহিদা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাহায্যে মিটান সম্ভব নহে। ১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় সম্প্রতি রাসায়নিক দ্রব্য, রং, কৃত্রিম রেশম সুতা ও চর্ম আমদানির মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আভ্যন্তরীণ শিল্প-প্রসারের গতি ত্বরান্বিত হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই সমস্ত কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঔষধপত্রাদির বেলায়ও একই প্রবণতা দেখা যায়। দেশীয় উৎপাদনের প্রসার সত্ত্বেও নূতন নূতন ধরনের ঔষধপত্র আমদানি করা হইতেছে। কিন্তু আমদানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে যন্ত্রপাতি। শিল্প-প্রসার ও শিল্পোৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মোটা টাকার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। ভবিষ্যতে ভারত যখন নিজেই যন্ত্রপাতি উৎপাদন করিতে পারিবে তখন এই আমদানি হ্রাস পাইবে। ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের মধ্যে যন্ত্রপাতির আমদানি ২০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সালে মাত্র বেসরকারী খাতেই ১৩০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়; ইহা ব্যতীত সরকারী খাতে একটা মোটা টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়।*

বর্তমানে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিই প্রধানত আমদানি করা হয়

সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আমদানির মধ্যে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শিল্পপ্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের পরিমাণ অতি দ্রুত প্রসার পাইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের এই বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই সূচক। উন্নয়নমূলক কার্যাদি প্রসারলাভের ফলেই আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল যথাক্রমে পাট-শিল্পজাত দ্রব্য, কাঁচা তুলা, চা, বীজ ও কাঁচা পাট। ১৯৪৮-৪৯ সালে পাট-শিল্পজাত দ্রব্য, চা, তুলাজাত সূতা ও তুলা-শিল্পজাত দ্রব্য, কাঁচা তুলা, উদ্ভিজ্জ তৈল এবং চর্ম রপ্তানি বাণিজ্যে যথাক্রমে গুরুত্ব অনুযায়ী স্থানাধিকার করে। ১৯৫৮-৫৯ সালে

(খ) রপ্তানি বাণিজ্য— শিল্পজাত দ্রব্যের অংশ বৃদ্ধি

* Report on Currency and Finance for the year 1958-59.

রপ্তানি বাণিজ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকার করে চা, পাট-শিল্পজাত দ্রব্য ও তুলা-শিল্পজাত দ্রব্য। ইহাদের রপ্তানি-মূল্য যথাক্রমে দাঁড়ায় ১২৯ কোটি, ১০০ কোটি ও ৪৫ কোটি টাকার উপর।

প্রধান তিনটি রপ্তানি পণ্য—চা, পাটজাত ও তুলাজাত দ্রব্য

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে যে পাট-শিল্পজাত দ্রব্য, চা ও তুলা-শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাট-শিল্পজাত দ্রব্য ও চা বহুদিন হইতে ভারতের রপ্তানির প্রধান বস্তু। কিন্তু ভারত যুদ্ধের সুযোগে তুলা-শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি প্রসার করিতে সমর্থ হয় এবং ১৯৫০-৫১ সালে সর্বপ্রধান তুলা-শিল্পদ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর হইতে অবশ্য তুলা-শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি নানা কারণে হ্রাস পাইতেছে এবং সম্প্রতি চৈনিক প্রতিযোগিতার ফলে এই পণ্যের বৈদেশিক বাজারে সংকট দেখা দিয়াছে।* ভারত উদ্ভিজ্জ তৈল, কয়েক প্রকারের কাঁচা তুলা, আকরজাত দ্রব্য প্রভৃতিও রপ্তানি করিয়া থাকে।

রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যান্য পণ্য

ইহা ব্যতীত দেশের শিল্পপ্রসারের সংগে সংগে অন্যান্য কতকগুলি দ্রব্য রপ্তানি-বাণিজ্যে স্থান পাইতেছে। যদিও ইহাদের মূল্য এখনও পর্যন্ত খুব বেশী নয়, তথাপি ইহাদের রপ্তানি বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতির পরিবর্তনের কতকটা ইংগিত দেয়। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে আছে ডিজেল ইঞ্জিন (diesel engines), বাইসিকেল, সেলাই-এর কল, বৈদ্যুতিক পাখা, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্রাদি। এখানে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। একদিকে যেমন শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে, অপরদিকে তেমনি কাঁচামালের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। দেশবিভাগের ফলে কাঁচা পাটের রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধই হইয়া গিয়াছিল। তবে ১৯৫৯ সাল হইতে আবার সুরু হইয়াছে।

রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান ত্রুটি: মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা

পরিশেষে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখনও ভারত রপ্তানির ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল। রপ্তানির ভিত্তিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদির রপ্তানির প্রসারসাধন করা প্রয়োজন। অধুনা সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়াছে এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য 'রপ্তানি প্রসার পরিষদ' (Export Promotion Councils) গঠন করিয়াছে।

রপ্তানি প্রসার পরিষদ

৩। ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতির পরিবর্তন

তৃতীয়ত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতির কতকটা পরিবর্তন দেখা যায়। যদিও ঐতিহাসিক কারণের জন্য ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের (U.K.) অংশ এখনও সর্বাধিক, তথাপি অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রসারিত হইতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারত সরকার বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বকে পরিহার করিয়াই

* Reserve Bank Bulletin, April '59.

চলিয়াছে। বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও দেশীয় শিল্পের প্রসারসাধন এই দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাণিজ্যনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।*

(ক) আমদানি বাণিজ্যের গতি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ববৃদ্ধি

আমদানির ক্ষেত্রে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যুক্তরাজ্যের স্থান ছিল সর্বপ্রথম, ইহার পরই ব্রহ্মদেশ ও জাপানের স্থান নির্দেশ করা হইত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ অপেক্ষাকৃত অল্পই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। ইহার পর পরিকল্পনাধীন সময়ে যন্ত্রপাতি ও খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রসারলাভ করিতে থাকে। ইহা সত্ত্বেও

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান

দু'এক বৎসর ব্যতীত আমদানি বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যই প্রথম স্থানে রহিয়াছে দেখা যায়। অবশ্য যুক্তরাজ্যের পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান নির্দেশ করিতে হয়। বর্তমানে ভারতের মোট আমদানি-বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের অংশ হইল শতকরা ২৬ ভাগ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইল শতকরা ১২ ভাগ।†

ভারতের আমদানি বাণিজ্যে অন্যান্য দেশের স্থান

কমনওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের মধ্যে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মালয় ও সিংগাপুর; এবং ব্রহ্মদেশ হইতেও ভারত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করিয়া থাকে।

পাকিস্তানের সহিত ভারতের বাণিজ্যে ক্রমাগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইহার মূলে রহিয়াছে দুই দেশের বাণিজ্যনীতির দ্রুত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রনৈতিক মনোমালিন্য।

অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, অন্যান্য দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রসারলাভ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আছে পশ্চিম-জার্মেনী, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ইজিপ্ট, ইরাণ এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন। এই সমস্ত দেশ হইতে যে-সকল দ্রব্য আমদানি হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য যোগানের প্রধান কেন্দ্র হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া। যন্ত্রপাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মেনী প্রভৃতি দেশ হইতে আসে। ইরাণ, বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে তৈল। কাঁচা তুলা ক্রয়ের অন্যতম কেন্দ্র হইল ইজিপ্ট।

মুদ্রাঞ্চল হিসাবে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের বণ্টন

মুদ্রাঞ্চল হিসাবে ভারতের আমদানি বাণিজ্যের গতি বিচার করিলে দেখা যায় যে বর্তমানে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে ষ্টার্লিং অঞ্চল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে যথাক্রমে ও. ই. ই. সি. দেশ-সমূহ (O.E.E.C. Countries), ডলার অঞ্চল এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের বহির্ভূত দেশসমূহ।** স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হইতে প্রথম পরিকল্পনার

---

* ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে রপ্তানি বাণিজ্যকে বহু পরিমাণে বিনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

† India, 1959.

** Report on Currency and Finance, 1957-58.

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে ভারতের মোট আমদানির শতকরা ৫০ ভাগের কিছু কম ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে, শতকরা ২০ ভাগ ও. ই. ই. সি. দেশসমূহ হইতে, প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ ডলার অঞ্চল হইতে এবং বাকী প্রায় ১৩ ভাগ ষ্টার্লিং অঞ্চল বহির্ভূত অন্যান্য দেশ হইতে আসিতেছে।*

(খ) রপ্তানি বাণিজ্যের গতি:

ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যুক্তরাজ্যের অংশ অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক; ইহা শতকরা ২৬ ভাগের মত। ইহার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। যুদ্ধোত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা মাত্র ৮ ভাগের মত যাইত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইল শতকরা ১৫ ভাগের মত। এই দুইটি দেশের পর জাপান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, পশ্চিম জার্মেনী, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইজিপ্ট ও ব্রহ্মদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক একাধিক কারণে ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। যাহা হউক পাকিস্তানে ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান

রপ্তানি বাণিজ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দেশ

উক্ত দেশগুলি ব্যতীত অন্যান্য দেশেও ভারতীয় বাণিজ্যসম্ভার স্থান পাইতেছে। সিংগাপুর ও মালয়, কেনিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্, ইতালী, ইরাণ, মিশর, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুদ্রাঞ্চল অনুযায়ী ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের বণ্টনে বর্তমানে ষ্টার্লিং অঞ্চলের স্থান সর্বপ্রথম; ডলার অঞ্চল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং ষ্টার্লিং অঞ্চলের বহির্ভূত অন্যান্য দেশের স্থান তৃতীয়। ও. ই. ই. সি. (O. E. E. C.) দেশগুলির স্থান চতুর্থ। রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বোল্লিখিত হিসাব অনুসারে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৫৭ ভাগের কাছাকাছি হইল ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত, শতকরা ১৭ ভাগ ডলার অঞ্চলের সহিত, শতকরা ১৬ ভাগ ষ্টার্লি বহির্ভূত অন্যান্য দেশের সহিত এবং বাকী শতকরা ১০ ভাগ ও. ই. ই. সি. দেশগুলির সহিত।

মুদ্রাঞ্চল অনুযায়ী ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের বণ্টন

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতিতে যে কতকটা বিভিন্নতা আসিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারত যুক্তরাজ্যের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রসারসাধনের বিভিন্ন চেষ্টা চলিয়াছে। বর্তমানে চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চমকপ্রদভাবে না বাড়িলেও ক্রমশ

ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইয়াছে

* Reserve Bank of India—India's Balance of Payments, 1948-49—1955-56.

উহা উন্নতিলাভ করিতেছে। বাণিজ্য-সম্পর্কের উন্নতি-বিধানের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তি করিতেছে।

চতুর্থত, দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত (balance of trade) একরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিকূল হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত—এই আট বৎসরে ভারতের মোট ৮০২·৭ কোটি টাকার মত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে।* যুদ্ধপূর্ব যুগে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ভারতীয় বাণিজ্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই উদ্বৃত্ত হইতেই হোম চার্জের খাতে ব্যয় মিটান সম্ভব হইত। যুদ্ধের মধ্যে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ভারত বিদেশী সমস্ত দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়াও একটা মোটা টাকা জমাইতে সমর্থ হয়। যুদ্ধাবসানে দেখা যায় ১,৭০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের ষ্টার্লিং ভারতের খাতে জমা হইয়াছে।† কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর হইতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত আর অনুকূল থাকে না। ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৮৫ কোটি টাকার উপর প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ এবং ভোগ্যদ্রব্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অধিকতর আমদানির নীতি অবলম্বন করে। ফলে আমদানি বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যায়। অপরদিকে দ্রব্যমূল্যের আধিক্য, উৎপাদনের অপ্রতুলতা, কাঁচামালের ঘাটতি প্রভৃতির দরুন রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারে না। ফলে ক্রমশই অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। ১৯৪৯ সালে ভারত মুদ্রামান বা ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য শতকরা ৩০·৫ ভাগ হ্রাস করে। ইহা ব্যতীত সরকার রপ্তানি প্রসার ও আমদানি সংকোচনের নীতি অবলম্বন করিতে থাকে। তাহা হইলেও দেখা যায়, ১৯৪৯-৫০ সালে ১৪১ কোটি টাকার উপর প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হয়। পরের বৎসর অবশ্য মুদ্রামানহ্রাস, আমদানির উপর সরকারী বাধানিষেধ এবং কোরিয়ার যুদ্ধের দরুন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশে সমরায়োজন, মালমজুতের হিড়িক প্রভৃতির ফলে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য উন্নতিলাভ করে। তা ছাড়া বাণিজ্য-সর্ত (terms of trade) ভারতের পক্ষে অনুকূল হইতে থাকে—অর্থাৎ আমদানিকৃত সামগ্রীর মূল্যের পরিমাণের তুলনায় রপ্তানিকৃত সামগ্রীর মূল্যের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে বাণিজ্য-সর্ত ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২২ হয়।‡

৪। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে গতির পরিবর্তন:

যুদ্ধপূর্ব যুগে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

উল্লিখিত কারণগুলির জন্য ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইয়া ২২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৫১ সালেই আবার অবস্থার অবনতি

* Rrserve Bank of India—India's Balance of Payments, 1948-49—1955-56. January, 1957.

† ৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ আমদানি দ্রব্যের মূল্যসূচকের সহিত রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যসূচকের আনুপাতিক হারকে বাণিজ্য-সর্ত (terms of trade) বলা হয়।

সুরু হয়। খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের অত্যধিক চাপ, শিল্প বিনিয়োগের প্রসার প্রভৃতির ফলে অধিকমাত্রায় দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়। সরকার বাণিজ্যনীতির পরিবর্তন করে এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে বহু দ্রব্যের রপ্তানির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করে। এদিকে যুদ্ধের তোড়জোড় হ্রাস পাওয়ায় পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদাও ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। বাণিজ্য-সর্তেও অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ২১০ কোটি টাকায়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহা হইল সর্বাধিক। ইহার পরবর্তী দুই বৎসর খাদ্যসীমান্তে উন্নতি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পায়, এবং প্রথম পরিকল্পনাধীন বাকী সময়ে এই গতি মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।* কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই দেখা যায় সংকট।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অকল্পনীয় প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

১৯৫৫-৫৬ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৯৫ কোটি টাকার কিছু উপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই ইহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় প্রায় ৪৬৪ কোটি টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৬০৯ কোটি টাকার উপর দাঁড়ায়। এতটা প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের প্রধান কারণ হইল যে সরকারী খাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের আমদানির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। ইহা ছাড়া বহু পরিমাণ খাদ্যও আমদানি করিতে হইয়াছে। অপরদিকে রপ্তানি প্রসারের চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই।**

ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক সময় বলা হইত যে, বর্তমানে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও মালমসলা আনয়ন করিতেই হইবে। ইহা ব্যতীত যুদ্ধের মধ্যে ভারত যে-ষ্টার্লিং জমাইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলেও বিশেষ অসুবিধা হইবে না। উপরন্তু ভারত অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল হইতে ঋণও পাইতেছে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে এই আশাবাদ আর বর্তমান থাকে না। বস্তুত, ইহা সর্বদা স্মরণযোগ্য যে, ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতাকেই প্রকাশ করে। উপরন্তু, ভারতের জমা ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে এবং উহাও বাৎসরিক কিস্তিতে দেয়।† সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ অর্থনৈতিক

প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন

* ৪০ পৃষ্ঠার ছকটি দেখ।

** Report on Currency and Finance, 1958-59.

† ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত মোট ১৮৫ কোটি এবং মোট বৈদেশিক-মুদ্রা সঞ্চয় ৩৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে জানা যায়।

পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইতে পারে। এ-সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

পঞ্চমত, যুদ্ধপূর্ব যুগে ভারতকে ডলার ঘাটতির সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তই হইত। অবশ্য যুদ্ধের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণও স্বল্প ছিল। কিন্তু ইহার পর দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় ১৯৫৩-৫৪ সাল ছাড়া অন্যান্য বৎসরে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (trade balance) প্রতিকূল হয়। তবে অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য (invisibles) এবং প্রাপ্ত সরকারী দানের (official donations) কথা ধরিয়া চলতি হিসাবের খাতে দেনাপাওনার কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে প্রথম পরিকল্পনার শেষ তিন বৎসরে লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূলই হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হইতেই ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেনের উদ্বৃত্ত উভয়ই প্রতিকূল হইয়া চলিয়াছে। ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮, ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ফলে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৫ কোটি, ১০৯ কোটি এবং ৭৬ কোটি টাকা।* সুতরাং ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে অবস্থার কতকটা উন্নতি দেখা দিয়াছে।

৫। যুদ্ধোত্তর যুগে ডলার অঞ্চলের সহিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই কার্যের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজন হইল। বর্তমানে ডলার অঞ্চলই প্রধানত এই সকল দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। তাই ডলার অঞ্চলের সহিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বিশেষ আশংকার সৃষ্টি করিয়াছে। তবে আশার কথা হইল এই যে, পশ্চিম জার্মেনী, জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক উন্নতিলাভ করিতেছে; এবং উহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্যাদি পাইবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং মূলধন-দ্রব্যাদির জন্য এখন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এককভাবে নির্ভর করিতে হইবে না। উপরন্তু, ডলার অঞ্চলের সহিতও বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অবনতির প্রতিবিধানে ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়াছে এবং আমরা দেখিয়াছি যে ১৯৫৮-৫৯ সালে এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে ফলপ্রসূ হইয়াছে।

এই বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধান

ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত (India's Balance of Payments): কোন দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে মাত্র বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের (Balance of Trade) দিকে নজর দিলেই চলিবে না, লেনদেন-উদ্বৃত্তের (Balance of Payments) অবস্থাও বিশেষভাবে অনুধাবন করা

* Report on Currency and Finance 1958-59এর ৭৩ পৃষ্ঠা।

প্রয়োজন। জিনিসপত্রের প্রত্যক্ষ আমদানি ও প্রত্যক্ষ রপ্তানির পার্থক্য হইল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। অপরদিকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ উভয় প্রকারের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে যে-পার্থক্য থাকে তাহাকে বলা হয় লেনদেন-উদ্বৃত্ত।

লেনদেন-উদ্বৃত্ত কাহাকে বলে

ঐতিহাসিক পরিক্রমায় ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্তকে চারিভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়—যথা, (ক) প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুগে লেনদেন-উদ্বৃত্ত, (খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর যুগে লেনদেন-উদ্বৃত্ত, (গ) প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-উদ্বৃত্ত এবং (ঘ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে লেনদেন-উদ্বৃত্ত। গত যুদ্ধের পূর্বে ভারতের লেনদেনের মধ্যে সমতা রক্ষা করা সহজ ছিল। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সাধারণত অনুকূলই হইত। এই অনুকূল উদ্বৃত্তের সাহায্যে ভারত 'হোম চার্জ' প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইত।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের চারিটি যুগ

(ক) যুদ্ধপূর্ব যুগ

গত যুদ্ধের মধ্যে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অভূতপূর্বভাবে অনুকূল হয়। ফলে বৈদেশিক প্রাপ্য মিটাইয়াও ভারত একটা মোটা টাকার ষ্টার্লিং জমাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর, বিশেষত দেশবিভাগের পর, হইতে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় অসুবিধা। ১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৪৯-৫০ সাল, এই তিন বৎসরের মধ্যে চলতি হিসাবের (Current Account) খাতে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয় ৪১৩ কোটি টাকা। সঞ্চিত ষ্টার্লিং, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও অন্যান্য সূত্র হইতে ঋণের সাহায্যে এই পাওনা মিটান হয়।

(খ) যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগ

প্রথম পরিকল্পনার ৫ বৎসরের মধ্যে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত (সরকারী দান সমেত) ১৯৫১-৫২ সাল ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে অনুকূল হয়। অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য (সরকারী দান সমেত) অনুকূল হওয়ার দরুনই ইহা সম্ভব হয়—কারণ বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বরাবরই প্রতিকূল হইয়াছে। কিন্তু সরকারী দান বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে চলতি হিসাবের খাতে ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালেও ঘাটতি হয়।* ১৯৫১-৫২ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকে ভারতের রপ্তানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিনিয়োগের প্রসার ও খাদ্যাভাবের দরুন আমদানি রপ্তানিকে ছাড়াইয়া যায়। ফলে চলতি হিসাবের খাতে দেখা দেয় ঘাটতি। সরকারী দান বাদ দিলে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহাই হইল ঘাটতির সর্বাধিক পরিমাণ। পরবর্তী দুই বৎসরে কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকের অবসান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ে শ্লথগতির ফলে রপ্তানি বিশেষভাবে হ্রাস পাইলেও দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত মূলধন বিনিয়োগের গতিতে মন্থরতা ও খাদ্যাবস্থার উন্নয়নের ফলে আমদানির পরিমাণ আরও বেশী কমিয়া আসে। ফলে দেখা দেয় চলতি হিসাবের খাতে অনুকূল উদ্বৃত্ত।

(গ) প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়

* Reserve Bank—India's Balance of Payments, 1948-49—1955-56.

প্রথম পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরে রপ্তানি ও আমদানি উভয়ই প্রসারলাভ করে। একদিকে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যের সম্প্রসারণের ফলে যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে বিদেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মের উন্নতির ফলে রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমদানির প্রসার হয় রপ্তানির প্রসার অপেক্ষা অধিক। চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়া) দেখা দেয় ঘাটতি।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ঘাটতির পরিমাণ

সামগ্রিকভাবে দেখিলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়া) ঘাটতির মোট পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি টাকা। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে সরকারী সাহায্য (Official Donations) এবং সরকারী ঋণ হইতে প্রাপ্ত অর্থ মোট ঘাটতিকে অতিক্রম করে।*

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অপেক্ষা কম ঘাটতি হইয়াছে

পরিকল্পনা কমিশন আশংকা করিয়াছিল যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় চলতি হিসাবের খাতে ঘাটতি ৬৬৭ কোটি টাকা হইতে ৭২৭ কোটি টাকার মতন হইবে। কার্যক্ষেত্রে চলতি হিসাবের খাতে (সরকারী দান বাদ দিয়া) ঘাটতি কম হওয়ার প্রধান কারণ হইল নিম্নলিখিত তিনটি : (১) দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন উন্নতিলাভ করার ফলে যে-পরিমাণ খাদ্য আমদানি করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। (২) লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনকারী শিল্পের প্রস্তাবিত নির্মাণকার্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় সুরু করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং যে-পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তাহা হয় নাই। (৩) বিনিয়োগের হারও আশানুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই।

ঘাটতি কম হইবার কারণ

(খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়

প্রথম পরিকল্পনার সময় অধিকাংশ বৎসরে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই (১৯৫৬-৫৭) চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি (current account deficit) দাঁড়ায় ৩০৭ কোটি টাকা। এই ঘাটতি মিটাইতে যাইয়া ভারতকে তাহার বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় (foreign exchange reserves) হইতে ২২১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি আরও বাড়িয়া দাঁড়ায় ৪৭৬ কোটি টাকায়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার এবং বিদেশ হইতে অধিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও ভারতকে ঘাটতি মিটাইবার জন্য বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় হইতে ২৬০ কোটির মত টাকা ব্যয় করিতে হয়। পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া ৩৩৯ কোটি টাকাতে পরিণত হয়। যাহা হউক, পরিকল্পনার সুরু হইতেই এরূপ বিপুল ঘাটতি হইবার কারণ কি তাহা আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

* Report on Currency and Finance, 1955-56.

বহির্বাণিজ্য ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Foreign Trade and the Second Five Year Plan)ঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্বাপেক্ষা অধিক বিনিয়োগ (investment) এবং দ্রুত শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ফলে স্বভাবতই বহির্বাণিজ্যের উপর গুরুদায়িত্ব পড়িয়াছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালমসলার জন্য অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রাসংগ্রহের সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই কারণেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে ভারতের বাণিজ্যনীতির উদ্দেশ্য হইবে একদিকে রপ্তানিকে যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করা, আর অপরদিকে আমদানিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা। আমদানির ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয় এমন সমস্ত দ্রব্যেরই আমদানি সংক্ষেপ করা হইবে। ঐ ব্যয়সংক্ষেপের সাহায্যেই অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ করা সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহির্বাণিজ্যের গুরুত্ব ও বহির্বাণিজ্যনীতি

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্তের (Balance of Payments) যে-আনুমানিক হিসাব দেওয়া হয় তাহাতে সমগ্র পরিকল্পাধীন সময়ে চলতি হিসাবের খাতে (Current Account) ১,১০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। এই হিসাবের মধ্যে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ছিল। কারণ, রপ্তানি-আমদানি এবং অন্যান্য কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত সম্ভাব্য ঘাটতির পরিমাণ হিসাব করা ছিল। প্রথমত, ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে বাণিজ্য-সর্ত (terms of trade) ১৯৫৫-৫৬ সালের প্রথম ৯ মাসে যাহা ছিল তাহাই থাকিবে। এবং এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময়ে বাণিজ্য-সর্ত (ভিত্তিঃ ১৯৫২-৫৩=১০০) ১০০ ছিল। দ্বিতীয়ত, বলা হইয়াছিল যে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইবে। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থা যে এই দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল তাহা একরূপ সর্বজ্ঞাত সত্য। বাণিজ্য-সর্তের সামান্য অবনতির ফলেও লেনদেনের অবস্থায় বিশেষ অবনতি দেখা দিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতিও লেনদেনের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। যখনই মুদ্রাস্ফীতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তখনই বিদেশী দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং বিদেশে দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়—অর্থাৎ রপ্তানিহ্রাস ও আমদানিবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়। সুতরাং বাণিজ্য-সর্ত এবং আভ্যন্তরীণ দ্রব্যমূল্য যে-কোনও একটির প্রতিকূল পরিবর্তন পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবকে বানচাল করিয়া দিয়া লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণকে বৃদ্ধি করিতে পারিত। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে উক্ত দুইটি বিষয়ই কার্যকর হইয়াছিল।

পরিকল্পনা কমিশন মোট ১,১০০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে অনুমান করিয়াছিল

এই অনুমানের ভিত্তিঃ ১। বাণিজ্য-সর্ত অপরিবর্তিতই থাকিবে

২। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত করা হইবে

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির সম্ভাবনা সম্পর্কে যে-অনুমান করা হইয়াছিল তাহাতে চা, পাটজাত দ্রব্য ও তুলাবস্ত্র, এই তিনটি রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম

দুইটির উপর বিশেষ আস্থাস্থাপন করা হয় নাই। তবে তুলাবস্ত্রের মাধ্যমে একটা মোটা অংকের বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কয়েকটি নূতন ও পুরাতন রপ্তানি পণ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও মোটামুটি খুব বেশী রপ্তানিবৃদ্ধির আশা করা হয় নাই। তাহা হইলেও নূতন নূতন দ্রব্যের রপ্তানির প্রসারের কথা এবং পাটজাত দ্রব্য, চা, তুলাবস্ত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দ্রব্যের রপ্তানি ও বিক্রয়-বাজার যাহাতে সম্প্রসারিত হয় তাহার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টার কথাও বলা হইয়াছিল।

রপ্তানির সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুমান

আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয় যে মূল শিল্পগুলির প্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি, যানবাহন, লৌহ ও ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্যই অধিক পরিমাণে আমদানি করা হইবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির হিসাব করা হয়। তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও খনিজ তৈলের আমদানির পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইবে না। রাসায়নিক দ্রব্য এবং ঔষধপত্রাদির আমদানি বর্তমানে যাহা আছে তাহাই থাকিবে বলিয়া ধরা হয়। তবে রং ও কাগজের আমদানি হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে বলা হয় যে বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য উহাদের আমদানি যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। মোটকথা শিল্পপ্রসারের জন্য অপরিহার্য নয় এমন সমস্ত দ্রব্যের আমদানিকে সীমাবদ্ধ করিয়া যন্ত্রপাতি এবং শিল্পের কাঁচামাল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইবে। অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্যের (Invisibles) ক্ষেত্রে (সরকারী দান বাদ দিয়া) হিসাব করা হয় যে, প্রতি বৎসর ৫১ কোটি টাকার মত অনুকূল উদ্বৃত্ত হইবে।

আমদানি বাণিজ্য সম্পর্কে অনুমান

এখন দেখা যাউক ১,১০০ কোটি টাকার মত যে ঘাটতির আশংকা করা হইতেছে তাহা কিভাবে পূরণ করা হইবে। পরিকল্পনা কমিশন এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ করে নাই; সাধারণভাবে কতকগুলি উপায়ের ইংগিতমাত্র দিয়াছে। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের সাময়িক অসুবিধা অতিক্রম করিবার মত বিদেশী মুদ্রার ব্যবস্থা রাখিয়া জমা ষ্টার্লিং হইতে ২০০ কোটি টাকার মত ব্যয় করিবার প্রস্তাব হয়। বাকী ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে পূরণের চেষ্টা করা হইবে। এই সূত্রগুলি মোটামুটিভাবে হইল: (১) বৈদেশিক বাজারে ঋণ সংগ্রহ; (২) বিদেশ হইতে মাল সরবরাহের জন্য রপ্তানি ক্রেডিট ও ব্যাংকারস্ ক্রেডিটের (Exports and Bankers' Credit) ব্যবস্থা; (৩) বিশ্বব্যাংক (International Bank for Reconstructions and Development) এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-সাহায্য করপোরেশন (International Finance Corporation) হইতে ঋণ গ্রহণ; (৪) অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দান; (৫) মিত্রভাবাপন্ন বিদেশী সরকারগুলির নিকট হইতে দান ও ঋণ গ্রহণ এবং (৬) ব্যক্তিগত বিদেশী মূলধনের (private foreign investment) বিনিয়োগ। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত

বহির্বাণিজ্যের দেনা-পাওনার ঘাটতি পূরণের উপায়সমূহ

বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এবং উহা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রেই (private sector) বিনিয়োজিত হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৮০০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে।

পরিকল্পনা কমিশনের উক্ত হিসাবকে ভুল প্রমাণিত করিয়া ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ঘাটতি হয় যথাক্রমে ৩০৭ ও ৪৭৬ কোটি টাকা।—অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেই মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮৩ কোটি টাকা—যদিও বা মোট পরিকল্পনাধীন সময়ে ১,১০০ কোটি টাকা ঘাটতির অনুমান করা হইয়াছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্য এই দুই বৎসরে মোট ৪৮১ কোটি টাকা ভারতের জমা বিদেশী মুদ্রা হইতে ব্যয় করিতে হয় এবং ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের পরিমাণ বিশেষ কমিয়া গিয়া মোট ৪২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।* ইহার ফলে অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংকটের সূচনা দেয়। ভারতের নোট প্রচলন-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন** এবং পরিকল্পনার ছাঁটকাট করিতে হয়। সংগে সংগে অবশ্য লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত ও বৈদেশিক মুদ্রাসংকট

এই সকল ব্যবস্থার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঐরূপ প্রতিকূল অবস্থার কারণ কি এবং কি কি উপায়ে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়।

কারণ ঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে অস্বাভাবিক লেনদেন-ঘাটতির প্রধান কারণ হইল অস্বাভাবিক পরিমাণে আমদানির মূল্যবৃদ্ধি। সংগে সংগে অবশ্য আমদানিও হ্রাস পাইয়াছিল; তবে আমদানির মূল্য যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, রপ্তানির মূল্য সে-পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। নিম্নের ছকটি হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে আমদানি-রপ্তানির প্রকৃতি বুঝা যাইবে ঃ

প্রধান কারণ আমদানির মূল্যবৃদ্ধি

(হিসাব কোটি টাকায়)

	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
১। আমদানি	৭৬১'৪	১,০৯৯'৫	১,২০৪'২
২। রপ্তানি	৬৪০'২	৬৩৫'২	৫৯৪'৭
৩। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত	—১২১'২	—৪৬৪'৩	—৬০৯'৫
৪। অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য ও সরকারী দান	১২৬'৪	১৫৩'০	১৩৩'৬
৫। লেনদেন-উদ্বৃত্ত	+৫'২	—৩১১'৩	—৪৭৫'৯

* Report on Currency and Finance, 1957-58.

** পরবর্তী অধ্যায় দেখ।

ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৯৫৫-৫৬ সালে আমদানির মূল্য ছিল মাত্র ৭৬১ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় যথাক্রমে ১,০৯৯ এবং ১,২০৪ কোটি টাকার উপর। অপরদিকে রপ্তানি ৬৪০ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৬৩৫ কোটি টাকায় এবং ৬৩৫ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৫৯৪ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ফলে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ১২১ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬১০ কোটি টাকা দাঁড়ায়ঃ এবং ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালের লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৩১১ ও ৪৭৬ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভেই যে এতটা আমদানি করিতে হইবে তাহা পরিকল্পনা কমিশন চিন্তা করে নাই। কমিশনের হিসাব ছিল ১৯৫৮-৫৯ সালে আমদানি সর্বাধিক হইবে এবং উহার পরিমাণ হইবে ৯৯০ কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যাইতেছে পরিকল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরেই উহা ছাপাইয়া গিয়াছে। আশাতীতভাবে আমদানি দ্রুতবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রথমেই বলিতে হয় কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য কত আমদানির প্রয়োজন সে সম্পর্কে হিসাবে ভুল করিয়াছিল। দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম দ্রুত সম্প্রসারিত করা হয় যাহার ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি—বিশেষ করিয়া মূলধন-দ্রব্যের আমদানি বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা প্রকাশের পরও কতকগুলি নূতন কর্মসূচী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয়ত, সরকার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিয়াই ১৯৫৬-৫৭ সালে অধিক পরিমাণে আমদানি-লাইসেন্স (import licence) দিতে থাকে এবং উহার ফল ১৯৫৭-৫৮ সালে ফলিতে থাকে। অবশ্য সম্প্রতি লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি করা হইয়াছে। চতুর্থত, খাদ্যাবস্থার অবনতি হওয়ায় খাদ্যশস্যের আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাত্র ২৯ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে খাদ্যশস্য আমদানি মূল্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০২ কোটি টাকা ও ১৫২ কোটি টাকার মত।* পঞ্চমত, দেশরক্ষা খাতের বর্ধিত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অধিক আমদানি হয়। ষষ্ঠত, খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির মূল্যের পরিমাণ কতকটা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন সকল দ্রব্যের আমদানি সম্পর্কে কড়াকড়ি করার ফলে ১৯৫৭-৫৮ সালে উহার আমদানি কমিয়া যায়। সপ্তমত, ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানির মূল্য অধিক হওয়ার আর একটি কারণ হইল সুয়েজ খাল লইয়া বিবাদ। এই বিবাদের ফলে মালের মাসুল বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানির মোট মূল্য বৃদ্ধি পায়।

আমদানির মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ

১৯৫৭-৫৮ সালের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে আমদানি বেসরকারী ক্ষেত্রে কমিয়া যাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। এই বৃদ্ধি খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতির আমদানির দরুনই হয়।

* Report on the Currency and Finance, 1957-58.

১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে রপ্তানি হ্রাসের অন্যতম কারণ হইল দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যদ্রব্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি। বিদেশী বাজারে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতাও আর একটি কারণ। রপ্তানি প্রসারের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চা, পাট-শিল্পজাত দ্রব্য, তুলাবস্ত্র, কাঁচা তুলা, উদ্ভিজ্জ তৈলের রপ্তানি বিশেষভাবে হ্রাস পায়। উপরি-উক্ত কারণগুলি ব্যতীত ১৯৫৭-৫৮ সালে যুক্তরাজ্যে মালমজুতের হিড়িক কমিয়া যাওয়ায় ও ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার ফলে ঐ দেশে ভারতীয় দ্রব্য কম বিক্রয় হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দাগতি দেখা দেওয়ায় ভারতের রপ্তানি কতক পরিমাণে হ্রাস পায়।

রপ্তানি হ্রাসের কারণ

১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে উপরি-উক্ত ৩১২ ও ৪৭৬ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ করা হয় প্রধানত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হইতে। এই দুই বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হইতে ভারতকে ৪৮১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বাকী টাকা বৈদেশিক ঋণ ইত্যাদি হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

ঘাটতি পূরণ

১৯৫৮-৫৯ সালে লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Payments in 1958-59): ১৯৫৬-৫৭ সালে লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা আশংকাজনক রূপ ধারণ করার সংগে সংগেই আমদানি নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি প্রসার প্রভৃতির উপর আরও অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের প্রচেষ্টা তীব্রতর করা হয়। এই সকলের ফল ফলে ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে। বস্তুত, এই সালে লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থার অনেকাংশে উন্নতি ঘটে। নিম্নের ছকটি হইতে পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে লেনদেন-অবস্থার প্রকৃতি বুঝা যাইবে:

(হিসাব কোটি টাকায়)

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
১। আমদানি	১০৯৯.৫	১২০৪.২	১০৪৬.৫
২। রপ্তানি	৬৩৫.২	৫৯৪.৭	৫৭৬.১
৩। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত	−৪৬৪.৩	−৬০৯.৫	−৪৭০.৪
৪। অপ্রত্যক্ষ বাণিজ্য ও সরকারী দান	১৫৩.০	১৩৩.৬	১৩১.৬
৫। লেনদেন-উদ্বৃত্ত	−৩১১.৩	−৪৭৫.৯	−৩৩৮.৮

যুদ্ধোত্তর যুগের বাণিজ্য ও লেনদেন-উদ্বৃত্তের কারণের সংক্ষিপ্তসার (Summary of the Reasons for Adverse Balance of Trade and Balance of Payments in the Post-war Era): যুদ্ধোত্তর যুগে প্রতি বৎসরেই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছে। তবে প্রথম পরিকল্পনার ১৯৫১-৫২ সাল ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল ছিল। ইহা সরকারী দানের জন্যই সম্ভব

হইয়াছিল। পূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বা লেনদেন-উদ্বৃত্তের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইলেও এখন উহার একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে: (১) স্বাধীন ভারতের একটি প্রধান সমস্যা হইল খাদ্যাভাব। ইহার জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে একটা মোটা টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। (২) দেশবিভাগের পূর্বে ভারত কাঁচামাল রপ্তানি করিত। একদিকে যেমন দেশ-বিভাগের ফলে কাঁচামালের ঘাটতি হয়, অপরদিকে শিল্পপ্রসারের জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। ফলে ভারতকে বহুল পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি করিতে হয়। (৩) যুদ্ধাবস্থায় আয় বৃদ্ধি পাইলেও ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের পর ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি বাড়িয়া যায়। (৪) যুদ্ধকালে যন্ত্রপাতির যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহার পূরণের জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতে হয়। (৫) মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভারতীয় বাজারে বিক্রয় যেমন সুবিধাজনক হয় ভারত হইতে ক্রয় তেমনি আবার অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ব্যয়-মূল্যের (cost-price) সম্পর্কে অসমতা ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যকে ব্যাহত করে। (৬) আশানুরূপভাবে ভারতের উৎপাদনকে রপ্তানিবৃদ্ধি ও আমদানিহ্রাসের উপযোগী করিয়া সংগঠিত করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া ভারতীয় দ্রব্যাদির গুণগত উৎকর্ষেরও উন্নতি করা হয় নাই; ফলে বিদেশে উহাদের বিক্রয়-সম্ভাবনার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যায় নাই। (৭) পাকিস্তানের সংগে বাণিজ্য-সম্পর্ক সকল সময় সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় নাই। ইহাতে ভারতের উৎপাদন ও বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। (৮) পরিশেষে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য ভারতকে বহুপরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইতেছে। বস্তুত, এই খাতেই বর্তমানে আমদানি হইল সর্বাপেক্ষা অধিক।

অবলম্বিত প্রতিবিধান (Remedies Adopted): প্রথমত, উৎপাদন-বৃদ্ধি বিশেষত কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য 'অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান' (Grow More Food Campaign) চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করে। সম্প্রতি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি কৃষি-উৎপাদনের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে উৎপাদনবৃদ্ধি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন দলও অনুরূপ উক্তি করিয়াছে।* উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্যে ছোট ও মধ্যাকারের সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, জমির পুনরুদ্ধার, উন্নত ধরনের সার ও বীজ সরবরাহ, বীজ-খামারের প্রসার, জাপানী পদ্ধতিতে ধানচাষ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কৃষি-উৎপাদনাভিমুখী করিয়া তোলা হইয়াছে।

১। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan এবং Report of the Foodgrains Enquiry Committee.

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় তাহা রোধ করিবার জন্য নানাবিধ আর্থিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৬ সালের মে মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাংক পরিমাণমূলক (quantitative) এবং নির্বাচনমূলক (selective) নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রয়োজন মত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

২। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ

তৃতীয়ত, সরকার যে-সমস্ত দ্রব্য অপরিহার্য নয় তাহাদের আমদানি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদির আমদানি বিশেষভাবে কমাইয়া দেয়। অবশ্য যন্ত্রপাতি ও শিল্পপ্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের আমদানির দ্বার প্রথম প্রথম মুক্ত রাখা হয়। কিন্তু খাদ্যশস্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগ হইতে এ-সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। ব্যবসায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নূতন শিল্প-পরিকল্পনার জন্য মূলধন একমাত্র 'বিলম্বে পাওনা মিটানর ব্যবস্থা'র (deferred payment arrangements) ভিত্তিতে আমদানি করিতে দেওয়া হয়।*

৩। আমদানি নিয়ন্ত্রণ

চতুর্থত, রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা রপ্তানি প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং ক্রমশ রপ্তানির উপর হইতে বাধানিষেধ অপসারিত করা হইতেছে। একটি রপ্তানি উপদেষ্টা পরিষদ (an Export Advisory Council) ছাড়াও রপ্তানিবৃদ্ধির উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৪৯ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি (Gorwalla Export Promotion Committee) নিয়োগ করা হয়। সরকার এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রপ্তানি প্রসারের জন্য নানা পন্থা গ্রহণ করে। রপ্তানি প্রসারের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচনার জন্য ১৯৫৭ সালে আবার একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি (Export Promotion Committee, 1957) নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস, রপ্তানিপ্রসার পরিষদ গঠন, রপ্তানির জন্য অতিরিক্ত কোটা মঞ্জুর প্রভৃতি নানা পন্থা অবলম্বন করা হয়। ১৯৫৮ সালে বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাদির সমন্বয়ের জন্য একটি বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড (Foreign Trade Board) এবং রপ্তানিপ্রসার নীতির সমন্বয়ের জন্য একটি রপ্তানিপ্রসার দপ্তর (Directorate of Export Promotion) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।† আবার সরকার রপ্তানি বাণিজ্যের ঝুঁকি বীমা পরিকল্পনার (Export Credit Insurance Scheme) খসড়া রচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী

৪। রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টা

রপ্তানি প্রসার কমিটি

রপ্তানি প্রসার পরিষদ

রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পনা

---

* Report on Currency and Finance, 1957-58.

† Report on Currency and Finance, 1957-58.

সরকার ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন (Export Risks Insurance Corporation) গঠন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সম্প্রতি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় করপোরেশন [The State Trading Corporation of India (Private) Ltd.] গঠিত হইয়াছে। এই করপোরেশন বহির্বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করিতেছে। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, ভারতীয় দ্রব্যাদির মান নির্ধারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে শো-রুমের (show-rooms) ব্যবস্থা ও প্রচারকার্য প্রভৃতি ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করিয়াছে। ইহার উপর ভারত সরকার বিভিন্ন দেশে শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত শুভেচ্ছা দল (Industrial-cum-Commercial Mission) প্রেরণ করিয়া রপ্তানি প্রসারের চেষ্টা করিতেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় করপোরেশন

পঞ্চমত, আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহা ছাড়া বিদেশজাত দ্রব্যের যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা তাহা দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা পূরণ করিয়া বিদেশী মুদ্রার ব্যয়সংক্ষেপ করার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

৫। উৎপাদনবৃদ্ধি

ষষ্ঠত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণের (Exchange Control) সাহায্যে বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে উহাকে ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, বিদেশী মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়, বিদেশ-ভ্রমণের ব্যয়, বিদেশে শিক্ষার জন্য ব্যয়, স্বর্ণ ও গহনাদির আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মধ্যে এই নিয়ন্ত্রণ কতকটা শিথিল করা হইলেও লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থায় (Balance of Payments Position) অবনতি দেখা দেওয়ায় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে আবার কঠিন করা হইয়াছে।

৬। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

সপ্তমত, বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। এই চুক্তির ফলে ঐ দেশগুলি হইতে শিল্পপ্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আমদানি করা কতকটা সহজসাধ্য হইয়াছে। এই দিক দিয়া ঐ দেশগুলিতে ভারতীয় দ্রব্যাদির রপ্তানির কিছুটা প্রসারলাভ করিয়াছে। এইভাবে ভারত যুগোশ্লাভিয়া, মিশর, পোল্যাণ্ড, হাংগেরী, সুইজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মেনী, জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন, নয়া চীন প্রভৃতি দেশগুলির সহিত সরাসরি বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

৭। বাণিজ্যচুক্তি

অষ্টমত, যুদ্ধোত্তর যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ভারতীয় মুদ্রামান-হ্রাস। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাজ্যের পদাংক অনুসরণ করিয়া ভারত ডলারের হিসাবে টাকার বিনিময় মূল্য শতকরা ৩০·৫ ভাগ হ্রাস করে। ইহার ফলে ভারতীয় রপ্তানি প্রসারলাভ করে এবং আমদানি সংকুচিত হয়। একদিকে ডলার অঞ্চলে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যহ্রাস, অপরদিকে ষ্টার্লিং অঞ্চলে অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার চাপ হ্রাস ভারতীয় রপ্তানি প্রসারে সাহায্য করে। দেখা গিয়াছে যে উপরি-উক্ত পন্থাগুলি অবলম্বনের ফলে ভারতের লেনদেনের অবস্থা

৮। মুদ্রামানহ্রাস

১৯৫২ সালের পর হইতে কতকটা উন্নতিলাভ করিলেও ১৯৫৬-৫৭ সালে আবার বিশেষ অবনতির পথে চলে। সুতরাং ১৯৫৭ সালের মধ্যভাগ হইতে আমদানি সংকোচ ও রপ্তানি প্রসারের নীতি আরও দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে হয়। ইহার ফলেই ১৯৫৮-৫৯ সালে লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থার কতকটা উন্নতি ঘটে।

উপসংহার : ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও যে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হইতেছে তাহার অন্যতম কারণ হইল বৈদেশিক সাহায্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোবিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মেনী, জাপান, কলম্বো পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি হইতে ভারত দান ও ঋণ হিসাবে যথেষ্ট সাহায্য পাইতেছে। ইহা ব্যতীত বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ভারত ঋণ পাইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় মোট ৪০৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পায়; ইহার মধ্যে ১৯০ কোটি টাকা ঐ পরিকল্পনার সময় ব্যয় করা হয় নাই। সুতরাং এই টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যের জন্য পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনার তিন বৎসরে ১,২১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ইহা আশাতীত। কিন্তু ইহাও পর্যাপ্ত নহে। দ্বিতীয়ত, অধিক খাদ্য আমদানির আশংকা সকল সময়েই রহিয়াছে। তৃতীয়ত, বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্রতর হইতেছে এবং মন্দাগতিও (recession) দেখা দিয়াছে। চতুর্থত, আমদানি হ্রাস করিবার অবকাশ খুব বেশী নাই। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হইয়াছে। আমদানিহ্রাসের আরও বেশী চেষ্টা করা হইলে দেশের উৎপাদন ও নিয়োগ ব্যাহত হইবে। পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছে প্রথমে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব করা হইয়াছিল তাহা ঠিক নয়। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে হিসাব করা হইয়াছে যে পরিকল্পনাধীন সময়ে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি ১,১০০ কোটি টাকার স্থলে ২,০০০ কোটি টাকার মত হইবে।* সুতরাং আরও বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য প্রয়োজন। নচেৎ পরিকল্পনার আরও ছাঁটকাট করিতে হইবে।

পরিকল্পনা কার্যের জন্য বৈদেশিক সাহায্য

মুদ্রামানহ্রাস ও ভারতের বহির্বাণিজ্য (Devaluation and Foreign Trade of India) :** ১৯৪৯-৫০ সালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

* Report on Currency and Finance, 1958-59.

** স্বর্ণ এবং বিদেশী মুদ্রার হিসাবে কোন দেশের মুদ্রার বিনিময়-মূল্য সরকারীভাবে হ্রাস করা হইলে তাহাকে মুদ্রামানহ্রাস বা ডিভ্যালুয়েশন (Devaluation) বলা হয়। এই মুদ্রামানহ্রাস সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানি ও রপ্তানির উপর প্রভাব বিস্তার করে। মুদ্রামানহ্রাসকারী দেশে বিদেশী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশে ঐ দেশের রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে—যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, ভারতীয় ও আমেরিকান বিনিময়-হার হইল ১ টাকা = ৩০ সেন্ট (cents) তাহা হইলে আমেরিকার ৩০ সেন্ট মূল্যের দ্রব্য ভারতীয়রা ক্রয় করিতে চাহিলে ১ টাকা দিতে হইবে। এখন ধরা যাউক যে টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা হইল এবং বিনিময়-হার হইল ১ টাকা = ২০ সেন্ট। এখন ভারতীয়দের ৩০ সেন্ট মূল্যের আমেরিকার দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে ১ টাকা ৬ আনা ১০$\frac{২}{৩}$ পাই দিতে হইবে। অপরদিকে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে। যেমন, মুদ্রামানহ্রাসের

ঘটনা হইল ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাস। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৯শে তারিখে ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য শতকরা ৩০·৫ ভাগ হ্রাস করা হয়। অবস্থার চাপে পড়িয়াই ভারতকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাজ্যের অনুসরণে ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশ ডলারের হিসাবে উপরি-উক্ত পরিমাণে তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে যুক্তরাজ্যের রপ্তানি-বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছিল। বিশেষত, ডলার অঞ্চলে রপ্তানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যুক্তরাজ্য ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলিতে ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে। ইহার ফলে স্বর্ণ ও ডলার সঞ্চয় দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবস্থা সংকটজনক হইয়া দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্য এবং উহার সহিত ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলি মুদ্রামানহ্রাস করিয়া বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থার উন্নতি করিতে প্রয়াস পায়।

ষ্টার্লিং অঞ্চলের মুদ্রামানহ্রাস

ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে ১৯৪৫ সালের পর হইতে ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে লেনদেনের উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে। ইহা সত্ত্বেও ভারত মুদ্রামানহ্রাসের নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল না। সরকার স্পষ্টই ঘোষণা করে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রামানহ্রাস ডলার দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়। আমদানি ত' সরকারী বাধানিষেধের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে; মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে আমদানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আমদানি হ্রাস করিবার প্রয়োজন নাই এবং কাম্যও নয়। ভারতের রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদির সরবরাহের প্রকৃতি অনতিপরিবর্তনশীল (inelastic) হওয়ায় মুদ্রামানহ্রাসের সাহায্যে রপ্তানি পণ্যের মূল্য হ্রাস করিয়া রপ্তানি হইতে আয় বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ষ্টার্লিং অঞ্চল যখন মুদ্রামানহ্রাস করিল ভারতকে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই ঐ পথে পদসঞ্চার করিতে হইল।* কারণ ভারতের তিন-চতুর্থাংশ রপ্তানি ষ্টার্লিং অঞ্চলে হইত। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাস না করা হইলে ঐ অঞ্চলের মুদ্রার হিসাবে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইত এবং ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিল ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলি। এই অবস্থায়

ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-মান হ্রাস সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা

আত্মরক্ষার জন্য ভারতকে মুদ্রামানহ্রাস করিতে হয়

পূর্বে ১ টাকা মূল্যের ভারতীয় দ্রব্য আমেরিকায় ৩০ সেণ্টে বিক্রয় হইত। ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাসের পর ১ টাকা দামের ভারতীয় দ্রব্য আমেরিকায় ২০ সেণ্টে বিক্রয় হইবে। এইভাবে আমদানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহার চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইলে বিদেশে রপ্তানির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। তবে আমদানি-রপ্তানির হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করিবে আমদানি-রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদির চাহিদার পরিবর্তনশীলতার (Elasticity of Demand) উপর। আমদানি-রপ্তানির অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদির চাহিদা মোটামুটিভাবে পরিবর্তনশীল হইলেই লেনদেনের উদ্বৃত্তের অবস্থার উন্নতিসাধন করা সম্ভব।... আরও বিশদ আলোচনার জন্য 'মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা' সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ।

* 'মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা' সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ।

ভারত মুদ্রামানহ্রাস না করিলে তাহার প্রতিযোগিতার শক্তি হ্রাস পাইত, কারণ যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করিয়াছিল তাহাদের রপ্তানি দ্রব্যাদির তুলনায় ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া দাঁড়াইত। ফলে বিদেশী বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদা কমিয়া যাইত। বলা হয় যে, এই পরিস্থিতিতে ভারতকে আত্মরক্ষার জন্যই মুদ্রামানহ্রাস করিতে হয়।

এখন দেখা যাউক বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল কি দাঁড়ায়:

(১) রপ্তানির উপর প্রভাব: মুদ্রামানহ্রাসের ফলে ডলার ও দুষ্প্রাপ্য (hard) মুদ্রাঞ্চলে ভারতীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস পায়। তুলাবস্ত্র, তৈল, অভ্র, চর্ম প্রভৃতি দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ষ্টার্লিং অঞ্চলেও রপ্তানি বৃদ্ধি হয় কারণ যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করে না তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের সুবিধা হয়। যেমন জাপান মুদ্রামানহ্রাস না করায়, ষ্টার্লিং অঞ্চলে তুলাবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। তবে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মুদ্রামানহ্রাস নয়। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে সমরায়োজন ও দ্রব্যসঞ্চয়ের হিড়িকে ভারতীয় রপ্তানি অনেকটা সম্প্রসারিত হয়। ইহা ছাড়া ভারত সরকার রপ্তানি প্রসারের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করিতে থাকে।

ফলাফল: রপ্তানি বৃদ্ধি

(২) আমদানির উপর প্রভাব: ডলার অঞ্চল ও অন্যান্য যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করে না তাহাদের নিকট হইতে আমদানির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ঐ অঞ্চলগুলি হইতে খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় মূলধন-দ্রব্যের ক্রয় ভারতের পক্ষে অধিক ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। ভারতের আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। এমনকি যে-সমস্ত দেশ মুদ্রামানহ্রাস করে তাহাদের নিকট হইতেও আমদানি ব্যয়সাধ্য হয়; কারণ ডলার ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অঞ্চলে ঐ সমস্ত দেশের জিনিসপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ভারতের আমদানিহ্রাসের একমাত্র কারণ মুদ্রামানহ্রাস নয়। ভারত সরকার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে। দেশের মধ্যে খাদ্য, পাট ও তুলা উৎপাদনের বৃদ্ধির দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

ডলার অঞ্চল হইতে আমদানি হ্রাস

(৩) বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের উপর প্রভাব: রপ্তানিবৃদ্ধি ও আমদানিহ্রাসের ফলে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে কিছু সময়ের জন্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১৮৫ কোটি টাকা। ১৯৪৯-৫০ সাল ও ১৯৫০-৫১ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪২ কোটি টাকা ও ২২ কোটি টাকায়। কিন্তু পরের বৎসর এই উন্নতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫১-৫২ সালে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২১০ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে উন্নতি

(৪) বাণিজ্য-সর্তের উপর প্রভাব : বাণিজ্য-সর্তেও উন্নতি দেখা যায়। মুদ্রামানহ্রাসের পর হইতে উহা ভারতের পক্ষে অনুকূল হইতে থাকে। তবে এই উন্নতির মূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের সমর প্রস্তুতির প্রভাবও বর্তমান ছিল।

বাণিজ্য-সর্তের অনুকূল অবস্থা

(৫) পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্যের উপর প্রভাব : পাকিস্তান প্রথমে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার মুদ্রার মান হ্রাস করে নাই। ফলে পাকিস্তানের ১০০ টাকার বিনিময়-মূল্যের হার দাঁড়ায় ভারতীয় ১৪৪ টাকা। এই বিনিময় হারে হিসাব করিলে পাকিস্তান হইতে আমদানি দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই উচ্চমূল্যে কাঁচা পাট, চর্ম, তুলা প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। একদিকে পাকিস্তান এই নূতন বিনিময় কার্যকর করিতে মনস্থ করে, অপরদিকে ভারত সরকার এই বিনিময় হার মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। ইহাতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে দেখা দেয় অচলাবস্থা। পাট, চর্মশোধন প্রভৃতি শিল্পগুলি কাঁচামালের অভাবে সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়। পাট-শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিও হ্রাস পায়। অপরপক্ষে পাকিস্তানও কয়লা ও তুলা-শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবে অসুবিধায় পড়ে। পরে ১৯৫১ সালের পাক-ভারত চুক্তির পর অবস্থার কতকটা উন্নতি হয়।

পাক-ভারত বাণিজ্যে অচলাবস্থা

ভারতের বাণিজ্যনীতি (India's Trade Policy) : দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী শাসকের সাম্রাজ্যিক স্বার্থেই পরিচালিত হইত। প্রধানত 'হোম চার্জে'র পাওনা মিটাইবার প্রয়োজনে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল রাখিবার চেষ্টা করা হইত।

যুদ্ধপূর্ব যুগে বাণিজ্য-নীতি

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় বাণিজ্যনীতিকে যুদ্ধোপযোগী করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়—কারণ, ভারত মিত্রশক্তির যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের উপর কড়াকড়িভাবে বাধানিষেধ বসান হয়; শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়; এমনকি নিরপেক্ষ ও মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির সহিত বাণিজ্য নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। যাহা হউক, যুদ্ধের সময় আমদানি হ্রাস পাইয়া রপ্তানি বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়; এবং ভারতের হিসাবে মোটা অংকের ষ্টার্লিং জমা হয়।*

দ্বিতীয় যুদ্ধ ও বাণিজ্যনীতি

স্বাধীন ভারতে বাণিজ্যনীতি (Trade Policy in Independent India) : যুদ্ধাবসান ও দেশবিভাগের পরে ভারত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, মূলধন-দ্রব্যের অভাব প্রভৃতির জন্য অধিক আমদানি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং বাণিজ্যনীতি তদনুযায়ী পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন হয়।

আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যনীতিকে পরিচালিত করা হয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া : (১) ভারতের বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় (foreign exchange

* ৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

resources) হ্রাস পাইতে থাকে এবং বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকে। সুতরাং সরকার যতটা সম্ভব আমদানিকে সীমাবদ্ধ করিয়া লেনদেনের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। (২) অপরদিকে আবার মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় ভারতকে বাধ্য হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির ব্যবস্থা করিতে হয়। (২) সরকারকে শিল্পপ্রসার ও কৃষি উন্নয়নের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানি একপ্রকার অপরিহার্য হইয়া পড়ে। (৪) অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও যতটা সম্ভব বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং তদনুযায়ী আমদানি নীতিকে পরিচালিত করা হয়। তবে সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমদানির উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

(ক) আমদানি নীতি

ভারতের আমদানি নীতি নিয়ন্ত্রণকারী উপরি-উক্ত বিষয়গুলি কতকটা পরস্পর-বিরোধী এবং বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল। ফলে আমদানি নীতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন সময় বা বাধা-নিষেধের কড়াকড়ি করা হইয়াছে আবার কোন সময় কড়াকড়ি শিথিল করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৭ সালে যখন স্থির হইল যে, ইংল্যাণ্ডে জমা ষ্টার্লিং হইতে মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের চলতি ঘাটতি মিটাইবার জন্য পাওয়া যাইবে তখন প্রয়োজন হইল আমদানি নিয়ন্ত্রিত করিবার ; অপরদিকে আবার যখন ১৯৪৮ সালে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সংকটে পরিণত হইল, প্রয়োজন দেখা দিল আমদানিবৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করিবার। কিন্তু আমদানি প্রসারনীতির ফলে আমদানি এতটা বৃদ্ধি পাইল যে দেখা গেল, তাহার মূল্য দেওয়ার মত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংগতি নাই। ফলে ১৯৪৯ সালে আবার আমদানি নীতির কড়াকড়ি করা হইল।

নিয়ত পরিবর্তনশীল আমদানি নীতি

১৯৫০ সালে আমদানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটি প্রথমেই অভিমত প্রকাশ করে যে আমদানি সম্পর্কে সরকারী নীতির স্থিরতা বা নিশ্চয়তা ভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে শৃংখলা আনয়ন করা সম্ভব নহে। আমদানি নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া কমিটি বলে : (১) যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (foreign exchange) পাওয়া যাইবে আমদানি তাহাতেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে, এবং (২) কৃষি ও শিল্পপ্রসার, অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাপূরণ এবং নির্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য যে-সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে বিদেশী মুদ্রা যথাযথভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কমিটির অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে লাইসেন্স প্রদান, পদ্ধতির বিকেন্দ্রিকরণ, আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নূতন ব্যবসায়ীকে সুবিধা-সুযোগ প্রদান, মুদ্রাঞ্চল অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরকার এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তাহাদের কার্যকর করার ব্যবস্থা করে। বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের পরিমাণ এবং

১৯৫০ সালে আমদানি অনুসন্ধান কমিটি

আমদানি সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ

প্রয়োজনীয় শিল্প ও ভোগ্যদ্রব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকার অধিক পরিমাণে আমদানি করিবার নীতি গ্রহণ করে।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে আমদানি নীতি

ফলে ১৯৫১ সাল হইতে আমদানির উপর বাধানিষেধ শিথিল করা এবং অবাধ লাইসেন্সের পরিধি বিস্তৃততর করা হয়। মোটামুটিভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত এই শিথিল আমদানি নীতিই প্রবর্তিত ছিল যদিও বা ১৯৫৪ সালে আমদানি-শুল্কের মাধ্যমে কিছুটা আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আমদানি নীতি

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একরূপ সুরু হইতেই, এবং বিশেষ করিয়া ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকায় আমদানি নীতিতে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বনের আবার প্রয়োজন হয়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্য আমদানি বহুল পরিমাণে হ্রাস করা হয়; এমনকি বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্য আমদানিতেও বিশেষ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস হইতে 'বিলম্বে পাওনা মিটানর ব্যবস্থা'র (deferred payment arrangements) ভিত্তিতে মূলধন-দ্রব্যাদি আমদানি করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। ইহা সত্ত্বেও ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় ক্রমাগতই হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে ১৯৫৭-৫৮ সালে সরকারকে আমদানি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন দ্রব্যের আমদানি যথাসম্ভব নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করিতে দেওয়া হয়। নূতন শিল্পের জন্য মূলধন আমদানি মাত্র বিলম্বে পাওনা মিটানর ব্যবস্থার ভিত্তিতি করিতে দেওয়া হয়; এবং সংগে সংগে বিচার করিয়া দেখা হয় যে ঐ শিল্পের সাহায্যে ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা আছে কিনা।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে আমদানি নীতি পূর্ববৎ নিয়ন্ত্রিত থাকিলেও রপ্তানি প্রসারের স্বার্থে কতিপয় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানি ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। বৎসরের শেষের দিকে মূলধন-দ্রব্য আমদানির দিকেও অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

আমদানি উপদেষ্টা পরিষদ

বর্তমানে আমদানি সম্পর্কে সরকারী নীতি আমদানি উপদেষ্টা পরিষদ (Import Advisory Council) এবং বিভিন্ন স্বার্থসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হয়।

(খ) রপ্তানি নীতি

ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই যে, রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা রপ্তানি প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। রপ্তানি প্রসার ব্যতিরেকে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নাই। ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যের প্রধান দুর্বলতা হইল চা, পাটজাত দ্রব্য এবং তুলাজাত দ্রব্য—এই কয়টি পণ্যের উপর সবিশেষ নির্ভরশীলতা। এই দুর্বলতা দূর করিয়াই রপ্তানি প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতীয়

* Report on Currency and Finance, 1957-58 এবং India—1958.

ব্যবসায়িগণ এতদিন যে ইহা করিতে পারে নাই তাহার দুইটি প্রধান কারণ ছিল : (ক) ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য অসংগঠিত অবস্থায় ছিল; (খ) সরকারের রপ্তানি নীতিও অনির্দিষ্ট ছিল।

রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব প্রদান

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যাভাব থাকায় কতকগুলি দ্রব্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহার সাহায্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়। ক্রমশ রপ্তানির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ কতকটা শিথিল করা হয়, এবং অধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সরকার রপ্তানি প্রসারের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৪৯ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি (Gorwalla Export Promotion Committee) নিয়োগ করে। কমিটি যে-সকল সুপারিশ করে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান: (১) ভারতীয় শিল্পপতিগণকে আভ্যন্তরীণ বাজার লইয়া পড়িয়া থাকিলেই চলিবে না; বৈদেশিক বাজারের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কেও সচেতন হইতে হইবে। (২) ভারতীয় দ্রব্যাদির উৎকর্ষতার উন্নতি করিতে হইবে। যাহাতে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভেজাল দ্রব্য সরবরাহ প্রভৃতি অসাধু উপায় অবলম্বিত না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (৩) ভারতীয় দ্রব্যাদি যাহাতে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে তাহার জন্য ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য অধিক না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।

গোরওয়ালা কমিটি

ব্যাখ্যা করিয়া রপ্তানি প্রসার কমিটি বলে যে, রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী বাধানিষেধ যতদূর সম্ভব অপসারিত করিতে হইবে। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রপ্তানি-শুল্ককে সরকারী আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হিসাবে গণ্য করা সমীচীন নয়; দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই উহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে। অতীতে মালমজুত ও ফটকা কারবারের জন্যও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে। ইহার প্রতিকারবিধান করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক মতবিরোধের জন্য কোন দেশে রপ্তানিকে বাধা দেওয়া অনুচিত। অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনকে ব্যাহত করা কাম্য নয়।

গোরওয়ালা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার রপ্তানি প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালের পূর্বে রপ্তানি প্রসারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হয় নাই। ইতিপূর্বে ১৯৫০-৫১ সালে মুদ্রামানহ্রাস ও অন্যান্য কারণে রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাইলে সরকার নানাভাবে নিয়ন্ত্রণেরই ব্যবস্থা করে। বলা হয় যে, দেশের অভ্যন্তরে কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতার আশংকা দেখা দেওয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। যাহা হউক, ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে বিশেষভাবে রপ্তানি প্রসারের প্রচেষ্টা করা হয়। অনেক দ্রব্যের উপর হইতে রপ্তানি-শুল্ক উঠাইয়া লওয়া হয়, অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হয়, বহুক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয় এবং

লাইসেন্স-প্রদান পদ্ধতিকে সহজ ও সরল করা হয়। ইহা ব্যতীত রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য যে-সমস্ত কাঁচামাল আমদানি করা হয় তাহাদের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্কে রেয়াৎ (rebates) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় হইতে রপ্তানি প্রসারের নীতি অব্যাহতই আছে ; বরং বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ে বিশেষ মন্দা হওয়ায় ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা আরও তীব্রতর করা হইয়াছে। কিভাবে ইহা করা হইয়াছে নিম্নে তাহা বর্ণনা করা হইল।

১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে রপ্তানি প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সামগ্রিকভাবে রপ্তানি প্রসারের প্রশ্নকে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য দ্বিতীয় রপ্তানি প্রসার কমিটি (Export Promotion Committee) নিয়োগ করা হয়। ঐ সালের আগষ্ট মাসে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশ হইল নিম্নলিখিতরূপ : (১) সকল দিকে উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া কৃষিজ-উৎপাদনকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে ; (২) আভ্যন্তরীণ ভোগ বা ব্যবহারকে কতকটা সীমাবদ্ধ করিয়াও রপ্তানি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে ; (৩) ভারতের চিরন্তন রপ্তানি দ্রব্যগুলির জন্য নূতন নূতন বাজারের অনুসন্ধান করিতে হইবে ; ইহা ব্যতীত নূতন দ্রব্যাদির জন্যও বিভিন্ন বিদেশী বাজার সন্ধান করিতে হইবে ; (৪) রপ্তানি দ্রব্যের নূতন ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চালাইতে হইবে এবং তদনুযায়ী আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করিতে হইবে ; (৫) যাহাতে ভারতীয় টাকায় অন্য দেশের পাওনার একাংশ পরিশোধ করা যায় এমনভাবে বাণিজ্য-চুক্তির চেষ্টা করিতে হইবে ; (৬) দ্রব্যমূল্যকে প্রতিযোগিতার স্তরে রাখিতে হইবে।

রপ্তানি প্রসার কমিটি

কমিটি কৃষিজ-উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে—কারণ প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলি হয় কৃষিজাত আর না-হয় কৃষির উপর ভিত্তিশীল। ইহা ব্যতীত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খাদ্যশস্যের আমদানি হ্রাস না করিতে পারিলে বহির্বাণিজ্যে স্থায়িত্ব আসিবে না। রপ্তানি প্রসারের আর একটি সমস্যা হইল রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় ও উৎকর্ষ। অনেক দ্রব্যের নির্দিষ্ট মান নাই। রপ্তানিকারী দ্রব্যের মান নির্দিষ্ট করিয়া না চলিলে বিদেশে দ্রব্য বিক্রয় বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে উৎপাদন-ব্যয়কেও যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। উৎপাদন-ব্যয় সম্পর্কে দুইটি প্রধান প্রশ্ন হইল—(ক) শিল্পের উৎপাদনশীলতা, এবং (খ) করধার্যকরণ। উৎপাদন ব্যাপারে রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং শ্রমিকের উৎপাদনের হারও বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। কর-স্থাপন বিষয়ে কমিটির মত হইল যে, রপ্তানি দ্রব্যকে উৎপাদন শুল্ক ও বিক্রয়কর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে এবং রপ্তানি-শুল্কের হার হ্রাস করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রপ্তানি প্রসারে উৎসাহিত করিবার জন্য আয়-কর ব্যাপারে রপ্তানিকারীকে সুবিধা-সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে, কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, বিদেশে আমাদের

দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত প্রচার হয় নাই। সুতরাং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রপ্তানি প্রসারকল্পে অবলম্বিত সাম্প্রতিক ব্যবস্থাসমূহ ঃ রপ্তানি প্রসারের জন্য সরকার উপরি-উক্ত রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস বা বর্জন, রপ্তানির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উত্তোলন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। বিভিন্ন দ্রব্যের রপ্তানি প্রসারের জন্য রপ্তানি প্রসার পরিষদ (Export Promotion Councils) গঠন করা হইয়াছে। যেমন, তুলাবস্ত্র, রেশম ও রেয়ন বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, তামাক, মরিচ, অভ্র, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য, খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি পণ্যের জন্য রপ্তানি প্রসার পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত পরিষদ বৈদেশিক বাজারে ভারতের দ্রব্যাদি বিক্রয় প্রসারের চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে পরিষদগুলি বিভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করিতেছে। বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাদির সমন্বয় করিবার জন্য একটি বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড (Foreign Trade Board) এবং রপ্তানি প্রসারের নীতির সমন্বয়সাধনের জন্য একটি রপ্তান প্রসার দপ্তরও (Directorate of Export Promotion) সরকার গঠন করিয়াছে।

রপ্তানি প্রসার পরিষদ

ইহা ব্যতীত সরকার ভারতের জন্য রপ্তানি-বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পনা (Export Credit Guarantee Scheme) প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। কমিটি অনতিবিলম্বে রপ্তানি-বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন (Export Risks Insurance Corporation) প্রতিষ্ঠা করিবার সুপারিশ করে। সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে করপোরেশনটি স্থাপিত হয়। করপোরেশনের সদর দপ্তর বোম্বাই-এ এবং শাখা কার্যালয় কলিকাতা ও মাদ্রাজে অবস্থিত। করপোরেশনের কার্য হইল ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে তাঁহাদের রপ্তানি সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান ও রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য অর্থ-সাহায্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। করপোরেশন বিদেশীয় ক্রেতাদেরও ভারতীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করে। করপোরেশন বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় প্রকার ঝুঁকিই বহন করে। করপোরেশনের নিকট বীমাবদ্ধ রপ্তানিকারিগণ (insured exporters) ব্যাংক হইতে ঋণ লইলেও ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে করপোরেশন ঐ ঋণেরও গ্যারান্টি প্রদান করিতেছে। এই রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন সম্বন্ধে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা পরিকল্পনা

১৯৫৬ সালের মে মাসে একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন [The State Trading Corporation (Private) Ltd.] প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল নির্দিষ্ট দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি সংগঠনের ব্যবস্থা করা। ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানি বাণিজ্যের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন

রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের অন্যান্য পন্থার মধ্যে বিল বাজার পরিকল্পনায় রপ্তানি বিলের অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতের অংশগ্রহণ, ১৯৫৮ সালের প্রদর্শনীর (India 1958 Exhibition) ন্যায় জাতীয় প্রদর্শনী সংগঠন, প্রচারকার্য, বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল (Trade Missions) প্রেরণ, বিদেশে বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যকলাপের সংহতিসাধন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রপ্তানি প্রসারের অন্যান্য প্রচেষ্টা

উপসংহার: দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই রপ্তানি প্রসারের তীব্রতর প্রচেষ্টা করিয়া আসা হইতেছে সত্য; কিন্তু পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরেও—অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালেও আশামত রপ্তানি প্রসার করা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার কারণও আছে। প্রথমত, আমাদের রপ্তানির প্রধান দ্রব্যগুলি—যথা, চা, পাট, তুলাবস্ত্র, তৈলবীজ প্রভৃতি ক্রমশ অন্যান্য দেশের তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির আশংকায় আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ না করিয়া রপ্তানির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বিবেচিত হয় নাই। মাত্র ১৯৫৮-৫৯ সালেই এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে; প্রায় ২০০ রপ্তানি পণ্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হইয়াছে এবং কয়েকক্ষেত্রে রপ্তানি-কোটাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে বাণিজ্য-মন্দার (trade recession) ফলে ভারত হইতে উহাদের কাঁচামাল ও অর্ধোৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদাও কমিয়া গিয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে বাণিজ্য-মন্দার যুগ শেষ হইলেও ইহার প্রভাব বর্তমান থাকে। যাহা হউক, রপ্তানি প্রসারের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের ফল ১৯৫৯-৬০ সালে ফলিবে আশা করা যায়।*

রপ্তানি ঝুঁকি বীমা (Export Risks Insurance): পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের অন্যতম পন্থা হইলে বাণিজ্য-ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা। রপ্তানি বাণিজ্যে নানাপ্রকারের ঝুঁকি থাকে। সুতরাং রপ্তানিকারীর ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে এককভাবে ক্ষতির ঝুঁকি লইয়া কার্য করিতে হয় বলিয়া রপ্তানিকারী অনন্যমনে রপ্তানি প্রসারের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক যে সম্প্রসারিত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। একাধিক দেশে এই বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হইয়াছে।

বীমার উদ্দেশ্য

ভারত সরকারও এই ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রপ্তানি ঝুঁকি বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছে। বীমা পরিকল্পনা রচনার জন্য ভারত সরকার পূর্বোল্লিখিত রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটি (Export Credit Guarantee Committee) নিয়োগ করে। কমিটি তাহার রিপোর্টে বলে: রপ্তানি বীমা-ব্যবস্থা রপ্তানি সম্প্রসারিত করিতে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা যায়। ক্ষুদ্র ও মধ্যাকারের

রপ্তানি ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ

* Report on Currency and Finance for the Year 1958-59.

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমশ অংশগ্রহণ করিতেছে ; তাহাদের জন্য রপ্তানি বীমার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা ছাড়া বীমা প্রবর্তিত হইলে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিকল্পনার জন্য অর্থ সহজলভ্য হইবে এবং রপ্তানিকারীও নূতন নূতন বিক্রয় বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অপরাপর দেশে রপ্তানি বীমার সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতীয় রপ্তানিকারীকে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হইলে প্রতিযোগিতায় তাহার অসুবিধা হইবে। বীমা-ব্যবস্থার এই সমস্ত সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া কমিটি অনতিবিলম্বে ভারতে রপ্তানি ক্রেডিট বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তনের এবং ইহার পরিচালনা একটি করপোরেশনের উপর ন্যস্ত করিবার সুপারিশ করে।

কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে 'রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন' (Export Risks Insurance Corporation) গঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত। ইহার দায়িত্ব ৭ জন ডিরেক্টর লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। উহার অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা এবং বিলিকৃত মূলধন ২.৫ কোটি টাকা।

রপ্তানি বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন

করপোরেশনকে পরামর্শদানের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council) আছে। রপ্তানি-ব্যবসায়ী, রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থপ্রদানকারী ব্যাংক, রপ্তানি প্রসার পরিষদগুলি (Export Promotion Councils) এবং পণ্য বোর্ডের (Commodity Boards) ২১ জন প্রতিনিধি লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

গঠন

করপোরেশন বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উভয় প্রকারের ঝুঁকিই (Commercial and Political Risks) গ্রহণ করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত :

কার্যাবলী :

বাণিজ্যিক ঝুঁকি : (১) ক্রেতা দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে (insolvency risks); (২) ক্রেতা ঋণের সর্তে জিনিস লইয়া নির্দিষ্ট তারিখে দাম পরিশোধ করিতে অস্বীকার বা অসমর্থ হইতে পারে (default risk)।

১। বাণিজ্যিক ঝুঁকি

রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকি : (১) রপ্তানিকারী ও আমদানিকারী প্রভৃতি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার ফলে অথবা আমদানিকারীর দেশে যুদ্ধ, গৃহবিবাদ বিদ্রোহ বিশৃংখলার ফলে রপ্তানিকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে (war and civil war risk); (২) রপ্তানিকারীর দেশের সীমানার বাহিরে মালবাহী জাহাজের গতি বাধাপ্রাপ্ত বা পরিবর্তিত হওয়ার ফলে মালপ্রেরণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে (diversion risk); (৩) ক্রেতার আমদানি বা মুদ্রা বিনিময় লাইসেন্স বাতিল বা উহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইতে পারে (import control risk); (৪) কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান ক্রয়চুক্তি সম্পাদন করিয়া পরে উহাকে বাতিল করিতে পারে বা জিনিস গ্রহণে অস্বীকার করিতে পারে ; অথবা

২। রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকি

কোন ক্রেতা ক্রয়চুক্তি অস্বীকার করিতে পারে বা দেউলিয়া বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে (repudiation risk); (৫) আইনকানুন প্রবর্তনের ফলে ক্রেতার দেশ হইতে বিক্রেতার দেশে প্রাপ্য অর্থপ্রেরণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে (transfer risk); (৬) বিদেশে ডক শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘট দেখা দিতে পারে, মাল ছাড়ানর ব্যাপারে বিলম্ব হইতে পারে এবং বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।

৩। অন্যান্য প্রকারের ঝুঁকি

করপোরেশন উপরি-উক্ত ধরনের ঝুঁকি ব্যতীত রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিও (export control risk) গ্রহণ করে। অর্থাৎ যদি ভারতীয় রপ্তানিকারীর রপ্তানি-লাইসেন্স বাতিল বা পুনঃপ্রদান বন্ধ হয় অথবা উহার উপর নূতন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় তবে তাহার ঝুঁকিও করপোরেশন লইতে পারে। আবার বিশেষ অবস্থায় বিদেশী বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান, প্রচারকার্য পরিচালনা ও অন্যান্য ধরনের রপ্তানি প্রসার কার্যের জন্য অর্থব্যয় সম্পর্কেও করপোরেশনকে ঝুঁকি লইতে হয়। অবশ্য মুদ্রামানহ্রাস, মুদ্রাবিনিময় হারের পরিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কিত ঝুঁকির দায়িত্ব করপোরেশন বহন করে না।

করপোরেশনের ঝুঁকির পরিমাণ

রপ্তানি ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ মত বাণিজ্যিক ঝুঁকির শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত এবং রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকির শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত করপোরেশন বহন করে, আর বাকী দায়িত্ব রপ্তানিকারীকেই লইতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত রপ্তানিকারীকে সাধারণত তাহার সকল রপ্তানি দ্রব্যকে বীমার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমানে বীমা-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক রাখা হইয়াছে; পরে উহাকে বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। করপোরেশন মুনাফাকারী প্রতিষ্ঠান নহে; এবং বীমার হারকে যতদূর সম্ভব স্বল্প রাখা হইয়াছে।

বীমা-ব্যবস্থা স্বেচ্ছামূলক

বীমা-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক করার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উহাকে বাধ্যতামূলক করাই সমীচীন ছিল—কারণ বীমাকারী রপ্তানিকারকের সংখ্যা অধিক না হইলে করপোরেশনের সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে না। বাণিজ্যিক ঝুঁকিকে যত বেশী ছড়াইয়া দেওয়া হইবে করপোরেশনের ভিত্তিও তত বেশী সুদৃঢ় হইবে। তাহা ছাড়া বীমাকারীর সংখ্যা অধিক না হইলে প্রিমিয়ামের হার কম করা সম্ভব হইবে না। আবার বীমার প্রিমিয়ামের হার স্বল্প না হইলে করপোরেশন ব্যবসায়ীদের নিকট লাভজনক হইবে না। সুতরাং করপোরেশনকে স্বেচ্ছামূলক রাখা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই করপোরেশনকে আপাতত স্বেচ্ছামূলক রাখিবার সুপারিশ করিয়াছে।

বীমা-ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছামূলক রাখিবার বিরুদ্ধে যুক্তি

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাণিজ্য ঝুঁকি বীমা করপোরেশন উল্লেখযোগ্যভাবে কার্য সুরু করে ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে। ঐ সালেই করপোরেশন কলিকাতা ও মাদ্রাজে শাখা কার্যালয় খুলিয়া মোট ১৭৬টি পলিসির বিরুদ্ধে প্রায়

৭ কোটি টাকার ঝুঁকি গ্রহণ করে।* প্রয়োজনীয়তার তুলনায় ইহা অবশ্য সামান্যই।

কার্যসম্পাদন

তাই রপ্তানি ঝুঁকি বীমাকে আরও জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলি যদি বীমাবদ্ধ রপ্তানিকারীদের ঋণ প্রদান করে তাহার গ্যারান্টি দিবার ঝুঁকি করপোরেশন গ্রহণ করিয়াছে।†

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading): বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। গত যুদ্ধের পূর্বে একমাত্র জার্মেনী ও সোবিয়েত ইউনিয়নেই ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ব্যবস্থা ছিল।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ

যুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে একদিকে যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত করা হয় অপরদিকে তেমনি দ্রব্যাদির বণ্টন ব্যাপারেও রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। যুদ্ধোত্তর যুগে বহু দেশেই রাষ্ট্র সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন, নয়া চীন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংগ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বার্থানুযায়ী বাণিজ্যকে পরিচালিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও রাষ্ট্র অল্পবিস্তর অপরাপর দেশের সহিত সরাসরি বাণিজ্য পরিচালনা করিতে সুরু করিয়াছে।

একাধিক কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্র বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইতেছে। প্রথমত, জরুরী অবস্থা, যেমন খাদ্যাভাব, দেখা দিলে রাষ্ট্র অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্যান্য দেশের সহিত সরাসরি বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে

বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের কারণ

একচেটিয়া ব্যবসা ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবারের স্থানে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসা অধিক কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তৃতীয়ত, সম্প্রতি বিভিন্ন দেশ অধিক মাত্রায় দ্বি-দলীয় চুক্তি সম্পাদিত করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছে। চুক্তির সর্তাদি কার্যকর করিবার জন্য বাণিজ্যে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। চতুর্থত, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিকে কার্যকর করিবার জন্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রয়োজন হইতে পারে। পঞ্চমত, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মূনাফার লোভ, অসাধু উপায় অবলম্বন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ অন্যান্য দেশে নূতন নূতন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের প্রসার-সাধনে অপারগ বা অনিচ্ছুক হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইতে হয়। মোটকথা বহির্বাণিজ্যের প্রসার এবং সরকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতিকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র সরাসরিভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

---

* Report on Currency and Finance for the Year 1958-59.

† ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ভারত সরকার গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটির সভাপতিত্ব করেন ডাঃ পি. আর. দেশমুখ। কমিটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতিকে অনুমোদন করে এবং খাদ্য, কয়লা, ইস্পাত, তুলা, সার ও তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতির বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কমিটির মতে, করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) হইবে ১০ কোটি টাকা আর প্রাথমিক মূলধন (Initial Capital) হইবে ২ কোটি টাকা। অন্যান্য কার্যের মধ্যে করপোরেশন সরকারকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্পর্কে পরামর্শ দিবে, এবং প্রয়োজন হইলে বিদেশী সরকারের পক্ষে ভারতীয় বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় করিবে। বিক্রয় বাজার সম্প্রসারণের জন্য কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানির দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

১৯৪৯ সালের অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ

ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

এই বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালের মে মাসে সরকারী উদ্যোগে ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন [The State Trading Corporation of India (Private) Ltd.] একটি ঘরোয়া যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংগঠিত হয়। করপোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে ৫ লক্ষ টাকার মূলধন বিলি করা হইয়াছে। ইহার সমগ্রটাই ভারত সরকার যোগান দিয়াছে। করপোরেশনের পরিচালনার ভার একটি বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। বোর্ডের সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ইঁহারা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের গঠন

করপোরেশনের স্মারকলিপিতে (Memorandum of Association) করপোরেশনের উদ্দেশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। করপোরেশন যে-সকল দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি সংগঠিত করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে তাহাদের আমদানি-রপ্তানি সংগঠিত করিবে, ভারতে কিংবা অন্যান্য দেশে ঐ সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় ও গমনাগমন এবং ব্যবসায় পরিচালনা সংগঠিত করিবে। উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে-সকল আনুষংগিক পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইবে তাহাও করপোরেশন করিতে পারিবে।

করপোরেশনের উদ্দেশ্য

বর্তমানে স্থির হইয়াছে যে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য সিমেণ্ট, কষ্টিক সোডা, (caustic soda), সোডা এ্যাস (soda ash) প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আমদানির ভার করপোরেশন গ্রহণ করিবে এবং লৌহ-মাক্ষিক, ম্যাংগানিজ-

মাক্ষিক ও অন্যান্য আকর জাতীয় দ্রব্যাদি অন্য দেশে রপ্তানি করিবে। ইহা ব্যতীত কম্যুনিষ্ট দেশগুলিতে উদ্ভিজ্জ তৈল রপ্তানি করিবে।

করপোরেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসংগে শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছিলেন: প্রধানত রপ্তানি বাণিজ্য ও উহার সংগে আমদানি বাণিজ্যের প্রসারসাধনের নিমিত্তই এই করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি করপোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমত, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রসার পাইতেছে। এই সমস্ত দেশে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত সুতরাং ঐ সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহিত সম্যকভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করিতে হইলে ভারতেও অনুরূপ রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রবর্তিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদির আমদানির জন্য একচেটিয়া ব্যবস্থাই অধিক কাম্য বলিয়া মনে হয়; ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ সকল সময় ন্যায্য মূল্যে এই সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-প্রবর্তনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; যাহাতে ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবার গড়িয়া না উঠে, যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয় তাহার জন্য রাষ্ট্রকে অধিকমাত্রায় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে।* পরিশেষে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হইবে। এ-বিষয়েও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কিছুটা সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।**

ভারতে করপোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনাও করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ এই সমালোচনা করিয়াছে। প্রথমত বলা হয়, বাণিজ্য-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং ব্যর্থতার সম্ভাবনা অধিক। দ্বিতীয়ত, সরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎসাহ, উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপরি-উক্ত দুইটি ত্রুটির জন্য দ্রব্যমূল্য অধিক হইবে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর অকাম্যভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে। চতুর্থত, করপোরেশনের উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। এই অনির্দিষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া করপোরেশন বাণিজ্য পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থাদির পরিবর্তন করিলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা অধিক—কারণ ব্যবসায়িগণের মতে, প্রচলিত ব্যক্তিগত বাণিজ্য-ব্যবস্থাই বহির্বাণিজ্য পরিচালনার পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা

উপসংহারে বলা যায় যে, বর্তমান জগতে রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল দায়িত্ব নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়াছে তখন তাহাকে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনবোধে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সর্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে হইবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে

উপসংহার

* Industrial Policy Resolution—1956.

** Second Five Year Plan-এর ৯১ পৃষ্ঠা।

এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে তাহা অপসারণের জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন কার্যের মধ্য দিয়া অবিলম্বেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করিতে সমর্থ হইবে।

কার্যসম্পাদন

প্রতিষ্ঠার পর হইতেই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার করিয়া উহাদিগের নিকট হইতে ইস্পাত, সিমেন্ট ও শিল্প-যন্ত্রপাতি আমদানির প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে আমাদের ষ্টার্লিং সঞ্চয়ের উপর যতটা ভার পড়িত ততটা পড়ে নাই। করপোরেশন যুক্তিসংগত মূল্যে সিমেণ্ট, সোডা এ্যাস, কষ্টিক সোডা, কাঁচা সিল্ক, রাসায়নিক সার, জিপসাম, গুঁড়া দুধ, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রভৃতি ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের মধ্যে যোগানে যেন ঘাটতি না পড়ে এবং সর্বাধিক উৎপাদন যেন সম্ভব হয়—এই দুই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই সকল দ্রব্যের আমদানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। করপোরেশন কর্তৃক রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল খনিজ আকর (mineral ores), জুতা, হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চা, কফি, এবং পশমজাত দ্রব্য। ১৯৫৮-৫৯ সালে করপোরেশন রপ্তানি প্রসারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত করপোরেশন কর্তৃক মোট আমদানি-রপ্তানির মূল্য ছিল ১২৬ কোটি টাকা।

সিমেণ্টের ব্যবসায় বর্তমানে একরূপ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সাল হইতে লৌহ-মাক্ষিক (iron ore) রপ্তানির সম্পূর্ণ ভারও উহার উপর দেওয়া হইয়াছে। রপ্তানি প্রসার ও আমদানি সুসংগঠনের জন্য করপোরেশন কয়েকটি দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সংগঠনের (Foreign Trade Organisations) সহিত চুক্তিও সম্পাদন করিয়াছে।*

বহির্বাণিজ্য ছাড়াও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে। খাদ্য-সীমান্তই হইল এই ক্ষেত্র; অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যকে খাদ্য-সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবিধান হিসাবে গণ্য করা হইতেছে। এ-সম্পর্কে অবশ্য পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।**

ঐতিহাসিক পরিক্রমা: সাম্রাজ্যিক সুবিধা

বাণিজ্য-চুক্তি (Trade Agreements): উপনিবেশগুলিতে মাল রপ্তানি বিষয়ে ইংল্যাণ্ড বহুদিন হইতেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলির তুলনায় ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উপর অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক ধার্য করা হইত। এমনকি ডোমিনিয়নগুলি যখন স্বাধীনভাবে শুল্কনীতি নির্ধারণের অধিকার লাভ করে তখনও ইংল্যাণ্ডের পণ্যদ্রব্যকে অধিক সুবিধা প্রদান করা হইত। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের আমদানির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দেশগুলিকে অধিক সুযোগ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ, ইংল্যাণ্ড অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করিত।

* India—1959.

** খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত অধ্যায় দেখ।

ভারত সাম্রাজ্যিক সুবিধার নীতি প্রথম দিকে গ্রহণ করে নাই। কারণ, সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিয়া ভারতের যে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইত তাহা হইতেই ইংল্যাণ্ডের পাওনা মিটান সম্ভব হইত; এই অবস্থায় সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের নীতি গ্রহণ করা হইলে অন্যান্য দেশ কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আশংকা ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতের প্রশ্ন বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ফিসক্যাল কমিশন ঐ নীতি ভারতের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও সীমাবদ্ধভাবে উহা গ্রহণের সুপারিশ করে। ফলে ভারত ব্রিটেনের ইস্পাত ও বস্ত্রকে অধিক সুবিধা প্রদান করে এবং উহাদের উপর শুল্কের হার হ্রাস করা হয়।

ইহার পর বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের ফলে ইংল্যাণ্ডকে ১৯৩২ সালে অবাধ বাণিজ্যের নীতিকে পরিহার করিতে হয় এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত পক্ষপাতমূলক নীতির ভিত্তিতে বাণিজ্য প্রসারের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হয়। ইংল্যাণ্ড সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির দ্রব্যাদিকে শুল্ক ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা দিবার সিদ্ধান্ত করে। ১৯৩২ সালে অটোয়াতে (Ottawa) একটি সাম্রাজ্যিক অর্থনৈতিক সম্মেলন (Imperial Economic Conference) আহূত হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধাপ্রদান করিয়া চলিবে। ভারতের সংগে যুক্তরাজ্যের যে বাণিজ্য-চুক্তি হয় তাহাতে ভারত ও যুক্তরাজ্যের পক্ষে পরস্পরকে শুল্ক-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

অটোয়া চুক্তি

জাতীয়তাবাদীরা এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে, কিন্তু সরকার উহার গুণগান করিতে থাকে। সরকারী অভিমত ছিল যে, ভারত যে-সুবিধা প্রদান করিয়াছিল তাহার তুলনায় অধিক সুবিধা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের রপ্তানিই বিশেষ প্রসারলাভ করে। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, ভারতীয় রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে চা, তামাক ও পাট-শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানিই প্রসারিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রসার লাভজনক মনে হইলেও আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ স্বার্থই লাভবান হয়। চা ও অন্যান্য রোপণ-শিল্প এবং পাট-শিল্পের ক্ষেত্রে ইংরাজ মালিকদেরই সুবিধা হয়। চাউলের ক্ষেত্রে ব্রহ্মদেশ হইতে অধিক চাউল রপ্তানি হয়; এবং মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ইহা ব্যতীত ভারতের রপ্তানি দ্রব্য যুক্তরাজ্যের শিল্পগুলিকে সহায়তা করে। অপরদিকে যুক্তরাজ্য হইতে যে বহুসংখ্যক দ্রব্যাদি ভারতে আমদানি করা হয় তাহা ভারতীয় শিল্পস্বার্থকে ব্যাহত করে। আরও বলা হয় যে, সাম্রাজ্যিক সুবিধাদানের ফলে ভারত সরকারের নিজস্ব আয় হ্রাস পায়।

অটোয়া চুক্তির সমালোচনা

যাহা হউক, চুক্তির লাভালাভের পরিমাণ নিরূপণ করা কঠিন। কারণ অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেয়, বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক জাতীয়তা-

বাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং বহির্বাণিজ্যের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ করিতে থাকে। তবে বলা হয় যে, লাভ হউক বা না-হউক, তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে অটোয়া চুক্তির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কারণ, অন্যান্য দেশ কর্তৃক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতি অনুসৃত হওয়ায় ঐ সমস্ত দেশে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। এই অবস্থায় অটোয়া চুক্তি গ্রহণ না করা হইলে ভারতের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা ছিল।

অটোয়া চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে অভিমত

অটোয়া চুক্তির বিরুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া তীব্র সমালোচনার ফলে ১৯৩৯ সালে এক নূতন ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য চুক্তি (Indo-British Trade Agreement, 1939) সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে সাম্রাজ্যিক সুবিধাদানের মূল-নীতিকে অক্ষুণ্ণই রাখা হয়। তবে অটোয়া চুক্তির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। যুক্তরাজ্যের যে-সমস্ত দ্রব্যকে সুবিধাদান করা হইত তাহাদের সংখ্যা হ্রাস করা এবং প্রধানত যে-সমস্ত দ্রব্য ভারতে উৎপাদিত হয় না তাহাদের বেলাই সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পরিবর্তে ব্রিটিশ কতকগুলি ভারতীয় দ্রব্য বিনা শুল্কে বা সাম্রাজ্যের বহির্ভূত দেশের তুলনায় কম শুল্কে আমদানি করিতে স্বীকৃত হয়।

১৯৩৯ সালের ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য চুক্তি

এই চুক্তিও অটোয়া চুক্তির ন্যায় ভারতের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ভারতীয়রা উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। প্রথমত বলা হয় যে, যে-সমস্ত ভারতীয় দ্রব্যকে বিনা শুল্কে যুক্তরাজ্যে আমদানি করিবার ব্যবস্থা হয় তাহার সরবরাহে ভারত একচেটিয়া সুযোগ ভোগ করিত। শিল্পের অপরিহার্য কাঁচামাল হিসাবে ঐ সকল দ্রব্য যুক্তরাজ্যের শিল্প-সমূহকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। শিল্পস্বার্থের খাতিরে যুক্তরাজ্যের পক্ষে উহার উপর শুল্ক বসান বোধ হয় সম্ভব হইত না। অপরপক্ষে যুক্তরাজ্য হইতে যে-সমস্ত দ্রব্য ভারত আমদানির ব্যবস্থা করে তাহা শিল্পজাত দ্রব্য এবং উহা ভারতের শিল্পপ্রসারের প্রতিবন্ধকই ছিল। এ-ক্ষেত্রেও অন্যভাবে যুক্তরাজ্যের সুবিধা হয়—কারণ যুক্তরাজ্যের রপ্তানিকারীদের অন্যান্য দেশের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যিক সুবিধার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে রক্ষা পায়। দ্বিতীয়ত, যে-সমস্ত ভারতীয় দ্রব্যের উপর শুল্কহ্রাসের ব্যবস্থা করা হয় তাহাদের বেলায় অন্যান্য সাম্রাজ্যিক দেশগুলিও যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে সুবিধা ভোগ করে। ফলে ভারতকে সাম্রাজ্যিক দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়। তৃতীয়ত, ভারতীয় জাহাজ এবং ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিভেদমূলক আচরণ অপসারণের যে-দাবি করা হয় তাহা গৃহীত হয় নাই। চতুর্থত, কাঁচা তুলা ও তুলাবস্ত্র সম্পর্কে যে-চুক্তি হয় তাহাতে ভারতের প্রতি অবিচারই করা হইয়াছিল। যুক্তরাজ্য পূর্বের তুলনায় ভারত হইতে কম পরিমাণ কাঁচা তুলা আমদানি করিয়া ভারতে অধিক পরিমাণ তুলাবস্ত্র রপ্তানি করিবার সুযোগ লাভ করে।

ভারতে ব্রিটিশ চুক্তির সমালোচনা

১৯৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশনের মতে, উক্ত চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রদান করা কঠিন—কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর যুগে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় চুক্তিটি পূর্ণভাবে কার্যকর হইতে পারে নাই।

চুক্তির ফলাফল নির্ণয় করা কঠিন

স্বাধীনতালাভের পর স্বভাবতই সাম্রাজ্যিক সুবিধাদানের নীতিকে পরিহার করিবার দাবি উত্থাপিত হয়। উহার পরিবর্তে ভারতের অর্থ-নৈতিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত নূতনভাবে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করা হয়। ভারত সরকার প্রশ্নটি বিচার-বিবেচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করে যে, সাম্রাজ্যিক সুবিধার এখন আর ভারতের নিকট গুরুত্ব নাই এবং বর্তমান ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের অনুকূলেই কার্য করিতেছে।

বলা হয়, বর্তমানে সাম্রাজ্যিক সুবিধা গুরুত্বহীন

বস্তুত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতির দিকে নজর দিলে বুঝা যাইবে যে, ভারত আপন স্বার্থানুযায়ী বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে। কমনওয়েলথ-বহির্ভূত দেশগুলির সংগে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ক্রমশ প্রসারলাভ করিতেছে। ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ভিত্তি ক্রমশ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে।

অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের প্রসার

দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি (Bi-lateral Trade Agreements): বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা হইতেছে দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তির মাধ্যমে। দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তি অবশ্য নূতন কিছু ব্যাপার নয়। বিগত তৃতীয় দশকের মন্দাবাজারের সময় হইতেই এই দিকে গতি লক্ষ্য করা যায়। মন্দাবাজারের সময় বিভিন্ন দেশ বহির্বাণিজ্যের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করায় দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিয়া বাণিজ্য প্রসারের সপক্ষে আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ভারত ব্রিটেনের সহিত চুক্তি ছাড়াও জাপান ও ব্রহ্মদেশের সহিত এইরূপ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করে। স্বাধীনতার পর ভারত দ্বি-পক্ষীয় বাণিজ্য-চুক্তির দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক ঝুঁকিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ হইল ভারতেব প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। অনেক সময় ব্যক্তিগত ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সরকারকে চুক্তির মাধ্যমে নূতন নূতন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হয়। বর্তমানে ভারত ইহাই করিতেছে। ইহা ছাড়া শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সহিত ভারত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত চুক্তি স্বল্পমেয়াদী হইলেও মেয়াদ শেষে সাধারণত ইহাদের পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়।

যুদ্ধোত্তর যুগে দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের দিকে অধিক ঝোঁক ও ইহার কারণ

স্বাধীনতার পর যে-সমস্ত দেশের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতালী, রুমানীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইন্দোনেশিয়া,

সোবিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, ইরাক, ইথোপিয়া, হাংগেরী, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, পাকিস্তান, পশ্চিম জার্মেনী, চীন, গ্রীস, জাপান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারত ২৭টি দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করে।*

কয়েকটি চুক্তির বিবরণ

এই প্রসংগে দুই-একটি চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে সোবিয়েত ইউনিয়নের সংগে চুক্তি করা হয় যে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ দেশ ভারতকে বিভিন্ন প্রকার সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ সরবরাহ করিবে। ইহার পরিবর্তে সোবিয়েত ইউনিয়ন ভারত হইতে চা, কফি, মসলা, চর্ম, বনস্পতি তৈল, তামাক, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি অধিক হারে ক্রয় করিবে। আবার ইতালীর সংগে চুক্তি করা হইয়াছে যে কলাকৌশল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহের ব্যাপারে উক্ত দেশ দুই দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কার্যকরীভাবে সহযোগিতার প্রসারসাধন করিবে। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে যুগোশ্লাভিয়ার সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে ভারত ঐ দেশ হইতে ডিসেল ইঞ্জিন, জাহাজ, ইস্পাতজাত দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করিবে। অপরপক্ষে ভারত হইতে লৌহ ও ম্যাংগানীজ-আকর, কফি, অভ্র প্রভৃতি দ্রব্য যুগোশ্লাভিয়ায় রপ্তানি করা হইবে।

চুক্তির সাহায্যে পরিকল্পনার জন্য মূলধন-দ্রব্য সংগ্রহ

উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ভারত এই সমস্ত চুক্তির সাহায্যে পরিকল্পনার জন্য মূলধন-দ্রব্যাদি (capital goods) আমদানি করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। উপরন্তু, ভারত ও চুক্তিকারী দেশগুলির মধ্যে আদানপ্রদানের ফলে বাণিজ্য প্রসারের পথও প্রশস্ততর হইতেছে। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্য প্রতিনিধি-দল আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হইতেছে। ১৯৫৮ সালেই আফগানিস্তান, জাপান এবং সোবিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে তিনটি বাণিজ্য প্রতিনিধি-দল প্রেরিত হয় এবং ঘানা, সাউদি আরব, আরব গণতন্ত্র, জাঞ্জিবর, সিংহল এবং উগাণ্ডা হইতে প্রতিনিধিদল আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। ভারত সরকার ছাড়া বর্তমানে যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন বিভিন্ন দেশের বহির্বাণিজ্য সংগঠনের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতেছে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে করপোরেশন এইরূপ চারিটি চুক্তি সম্পাদন করে।

বাণিজ্য প্রতিনিধি-দল আমন্ত্রণ ও প্রেরণ

হাভানা সনদ

ভারত এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন (India and the International Trade Organisation) : গত যুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বাণিজ্য ও নিয়োগের ব্যাপারে দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার প্রসার করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। হাভানায় (Havana) অনুষ্ঠিত

* Report on Currency and Finace, 1958-59-এর ৮৩ পৃষ্ঠা।

জাতিপুঞ্জের এক সম্মেলনে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে একটি সনদ (Charter) ৫৩টি জাতির প্রতিনিধি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন (International Trade Organisation) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। ভারতও এই হাভানা চুক্তিতে (Havana Charter) স্বাক্ষর প্রদান করে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত না হইলে এই সনদ কার্যকরী হইবে না।

এই সনদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বাধানিষেধ ও বিভেদমূলক আচরণকে অপসারিত করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও সহযোগিতার প্রসারসাধন করা। সনদে অবশ্য বলা হয় যে, অনুন্নত দেশগুলি তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যের উপর প্রয়োজনীয় বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবে—অর্থাৎ শিল্পপ্রসার, পূর্ণনিয়োগ ও বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অসুবিধা (balance of payment difficulties) দূরিকরণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বহির্বাণিজ্যের উপর বাধানিষেধ বসাইতে পারিবে।

হাভানা সনদের উদ্দেশ্য

ভারত সরকার উপরি-উক্ত সনদ গ্রহণ করিবে কি না সেই সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশনকে সনদটি বিচার-বিবেচনা করিতে বলা হয়। কমিশন সনদের বিভিন্ন দিকের বিচার করিয়া নিম্নলিখিত সুপারিশ করে: (১) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক সনদ গৃহীত হইলে, এবং (২) স্বীকৃতিদানের সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় যথোপযুক্ত মনে হইলেই ভারত সরকার সনদে সম্মতি প্রদান করিতে পারে।

এই সুপারিশের সপক্ষে কমিশন যুক্তি প্রদর্শন করে। কমিশনের মতে, যতদিন ভারতের বহির্বাণিজ্যে দেনা-পাওনার অসুবিধা চলিতে থাকিবে ততদিন এই সনদের দ্বারা ভারতের নিজস্ব বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইবে না। দীর্ঘকালের কথা ধরিলে অবশ্য ভারতের উপর বাধানিষেধ আসিবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করিতে হইলে কিছু কিছু বাধানিষেধ স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইলে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আর্থিক উন্নয়নের জন্য সাহায্য সহজেই পাইবে। ইহা ব্যতীত ভারত শিল্পে উন্নত হইলে বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের প্রশ্ন দেখা দিবে। এদিক হইতেও ভারতের পক্ষে হাভানা সনদ গ্রহণ করা সমীচীন। যাহা হউক, ব্রিটেন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হাভানা চুক্তি গ্রহণ করে নাই। সুতরাং ভারতের পক্ষেও ঐ সনদ স্বীকার করিয়া লইবার কোন প্রশ্ন জাগে নাই।

ভারত হাভানা সনদ গ্রহণ করে নাই

শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি (General Agreement on Tariff and Trade): এই সাধারণ চুক্তির উদ্দেশ্যও অবাধভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও বাণিজ্য-শুল্কের হ্রাস করা। জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে জেনেভায় এক সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে ২৩টি জাতি যোগদান করে এবং

দ্বি-পক্ষীয় ভিত্তিতে বাণিজ্য-শুল্ক হ্রাসের জন্য আলাপ-আলোচনা চালায়। এই আলাপ-আলোচনার ফলে যে চুক্তি গৃহীত হয় তাহা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সমস্ত জাতির পক্ষে প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত চুক্তির ফলাফল পরে দলিল-বদ্ধ করা হয়। ঐ দলিলই শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি নামে পরিচিত। ভারতও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করে এবং ১৯৪৮ সালে ৯ই জুলাই তারিখ হইতে চুক্তি কার্যকর করে। পরে চুক্তিটির কিছু বদল করা হয় এবং মোট ৩৩টি দেশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি

এই সাধারণ চুক্তির ফলে বহুক্ষেত্রেই বাণিজ্য-শুল্কের হার হ্রাস করা সম্ভব হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, কানাডা, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দেশের সংগে বাণিজ্য-শুল্ক সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন কতকগুলি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-শুল্ক সম্পর্কে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছে, অপরদিকে আবার অন্যান্য দেশকে শুল্কের ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা দিতেও হইয়াছে।

চুক্তির ফলাফল

সাধারণ চুক্তিতে ভারতের যোগদানের বিরুদ্ধে সমালোচনাও করা হইয়াছে। প্রথমত বলা হইয়াছে যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ কোন সুবিধা পায় নাই। দ্বিতীয়ত, বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক হ্রাস করায় ভারতীয় শিল্পস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

১৯৫০ সালে ফিসক্যাল কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত চুক্তি (GATT) ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হয় নাই ; কারণ অন্যান্য দেশ তাহাদের বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাধীনই রহিয়াছে। তবু কমিশন যে-কারণে হাভানা সনদ গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিল সেই কারণেই ভারতকে সাধারণ চুক্তির (GATT) আওতায় থাকিবার পরামর্শ দিয়াছে।

শুল্ক-সুবিধার বিষয়ে কমিশন কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছে। অন্যান্য দেশের নিকট হইতে শুল্ক-সুবিধা আদায়ের বেলায় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উপর ভারতের অধিক জোর দেওয়া উচিত : (১) যে-সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের প্রতিযোগিতা রহিয়াছে ; (২) শিল্পজাত দ্রব্য ; (৩) কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্য। অন্যান্য দেশকে শুল্ক-সুবিধা প্রদানের বেলায় ভারতের (১) মূলধন-দ্রব্য, (২) অন্যান্য যন্ত্রপাতি ; ও (৩) কাঁচামালের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

শুল্ক-সুবিধা সম্পর্কে ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ

১৯৫৫ সালে চুক্তিকারী দেশগুলি সাধারণ চুক্তির পর্যালোচনা করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য চুক্তির বিভিন্ন ব্যবস্থার সংশোধন করে। এই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলেই কার্যকর হইতে পারিবে। নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) নির্ধারিত শুল্ক তালিকার (Tariff Schedules) মেয়াদ ভবিষ্যতে আপনা হইতেই তিন বৎসর করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। তবে চুক্তিকারী দেশগুলি শুল্কের হার

চুক্তির সংশোধন বা পরিবর্তন

পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারিবে। (২) চুক্তিকারী দেশগুলি যাহাতে প্রথম দিকে বাণিজ্য-শুল্কের সাহায্যে নির্দিষ্ট শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে এবং যাহাতে আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া বহির্বাণিজ্যের দেনাপাওনার উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তাহার জন্য উহাদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. What was the nature of India's Foreign Trade before World War II? Discuss the main changes that have come about since then.

[ইংগিত: (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের; (২) বহির্বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের (U. K.) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়; (৩) পণ্যব্যবসায় বহির্বাণিজ্যে নিয়মিতভাবে অনুকূল উদ্বৃত্ত হইত; (৪) ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশী বণিকদের স্বার্থে পরিচালিত হইত; (৫) স্থলপথে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অতি সামান্য।

বর্তমান বৈশিষ্ট্য: (১) বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; (২) বহির্বাণিজ্যের গঠন ও প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসিয়াছে—ভারত এখন শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি এবং কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য আমদানি করে; (৩) দেশানুযায়ী বহির্বাণিজ্যের গতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে—নানাদেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে; (৪) বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত একরূপ নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে—ডলার অঞ্চলের সহিত এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইল অধিক; (৫) দেশবিভাগের ফলে স্থল-বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে।...(৩৭-৩৮, ৪১-৪৮ পৃষ্ঠা)]

2. Describe the important trends in the direction of India's Foreign Trade since 1939. (C. U. B. A. 1944, '48, '54, '56) (৩৮-৪৮ পৃষ্ঠা)

3. What important changes have taken place in the nature, volume and direction of India's Foreign Trade since Independence?

(C. U. B. A. 1949; B. Com. 1949, '53)

[ইংগিত: স্বাধীনতার পর হইতে (১) কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; (২) স্থলবাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; (৩) বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত, বিশেষত ডলার অঞ্চলের সহিত নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে; (৪) বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে এবং ফলে যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে; (৫) বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।...

(৩৯-৪৮ পৃষ্ঠা)]

4. Examine the causes of India's adverse balance of payments after World War II. What measures have been adopted to correct the adverse balance?

(C. U. B. A. 1951, '59; B. Com. 1951, '56)

[ইংগিত: (১) প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের প্রতিবিধানে আমদানির পরিমাণকে হ্রাস করার চেষ্টা হইতেছে যদিও আমদানিনীতি বিশেষ পরিবর্তনশীল; (২) রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে; (৩) এই উদ্দেশ্যে রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।... (৫৫-৫৯ পৃষ্ঠা)]

5. Discuss the main factors that have affected India's balance of payments situation since the initiation of the Second Plan.

(C. U. B. A. 1958; B. Com. 1959) (৫১-৫৫ পৃষ্ঠা)

6. Discuss briefly the balance of payments position during the period of the First Five Year Plan and of three years of the Second Five Year Plan. (৪৯-৫৫ পৃষ্ঠা)

7. Discuss, in brief, India's Trade Policy since Independence. (৬২-৬৭ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the importance of export promotion. Discuss the measures taken by the Government of India for the promotion of exports. (৬৪-৬৮ পৃষ্ঠা)

9. Discuss the Export Credit Guarantee Scheme and comment on its working. (৬৮-৭১ পৃষ্ঠা)

10. Briefly discuss the organisation and function of the State Trading Corporation of India. (C. U. B. A. Hons. 1956) (৭১-৭৪ পৃষ্ঠা)

11. Discuss the main features of India's export trade and examine the prospects of increasing our export-earnings in the near future. (C. U. B. Com. 1958) (৪২-৪৩ এবং ৬৪-৬৮ পৃষ্ঠা)

12. Give a critical estimate of our foreign trade during the Second Plan with special reference to the foreign exchange needs of the Plan. (৫১-৫৫ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থা

(INDIAN CURRENCY AND EXCHANGE SYSTEM)

ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাস (History of Metallic Currency System): প্রাচীন ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি নানাবিধ ধাতব মুদ্রার প্রচলন ছিল। হিন্দু রাজারা নিজেদের নামে স্বর্ণমুদ্রা অংকন করিয়া প্রচলিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। দেশ অধিকাংশ সময় বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। তবে সকল সময় স্বর্ণ ছিল খাদবিহীন।

ভারতের প্রাচীন মুদ্রা-ব্যবস্থা: হিন্দু আমল

মুসলমান রাজত্বে মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার করিবার চেষ্টা হয়। মোহম্মদ তুগলকের সময় রৌপ্যমুদ্রার মূল্যে তাম্রমুদ্রার প্রচলনের প্রচেষ্টা, আকবরের নির্দিষ্ট এক-ধাতুমান (monometallic system) প্রবর্তনের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল সংস্কারের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। মুঘল যুগে স্বর্ণ-মোহর, রৌপ্য টাকা, এবং তাম্র দাম—এই তিন প্রকারের মুদ্রা চালু ছিল। মুঘল রাজত্বের পতনের সংগে সংগে ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে বহু রকমের মুদ্রাও প্রবর্তিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে প্রায় ৯৯৪ রকমের মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। ইহাতে একপ্রকার বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত হইতে থাকে।

মুসলমান আমল

ইহার পর আসিল ব্রিটিশ শাসনের আমল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শাসনক্ষমতায় আসীন হইয়া প্রথমেই মুদ্রা-ব্যবস্থার বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনিতে এবং দেশের সর্বত্র একই প্রকারের মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলনে সচেষ্ট হয়। আলোচনার সুবিধার্থে ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার ইতিহাসকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ

ব্রিটিশ আমলের বিভিন্ন পর্যায় ঃ

(১) ১৮০১-৩৫—দ্বি-ধাতুমান (Bi-metallic Standard) ঃ এই সময় দ্বি ধাতুমান প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। স্বর্ণ এবং রৌপ্য এই দুই প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত করিয়া ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই দুই প্রকারের মুদ্রার সরকারী বিনিময়-হার রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় ১৮৩৫ সালে রূপার টাকাই সমস্ত ব্রিটিশ ভারতের জন্য একমাত্র বিহিত মুদ্রা (legal tender money) হিসাবে গৃহীত হয়—অর্থাৎ ঐ সাল হইতে ভারতে একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।

(২) ১৮৩৫-৯৩—একধাতু রৌপ্যমান (Silver Monometallic Standard) ঃ একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকে। ইহার অধীনে স্বর্ণমুদ্রা বিহিত মুদ্রা না থাকিলেও রূপার টাকা এবং স্বর্ণমোহরের মধ্যে বিনিময়-হার নির্দিষ্ট ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকিলে রূপার টাকা ও স্বর্ণমোহরের মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার (১৫টি রূপার টাকা=১টি স্বর্ণমোহর) বজায় রাখায় অসুবিধা দেখা দেয়। তখন দেশের সর্বত্র, বিশেষত ব্যবসায়ী মহলে, স্বর্ণমান (Gold Standard) প্রবর্তনের দাবি করা হয়।

কিছুদিন পর হইতে (১৮৭৩ সাল) আবার কিন্তু বিপরীত ঘটিতে থাকে—অর্থাৎ স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে। এইভাবে রৌপ্যমুদ্রার মূল্যে অস্থায়িত্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলে।

(৩) রূপান্তরের সময় (Period of Transition) ঃ কিভাবে রৌপ্য মুদ্রামূল্যের অস্থায়িত্ব দূর করা যায় তাহা নির্দেশ করিবার জন্য সরকার ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি (Fowler Committee) নিযুক্ত করে। কমিটি স্বর্ণমান গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়া পর্যায়ক্রমে উহা প্রবর্তনের জন্য কতকগুলি পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করে।

(৪) ১৮৯৮-১৯১৭—স্বর্ণ-বিনিময় মান (Gold Exchange Standard) ঃ সরকার ফাউলার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্বর্ণমান প্রবর্তনের নীতিকে গ্রহণ করিলেও ঐ কমিটি নির্দেশিত পন্থাগুলি পুরাপুরিভাবে অবলম্বন না করায় ভারতে এক অভূতপূর্ব মুদ্রা-ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়। ইহা স্বর্ণ-বিনিময় মান (The Gold Exchange Standard) নামে পরিচিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ইহা হইল 'স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত স্বর্ণমান'।

স্বর্ণ-বিনিময় মান দৈবক্রমে উদ্ভূত হয়

স্বর্ণ-বিনিময় মানের অধীনে ১ টাকা=১ শি. ৪ পে.—এই হারে টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময়-হার ধার্য করা হয়।

১৯১৭ সালে স্বর্ণ-বিনিময় মানের পতন ঘটে। ইহার মূলে ছিল স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্যবৃদ্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে প্রধান রৌপ্য উৎপাদনকারী দেশ মেক্সিকোয় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, উৎপাদন-ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মুদ্রা প্রণয়নের জন্য রৌপ্যের চাহিদাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যায়। ফলে গ্রেসামের বিধি কার্যকর হয়—অর্থাৎ আইনগত বাধা সত্ত্বেও লোকে ভারতীয় রৌপ্য-নির্মিত মুদ্রা গলাইয়া ফেলিতে থাকে।

স্বর্ণ-বিনিময় মানের পতন ও ইহার কারণ

অপরদিকে আবার ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হওয়ায় ভারতীয় টাকার চাহিদাও বাড়িয়া যায়। উভয় কারণে শেষ পর্যন্ত টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার (১ টাকা=১ শি. ৪ পে.) রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; এবং সরকার স্বর্ণ-পিণ্ডমান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৫) ১৯১৭-২৬—অস্থায়ী বিনিময়-হারের যুগ (Period of Unstable Exchange Rate) : স্বর্ণ-পিণ্ড মান প্রবর্তিত হয় ১৯২৭ সাল হইতে। ইহার ঠিক পূর্ববর্তী সময়কে—অর্থাৎ ১৯১৭ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়কে 'অস্থায়ী বিনিময়ের যুগ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সময় টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময়-হার ১ টাকা=২ শি.—এইভাবে নির্দিষ্ট করা হইলেও উহা কার্যকর হয় নাই।

(৬) ১৯২৭-৩১—স্বর্ণ-পিণ্ড মান (The Gold Bullion Standard) : স্বর্ণ-পিণ্ড মানের অধীনে ১ টাকা=১ শি. ৬ পে.—এই বিনিময়-হার ধার্য করা হয়। এখন পর্যন্ত ঐ হারই বর্তমান আছে।

(৭) ১৯৩১-৪৭—ষ্টার্লিং-বিনিময় মান (Sterling Exchange Standard) : বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের কবলে পড়িয়া ব্রিটেন ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বর্ণমান হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হয়। তখন ভারতকেও স্বর্ণের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া সরাসরি ষ্টার্লিং-এর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। ফলে ভারতে যে মুদ্রামান উদ্ভূত হয় তাহাকে ষ্টার্লিং-বিনিময় মান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনের দ্বারা ষ্টার্লিং-বিনিময় মানকে আইনসিদ্ধ করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের উপর টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে উপরি-উক্ত বিনিময়-হার (১ টাকা=১ শি. ৬ পে.) বজায় রাখিবার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

ভারতের বর্তমান মুদ্রামান—আন্তর্জাতিক মান (Present Monetary Standard of India—the International Standard) : ১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সভ্যপদভুক্ত হয়। অর্থভাণ্ডারের প্রত্যেক সভ্যকেই তাহার মুদ্রার স্বর্ণ-বিনিময় হার (rate in terms of gold) ঘোষণা করিতে ও বজায়

রাখিতে হয়। স্বভাবতই ভারতকেও ইহা করিতে হইয়াছে। সভ্যপদভুক্ত হওয়ার সময় ভারতীয় টাকার ঘোষিত স্বর্ণমূল্য ছিল ০'২৬৮৬৯১ গ্রেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের ৩০'২২৫ অংশ। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামানহ্রাসের (devaluation) পর ইহা কমিয়া ০'১৮৬৬১ গ্রেন স্বর্ণ বা ২১ সেণ্ট মার্কিন ডলারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টার্লিং-এর মূল্যও সমপরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্য টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময়-হার অপরিবর্তিতই আছে। এই অপরিবর্তিত হার হইল ১ টাকা = ১ শি. ৬ পে.।

ভাণ্ডার-ব্যবস্থা বা স্বর্ণসমতা মান

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অধীনস্থ এই যে বিনিময়-ব্যবস্থা তাহাকে সংক্ষেপে ভাণ্ডার-ব্যবস্থা (Fund System) বা স্বর্ণসমতামান (Gold Parity Standard) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার পুরা নাম হইল আন্তর্জাতিক বহু মুদ্রায় পরিবর্তনশীল স্বর্ণ-বিনিময় মান (International Multi-lateral Gold Exchange Standard)। সুতরাং ভারতের বর্তমান মুদ্রামান হইল আন্তর্জাতিক মান।

বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা (Present Currency System): টাকা (Rupee) ও নয়া পয়সা বর্তমানে ভারতে হিসাব-নিকাশের মাধ্যম (units of account)। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রাকে টাকা ও নয়া পয়সার হিসাবেই ব্যক্ত করা হয়। অপরাপর সভ্য দেশের ন্যায় ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাতেও দুই প্রকারের মুদ্রা আছে: (ক) ধাতব মুদ্রা (coins) এবং (খ) কাগজী মুদ্রা (paper notes)।

ধাতব মুদ্রা (Coins): ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থা ১৯০৬ সালের মুদ্রাকংন আইন (Coinage Act, 1906) দ্বারা পরিচালিত হইত। ইহার অধীনে ধাতুনির্মিত টাকা ছিল ভারতের প্রধান ধাতব মুদ্রা। টাকার পর ছিল ৮ আনা, ৪ আনা, ২ আনা, ১ আনা, ২ পয়সা ও ১ পয়সার ধাতব মুদ্রা। সকল ধাতব মুদ্রাই প্রতীক মুদ্রা (token coins)—প্রত্যেকটির্ই লিখিত মূল্য ধাতব মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক। তবে আইনের দৃষ্টিতে টাকাকে প্রামাণিক মুদ্রা (standard money) বলিয়া গণ্য করা হয়।

পূর্বতন ব্যবস্থা

উপরি-উক্ত ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিবর্তে ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থার অধীনে টাকাই প্রামাণিক মুদ্রা (standard coin) হিসাবে গণ্য রহিয়াছে। কিন্তু উহা পূর্বের ন্যায় ১৬ আনা, ৬৪ পয়সা, ১৯২ পাই-এ বিভক্ত না হইয়া 'নয়া পয়সা' নামে অভিহিত ১০০টি নূতন মুদ্রায় বিভক্ত। নয়া পয়সা নূতন ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক। ইহার উপরে আছে ২ নয়া পয়সা, ৫ নয়া পয়সা, ১০ নয়া পয়সা, ২৫ নয়া পয়সা এবং ৫০ নয়া পয়সার মুদ্রা।* ১৯৬০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পুরাতন সকল মুদ্রাই নয়া পয়সার পাশাপাশি চালু থাকিবে। তবে উক্ত তারিখ

দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা

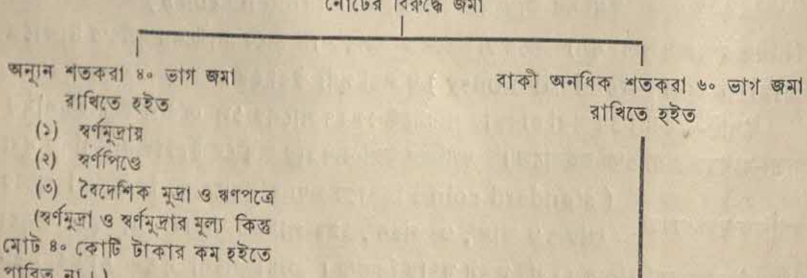
* ২৫ এবং ৫০ নয়া পয়সার মুদ্রা ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি চালু করা হয় নাই।

(১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল) হইতেই হিসাব-নিকাশ আনা-পাই-এর পরিবর্তে নয়া পয়সায় রাখা হইতেছে।

কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা (Paper Currency System) : ভারতে কাগজী মুদ্রার ইতিহাস সুরু করিতে পারা যায় ১৮৬১ সাল হইতে। ইহার পূর্বে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাংক তিনটি কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিবার অধিকারী ছিল। ১৮৬১ সালে কাগজী মুদ্রা আইন (Paper Currency Act, 1861) দ্বারা সরকার ঐ অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইহার পর আবার ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হইলে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৩৪ সালের আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক যে-পদ্ধতিতে নোট প্রচলন করিত বর্তমানে তাহার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। নিম্নে মূল ও পরিবর্তিত উভয়প্রকার নোট প্রচলন পদ্ধতিরই আলোচনা করা হইতেছে।

১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইন অনুসারে নোট প্রচলন পদ্ধতি (The System of Note Issue under Reserve Bank Act, 1934) : ১ টাকার নোট ছাড়া আর সকল নোটই প্রচলন করে রিজার্ভ ব্যাংক। নোট প্রচলন ব্যাপারে মূল ১৯৩৪ সালের আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি (proportional reserve system) অনুসরণ করিত।* ঐ আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংককে প্রচলিত নোটের মোট মূল্যের অন্যূন দুই-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণপিণ্ড ও বৈদেশিক ঋণপত্র বা মুদ্রায়** জমা রাখিতে হইত। বাকী অনধিক তিন-পঞ্চমাংশ বা শতকরা ৬০ ভাগ জমা রাখিতে হইত ভারতের প্রামাণিক মুদ্রায় বা টাকায়, ভারত সরকারের ঋণপত্রে এবং হুণ্ডি প্রভৃতিতে। পদ্ধতিটি বুঝাইবার জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া গেল :

আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি



* Reserve Bank of India—Functions and Working, ১৩ পৃষ্ঠা।

** ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্যপদভুক্ত হইবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংককে বৈদেশিক ঋণপত্রের বিনিময়ে ষ্টার্লিং ঋণপত্র বা মুদ্রা জমা রাখিয়া নোট প্রচলন করিতে হইত।

নানা দিক দিয়া ভারতের নোট প্রচলনের এই আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতির সমর্থন করা হইয়াছিল। প্রথমত, প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে বৈদেশিক ঋণপত্র প্রভৃতি জমা রাখিবার ব্যবস্থা থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-ব্যবস্থা (foreign exchange operations) পরিচালনায় সুবিধা হইত। প্রয়োজনমত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার দ্বারা সহসা উদ্ভূত লেনদেন-উদ্বৃত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইত। দ্বিতীয়ত, অপরিবর্তনীয়ভাবে দুই-তৃতীয়াংশ স্বর্ণও বৈদেশিক মুদ্রায় জমা রাখিতে হইত বলিয়া যথেচ্ছ নোট ছাপা যাইত না। ফলে একদিক দিয়া পদ্ধতিটি মুদ্রাস্ফীতির আশংকামুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, অপরদিকে কিন্তু হুণ্ডি প্রভৃতি জমা রাখিয়া নোট ছাপার ব্যবস্থা থাকায় সাময়িক প্রয়োজনমত বাজারে অধিক নোট প্রচলন করা যাইত। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সুগঠিত বিল বাজারের অভাবে হুণ্ডি জমা রাখিয়া কখনই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নোট ছাপা হয় নাই।*

সমালোচনা

সুবিধা

উপরি-বর্ণিত নোট প্রচলন পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি ছিল যে ইহাতে ভারতে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাতে না হইলেও ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে অকাম্যভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারিত। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হইবার পূর্বে ব্যবস্থা ছিল যে, প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে জমার অন্যূন শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও ষ্টার্লিং ঋণপত্রে জমা রাখিতে হইবে। ইহার মধ্যে অবশ্য মোট স্বর্ণের মূল্য ৪০ কোটি টাকার কম হইতে পারিত না। ইহাতে মোট ৪০ কোটি টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে জমা রাখিয়া থাতাকলমে ষ্টার্লিং পাওনার বিরুদ্ধে যথেচ্ছভাবে নোট ছাপা চলিত—কারণ ব্যবস্থা ছিল যে 'অন্যূন' শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণও ষ্টার্লিং-এ জমা রাখিতে হইবে; সর্বাধিক এইরূপ জমার পরিমাণ কত হইবে সে-সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধই ছিল না। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকার একরূপ বাধাবিহীনভাবেই নোট ছাপাইয়া গিয়াছিল। ফলে ইংল্যাণ্ডে সঞ্চিত হইয়াছিল বিরাট অংকের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত (Sterling Balance) এবং এ-দেশে দেখা দিয়াছিল অভাবনীয় মুদ্রাস্ফীতি। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

বিপদ : মুদ্রাস্ফীতির আশংকা

যুদ্ধের সময় আশংকা কার্যে পরিণত হইয়াছিল

বর্তমান কাগজী মুদ্রা প্রচলন পদ্ধতি (The Present Note Issue System) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক (পরিবর্তন) আইন [Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1956] দ্বারা উক্ত ১৯৩৪ সালের নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করা হয়। পরিবর্তন দ্বারা অনুপাত সংরক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার জমাকে অনাপেক্ষিক (absolute) করা হয়। এই ব্যবস্থা করা হয় যে পূর্বের মত আর সকল সময় মোট জমার দুই-তৃতীয়াংশ

১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক আইনের পরিবর্তন :

* Reserve Bank of India—Functions and Working ১২ পৃষ্ঠা।

বা শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রায় না রাখিয়া ন্যূনতম ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্র—এই মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা রাখিলেই চলিবে। উপরন্তু, প্রয়োজনবোধে স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্রের মূল্যের পরিমাণ কমাইয়া ৩০০ কোটি টাকা, ফলে মোট জমার পরিমাণ ৪১৫ কোটি টাকাতেও লইয়া আসা যাইবে।

ক। অনুপাত সংরক্ষণ পদ্ধতির বিদায়

১৯৫৬ সালে নোট প্রচলন সংক্রান্ত ব্যাপারে আর একটি পরিবর্তন হইল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের পুনর্মূল্যনির্ধারণ (revaluation) লইয়া। ১৯৩৫ সালের মূল রিজার্ভ ব্যাংক আইনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের মূল্য প্রতি টাকায় ৮'৪১৭৫:২ গ্রেন বা প্রতি তোলা ২১'২৪ টাকা হিসাবে ধরা হইয়াছিল। উক্ত আইন দ্বারা স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া প্রতি টাকায় ২'৮৮ গ্রেন বা প্রতি তোলা ৬২'৫০ টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। অন্য ভাবে বলা যায়, ১৯৫৬ সাল (১লা সেপ্টেম্বর) হইতে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ করা হয় প্রতি টাকায় ২'৮৮ গ্রেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ বা তোলা প্রতি ৬২'৫০ টাকা দামের হিসাবে। ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে মজুত স্বর্ণের মূল্য দাঁড়ায় মোট ১১৫ কোটি টাকার কিছু উপরে। এই ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ ও ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র—অর্থাৎ মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা হিসাবে রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংক বাধাহীনভাবে নোট ছাপাইয়া যাইতে পারিত।

খ। মজুত স্বর্ণের পুনর্মূল্যনির্ধারণ

১৯৫৬ সালে পরিবর্তিত নোট প্রচলন পদ্ধতি কার্যকর করা হয় ঐ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে। তাহার পর হইতেই রিজার্ভ ব্যাংকের বৈদেশিক পাওনা (foreign assets) এরূপ কমিতে থাকে এবং উহার উপর ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতিতে (deficit financing) পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের এরূপ ভার অর্পিত হয় যে ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া নোট প্রচলন পদ্ধতির আর এক দফা পরিবর্তনসাধন করিতে হয়। পরে এই অর্ডিন্যান্সের ব্যবস্থাকে ১৯৫৭ সালের রিজার্ভ ব্যাংক (দ্বিতীয় পরিবর্তন) আইনের [Reserve Bank (Second Amendment) Act, 1957] অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৫৭ সালের পরিবর্তন ও বর্তমান পদ্ধতি

এই দ্বিতীয় পরিবর্তন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে এখন মাত্র অন্যূন ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক ঋণপত্র জমা রাখিলেই চলে। ইহার বিরুদ্ধে রিজার্ভ ব্যাংক যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে পারে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে ৬২'৫০ টাকা তোলা প্রতি দামের হিসাবে ১১৫ কোটি টাকার মত স্বর্ণ জমা আছে; সুতরাং ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র পাইলেই ইহার চলিয়া যাইবে। উপরন্তু, ১৯৫৭ সালের উক্ত দ্বিতীয় পরিবর্তন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে এই ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে যে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া কোন বৈদেশিক ঋণপত্র জমা না রাখিয়াও নোট প্রচলন করিতে পারে; তবে সকল সময় উহাকে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ জমা রাখিতেই হইবে।

এই পরিবর্তিত নোট প্রচলন পদ্ধতির সমালোচনা নানাভাবে করা হইয়াছে। ভারতের সংযুক্ত বণিক ও শিল্পসংঘের (Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry) মতে, আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি (proportional reserve system) হইতে বিদায় লইয়া নূতন বিপজ্জনক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হইয়াছে। বৈদেশিক ঋণপত্রজনিত বাধা তুলিয়া দেওয়ায় এবং জমার পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস করায় বিপদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়-পদ্ধতি অনুসরণে আইনগত বাধা দূর করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে ভারতীয় মুদ্রার উপর দেশবিদেশে লোকের বিশ্বাস অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িবে।

সমালোচনা : ১। ইহাতে ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মর্যাদা হ্রাস পাইবে

প্রকৃতপক্ষে, নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হইল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মুদ্রাসৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক দূর করা। মূল পরিকল্পনায় ১,২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়। ইহাকে কার্যকর করিবার জন্যই রিজার্ভ ব্যাংক আইনের নোট প্রচলন সংক্রান্ত ধারাগুলি উপরি-উক্তভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছে। এই প্রসংগে ডক্টর সরোজকুমার বসু বলিয়াছেন, "পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় নোট প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে নূতন ক্ষমতা দেওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল।"*

নূতন পদ্ধতির উদ্দেশ্য : রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন

কিন্তু বক্তব্য হইল যে অন্যভাবেও রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করা যাইতে পারিত। এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অধিক পরিমাণে কাগজী মুদ্রা সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতিতে এই দেশকেও প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে শতকরা ৪০ ভাগ স্বর্ণ ইত্যাদিতে জমা রাখিতে হইত। স্বর্ণের পরিমাণ বাড়াইতে না পারিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিহিত সংরক্ষণের অনুপাত (proportion of statutory reserve) ৪০ হইতে কমাইয়া ২৫-এ লইয়া আসে। ফলে কর্তৃপক্ষের নোট প্রচলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতিও বজায় থাকে। ভারতে কিন্তু মার্কিন দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া সরাসরি আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি হইতে বিদায় লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু অন্যভাবেও এই ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করা যাইত

সরকারী পক্ষ হইতে অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান যুগে আর নোট প্রচলনের বিরুদ্ধে জমার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। বস্তুত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইসরায়েল, সিংহল, ফিলিপাইন প্রভৃতি রাষ্ট্র তাহাদের প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখার পদ্ধতি তুলিয়াই দিয়াছে। মুদ্রার আভ্যন্তরীন মূল্য

এই সমালোচনার উত্তর

* Currency and Credit during the Second Five Year Plan—Dr. S. K. Basu.

সংরক্ষণকল্পে বর্তমানে অর্থ, কর ও মুদ্রা নীতির উপরেই অধিকতর নির্ভর করা হইতেছে—প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে জমার উপর নহে।*

দ্বিতীয়ত, অর্ধোন্নত দেশসমূহে (underdeveloped countries) নোট প্রচলনের বিরুদ্ধে কি পরিমাণ জমা রাখিতে হইবে সে-সম্বন্ধে সম্প্রতি নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রচলিত নোটের বিরুদ্ধে জমার পর্যাপ্তি বিচার করিতে হইবে দেশের দেনাপাওনার উদ্বৃত্তের (balance of payments) দিক দিয়া, দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত নোটের পরিমাণের দিক দিয়া নহে। এই তত্ত্বানুসারে ফিলিপাইন, প্যারাগুয়ে প্রভৃতির নোট প্রচলন সম্পর্কিত ব্যবস্থায় এইরূপ ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট দেশের বৈদেশিক পাওনার পরিমাণ কমিতে থাকিলে দেশকে কাগজী মুদ্রার পরিমাণবৃদ্ধি হইতে বিরত থাকিতে হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী আইনে এইরূপ কোন ধারা অংগীভূত করা হয় নাই। করিলে বোধ হয় আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় মুদ্রার মর্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিত না।

২। এই পরিবর্তন ব্যাপারে অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশকে অনুসরণ করা হয় নাই

তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংকের নোট প্রচলন বিভাগে মজুত স্বর্ণের পুনর্মূল্যনির্ধারণের সিদ্ধান্ত সংগত হইয়াছে স্বীকার করিয়া লইলেও এই দিকে আশংকা পোষণ না করিয়া পারা যায় না। ডক্টর সরোজকুমার বসুর মতে, "এই পুনর্মূল্য-নির্ধারণ হইল স্বর্ণের বাজার দাম পরিবর্তনের স্বীকৃতি মাত্র।" প্রকৃতপক্ষে ঐ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট মজুত স্বর্ণের মূল্য বাজার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত কল্পিত দামে নির্ধারণ করিয়া আসা হইতেছিল। সুতরাং এই দিক দিয়া স্বর্ণের পুনর্মূল্যনির্ধারণকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, একবার পুনর্মূল্যনির্ধারণ পরবর্তী পুনর্মূল্যনির্ধারণ সম্পর্কে পূর্বাভাষই দেয়। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন আইনের অংগীভূত করা প্রয়োজন ছিল।

৩। স্বর্ণের পুনর্মূল্য-নির্ধারণ ব্যবস্থায় ফাঁক আছে

উপসংহারে বলা যায় যে, আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের নোট প্রচলন ক্ষমতার সম্প্রসারণ অপরিহার্য হইলেও ইহার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সুতরাং নূতন ব্যবস্থা হইল ত্রুটিপূর্ণ; এবং ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া বিপজ্জনক। এই কারণে কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সতর্কতার সহিত ইহাকে কার্যকর করিতে হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কর্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন না। অনুমিত ঘাটতি ব্যয় ১,২০০ কোটি টাকা হইতে ১,০৯২ কোটি টাকায় হ্রাস করা হইলেও প্রথম তিন বৎসরেই ঘাটতি ব্যয় করা

উপসংহার : নূতন ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হইলেও ত্রুটিপূর্ণ ও বিপজ্জনক

* Reserve Bank Bulletin—September, 1957.

হইয়াছে ৮৮২ কোটি টাকা।* সুতরাং শেষ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয় মোট ১,০৯২ কোটি টাকায় থাকিবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থার পরিবর্তন (Changes in the Currency and Exchange System) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হইতে আজ পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ সমস্যাও দেখা দিয়াছে এবং উহার সমাধানকালে প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এই সকল পরিবর্তন ও সমস্যার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল : (১) নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তন, (২) মুদ্রার প্রকারে পরিবর্তন, (৩) ষ্টার্লিং-এর উদ্বৃত্ত ও তজ্জনিত সমস্যা, (৪) মুদ্রাস্ফীতি, (৫) মুদ্রামানহ্রাস (devaluation) এবং (৬) বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ। ইহাদের মধ্যে নোট পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইবে। অন্যান্য বিষয়গুলির আলোচনা নিম্নে করা হইতেছে।

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসমূহ

মুদ্রার প্রকারে পরিবর্তন (Changes in the Types of Currency) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হইতে আজ পর্যন্ত মুদ্রার প্রকারে যে-সকল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাদিগকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে :

(১) ধাতব মুদ্রার স্থানাধিকার করিবার জন্য ১৯৪০ সাল হইতে ১ টাকার নোটের প্রচলন করা হইয়াছে। এই নোট অসীম বিহিত মুদ্রা (unlimited legal tender money) বলিয়া ঘোষিত হইলেও ইহা পরিবর্তনীয় (convertible) নহে। (২) ১৯৪৪ সাল হইতে পরিবর্তনীয় দুই টাকার নোটও প্রচলন করা হইয়াছে। (৩) ১৯৪৭ সাল হইতে আধুলি সিকি ইত্যাদির সহিত টাকাকেও মাত্র নিকেলে নির্মাণ করা হইতেছে। (৪) ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে দশমিক মুদ্রা প্রবর্তনের ফলে ১ নয়া পয়সা ছাড়া সকল মুদ্রাই নিকেলে নির্মিত হইতেছে। ফলে ১৫০ বৎসরের পর ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থা হইতে রৌপ্য সম্পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

রৌপ্যের বিদায় গ্রহণকে অনেকে সুনজরে না দেখিলেও ইহাতে কোন অসুবিধা অনুভূত হয় নাই। ধাতব মুদ্রার প্রাথমিক কার্য যে সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে বজায় থাকা তাহা নিকেল-নির্মিত মুদ্রা ভালভাবেই সম্পাদন করিতেছে। অবশ্য সঞ্চিত মূল্যের (store of value) বাহন হিসাবে ভারতীয় ধাতব মুদ্রার এখন আর কোন উপযোগিতাই নাই। উপরন্তু বর্তমানে মুদ্রার এই কার্যের গুরুত্বও অনেক কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং মুদ্রার প্রকারে পরিবর্তনসাধনে অন্যায় কিছুই করা হয় নাই। বরং বিপরীত দিক দিয়া ইহার ফলে মুদ্রানির্মাণের ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে।

রৌপ্যের বিদায় গ্রহণ ও ইহার ফলাফল

* Report on currency and Finance for the year 1958-59.

ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত (Sterling Balances) ঃ ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের সঞ্চয় যুদ্ধকালীন ঘটনা হইলেও ইহার সহিত সম্পর্কিত সমস্যা যুদ্ধোত্তর যুগেই দেখা দেয়। পদ্ধতির দিক দিয়া যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি ও বিরাট অংকের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত সঞ্চয় পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত।

যুদ্ধের পূর্বে ভারত ছিল ব্রিটেনের অধমর্ণ দেশ। যুদ্ধের পরে দেখা গেল যে, ভারত শুধু এই ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধই করে নাই, বরং বিরাট অংকের ষ্টার্লিং সঞ্চয় লইয়া ব্রিটেনের উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় মোট ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণ

অধমর্ণ দেশ থাকিলেও ভারত তাহার কাগজী মুদ্রার বিরুদ্ধে চিরকালই কিছু কিছু ষ্টার্লিং ইংল্যাণ্ডে জমা রাখিত। যুদ্ধের ঠিক পূর্বে এই জমার পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি টাকা। যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫-৪৬ সালে দেখা গেল যে ইহা ১,৭৩৩ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ভারত ৪৬৪ কোটি টাকার মত তাহার ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধের সময় ভারতের পক্ষে মোট ষ্টার্লিং সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২,২০০ কোটি টাকার মত।

ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের কারণ ঃ

১। ষ্টার্লিং ঋণ-পত্রের বিরুদ্ধে কাগজী মুদ্রার প্রচলন

বলা হইয়াছে, পদ্ধতির দিক দিয়া ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের সঞ্চয় ভারতের মুদ্রাস্ফীতির সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। যুদ্ধের সময় ভারতের বিদেশী সরকার ভারত হইতে ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তির পক্ষে বিরাট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সকল যুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করা হইয়াছিল নোট ছাপাইয়া; এবং নোট ছাপান হইয়াছিল রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে খাতাকলমে ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া। ফলে একদিকে যেমন ভারতে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়াছিল, অপরদিকে তেমনি রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে দিন দিন ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

২। ষ্টার্লিং-এর বিরুদ্ধে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার অধিগ্রহণ

৩। ভারতীয়গণের ডলার-সম্পত্তির অধিগ্রহণ

ভারতের পক্ষে বিরাট অংকের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে। যুদ্ধের সময় ভারতের ছিল অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। এই বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ফল কিন্তু ভারত তখন ভোগ করিতে পারে নাই। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ফলে ভারত যে ডলার ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা অর্জন করিয়াছিল ব্রিটিশ সরকার তাহার সমগ্রটাই অধিগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পরিবর্তে ভারতকে দেওয়া হইয়াছিল ষ্টার্লিং ঋণপত্র—অর্থাৎ এই ষ্টার্লিংও রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে ইংল্যাণ্ডে জমা রাখা হইয়াছিল, নগদ দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়ত, ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া আবার সকল ভারতীয়ের ডলার-সম্পত্তিরও (Dollar Assets) অধিগ্রহণ করা হইয়াছিল। চতুর্থত, প্রতিরক্ষা ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি* ছিল। চুক্তিটি এইরূপ ঃ ভারতের প্রকৃত প্রতিরক্ষার জন্য যে-ব্যয় তাহা ভারতকে বহন করিতে হইবে; কিন্তু ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ কোন ব্যয় ভারত প্রাথমিকভাবে

* Share of Defence Expenditure Agreement.

নির্বাহ করিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনকেই বহন করিতে হইবে। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, ভারত তাহার নিজস্ব প্রতিরক্ষার জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিল। পরে এই সৈন্যদলকে ইয়োরোপ বা আফ্রিকার কোন যুদ্ধক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হইল—যে-যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত ভারতের প্রতিরক্ষার কোন সম্পর্ক নাই। এ-ক্ষেত্রে সৈন্যদলটির জন্য ব্যয় ভারত প্রাথমিকভাবে নির্বাহ করিলেও ইহা শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনই বহন করিত। ব্রিটেন কিন্তু নগদ টাকায় ভারতের এই পাওনা মিটাইয়া দিত না। পাওনা মিটাইত পূর্বোক্ত ঐ একই পদ্ধতিতে—অর্থাৎ ভারতের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাংকের খাতে ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া।

৪। প্রতিরক্ষার ব্যয় সংক্রান্ত চুক্তি

এইভাবে বিভিন্ন সূত্র হইতে ভারতের পক্ষে ষ্টার্লিং জমা হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই জমার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে ৪৬৪ কোটি টাকার মত দেনা মিটাইয়াও ইহা ১৯৪৫-৪৬ সালে ১,৭৩৩ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

যুদ্ধের পর ভারতের এই ষ্টার্লিং পাওনা ব্রিটেন কিভাবে প্রদান করিবে তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনা চলিতে থাকে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল (Conservative Party) দাবি করে যে ভারতের মোট ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে—কারণ রক্ষণশীল দলের মতে, ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটেন যে-ব্যয় করিয়াছে তাহাই মূলত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে একটা মোটা অংশ বাদ দিতে হইবে। উপরন্তু, যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বহু পরিমাণ বর্ধিত মূল্যে ব্রিটেন ভারত হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। এই দিক দিয়াও ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণহ্রাসের যৌক্তিকতা আছে।

ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত প্রদানে রক্ষণশীল দলের বাধার প্রচেষ্টা

ভারত রক্ষণশীল দলের এই দাবির তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদে বলা হয় যে, ভারতকে প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার কি পরিমাণ বহন করিতে হইবে তাহা ব্রিটেনের সহিত চুক্তি অনুসারে পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট ছিল। ভারত এই চুক্তি অনুসারেই প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। সুতরাং এখন আর কোন ব্যয়ভার বহনের প্রশ্ন উঠে না। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ভারত তাহার সংগতিকে ছাড়াইয়া প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। সুতরাং তাহার উপর নূতন কোন ব্যয়ভার চাপান শুধু অযৌক্তিক নহে, অন্যায়ও বটে। তৃতীয়ত, ব্রিটেন ভারত হইতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতের যে-পরিমাণ পাওনা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। বস্তুত, ভারতকে বর্তমান ভোগ রহিত করিয়া, যন্ত্রপাতির পুনর্নবিকরণের (replacement) ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়া এই যুদ্ধোপকরণ যোগান দিতে হইয়াছিল। সুতরাং ব্রিটেনের যুদ্ধজয়ে ভারতকে যে-অশ্রু বিসর্জন করিতে হইয়াছিল, যে-রক্তদান করিতে হইয়াছিল—ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত তাহারই প্রতীক। চতুর্থত, পরাধীন ভারতকে জোর করিয়া যুদ্ধে

ইহার বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ

নামান হইয়াছিল। ফলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহার অর্থ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই ভগ্ন অর্থ-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য ব্রিটেনের পক্ষে সমগ্র ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তই বিনা ওজর-আপত্তিতে ভারতকে প্রদান করা উচিত।

শ্রমিক দল ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হ্রাসের দাবি করে নাই

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস করার বিরুদ্ধে ভারতের যুক্তি রক্ষণশীল দল উপেক্ষা করিলেও তৎকালীন শ্রমিক সরকার (Labour Government) উহা সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছিল। শ্রমিক সরকারের অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer) ডক্টর ডালটন ১৯৪৬ সালে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের ষ্টার্লিং পাওনার একাংশকেও অস্বীকার করার ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের নাই।

ব্রিটেনের ষ্টালিং দেনা পরিশোধের পদ্ধতির প্রশ্ন

কিন্তু ভারতের প্রয়োজন ও ইচ্ছামত পদ্ধতিতে ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে এই ক্ষমতার প্রশ্ন বিশেষ উঠে নাই কারণ ব্রিটিশ সরকারই তখন ভারতের অর্থ সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ করিত। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে এই নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয়দের হস্তে চলিয়া আসে। ফলে ব্রিটেনের পক্ষে প্রয়োজন হয় ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ ব্যাপারে বা ষ্টার্লিং মুক্তির (Sterling Release) ব্যাপারে ভারতের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার। ইহার পূর্বেই অবশ্য ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকার তাহার অধীনস্থ ভারত সরকারের সহিত এই বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল।

ষ্টার্লিং পাওনা সংক্রান্ত চুক্তি (Sterling Agreements) : ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের চুক্তির পূর্বে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনার মুক্তি অন্তত তত্ত্বগতভাবে বাধাবিহীন ছিল ; ভারত ইচ্ছা করিলে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত উঠাইয়া ষ্টার্লিং ও ডলার অঞ্চল হইতে মালপত্র আমদানি করিতে পারিত। তবে ডলার অঞ্চল হইতে মালপত্র আমদানি করিবার জন্য ষ্টার্লিংকে ডলারে রূপান্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হইত।* কিন্তু দুইটি কারণে ষ্টার্লিং পাওনার এই বাধাবিহীন মুক্তি ও ডলার পরিবর্তন যোগ্যতাকে বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই—যথা, (ক) ব্রিটেনে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির অপ্রচুর উৎপাদন ; (খ) ইংগ-মার্কিন ঋণচুক্তি সম্পাদন। এই চুক্তির একটি সর্ত ছিল যে, ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত ঋণের কোন অংশ তাহার ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করিতে পারিবে না। ফলে ব্রিটেনকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে তদানীন্তন ভারত সরকারের সহিত একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদন করিতে হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের কিছু অংশকে ১নং হিসাবে (Account I), এবং অবশিষ্টাংশকে ২নং হিসাবে

১। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসের চুক্তি

* এই নিয়মকানুনগুলি সাম্রাজ্যের ডলার তহবিল (Empire Dollar Pool) কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। যুদ্ধের ডলার-দুষ্প্রাপ্যতার সমস্যা মিটাইবার জন্য এই তহবিল খোলা হইয়াছিল।

(Account II) রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১নং হিসাব হইল চলতি হিসাব (Current or Operative Account)। ব্যাংকের চলতি হিসাবের মত ইহা হইতে ইচ্ছামত ষ্টার্লিং উঠাইয়া ব্যবহার করা চলিত। উপরন্তু, এই হিসাবে যে-ষ্টার্লিং রাখা হইয়াছিল তাহা ছিল বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীল (multi-laterally convertible)। কিন্তু ২নং হিসাবের প্রকৃতি স্থায়ী আমানতের মত। ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে ইহা হইতে কোন ষ্টার্লিং উঠান যাইত না। এই দুই হিসাবকে আটক বা জমান হিসাব (Blocked or Frozen Account) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ক্ষমতা-হস্তান্তরের ঠিক পূর্বে অনুরূপ আর একটি সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা কিছু ষ্টার্লিং আটক হিসাব হইতে চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয়।

চলতি ও আটক হিসাব

২। ক্ষমতা-হস্তান্তরের ঠিক পূর্বে দ্বিতীয় চুক্তি

ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত সম্পর্কে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৯৪৮ সালের জুন মাসে। চুক্তির প্রধান সর্তগুলি ছিল এইরূপ:

৩। ১৯৪৮ সালের স্থায়ী চুক্তি

(১) ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের আটক হিসাব হইতে ১৩৩ কোটি টাকার কিছু উপর ভারতে ব্রিটিশ সরকার যে-সকল সামরিক সাজসরঞ্জাম রাখিয়া গিয়াছিল তাহার জন্য বাদ দিতে হইবে।

(২) আবার ঐ আটক হিসাব হইতেই ২২৪ কোটি টাকা বাদ দিতে হইবে পূর্ববর্তী ভারত সরকারের ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেন্‌সন বাবদ। পাউণ্ডের হিসাবে এই দুই খাতে মোট বাদ যাইবে ২২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড।

(৩) মোট ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে পাকিস্তান পাইবে ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং এই তিন খাতে মোট বাদ দেওয়ার পরিমাণ হইল ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড।

(৪) আটক হিসাব হইতে চলতি হিসাবে ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে মোট ১৬ কোটি পাউণ্ড স্থানান্তরিত করা হইবে।

৪। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসের চুক্তি

১৯৫১ সালের জুলাই মাসে এই চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হইলে আবার নূতন করিয়া চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হয়। এই নূতন চুক্তির সর্তগুলি হইল:

(১) ৩১ কোটি পাউণ্ড ২নং বা আটক হিসাব হইতে ১নং বা চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই টাকা অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংকে তাহার মুদ্রার বিরুদ্ধে জমা (Currency Reserve) হিসাবে ধরিয়া রাখিবে এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে ব্যয় করিবে না। আবার ব্যয়ও করিতে হইবে ব্রিটিশ সরকারের পূর্বানুমতি লইয়া।

(২) ব্যয়ের জন্য প্রতি বৎসর ৩.৫ কোটি পাউণ্ড করিয়া ২নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে স্থানান্তরিত করা হইবে। এইরূপ মুক্ত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের শেষ অংশ যদি কোন বৎসর ব্যয় করা না হয় তবে উহাকে পরবর্তী যে-কোন বৎসরে ব্যয়ের জন্য উঠান যাইবে। অবস্থা বিশেষে প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার ব্রিটেনের সম্মতি ব্যতিরেকেই উক্ত বাৎসরিক মুক্তির (৩.৫ কোটি পাউণ্ড) উপর ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত—১নং হিসাবে স্থানান্তরিকরণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু প্রয়োজন ৫০ লক্ষ

পাউণ্ডের অতিরিক্ত হইলে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা দ্বারা ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) এই চুক্তি ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত প্রবর্তিত থাকিবে। ঐ তারিখে যে-ষ্টার্লিং আটক হিসাবে থাকিবে তাহা আপনা হইতেই ১নং হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে। সুতরাং সমস্ত ষ্টার্লিং পাওনা বর্তমানে চলতি হিসাবে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

আদায়ীকৃত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত কিভাবে ব্যয়িত হইতেছে

এখন আদায়ীকৃত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত কিভাবে ব্যয়িত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। ক্ষমতা-হস্তান্তর হইতে সুরু করিলে দেখা যায় যে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে ভারতের মোট ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ ছিল ১১৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা হইতে পাকিস্তানের অংশ বাবদ এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের পেন্সন্ ইত্যাদি বাবদ মোট দেওয়া হয় ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং স্বাধীন ভারতের অংশে পড়িয়াছিল ৭৫ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড (১১৩·৭০ কোটি পাউণ্ড – ৩৭·৮০ কোটি পাউণ্ড) বা ১,০০৯·৪৭ কোটি টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে ইহা কমিয়া ৮৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং অন্তর্বর্তী সময়ে (১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৫০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত) ভারত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে ১১৫·৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল; এবং ব্যয় করা হইয়াছিল প্রধানত খাদ্য আমদানি করিবার জন্য।

ব্যয় প্রধানত খাদ্য-আমদানিতে করা হইয়াছিল

কিন্তু খাদ্য আমদানিতে আদায়ীকৃত ষ্টার্লিং পাওনা ব্যয় অপরিহার্য হইলেও কাম্য বিবেচিত হয় নাই। সংগঠনমূলক কার্যেই ভারত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তকে নিয়োজিত করিবার আশা করিয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনার শেষে ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া ৭১৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে ১৭০ কোটি টাকার (৮৮৪ কোটি টাকা – ৭১৪ কোটি টাকা) মত ব্যয় করা হইয়াছিল। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ৭১৪ কোটি টাকা হইতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত ব্যয়

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয় প্রধানত মূলধন-দ্রব্য ও শিল্পগত কলাকৌশল (industrial know-how) আমদানিতে করিবার কথা ছিল। প্রসংগত উল্লেখ-যোগ্য যে, উক্ত ২০০ কোটি টাকার মত ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে ব্যয় করিয়া মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত মোট ঘাটতি বাজেটের প্রয়োজনীয়তাকে ১,২০০ কোটি টাকা হইতে কমাইয়া ১,০০০ কোটি টাকায় লইয়া আসিবার আশা করা হইয়াছিল।

সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার কথা থাকিলেও বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই ৫৪০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। ফলে ঐ সময় ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমিয়া গিয়া ১৭৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তখন হইতে অবশ্য অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে।

* Second Five Year Plan-এর ৮২ এবং ৮৫ পৃষ্ঠা।

উঠানর পরিমাণ বিশেষ কমিয়া গিয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাংক সম্ভবমত ষ্টার্লিং ক্রয় করিয়া জমাও রাখিতেছে। ফলে ১৯৪৯ সালের জুন মাসের হিসাবে দেখা যায় যে ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত আবার বাড়িয়া ২০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের পরিমাণ সবিশেষ হ্রাস পাওয়ার দরুনই ১৯৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের দ্বিতীয় সংশোধন দ্বারা নোট প্রচলন-পদ্ধতির দ্বিতীয়বার পরিবর্তনসাধন করিতে হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতা পূর্বাপেক্ষা বহু অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের (external assistance) উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও ভারতীয় বিনিময়-ব্যবস্থা (I. M. F. and the Indian Exchange System): আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহিত ভারতীয় বিনিময়-ব্যবস্থার সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে।* এখন এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন কারণ ইহার সহিত যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের বিনিময়-ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন—মুদ্রামানহ্রাস (devaluation) ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে। অর্থভাণ্ডারের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হইল : (ক) অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার

অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

পথ সুগম করা ; (খ) বিনিময়-ব্যবস্থার দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া মুদ্রার অপচয় (currency depreciation) পরিহার করা ; (গ) আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থার বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীলতা (multi-lateral system of payments) আনয়ন করা ; (ঘ) বহুমুদ্রায় পরিবর্তনশীল বিনিময়-ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া ; এবং (ঙ) সদস্য-রাষ্ট্রসমূহকে ক্ষণস্থায়ী প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের অসুবিধা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঋণপ্রদান করা। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পঞ্চম বৃহৎ অংশীদার।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদভুক্ত হইবার সংগে সংগে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে

সদস্য-রাষ্ট্রের দায়িত্ব : মুদ্রামান ঘোষণা

তাহার স্বর্ণমূল্য অথবা মার্কিন ডলারের হিসাবে মুদ্রামূল্য ঘোষণা করিতে হয়। একবার মুদ্রামান ঘোষণা করিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে ঐ মূল্য বা সমতা (parity) বজায় রাখিতে হয়। তবে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট

মুদ্রামানের পরিবর্তন : ক্ষণস্থায়ী ও মৌলিক অসমতা

রাষ্ট্র তাহার ঘোষিত মুদ্রামানের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তন অর্থভাণ্ডারের অনুমতি ব্যতিরেকেই করিতে পারে। ইহার অধিক পরিবর্তন করিতে হইলে ভাণ্ডারের সম্মতির প্রয়োজন হয়। শতকরা ২০ ভাগের অধিক পরিবর্তন একমাত্র বিনিময় হারের স্থায়ী বা মৌলিক অসমতা (Fundamental Disequilibrium) দূরিকরণের জন্যই করা চলে।

আমদানি-রপ্তানির প্রতিকূল উদ্বৃত্তের জন্য কোন সদস্য-রাষ্ট্রের পক্ষে কোন বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে তাহার নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট

* ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিমাণ অবধি ঐ প্রয়োজনীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে যে-সকল মুদ্রার চাহিদা এত অধিক যে ভাণ্ডারের পক্ষে সমগ্র চাহিদা মিটান সম্ভব নহে, সে-সকল মুদ্রাকে ভাণ্ডার 'দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা' (Scarce Currencies) বলিয়া ঘোষণা করে ; এবং ইহাদের ক্ষেত্রে বরাদ্দ-ব্যবস্থা (system of rationing) প্রবর্তিত করে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ভাণ্ডার হইতে দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা চাহিদামত পাওয়া যায় না—বরাদ্দমতই পাওয়া যায়।

সদস্য-রাষ্ট্রের অধিকার

চলতি লেনদেন ব্যাপারে ধীরে ধীরে সকল প্রতিবন্ধকের অপসারণ করা অর্থ-ভাণ্ডারের আর একটি দায়িত্ব।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্যে ঋণদান করিয়া সহায়তা করিবার জন্য যে-ব্যাংক আছে (International Bank for Reconstruction and Development) আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারে যোগদান না করিয়া তাহার সদস্য হওয়া যায় না—অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ হইল বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদের অন্যতম অপরিহার্য সর্ত।

অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ বিশ্বব্যাংকের সদস্য-পদের অন্যতম সর্ত

তত্ত্বগতভাবে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। স্বর্ণমান ব্যতিরেকেও যে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের বাজারে স্থায়িত্ব আনয়ন করা যায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। অপরদিকে কিন্তু স্বর্ণমানের ন্যায় ইহার অধীনে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের জন্য নির্দিষ্ট (fixed exchange), মুদ্রাসংকোচ (deflation) প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয় না। ভাণ্ডার-ব্যবস্থার (Fund System) অধীনে সাধারণত স্থায়ী বিনিময়ের হার বজায় রাখিতে হইলেও প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই হারের পরিবর্তনসাধন করা চলে। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত যদি অস্থায়ীভাবে প্রতিকূল হয় তবে অর্থভাণ্ডারের কোন সভ্য-রাষ্ট্রের পক্ষে মুদ্রাসংকোচের ব্যবস্থা করিতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া তাহার বিনিময়-ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে।

ইহা স্বর্ণমান ব্যতি-রেকেও আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থা প্রশস্ত করার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তত্ত্বগত উপযোগিতা সম্পূর্ণ-ভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। ইহার অন্যতম কারণ হইল সোবিয়েত ইউনিয়ন ইহাতে যোগদান করে নাই। ফলে ইহার কার্যক্ষেত্র হইয়াছে কতকাংশে সংকীর্ণ। দ্বিতীয়ত, অর্থভাণ্ডার যখন স্থাপিত হয় তখন সমগ্র বিশ্বই ছিল ডলার অ-পর্যাপ্তির সম্মুখীন। সুতরাং প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রপীড়িত দেশসমূহের ডলারের চাহিদা মিটান ভাণ্ডারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তৃতীয়ত, যুদ্ধোত্তর যুগের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র এখনও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অপসারণ করিতে পারে নাই। ফলে অর্থভাণ্ডারের অন্যতম উদ্দেশ্যও সাধিত হয় নাই। তবুও বলা যায়, আন্তর্জাতিক

কার্যক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডার পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে নাই

অর্থভাণ্ডার বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারের স্থায়িত্ব আনয়ন করিয়া বিশ্বের বৃহত্তর অংশে আর্থিক সহযোগিতা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্র বহুলাংশে প্রসার করিয়াছে।

ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে সরাসরি কি প্রকার সহায়তা লাভ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারত কয়েকবার ভাণ্ডার হইতে ডলার সংগ্রহ করিয়া তাহার বুভুক্ষু জনসাধারণকে খাদ্য যোগাইয়াছে। শুধু যে খাদ্য আমদানির জন্যই ডলারের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা নহে, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শিল্পগত কাঁচামাল আমদানির জন্যও ঐ মুদ্রার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এককথায় বলা যায়,

ভারত ভাণ্ডার হইতে কি প্রকার সহায়তা লাভ করিয়াছে ঃ

১। ভারত তাহার অর্থ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে

প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রপীড়িত ভারত বারবার অর্থভাণ্ডার হইতে ডলার সংগ্রহ দ্বারা অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি করিয়া তাহার অর্থ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বে ভারতের পক্ষে অর্থভাণ্ডারের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উহার পর মুদ্রামানহ্রাস ও তৎপরবর্তী কোরিয়া-যুদ্ধের ফলে তাহার প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত কমিতে কমিতে অনুকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। ফলে অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজনীয়তাও আর থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই আবার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

২। ডলার ক্রয়ের সুবিধা

সাময়িক ঋণ-দান ছাড়াও অর্থভাণ্ডার অন্যান্য সদস্যের মত ভারতকে ডলার ক্রয়ের সুবিধা দান করে। অর্থভাণ্ডারের সংবিধান অনুসারে ভারত ৪০ কোটি ডলার-মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ভারতীয় টাকার বিনিময়ে ক্রয় করিতে পারে। এ সুযোগও ভারত প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়াছে।

তৃতীয়ত বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ হইল বিশ্বব্যাংকের (World Bank) সদস্যপদভুক্তির অন্যতম সর্ত। বিশ্বব্যাংকের সদস্য হিসাবে ভারত তাহার গঠনমূলক কার্যে বহু পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, কয়না পরিকল্পনা, টাটা জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা, ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, ট্রাক্টর ক্রয়, রেলপথের সাজসরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতির জন্য ঋণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৫৯ সালে বিশ্বব্যাংকেরই সহযোগিতায় ভারত তাহার বৈদেশিক মুদ্রা সংকট দূর করিবার জন্য ৩৬ কোটি ডলার ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

৩। উন্নয়নকার্যে বিশ্বব্যাংক হইতে ঋণ করিয়াছে

৪। ভারতের ঋণ ও অর্থ ব্যবস্থার পর্যালোচনা

পরিশেষে, ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে অর্থভাণ্ডার ভারতের ঋণ ও অর্থ ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিয়া কয়েকটি মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে।

মুদ্রামানহ্রাস (Devaluation) ঃ ভারতের বিনিময়-ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাসে ১৯৪৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঐ দিন মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য শতকরা ৩০.৫ ভাগ

হ্রাস করা হয়। শুধু যে ভারতীয় মুদ্রার মান হ্রাস হইয়াছিল তাহা নহে, পাকিস্তান ব্যতীত ষ্টার্লিং অঞ্চলের সকল মুদ্রার মানই ঐ পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছিল।

মুদ্রামানহ্রাসের প্রধান কারণ : ডলার-সংকট

সংক্ষেপে বলা যায়, ১৯৪৯ সালের মুদ্রামানহ্রাসের কারণ হইল ডলার-সংকট (Doller Crisis)—সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলের ডলার-সংকট। এই সংকটে আবার বিশেষভাবে পতিত হইয়াছিল গ্রেট ব্রিটেন। যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটিশ অর্থ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে অসংগঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডলার অঞ্চলে তাহার রপ্তানি অভূতপূর্বভাবে কমিয়া গিয়াছিল এবং খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি অকল্পনীয় পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে যে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল ব্রিটেন তাহা বারবার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হইয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণসংগ্রহ করিয়া মিটাইয়াছিল। ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশও অনুরূপ সংকটে পতিত হইয়া অল্পবিস্তর ব্রিটেনেরই পদাংক অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু এভাবে যে বেশী দিন চলিতে পারে না, ষ্টার্লিং অঞ্চলের বিনিময়-ব্যবস্থায় এই যে অসমতা (disequilibrium) ইহা যে ক্ষণস্থায়ী নহে ইহা অনুধাবন করিয়াই ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ্ অর্থসচিবদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

কমনওয়েলথ্ অর্থসচিবদের সম্মেলন

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে ডলার অঞ্চল হইতে আমদানির পরিমাণকে শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও কানাডার প্রতিনিধিবর্গের আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার আমদানি শুল্ক কমাইয়া ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে আরও মাল আমদানি করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই অনুরোধ পরীক্ষিত হইবার পূর্বেই ওয়াশিংটন হইতে তৎকালীন ব্রিটিশ অর্থসচিব স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ (Sir Stafford Cripps) ঘোষণা করেন যে, মার্কিন ডলারের তুলনায় পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর মূল্য শতকরা ৩০·৫ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। সংগে সংগে ষ্টার্লিং অঞ্চলের প্রায় সকল দেশই ব্রিটেনকে অনুসরণ করে। কানাডার কোন ডলার-সংকট না থাকিলেও কানাডা মার্কিন ডলারের তুলনায় তাহার মুদ্রামান শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস করে। পাকিস্তান কিন্তু ঘোষণা করে যে, সে তাহার মুদ্রামান হ্রাস করিবে না।

ওয়াশিংটন-সম্মেলন

ব্রিটেনের মুদ্রামানহ্রাস ও অন্যান্য দেশের অনুসরণ

ডলার-সংকট হইতে ষ্টার্লিং অঞ্চলের প্রায় সকল দেশেরই মুদ্রামানহ্রাসের কারণকে অধ্যাপক প্যাটারসন্ তাঁহার 'বিশ্ব অর্থবিদ্যা' গ্রন্থে* এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : ডলার ও ষ্টার্লিং হইল বিশ্বের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ষ্টার্লিং কোনমতেই ডলারের সহিত ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। উভয় মুদ্রার মধ্যে যে-অসমতা (disequilibrium)

ষ্টার্লিং ও ডলারের মধ্যে মৌলিক অসমতাই মুদ্রামানহ্রাসের কারণ

* Patterson—World Economics.

তাহা মৌলিক বা স্থায়ী বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। সুতরাং স্থায়ী ভারসাম্য আনয়নকল্পে একটিমাত্র অবলম্বনীয় পন্থা ছিল ; ইহা হইল ডলারের তুলনায় ষ্টার্লিং-এর মূল্য হ্রাস করা। এবং এই পন্থাই অনুসরণ করা হইয়াছিল।

ষ্টার্লিং-এর অনুসরণে সমপরিমাণে ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাসের কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ডলার অঞ্চলের সহিত ভারতেরও বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্রমাগতই প্রতিকূল হইতেছিল। প্রথম প্রথম ভারত এই প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা আদায় করিয়া মিটাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতে ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের অধিকাংশই আটক হিসাবে (Blocked Account) জমা থাকায় ভারতের পক্ষে ডলার ঘাটতি মিটাইবার জন্য বারবার আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। সুতরাং বুঝা গিয়াছিল যে, ডলারের সহিত ভারতীয় মুদ্রার যে-অসমতা (disequilibrium) তাহা হইল স্থায়ী বা মৌলিক (fundamental)। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারও এ-সম্বন্ধে ইংগিত দিয়াছিল। ফলে একরূপ ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতেই ভারতে মুদ্রামানহ্রাসের কথা চলিতেছিল।

ভারতের মুদ্রামান-হ্রাসের কারণঃ

কিন্তু ভারত সরকার তখন প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও ডলার-ঘাটতি মিটাইবার জন্য মুদ্রামানহ্রাসের প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রকৃতি। ঐ সময় ভারত প্রধানত পাটজাত দ্রব্য, কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রপ্তানি এবং খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করিত। মুদ্রামানহ্রাসের দ্বারা রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণহ্রাসের বিশেষ কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ডলার-ঘাটতি মিটানর জন্য বেসরকারী মহল হইতে মুদ্রামানহ্রাসের প্রস্তাব করা হইলেও সরকার ইহাতে সম্মত হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রিটেন ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশ যখন তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করিল ভারতের পক্ষে তখন আর তাহাদের অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

বাধ্য হইয়াই ভারতের পক্ষে ব্রিটেনকে অনুসরণ করিতে হইয়াছিল

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সরকারী বিবৃতিতে ভারতীয় মুদ্রামানহ্রাসের কারণকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ঃ ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের মুদ্রামানাহ্রাস ভারতের পক্ষে ঐ পথ অবলম্বন করা একরূপ অপরিহার্য করিয়া তুলে। ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশ ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত হওয়ায় এবং ভারতের মূল্যস্তর (price level) অতি উচ্চে থাকায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ভারতীয় মুদ্রার মানহ্রাস ব্যতিরেকে ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যকে ব্যাহত করা হইবে ; এবং ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত অপরিহার্যভাবে আমদানিহ্রাসের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। উপরন্তু, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশ তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করার ফলে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, ভারতও তাহার মুদ্রামান ঐ পরিমাণই হ্রাস করিবে। এই কারণে পুরাতন বিনিময়

এই সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

হারে ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করিলে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। স্মৃতরাং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা (as a defensive measure) হিসাবে ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় মুদ্রারও মান হ্রাস ছাড়া ভারতের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না।

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা

মুদ্রামানহ্রাসের পরিমাণ (শতকরা ৩০'৫ ভাগ) সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ইহার কম পরিমাণ হ্রাস করিলে রপ্তানি বাজারের প্রয়োজনীয়তা মিটান যাইত না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সরকারী মতে, ভারতীয় মুদ্রার মান শতকরা ৩০'৫ ভাগের কম হ্রাস করিলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাহত হইতই।

মুদ্রামানহ্রাসের পরিমাণ সম্বন্ধে বিতর্ক

মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল (Effects of Devaluation) : পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বহির্বাণিজ্যের দিক দিয়া মুদ্রামানহ্রাসের ফলাফল সম্বন্ধে একরূপ বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।* এখন মুদ্রা-ব্যবস্থার দিক দিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর মুদ্রামানহ্রাসের প্রভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে অভিমত প্রদান করা কঠিন। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের সহসা বৃদ্ধি আশংকা করিয়া সরকার অষ্টপর্যায়ী কার্যক্রম (Eight-point Programme) দ্বারা মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়।† ইহার ফলে মূল্যস্তর কিছুদিনের জন্য নিম্নগ হইলেও, ১৯৫০ সালের সুরু হইতেই আবার উর্ধ্বগামী হইতে সুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যে-সকল দেশ তাহাদের মুদ্রামানহ্রাস করে নাই সেই সকল দেশ হইতে পণ্য আমদানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য-সংকটের ফলে পাট ও তুলার আমদানি কমিয়া যাওয়ায় এই দুই প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে আবার অধিক পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানি হইবার জন্যও তুলাজাত বস্ত্রের মূল্য ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ইহার উপর আসামে ভূমিকম্প, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতিতে বন্যা সরকারের পক্ষে মূল্যস্তরকে নিয়ন্ত্রিত রাখা একরূপ অসম্ভব করিয়া তুলে। যাহা হউক, ভূমিকম্প ইত্যাদির জন্য মুদ্রমানহ্রাস দায়ী নহে ; তবে ইহারা কাকতালীয় প্রকৃতির বলিয়া উভয়ের ফলাফল পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল।

ক। আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের উপর প্রভাব

মুদ্রামানহ্রাসের অন্যান্য ফলাফল হইল ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্ত ও আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার দিক দিয়া। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে ভারতের ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের ডলার-মূল্য (Dollar Value) শতকরা ৩০'৫ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ষ্টার্লিং-উদ্বৃত্তের সমগ্রটাই অনতিবিলম্বে ডলারে পরিবর্তনশীল না হওয়ায় কার্যক্ষেত্রে ভারতকে ঐ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। পাকিস্তানের কাছে ভারতের ৩০০ কোটি টাকার মত পাওনা ছিল। মুদ্রামানহ্রাসের ফলে তাহা

খ। অন্যান্য প্রভাব

* ৬১-৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

† দ্রব্যমূল্য সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

হইতে সরাসরি ৩০.৫ ভাগ বাদ দেওয়া হয়। অপরদিকে কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাংকে ভারতের পক্ষে দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়।

পাকিস্তানের মুদ্রামানহ্রাস (Devaluation of the Pakistani Rupee) : ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সহিত একযোগে মুদ্রামানহ্রাস করে নাই। পাকিস্তানের এই অনন্য কার্যের দুইটি প্রধান কারণ ছিল : (ক) ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের ন্যায় পাকিস্তানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে কোন স্থায়ী বা মৌলিক অসমতা (fundamental disequilibrium) ছিল না। সুতরাং ভারসাম্য আনয়নকল্পে পাক মুদ্রার মানহ্রাস প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে নাই। (খ) মুদ্রামানহ্রাস না-করার সিদ্ধান্ত দ্বারা পাকিস্তান ভারত হইতে আমদানির জন্য অল্পমূল্য প্রদানের এবং ভারতে রপ্তানির জন্য অধিক মূল্য লাভের আশা করিয়াছিল। উপরন্তু, ভারতের নিকট পাকিস্তানের যে-ঋণ ছিল তাহা ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে ছিল বলিয়া ইহার মূল্যও কমিয়া যাইবার কথা ছিল।

১৯৪৯ সালে পাক মুদ্রার মানহ্রাস না করিবার কারণ

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু পাকিস্তান মুদ্রামানহ্রাস না করার জন্য আশানুরূপ সুবিধালাভ করিতে পারে নাই। ভারতের সহিত বাণিজ্য-সংকট, অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ক্রমশ প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে পরিণতি প্রভৃতি মুদ্রামানহ্রাস না করারই ফল। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে পাকিস্তান ঐ শতকরা ৩০.৫ ভাগই তাহার মুদ্রামানহ্রাস ঘোষণা করে। ফলে ভারতীয় মুদ্রা ও পাক মুদ্রার মধ্যে আবার সমতা আনীত হয়।

১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের মুদ্রামানহ্রাস

ভারতীয় মুদ্রার পুনর্মানহ্রাস (Further Devaluation of the Indian Rupee) : দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার পুনর্মাননির্ধারণের (revaluation) দাবি করা হইতেছিল। ১৯৪৯ সালে মুদ্রামানহ্রাসের পর কোরিয়ার যুদ্ধজনিত কারণে যে আন্তর্জাতিক মালমজুতের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় লেনদেন-উদ্বৃত্ত ভারতের অনুকূলে থাকে। লেনদেন-উদ্বৃত্তের এই অনুকূল গতির জন্যই ভারতীয় মুদ্রার পুনর্মাননির্ধারণের দাবি উত্থিত হয়। দাবির সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হয় :

পূর্বে দাবি ছিল টাকার পুনর্মাননির্ধারণের

(ক) ইহাতে খাদ্য ও যন্ত্রপাতির ন্যায় প্রয়োজনীয় আমদানি দ্রব্যের ব্যয় হ্রাস পাইবে ;

(খ) ইহাতে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর নিম্নাভিমুখী হইবে ;

(গ) ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যের অধিকাংশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (inelastic) হওয়ায় পুনর্মাননির্ধারণ সত্ত্বেও রপ্তানির পরিমাণ প্রায় একই থাকিবে। ফলে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, বিশেষ করিয়া ডলার আহরণ করা সম্ভব হইবে। এই বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা বুভুক্ষু জনসাধারণের জন্য খাদ্য, শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল যে ভারতের অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য; আন্তর্জাতিক মালমজুতের হিড়িক কাটিয়া গেলেই ইহা বিপরীতমুখী হইবে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, মুদ্রামানের পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত সকল জল্পনাকল্পনার অবসান করিয়া ১৯৫১ সালে সরকার ঘোষণা করে যে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভারতীয় মুদ্রামানকে পুনর্নির্ধারিত না করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছে।

বর্তমান দাবি হইতেছে টাকার পুনর্মানহ্রাসের

ইহার পরও অবশ্য কোন কোন মহল হইতে মুদ্রামান পুনর্নির্ধারণের দাবি করা হইতে থাকে। তবে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান তাহার মুদ্রার মানহ্রাস করিলে এ-দাবি বিশেষ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে মূল্যস্তর ঊর্ধ্বগতি হইতে থাকিলে এবং ক্রমে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দিলে এই দাবি বিপরীতমুখী হয়—অর্থাৎ নির্দেশ দেওয়া হইতে থাকে যে ভারতীয় মুদ্রার পুনরায় মানহ্রাসের (further devaluation) দ্বারা প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের গতি রুদ্ধ করা হউক; ইহার দ্বারাই অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করিয়া ইহার সহিত সম্পর্কিত সংকট হইতে পরিত্রাণ লাভের প্রচেষ্টা করা হউক।

পুনর্মানহ্রাসে সরকারের বিরোধিতা

সরকার অবশ্য এই দাবি বা নির্দেশের কোন মূল্য দেয় নাই; আজও দিতেছে না। বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের প্রতিবিধানকল্পে পুনর্মানহ্রাসের পন্থা অবলম্বনের কোনই সম্ভাবনা নাই বলিয়া অর্থমন্ত্রী ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে সুস্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করেন। যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, টাকার পুনরায় মানহ্রাসের ফলে খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল আমদানির ব্যয় এত বৃদ্ধি পাইবে যে তাহা বহন করা ভারতের পক্ষে সম্ভব হইবে না। বর্তমানে অন্তত যদি খাদ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা না থাকিত তবে এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা যাইত। দ্বিতীয়ত, টাকার মান আরও হ্রাস করিলে রপ্তানি কতটা বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ কম দামে মাল যোগান সম্ভব হইবে না। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই মূল্যস্তর আশংকাজনকভাবে বাড়িতে সুরু করিয়াছে। ইহার উপর টাকার মান আরও হ্রাস করিলে মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের বাহিরে গিয়া সমগ্র পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিতে পারে। চতুর্থত, পরিকল্পনার কার্যে সরকার যে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করিতেছে মুদ্রামান পুনর্হ্রাসের ফলে তাহাদেরও ভার বৃদ্ধি পাইবে। ভবিষ্যতে হয়ত' এ-ভার বহন করাই সম্ভব হইবে না।

১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী সংস্থার (Indian Institute of Bankers) বার্ষিক সভায় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণর ঘোষণা করেন যে স্বাধীনতার সময় হইতে এ-পর্যন্ত টাকার ক্রয়শক্তি বা আভ্যন্তরীণ মূল্য শতকরা ২৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে পুনর্মানহ্রাসের দাবি আবার উত্থিত হইয়াছে। ইহার উত্তরেও বলা হইয়াছে যে আমদানি-প্রসার ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণই অবলম্বনীয় ব্যবস্থা, টাকার পুনর্মানহ্রাস নহে।

বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Foreign Exchange Crisis and Exchange Control) : যাহাকে ঠিক বৈদেশিক মুদ্রাসংকট (foreign exchange crisis) বলা হয় তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের ঘটনা হইলেও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের কার্য চলিতেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হইতেই। যুদ্ধের সময় ডলার, ইয়েন (Yen) এবং মহাদেশীয় অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় ভারতীয় টাকার ক্রমাগত অপচয় (depreciation) ঘটিতে থাকে। ফলে ব্রিটেনের অনুসরণে ভারতকেও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। প্রতিরক্ষা নিয়মাবলীর (Defence of India Rules) অধীনে রিজার্ভ ব্যাংককে দেশ হইতে মূলধনের স্থানান্তরগমন রহিত ও যুদ্ধকার্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের বিপুল ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

যুদ্ধের সময় বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ

এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাধীনে বৈদেশিক মুদ্রার সকল প্রকার ক্রয়বিক্রয় রিজার্ভ ব্যাংক বা ইহার অনুমোদিত ব্যবসায়িগণের মাধ্যমে করিতে হইত। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দিক দিয়া সমগ্র কমনওয়েলথ্‌কে একটিমাত্র মুদ্রা সংস্থা (a single currency unit) হিসাবে গণ্য করিয়া ইহাকে ষ্টার্লিং অঞ্চল (the Sterling Area) বলিয়া অভিহিত করা হইত। ষ্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলির মুদ্রা-বিনিময়ে কোন বাধা ছিল না বলা চলে। কিন্তু ইহার বাহিরে কোন দেশের সহিত বিনিময় কঠিন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাধীন ছিল।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার রূপ

ষ্টার্লিং অঞ্চলস্থ দেশগুলির ডলার এবং অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় সাম্রাজ্যের ডলার তহবিল (Empire Dollar Pool) নামে অভিহিত একটি তহবিলে আবশ্যকীয়ভাবে জমা দিতে হইত।* কয়েকটি নির্ধারিত বিষয় ছাড়া এই ডলার তহবিলে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করা যাইত না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রিটেনই ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহার্থে ব্যয় করিত।

যুদ্ধের পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অবস্থাতেও মুদ্রা-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে বজায় রাখা হয়; এবং বর্তমানে ইহা আমাদের বিনিময়-ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই আবার এই গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বহির্বাণিজ্য ও মুদ্রামানহ্রাসের আলোচনা প্রসংগে একথা বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের লেনদেনের অবস্থার অকল্পিত অবনতির দরুন বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের উদ্ভব হইয়াছে। লেনদেনের চলতি হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৩১২ কোটি টাকার মত। ১৯৫৭-৫৮ সালে ইহা আরও বাড়িয়া ৪৭৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে অবস্থার অবশ্য উন্নতি হইয়াছে—অর্থাৎ চলতি হিসাবের খাতে ঘাটতির

সাম্প্রতিক মুদ্রাসংকট ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ

* ৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিমাণ কমিয়া ৩৩৯ কোটি টাকায় এবং বৈদেশিক মুদ্রাসংগতিহ্রাসের পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকা হইতে মোট ৪৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।*

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চলতি হিসাবের খাতে মোট ১,১০০ কোটি টাকা লেনদেন ঘাটতি হইতে পারে অনুমান করা হইয়াছিল। বর্তমানে উহা বাড়িয়া ২,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অবস্থা যে সংকটজনক সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সংকটজনক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রথমেই পরিকল্পনার ছাঁটকাট করা হইয়াছে। মোট পরিকল্পিত ব্যয়কে ৪,৮০০ কোটি টাকা হইতে কমাইয়া ৪,৫০০ কোটি টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় নাই—কারণ, ৪,২২০ কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না আশংকা করা হইতেছে। উপরন্তু, ৪,২২০ কোটি টাকার পরিকল্পনাও কার্যকর করা বর্তমানে অনুমিত ১,১০০ কোটি টাকার (মূল ৮০০ কোটি টাকা) বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। কোনক্রমে যদি বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমিয়া যায় অথবা প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে বর্তমানের সংক্ষিপ্তকার পরিকল্পনাকেও কার্যকর করা দুষ্কর হইবে। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের শেষে দেখা যায় যে ভারতের নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রাসংগতির পরিমাণ ৩৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্ত সামান্যই।

এই সংকটজনক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় হইল রপ্তানি প্রসার এবং আমদানি হ্রাস করা। স্বভাবতই সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এবং সরকারের আমদানিহ্রাস নীতির মধ্যেই রহিয়াছে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ। বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে যত কম ব্যয়িত হয় এবং যাহাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া ব্যয়িত না হয় তাহার দিকে সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে।†

প্রশ্নোত্তর

1. Make a brief survey of the history of Indian Currency and Exchange till the outbreak of the World War II. (৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the main changes that have taken place in the Currency and Exchange System since the World War II.

[ইংগিত : নোট-প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তন, ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত সঞ্চয়, মুদ্রামানহ্রাস এবং মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে।]

3. Analyse the main features of the present Currency System of India. What changes have been recently introduced in the law realating to the paper currency reserve ? (C. U. B. A. 1958)

[ইংগিত : প্রশ্নটি দুই অংশে বিভক্ত—(ক) বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা, এবং (খ) নোট প্রচলন-পদ্ধতির সাম্প্রতিক পরিবর্তন।

---

* Report on Currency and Finance for the year 1958-59-এর ৭২ পৃষ্ঠা এবং এই গ্রন্থের ৫০-৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

† ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ভারতের বর্তমান মুদ্রামান (আন্তর্জাতিক মান) এবং কাগজী ও ধাতব মুদ্রা-ব্যবস্থার বর্ণনা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে নোট প্রচলন-পদ্ধতির যে যে পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে।......৮৫-৮৬, ৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা]

4. Critically discuss the changed system of Note-issue. (৮৭-৯১ পৃষ্ঠা)

5. Explain the origin of India's Sterling Balances. Indicate the process of their release and utilisation by India. (C. U. B.A. 1948, 49, 52; B. Com. 1946, '47) (৯২-৯৩ এবং ৯৪-৯৭ পৃষ্ঠা)

6. Discuss the objectives of the I. M. F. and indicate how far its membership has been beneficial or otherwise to India. (C. U. B. A. 1955) (৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা)

7. Explain the circumstances that led to the Devaluation of the Indian Rupee in September, 1949. What have been the effects of Devaluation? Is there any case for further Devaluation? (C. U. B. A. 1952)

[ইংগিত : ভারতের মুদ্রামানহ্রাসের গৌণ কারণ হইল সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলের (Sterling Area) ডলার-সংকট এবং ভারতের নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। অবশ্য প্রাথমিকভাবে ভারতকে মুদ্রামানহ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় ব্রিটেন ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্যান্য দেশের অনুরূপ সিদ্ধান্তের জন্য।......১০০-১০৩ এবং ৬১-৬২ পৃষ্ঠা]

8. Write a note on Exchange Control. (১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার

(INDIAN BANKING AND THE MONEY MARKET)

ঐতিহাসিক পরিক্রমা : প্রাচীন যুগ

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায়ই প্রাচীন। মনুসংহিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে খ্রীষ্টীয় যুগের বহু পূর্ব হইতেই ভারতে ব্যাংক-ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছিল। চাণক্যের অর্থ-শাস্ত্রে ব্যাংক-ব্যবসায়ী বা শ্রেষ্ঠীদের কথা উল্লেখ আছে। এই সকল শ্রেষ্ঠী আমানত গ্রহণ করিত, ঋণ ও হুণ্ডি প্রদান করিত এবং সরল বীমাকার্য সম্পাদন করিত।

মুসলমান যুগ

মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারের ফলে ভারতের ব্যাংক-ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কয়েকটি পরিবারিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান রক্ষা পাইয়া যায়। এই সকল প্রতিষ্ঠান ক্রমে রাজদরবারের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। মুসলমান রাজত্বের শেষের দিকে বাংলার ইতিহাসে জগৎশেঠের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও প্রথম দিকে হিন্দু ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর ইংরেজ বণিকরাও ক্রমে ব্যাংক-ব্যবসায় সুরু করে। এই ব্যাংক-ব্যবসায় এজেন্সী হাউস (Agency House) নামে অভিহিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। ইহার পর বিদেশী বণিকদের দ্বারা যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে নূতন নূতন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার ফলে কিন্তু দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অপসারিত হয় না। তাহারা গতানুগতিক পদ্ধতিতেই তাহাদের ব্যাংক-ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে থাকে। পরে ইয়োরোপীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণের অনুসরণে ভারতীয়গণও যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে ব্যাংক-ব্যবসায় সুরু করে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব

উপরি-উক্ত ঐতিহাসিক পদ্ধতির ফলে ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজার এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্তমানে ইহা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। নানাপ্রকারের মালিকানাধীনে এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া থাকে।

ভারতীয় টাকার বাজারের অদ্ভুত রূপের ঐতিহাসিক কারণ

ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও আংশিক উপাদান (Characteristics and Constituent Elements of the Momey Market)ঃ ভারতের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ইহার দোষত্রুটির সন্ধান পাওয়া যাইবে। বর্তমানে কিন্তু এই সকল দোষত্রুটি পর্যালোচনা না করিয়া মাত্র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিরই উল্লেখ করা হইল।

ভারতের টাকার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত—টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজার (European Money Market) ও টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার (Indian Money Market)। ভারতের টাকার বাজারের আধুনিক বা সংগঠিত অংশকেই টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজার বলা হয়। ইহা আধুনিক ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে লইয়া গঠিত। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতীয় মালিকানা ও পরিচালনাভুক্ত প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু ইহারা ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া ইয়োরোপীয় বাজারের অন্তর্ভুক্ত। টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার অসংগঠিত দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের লইয়াই গঠিত। ইহাদের ব্যবসায়-পদ্ধতি সনাতনী—অধুনিক রীতিনীতির সংগে বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। ভারতের ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় এই দুইটি বাজার আবার পরস্পরের সহিত একরূপ সম্পর্কহীন; উহাদের সুদের হার পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।* এ-সম্পর্কে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় বাজার

* Reserve Bank of India—Functions and Working—২২-২৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয়, ভারতের টাকার বাজার লণ্ডন বা নিউইয়র্কের ন্যায় একস্থানে কেন্দ্রীভূত নহে, ইহা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত আছে। ভারতে কলিকাতা ও বোম্বাই হইল টাকাকড়ির লেনদেনের দুইটি বৃহৎ কেন্দ্র। এই কেন্দ্র দুইটিকে টাকাকড়ির জাতীয় বাজার (National Money Market) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই জাতীয় বাজার দুইটি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক বাজারের (Local Money Markets) সহিত সংযুক্ত।

ভারতীয় টাকার বাজার একস্থানে কেন্দ্রীভূত নহে

ভারতীর টাকার বাজারের সংগঠন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহা নিম্নলিখিত আংগিক উপাদান লইয়া গঠিত :

(ক) দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers) : মহাজন, সাউকর, স্রফ, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ এই পর্যায়ভুক্ত। ইহারা ইংরাজদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল। পরিমাণের দিক দিয়া ইহারা ভারতের টাকার বাজারের শতকরা ৯০ ভাগ অধিকার করিয়া আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। পদ্ধতির দিক দিয়া ইহারা টাকাকড়ির ভারতীয় বাজারের (Indian Money Market) সংগঠক।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে লইয়াই টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার সংগঠিত

(খ) টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বা আধুনিক বাজার ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক—এবং সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাংক, শিল্প-ব্যাংক, পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাংক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত। এখন ইহাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজারের গঠন :

(১) ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক (Indian Joint Stock Banks) : ভারতের কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত এই সকল ব্যাংক ব্যাংকিং সংক্রান্ত নানাপ্রকার কার্য সম্পাদন করে। ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বলিয়াও অভিহিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহাদের কার্যপদ্ধতি আধুনিক বা ইয়োরোপীয়।

(২) বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks) : এই সকল ব্যাংকের প্রধান কার্য হইল বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসাহায্য এবং মুদ্রা-বিনিময়ের কার্য করা। বিনিময় ব্যাংকগুলির প্রধান কার্যালয় ভারতের বাহিরে। ইহাদের মালিকানাও প্রধানত বৈদেশিক।

(৩) ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India) : ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সৃষ্টি করা হইয়াছে।* রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে পরিণত হইবার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক অন্যতম যৌথ পুঁজি ব্যাংক হিসাবে পরিগণিত থাকিলেও সংগঠন ও কার্যপদ্ধতিতে ইহা ছিল

* এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১১শ অধ্যায় দেখ।

অন্যান্য যৌথ পুঁজি ব্যাংক হইতে অনেকাংশে পৃথক্‌। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে পরিণত হইবার পর এই পার্থক্য আরও বর্ধিত হইয়াছে। মালিকানার দিক দিয়া বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও যৌথ পুঁজি ব্যাংকের মধ্যে কোন সংগতিই নাই। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের আর যৌথ পুঁজি ব্যাংকের মালিকানা ব্যক্তিগতভাবে অংশীদারগণের। কার্য-পদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক ঋণ সরবরাহ করা ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধন হইল রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্যভার যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির উপর কোনমতেই ন্যস্ত নাই। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এককভাবে একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক একটি বিশেষ পর্যায়ভুক্ত

(৪) রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India): রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় টাকার বাজারের প্রধান কর্তৃত্ব ইহার হস্তে ন্যস্ত। শুধু কর্তৃত্বই নহে, ইহার দায়িত্বও আছে। দায়িত্ব হইল মুদ্রা ও বিনিময়-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা বজায় রাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভারতের টাকার বাজারের সমগ্রটা রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীনে আসে নাই। ইহার কর্তৃত্ব শুধু টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজারে পরিব্যাপ্ত। এই বাজারেই আবার ইহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নহে। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংকে আইনের সংশোধন দ্বারা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করা হইলেও টাকা-কড়ির বাজারের ভারতীয় বা অসংগঠিত অংশ উহার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া গিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব

(৫) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (Miscellaneous Institutions): টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাংক, শিল্প-ব্যাংক, পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক, শেয়ার বিনিময় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। ইহারা বিশেষ বিশেষ ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের বিশদ আলোচনা (Detailed Study of the Different Kinds of Banking Institutions): ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন বিশ্লেষণের পর ইহার দোষত্রুটি ও সমস্যার পর্যালোচনা করিতে হয়। কিন্তু ইহা করিবার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers): দেখা গিয়াছে যে ভারতের টাকাকড়ির বাজারের অসংগঠিত অংশ দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে লইয়া গঠিত এবং ভারতের ঋণ ও ব্যাংক ব্যবসায় এই দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ স্থানাধিকার করিয়া আছে।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ি-গণের ভূমিকা

অনেক সময় গ্রাম্য মহাজনকে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পর্যায়ভুক্ত করা হইলেও ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থার পর্যালোচনায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। পার্থক্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে নির্দেশ করা যায়: (ক) গ্রাম্য মহাজনের প্রধান কার্য ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঋণপ্রদান করা; দেশীয় ব্যাংক-

ব্যবসায়ীর কার্য হইল শিল্পবাণিজ্যে মূলধন সরবরাহ করা। (খ) আমানতগ্রহণ এবং হুণ্ডি লইয়া কারবার গ্রাম্য মহাজনের কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নহে; কিন্তু উভয় কার্যই দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। (গ) গ্রাম্য মহাজনের সুদের হার দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সুদের হার অপেক্ষা অনেক বেশী। (ঘ) ঋণপ্রদান ও পরিশোধ ব্যাপারে গ্রাম্য মহাজন নিয়মকানুনের বিশেষ ধার ধারে না; কিন্তু নিয়মানুবর্তিতা হইল দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গ্রাম্য মহাজন ও দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের প্রধান কার্য হইল ঋণপ্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মূলধন সরবরাহ করা। অনেক ক্ষেত্রেই এই ঋণ সরাসরি ব্যক্তিগত জামিনে প্রদান করা হয়; এবং প্রদান-পদ্ধতি যৌথ পুঁজি ব্যাংকের পদ্ধতি হইতে অনেক সরল এবং সংক্ষিপ্ত।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর কার্যাবলী

দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী হুণ্ডি লইয়া কারবার করে। হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণপ্রদান ছাড়াও টাকাকড়ির স্থানান্তরিকরণ সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। মক্কেল মহলে সুনামের জন্যই তাহাদের পক্ষে আমানত পাওয়া সম্ভব হয়। অনেক সময় অবশ্য ব্যাংক-ব্যবসায়ী সাধারণের নিকট হইতে আমানত অপেক্ষা নিজস্ব সংগতির উপরই অধিক নির্ভর করে।

পরিশেষে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে বহু ক্ষেত্রে ব্যাংকিং-এর সহিত অন্যান্য ব্যবসায়ও মিশাইয়া ফেলিতে দেখা যায়। সোনারূপার ব্যবসায়, কৃষিজ পণ্যে আগাম কারবারে, ফটকা বাজারে যাতায়াত প্রভৃতি দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের একরূপ অংগীভূত বলা যায়।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, এই ব্যবস্থা বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিবিহীনভাবে সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এখনও ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে চেক ও আমানত ব্যবস্থা মোটেই গড়িয়া উঠে নাই। ইহার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব ও রক্ষণশীলতা। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ব্যাংক-ব্যবসায়ীই ব্যাংক-ব্যবসায়ের সহিত অন্যান্য প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ব্যাংকিং নীতির দিক দিয়া ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক পদ্ধতি। তৃতীয়ত, এই ব্যাংক-ব্যবসায়ীর লেনদেন ব্যাপারে হুণ্ডি এখনও উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। ফলে বিলের বাজারও (bill market) বিশেষ গড়িয়া উঠে নাই; ডিস্কাউন্ট বাজার (discount market) বলিয়াও কিছু নাই।* চতুর্থত, ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ নিজেদের মধ্যেই সংগঠিত নয়; ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবও বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে, এই ব্যাংক-ব্যবস্থার সহিত টাকাকড়ির আধুনিক বাজার একরূপ সম্পর্ক-বিহীন বলিলেই চলে। হুণ্ডির বাট্টার হার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংকের বাট্টার হার

দোষত্রুটি

* Reserve Bank—Functions and Workingএর ২৩ পৃষ্ঠা।

(bank rate) হইতে শতকরা ২-৩ ভাগ অধিক হয়। অনেক সময় দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ হুণ্ডি বিক্রয় করিয়া যৌথ পুঁজি ব্যাংক হইতে টাকা সংগ্রহ করিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা নিজস্ব সংগতির উপর নির্ভরশীল থাকিয়া কার্য পরিচালনা করিতে চেষ্টা করে। যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলিও এই সকল ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে সুনজরে দেখে না। ঋণপ্রদান করিবার সময় বাণিজ্যিক ব্যাংক নানারূপ কঠিন সর্ত আরোপ করে। ফলে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যৌথ পুঁজি ব্যাংককে পরিহার করিয়া চলে।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা টাকাকড়ির সংগঠিত বাজারের সহিত সম্পর্কহীন

উপরি-উক্তভাবে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবস্থা ভারতের আধুনিক বা ইয়োরোপীয় টাকার বাজার হইতে সম্পর্কচ্যুত হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে ঋণ-ব্যবস্থার পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ মোটেই সম্ভব হয় না। ভারতীয় টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার ইহা একটি বিশেষ ত্রুটি।

রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ পর্যাপ্ত নহে

টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার ও ইয়োরোপীয় বাজারের মধ্যে সংহতি-সাধন (Co-ordination between Indian and European Money Markets): উক্ত ত্রুটি দূর করিবার ও ভারতীয় টাকার বাজারকে সুসংগঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইল টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার ও ইয়োরোপীয় বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনের। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি (Central Banking Enquiry Committee) কয়েকটি বিশেষ সর্তাধীনে প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত এই সকল দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সংযুক্ত হওয়ার সুপারিশ করে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৩৭ সালে এই সংযুক্তির প্রস্তাব করিয়া একটি খসড়া প্রস্তুত করে। প্রস্তাবের ধারার মধ্যে প্রধানতম ছিল যে, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ কয়েকটি সর্ত পালন করিলে তাহারা রিজার্ভ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হইয়া এই ব্যাংক-প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। আরোপিত সর্তাবলীর মধ্যে ছিল: দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অন্যান্য সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করিয়া চলিবে; আমানত ব্যবস্থার প্রসারসাধন করিবে; আধুনিক হিসাবরক্ষক-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে; নির্দিষ্ট সময়ান্তরে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হিসাব-নিকাশ দাখিল করিবে; ইত্যাদি। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অবশ্য এই প্রস্তাব ও সর্তাবলীকে সুনজরে দেখে নাই। বস্তুত, উক্ত সর্তাবলী আরোপ করিয়া দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের একরূপ যৌথ পুঁজি ব্যাংকে পরিণত হইতেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ প্রস্তাব গ্রহণ না করায় ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার দুইটি অংশের মধ্যে কাম্য সংহতি-সাধন সম্ভব হয় নাই।

সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা

ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশের মহাজনী আইন পাস হওয়ায় অনেক দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী তাহাদের প্রতিষ্ঠানকে যৌথ পুঁজি ব্যাংকে পরিণত করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের সময় এই নবসৃষ্ট যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি বিশেষ মুনাফা করিলেও যুদ্ধোত্তর যুগে ইহাদের অনেকগুলি ফেল পড়ে।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করিয়া ব্যাপক ব্যাংক-ফেল রোধ করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস করা হয়। এই আইনের ফলে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ অবশ্য ব্যাংক, ব্যাংকিং, ব্যাংকার প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না; কিন্তু ঐ সকল শব্দ ব্যবহার না করিয়া তাহারা পূর্বের মতই ব্যবসায় চালাইয়া যাইতে পারে।

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন

ইহার পর ১৯৫১ সালে নিখিল ভারত শ্রফ সম্মেলন (All-India Shroff Conference) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় শ্রফ সংঘ (Central Shroff Association) প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবকে এখনও অবশ্য কার্যকর করা হয় নাই।

শ্রফ সম্মেলন

আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় টাকাকড়ির বিভিন্ন বাজারের মধ্যে সংহতি-সাধনের এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান একরূপ অসম্ভব। সুতরাং পূর্বে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ ভিন্ন পথে চলিলেও এখন আর তাহাদিগকে টাকাকড়ির আধুনিক বাজারের বাহিরে রাখা যাইতে পারে না। এইজন্য প্রয়োজন হইল নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের। এই নূতন ব্যবস্থায় দেশীয় ব্যাংকসমূহ যৌথ পুঁজি ব্যাংক বা সমবায় ব্যাংকে পরিণত হইতে পারে।

সংহতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক (Indian Joint Stock Banks): ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক, বিনিময় ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং রিজার্ভ ব্যাংক লইয়া ভারতের ইয়োরোপীয় বা আধুনিক টাকার বাজার গঠিত। যে-সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে ভারতে সংগঠিত হইয়া আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনা করে তাহাদিগকেই ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক বলা হয়। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) তপশীলভুক্ত (scheduled) এবং (খ) তপশীল-বহির্ভূত (non-scheduled)। তপশীলভুক্ত বলিতে বুঝায় রিজার্ভ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। রিজার্ভ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংকসমূহের একটি তালিকা রক্ষা করে; এবং এই তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলিই তপশীলভুক্ত বা তপশীলী ব্যাংক নামে পরিচিত। যে-সকল ব্যাংকের আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্তত ৫ লক্ষ টাকা মাত্র তাহারাই তপশীলভুক্ত হইতে পারে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে তাহাদের গৃহীত চলতি আমানতের (demand deposits) শতকরা ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের (time deposits) শতকরা ২ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন অনুসারে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে গৃহীত আমানতের অনুরূপ অংশ হয় নগদ টাকায় না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।

তপশীলভুক্ত ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস অবধি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট খবরাখবর প্রদানকারী যৌথ পুঁজি ব্যাংকের (reporting banks including foreign banks) সংখ্যা ছিল ৩৭৩। ইহার মধ্যে ভারতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাংক ছিল সংখ্যায় ৭৮, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ১৬ এবং তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক ২৭৯।*

বর্তমান অবস্থা

প্রতিষ্ঠান হিসাবে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও তপশীলী ব্যাংকগুলির কার্যালয়ের সংখ্যা তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলির কার্যালয়ের সংখ্যা হইতে অনেক অধিক। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৪,৬১৬টি কার্যালয়ের মধ্যে ২,৮৪১টি ছিল তপশীলী ব্যাংকসমূহের এবং ৯৯৯টি তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকসমূহের কার্যালয়। বাকী ৭৭৬টি কার্যালয়ের মধ্যে ৭১০টি ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের এবং ৬৬টি ছিল বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের।

তপশীলী ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকের মধ্যে তুলনা

আমানতের দিক দিয়াও তপশীলী ব্যাংকগুলি তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে বহুমাত্রায় অতিক্রম করিয়া যায়। ১৯৫৮ সালের শেষ শুক্রবারে যৌথ পুঁজি ব্যাংক-সমূহের মোট আমানত ১,৫৬২ কোটি টাকার মধ্যে ভারতীয় তপশীলভুক্ত এবং তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলির আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৩১৯ কোটি টাকা এবং ৪৬ কোটি টাকা। বাকী আমানত (১৯৭ কোটি টাকা) গ্রহণ করিয়াছিল বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলি।**

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় সমুদয় কার্যই সম্পাদন করে। তাহারা চলতি ও মেয়াদী উভয় আমানতই গ্রহণ করে, ব্যক্তিবিশেষ ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে স্বল্পকালীন ঋণদান করে, অন্তর্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ করে, ব্যবসায়ীদের উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে, ইত্যাদি। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে কোন ভূমিকা গ্রহণ করে না। মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের একরূপ একচেটিয়া কারবার। ব্যাংক-ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি অনুপ্রবেশের বিশেষ চেষ্টা করিলেও সমর্থ হয় নাই।

কার্যাবলী

কার্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য যেরূপ বিনিময় ব্যাংকসমূহের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে, তেমনি কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার ভার গিয়া পড়িয়াছে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী ও গ্রাম্য মহাজনের হস্তে। এ-ক্ষেত্রেও ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির ভূমিকা অতি অকিঞ্চিৎকর।

---

* Reserve Bank Bulletin—July, 1959.

** Trend and Progress of Banking in India during 1958.

ত্রুটি ও অসুবিধা: ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবসায়ের বয়স মাত্র ৭০ বৎসরের কিছু অধিক। এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে বলা চলে। কিন্তু উন্নত দেশসমূহের তুলনায় ভারতের যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থা এখনও অকিঞ্চিৎকর। প্রথমত, দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় মোট ব্যাংক-কার্যালয়ের সংখ্যা হইল অত্যল্প। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যাংক ও ব্যাংক-কার্যালয়ের সংখ্যা কতকটা বৃদ্ধি পাইলেও ইহা পর্যাপ্তির পরিসীমার মধ্যে আসিয়া পৌছায় নাই। উপরন্তু, যুদ্ধোত্তর যুগে সংক্রামকভাবে ব্যাংক-পতনের ফলে কয়েক স্থানে কার্যালয় উঠিয়াও গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি অতিমাত্রায় নগরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ভারত বিশেষ মাত্রায় গ্রাম্য ভারত—এখানে শতকরা ৮৩ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে।* গ্রামাঞ্চলে যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারের অভাব ভারতের সামগ্রিক ব্যাংক-ব্যবস্থার দুর্বলতারই দ্যোতক। তৃতীয়ত, যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সবিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যৎসামান্য মূলধন লইয়া কার্যারম্ভ, রিজার্ভ সংগঠনের পরিবর্তে লভ্যাংশ বিতরণে আগ্রহ, অযথা শাখাপ্রশাখা বিস্তার, অযৌক্তিক-ভাবে ঋণদান, অনভিজ্ঞ কর্মচারী লইয়া পরিচালনা, বে-আইনীভাবে হিসাবরক্ষণ প্রভৃতিকে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের একরূপ বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করা চলে। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে এই বৈশিষ্ট্য বা ত্রুটিগুলি আরও সুস্পষ্ট ছিল। বর্তমানে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানের ফলে ইহারা বহুমাত্রায় নিয়মিত হইয়াছে। চতুর্থত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক ও দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের পথে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। এই সম্পর্কে ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং তদন্তকারী কমিটি উক্তি করে যে একদিকে দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়িগণ যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলিকে তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করে, অপরদিকে যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলিকে বিনিময় ব্যাংকগুলির সহিতও পদে পদে প্রতিযোগিতা করিতে হয়। উভয় দিকে এইরূপ নিষ্পেষণের মধ্যে পড়িয়া ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক কোনমতে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। পঞ্চমত, যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহ সরকার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রয়োজনমত সহায়তা লাভ করে নাই। ব্রিটিশ শাসনাধীনে সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কাজকর্ম সম্পাদন করা হইত ইম্পিরিয়াল ও বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে। ১৯৩৫ সালের পূর্বে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিয়া যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির প্রসারসাধনের ব্যবস্থা করে

ত্রুটি ও অসুবিধা: ১। এই ব্যাংক-ব্যবস্থা পর্যাপ্তভাবে প্রসারলাভ করে নাই

২। গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটে নাই

৩। আভ্যন্তরীণ পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ

৪। বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের প্রতিযোগিতা অন্যতম প্রতিবন্ধক

৫। সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতার অভাব

* এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

নাই। পরাধীন ভারতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশ বৈদেশিকগণের হস্তে থাকায় বণিক মহল হইতেও যৌথ পুঁজি ব্যাংক বিশেষ কোন সহায়তা লাভ করে নাই। স্বাধীনতার পর এই দৃষ্টিভংগির কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও ব্যবসায়ী ও বণিক মহলে বৈদেশিক ব্যাংকের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৬। অসংগঠিত বিলের বাজার

ষষ্ঠত, ভারতের বিলের বাজার (bill market) ভালভাবে গড়িয়া না উঠায় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি কাম্যভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহাদের মোট বিনিয়োগের মাত্র সামান্য অংশই বিলে আবদ্ধ থাকে; ফলে তাহারা রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে প্রয়োজনমত ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না। সপ্তমত, যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবও বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ফলে ইহাদেরই অসুবিধা ও প্রতিযোগী বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের বিশেষ সুবিধা হয়। যৌথ পুঁজি ব্যাংক-ব্যবস্থার এই ত্রুটি দূরিকরণের অন্যতম প্রধান উপায় হইল সংযুক্তিসাধনের মাধ্যমে বৃহৎ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা। সম্প্রতি অনেক ক্ষেত্রে এই পন্থাই অবলম্বিত হইতেছে।

৭। ব্যাংকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব

পরিশেষে, সেদিন পর্যন্ত তপশীলী ব্যাংকগুলির মধ্যে আমানতগ্রহণের জন্য বিশেষ প্রতিযোগিতা ছিল। ইহার ফলে গৃহীত আমানতের উপর সুদের হার অনেক ক্ষেত্রেই অতি উচ্চ হইত। ১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বড় বড় ব্যাংকগুলি (বিনিময় ব্যাংকসমেত) নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া সুদের হার নির্দিষ্ট করায় এই ত্রুটি কতকটা দূর হইয়াছে।

৮। আমানত গ্রহণ লইয়া প্রতিযোগিতা

দোষত্রুটি ও অসুবিধার আলোচনার পর ইহাদের প্রতিবিধান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস এবং ১৯৫৬ সালে উহার সংশোধন করিয়া ইতিমধ্যেই এ-সম্পর্কে কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালে উক্ত আইনের আর একবার সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরে ব্যাংক পতন ও ব্যাংক আইন (bank failures and bank legislation) প্রসংগে এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক (Foreign Exchange Banks) : বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য করিবার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। এই ব্যাংক বিনিময় ব্যাংক নামে অভিহিত। ইহারা মুদ্রা বিনিময়ে সহায়তা ও আমদানি-রপ্তানিতে অর্থ সরবরাহ করে।

ভারতীয় বিনিময় ব্যাংকগুলি হইল বৈদেশিক

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ব্যাংক-ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গিয়া পড়িয়াছে কতকগুলি বৈদেশিক ব্যাংকের হস্তে। বস্তুত, বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাংকারের কার্য করা এই সকল বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের একরূপ একচেটিয়া কারবার। সম্প্রতি কয়েকটি ভারতীয় ব্যাংক ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা এখনও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে এইরূপ বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ১৬।* ইহাদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(ক) যাহাদের ব্যবসায়ের বৃহত্তর অংশ ভারতে সীমাবদ্ধ ; এবং (খ) যাহারা বৃহৎ বৈদেশিক ব্যাংকের শাখামাত্র। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশানাল ওভারসীজ এণ্ড গ্রিণ্ডলেস্ ব্যাংক (the National Overseas and Grindlays Bank), মারক্যান্টাইল ব্যাংক (the Mercantile Bank of India), চার্টার্ড ব্যাংক (the Chartered Bank) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে আছে লয়েডস্ ব্যাংক (Lloyds Bank) এবং ন্যাশানাল সিটি ব্যাংক অফ নিউইয়র্ক (the National City Bank of New York)। বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের কার্যালয়ের সংখ্যা ৬৬। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উক্ত তারিখে সকল ব্যাংকের মোট আমানত ১,৫৬২ কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৯৭ কোটি টাকা।† মোটামুটিভাবে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলি মোট প্রদত্ত আমানতের শতকরা ১৪-১৫ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে।

গঠন

কার্যাবলী : বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্য ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ করা। এই অর্থ সরবরাহের কার্য হইল প্রধানত দুই প্রকারের : (ক) ভারতীয় বন্দর হইতে বিদেশের বন্দরে এবং বিদেশের বন্দর হইতে ভারতীয় বন্দরে মাল লইয়া যাওয়া ও আনয়নে অর্থ সরবরাহ করা ; (খ) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত রপ্তানি পণ্যকে বন্দরে লইয়া যাওয়া এবং বন্দর হইতে আমদানিকৃত পণ্যকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লইয়া যাওয়া। এই দুই কার্যের মধ্যে প্রথমটির একরূপ সমগ্রভাবেই সম্পাদিত হয় বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির দ্বারা ; দ্বিতীয়টিতে অবশ্য ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের কিছুটা ভূমিকা দেখা যায়। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের কার্যপদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন—কারণ এই কার্যপদ্ধতির জন্যই ইহাদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করা হয়। অভিযোগটি হইল, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের একটি মোটা অংশ পরিচালনা করা হয় লণ্ডনের টাকার বাজারের স্বল্পকালীন মূলধন (short term funds) দ্বারা।

১। প্রধান কার্য বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসাহায্য করা

যখন কোন ভারতীয় রপ্তানিকারী পণ্য রপ্তানি করে তখন সে সাধারণত আমদানিকারীর উপর ৩ মাস পরে দেয় হুণ্ডি জারি করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রপ্তানিকারী টাকা আদায়ের জন্য ৩ মাস অপেক্ষা করে না। তৎপূর্বেই সে ইহাকে আমদানিকারীর ব্যাংকের ভারতীয় শাখা হইতে বাট্টা করিয়া লয়। ব্যাংকটির ভারতীয় শাখা তখন হুণ্ডিটিকে তাহার প্রধান

রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থ-সরবরাহের পদ্ধতি

* Reserve Bank Bulletin—July, 1959.

† ১১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

কার্যালয়ে পাঠাইয়া দেয়। প্রধান কার্যালয় প্রয়োজনমত হুণ্ডিটিকে লণ্ডনের টাকার বাজারে পুনর্বাট্টা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে পারে; এবং অধিকাংশ সময় করেও। ফলে লণ্ডনের টাকার বাজারের স্বল্পকালীন মূলধনে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হইতে থাকে।

২। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ

দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ করিতেছে। বর্তমানে ইহারা পাট শিল্পজাত দ্রব্য, চর্মদ্রব্য, বস্ত্রাদি প্রভৃতির আন্তর্বাণিজ্যে অর্থ সরবরাহকারীদের মোটা অংশীদার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানত, এই উদ্দেশ্যেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহাদের কার্যালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছে।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকর অন্যান্য কার্য সম্পাদন

তৃতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্যও এই সকল বিনিময় ব্যাংক সম্পাদন করে—যথা, আমানত গ্রহণ, ঋণপ্রদান এজেন্সীর কার্য পরিচালনা ইত্যাদি।

৪। মুদ্রা বিনিময়

চতুর্থত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের সময় হইতে ইহারা বৈদেশিক মুদ্রায় রিজার্ভ ব্যাংকের 'অনুমোদিত কারবারী' (authorised agents) হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইহারা বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও উহাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিয়া থাকে।

বিনিময় ব্যাংকসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগঃ বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একরূপ এক-চেটিয়া অধিকার সমন্বিত বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের অস্তিত্ব ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার একটি অকাম্য অংগ।

১। বিনিময় ব্যাংকগুলি ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যতম বিপদস্থল

ইহাদের বিশেষ কার্যপদ্ধতির জন্য লণ্ডনের টাকার বাজারের স্বল্পকালীন মূলধনে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ পরিচালিত হয়। কি করিয়া ইহা সম্ভব হয় তাহার ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। বহুদিন পূর্বেই লর্ড কেইনস্ (Lord Keynes) বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার ইহা অন্যতম প্রধান বিপদস্থল।*

২। ইহারা ভারতীয় ব্যাংকসমূহের প্রতিযোগী

দ্বিতীয়ত, ইহাও বলা হইয়াছে যে, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ উত্তরোত্তর দেশের অন্তর্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও আমানত গ্রহণের দ্বারা ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক-সমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেছে। বস্তুত, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ-সরবরাহ বিনিময় ব্যাংকসমূহের বর্তমানে আর প্রধান কার্য নহে; বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্য সম্পাদনই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায় যে, বিনিময় ব্যাংকসমূহ প্রদত্ত মোট ঋণ ছিল ১৩৮ কোটি টাকা এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হুণ্ডিতে আবদ্ধ টাকার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮ কোটি

* Keynes—Indian Currency and Exchange-এর ২১২ পৃষ্ঠা।

টাকার কিছু উপর। এই সকল ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ আমানত গ্রহণের পরিমাণও যে সামান্য নহে তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।*

তৃতীয়ত, বৈদেশিক ব্যাংকসমূহ জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতার কার্যই করিয়া আসিতেছে। এই সকল বৈদেশিক ব্যাংকের জন্যই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার বৃহত্তর অংশ গিয়া পড়িয়াছে বৈদেশিক বণিকদের হস্তে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির সম্মুখে অনেকে এইরূপ সাক্ষ্যই দিয়াছিল যে, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ ভারতীয় ব্যবসায়িগণ সম্পর্কে অধিকাংশ সময় বিরুদ্ধ ব্যাংক-অভিমত (bank reference) প্রদান করে। আমদানির ক্ষেত্রে তাহারা ইয়োরোপীয় আমদানিকারীদের যে-সুবিধা প্রদান করে ভারতীয় আমদানিকারীদের তাহা করে না। উপরন্তু, তাহারা ভারতীয় আমদানিকারককে বৈদেশিক বীমা কোম্পানী, বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানী, বিদেশী দালাল প্রভৃতির জন্য কারবার করিতে বাধ্য করিয়া এই প্রকারের সকল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানেরও বিরোধিতা করে। উপরন্তু দেখা যায় যে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের উচ্চপদাধিকারী কর্মচারিগণের অধিকাংশই বৈদেশিক। ভারতীয়গণকে ইহারা উচ্চ পদে নিয়োগ করিতে চাহে না; ভারতীয়গণকে ব্যবসায়ের পর্যাপ্ত শিক্ষাও প্রদান করে না।

৩। ইহারা জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে

পরিশেষে, বৈদেশিক মূলধনের ন্যায় বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকের বেলাতেও লভ্যাংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। অনেক সময় আবার বৈদেশিক ব্যাংককে এ-দেশে সংগৃহীত অর্থকে বিদেশে বিনিয়োগ করিতে দেখা যায়। দেশ যখন মূলধনের অভাবে প্রপীড়িত তখন বিদেশে বিনিয়োগকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না।

৪। লভ্যাংশ দেশের বাহিরে চলিয়া যায়

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ একরূপ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। ভারতীয় ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের যে-তত্ত্বাবধানে থাকিত, সে-তত্ত্বাবধানও বিনিময় ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। ফলে তাহারা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে অবস্থান করিয়া উপরি-উক্তভাবে ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল।

প্রতিবিধান :

বিনিময় ব্যাংকসমূহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছিল। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি সুপারিশ করে যে, প্রত্যেক বিনিময় ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া ব্যবসা করিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে কয়েকটি সর্ত পূরণ করিলে তবেই পুনরায় লাইসেন্স প্রদান করা হইবে। নির্দেশিত সর্তের মধ্যে ছিল রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট নিজ দেনাপাওনা সম্বন্ধে নিয়মিত হিসাব দাখিল করা, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায় পরিচালনা করা, ইত্যাদি।

* ১১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির রিপোর্ট তখন কার্যকর করা না হইলেও ১৯৪৯ সালের মূল ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে উহার সুপারিশের অধিকাংশই সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই আইনের ফলে বিনিময় ব্যাংকসমূহ সুবিধাজনক অবস্থানক্ষেত্র হইতে বহু পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছে এবং ইহাদের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি অপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে।

১৯৩৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ও বিনিময় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ

বিনিময় ব্যাংকসমূহের উপর যে-সকল অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ-নীতি প্রযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (ক) ইহাদিগের প্রাপ্ত মূলধন (paid-up capital) এবং রিজার্ভের পরিমাণ ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংক হইতে অধিক হইবে ; (খ) প্রতি বৎসরের শেষে ইহাদের ভারতীয় আমানতের অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতেই রাখিতে হইবে, (গ) এই সকল ব্যাংক তাহাদের ভারতীয় শাখাসমূহের কারবারের স্বতন্ত্র হিসাব প্রকাশ করিবে ; (ঘ) এইরূপ কোন ব্যাংক ফেল পড়িলে সম্পত্তির (assets) উপর ভারতীয় আমানতকারীদের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য হইবে।

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলেও এখনও কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে ; এখনও ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার এই বিপদস্থলকে জাতীয় স্বার্থের অনুপন্থী করিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। এই উদ্দেশ্যে অবশ্য আরও কতকগুলি প্রতিবিধানের নির্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথমত, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ভারতীয় বিনিময় ব্যাংক স্থাপন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে বিনিময় ব্যাংকের কার্য করিতে উৎসাহিত করা যাইতে পারে। অতীতে অবশ্য এ-বিষয়ে ভারতীয় প্রচেষ্টা সফল হয় নাই ; কিন্তু তাহার কারণ ছিল সরকারী সহযোগিতার অভাব। জাতীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব হইতে পারে। ভারতীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পক্ষে এককভাবে এই কার্য সুরু করা বর্তমানেই সম্ভব না হইলেও কয়েকটি প্রধান ব্যাংক সম্মিলিতভাবে সমবায়ের ভিত্তিতে ইহার গোড়াপত্তন করিতে পারে। তৃতীয়ত, ১৯৫৪ সালে শ্রফ কমিটি এই সুপারিশ করে যে, রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে বৈদেশিক হিসাব (foreign accounts) বর্তমানের মত বৈদেশিক ব্যাংকসমূহের নিকট না খুলিয়া ভারতীয় ব্যাংকের বৈদেশিক শাখাসমূহের নিকটই খোলা উচিত। ইহার ফলে ভারতীয় ব্যাংকসমূহ সহজেই বিনিময় ব্যাংকের কার্য করিতে সমর্থ হইবে। এ-সুপারিশ এখনও কার্যকর করা হয় নাই।

আরও কয়েকটি অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

উপসংহারে বলা যায়, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি ধীরে ধীরে বিনিময় ব্যাংকের কার্যে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশে নূতন নূতন

শাখাও খোলা হইতেছে। বর্তমানে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের ১০৩টি শাখা বিদেশে কাজকারবার করিতেছে।* কিন্তু প্রত্যক্ষ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলে এই গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইবে না; ফলে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থাও সুসংগঠিত হইয়া উঠিবে না।

উপসংহার

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India): ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে। এই ইম্পিরিয়াল ব্যাংক আবার ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাংক (Presidency Banks) তিনটির সংযুক্তিসাধনের দ্বারা।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের উদ্ভব

রিজার্ভ ব্যাংক গঠনের পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি কার্য সম্পাদন করিত—যথা, (ক) সরকারের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করা, এবং (খ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করা। অন্যান্য দিকে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ছিল ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। মোটকথা, ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মর্যাদা পায় নাই বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল করণীয় কার্য সম্পাদন করে নাই। তবুও ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপরি-উক্ত কার্য দুইটি সম্পাদন করিত বলিয়া ইহার কার্যাবলীর উপর কয়েকটি বাধানিষেধ অর্পিত হইয়াছিল—যথা, ইহা মুদ্রা বিনিময়ের কার্য বা জমিবন্ধকের কারবার করিতে পারিত না, ইত্যাদি।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের প্রকৃতি

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংক্রান্ত কার্যাবলীর পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত এক চুক্তিবলে ইহা যে-সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন শাখা ছিল না সেই সকল স্থানে এই ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবে কার্য করিতে থাকে। ইহার ফলে এবং নিজস্ব সংগতির জন্য ইহা ভারতীয় টাকার বাজারে একরূপ বেসরকারী নেতৃত্বের অধিকারী হয়। জাতীয়করণের সময় ইহার কার্যালয়ের সংখ্যা ছিল চারি শতেরও অধিক।

রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর ইম্পিরিয়াল ব্যাংক

জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনগণ চিরকালই ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া আসিতেছিল। ব্যক্তিগত মালিকাধীন এই ব্যাংকের মূলধনের অধিকাংশই ছিল বৈদেশিকগণের। ইহার পরিচালনভারও ছিল মূলত বৈদেশিক। ভারতীয়গণকে ব্যাংকের উচ্চতর পদে একরূপ নিয়োগ করা হইত না বলিলেই চলে; এবং ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ব্যবসায়িগণের মধ্যে প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা হইত। ভারতীয় শিক্ষানবিসদিগকেও (apprentices) পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা হইত না। অপরদিকে অন্যান্য যৌথ পুঁজি ব্যাংকের তুলনায় ইম্পিরিয়াল ব্যাংক নানারূপ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। ১৯৩৫ সাল হইতে ইহা রিজার্ভ ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিত, এবং ফলে সরকার

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

* Trend and Progress in India during 1957-এর ৮৩ পৃষ্ঠা।

ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত। কোন কোন মহল হইতে এইরূপ অভিযোগও করা হইয়াছিল যে, প্রকৃতপক্ষে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের মাধ্যমে টাকার বাজারে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল।

ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর পরিবর্তন

ক্ষমতা-হস্তান্তরের ফলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। ইহার শেয়ারের অনেকাংশ ভারতীয়গণের নিকট হস্তান্তরিত হয়, উচ্চতর পদে ভারতীয়গণকে নিয়োগ করা হইতে থাকে এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার রহিত না হইলেও উহা পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে হ্রাস পায়।

জাতীয়করণের দাবি

তবুও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণের দাবি বন্ধ হয় না। ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ সংঘটিত হইলে এই দাবি আরও প্রবল হইয়া উঠে। বলা হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণের পর ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের ক্ষেত্রে অনুরূপ পন্থার অনুসরণ প্রথমোক্ত কার্যের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। দ্বিতীয়ত, টাকার বাজারের বেসরকারী নেতৃত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে রাখা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়াও অভিমত প্রকাশ করা হয়। বেসরকারী নেতৃত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকিলে টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব কখনই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না বলিয়া যুক্তিপ্রদর্শন করা হয়।

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থায় ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের দান

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ করা হইলেও ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবস্থায় ইহার দানকে অস্বীকার করা যায় না। এই ব্যাংক ভারতীয় টাকার বাজারকে অনেকটা সুসংগঠিত করিয়াছিল। চারি শতাধিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ইহা দেশের বিভিন্ন অংশের সুদের হারে সাম্য আনয়নকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ভারতীয়গণের মধ্যে ব্যাংকিং স্বভাবও কতকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল। সমবায় আন্দোলনকে ইহা কিছু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা: ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ করা হয় গ্রাম্য-ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৫ সালে। ইহা অবশ্য আমরা পূর্বে দেখিয়াছি।*

জাতীয়করণের কারণ বিশ্লেষণ

ভারতের গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিয়া জরিপ কমিটি উহার সুপারিশে বলে যে, গ্রামময় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব করিতে হইলে সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার একটি পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit) প্রস্তুত করিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলের এই পূর্ণাংগ ঋণ-পরিকল্পনার প্রতি স্তরে থাকিবে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ (State-partnership)। অন্যান্যের মধ্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ কার্যকর হইবে রাষ্ট্রের অংশীদারভুক্ত এমন একটি বানিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে যাহার শাখা-প্রশাখা দেশের

* প্রথম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সর্বত্র বিস্তৃত থাকিবে এবং যাহার উপর অনেকাংশে গ্রাম্য ঋণ ও সমবায় ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত থাকিবে। ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও উহার সহিত বিভিন্ন সরকার সম্পর্কিত ব্যাংকগুলিকে (State-associated Banks) সংযুক্ত করিয়াই এই ব্যাংক সৃষ্টি করা হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সৃষ্টি

এই সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৫ সালের মে মাসে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইন পাস করিয়া ঐ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের জাতীয়করণ ও ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সৃষ্টি করা হয়। ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের সকল দেনাপাওনা এই নবসৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের গঠন

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের পরিচালনার ভার একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। বোর্ড নিম্নলিখিত পদাধিকারিগণকে লইয়া গঠিত: (১) রিজার্ভ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন সভাপতি (Chairman) এবং ১ জন সহ-সভাপতি, (২) রিজার্ভ ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য অংশীদার কর্তৃক নির্বাচিত ৬ জন পরিচালক, (৩) রিজার্ভ ব্যাংক এবং আঞ্চলিক আর্থিক স্বার্থসমূহের (territorial economic interests) সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ৮ জন পরিচালক এবং (৪) রিজার্ভ ব্যাংক মনোনীত একজন পরিচালক। এইভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় বোর্ড প্রয়োজন হইলে কার্য পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে অনধিক দুইজন কর্মাধ্যক্ষ (Managing Directors) নিযুক্ত করিতে পারে। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে পুনর্গঠিত পরিচালনা-ব্যবস্থায় দুইজন কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

চারিটি সার্কেল

আঞ্চলিক কার্য সুপরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সমগ্র কার্যক্ষেত্র বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও দিল্লী—এই চারিটি সার্কেল-এ (circles) বিভক্ত।

কার্যাবলী :

ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের মত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া চলিবে। ইহা শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ঋণ সরবরাহ করিবে। উপরন্তু, গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার অংগ হিসাবে ইহা অধিকতর উদ্যমশীলতার পথে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার-সাধনে সহায়তা করিবে। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে ইহা বিভিন্ন অংশে

১। ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কার্যাবলী

৪০০-এর মত শাখা স্থাপন করিবে। ইহা স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের অধিকতর সুবিধা (increased remittance facilities) প্রদান করিবে এবং গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা করিবে। পরে শস্যভাণ্ডার

২। নূতন অর্পিত দায়িত্বসমূহ

ও কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের উন্নত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ইহার বিস্তৃততর সংগঠনের মাধ্যমে গ্রাম্য ঋণ যোগানবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

যদি প্রয়োজন হয় তবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আবার যে-সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাংকের কোন শাখা নাই সেই সকল স্থানে ঐ ব্যাংকের এজেন্ট হিসাবে কার্য করিতে

পারিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অন্য কোন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারিবে।

৩। রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবে কার্য

দায়িত্ব কতটা পালিত হইয়াছে

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত প্রধানতম দায়িত্ব—৫ বৎসরের মধ্যে ৪০০টি শাখা স্থাপন—পালনের পথে উহা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ইহা ৩১১টি শাখা খুলিয়াছে; এবং বাকী ৮৯টি শাখা ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে খোলা যাইবে ঘোষণা করা হইয়াছে।*

সরকারী ব্যাংকের সংযুক্তিসাধন

এই প্রসংগে আরও একটি বিষয়ের পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে হায়দরাবাদ রাজ্য ব্যাংক, জয়পুর ব্যাংক, মহীশূর ব্যাংক প্রভৃতি ৮টি সরকারী ব্যাংক (State-associated Banks) রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সহিত সংযুক্ত হইবার কথা ছিল। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু উহারা সংযুক্ত হয় নাই; তবে ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইনের পরিবর্তন দ্বারা উহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অধীন ব্যাংকে (Subsidiary Banks) পরিণত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।† রাষ্ট্রীয় ব্যাংক আইনের আর একটি পরিবর্তন দ্বারা যাহাতে অন্যান্য ব্যাংক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাংক (The Reserve Bank of India): রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৯৩৪ সালের আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না; ১৯২০ সাল হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুইটি কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল মাত্র।

রিজার্ভ ব্যাংক গঠন

১৯২৬ সালের হিলটন-ইয়্যাং কমিশনের নিকট ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে পুরাপুরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হয়। কমিশন কিন্তু এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করে। এই সুপারিশকে কার্যকর করা হয় ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইন পাস করিয়া।

রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ

আদিতে রিজার্ভ ব্যাংক ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে, ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ড এবং ব্যাংক অফ ফ্রান্সের জাতীয়করণের পরই, ইহার জাতীয়করণ করা হয়।

সেই সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাংক সকল সময়ই সরকারের নির্দেশ

* Report of the Central Board of the Reserve Bank for 1958-59.

† ১ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠা এবং Report on Currency and Finance for 1958-59-এর ৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

মত চলিয়াছে, সকল সময়ে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে ; সুতরাং ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া পরিচালনাগত কোন লাভই হয় নাই। দ্বিতীয়ত, একদল অংশীদারের অস্তিত্ব সরকারী কার্যের উপর স্বয়ংস্থাপিত তত্ত্বাবধানের কার্যই করিয়া আসিতেছিল। এইরূপ তত্ত্বাবধানে না থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে দলীয় সরকারের খেয়ালখুশী মতই চলিবে।

জাতীয়করণের বিরুদ্ধে সমালোচনা

সমালোচনার উত্তরে বলা হইয়াছিল যে ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ডও সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিল, তবুও ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। বিত্তশালী শ্রেণী হইতে একদল অংশীদার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা যে কিছু পরিমাণও যে নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণে অন্যায় কিছুই করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, দলীয় সরকারের যে প্রভাবের কথা বলা হয় তাহা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বাধীন সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই বলিয়া এগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় রাখা হয় নাই। দেশের সর্বাংগীণ আর্থিক উন্নয়নের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের জাতীয়করণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই এই কার্য সম্পাদন করা হইয়াছে।

সমালোচনার প্রত্যুত্তর

সংগঠন ও পরিচালনা : রিজার্ভ ব্যাংক যখন অংশীদারগণের ব্যাংক ছিল তখন ইহার মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। জাতীয়করণের পর অবস্থা ঐ একই আছে—তবে মূলধনের সমগ্রটাই এখন রাষ্ট্রের।

রিজার্ভ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ডের (Central Board of Directors) হস্তে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১ জন গভর্ণর, ৩ জন সহকারী গভর্ণর, চারিটি স্থানীয় বোর্ড হইতে মনোনীত ৪ জন পরিচালক, মনোনীত ৬ জন অন্যান্য পরিচালক এবং ১ জন সরকারী কর্মচারী—এই ১৫ জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড গঠিত।

বোর্ডের গভর্ণরই মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive) এবং পরিচালক বোর্ডের সভাপতি। স্থানীয় বোর্ড (Local Boards) চারিটি বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও নয়া দিল্লীতে অবস্থিত। যৌথ পুঁজি ব্যাংক, দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী, সমবায় প্রভৃতি আর্থিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে ৫ জন করিয়া সদস্য মনোনীত করিয়া প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ড গঠন করা হয়।

দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ড

ব্যাংকের নীতি নির্ধারণ করে সম্পূর্ণভাবে সরকার। সরকারী নির্দেশ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ডকে মানিয়া লইতে হয়।

ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ডের মত রিজার্ভ ব্যাংকের মূল বিভাগ দুইটি—(ক) নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department), (খ) ব্যাংকিং বিভাগ (Banking Department)। ব্যাংকিং বিভাগের আবার কয়েকটি উপবিভাগ আছে—যথা, কৃষি-ঋণ বিভাগ (Agriculture Credit Department), বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Exchange Control Department), ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ (Department of Banking Operations),

বিভাগ ও কর্মদপ্তর

ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ (Department of Banking Development), পরিদর্শন বিভাগ (Inspection Department) এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ (Industrial Finance Department)। ইহাদের মধ্যে ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ এবং পরিদর্শন বিভাগ অন্যান্য ব্যাংকের পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অপ্রধান কর্মদপ্তরসমূহের মধ্যে গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগই (Department of Research and Statistics) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্যাবলী : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলিয়া ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। উপরন্তু উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থাতে ইহার উপর অন্যান্য কয়েকটি কার্যভারও অর্পিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের এই কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

ইহা প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকে

(১) নোট প্রচলন সংক্রান্ত কার্য : রিজার্ভ ব্যাংক নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকারী—ইহা এক টাকার নোট ছাড়া অন্য সকল মূল্যের নোটই প্রচলন করিয়া থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নোট প্রচলন পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে।*

(২) সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য : সরকারের ব্যাংক সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদন করে রিজার্ভ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল অর্থ ইহার নিকট জমা রাখা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক সরকারী ঋণ-ব্যবস্থা (public debt) পরিচালনা করে ও ঋণপত্রের মাধ্যমে সরকারের নির্দেশমত বাজার হইতে অর্থসংগ্রহ করে। আবার ইহা সরকারের প্রয়োজনমত অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে। সরকারকে ইহা স্বল্পকালীন (চাহিদামাত্র দিবার সর্তে বা সর্বাধিক ৯০ দিনের জন্য) ঋণপ্রদানও করিয়া থাকে। ব্যাংকিং সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শপ্রদান করা ইহার কর্তব্য। রিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমে বৈদেশিক সরকারের এজেন্ট হিসাবেও কার্য করিতে পারে।

(৩) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য : প্রত্যেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কার্য করে। ইহা তাহাদের আমানতের একাংশ জমা রাখে, তাহাদের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে, তাহাদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে এবং প্রয়োজনমত তাহাদের ঋণপ্রদান করে। আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকও এই সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বে মাত্র তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের শতকরা ২ ভাগ জমা রাখিতে হইত। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে বর্তমানে তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলি অনুরূপ জমা রাখিতে পারে।** ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের যে সংশোধন পাস করা হয় তাহার দ্বারা রিজার্ভ

---

* ৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

** তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলি গৃহীত আমানতের এ-অংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট না রাখিয়া নগদ অবস্থায় (in cash) নিজেদের কাছেও রাখিতে পারে…১১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্যাংককে প্রয়োজনবোধে তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে চলতি আমানতের শতকরা ২০ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ৮ ভাগ—অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই চার গুণ পর্যন্ত বেশী জমা দাবি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে অবশ্য আরও কয়েকটি দায়িত্ব পালন করিতে হয়; ইহার ফলে তাহারা কয়েকটি সুবিধাও ভোগ করে। তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ প্রদান করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে রিজার্ভ ব্যাংক বিনা খরচে তাহাদের টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করে (free remittance facilities) এবং বিল অথবা সরকারী ঋণপত্রের জামিনে তাহাদের ঋণও প্রদান করে। উপরন্তু, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, তপশীলী ব্যাংকসমূহের মধ্যে যেগুলি 'অনুমোদিত ব্যবসায়ী' রিজার্ভ ব্যাংক তাহাদের নিকট বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে।

তপশীলী ব্যাংক ও রিজার্ভ ব্যাংকের মধ্যে সম্বন্ধ

(৪) টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষার কার্য: রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ভারতীয় টাকার বিনিময়-মূল্য বা মানরক্ষার ভার অর্পিত আছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। মূল আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক টাকায় ১ শি. ৬$\frac{৩}{১৬}$ পে. হইতে ১শি. ৫$\frac{৪৯}{৬৪}$ পেন্সের মধ্যে তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট ষ্টার্লিং ক্রয়বিক্রয় করিত। কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সভ্য হওয়ার পর হইতে (১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ) ব্যাংককে অনুমোদিত সকল বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়। বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাংক মাত্র অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের (authorised dealers) নিকটই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করে, সকল ব্যাংকের নিকট নহে।

(৫) ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ কার্য: বর্তমানে প্রত্যেক উন্নত দেশেই টাকাকড়ি অল্পবিস্তর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত (managed money)। রাষ্ট্র এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (credit control) করিয়া। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য বা ক্রয়শক্তি নিয়ন্ত্রিত থাকিলে তবেই শেষ পর্যন্ত ইহার বিনিময়-মূল্য সংরক্ষিত হয়।

(৬) কৃষি-ঋণ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্য: কৃষি-ঋণ-ব্যবস্থাতেও রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকা রহিয়াছে। ইহা ইহার কৃষি-ঋণ বিভাগের (Agricultural Credit Department) মাধ্যমে কৃষি-ঋণ-ব্যবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সমবায় আন্দোলন অধ্যায়ে করা হইয়াছে।*

(৭) পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা দ্বারা ন্যস্ত দায়িত্ব: রিজার্ভ ব্যাংকের উপরি-উক্ত ছয়টি কার্যের প্রথম পাঁচটি যে-কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহার উপর কৃষিপ্রধান দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করে। অর্ধোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য আছে। সম্প্রসারণই (growth)

* ১ম খণ্ডের ১৩শ অধ্যায় দেখ

এই সকল দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যা। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে সাহায্য করা অর্ধোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।*

তিনটি দায়িত্ব

পরিকল্পনাকে সহায়তা করিবার যে-সকল দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল তিনটি: (ক) ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) সাহায্যে পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে সহায়তা করা, (খ) সংগে সংগে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রচেষ্টা করা, এবং (গ) বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্য যাহাতে মূলধনের সমস্যায় প্রপীড়িত না হয় তাহা দেখা।

ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি দায়িত্ব পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মূল্যস্তর আয়ত্বের বাহিরে গিয়া পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিতে পারে। এইজন্য ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধির সংগে সংগে যাহাতে ব্যাংক-ঋণ অকাম্যভাবে বৃদ্ধি না পায় রিজার্ভ ব্যাংককেই তাহা দেখিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তনের সংগে সংগে ব্যাংক-ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতারও বৃদ্ধিসাধন করা হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প-মূলধন সরবরাহের কার্য সম্যকরূপে সম্পাদন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যাংক-উন্নয়ন বিভাগ খোলা হয়। পরে এই বিভাগকে ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ এবং শিল্প-মূলধন বিভাগ—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগের কার্য ব্যাংক-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন ও সম্প্রসারণ এবং শিল্প-মূলধন বিভাগের কার্য বিভিন্ন শিল্প-অর্থ করপোরেশনকে সহায়তা করা।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়তার উদাহরণ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের বিল বাজার পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

টাকাকড়ির বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ (Control of the Reserve Bank of India over the Money Market): এখন রিজার্ভ ব্যাংক টাকাকড়ির বাজারকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন

টাকাকড়ির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্ব সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির বাজারের পরিব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্ব পূর্বে ছিল বিশেষ সংকীর্ণ। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের দ্বারা ইহাকে কতকটা ব্যাপক করা হয়। ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাংক আইন এবং ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সংশোধন দ্বারা

** "Some Reflections on our Domestic Economy" by, H.V.R Iengar, Governor of Reserve Bank.

ইহাকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে। তবুও ব্যাপকতা কাম্যভাবে প্রসারিত হয় নাই; ব্যাংক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের একটা বিরাট অংশ এই কর্তৃত্বের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

প্রথমে ঋণ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করা প্রয়োজন।

রিজার্ভ ব্যাংক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Reserve Bank and Credit Control)ঃ 'ঋণ-নিয়ন্ত্রণ' বলিতে বুঝায় 'ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণের সহিত ঋণের পরিমাণের সংগতিসাধন' (adjustment of the volume of credit to the volume of business)। মোটামুটিভাবে দেশে ঋণের পরিমাণ ব্যাংকসমূহের ঋণনীতির (lending policy) উপর নির্ভর করে বলিয়া ঋণ-নিয়ন্ত্রণের (control of credit) জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে ঋণনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ (control of credit policy) প্রয়োজন হয়। এই নিয়ন্ত্রণকার্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তে কয়েকটি অস্ত্রশস্ত্র (weapons) থাকে—যথা, নৈতিক প্রণোদন (moral suasion), ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন (variation of the bank rate), খোলা বাজারে কারবার (open market operations) এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট সদস্য-ব্যাংকসমূহের জমা রাখার অনুপাতের পরিবর্তন (variation of the reserve ratio)। ইহাদের মধ্যে অবশ্য নৈতিক প্রণোদনকে অস্ত্রশস্ত্রের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, ইহাতে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া সদস্য-ব্যাংকসমূহকে তাহাদের ঋণনীতি পরিবর্তন করিতে অনুরোধ করা হয়। অনুরোধ রক্ষিত না হইলে কিছুই করিবার উপায় নাই। অপর তিনটি অস্ত্রশস্ত্রকে সাধারণ বা পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্র (instruments of general or quantative credit control) বলা হয়—অর্থাৎ, ব্যাংকের বাট্টাহার ইত্যাদি দ্বারা ঋণের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধিসাধন করা হয়। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনমূলক এবং প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার (power of selective and direct credit regulation) অধিকারী হইতে পারে।

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্র

দুই প্রকারের ঋণ নিয়ন্ত্রণ—
ক। পরিমাণমূলক,
খ। নির্বাচনমূলক

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায়, সমগ্র ঋণনীতি নিয়ন্ত্রণ না করিয়া ব্যাংক-গুলি কোন্ কোন্ ঋণপ্রদান সংকুচিত করিবে এবং উহা কিভাবে করিবে তাহা নির্ধারণ করিতে দেওয়া; অপরদিকে প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় কোন বিশেষ ব্যাংক বা ব্যাংকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঋণপ্রদান রহিত করা। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংককে খাদ্যশস্যের বিরুদ্ধে পূর্বাপেক্ষা অধিক জামিন রাখিয়া ঋণপ্রদান করিতে নির্দেশ দিতে পারে, এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কোন বা সকল ব্যাংকের ঋণপ্রদান বন্ধ করিতে পারে।

আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উভয় প্রকার ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই আছে। ইহার মধ্যে পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা মূল রিজার্ভ ব্যাংক আইন ও উহার ১৯৫৬ সালের

সংশোধন (amendment) হইতে প্রাপ্ত। মূল আইন রিজার্ভ ব্যাংককে বাট্টাহারের পরিবর্তন এবং খোলা বাজারে কারবার—এই দুইটি ক্ষমতা প্রদান করে। তারপর ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা তপশীলী ব্যাংকগুলির জমার অনুপাতের পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতাও ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করে ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন ও উহার বিভিন্ন সংশোধন। এখন ঋণ-নিয়ন্ত্রণের এই বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র কতদূর কার্যকর হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা :

নৈতিক প্রণোদন প্রকৃত অস্ত্রশস্ত্রের অন্যতম না হইলেও ইহার উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে আমাদের দেশে এই পদ্ধতি পূর্বে বিশেষ কার্যকর হয় নাই। তবে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ইহার উপর কতকটা আস্থাস্থাপন করা হইতেছে। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিরোধ এবং খাদ্যশস্যের মূল্য দমিত রাখিবার জন্য তপশীলী ব্যাংকগুলিকে কয়েকবার ঋণপ্রদান ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ করা হয়। এই অনুরোধে অনেকটা কাজ হয়। ব্যাংকগুলি প্রত্যেকবারেই ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাইয়া আনে।*

১। নৈতিক প্রণোদন

১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এ-পর্যন্ত মাত্র তিনবার ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন করা হইয়াছে। প্রথমবার করা হয় ১৯৩৫ সালে। তখন বাট্টাহার শতকরা ৩½ হইতে কমাইয়া শতকরা ৩ করা হয়। ইহার ১৬ বৎসর পরে ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে বাট্টাহারকে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৩½-এ লইয়া যাওয়া হয়। তারপর ১৯৫৭ সালের ১৬ই মে তারিখে বাট্টাহারের আরও বৃদ্ধি করিয়া উহাকে শতকরা ৪-এ পরিণত করা হয়। বাট্টাহারের বৃদ্ধি প্রত্যেকবারই সংগঠিত টাকার বাজারের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫২ সালে 'বিল বাজার পরিকল্পনা' (Bill Market Scheme) প্রবর্তনের পূর্বে তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলি ঋণের জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের বিশেষ দ্বারস্থ না হওয়ায় ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন যতটা কার্যকর হইতে পারিত ততটা হয় নাই। বিল বাজার পরিকল্পনা অবশ্য প্রসারিত হয় ১৯৫৭ সাল হইতে। ঐ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৫ই মে পর্যন্ত বাট্টাহার অপরিবর্তিত রাখিয়া সরকারী ঋণপত্রের জামিনে ঋণগ্রহণের সুদের হার শতকরা ½ ভাগ বৃদ্ধি (শতকরা ৩½ হইতে ৪) করা হয়। ইহাও টাকার বাজারে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইহার মূল কারণ হইল, বিল পুনর্বাট্টার পদ্ধতি (re-discounting bills) রিজার্ভ ব্যাংক কখনও বিশেষ অনুসরণ করে নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী ঋণপত্রের জামিনেই তপশীলী ব্যাংকগুলিকে ঋণপ্রদান করিয়াছে। বস্তুত, ভারতে ব্যাংকের বাট্টাহার বলিতে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ঋণপ্রদানের এই সুদের হারই বুঝায়।** যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে, অন্তত

২। বাট্টাহারের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

* Report of the Central Board of Directors of the Reserve Bank for 1957-58.

** Reserve Bank—Functions and Working-এর ৩৭ পৃষ্ঠা।

সুসংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন কার্যকর অস্ত্র হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে মুদ্রাস্ফীতি প্লুতগতিসম্পন্ন (galloping) হইলে বা মুদ্রাসংকোচ (deflation) দ্রুত ঘটিলে ব্যাংকের বাট্টাহারের সামান্য পরিবর্তনে গতি বিশেষ অবরুদ্ধ হয় না। এইজন্য অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রকেও কাজে লাগাইবার প্রয়োজন হয়।

৩। খোলা বাজারে কারবারের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

খোলা বাজারে কারবার—অর্থাৎ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা সংকোচের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয়, রিজার্ভ ব্যাংক ইহার প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই করিয়া আসিতেছে। সাধারণ সময়ে এই পদ্ধতি বেশ কতকটা কার্যকর ছিল। বিগত যুদ্ধের সময় হইতে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে সরাসরি ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইহার দ্বারা ইহা তপশীলী ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনমত অর্থ-সরবরাহ করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ টানিয়া লইত। কিন্তু ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে বাট্টাহারের বৃদ্ধির সংগে সংগে ঘোষণা করা হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংক আর তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে সরাসরি ঋণপত্র ক্রয় করিবে না; ইহাদের জামিনে ঋণপ্রদান করিবে মাত্র। খোলা বাজারে কারবারের নীতির উক্ত পরিবর্তনের ফলে ব্যাংকসমূহের ঋণসৃষ্টির ক্ষমতা (power of credit creation) অনেক পরিমাণ সংকুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সম্প্রতি ইহাও পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাই ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে লাইসেন্সভুক্ত ব্যাংকসমূহের জমা বা রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা (power of variation of the reserve ratio) প্রদান করা হইয়াছে।

৪। ১৯৫৬ সালে জমার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান

রিজার্ভ ব্যাংকের উপরি-উক্ত পরিমাণমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্র অ-পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রাক্কালে। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের ফলে যাহাতে মূল্যস্তর আয়ত্তের বাহিরে না যায় তাহার জন্যই রিজার্ভ ব্যাংককে নোট প্রচলনের ক্ষমতাবৃদ্ধির সংগে সংগে ঋণ-নিয়ন্ত্রণেরও উক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়।* বস্তুত, অর্ধোন্নত দেশে (under-developed countries) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ব্যাংকসমূহের জমা বা রিজার্ভের হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অস্ত্রাগারের অন্যতম অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইজন্য এই সকল দেশের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক-আইনেই মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের প্রতিবিধানকল্পে জমা বা রিজার্ভের পরিমাণ শতকরা ১০ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনাকারী কর্তৃত্বের (monetary authority) হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। আমাদের রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তপশীলভুক্ত ব্যাংকসমূহকে চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ ও স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ মাত্র জমা রাখিতে হইত; প্রয়োজনবোধে ইহার

* ৮৭ এবং ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইত না। রিজার্ভ ব্যাংক আইনের সংশোধন দ্বারা এই হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতাই দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে চলতি আমানতের শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ৮ ভাগ পর্যন্ত জমা দাবি করিতে সমর্থ। সুতরাং এই সকল ব্যাংকের ক্ষেত্রে চলতি ও স্থায়ী আমানত উভয় ক্ষেত্রে জমা ৪ গুণ পর্যন্ত (৫ হইতে ২০ এবং ২ হইতে ৮) বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এই ক্ষমতা প্রদানের বিরুদ্ধে সমালোচনা :

রিজার্ভ ব্যাংকের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির সমালোচনা প্রথমত দুই দিক দিয়া করা হইয়াছে। প্রথমত দেখা গিয়াছে যে, জমা বা রিজার্ভের অনুপাতের এত অধিক পরিবর্তনের ফলে বৃহৎ বৃহৎ ব্যাংক অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংকই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়—কারণ বৃহৎ ব্যাংকের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় অর্থ অলস অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই অলস অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা দিলে বৃহৎ ব্যাংকের কোনই অসুবিধা হয় না—উহার ঋণপ্রদানকার্য পূর্বমতই চলিতে থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় ঋণপ্রদানকার্য সংকুচিত করিয়া। সুতরাং অনেকের মতে, রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতা মাত্র ভবিষ্যৎ জমার ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী আইনে তাহা না করিয়া রিজার্ভের অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা সমগ্র জমার উপর প্রযুক্ত করায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকের প্রতি প্রভেদাত্মক ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া ইঁহারা মনে করেন।

ক। ইহাতে ক্ষুদ্র ব্যাংকের ক্ষতির সম্ভাবনা

দ্বিতীয়ত, পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া না দিয়া সহসা জমার অনুপাতবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে অনেক ব্যাংকের পতন ঘটিতে পারে। এইজন্য অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আইনে সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। উদাহরণস্বরূপ ফিলিপাইন ও গোয়াটেমালার (Guatemala) কেন্দ্রীয় ব্যাংক-আইনে এইরূপ ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ব্যাংকসমূহের জমা বা রিজার্ভের পরিমাণ ধীরে ধীরে ও গতিশীল হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ব্যাংকসমূহকে পূর্বাহ্নেই এই বৃদ্ধির পরিমাণ ও সময় জানাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধনী আইনে এই সময়োচিত সতর্কের ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই। ইহার ফলে সহসা ব্যাংক-ব্যবস্থায় বিশেষ বিশৃংখলা ঘটিতে পারে।

খ। ইহাতে অন্যান্য দেশের মত পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থা নাই

পরিশেষে ইহাও বলা যায় যে, ব্যাংক রিজার্ভের অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির—যথা, ব্যাংকের বাট্টাহার, খোলা বাজারে কারবার প্রভৃতির সহিত সতর্কভাবে সংহতিসাধন করিতে হইবে। অন্যথায় ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে বিশৃংখল হইয়া সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরাইতে পারে।

গ। ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সংহতিসাধন না করিয়াই এই ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে

যাহা হউক, ১৯৫৬ সালের সংশোধনের ফলে সমগ্র ঋণ-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে ব্যাপকতর হইয়াছে এবং ইহার ফলে ভারতে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত টাকাকড়ির (managed money) ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইয়াছে। অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির আশংকাযুক্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই নূতন অধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

নূতন সংশোধন সম্বন্ধে মোটামুটি অভিমত

রিজার্ভ ব্যাংকের নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিভিন্ন সংশোধনসহ ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইতে প্রাপ্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ বলিতে বুঝায় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা অর্থ-ব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ। ইহার উদ্দেশ্য হইল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণের সম্প্রসারণ এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণের নিয়ন্ত্রণ। রিজার্ভ ব্যাংক নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ১৯৫৬ সালের মধ্যভাগ হইতে। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইল খাদ্যশস্য ও কৃষিজ কাঁচামালের ফটকা কারবার (speculative holding) নিয়ন্ত্রণ করা। কয়েক ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবেও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছে—লাইসেন্সভুক্ত ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর ঋণপ্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকে ঋণ-বরাদ্দ (rationing of credit) বলিয়া অভিহিত করা যায়। যাহা হউক, মোটমুটিভাবে বলা যায় যে, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ এখন পর্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। ইহার অন্যতম কারণ হইল, টাকাকড়ির অসংগঠিত বাজার ইহার কর্তৃত্বাধীন নহে।

নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ (Control of the Banking System by the Reserve Bank) : এখন ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পূর্বে এই নিয়ন্ত্রণ ছিল অতি সংকীর্ণ। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন দ্বারা ইহাকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে। অবশ্য এই প্রসংগে ব্যাংক-ব্যবস্থা বলিতে টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজারের (European Money Market) ব্যাংকসমূহকেই বুঝায়। বর্তমানে এই সকল ব্যাংককে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে হয় অনুমোদন না হয় লাইসেন্স লইয়া ব্যবসা করিতে হয়।* রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে উহারা কোন শাখা স্থাপন, শাখা স্থানান্তরিতকরণ বা শাখা বন্ধ করিতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মতি ব্যতিরেকে দুই বা ততোধিক ব্যাংক-কোম্পানীর মধ্যে আবার সংযুক্তিসাধন করাও চলিতে পারে না।

ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যান্য দিক নিয়ন্ত্রণ

আবার তপশীলী ব্যাংকসমূহকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তাহাদের চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং মেয়াদী আমানতের শতকরা ২ ভাগ জমা রাখিতে হয়। তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে তাহাদের গৃহীত আমানতের অনুরূপ অনুপাত

* ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

হয় নগদ টাকায় রাখিতে হয়, না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংক যে-কোন ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালনার বিষয়ে তদন্ত করিতে পারে, নিয়োগ ও পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারে এবং প্রয়োজনবোধ করিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবসায় বন্ধ রাখিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাংকের এই কর্তৃত্বের আলোচনা ব্যাংক-পতন (bank failures) এবং ব্যাংক-আইন (bank legislation) প্রসংগে পরে আরও করা হইতেছে।

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, সম্প্রতি ইয়োরোপীয় টাকার বাজার ও ঋণ-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ব্যাপক হইয়া উঠিলেও টাকাকড়ির ভারতীয় বাজারের (Indian Money Market) সহিত ইহার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। ভারতীয় টাকার বাজারের প্রায় ৯০ ভাগ স্থানাধিকারী এই দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ রিজার্ভ ব্যাংকের আওতার বাহিরে থাকায় ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা কথনই সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে না। ফলে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত টাকাকড়িও (managed money) কখনও সার্থকতায় রূপায়িত হইতে পারে না।

রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ আংশিক মাত্র

রিজার্ভ ব্যাংকের ভূমিকার মূল্যায়ন (Evaluation or the Part played by the Reserve Bank) : রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। ইহার এই প্রায় ২৫ বৎসরের জীবনকাল হইল নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের (Worldwide Trade Depression) অব্যবহিত পরেই মুদ্রামানে দৃঢ়তা আনয়ন ও টাকার বাজারের সংহতিসাধনের দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া ইহা আবির্ভূত হয়। এই দায়িত্ব পালনের পক্ষে প্রয়োজনমত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আসিল মহত্তর বিশ্বযুদ্ধ, এবং রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত হইল অকল্পনীয় অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন-পদ্ধতিতে দেখা দিল অভাবনীয় মুদ্রাস্ফীতি। তাহার পর ঘটিল দেশবিভাগ এবং ঘটিতে লাগিল নিয়মিত প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। বলা যায়, প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের জন্যই করা হইল ভারতীয় মুদ্রার মানহ্রাস (Devaluation)। মুদ্রাস্ফীতির প্রথম যুগ হইতে মুদ্রামানহ্রাস পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংককে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইল যোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বনে। অপরদিকে আবার দায়িত্ব পড়িল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা কার্যকরকরণের জন্য অর্থ-সরবরাহের। বর্তমানে—অর্থাৎ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ে (second phase of planned economy) অর্থসরবরাহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে নূতনতর প্রতিবিধান অবলম্বনের দায়িত্ব।* সুতরাং প্রকৃতপক্ষেই রিজার্ভ ব্যাংকের নাতিদীর্ঘ জীবনকে দায়িত্বপূর্ণ ও সমস্যাবহুল বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

রিজার্ভ ব্যাংকের স্বল্পকালীন বৈচিত্র্যময় জীবন

উহার দায়িত্বপূর্ণ ও সমস্যাবহুল জীবন

উক্ত দায়িত্বসমূহ পালন ও সমস্যাসমূহের সমাধানে রিজার্ভ ব্যাংক কি পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, ইহা টাকার

* ১৩১ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী অধ্যায় দেখ।

বাজারে স্বল্পকালীন সুদের হারে সংকোচ-প্রসার বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের পূর্বে স্বল্পকালীন সুদের হার শতকরা ৭-৮ হইতে ১½-এর মধ্যে নামাউঠা করিত। বর্তমানে ইহা শতকরা ৫½ হইতে ৪-এর মধ্যে নামাউঠা করে। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক অর্থ স্থানান্তরিকরণের ব্যয়হ্রাসে বহু পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদের হারে অনেকটা সমতা আসিয়াছে। তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা অনেক সরকারী ঋণের (Public Debt) পরিচালনা বিশেষ সার্থক হইয়াছে। খোলা বাজারে কারবার পদ্ধতিতে ইহা সরকারী ঋণপত্রের বাজারের সুসংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থত, অতীতে না হইলেও বর্তমানে টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজারের উপর ইহার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্তত, এই বাজারে ইহার বাট্টাহার বিশেষ কার্যকর। বাট্টাহার, নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (selective credit control) এবং ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (১৯৫৬ সালের সংশোধনসহ) প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতাবলে ইহা ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাংক-ব্যবস্থায় দৃঢ়তা আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। পঞ্চমত, কৃষিঋণের ক্ষেত্রেও রিজার্ভ ব্যাংকের অবদান আছে। অতীতে ইহা নানাভাবে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করিয়াছে। সম্প্রতি আবার এই বিষয়ে ব্যাপকতর প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে। ষষ্ঠত, রিজার্ভ ব্যাংক শিল্পগত অর্থ করপোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ করপোরেশন, পুনঃঅর্থসরবরাহ করপোরেশন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়া শিল্পোদ্যোগেও ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই অর্থসরবরাহ করপোরেশনগুলিকে ইহা ঋণপ্রদানও করিতেছে। সপ্তমত, সরকারকে ইহা ঘাটতি ব্যয়জনিত বিরাট 'ঋণ'* সরবরাহ করিয়াও মূল্যস্তরকে আয়ত্তের বাইরে যাইতে দেয় নাই। পরিশেষে, ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক এক 'বিল বাজার পরিকল্পনা' (Bill Market Scheme) গ্রহণ করিয়া ইহাকে কার্যকর করিয়াছে। ইহার ফলে ভারতে বিলের বাজার কতকাংশে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার নিয়মিত গবেষণা চালাইয়া এবং গবেষণাকার্যের ফলাফল প্রচার করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে বলা যায়।

ব্যাংক দায়িত্বপালন ও সমস্যা সমাধানে কতটা সমর্থ হইয়াছে : সফলতার বিভিন্ন ক্ষেত্র

অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের বিরুদ্ধ সমালোচনাও না করিলে চলে না। প্রথম বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ বা টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার লইয়া। রিজার্ভ ব্যাংক এই ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে কর্তৃত্বাধীনে আনিতে পারে নাই; ফলে টাকাকড়ির ভারতীয় বাজার এবং ইয়োরোপীয় বাজারের মধ্যে সংহতিসাধনও সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ১৯৫২ সালের পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংক ভারতে বিল বাজার গঠনের কোন প্রচেষ্টা করে নাই। ফলে ইহা শিল্প-বাণিজ্যকে কাম্যভাবে অর্থসরবরাহ করিতে সমর্থ হয় নাই। তৃতীয়ত, ভারতের

ব্যর্থতার বিভিন্ন ক্ষেত্র

* ঘাটতি ব্যয়কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণও বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে অনেকাংশে দায়ী করা চলে। যুদ্ধের সময় ইহা সরকারী যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল, এবং সরকারী নির্দেশমত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া গিয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে রক্ষা করিতে বিশেষ প্রচেষ্টা করে নাই। অবশ্য ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে এই সকল বিনিময় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাতে ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থসরবরাহ এখনও বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের একরূপ একচেটিয়া অধিকার রহিয়া গিয়াছে। উপরন্তু, ইহারা অন্তর্বাণিজ্য, আমানত গ্রহণ প্রভৃতিতে উত্তরোত্তর অংশগ্রহণ করিতেছে। এমনকি নব-প্রবর্তিত বিল বাজারের পরিকল্পনাতেও বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকগুলির ভূমিকা ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির ভূমিকা হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে ব্যাপক ব্যাংক-পতনের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংক সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া যাইতে পারে না। ১৯৩৮ সালে ত্রিবাংকুর ন্যাশানাল এণ্ড কুইলন ব্যাংক (Travancore National and Quilon Bank) নামে একটি তপশীলভুক্ত ব্যাংক ফেল পড়িয়া দক্ষিণ ভারতের আমানতকারীদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করে। বলা হয়, রিজার্ভ ব্যাংক নিষ্ক্রিয় হইয়া না থাকিলে এই ব্যাংক ফেল পড়িত না। যাহা হউক, ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের ফলে বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংককে এই নিষ্ক্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া আমানতকারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও ব্যাংক-ব্যবস্থায় দৃঢ়তা আনয়নে সযত্ন হইতে হইয়াছে। পরিশেষে, রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ বিভাগের কিছু অবদান থাকিলেও ইহা এখনও পর্যন্ত কৃষি-ঋণ-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ভারতের সমবায় আন্দোলন যে ব্যর্থ হইয়াছে* তাহার জন্য আংশিকভাবে রিজার্ভ ব্যাংককেই দায়ী করা চলে। তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমাদের রিজার্ভ ব্যাংক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৃষি-ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। অবশ্য, বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক গ্রাম্য ঋণ-ব্যবস্থার সুসংগঠনে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়ভাবে ব্রতী হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অসফলতার বিষয় ধরিলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে রিজার্ভ ব্যাংক ইহার স্বল্পপ্রায় ২৫ বৎসরের জীবনকালের মধ্যে অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। যদি ইহাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশবিভাগ প্রভৃতি বিরাট প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা বহুগুণ অধিক সার্থকতায় রূপায়িত হইত। সুতরাং অন্তত অধ্যাপক জাথার ও বেরীর উক্তির প্রতিধ্বনি স্বচ্ছন্দেই করা চলে যে, "কার্যক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাংক আর্থিক স্থায়িত্ব, ব্যাংক-ব্যবস্থার সংস্কার,

---

* ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং ১৩শ অধ্যায় দেখ।

টাকার বাজারের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠন ব্যাপারে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।" উপরন্তু, ইহা অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজনীয় কার্যও সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্ণরের ভাষায়, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন উভয় প্রকার কার্যের এজেন্সী হিসাবেই ইহার ভূমিকা সার্থক হইয়াছে।*

ব্যাংক-পতন এবং ব্যাংক-আইন (Bank Failures and Bank Legislation): ভারতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পতনের হার অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯৪৯ সালে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস হইবার পূর্বে ব্যাংক্-পতন একরূপ সংক্রামকই ছিল। বর্তমানে ইহা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে সত্য কিন্তু এখনও অতীতের বস্তুতে পরিণত হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৮-৫৯ সালেই

ব্যাংক-পতনের পরিসংখ্যান

১৩টি ব্যাংকের পতন ঘটে।† প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে সুরু করিলে দেখা যায় ১৯১৩ সাল হইতে ১৯২৪ সালের মধ্যে ১৬১টি ব্যাংক ফেল পড়িয়াছিল ; ১৯৩৬-৪০ সালের মধ্যে ব্যাংকের পতনসংখ্যার বাৎসরিক গড় ছিল ৬৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন ১৯৪০ সাল হইতে পতন বেশ কিছুটা প্রশমিত হইয়াছিল ; কিন্তু যুদ্ধের পর ইহা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বাধিক ব্যাংকের পতন ঘটে পশ্চিমবংগ ও পাঞ্জাবে। পশ্চিমবংগে ব্যাংকের

কারণ : ক। আভ্যন্তরীণ এবং খ। অকল্পিত

পতনসংখ্যা ছিল ১৯৪৮ সালে ২০, ১৯৪৯ সালে ২৭ এবং ১৯৫১ সালে ৩৯। ইহার পরও পশ্চিমবংগে কয়েকটি ব্যাংকের পতন ঘটিয়াছিল। ভারতে অস্বাভাবিক ব্যাংক-পতনের কারণসমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (ক) আভ্যন্তরীণ কারণ (internal causes), এবং (খ) অকল্পিত কারণ (adventitious causes)।

আভ্যন্তরীণ কারণসমূহ যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির ত্রুটিপূর্ণ কার্যপরিচালনার মধ্যেই অল্পবিস্তর নিহিত। যৎসামান্য মূলধন লইয়া কার্যারম্ভ, লভ্যাংশ বিতরণে উৎসাহ কিন্তু

ক। আভ্যন্তরীণ কারণের ব্যাখ্যা

রিজার্ভ সংগঠনে অনাগ্রহ, অযথা শাখাপ্রশাখা বিস্তার, অযৌক্তিক-ভাবে ঋণপ্রদান ও বিনিয়োগ, অনভিজ্ঞ কর্মচারী লইয়া পরিচালনা, বে-আইনীভাবে হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির একরূপ বৈশিষ্ট্য হিসাবেই পরিগণিত হইয়াছে।** ইহাদের জন্য অনেক ব্যাংক সামান্য আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৩টি ব্যাংকেরই পতনের কারণ ছিল মূলত আভ্যন্তরীণ।

অকল্পিত কারণ বলিতে বুঝায় এমন ঘটনাবলীকে যাহাদের আশংকা মোটেই

খ। অকল্পিত কারণের ব্যাখ্যা

বা বিশেষ করা হয় নাই—উদাহরণস্বরূপ, দেশবিভাগ ও ১৯৪৬ সালে কলিকাতার শেয়ার বাজারের সংকটের উল্লেখ করা যাইতে

* Iengar—Some Reflections on our Domestic Economy.

† Report of the Central Board of Directors of the R. Bank for 1958-59.

** ১১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পারে। ইহাদের আশংকা স্বাভাবিক সময়ে করিতে পারা যায় নাই ; অথচ ইহাদের জন্য ছোট ছোট ব্যাংককে জীবন-সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

পশ্চিমবংগে ব্যাংক-পতনের কারণানুসন্ধান করিবার জন্য পশ্চিমবংগ সরকার একটি কমিটি (N. N. Law Committee) নিয়োগ করে। কমিটির রিপোর্টে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, অকল্পিত কারণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ পরিচালনাগত ত্রুটিই পশ্চিমবংগের সংক্রামক ব্যাংক-পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই অভিমত অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি বহু পূর্বেই প্রদান করিয়াছিল। ফলে প্রচেষ্টা চলিতেছিল একটি ব্যাংক-আইন প্রণয়নের। ১৯৪৯ সালে এই ব্যাংক-আইন বা ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পাস করা হয়। ১৯৫৬ সালে এবং আরও দুইবার আইনটির সংশোধন দ্বারা ইহার কর্তৃত্ব ব্যাপকতর করা হইয়াছে।

ব্যাংক-আইন (Bank Legislation) : কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাংক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা করা হয় ১৯৩৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act, 1936) সংশোধন করিয়া। এই সংশোধনে ব্যাংকিং বা ব্যাংক-ব্যবসায়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয় এবং এই ধারা নিবদ্ধ করা হয় যে, ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি শুধু ব্যাংক-ব্যবসায়েই লিপ্ত থাকিবে। আইনে ব্যাংকিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ইহা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল—যথা, অন্তত ৫০ হাজার টাকার আদায়ীকৃত মূলধন (paid-up capital) লইয়া ব্যাংককে কার্যারম্ভ করিতে হইবে ; তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকে তাহাদের লাভের শতকরা ২০ ভাগ রিজার্ভ হিসাবে রাখিতে হইবে ; এই শ্রেণীর ব্যাংকগুলিকে আবার তাহাদের চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ১.৫ ভাগ নগদ টাকায় রাখিতে হইবে ; ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা : ১। ১৯৩৬ সালে কোম্পানী আইনের ধারা নিবদ্ধকরণ

অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল যে, ভারতীয় কোম্পানী আইনের উক্ত ধারাগুলি পর্যাপ্ত ও কার্যকর নহে। ফলে প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল এক ব্যাপক ব্যাংক-আইন প্রণয়নের। কিন্তু যুদ্ধের দরুন এ-প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। ১৯৪২-৪৩ সালে কতকগুলি নবসৃষ্ট ব্যাংকের বে-আইনী কার্যাবলীর ফলে ভারতীয় কোম্পানী আইনের পুনরায় সংশোধন করিতে হইল। এই সংশোধনে ব্যাংকের শেয়ার বিলি, পরিচালক নিয়োগ ও মূলধন সম্বন্ধে কয়েকটি বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। অবশেষে ১৯৪৪ সালে একটি ব্যাপক ব্যাংকিং বিল পার্লামেণ্টে আনয়ন করা হয়। নানা বাধাবিপত্তির পর ইহা ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাস এবং মার্চ মাসের ১৬ই তারিখ হইতে কার্যকর হয়।

২। ১৯৪২-৪৩ সালে পুনরায় সংশোধন

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) : ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইল ব্যাংক-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যাপকতম বিধি। ইহাতে এই বিষয় সংক্রান্ত সকল আইন ও অর্ডিন্যান্স—যথা, কোম্পানী আইনের ধারা, ১৯৪৬

৩। ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন

সালের ব্যাংকিং কোম্পানী (পরিদর্শন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪৮ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

১। ব্যাংকিং কোম্পানীর সংজ্ঞা

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের প্রথমেই ব্যাংকিং কোম্পানী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য 'ব্যাংকিং' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ঋণপ্রদান বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট হইতে আমানতগ্রহণই 'ব্যাংকিং' বলিয়া অভিহিত। যে-প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং-এর কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহাই 'ব্যাংকিং কোম্পানী।'

২। লাইসেন্স

কয়েকটি অনুমোদিত ব্যাংক (Certain Approved Banks) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইবে। এইভাবে অনুমোদিত অথবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত না হইলে কোন প্রতিষ্ঠান 'ব্যাংক', 'ব্যাংকার' অথবা 'ব্যাংকিং' শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৩। ব্যবসায়

তারপর আছে ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যবসা করিতে পারিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে পারিবে না সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থা। যথা, ইহারা ঋণগ্রহণ করিতে পারিবে, হুণ্ডি লইয়া কারবার করিতে পারিবে, এজেন্সীর কার্য করিতে পারিবে কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যক্ষ ব্যবসায় (direct trading) করিতে পারিবে না, ইত্যাদি।

৪। পরিচালনা

ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি সুস্পষ্ট বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে—যথা, ব্যাংকিং কোম্পানীকে ম্যানেজিং এজেন্সীর হস্তে দেওয়া চলিবে না, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ব্যাংকের পরিচালক অথবা চাকুরিয়া দ্বারা পরিচালিত হইবে না, ইত্যাদি।

৫। মূলধন

প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীর পক্ষে অন্যূন ৫০ হাজার টাকার মূলধন থাকিতে হইবে। কোন ব্যাংক যদি ভারতের বাহিরে সংঘবদ্ধ (incorporated) হয় তবে ইহার পক্ষে মোট ভারতে আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ অন্তত ১৫ লক্ষ টাকা হইতে হইবে। এইরূপ ব্যাংকের আবার কলিকাতা বা বোম্বাই নগরে শাখা থাকিলে মোট মূলধনের পরিমাণ হইবে ২০ লক্ষ টাকা। ভারতে সংঘবদ্ধ ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির মূলধনের নিম্নতম মাত্রা সম্বন্ধেও নির্দেশ দেওয়া আছে। পরপৃষ্ঠার ছকটি হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাংকের মূলধনের নিম্নতন মাত্রা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

প্রত্যেক ব্যাংকের বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুমোদিত মূলধনের অন্তত অর্ধেক হইবে; এবং আদায়ীকৃত মূলধন বিলিকৃত মূলধনের অর্ধেক হইবে।

৬। রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা

প্রত্যেক তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তাহার চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ এবং স্থায়ী আমানতের শতকরা ২ ভাগ জমা রাখিতে হইবে।* তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংকগুলিকেও

* ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংক সংশোধন আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক এই জমার হার যথাক্রমে শতকরা ২০ ভাগ ও ৮ ভাগে বর্ধিত করিতে পারে।...১৩১-৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

তাহাদের আমানতের অনুরূপ অংশ হয় নগদে না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।

ব্যাংকিং কোম্পানীর ধরন	আদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভের ন্যূনতম পরিমাণ
(১) ভারতের বাহিরে সংঘবদ্ধ ব্যাংক	১৫-২০ লক্ষ টাকা (কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে শাখা থাকিলে ২০ লক্ষ টাকা, নচেৎ ১৫ লক্ষ টাকা)
(২) কলিকাতা বা বোম্বাই শহর সমেত একাধিক রাজ্যে শাখাসমন্বিত ব্যাংক	১০ লক্ষ টাকা
(৩) কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে একটি করিয়া শাখা সমেত পশ্চিমবংগ অথবা বোম্বাই রাজ্যে (একাধিক রাজ্যে নহে) সকল শাখাসমন্বিত ব্যাংক	৫ লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা বা বোম্বাই শহরের বাহিরে প্রতিটি শাখার জন্য ২৫ হাজার টাকা করিয়া
(৪) কলিকাতা বা বোম্বাই শহর ছাড়া একাধিক রাজ্যে শাখাসমন্বিত ব্যাংক	৫ লক্ষ টাকা
(৫) একই রাজ্যে সকল শাখা-সমন্বিত কিন্তু কলিকাতা বা বোম্বাই-এ শাখা নাই এইরূপ ব্যাংক	১ লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা (রাজ্যের বিভিন্ন জিলায় শাখা থাকিলে ১ লক্ষের উপর ৩৫ হাজার টাকা)

প্রত্যেক ব্যাংককে দিনের শেষে তাহার চলতি স্থায়ী আমানতের অন্তত শতকরা ২০ ভাগ নগদ টাকায়, স্বর্ণে ও অনুমোদিত ঋণপত্রে নিজের কাছে রাখিতে হইবে। অন্যদিকে ভারতে গৃহীত আমানতের তিন-চতুর্থাংশ ভারতেই রাখিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত ব্যাংকিং কোম্পানীগুলি ব্যাংকিং-এর আনুষংগিক কার্য ছাড়া কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারিবে না।

৭। রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা

তারপর আছে রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারাবলী। এই সকল ধারায় রিজার্ভ ব্যাংককে ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মূল আইনের ৫৫টি ধারার মধ্যে ২৭টি ছিল রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বের সহিত সম্পর্কিত। এই সকল ধারার বলে রিজার্ভ ব্যাংক জরুরী অবস্থায় ব্যাংকিং কোম্পানী আইন সাময়িকভাবে স্থগিত

রাখিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারে, কোন ব্যাংককে মূলধন সংক্রান্ত বাধানিষেধ হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিতে পারে। কোন ব্যাংকের কার্য-পরিচালনা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া উহার ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করিতে পারে, ইত্যাদি। অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত নূতন শাখা স্থাপন বা কার্যালয় স্থানান্তরিতকরণ করা চলে না, বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সংযুক্তিসাধন করা চলে না, ব্যাংকিং-এর আনুষংগিক ছাড়া অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করা যায় না। প্রত্যেক ব্যাংককে নিয়মিতভাবে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হিসাব-নিকাশ ও রিপোর্ট দাখিল করিতে হয়। হিসাব-নিকাশ ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে রিজার্ভ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং কোম্পানীকে সতর্ক করিয়া দিতে পারে—এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করিয়া ব্যাংকের আমানত গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাংকিং কোম্পানীগুলির ঋণপ্রদান নীতিকে বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ।

৮। ব্যাংক বন্ধকরণ

পরিশেষে, ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে আদালতের আদেশক্রমে ব্যবসায় স্থগিত রাখা, ব্যাংক উঠাইয়া দেওয়া বা বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সংযুক্তি-সাধন সম্বন্ধে কতকগুলি ধারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। আদালতকে এই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংকের মতামত গ্রহণ করিতে হয়।

ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সংশোধন

১৯৫০, ১৯৫৩, ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে মোট এই চারিবার ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সংশোধন করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের সংশোধন দ্বারা সংযুক্তিসাধনের পদ্ধতির মধ্যে সরলতা আনয়ন করা হয়। ইহার দ্বারা আদালতের মাধ্যম ব্যতিরেকেও সংযুক্তিসাধন সম্ভব করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বা ১৯৫৩ সালের সংশোধন দ্বারা দেউলিয়া-পদ্ধতিকে সরল করা হইয়াছে। দেউলিয়া হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ আদায়কার্য এখন অনেক সরল ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যায়। তৃতীয় বা ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের সংশোধন :

১। ভোটাধিকারের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন পরিচালনায় কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেওয়াতেই ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইন [Banking Companies (Amendment) Act, 1956] পাস করা হয়। এই সংশোধনী আইন কার্যকর হয় ১৯৫৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী হইতে। এই সংশোধন দ্বারা কয়েকজনের হস্তে শেয়ার কেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে পূর্বে ভোটাধিকারের যে-অপব্যবহার করা হইত তাহা রহিত করা হইয়াছে। পূর্বে ১৯৩৭ সালের ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকসমূহের ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাংকের ছিল না। উপরি-উক্ত সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাংককে সেই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মূল আইনে ব্যবস্থা ছিল যে একই ব্যক্তি একাধিক ব্যাংকিং কোম্পানীর পরিচালক হইতে পারিবে না। ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা ইহার উপরেও এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, কয়েকটি

বা কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যদি কোন ব্যাংকের শতকরা ২০ ভাগ ভোটদানে অধিকারী হয় তবে ঐ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে ঐ ব্যাংকের পরিচালক নিযুক্ত করা চলিবে না, এবং কোন ব্যাংকের মুখ্য পরিচালক (Managing Director) অথবা মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive Officer) নিযুক্ত করিবার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বানুমতি লইতে হইবে। সংশোধনী আইনে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত ব্যবস্থাও আছে। অত্যধিক বলিয়া মনে করিলে রিজার্ভ ব্যাংক ঐ পারিশ্রমিক প্রদান রহিত করিতে বা কমাইয়া দিতে পারে।

২। নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নিয়ন্ত্রণ

রিজার্ভ ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকিং কোম্পানীর কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া রিপোর্ট প্রকাশের জন্য নিরীক্ষক (Observers) নিয়োগের কোন ব্যবস্থা মূল ব্যাংকিং কোম্পানী আইনে ছিল না। ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা সে-ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। নিরীক্ষকের রিপোর্টের ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাংক লাইসেন্সভুক্ত যে-কোন ব্যাংককে পরিচালনায় পরিবর্তন সংঘটিত করিতে নির্দেশ দিতে পারে। ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংক জাতীয় অথবা ব্যাংকগুলির স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে পরিচালনা বা নীতি সংক্রান্ত যে-কোন ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে।

৩। নিরীক্ষণের ব্যবস্থা

৪। ১৯৫৯ সালের সংশোধন

১৯৫৯ সালের সংশোধন দ্বারা লাইসেন্স-বাতিলের ধারাকে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাংকের সুপারিশক্রমে আদালত কর্তৃক ব্যাংক বন্ধ করার ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ততর করা হইয়াছে।

সমালোচনা : ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সমালোচনা সাধারণত দুই দিক দিয়া করা হইয়াছে। প্রথমত, অনেকের মতে, রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তে যে-ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহা অযৌক্তিক। ইহার অপব্যবহার ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার ফলে দেশে ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগ ব্যাহত হইবে। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংকের হস্তে উক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যখন যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির প্রধানত আভ্যন্তরীণ পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য পতন ঘটিতেছিল এবং যখন ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর লোক বিশ্বাস ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছিল তখন রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বভাবতই ব্যাংক-ব্যবস্থার সতর্ক প্রহরী (watchdog of the banking system) হিসাবে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইহাও বলা হয় যে, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাংক তাহার ক্ষমতার অপব্যবহার মোটেই করে নাই ; বরং অনেক ক্ষেত্রে উহা ব্যাংকিং কোম্পানীগুলিকে আইনের কঠিন সর্তাবলীর দায় হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিয়া পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে।

১। রিজার্ভ ব্যাংককে অযৌক্তিকভাবে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে

দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়াও সমালোচনা করা হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভারতে টাকাকড়ির

ভারতীয় বাজার ও ইয়োরোপীয় বাজারের মধ্যে সংগতিসাধন না করিয়া দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের আওতায় আনিলে আইনকেই কার্যকর করা দুষ্কর হইত। ফলে সমগ্র টাকার বাজারেই বিশৃংখলা দেখা দিত। সুতরাং অযৌক্তিক কিছু করা হয় নাই; অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে বলিতে পারা যায়, ব্যাংকিং কোম্পানী আইন হইল অন্যতম সুপরিকল্পিত বিধি; ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

২। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই

বিল বাজার পরিকল্পনা (The Bill Market Scheme): একটি সুসংগঠিত বিল বাজারের অভাব ভারতের টাকার বাজারের অন্যতম দুর্বলতা বলিয়া গণ্য। ইহার জন্য ব্যাংকসমূহ তাহাদের স্বল্পকালীন বিনিয়োয্য অর্থ ঠিকমত বিনিয়োগ করিতে পারিত না; এবং ইহার ফলে দেশের ঋণ-ব্যবস্থা কাম্যভাবে সংকোচন-প্রসারণশীল হইয়া উঠে নাই। সুতরাং কৃষিপ্রধান ভারতে দেখা যাইত কৃষিকার্যের সময়ে ঋণ সরবরাহের অপ্রাচুর্য এবং বাকী সময়ে বহু পরিমাণ অলস অর্থ।

বিল বাজারের গুরুত্ব

ভারতে বিল বাজার না গড়িয়া উঠার কারণানুসন্ধানে বেশীদূর যাইতে হয় না। এদেশে নগদ টাকা এবং ওভারড্রাফটের (overdrafts) মাধ্যমেই ঋণপ্রদানের দিকে অধিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ হুণ্ডির কারবার করে বটে, কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি সামান্য এবং প্রকৃতি বিশেষভাবে আঞ্চলিক। বিভিন্ন অঞ্চলে হুণ্ডির বাট্টা, সময় প্রভৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে। ফলে যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের পক্ষে ইহাদের পুনর্বাট্টা করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়। উপরন্তু, ভারতে কোন 'গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান'ও (Accepting Houses) নাই। ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে তাহাদের মূলধন ও গৃহীত আমানতের একটা মোটা অংশকে নগদ (liquid) অবস্থায় রাখিতে হয়। ফলে তাহারা প্রধানত সরকারী ঋণপত্রেই বিনিয়োগ করে। পরিশেষে, ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে ভারতে বিল বাজার গঠনের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

বিল বাজার গড়িয়া না উঠার কারণ

রিজার্ভ ব্যাংকের পরিকল্পনা (The Reserve Bank Scheme): ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাংকের বাট্টাহার শতকরা ৩ হইতে ৩½-এ বৃদ্ধির সংগে সংগেই রিজার্ভ ব্যাংক ঘোষণা করে যে উহা আর তপশীলী ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে সরাসরি ঋণপত্র ক্রয় করিবে না, ঋণপত্রের জামিনে উহাদিগকে ঋণপ্রদান করিবে মাত্র। রিজার্ভ ব্যাংকের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে ঋণ-ব্যবস্থা বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়া পড়ার আশংকা থাকায় রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে একটি বিল বাজার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইহা হইল বিল বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতে ঋণ-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের একটি প্রধান ত্রুটি দূর করা।

১৯৫২ সালের মূল পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এইভাবে করা যাইতে পারে: ইহার অধীনে তপশীলী ব্যাংকসমূহ তাহাদের খাতকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত চলতি প্রতিশ্রুতিপত্রের (demand promissory notes) একাংশকে ৯০ দিনের মধ্যে দেয় প্রতিশ্রুতিপত্রে (usance promissory notes) রূপান্তরিত করিতে পারিত। তারপর তাহারা তাহাদের নিজেদের প্রতিশ্রুতিপত্র এবং ইহার সমর্থনে ঐ রূপান্তরিত প্রতিশ্রুতিপত্র জামিন রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ব্যাংক বাট্টাহার অপেক্ষা শতকরা ½ কমে—অর্থাৎ শতকরা ৩ টাকা সুদে (তখন বাট্টাহার ছিল শতকরা ৩½ টাকা) স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করিতে পারিত। রিজার্ভ ব্যাংক আইনের ১৭ (৪) (গ) ধারা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক তপশীলী ও সমবায় ব্যাংকগুলিকে এইরূপ ঋণপ্রদান করিতে সমর্থ ছিল। অন্যভাবে বলিতে গেলে, উক্ত বিল বাজার পরিকল্পনার অধীনে বিল জামিন রাখিয়া তপশীলী ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিত, বিল পুনর্বাটা (rediscount) করিতে পারিত না। *

মূল পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রথমে এই বিল বাজার পরিকল্পনার সুবিধা সকল ব্যাংককে দেওয়া হয় নাই। যে-সকল ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ অন্তত ১০ কোটি টাকা মাত্র তাহারাই এই পরিকল্পনাধীনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারিত। আবার ২৫ লক্ষ টাকার কম ঋণগ্রহণ করা চলিত না, এবং প্রত্যেক বিলের অর্থের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার কম হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৫৪ সাল হইতে কিন্তু পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা সকল তপশীলী ব্যাংককেই দেওয়া হইতেছে।** এই সালেই শ্রোফ্ কমিটি সুপারিশ করে যে, ন্যূনতম ঋণগ্রহণের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ১০ লক্ষ টাকায় লইয়া আসিতে হইবে এবং বিলপ্রতি ন্যূনতম অর্থের পরিমাণ হইবে ৫০ হাজার টাকা—১ লক্ষ টাকা নহে। কমিটির এই সুপারিশ গৃহীত হয়, এবং ফলে, বিল বাজার পরিকল্পনা পূর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

পরিকল্পনার প্রসার

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে বিলের বিরুদ্ধে রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণপ্রদানের সুদের হার ৩ টাকা হইতে বাড়াইয়া ৩½ টাকাই করা হয়। ইহার উপর শতকরা ½ হারে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইত বলিয়া কার্যক্ষেত্রে বিল পরিকল্পনার অধীনে সুদের হার শতকরা ৪ হইয়া উঠে। এই কারণে প্রথমে সরকারী ঋণ-পত্রের বিরুদ্ধে ঋণগ্রহণের সুদের হার শতকরা ৪ এবং পরে ১৯৫৭ সালের মে মাসে ব্যাংকের বাট্টাহারও শতকরা ৪-এ লইয়া যাওয়া যায়।† তবুও বিল পরিকল্পনার অধীনে সুদের হার ও বাট্টাহারের মধ্যে সমতা আসে নাই। কারণ,

পরিকল্পনার পরিবর্তন

---

* Reserve Bank—Functions and Working-এর ৩৪ পৃষ্ঠা

** Bill Market Scheme in Operation—Reserve Bank Bulletin, May 1958.

† ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

বিলের ক্ষেত্রে শতকরা '২ হারে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় এবং ফলে কার্যক্ষেত্রে সুদের হার হইয়া দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪'২।

রপ্তানি বিলের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রসার

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ১ বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে রপ্তানি বিল-সমূহকেও (export bills) এই পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন করা হয়। তপশীলী ব্যাংকগুলি ছাড়া অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা-ব্যবসায়ীরাও (authorised foreign exchange dealers) ইহার সুবিধাভোগ করিতে সমর্থ হয়।*

১৯৫২ সালে বিল বাজার পরিকল্পনাধীনে তপশীলী ব্যাংকসমূহের ঋণগ্রহণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮১ কোটি টাকা। ১৯৫৫ সালে ইহা বাড়িয়া ২২৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস হইতে পরিকল্পনার পরিবর্তন এবং ঋণ-নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণের ফলে বিলের বিরুদ্ধে ঋণগ্রহণের পরিমাণ কমিয়া আসে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে রপ্তানি বিলে পরিকল্পনা প্রসারিত হওয়ার পর হইতে ঋণগ্রহণের পরিমাণ আবার কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমালোচনা

বিল বাজার পরিকল্পনার সমালোচনা বিভিন্ন দিক হইতে করা হইয়াছে। প্রথমত দেখা গিয়াছে যে, প্রকৃত বাণিজ্যিক বিলের পরিবর্তে রূপান্তরিত প্রতিশ্রুতিপত্রের বিরুদ্ধে ঋণপ্রদান করা হয় বলিয়া এই বিল বাজার প্রকৃত বিল বাজার নহে। দ্বিতীয়ত, ইহাতে দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এই ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ পরিকল্পনার বাহিরে থাকিলে পরিকল্পনা কখনও সার্থক হইতে পারে না। তৃতীয়ত, ঋণপ্রদান করিবার সময় রিজার্ভ ব্যাংক নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করে, যাহা ব্যাংকগুলি সকল সময় পছন্দ করে না। অনুসন্ধানের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে রিজার্ভ ব্যাংক ঋণপ্রদানে অস্বীকারও করে। ফলে, কার্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংকের প্রতি রিজার্ভ ব্যাংকের প্রভেদাত্মক আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

যাহা হউক, সূচনা যে শুভ হইয়াছে এবং পরিকল্পনা যে ক্রমশ সম্প্রসারিত হইতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমানে ৫০-এর উপর তপশীলী ব্যাংক এবং কয়েকটি অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা-ব্যবসায়ী এই পরিকল্পনাধীনে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণগ্রহন করিতেছে এবং ঋণের সংকোচন সত্ত্বেও শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ইহা হইতে অর্থসাহায্য পাইতেছে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার (Development of Banking in Rural Areas) ঃ ভারত গ্রামময় হইলেও, ভারতের শতকরা ৮৩ জন লোক গ্রামে বাস করিলেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার এখনও ঘটে নাই। ইহা ভারতের টাকার বাজারের অন্যতম দুর্বলতা। ভারতের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের শাখার সন্ধান একরূপ মিলে না বলিলেই চলে। ১৯৪৯ সালের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্তকারী কমিটির (Rural

* Report on Currency and Finance for 1958-59-এর ৩৪ পৃষ্ঠা।

Banking Enquiry Committee) রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতে ৫০০-এর মত জিলা বা তালুকের সদরে যৌথ পুঁজি ব্যাংকের কোন কার্যালয় ছিল না। গ্রামাঞ্চলে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের সংখ্যা যে নগণ্য এবং সমবায়-ঋণদান সমিতির সংখ্যাও যে পর্যাপ্ত নহে, কমিটি রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ করে। অপরদিকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, গ্রাম্য মহাজনগণ মোট গ্রাম্য ঋণের শতকরা ৭০ ভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। গ্রাম্য মহাজনের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে সে-সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।*

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা কতদূর প্রসারিত

নানা দিক দিয়া গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথমত, কৃষি ভারতের প্রধানতম উপজীবিকা, অথচ অন্যান্যের মধ্যে মূলধনের সমস্যার জন্য কৃষি মাত্র অস্তিত্ব বজায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া আছে। কৃষিকার্যে ও কৃষিজ পণ্যের বাজারিকরণে পর্যাপ্ত মূলধন যোগান দেওয়া কৃষির উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য সর্ত। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের স্বভাব গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। তাহা না হইলে দেশের আর্থিক উন্নয়নে প্রয়োজন মত অর্থ পাওয়া যাইবে না। তৃতীয়ত, নগরাঞ্চলের তুলনায় বর্তমানে গ্রামাঞ্চলের আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধন না ঘটিলে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে সঞ্চয়সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়াই যাইবে; এবং স্বভাবতই আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হইবে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রসার-সাধনে গুরুত্ব

এইভাবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৯ সালের শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া ইহার উপর গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দেয়। এই কমিটি উপরি-উক্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্তকারী কমিটি। ইহার পূর্বেই অবশ্য গ্যাড্‌গিল কমিটি (Gadgil Committee on Rural Finance), সারাইয়া কমিটি (Saraiya Committee on Co-operative Planning) প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করিয়াছিল। এই সকল কমিটির মূল সুপারিশগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল:

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থা তদন্তকারী কমিটি

এই ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধনে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ

(ক) গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু ব্যাংকিং-এর সাধারণ সুযোগ-সুবিধাই প্রদান করিবে না; ইহাকে কৃষির ক্ষেত্রেও অর্থ-সরবরাহ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কতিপয় অঞ্চলে কৃষি-ঋণ করপোরেশন (Agricultural Credit Corporations) স্থাপন করা যাইতে পারে।

* ১ম খণ্ডের (৪র্থ সংস্করণ) ১৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) নূতন শাখা উদ্বোধন, চেক-পদ্ধতির প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অনেক স্থলে ভ্রাম্যমাণ সেভিংস ব্যাংকেরও প্রচলন করা যাইতে পারে।

(গ) ধীরে ধীরে বর্তমান ট্রেজারী-ব্যবস্থার (treasury system) বিলোপসাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানে সরকারী ট্রেজারীর মাধ্যমে যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের ভার ক্রমবর্ধমান হারে রিজার্ভ ব্যাংক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের শাখাগুলির উপর অর্পণ করিতে হইবে। ইহার ফলে নগদ টাকা লইয়া কারবার কমিয়া যাইবে এবং চেকের প্রচলন বৃদ্ধি পাইবে।

(ঘ) সরকারের পক্ষে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(ঙ) ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে বিভিন্ন স্থানে নূতন ২০০-র মত শাখা স্থাপন করিতে হইবে। এই শাখা স্থাপনের জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে পূর্বাপেক্ষা কিছু অধিক হারে এজেন্সী-পারিশ্রমিক প্রদান করিবে।

উপরি-উক্ত পন্থাসকল বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই

উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি মোটামুটি কার্যকর করা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে নাই। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপনের জন্য কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু এ-বিষয়ে তাহাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। মূলত ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণের স্বল্পতা, সহজ বিক্রয়যোগ্য জামিনপত্রের অভাব এবং কৃষি-ঋণে অধিকতর ঝুঁকির জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পক্ষে ছোট ছোট শহরে শাখাস্থাপন লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।* ফলে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে যাহা অংশীদারগণের নিকট দায়িত্ব অপেক্ষা দেশের বৃহত্তম স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই পথে অগ্রসর হইবে। সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটি বলিল যে, এই প্রতিষ্ঠান হইবে রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক।

নূতন পন্থার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। অন্যান্যের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্য হইল টাকাকড়ি স্থানান্তরিকরণের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা (extended remittance facilities) প্রদান করা। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তপশীলী ও রাজ্য সমবায় ব্যাংকগুলি (State Co-operative Banks) রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে সপ্তাহে একবার করিয়া অনধিক ৫,০০০ টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারিত। কিন্তু ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাস হইতে তপশীলী ও সমবায় ব্যাংকগুলিকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া এই সুযোগ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক নূতন ব্যবস্থার কেন্দ্র

* Report on Currency and Finance for the Year 1954-55-এর ৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

সর্ব-ভারতীয় গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির স্থপারিশ অনুসারে 'গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনা'র জন্য অন্যতম অংগ হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংককে দুইটি জাতীয় তহবিল—যথা, জাতীয় কৃষি-ঋণ-ব্যবস্থা (দীর্ঘকালীন কার্য) তহবিল [The National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund] এবং জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] স্থষ্টি করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ১০ কোটি টাকা প্রাথমিক মূলধন লইয়া ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্থাপিত হয়। রিজার্ভ ব্যাংক প্রতি বৎসর ৫ কোটি টাকা হিসাবে এই তহবিলে জমা রাখিতেছে। কৃষি-ঋণদান সমিতি, কেন্দ্রীয় ও জমিবন্ধকী সমবায় ব্যাংকগুলির শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য তহবিলটি হইতে রাজ্য সরকারসমূহকে ঋণ-প্রদান করা হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫ কোটি টাকা হইবে। ১৯৫৮ সালের মধ্যভাগেই ইহার পরিমাণ ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

দুইটি তহবিল

জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিলও স্থাপিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে অর্থপ্রদান করিয়া রিজার্ভ ব্যাংক অজন্মা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় স্বল্পমেয়াদী ঋণকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পরিণত করিতে পারে। ১৯৫৮ সালের শেষ পর্যন্ত এই তহবিলের পরিমাণ ৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।*

এইভাবে গ্রামাঞ্চলের ঋণ-ব্যবস্থার পূর্ণাংগ পরিকল্পনার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসারসাধন করা হইবে। এই প্রসারসাধনকার্যে কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক।

ভারতীয় টাকার বাজারের ত্রুটি ও অভাবের সংক্ষিপ্তসার (Summary of the Defects and Deficiencies of the Indian Money Market) : ভারতের টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশদ আলোচনার পর এখন ইহার ত্রুটি ও অভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাইতে পারে :

প্রথমত, ভারতের টাকার বাজার সমজাতীয় উপাদানে গঠিত নয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহ, ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহ, দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্যের অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ফলে ইহাদের সমবায়ে এক স্থসংগঠিত টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও সম্ভব হয় নাই।

১। ভিন্ন জাতীয় আংগিক উপাদান

দ্বিতীয়ত, ভারতের ব্যাংক ও ঋণ-ব্যবস্থা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। ভারতে প্রায় ১ লক্ষ লোক পিছু ১·৫টি করিয়া ব্যাংক-কার্যালয় ও ঋণ-প্রতিষ্ঠান আছে। ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই পরিমাণ হইল যথাক্রমে ২৩ এবং ৪৫।

২। ব্যাংক ও ঋণ-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নহে

* ১ম খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠা দেখ।

তৃতীয়ত, মাথা পিছু যে ব্যাংক ও ঋণ-প্রতিষ্ঠান আছে তাহাও গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত নহে। বস্তুত, ভারতের গ্রামাঞ্চল এখনও একরূপ ব্যাংকিং-এর সুযোগ-সুবিধাবিহীন।

৩। গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার বিশেষ প্রভাব

চতুর্থত, সুদের হারে বিশৃংখলা (chaos in money rates) ভারতের টাকার বাজারের আর এক ত্রুটি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্তকারী কমিটি দেখিয়াছিল সুদের হার শতকরা ৪ টাকা হইতে শতকরা ১৫ টাকার মধ্যে উঠানামা করে। সেদিন পর্যন্ত তপশীলী ব্যাংকগুলির গৃহীত আমানতের উপর প্রদত্ত সুদের হারেও বিশেষ তারতম্য ছিল। ১৯৫৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আন্তঃব্যাংক চুক্তির (Inter-bank agreement) ফলে সুদের এই হারে কতকটা সমতা আসিয়াছে।*

৪। সুদের হারে বিশৃংখলা

পঞ্চমত, বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের অস্তিত্বকে ভারতীয় টাকার বাজার ও ব্যাংক-ব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকের কতকটা নিয়ন্ত্রণে; ইহারা ভারতীয় যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলির সম্প্রসারণের পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক রহিয়া গিয়াছে।

২। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকসমূহের অস্তিত্ব

ষষ্ঠত, বিল বাজার সুসংগঠিত না হওয়ার দরুন অন্যান্যের মধ্যে প্রয়োজনের সময় টাকার অভাব বিশেষ অনুভূত হয়, এবং অন্য সময় টাকা অলস অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

৬। বিলের বাজার সুসংগঠিত নয়

সপ্তমত, ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার পরিবর্তে নিজের কাছে মূল্যবান ধাতু জমাইয়া রাখাই ভারতীয়গণের স্বভাব বলা চলে। রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে আন্তর্জাতিক মূল্যে (international price) ভারতে ব্যক্তিগত সঞ্চিত স্বর্ণের মূল্য ১,৭৫০ কোটি টাকা হইবে।** এইজন্য ভারতকে মূল্যবান ধাতুর অতলগর্ভ গহ্বর (bottomless sink of precious metals) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে আমানতের পরিমাণ কাম্যভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না; এবং স্বভাবতই ব্যাংক-ব্যবস্থা ও আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৭। মূল্যবান ধাতু জমানর স্বভাব

পরিশেষে, ভারতীয় টাকার বাজারের বিশেষ প্রকৃতির জন্য ইহার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বও ব্যাপক ও সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। সম্প্রতি অবশ্য এইদিকে গঠনকার্য চলিতেছে।

৮। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত নহে।

---

* ১১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

** বর্তমানে স্বর্ণের আন্তর্জাতিক মূল্য হইল প্রতি তোলা ৬২'৫০ টাকা; কিন্তু ভারতে প্রতি তোলা স্বর্ণ ১০০-১১০ টাকার মধ্যে বিক্রয় হয়। ভারতীয় মূল্যে হিসাব করিলে উক্ত ১,৭৫০ কোটি টাকা ৩,০৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the characteristics of the Indian Money Market and point out its defects and deficiencies. (C. U. B. A. 1948 ; B. Com. 1945, '47)

[প্রথম অংশের উত্তরের ইংগিত : ভারতের টাকার বাজার টাকাকড়ির ইয়োরোপীয় বাজার ও ভারতীয় বাজার—এই দুই অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশের ন্যায় টাকার বাজার এক স্থলে কেন্দ্রীভূত নহে। ভারতে টাকাকড়ির বাজারে দুইটি জাতীয় বাজার এবং কয়েকটি আঞ্চলিক বাজার আছে। ...১০৮-১১০ এবং ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা]

2. What are the principal constituents of the Indian Money Market? Briefly describe the functions. (C. U. B. Com. 1951) [১০৯-১১০ পৃষ্ঠা]

3. Describe the main features of the Indian Banking System. (C.U. B. Com. 1947)

[ইংগিত : ভারতের টাকার বাজারের আংগিক উপাদানগুলির বর্ণনা এবং দোষত্রুটি ও অভাবের উল্লেখ করিতে হইবে। ...১০৯-১১০ এবং ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা]

4. What is the role of the Indigenous Bankers in the Indian Money Market? Indicate the need and suggest measures for regulating this system of Banking. [১১০-১১২ পৃষ্ঠা]

5. What are the main defects of Joint Stock Banking in India? How far have they been sought to be removed by legislation in recent years? (C. U. B. A. 1950 ; B. Com. 1951)

[ইংগিত : প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (সংশোধনী আইনসমূহ সহ) দ্বারা যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহের দোষত্রুটির প্রতিবিধানের কতদূর প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে (......১১৫-১১৬ এবং ১৩৭-১৪৩ পৃষ্ঠা]

6. What are the charges against the Exchange Banks? Suggest a suitable policy in regard to them. Point out the steps that have been taken in this regard in recent years. (C. U. B. A. 1951)

[ইংগিত : প্রশ্নের তৃতীয় অংশের উত্তরে—১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের দ্বারা অবলম্বিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। ......১১৭-১২১ পৃষ্ঠা]

7. Describe the constitution and functions of the State Bank of India.

[ইংগিত : কার্যাবলীর আলোচনায় ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গঠনের কারণ বর্ণনা করিতে হইবে। ...১২২-১২৪ এবং ১৪৭ পৃষ্ঠা]

8. How far do you think the establishment of the State Bank of India would solve the problem of inadequate rural banking facilities? (C. U. B. A. 1956) [১২৩-১২৪ এবং ১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা]

9. Discuss the methods through which the Reserve Bank of India can control the credit situation. What new powers have been given to the Reserve Bank for controlling currency and credit during the Second Plan period? (C. U. B. A. 1959)

[ইংগিত : বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক (১) ব্যাংকের বাট্টাহারের পরিবর্তন, (২) খোলা বাজারে কারবার, (৩) নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণ (selected and direct credit control), (৪) জমার অনুপাতে পরিবর্তন এবং (৫) নৈতিক প্রণোদনের মাধ্যমে ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংককে জমার অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং উহার নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে কাগজী মুদ্রা প্রচলনের যে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে

তাহার ফলে মূল্যস্তর (price level) আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারে। এই আশংকা দূর করিবার জন্যই রিজার্ভ ব্যাংক-এর ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উপরি-উক্তভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

...১২৯-১৩৪ পৃষ্ঠা]

10. Indicate how far the Reserve Bank of India controls the Commercial Banks in the country. (C. U. B. A. 1954, '56; B. Com. 1953, '55, '56)

[ইংগিত: সংশোধনসহ ব্যাংকিং কোম্পানী আইন-প্রদত্ত ক্ষমতা, খোলা বাজারে কারবার ও বাট্টাহারের পরিবর্তনের ক্ষমতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা করিয়া ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাংকের সংশোধন আইনে জমা বা রিজার্ভের অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতার উল্লেখ করিতে হইবে।......১২৯-১৩৪ এবং ১৩৮-১৪৩ পৃষ্ঠা]

11. Discuss the working of the Reserve Bank of India. (C. U. B. A. 1957)

[ইংগিত: রিজার্ভ ব্যাংক-এর ভূমিকার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।...১৩৪-১৩৭ পৃষ্ঠা]

12. Account for the absence of a properly developed Bill Market in India. Describe the main features of the Bill Market Scheme that is now in operation.

[১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠা]

13. Discuss the factors which impede the extension of banking facilities in India. What measures would you suggest for the development of such facilities in this country? (C. U. B. Com. 1957) [১৪৫-১৪৮ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে দ্রব্যমূল্য

(PRICES IN INDIA)

মুদ্রাস্ফীতিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

মুদ্রাস্ফীতিকেই বোধ হয় যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন-সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহার ফলে একসময় সমগ্র মুদ্রা-ব্যবস্থা একরূপ ভাঙিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রপীড়িত করিতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে ইহার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অধিকাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে টাকার ক্রয়শক্তি ১৯৪৭ সাল হইতে এ-পর্যন্ত (আগষ্ট, ১৯৫৯) শতকরা ২৯ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।* মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য (internal value) বা ক্রয়শক্তি বহিঃমূল্যের (external value) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলিয়া এইভাবে টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাস পাইয়া চলিলে আবার মুদ্রামানহ্রাসের (devaluation) প্রয়োজন হইবে। সুতরাং ভারতে দ্রব্যমূল্যের গতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনা তিনটি পর্যায়ে করা হইবে—(ক) যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি; (খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি; (গ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মূল্যের গতি।

---

* ১৯৫৯ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারতীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী সংস্থায় শ্রী আয়েংগারের বক্তৃতা।

সমপরিমাণ দ্রব্যাদি সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিয়া প্রচলিত মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই সংক্ষেপে মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অর্থবিদের ভাষায় ইহা হইল "অত্যল্প দ্রব্যাদির পশ্চাতে অত্যধিক টাকাকড়ির ধাবিত হওয়ার অবস্থা।" মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং স্বভাবতই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকরা তখন মজুরি বৃদ্ধির দাবি করিতে থাকে। মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি দ্বারা মজুরি বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। এই গতিকে 'মুদ্রাস্ফীতির উর্ধ্বগ অবস্থা' (inflationary spiral) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে ঠিক এইরূপই ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূচনা হইতেই আবার এইরূপ ঘটিতেছে।

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে

(ক) যুদ্ধকালীন মূল্যের গতি (Trend in Prices during the War Period) : যুদ্ধ সুরু হইবার সংগে সংগে ভারতে দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগামী হইতে থাকে। ১৯৪০ সালের কয়েক মাস ব্যতীত দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতি ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি অবধি একরূপ অব্যাহতই ছিল। পাইকারী দামের সূচকসংখ্যা (wholesale prices index) ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের শেষে ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮২˙২-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, জীবনযাত্রার সূচকসংখ্যা (cost of living index) ইহা অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই অভূতপূর্ব মূল্য-বৃদ্ধিকেই যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে দুইটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—যথা, (ক) টাকাকড়ির অস্বাভাবিক যোগানবৃদ্ধি, এবং (খ) ভোগ্যপণ্যের অভূতপূর্ব যোগান হ্রাস।

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির দুইটি কারণ :

টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি নানাভাবে ঘটে। প্রথমত কাগজী মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৬৯ কোটি টাকার মত। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা ১,১৪২ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

১। টাকাকড়ির অভূতপূর্ব যোগানবৃদ্ধি —ইহার কারণ

কাগজী মুদ্রার উক্ত পরিমাণবৃদ্ধির কারণ হইল ত্রুটিপূর্ণ যুদ্ধব্যয় পরিচালনার নীতি (defective war finance policy) অনুসরণ। ভারতে তৎকালীন বিদেশী সরকার নিজের ও অন্যান্য মিত্রশক্তির পক্ষে এদেশ হইতে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিত। এই যুদ্ধোপকরণের মূল্য প্রদান করা হইত নোট ছাপাইয়া; এবং নোট ছাপান হইত রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবে ইংল্যাণ্ডে ষ্টার্লিং জমা রাখিয়া। ফলে প্রতিটি ক্রয়ের দরুন ইংল্যাণ্ডে ভারতের অনুকূলে ষ্টার্লিং জমা হইতে থাকে এবং এদেশে কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এ-বিষয়ে ষ্টার্লিং-উদ্‌বৃত্ত সঞ্চয় প্রসংগে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।*

---

* ৮৭ এবং ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।

সাধারণত মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ভারতে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৫ সালের চলতি আমানতের (demand deposits) পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৫০০ কোটি টাকার উপর। স্থায়ী আমানতও ইহা অপেক্ষা অল্প হইলেও অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

যুদ্ধকালীন কর্মপ্রচেষ্টাবৃদ্ধির দরুন টাকাকড়ির প্রচলনবেগও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

উক্ত তিনটি কারণের সম্মিলিত ফল দাঁড়াইয়াছিল মোট অর্থ সরবরাহ বা মোট ক্রয়শক্তির বহুপরিমাণ বৃদ্ধি।

অপরদিকে কিন্তু ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ নিম্নলিখিত কারণে অভূতপূর্বভাবে হ্রাস পাইয়াছিল :

২। ভোগ্যপণ্যের যোগানহ্রাস—ইহার কারণ

(ক) প্রথমত, মোট উৎপাদনের একটা মোটা অংশকে যুদ্ধাভিমুখী করা হইয়াছিল; ইহাতে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের এক বিরাট ঘাটতি পড়িয়াছিল। (খ) শ্রমিক-বিক্ষোভ, যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতি কারণে মোট উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছিল। (গ) যুদ্ধরত দেশগুলি হইতে এবং মালবাহী জাহাজে স্থানের অভাবে আমদানির পরিমাণও বিশেষ কমিয়াছিল। (ঘ) দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের উপর অভাবনীয় চাপের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে মালপত্র চলাচলের সুব্যবস্থাও ছিল না। (ঙ) মুনাফাখোর, কালোবাজারী প্রভৃতিদের জন্য ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ আরও ব্যাহত হইয়াছিল। (চ) সরকারের আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতিও (import control policy) ভোগ্যপণ্য আমদানির সহায়ক ছিল না। (ছ) মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি কারণে বিনিময়ের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছিল। (জ) পরিশেষে, সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিও (system of price control) ত্রুটিহীন ছিল না। অনেকটা ইহার জন্যই বহু ভোগ্যপণ্য বাজার হইতে সহসা অপসৃত হইয়াছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন কারণে অত্যধিক টাকাকড়ি অত্যল্প দ্রব্যাদির পশ্চাতে ধাবিত হইতেছিল। ফলে ঘটিয়াছিল অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও সাধারণ লোকের তজ্জনিত অকল্পনীয় দুর্দশা। এই মূল্যবৃদ্ধির দরুন একমাত্র ১৯৪৩ সালের বংগীয় দুর্ভিক্ষেই ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল।

বংগীয় দুর্ভিক্ষের পর সরকার মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মূল্যবৃদ্ধিকে কতকটা দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবিধান

(ক) কর-পদ্ধতি ও ঋণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার অতিরিক্ত ক্রয়শক্তিকে বাজার হইতে বিদায় করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল।

(খ) যুদ্ধের সময়ে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত দ্বিতীয় প্রতিবিধান হইল স্বর্ণ-বিক্রয়। রিজার্ভ ব্যাংক, ব্যাংক অফ্ ইংল্যাণ্ড ও মার্কিন সরকারের পক্ষে এদেশে প্রায় ৬০ কোটি টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল।

(গ) তৃতীয়ত, নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থারও প্রবর্তন করা হইয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করিয়া ও নিয়ন্ত্রিত বণ্টন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যয়কে যথাসম্ভব সীমার মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল।

(ঘ) নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকেও নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল। সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধি বা নূতন কোন প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা যাইত না।

(ঙ) স্বর্ণ, রৌপ্য, তুলা, জোয়ার প্রভৃতিতে আগাম কারবার (forward trading) নিষিদ্ধ করিয়া ইহাদের ক্ষেত্রে ফটকা কারবারজনিত মূল্যবৃদ্ধি রহিত করা হইয়াছিল।

(চ) যুদ্ধের শেষ দিকে আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতিকে কিছুটা শিথিল করিয়া ভোগ্য-দ্রব্যের আমদানিকে কতক পরিমাণে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল।

(ছ) যুদ্ধের অব্যবহিত পরে কালোবাজারী, কর-প্রবঞ্চক (tax dodgers) প্রভৃতিদের লুকান আয় বাহির করিবার জন্য ৫০০, ১,০০০, ১০,০০০ প্রভৃতি উচ্চমূল্যের নোটকে বিহিত মুদ্রা-বহির্ভূত (demonetised) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

(খ) যুদ্ধোত্তর যুগে মূল্যের গতি (Trend in Prices during the Post-war Period) : আশা করা হইয়াছিল যে উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের জন্য এবং স্বাভাবিক কারণে যুদ্ধোত্তর যুগে মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য ক্রমশ কমিয়া আসিবে। কিন্তু এই আশা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ না হইবার কারণ হইল, যুদ্ধোত্তর যুগেও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাস একরূপ সমান তালেই চলিয়াছিল। ইহার সহিত আবার হইয়াছিল বিনিয়ন্ত্রণ নীতি লইয়া সরকারের পরীক্ষা।

যুদ্ধোত্তর যুগে মুদ্রা-স্ফীতির কারণ

যুদ্ধের সংগে সংগেই কাগজী মুদ্রার পরিমাণবৃদ্ধির পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল। ফলে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ১,১৪২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে ১,২২৭ কোটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার উপর মাগ্‌গি-ভাতা ও মজুরি বৃদ্ধি, পাকিস্তান হইতে আগত বাস্তুহারাদের হস্তে নগদ মুদ্রা প্রভৃতির জন্য মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তির পরিমাণ (total available purchasing power) বিরাটভাবে বাড়িয়া গিয়াছিল।

অপরদিকে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে নাই; বরং দেশকে উৎপাদন-সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যন্ত্রপাতির অভাব, শ্রমিক-বিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা, পরিবহনের অব্যবস্থা, দেশবিভাগের দরুন কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস প্রভৃতি মোট দ্রব্যাদির পরিমাণকে যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে আরও সংকুচিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ নীতিকে শিথিল করিয়াও বিশেষ

ফল হয় নাই। এইভাবে লোকের যুদ্ধকালীন সঞ্চিত ভোগেচ্ছা (pent up war-time demand for consumers' goods) অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে সরকার আবার বিনিয়ন্ত্রণ নীতি লইয়া পরীক্ষা করিতে মনস্থ করে। প্রথমে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে খাদ্যশস্য ও চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ সরাইয়া লওয়া হয়। পরের মাসে কাপড়ের মূল্য-নিয়ন্ত্রণকেও প্রত্যাহার করা হয়। ইহার ফলে খাদ্যশস্য ও বস্ত্রাদির মূল্য বেগে উর্ধ্বগামী হইতে থাকে। কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণ সূচক (general index) বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

স্বভাবতই মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধকল্পে প্রতিবিধান অবলম্বনে সরকারকে যত্নবান হইতে হয়। প্রতিবিধানের নির্দেশকল্পে সরকার ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, অর্থবিদ্যাবিদ্ প্রভৃতির পরামর্শ আহ্বান করে। এই সকল পরামর্শ ও উপদেশের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অভিযানের কার্যক্রম ঘোষিত হয়। এই কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই ছিল প্রধান :

১৯৪৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে অবলম্বিত প্রতিবিধান

(ক) সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়া ঘাটতি বাজেট পদ্ধতি হইতে বিদায় লওয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।

(খ) সরকারী আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যে-সকল রাজ্যে কৃষি-আয়কর (agricultural income tax) ছিল না সেখানে ইহা এবং কেন্দ্রীয় কর-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মৃত্যু বা সম্পত্তি কর (death or estate duty) অনতিবিলম্বে ধার্য করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) ঋণের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের ব্যাপকতর প্রচেষ্টাও করা হইয়াছিল।

(ঘ) লভ্যাংশ বণ্টনের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ, অতিরিক্ত মুনাফা করা খাতে জমা প্রত্যর্পণ স্থগিত রাখা প্রভৃতি দ্বারা মোট ব্যবহার্য ক্রয়শক্তির পরিমাণকে কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

(ঙ) উৎপাদনবৃদ্ধিকল্পেও বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল—যথা, আয়কর নির্ধারণের জন্য অবপূর্তি নিয়মের (depreciation rules) পরিবর্তনসাধন, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা, শিল্পসমূহকে পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, ইত্যাদি। ইহার উপর যাহাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা বিলাসসামগ্রী অভিমুখী হইয়া প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ব্যাহত না করে তাহার জন্য এইরূপ দ্রব্যাদির উপর অন্তঃশুল্কের (excise duties) হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের আমদানির সুব্যবস্থার জন্য বিলাসসামগ্রীর উপর আমদানি শুল্কের হারও বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

(চ) মূল্যহ্রাস ও ন্যায্য বণ্টনের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও বস্ত্রকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা হইয়াছিল। এইবার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে অনেকটা পরিমার্জিত আকারে প্রবর্তিত করা হইয়াছিল।

১৯৪৭-৪৮ সালের মূল্যবৃদ্ধিকে প্লুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি (galloping inflation) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহ অনতিবিলম্বেই ইহাকে বেশ খানিকটা রোধ করিতে সমর্থ হয়। মোট প্রচলিত নোটের পরিমাণ না কমিলেও ইহার সম্প্রসারণ স্থগিত রাখা হয়। মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, ১৯৪৮ সালের অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহের ফলে ১৯৪৯ সালের প্রথম দিক হইতে মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে সামান্য পরিমাণে মূল্যহ্রাসই ঘটিতে থাকে; এবং ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের তুলনায় সাধারণ সূচক (General Index) ৩৯০ হইতে নামিয়া ৩৭০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহার পর হইতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ভারতের প্রতিকূল হওয়ায় আমদানির পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়। আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণও আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না। ফলে, আবার সূচকসংখ্যা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

প্রতিবিধানগুলি কতটা ফলপ্রসূ হয়

ইহার পর ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রামানহ্রাস (devaluation) করা হইলে আবার প্লুতগতিসম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতির আশংকা করিয়া ইহার বিরুদ্ধে আর একটি কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। ইহা অষ্টপর্যায়ী কার্যক্রম (8-Point Programme) নামে অভিহিত। এই কার্যক্রমের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিই হইল প্রধান: (ক) খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও সূতা, লৌহপিণ্ড ও ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতির মূল্য হ্রাস করা; (খ) কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে আগাম ব্যবসায় (forward trading) নিষিদ্ধ করা; (গ) সরকারী ব্যয়-হ্রাসের অধিকতর প্রচেষ্টা করা; (ঘ) ঋণ ব্যবস্থাকে বিস্তৃততর করিয়া স্বল্পসঞ্চয়ীদের সুবিধা প্রদান করা; (ঙ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কঠিনতর করা; ইত্যাদি।

মুদ্রামানহ্রাস ও মুদ্রাস্ফীতির আশংকা

অষ্টপর্যায়ী কার্যক্রম

এই সকল প্রতিবিধানের ফলে মুদ্রামানহ্রাসের পর হইতে বৎসরাধিক কাল সাধারণ মূল্য একরূপ স্থিতিশীলই ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে মহাচীন কোরিয়া-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে দ্রব্যমূল্য আবার বাড়িতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে সাধারণ সূচক ৪৬২-তে (ভিত্তি আগষ্ট, ১৯৩৯) গিয়া পৌছায়।

(গ) প্রথম পরিকল্পনা ও মূল্যের গতি (First Five Year Plan and Price Trends): প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে সরকার আর এক দফা প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে মনস্থ করে। ইহার মধ্যে প্রধান হইল রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ-সংকোচন (credit contraction)। ঋণ-সংকোচনের জন্য প্রথমে ব্যাংকের বাট্টাহার (Bank Rate) শতকরা ৩ হইতে ৩½-এ লইয়া যাওয়া হয়। পরে ইহা ঘোষণা করা হয় যে, রিজার্ভ ব্যাংক আর তপশীলভুক্ত ব্যাংকসমূহ হইতে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিবে না—ইহাদের জামিনে ঋণপ্রদান করিবে মাত্র। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের উদ্বৃত্ত বাজেট-নীতি এই সময় হইতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে এবং সরকার

১৯৫১ সালের প্রতিবিধান

বাজারে বহুল পরিমাণে মাল ছাড়িতে থাকে। ইহা ছাড়া বিদেশের বাজারেও যোগানের অবস্থা কতকটা সহজ হয়। এই সকলের সমন্বিত ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। সরকার এখন মূল্যে স্থায়িত্ব আনিবার জন্য নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করে। রপ্তানিকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ধার্য রপ্তানি শুল্ক হ্রাস এবং রপ্তানির উপর অন্যান্য বাধানিষেধ শিথিল করা হয়। ফলে ১৯৫২-৫৩ সালে দ্রব্যমূল্যে বেশ পরিমাণ স্থায়িত্ব আসে। সকলের ধারণা হয় যে অবশেষে দ্রব্যমূল্যে স্থায়িত্ব আসিয়াছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই স্থায়িত্ব সাময়িক হয়। ইতিমধ্যেই দ্রব্যমূল্যে মন্দাগতি (recession) দেখা দেয়।

১৯৫২-৫৩ সালে মূল্যের স্থায়িত্ব

তারপর মূল্যের নিম্নগতি

১৯৫৩ সালের জুলাই মাস ও ১৯৫৫ সালের মে মাসের মধ্যে সাধারণ মূল্যসূচক (ভিত্তি : ১৯৫২-৫৩ = ১০০) ১১০ হইতে হ্রাস পাইয়া ৯০-এ দাঁড়ায়। খাদ্যশস্যের দামই অপেক্ষাকৃত অধিক হ্রাস পায়। খাদ্যশস্যের মূল্যসূচক ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ছিল ১০৮, উহা ১৯৫৫ সালের মে মাসে হয় ৬৭।* এইভাবে মূল্যহ্রাসের অন্যতম কারণ হইল অনুকূল আবহাওয়ার দরুন আশাতীত কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি। বাজারে যোগান বৃদ্ধির সংগে সংগে এই ধারণা হয় যে উৎপাদন ও যোগান আরও বৃদ্ধি পাইবে ও দ্রব্যমূল্য আরও হ্রাস পাইবে। ফলে ব্যবসাদাররা মজুতমাল বাজারে ছাড়িতে থাকে। এই সকল কারণে মূল্য দ্রুত হ্রাস পায়।

সাম্প্রতিক গতি

ইহার পর ১৯৫৫ সালের জুন মাস হইতেই আবার দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বাভিমুখী হয় এবং ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে। ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত মূল্যগতি কিছুটা অধোমুখী হইলেও ইহার পর হইতে মূল্যস্তর আবার বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে।

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে মূল্যবৃদ্ধি ও উহার প্রতিবিধান

সাধারণ মূল্যসূচক (ভিত্তি : ১৯৫২-৫৩ = ১০০) বিচার করিলে দেখা যায় যে উহা ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ছিল ৯০, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের শেষে দাঁড়ায় ৯৯.২। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় সর্বাধিক। ইহার পরই মূল্যবৃদ্ধি পায় কাঁচামাল ও অর্ধনির্মিত শিল্পজাত দ্রব্যের। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও বিনিয়োগবৃদ্ধি এবং অধিক পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়, দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের অভাবে উৎপাদন হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা ইত্যাদির ফলে চাহিদার তুলনায় যোগানের অভাবের দরুনই এই মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। প্রতিবিধান হিসাবে খাদ্যশস্যের আমদানি, রপ্তানির উপর বাধানিষেধ, সরকারের হাতে জমা খাদ্যশস্য বাজারে যোগান দেওয়া, রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।**

* 'Index Number of Wholesale Prices in India' issued by the office of the Economic Adviser to the Government of India.

** Reprot on Currency and Finance, 1955-56-এর ১৮-২২ পৃষ্ঠা।

(ক) দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও মূল্যের গতি (Second Five Year Plan and Price Trends) : উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহের ফলে সাময়িকভাবে সামান্য সুফল ফলিলেও মূল্যের উর্ধ্বগতি অব্যাহতই থাকিয়া যায়। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার দপ্তরের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস ও ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মূল্যসূচক ৯৮ হইতে বাড়িয়া ১০৫.৬-এ দাঁড়ায়।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে মূল্যবৃদ্ধি

এই মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল বেসরকারী ও সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগকার্যের (investment) ক্রমাগত সম্প্রসারণ। প্রথম পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরেই পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৫৬-৫৭ সাল) ঐ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। লোকের স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অ-পর্যাপ্ত হওয়ায় সরকার অধিকমাত্রায় ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫৭ কোটি টাকার মত, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা দাঁড়ায় ২৫০ কোটি টাকায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণদানের মাত্রা বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে জিনিসপত্রের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের তুলনায় কৃষি-উৎপাদন বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদন কতকটা হ্রাস পায়। ইহা ব্যতীত ব্যবসাদাররা মালমজুত করিয়া কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করে। উপরন্তু, অবস্থাপন্ন কৃষকরা তাহাদের উৎপাদনের একটা বড় অংশ মজুত করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যোগানের তুলনায় চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির ফলেই দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়।

এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ

এই অবস্থায় সরকার একদিকে জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধি এবং অপরদিকে চাহিদার অতিরিক্ত চাপকে হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। যোগানবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বল্প-মেয়াদী পন্থা হিসাবে সরকার বিদেশ হইতে চাউল, আটা প্রভৃতি দ্রব্য আমদানির ব্যবস্থা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। খাদ্যশস্য বণ্টনের জন্য দেশের নানা স্থানে ন্যায্য মূল্যের দোকান (fair price shops) খোলা হয়। এই সকল স্বল্প-মেয়াদী পন্থা ব্যতীত উৎপাদনবৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য 'অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচী'কে (Grow More Food Programme) কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হয়। চাহিদার অত্যধিক চাপকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজস্ব ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত নীতিকে (fiscal and monetary policies) পরিচালিত করা হয়। কর-পদ্ধতির এরূপ পরিবর্তনসাধন করা হয় যাহাতে

অবলম্বিত প্রতিবিধান

* Report on Currency and Finance for 1958-59.

চাহিদা ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়। টাকাকড়ির ক্ষেত্রে নীতিকে এমনভাবে পরিচালিত করা হয় যাহাতে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কাজকর্ম অব্যাহত থাকে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। রিজার্ভ ব্যাংক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সাধারণ এবং নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ (general and selective) উভয় প্রকার ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে। ব্যাংকিং কোম্পানী আইন প্রদত্ত নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাবলে রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে ধান চাউল গম ডাল সুতাবস্ত্রের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিতে নির্দেশ প্রদান করে।

এই সকল পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মূল্যের গতি ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত উর্ধ্বমুখীই থাকিয়া যায়। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ সালে মূল্যের গতি পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। তবে ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষার্ধে একাধিক কারণে দ্রব্যমূল্য কিছুটা নিম্নগতি হয়। এই সকল কারণের মধ্যে ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের উদ্দেশ্যে অনুসৃত রাজস্ব ও ঋণসংক্রান্ত নীতি, অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ নীতি ও অন্যান্য দেশে ব্যবসায় মন্দাগতি (recessionary trends) প্রভৃতিই প্রধান। ইহার পর ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে যে মূল্যবৃদ্ধি পায় তাহার প্রধান কারণ হইল কৃষিজ দ্রব্যের, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের, উৎপাদন হ্রাস। ইহা ছাড়া বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির আশা দেখা দেওয়ায় ধারণা জন্মায় যে পরিকল্পনার ব্যয় ও কার্য ভাল-ভাবেই চলিবে।*

পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে মূল্যের গতি

পূর্বের বৎসরের ন্যায় ১৯৫৭-৫৮ সালে সরকার মূল্যের স্থায়িত্ব আনয়নের চেষ্টা করিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ ও নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ কিন্তু উন্নয়ন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখা, কর-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন ইত্যাদি পূর্বেকার সকল পন্থাই অনুসৃত হয়।† এইভাবে সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রচেষ্টা ছাড়াও খাদ্যমূল্য দমিত রাখার বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়। নির্বাচনমূলক ঋণ-নীতি প্রয়োগ করিয়া ধান, চাউল, আটা ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ঋণপ্রদান সীমাবদ্ধ করা হয়। যোগানের উন্নতির জন্য ১৯৫৭ সালে ৩৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায্য দোকান ব্যতীত স্থানীয় দুষ্প্রাপ্যতা রোধ করিবার জন্য চাউল ও আটা সম্পর্কে কতকগুলি অঞ্চল (zones for rice and wheat) সৃষ্টি করা হয়। এই সকল অঞ্চলে দ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়া আঞ্চলিক ঘাটতি প্রতিরোধ করা হয়। অত্যাবশ্যকীয় আইনের (Essential

* Report of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, 1957-58 এবং Report on Currency and Finance, 1957-58.

† Report of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India, 1957-58.

Commodities Act) সাহায্যে নির্দিষ্ট মূল্যে খাত্মশস্ত বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করা হয়।

১৯৫৭ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার খাত্ম-সমস্যা সম্পর্কে একটি খাত্মশস্ত অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) নিয়োগ করে।*

খাত্মশস্ত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ

এই কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে রাজস্ব, অর্থ ও ঋণদান সম্পর্কিত পন্থা অবলম্বন ছাড়া মূল্যের স্থায়িত্বের জন্য অপরাপর পন্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন। কমিটির মতে সাধারণ মূল্যের স্থায়িত্বের নীতি স্থির ও কার্যকর করার জন্য একটি মূল্য স্থায়িত্ব বোর্ড (Price Stabilisation Board) গঠন করা প্রয়োজন। এই বোর্ডের খাত্মশস্ত সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচীকে কার্যকর করার জন্য আর একটি খাত্মশস্ত স্থায়িত্ব সংগঠন (Foodgrains Stabilisation Organisation) থাকিবে। উপরি-উক্ত বোর্ড ও কেন্দ্রীয় খাত্মমন্ত্রীকে সাহায্যের জন্য বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় খাত্ম পরামর্শদান পরিষদও থাকিবে। ইহা ব্যতীত মূল্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য মূল্যতথ্য বিভাগ (Price Intelligence Division) সৃষ্টি করা প্রয়োজন। মূল্য স্থায়িত্ব বোর্ড মূল্যতথ্য বিভাগ ও পরামর্শদান পরিষদের সহায়তায় মূল্যের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যখন যেমন নীতি গ্রহণ করা সমীচীন তাহা করিবে।

অবলম্বিত প্রতিবিধানসমূহের ফলে প্রকাশ যে, বিশেষ করিয়া খাত্মদ্রব্যের মূল্য, কিছুটা বর্ধিত থাকে। কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সালে মূল্যবৃদ্ধি আবার চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য অবিচ্ছিন্ন গতিতে বাড়িয়া যাইতে থাকে।

পরিকল্পনার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে মূল্যের গতি

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার দপ্তরের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে ১৯৫৮-৫৯ সালে সাধারণ সূচক সংখ্যা (সাপ্তাহিক মূল্যের মাসিক গড়) বাড়িয়া বৎসরের শেষে দাঁড়ায় প্রায় ১১৩-তে। পূর্ববর্তী বৎসরে ঐ সূচক সংখ্যা ছিল ১০৫'৪। সুতরাং পূর্বের বৎসরের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সালে মূল্য শতকরা ৬'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।** বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে খাত্মদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিই সর্বাধিক হয়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ১১'২ ভাগ-এ। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাত্মশস্তের উৎপাদনে ঘাটতিই এই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।

সরকার এই মূল্যবৃদ্ধিকে দমন করিবার জন্য অধিক সচেষ্ট হয়। বিশেষত খাত্মদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যাহাতে রোধ হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। অধিক পরিমাণে খাত্ম-আমদানি, খাত্মশস্ত সংগ্রহ ও ন্যায্যমূল্য দোকানের মারফত খাত্মশস্ত বণ্টন, মালমজুত ও অতিরিক্ত মুনাফা শিকার নিষিদ্ধকরণ সর্বোচ্চ মূল্য স্থিরিকরণ প্রভৃতি পন্থা সরকার অবলম্বন করে। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাংক খাত্মশস্ত মজুত এবং ফটকা কারবার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতে

* প্রথম খণ্ডের (৪র্থ সংস্করণ) ২২৪-২৮ দেখ।

** Report on Currency and Finance, 1958-59, ১৯ পৃষ্ঠা।

থাকে। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে সরকার দীর্ঘমেয়াদী পন্থা হিসাবে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State trading) প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত করে। যাহাতে উৎপাদকেরা ন্যায্যমূল্য পায় এবং ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য ক্রয় করিতে পারে তাহা নিশ্চিত করাই এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের উদ্দেশ্য। এই সকল পন্থা অবলম্বনের ফলে সাময়িকভাবে মূল্যবৃদ্ধি কমিয়া আসিলেও সম্প্রতি আবার মূল্যের উর্ধ্বগতি দেখা যায়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে সাপ্তাহিক সাধারণসূচক ১১৮·০-তে আসিয়া দাঁড়ায়।

উপসংহার ঃ সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি যে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছে তাহা যুক্তিবিহীন নয় কারণ মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিলে পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিবে। ইতিমধ্যেই বৈদেশিক মুদ্রাসংকটজনিত কারণ ও ব্যয়বৃদ্ধি হেতু দ্বিতীয় পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট করা হইয়াছে।*

মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত সমাধান উৎপাদন ও উৎপাদনশক্তির সম্প্রসারণ

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন ও বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে পরিকল্পনাকে খুব বেশী ছাঁটকাট করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তা'ছাড়া ডাঃ নবগোপাল দাসের ভাষায় বলা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত সমাধান হইল দেশের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতাকে (production and productivity) সম্প্রসারিত করা। উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই জিনিসপত্রের যোগান বাড়িয়া যাইবে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হ্রাস পাইবে। তবে যে ব্যয়সংক্ষেপের অবকাশ বা প্রয়োজন নাই এরূপ মনে করা ভুল। সরকারী ব্যয়কে যতটা সম্ভব সংক্ষেপ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি আবার লোকের ব্যয় এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা দরকার।

বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির আশংকাবৃদ্ধির কারণ

বর্তমানে কতকগুলি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার জন্য মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন পর্যন্ত পরিকল্পনার কার্যের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে বিনিয়োগ ও ঘাটতি ব্যয়ের দরুন মূল্যবৃদ্ধিকে যে বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ হইল বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে অধিক খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র আমদানি করিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের সংগতি অতি সামান্যই। বৈদেশিক সাহায্য বেশ পরিমাণে পাওয়া না গেলে এ অবস্থার সুরাহা সম্ভব হইবে না। মুদ্রাস্ফীতি আর একটি কারণেও নিয়ন্ত্রিত ছিল। এতদিন পর্যন্ত শিল্পোৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছিল। অবস্থিত অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার (utilisation of spare capacity) এবং নূতন যন্ত্রপাতি ও কারখানা প্রতিষ্ঠানের ফলেই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। অবস্থিত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার শেষ হইয়া যাওয়ায় এদিক হইতে বর্তমানে উৎপাদনবৃদ্ধির বিশেষ অবকাশ নাই। নূতন

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan.

যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা বসাইয়া যে উৎপাদনবৃদ্ধি করা হইবে তাহারও অসুবিধা দেখা দিয়াছে কারণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ের অবস্থায় বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। ফলে শিল্পোৎপাদনের হার সম্প্রতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।* কৃষির ক্ষেত্রেও ১৯৫৭-৫৮ সালে উৎপাদন—বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিশেষ কমিয়া গিয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে অবশ্য উহার আবার কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে। যাহা হউক, উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস মুদ্রাস্ফীতির আশংকাকে প্রকটকর করিয়া তুলিয়াছে। সরকারও এই সম্ভাবনার আশংকা করিয়াই পরিকল্পনার জন্য ভবিষ্যতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বৈদেশিক সাহায্য অধিকমাত্রায় সংগ্রহের জন্যও সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। রাজস্ব ও মুদ্রানীতিকেও একদিকে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ এবং অপরদিকে আবশ্যকীয় উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা হইতেছে। তবে মনে রাখিতে হইবে কিছুতেই কিছু হইবে না যদি না উৎপাদন—বিশেষ করিয়া খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে মূল্য-ব্যবস্থায় খাদ্যমূল্য এক কেন্দ্রস্থল অধিকার করে কারণ অধিকাংশের জীবনযাত্রার ব্যয় ইহার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং খাদ্যশস্যের উৎপাদনকে এমনভাবে সংগঠিত করিতে হইবে যে আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও যেন উহা নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্বোল্লিখিত ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বিশেষজ্ঞদলের মতে, এই বৃদ্ধির হারকে বর্তমান বাৎসরিক শতকরা ৩·২ হইতে ৮·২-এ লইয়া যাইতে হইবে।** সংগে সংগে মালমজুত ও কালোবাজার দৃঢ়হস্তে বন্ধ করিতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্য-উৎপাদনকে বৃদ্ধি করা একান্তভাবে প্রয়োজন

প্রশ্নোত্তর

1. What is inflation? Discuss the causes and effects of inflation in India during World War II. (১৫২-১৫৪ পৃষ্ঠা)

2. Discuss the trends of prices after World War II. What measures were adopted by the Government to secure stability in price-level? (১৫৪-১৫৬ পৃষ্ঠা)

3. Account for the recent rise in prices. Comment on the measures that have been adopted to deal with it? (১৫৬-১৬২ পৃষ্ঠা)

4. Examine the nature of price trends during the first four years of the Second Five Year Plan. What measures have been taken to check inflation? (১৫৮-১৬২ পৃষ্ঠা)

---

* Report on Currency and Finance for the year 1958-59এর ১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

** Report on India's food crisis and steps to meet it.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেকার-সমস্যা

(UNEMPLOYMENT PROBLEM)

বর্তমান সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হইল বেকার-সমস্যা। পূর্বে এই সমস্যা যে ছিল না তাহা নয়। বহুদিন পূর্ব হইতেই মানুষ এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে এবং ইহার সমাধান খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে উহার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা পূর্বাপেক্ষা অধিক। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পশ্চিমী দেশগুলিতে যে অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহার একটি বৈশিষ্ট্য হইল শিল্প-শ্রমিকের একাংশের মধ্যে স্থায়ী বেকারত্ব ও দুর্দশা। এই অর্থ-ব্যবস্থা যত ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হয় আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্য তত প্রকট হইতে থাকে; এবং গত মহাযুদ্ধের পর উহার দুর্বলতা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তখন হইতে মানুষ বেকার-সমস্যা, অর্ধ-নিয়োগ ও আর্থিক দুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (U. N. Charter) পূর্ণ নিয়োগের (full employment) এবং ১৯৪৮ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) কর্মের অধিকার, পছন্দমত চাকরি গ্রহণের অধিকার, কার্যের ন্যায্য ও অনুকূল সর্তের অধিকার, বেকারাবস্থার হাত লইতে নিষ্কৃতি পাইবার অধিকার প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রও আজ আর নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া নাই। ইহারা বেকারাবস্থার অবসান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়াছে। ভারত সরকার পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধনে সচেষ্ট হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে বেকার-সমস্যার গুরুত্ব

শিল্প-বিপ্লব ও বেকার-সমস্যা

বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারতের বেকার-সমস্যায় কিছুটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে সময়ান্তরে ব্যবসায়ের তেজী-মন্দার ফলে শিল্প-শ্রমিকদের নিয়োগের তারতম্য (cyclical unemployment) দেখা দেয়, অথবা শিল্পের সংগঠনগত পরিবর্তন বা দ্রব্য উৎপাদনে পরিবর্তনকালে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব (frictional unemployment) দেখা দেয়। ভারতে কিন্তু সকল সময়ই জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশ বেকারাবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করে ও কাজকর্মের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা ব্যতীত ব্যাপক আকারে অর্ধ-নিয়োগ (under-employment) ভারতের বেকার-সমস্যার আর একটি প্রধান দিক। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো কৃষি-প্রধান; এখানে শতকরা ৭০ জন লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।

ভারতের বেকার-সমস্যার প্রকৃতি

অনন্যোপায় হইয়াই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জমিতে আসিয়া ভিড় করিয়াছে এবং জমির উপর চাপ অত্যধিক করিয়া তুলিয়াছে। ফলে কৃষি আর আর্থিক দিক হইতে লাভজনক নাই; এবং মাথাপিছু আয়ও হয় সামান্য। উপরন্তু কৃষক সারা বৎসর ধরিয়াই কৃষিকার্য করে না; বৎসরে ৫ মাস হইতে ৯ মাস পর্যন্ত তাহাকে বেকার জীবন যাপন করিতে হয়। কৃষিতে এই অর্ধ-নিয়োগ বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের (invisible unemployment) অবস্থা সহরাঞ্চলের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক শিল্পাঞ্চলে আসিয়া ভিড় করে; এবং ফলে মজুরির হার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অপরদিকে আবার শিল্পাঞ্চলে বেকার-সমস্যা দেখা দিলে শিল্প-শ্রমিকরা গ্রামাঞ্চলে ফিরিয়া যাইয়া কৃষিতে ভিড় জমায়।

কৃষিগত ও শিল্পগত বেকার-সমস্যা ব্যতীত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যাও অন্যতম সমস্যা। রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে এই সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা বা গুরুত্ব অধিক হওয়ায় সম্প্রতি ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মোটামুটিভাবে ভারতে তিন প্রকারের বেকার-সমস্যা রহিয়াছে: (১) কৃষিগত বেকার-সমস্যা; (২) শিল্পগত বেকার-সমস্যা; এবং (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা। তিন প্রকার সমস্যারই মূলে দুইটি প্রধান কারণ রহিয়াছে—যথা, ভারতের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং জাতীয় সম্পদের অপ্রসারতা।

ভারতে তিন প্রকারের বেকার-সমস্যা

কৃষিগত বেকার-সমস্যা (Problem of Agricultural Unemployment): পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, কৃষিগত বেকার-সমস্যা প্রধানত অর্ধনিয়োগ (under-employment) এবং বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে কর্মবিহীনতার (seasonal unemployment) সমস্যা। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে অচাষী ও জমিহীন চাষীদের বেকার-সমস্যা রহিয়াছে।

প্রকৃতি

গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-নিয়োগ ও সাময়িক কর্মবিহীনতার কারণ কি তাহার ইংগিত পূর্বেই দিয়াছি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও কৃষির অনগ্রসরতা এই অবস্থার জন্য দায়ী। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে জমি হইতে যে আয় হয় তাহা জীবিকানির্বাহের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতে যখন ৩,৬০০ লক্ষ একর জমিতে ৭৩০ লক্ষ কৃষক কার্য করে তখন ঐদেশে ৬,৩০০ লক্ষ একর জমিতে মাত্র ৮০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। উৎপাদনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতের একর প্রতি গম উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী হইবে না, এবং একর প্রতি তুলা উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না। জমির উর্বরতা ও অনুন্নত কৃষি-পদ্ধতির কথা ছাড়িয়া দিলে ইহা অনস্বীকার্য যে জমি জনসংখ্যার চাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না। জনসংখ্যার চাপের ফলেই আবার খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে। উৎপাদনের নিম্ন হারের অন্যান্য কারণের মধ্যে বৃষ্টির

জনসংখ্যার চাপ ও কৃষির অনগ্রসরতাই কৃষিগত বেকার-সমস্যার মূল কারণ

অনিশ্চয়তা, কৃষকের মূলধনের অভাব ও ঋণ, কৃষিগত সংগঠনের অভাব, বিক্রয়করণ-ব্যবস্থার দুর্বলতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে বৎসরের কয়েক মাস ধরিয়া মাত্র কৃষিকার্য চলে, অন্যান্য সময়ে কৃষককে অলস জীবনযাপন করিতে হয়। একটি সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে ভারতের গ্রামাঞ্চলে লাভজনক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ২৮ জনের কাজ সাপ্তাহিক ২৮ ঘণ্টার কম।* ইহাও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের একটি দিক। গ্রামাঞ্চলে কুটির-শিল্প ধ্বংস পাওয়ায় কৃষক অবসর সময়ে উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া আয়বৃদ্ধির সুযোগ পায় না।

গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধ-নিয়োগ সমস্যার সমাধান করিতে প্রথমেই সর্বতোভাবে কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। কৃষিকার্যে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, সেচের উন্নতি, উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহার, পাল্‌টি শস্য উৎপাদন (rotation of crops), জোতের সংহতিসাধন ও আয়তন বৃদ্ধি, বিক্রয়করণ-ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রাম্য ও কুটির-শিল্পের প্রসার প্রভৃতির সাহায্যে কৃষক ও গ্রামবাসীর অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই সমস্তের দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। আত্যন্তিক চাষের (intensive cultivation) ফলে হয়ত' কৃষির উৎপাদন বাড়িবে ; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। অতএব অগণিত জনসংখ্যার জীবিকার সমস্যা মাত্র কৃষির দ্বারা সমাধান করা যাইবে না। ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) সম্ভাবনাও খুব বেশী নাই কারণ অতিরিক্ত জমির পরিমাণ অত্যল্প। এই অবস্থায় শিল্প-প্রসার ভিন্ন নূতন নিয়োগ-সৃষ্টির অন্য কোন পন্থা নাই। শিল্পপ্রসারের সাহায্যেই জমির উপর জনসংখ্যার চাপকে হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

কৃষিগত বেকার-সমস্যার সমাধানের পন্থা

শিল্পগত বেকার-সমস্যা (Problem of Industrial Unemployment) : কিছুদিন পূর্বেও শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। কিন্তু ক্রমশ গ্রামাঞ্চলে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ অধিক হওয়ায় ও কৃষিক্ষেত্রে দুরবস্থা দেখা দেওয়ায় অধিক সংখ্যক লোক বর্তমানে শিল্পাঞ্চলে চাকরির সন্ধানে আসিয়া ভিড় করিতেছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে বেকারের সংখ্যা কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন ; তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা কার্যকর করা সত্ত্বেও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নগরাঞ্চলে নিয়োগের অবস্থায় অবনতিই ঘটিয়াছে। নিয়োগ-কেন্দ্রগুলির (Employment Exchanges) হিসাবে ত্রুটি থাকিলেও উহাদের তথ্যাদি হইতে নগরাঞ্চলে বেকার-সমস্যার গতির কতকটা ইংগিত পাওয়া যায়। ১৯৫১ সালে নিয়োগ-কেন্দ্রগুলির চলতি রেজিষ্ট্রারী খাতায় বিভিন্ন নিয়োগপ্রার্থীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩'২৯ লক্ষ। ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৯ সালে হয় ১৪'২১ লক্ষ। সম্প্রতি ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে ঐ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৪'২৬ লক্ষের মত। এই নিয়োগপ্রার্থীদের মধ্যে দক্ষ ও আংশিক দক্ষ কার্য, শিল্পে

শিল্পগত বেকার-সমস্যার অবনতি

* Surveys conducted by the National Sample Survey Orgnaisation in 1958.

পরিদর্শন কার্য, কেরাণীর চাকরি এবং অদক্ষ কার্যের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৬ হাজার, ১৩ হাজার, ৩ লক্ষ ৫১ হাজার এবং ৭ লক্ষ ৬৫ হাজারের মত।* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, মোট বেকারের একটা সামান্য অংশই নিয়োগ-কেন্দ্রে নাম লেখায়। সুতরাং বেকার-অবস্থায় যে অবনতি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিল্পগত বেকারত্বের কারণ

শিল্প-শ্রমিকের বেকার-সমস্যার মূলে রহিয়াছে নিম্নলিখিত কারণগুলি। প্রথমত, ভারতের শিল্প এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রসারলাভ করে নাই, সুতরাং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় দ্রব্যাদি ক্রমশ মন্দা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। সুতরাং রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন কতকটা সংকুচিত হইয়াছে এবং অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রভাব সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পেও পড়িয়াছে। তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য আর্থিক কারণে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের বিশেষ অসুবিধা দেখা দিয়াছে। চতুর্থত, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা সম্প্রসারণের একটি উপায় হইল উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপতিগণ উৎপাদন-ব্যয়কে হ্রাস করিতে সমর্থ হন নাই। পরিবর্তিত অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারায় বহু শিল্পেই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চমত, জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষিজীবী। সুতরাং শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় সম্প্রসারিত করিতে হইলে এই শ্রেণীর ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ-পর্যন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যতই সাফল্য অর্জন করিয়া থাকুক না কেন কৃষিজীবীদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। ষষ্ঠত, অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়োগ ব্যবস্থা না করিয়া শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (rationalisation) করিবার ফলে অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শিল্পগত বেকার-সমস্যার সমাধান

শিল্প-শ্রমিকদের বেকার-সমস্যা সমাধান করিতে হইলে দ্রুত শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে যে শিল্পগুলি আছে তাহাদের উৎপাদন উন্নয়নের সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শিল্পগত শিক্ষার প্রসার, উৎকৃষ্ট ধরনের কাঁচামাল সরবরাহ, মূলধনের অভাবপূরণ, পরিচালন-দক্ষতা, সংগঠনের উন্নতিসাধন প্রভৃতির দিকে অধিক নজর দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু দ্রুত শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তিনটি জিনিস হইল, শিল্পগত উদ্যোগ (enterprise), মূলধন ও শিল্পগত দক্ষতা। ইহাদের মধ্যে যে-কোনটির অভাব শিল্পপ্রসারকে ব্যাহত করিতে বাধ্য। সরকারের পক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রকে উৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্প গঠিত ও পরিচালিত করিয়া

* Reserve Bank of India Bulletin, March 1960. ৪০৩ পৃষ্ঠা।

প্রয়োজনীয় শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি করিতে হইবে। শ্রমিকের মধ্যেই কারিগরি দক্ষতার অভাব শিল্পশিক্ষার মাধ্যমেই পূরণ করিতে হইবে। মূলধনের অভাব অবশ্য ভারতের একটি প্রধান সমস্যা। একদিকে দেশের মধ্যে যতটা সম্ভব মূলধন গঠন ও সংগ্রহ করিতে হইবে, অপরদিকে বিদেশী মূলধন সংগ্রহ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রসংগে আর একটি বিষয়ের বিচার প্রয়োজন। ভারতের পুঁজি যেমন অল্প ক্রয়শক্তির সংগতিও তেমনি অপ্রচুর। এই অবস্থায় যে-সমস্ত শিল্পে মূলধন অপেক্ষা শ্রম অধিক নিয়োজিত হয় (labour intensive industries) তাহাদেরই প্রসার করা সংগত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মূল বা ভারী শিল্পগুলি না গড়িয়া তুলিতে পারিলে শিল্প-প্রসারের পথ প্রশস্ত হইবে না। এইজন্য মূলধন প্রয়োজন হইলেও উহাদের প্রসার করিতে হইবে। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের বেলায় বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিবর্তে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রসারের উপর সাময়িকভাবে অধিক জোর দেওয়া যাইতে পারে—কারণ ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন অপেক্ষা শ্রমিকই অধিক নিয়োজিত হয়। ইহাতে সত্বর বেকার-সমস্যার কতকটা সুরাহা হইবে। অনেকে অবশ্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। শিল্পপ্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারকে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। রপ্তানিপ্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

শিল্পগঠন ও শিল্পপ্রসার হইল দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা। যে-পর্যন্ত-না দেশ শিল্পোন্নত হইতে পারিবে সে-পর্যন্ত বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যেভাবে দ্রুত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন। রাস্তা ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি জনসেবামূলক কার্যাদির সাহায্যে সাময়িকভাবে বেকারাবস্থার দুর্দশা কতকটা দূরীভূত করা সম্ভব হইবে।

পরিশেষে, বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থায় জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে বেকারের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা (Problem of Unemployment amongst the Educated Class): সম্প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। সরকারী ও অন্যান্য মহলে ইহাতে উদ্বেগেরও সৃষ্টি হইয়াছে যথেষ্ট। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা সাধারণ বেকার-সমস্যা হইতে মূলত ভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও শিক্ষিত বেকার রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে অধিক চেতনাসম্পন্ন। সুতরাং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে শিক্ষিত বেকারকে অধিক বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হয়।

সমস্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি

দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত তাহা নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। তবে সম্প্রতি যে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৫৫ সালে নিযুক্ত অনুসন্ধান-দলের (Study Group) মতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ৫.৫ লক্ষের মত হইবে। নিয়োগ-কেন্দ্রগুলির (Employment Exchanges) হিসাব হইতে

দেখা যায় ১৯৫১ সালে শিক্ষাকার্যের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজারের মত। ১৯৫৯ সালে ঐ সংখ্যা হয় ৬৯ হাজার।* ১৯৫৭ সালে নিয়োগ-কেন্দ্র দপ্তরের লোকবল বিভাগের (Manpower Division of the Directorate of Employment Exchanges) অনুসন্ধান রিপোর্ট অনুসারে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবংগ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই এবং দিল্লীতে গ্রাজুয়েট বেকারদের সংখ্যা সর্বাধিক।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারের কারণ সম্পর্কে সর্বপ্রথমে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই দায়ী করা হয়। বলা হয়, দেশের শিক্ষা অতিমাত্রায় সাহিত্যাশ্রয়ী এবং বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত। ইহা ছাড়া উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত হউক বা না-হউক ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাইয়া ভিড় জমায় এবং প্রত্যেক বৎসর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য যে-সমস্ত শিল্পগত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন তাহা তাহারা মিটাইতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় সরকারী চাকরি আর না-হয় কেরাণিগিরির দিকে তাহারা ধাবিত হয়। ফলে দেখা দেয় শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যাপক বেকার-সমস্যা। এই অভিযোগের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা থাকিলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে অগণিত জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্রাংশই শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ইহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা যদি নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা না পায় তাহা হইলে আমাদের অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে দেশের সমাজ ও অর্থ-ব্যবস্থায় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। যে-দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন নিরক্ষর সে-দেশে শিক্ষিত বেকার-সমস্যার জন্য শিক্ষাধিক্যের অভিযোগ আনয়ন করা নিজেদের দুর্বলতা ও অসামর্থ্যকে ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। যে-পর্যন্ত-না নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সে-পর্যন্ত পেশাগত বা শিল্পগত শিক্ষাই হউক বা অন্য শিক্ষাই হউক কোনটাতেই সুবিধা হইবে না। শিল্পগত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শিক্ষাপ্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়াও কোন লাভ নাই কারণ বর্তমান যুগে অশিক্ষিত বেকার শিক্ষিত বেকারের মতই সমানভাবে বিপজ্জনক। যাহাই বলা হউক-না কেন শিক্ষিত বেকার-সমস্যার আসল কারণ হইল অর্থনৈতিক। শিল্পপ্রসারের অভাব ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ফলেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যার কারণ

সম্প্রতি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আর একটি কারণ হইল যুদ্ধের পর সরকারী বিভাগ ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যাপক ছাঁটাই-এর ব্যবস্থা।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই শিক্ষিত বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইবে।

* Reserve Bank of India Bulletin, March 1960.

পাঠ্যসূচীর মধ্যে বিভিন্নতা আনয়ন করিয়া ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। পেশাগত কারিগরী শিক্ষার প্রসার বিস্তার করিতে হইবে। সম্প্রতি সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার পর তিন বৎসরের জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠ্যবস্তুর বিভিন্নতা এবং পেশাগত বা শিল্পগত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। যাহারা উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে যাইবে তাহারা তিন বছর অধ্যয়নের পর ডিগ্রি পরীক্ষা দিতে পারিবে।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধান

কিন্তু শিক্ষার সংস্কারের সাহায্যে সমস্যার সমাধান হইবে না। আসল সমাধান হইল দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পের ব্যাপক প্রসার। ইহার সাহায্যেই পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যাইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে উপরি-উক্ত অনুসন্ধান-দল (Study Group) নিযুক্ত করা হয়।

এই দল কয়েকটি পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছে। প্রথমত, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নির্মাণ, আসবাব তৈয়ারি, ঢালাই-এর কাজ, যন্ত্রপাতি, গাড়ী প্রভৃতি মেরামতের কাজের জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যাহাতে শিক্ষিতদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও সবল দৃষ্টি-ভংগি প্রসারলাভ করে এবং হাতের কাজ করিতে অনিচ্ছা অপসারিত হয় তাহার জন্য কতকগুলি ক্যাম্পের (Orientation Camps) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই ক্যাম্পগুলি আবার শিক্ষিত ব্যক্তি ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিবে। তৃতীয়ত, সমবায়িক দ্রব্য পরিবহণ-ব্যবস্থা (co-operative goods transport) প্রবর্তনের সাহায্যে শিক্ষিতদের নিয়োগের সুবিধা করা যাইবে। ইহা ব্যতীত শিক্ষিত যুবকশ্রেণী চাকরির সন্ধানে যে দুর্দশা ভোগ করে তাহা অপসারণের জন্য অনুসন্ধান-দল সরকারী চাকরির নিয়োগ-পদ্ধতির উন্নতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ-ব্যুরোর (University Employment Bureau) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছে।

অনুসন্ধান দলের সুপারিশ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নিয়োগ (Five Year Plans and Employment)ঃ প্রথম পরিকল্পনার সময় নিয়োগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন ১১ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল (১) কার্য ও শিক্ষা-কেন্দ্র; (২) ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়কে বিশেষ সাহায্যদান; (৩) যে-সকল ক্ষেত্রে লোকবলের অভাব সে-সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার; (৪) রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দ্রব্য ক্রয়; (৫) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য; (৬) জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার প্রতিষ্ঠা; (৭) পথবাহী যানবাহনের প্রসার; (৮) ঘরবাড়ী নির্মাণ; (৯) ব্যক্তিগত বাড়ীনির্মাণ কার্যকে উৎসাহ প্রদান; (১০) বাস্তুহারাদের সহরনির্মাণে সাহায্য; (১১) ব্যক্তিগত মূলধনে বৈদ্যুতিক

শক্তি প্রসারের পরিকল্পনাকে উৎসাহপ্রদান। যাহাতে নিয়োগ বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনার কার্যকে সম্প্রসারিত করা হয়। ইহা সত্ত্বেও দেশের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রথম পরিকল্পনার ফলে মাত্র ৪৫ লক্ষের মত অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ নিয়োগের সংস্থা হইয়াছে। অবশ্য এ-হিসাবের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-অতিরিক্ত নিয়োগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ধরা হয় নাই। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলেই পরিকল্পনার ফল অধিক ফলিয়াছে। পুরাপুরিভাবে নিয়োগ ছাড়া অর্ধ-নিয়োগ (under-employment) সমস্যার কতক সমাধান করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় নিয়োগ সৃষ্টির পরিমাণ সামান্যই। ইহার প্রধান কারণ হইল শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি।

নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ৪৫ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ করিয়া এবং শ্রমিকসংখ্যা বার্ষিক ২০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১ কোটি নূতন শ্রমিক শ্রমিকদলে যোগদান করিবে। ইহার মধ্যে সহরাঞ্চলের শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩৮ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলে শ্রমিকসংখ্যার বৃদ্ধি ৬২ লক্ষ। নূতন শ্রমিক-সংখ্যার নিয়োগের সমস্যা ব্যতীত বর্তমানে ৫৩ লক্ষের মত নিয়োগপ্রার্থী রহিয়াছে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে সহরাঞ্চলে আছে ২৫ লক্ষ এবং গ্রামাঞ্চলে ২৮ লক্ষ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি

নূতন শ্রমিকসংখ্যা ও বর্তমান নিয়োগপ্রার্থীদের যোগ দিলে আগামী পাঁচ বৎসরে ১ কোটি ৫৩ লক্ষের জন্য নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই হিসাবের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের অর্ধ-নিয়োগের পরিমাণ ধরা হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিয়োগের ব্যাপারে তিনটি সমস্যা রহিয়াছে: প্রথমত, সহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান বেকারসংখ্যার নিয়োগ-সমস্যা; দ্বিতীয়ত, নূতন শ্রমিকদের নিয়োগ-সমস্যা; এবং তৃতীয়ত, অর্ধ-নিয়োগের সমস্যা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে অতিরিক্ত নিয়োগ সম্ভাবনার যে-হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১ কোটির অধিক অতিরিক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা এই মোট সংখ্যার মধ্যে হইবে না। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হইবে ৮০ লক্ষ পদের সৃষ্টি এবং জমির পুনরুদ্ধার, সেচের প্রসার প্রভৃতির ফলে হইবে ২০ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা। অতএব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে দেশের বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাব অনুযায়ী ৫০ লক্ষের মত লোক বেকার থাকিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় নিয়োগের সম্ভাবনা

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা সম্পর্কে ১৯৫৫ সালের অনুসন্ধান-দল হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ২০ লক্ষের মত এইরূপ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় মোটামুটি

১৪'৪ লক্ষ লোক নিয়োগের সুযোগ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অতএব বাকী লোকের নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান-দল কতকগুলি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে। এই সমস্ত সুপারিশের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সরকার পরীক্ষামূলকভাবে অনুসন্ধান-দলের সুপারিশ কার্যকর করার ব্যবস্থা করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য নিয়োগের সুযোগ

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে নিয়োগ সম্প্রসারণ কিন্তু মোটেই আশানুরূপ হয় নাই। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে ঐ সময় মাত্র ২৫ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে যে পরিকল্পনার বাকী দুই বৎসরে সকল সুবিধা হইলে আরও ৫০-৫৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি নিয়োগের যে-লক্ষ্য নির্দিষ্ট আছে তাহাতে পৌছান কোনমতেই সম্ভব হইবে না এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পুরাতন বেকারের সংখ্যা অন্তত ৭০ লক্ষে দাঁড়াইবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ইহার মূল কারণ হইল পরিকল্পনার ছাঁটকাট।*

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগ সম্প্রসারণ

যাহা হউক, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইবে উক্ত ৭০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী লইয়া। ইহার উপর বর্তমান জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারে অনুমিত ১ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থী আসিয়া যুক্ত হইবে। অতএব, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদি বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হয় তবে ২ কোটি ১০ লক্ষ (৭০ লক্ষ + ১ কোটি ৪০ লক্ষ) নিয়োগপ্রার্থীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিভাবে ইহা করা সম্ভব তাহাই হইল সমস্যা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগসমস্যা

ধরিয়া লওয়া হইয়াছে উক্ত ২ কোটি ১০ লক্ষ নিয়োগপ্রার্থীর মধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ সাধারণ কাজকর্মই (regular jobs) পাইবে। সুতরাং ১ কোটির জন্য নূতন কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই নূতন কিছু ব্যবস্থা কি ধরনের হইতে পারে সে-সম্বন্ধে বর্তমানে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করিলে তবেই এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Analyse the causes of Unemployment in India. Suggest remedies to tackle the same. (১৬৪-১৬৯ পৃষ্ঠা)

2. What is the nature of the Unemployment Problem in India? What measures should be taken to solve it? (১৬৩-১৬৯ পৃষ্ঠা)

3. Examine the causes of the recent increase in unemployment in India. How far would the Second Five Year Plan help to solve the problem? (C. U. B. Com 1957) (১৬৪-১৭১ পৃষ্ঠা)

4. Describe briefly the employment programme under the Five Year Plans. (১৬৯-১৭১ পৃষ্ঠা)

* Appraisal and Re-appraisal of the Second Five Year Plan.

সপ্তম অধ্যায়

সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা

(PUBLIC FINANCE)

বর্তমান জগতে প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের আয়ব্যয় সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিশেষ উচ্চ ছিল না। তখনকার দিনের প্রচলিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ অনুসারে ধারণা ছিল যে রাষ্ট্রের কার্য যত সীমাবদ্ধ করা যাইবে ততই মানুষের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। সুতরাং এই নিষ্ক্রিয় পুলিসী রাষ্ট্রের কর ও ব্যয় যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করা হইত। বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে আর কেহ বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্র এখন সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র, পুলিসী রাষ্ট্র নয় ; সমাজের সর্বাংগীণ মংগলসাধন ইহার অন্যতম কর্তব্য। তাই প্রায় প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা চলিয়াছে পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের পথ প্রশস্ত করিবার। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ব্যয়ভার বহনের জন্য চাই প্রচুর অর্থ। সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হইল কিভাবে জনসাধারণের অসুবিধা না করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যায়। অন্য আর একটি দিক হইতেও রাজস্ব-ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়। আর্থিক বা ধনগত বৈষম্য অধিকাংশ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি। আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সাহায্যে এই ধনবৈষম্য অপসারণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আয়ব্যয়-ব্যবস্থার এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার গুরুত্ব

ভারতের সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ (Evolution of India's Financial System) : বর্তমানে ভারতে আমরা যে সরকারী আয়ব্যয়-ব্যবস্থা দেখিতে পাই তাহা বিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থার আলোচনার পূর্বে এই বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের আয়ব্যয়-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত এবং ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার রূপ জে. বি. নর্টনের (J. B. Norton) বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। তিনি বর্ণনা প্রসংগে এক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন : "এমনকি দুইজন ঝাড়ুদারের এক টাকা করিয়া মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হইত।"

কেন্দ্রীভূত আয়ব্যয়-ব্যবস্থা

ক্রমশ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে; সরকারী মহলেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ব্যর্থতা উপলব্ধি হয়। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োর (Lord Mayo) সরকার বিকেন্দ্রিকরণের পথে প্রথম পদসঞ্চার করে। স্থানীয় পর্যায়ের শাসন বিভাগগুলিকে প্রদেশগুলির নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমঞ্জুরের পরিমাণ হ্রাস করা হয় ও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, এবং সীমাবদ্ধভাবে প্রদেশগুলিকে করস্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই। প্রথমত, অতিরিক্ত করস্থাপনের ফলে দরিদ্রশ্রেণী প্রপীড়িত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যে-অর্থসাহায্য করা হইত তাহা কোন সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত না।

আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমশ বিকেন্দ্রিকরণ

বিকেন্দ্রিকরণের পথে পরবর্তী ধাপ হইল ১৮৭৭ সালের বন্দোবস্ত। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের নিকট অতিরিক্ত কার্যের দায়িত্ব এবং ঐ সঙ্গে রাজস্বের অতিরিক্ত উৎস হস্তান্তরিত করে। এই বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থভাণ্ডারের উপর অত্যধিক চাপকে হ্রাস করা। বিভিন্ন প্রদেশের সহিত চুক্তির সর্তের মধ্যে কোনপ্রকার সামঞ্জস্য না থাকায় এই ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ হয়। ইহা ছাড়া প্রাদেশিক রাজস্ব প্রদেশগুলির দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে অ-পর্যাপ্ত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে মোটা অংকের অর্থসাহায্য করিয়া যাইতে হয়। ১৮৮২ সালে এক নূতন নীতি প্রবর্তিত হয়; এই নীতি অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলির ঘাটতি পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্যের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় রাজস্বের একাংশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়। রাজস্বের সূত্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব (Imperial Heads), সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব (Provincial Heads), এবং দুই সরকারের মধ্যে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব (Divided Heads)। প্রদেশগুলির সহিত চুক্তির ভিত্তিতেই এই বন্দোবস্ত করা হয় এবং প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর উহার পরিবর্তনের ব্যবস্থাও থাকে। রাজস্ব সংক্রান্ত এই বন্দোবস্ত বহুদিন ধরিয়াই অব্যাহত ছিল; অবশ্য ১৯০৪ সালে প্রদেশগুলির সহিত পঞ্চবার্ষিকী চুক্তির পরিবর্তে মোটামুটিভাবে স্থায়ী চুক্তি প্রবর্তিত করা হয়।

তারপর আসিল ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার। এই শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রদেশগুলিকে কতক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা অর্পণ করা। স্বাভাবিকভাবে সরকারী আয়ব্যয় ব্যাপারেও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্বে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব ও সরকারী অর্থ-মঞ্জুরের যে-ব্যবস্থা ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়; কেন্দ্রের ও প্রদেশগুলির রাজস্বের উৎসগুলিকে পরিষ্কারভাবে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় রাজস্বের উৎসগুলির মধ্যে প্রধান ছিল আয়কর, বাণিজ্যশুল্ক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, রেলপথ, লবণ, ডাক, তার প্রভৃতি। অপরদিকে প্রদেশগুলির রাজস্বের উৎসের মধ্যে ছিল ভূমিরাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, বন, রেজিষ্টারী করিবার ফী, জলসেচ হইতে আয়, খাদ্যের উপর আবগারী শুল্ক ইত্যাদি।

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার

১৯১৯ সালের আইনে এইভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে রাজস্ব ভাগাভাগি কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বে ৯ কোটি টাকার মত ঘাটতির সৃষ্টি করে। এই ঘাটতি-পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় প্রদেশগুলি কর্তৃক অর্থপ্রদানের। ঐ উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে লর্ড মেষ্টনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের অর্থপ্রদানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। মেষ্টন রোয়েদাদ (Meston Award) প্রদেশগুলিতে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশ কেন্দ্রীয় রাজস্বের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় প্রদেশগুলির অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করা হয়; এবং অবশেষে ১৯২৭ সালে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মেষ্টন রোয়েদাদ

ভারতীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হইল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রবর্তন। এই আইনে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আংশিকভাবে ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল প্রবর্তিত করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির রাজস্বসংগ্রহ ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কে যে-ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে মোটামুটিভাবে এইভাবে বর্ণনা করা যায়:

১৯৩৫ সালের আইনে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থা:

(১) কতকগুলি রাজস্বকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়—অর্থাৎ ঐ সম্পর্কে করস্থাপনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় কেন্দ্রীয় আইনসভার হস্তে। উদাহরণস্বরূপ, বাণিজ্যশুল্ক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, কোম্পানী আয়কর, লবণকর, আয়কর (কৃষি-আয় বাদ দিয়া), রেলপথের ভাড়া বা মাসুলের উপর কর, ষ্ট্যাম্পকর, অ-কৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, যাত্রী ও দ্রব্যাদির উপর সীমাকর (terminal taxes), অ-কৃষি-জমি ব্যতীত মূলধনের উপর কর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা

(২) কতকগুলি রাজস্বপ্রাপ্তির উৎসকে প্রাদেশিক তালিকার (Provincial List) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাদেশিক রাজস্বের মধ্যে ভূমিরাজস্ব, অহিফেন, গাঁজা, সুরা ইত্যাদির উপর অন্তঃশুল্ক, কৃষি-আয়ের উপর কর, বাড়ী জমি ইত্যাদির উপর কর, পেশা ব্যবসায় বৃত্তি ইত্যাদির উপর কর, স্থানীয় সেস্, বিক্রয় কর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খ। প্রাদেশিক তালিকা

কতকগুলি করের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করা হয় যে, উহাদের ধার্য ও আদায় করিবে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু ভোগ করিবে প্রাদেশিক সরকার। অ-কৃষি-জমি ব্যতীত সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, বাণিজ্যিক ষ্ট্যাম্পের উপর কর, যাত্রী দ্রব্যাদির উপর সীমান্ত কর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে কর হইতে প্রাপ্ত অর্থকে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগাভাগি করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, আয়কর, পাটের

গ। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন

উপর রপ্তানি শুল্ক, তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, লবণকর হইতে প্রাপ্ত অর্থকে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদেশগুলিকে সাধারণ এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য অর্থ-সাহায্যের বিধান ছিল। ১৯৩৫ সালের আইনে আরও ব্যবস্থা করা হয় যে-সমস্ত রাজস্বের কথা শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই সে-সম্পর্কে গভর্ণর-জেনারেল স্থির করিবেন যে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে কে কর ধার্য করিবে।

নিমেয়ার রোয়েদাদ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পর প্রদেশগুলিকে আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুল্কের অংশ বণ্টন ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য স্যার অটো নিমেয়ারকে (Sir Otto Niemeyer) নিয়োগ করা হয়। নিমেয়ার দুইটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নিরাপত্তা ও সুনাম রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলির আর্থিক সংগতি যাহাতে যথোপযুক্ত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। নিমেয়ারের সুপারিশগুলি সরকার কর্তৃক একরূপ গৃহীত হয়। নিমেয়ার রোয়েদাদ সংক্ষেপে ছিল এইরূপঃ আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। বণ্টনযোগ্য অর্থের শতকরা ২০ ভাগ করিয়া পাইবে বাংলা ও বোম্বাই। পাট-রপ্তানি শুল্কের শতকরা ৬২½ ভাগ পাট-উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত ঘাটতিপূরণের জন্য কয়েকটি প্রদেশকে অর্থসাহায্য করিবার সুপারিশ করা হয়।

নিমেয়ার রোয়েদাদের নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল। ঘাটতির ভিত্তিতে অর্থসাহায্য ও আয়করের অংশ বণ্টন করার ফলে যে-সকল প্রদেশ ব্যয়সংক্ষেপ করে তাহাদের অংশ কম হয়, অথচ যে-সকল প্রদেশ অপচয়মূলকভাবে ব্যয় করিতে থাকে তাহাদের সুবিধা হইয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রদেশগুলির উন্নয়নমূলক কার্যের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখা হয় নাই।

যাহা হউক, ১৯৪০ সালে যুদ্ধাবস্থায় আয়কর বণ্টন সম্পর্কে নিমেয়ার-ব্যবস্থার সংশোধন করা হয় এবং ফলে প্রদেশগুলি প্রস্তাবিত সময়ের পূর্ব হইতেই আয়করের অংশ ভোগ করিতে থাকে।

দেশবিভাগে নিমেয়ার রোয়েদাদের পরিবর্তন

ইহার পর দেশবিভাগের ফলে নিমেয়ার রোয়েদাদে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের ভারত সরকারের (রাজস্ব বণ্টন) নির্দেশ দ্বারা নিমেয়ার রোয়েদাদের অস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয় এবং প্রদেশগুলির মধ্যে আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুল্কের বণ্টনযোগ্য অংশের ভাগাভাগির রদবদল করা হয়। পরে ১৯৪৯ সালে প্রদেশগুলির মধ্যে আয়কর ও পাটের উপর রপ্তানি শুল্কের অংশ বণ্টন নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার শ্রীচিন্তামন দেশমুখকে নিয়োগ করে। তাঁহার রিপোর্ট দেশমুখ রোয়েদাদ (Deshmukh Award) নামে পরিচিত। সরকার দেশমুখের সুপারিশ গ্রহণ করে এবং উহা ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে

দেশমুখ রোয়েদাদ

১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ইহার পর হইতে প্রথম ফিনান্স কমিশনের (Finance Commission) সুপারিশকে কার্যকর করা হয়। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের বর্তমান সংবিধানকে প্রবর্তিত করা হয়। আমরা একটু পরেই দেখিব যে, বর্তমান সংবিধানে পূর্বের রাজস্ব বণ্টনের মূলসূত্রগুলিকে একপ্রকার অপরিবর্তিতই রাখা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক দেশমুখ রোয়েদাদে কি ব্যবস্থা করা হয় বুঝিবার সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যের আয়করের অংশ বণ্টন সম্পর্কিত নিমেয়ার রোয়েদাদ, দেশবিভাগের পর অস্থায়ী বন্দোবস্ত ও দেশমুখ রোয়েদাদ পাশাপাশি দেওয়া হইল:

প্রদেশ বা রাজ্য	নিমেয়ার রোয়েদাদ	দেশবিভাগের পর সাময়িক বন্দোবস্ত	দেশমুখ রোয়েদাদ
বোম্বাই	২০	২১	২১
মাদ্রাজ	১৫	১৮	১৭·৫
পশ্চিমবংগ	২০ (অবিভক্ত বাংলা)	১২	১৩·৫
ইউ. পি.	১৫	১৯	১৮
মধ্যপ্রদেশ	৫	৬	৬
পাঞ্জাব	৮ (অবিভক্ত পাঞ্জাব)	৫	৫·৫
বিহার	১০	১৩	১২·৫
উড়িষ্যা	২	৩	৩
আসাম	২	৩	৩

পাট রপ্তানির উপর শুল্কের যে-ভাগ সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইত তাহা ১৯৪৮ সালের নির্দেশে শতকরা ৬২½ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা ২০ ভাগ করা হয়। নূতন সংবিধানে পাট রপ্তানির উপর শুল্কের অংশপ্রদানের স্থলে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলিকে নির্দিষ্ট অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা হয়। দেশমুখ রোয়েদাদে নিম্নলিখিত হারে অর্থসাহায্য দেওয়ার সুপারিশ করা হয়: পশ্চিমবংগ ১০৫ লক্ষ টাকা; আসাম ৪০ লক্ষ টাকা; বিহার ৩৫ লক্ষ টাকা; এবং উড়িষ্যা ৫ লক্ষ টাকা।

দেশমুখ রোয়েদাদও কোন প্রদেশকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পশ্চিমবংগের দিক হইতে আপত্তি করা হয় যে, উহার জনসংখ্যা বোম্বাই রাজ্যের সমান হইলেও উক্ত রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবংগকে কম অংশ বণ্টন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বংগ-বিভাগের ফলে আয়করের খাতে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়—অথচ দেশমুখ রোয়েদাদে পশ্চিমবংগকে কয়েক কোটি টাকা কমাইয়া দেওয়া হয়। আরও বলা হয় যে, করসংগ্রহের সহিত বণ্টনের কোন সম্পর্কই রাখা হয় নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজ রাজ্য যথাক্রমে করসংগ্রহ ও জনসংখ্যার নীতির ভিত্তিতে আরও অধিক অংশের দাবি জানায়। বিহার অ-পর্যাপ্তির কারণে অধিক পাওয়ার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার কয়েকটি সাধারণ নীতি (General Principles of Federal Finance) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে কেন্দ্রীয় ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে নিজস্ব ক্ষেত্রে একে অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে—অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং অংগরাজ্য উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন। এই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে উভয় সরকারেরই নিজস্ব কর্তব্যপালনের জন্য পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা এবং ঐ আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা চাই। যেখানে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হাত পাতিতে হয় সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকার অংগরাজ্যগুলির আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। অতএব সমস্যার সমাধানের উপায় হইল দায়িত্বপালনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এমনভাবে প্রত্যেক সরকারের জন্য রাজস্বপ্রাপ্তির পৃথক্ সূত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। কিন্তু এইভাবে রাজস্বপ্রাপ্তির সূত্র ও কর্তব্যের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্যবিধান করা বাস্তব ক্ষেত্রে অসম্ভব। ইহা ব্যতীত শাসনতান্ত্রিক সুবিধার (administrative expediency) প্রশ্নও রহিয়াছে। যাহাতে সাধারণ করদাতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়, যাহাতে কর আদায়ে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং যাহাতে কর স্থাপনে সমতা রক্ষিত হয় তাহার জন্য আয়করের মত কতকগুলি কর আদায়ের ভার দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর, কিন্তু কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ হয় দুই সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয় না-হয় উহাকে আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পর্যাপ্তি (adequacy) এবং শাসনতান্ত্রিক সুবিধার (administrative expediency) স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য-নীতিকে (principle of independence) কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতে হয়। সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় যাহা করা হয় তাহা হইল এইরূপ : প্রথমত, রাজস্বপ্রাপ্তির কতকগুলি সূত্রকে দুই সরকারের মধ্যে পৃথক্‌ভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি সূত্রকে যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। ইহা ছাড়া রাজস্ব বণ্টন ও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত করার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যনীতিকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, অর্থসাহায্যের (grants) কথা উল্লেখ করা যায়। প্রায় সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করা বাধ্যতামূলক (obligatory) নয়, সেখানে আঞ্চলিক সরকারের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট আশংকা থাকে।

অংগরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও রাজস্ব বণ্টন

স্বাতন্ত্র্যনীতির সহিত পর্যাপ্তি ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার নীতির সামঞ্জস্যবিধান

অনুদান-ব্যবস্থা

রাজস্বসূত্র বণ্টনের সময় দুই সরকারের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের প্রকৃতির দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। সম্প্রসারণশীল কার্যের দায়িত্ব যাহার উপর ন্যস্ত থাকে তাহার হাতে প্রসারণশীল রাজস্বসূত্র দেওয়া প্রয়োজন। অপরপক্ষে অনতিপরিবর্তনশীল কার্যাদির

জন্য অনতিপরিবর্তনশীল (inelastic) রাজস্বসূত্র নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত। তবে এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান জগতে প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য প্রায় বিলুপ্তিলাভ করিতেছে। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার মূলে রহিয়াছে শিল্পগত কলাকৌশল ও পরিবহনের উন্নতি, বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট, রাষ্ট্রের সমাজ-কল্যাণকর কার্য এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই সকল বিষয় কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিতে কিভাবে সহায়তা করে তাহা দু'একটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ব্যাপক বেকার-সমস্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে কেন্দ্রীয় শক্তির সাহায্য ব্যতীত অংগরাজ্যের পক্ষে ইহাদের সমাধান করা সম্ভব নয়। আবার ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে হইলে কেন্দ্রীভূত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যে-সকল দেশে ধনতন্ত্র প্রচলিত সেখানেও দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্দেশে একচেটিয়া ব্যবসার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের।

বর্তমান জগতে কেন্দ্রের দিকে ঝোঁক অতি প্রবল

কেন্দ্রিকতার কারণ

বর্তমান সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থা (Federal Finance under the Present Constitution): যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সাধারণ নীতির আলোচনার পর দেখা যাউক বর্তমান সংবিধানের বন্টন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি। নূতন সংবিধান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ব্যবস্থাকেই মোটামুটিভাবে বজায় রাখিয়াছে। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে ইউনিয়ন তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) ও যুগ্ম তালিকার (Concurrent List) এই তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের গুরুত্ব অতি সামান্য।

রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা তিনটি তালিকার দ্বারা বণ্টন

ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হইল: বাণিজ্যশুল্ক; আয়কর (কৃষি-আয়কর ব্যতীত); * কোম্পানী আয়কর; ভারতে নির্মিত বা উৎপাদিত তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যের (মানুষের উপভোগের কোহল পানীয়, অহিফেন, ভারতীয় গাঁজা ও নিদ্রাবহ পদার্থ ব্যতীত) উপর অন্তঃশুল্ক; ব্যক্তিসমূহের এবং কোম্পানীসমূহের (কৃষি-ভূমি ভিন্ন অন্য) পরিসম্পদের মূলধন-মূল্যের উপর কর; কোম্পানীসমূহের মূলধনের উপর কর; কৃষি-জমি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কিত সম্পত্তিশুল্ক; কৃষি-জমি ছাড়া অন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত শুল্কসমূহ; রেলপথে, বিমানপথে বা সমুদ্রপথে বাহিত দ্রব্যসমূহ ও যাত্রীদের উপর সীমাকর (terminal taxes); রেলপথে বাহিত যাত্রী ও বস্তুর উপর কর; সংবাদপত্র ক্রয়বিক্রয়ের উপর এবং উহাতে

ক। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

* মূলধন-লাভ কর আয়করেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর; বিনিময় পত্র, চেক, প্রমিসরি নোটসমূহ, বহনপত্র (bills of lading), প্রত্যয়পত্র, বীমা-পলিসি, অংশ হস্তান্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত ষ্ট্যাম্প-শুল্কের হার; ষ্টক এক্সচেঞ্জে ও ভাবী বাজারে লেনদেনের উপর ষ্ট্যাম্প কর ব্যতীত অন্য কর। ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট বিষয় (residuary subjects) অর্থাৎ উপরি-উক্ত তিনটি তালিকার বহির্ভূত কর ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত।*

খ। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

রাজ্যের রাজস্বপ্রাপ্তির প্রধান সূত্রগুলি হইল: ভূমিরাজস্ব; কৃষিগত আয়ের উপর কর; কৃষি-জমির উপর উত্তরাধিকার কর; কৃষি-জমির সম্পর্কিত সম্পত্তিকর (Estate Duty); ভূমি ও বাড়ীর উপর কর; খনিজ অধিকারসমূহের উপর কর; রাজ্যে নির্মিত বা উৎপাদিত নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের উপর অন্তঃশুল্ক (Excise Duties) এবং অনুরূপ দ্রব্যসমূহ ভারতের অন্যত্র নির্মিত বা উৎপাদিত হইলে একই হারে অথবা নিম্নতর হারে তাহার উপর প্রতিশুল্ক: (১) মানুষের উপভোগার্থ কোহল পানীয়, এবং (২) অহিফেন, ভারতীয় গাঁজা ও অন্যান্য নিদ্রাবহ পদার্থ; কোন স্থানীয় অঞ্চলে উপভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য প্রবেশের উপর কর; বিদ্যুৎ ব্যবহার বা বিক্রয়ের উপর কর; সংবাদপত্র ভিন্ন অন্য দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয়ের উপর কর; সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ভিন্ন অন্য বিজ্ঞাপনের উপর কর; রাজপথ বা অন্তর্দেশীয় জলপথে বাহিত দ্রব্য ও যাত্রীদের উপর কর; রাজপথে ব্যবহারযোগ্য যানবাহনের উপর কর; পশু ও নৌকার উপর কর; পথকর (tolls); বৃত্তি, ব্যবসায়, পেশা ও চাকরির উপর কর; বিলাসদ্রব্যের উপর কর (প্রমোদ, আমোদ, পণক্রিয়া ও জুয়াখেলার উপর কর ইহার অন্তর্ভুক্ত)।

গ। ইউনিয়ন কর্তৃক ধার্য কিন্তু রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত ও ভোগ্য কর

১৯৫৩ সালের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে বর্তমান সংবিধানে পর্যাপ্তি ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার স্বার্থে কতকগুলি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাগুলি নিম্নলিখিত রূপ: (১) কতকগুলি শুল্ক আছে যাহা কেন্দ্র স্থাপন করে কিন্তু উহা সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্যসমূহ। ইউনিয়ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত ষ্ট্যাম্প কর এবং ঔষধপত্র ও প্রসাধনসামগ্রীর উপর অন্তঃশুল্ক এই পর্যায়ে পড়ে। (২) অ-কৃষি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর ও সম্পত্তি কর, সীমাকর, রেলপথে যাত্রীর বস্তুর উপর কর প্রভৃতি কতকগুলি কর আছে যাহা ইউনিয়ন স্থাপন ও সংগ্রহ করে, কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব রাজ্যসমূহকে সমর্পণ করা হয়।

ঘ। ইউনিয়ন কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত কিন্তু রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত কর

(৩) কৃষি-আয় ব্যতীত অন্য আয়ের উপর কর ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও সংগৃহীত হয় কিন্তু উহা ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে করপোরেশন কর (Corporation Tax) বণ্টিত হয় না। ইহা ছাড়া ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহে (Union Territories) উৎপন্ন

* অবশিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ব্যয়কর (Expenditure Tax) কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত।

আয়কর এবং কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত বেতনাদির উপর দেয় করও বণ্টনযোগ্য আয়করের মধ্যে পড়ে না। এই সকল কর বাবদ সংগৃহীত অর্থ বাদ দিয়া প্রতি আর্থিক বৎসরে আয়কর হইতে যে নীট অর্থ পাওয়া যায় তাহার একটা অংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মোট আয়করের শতকরা কত ভাগ রাজ্যগুলি পাইবে এবং রাজ্যগুলির মোট অংশ কিভাবে বন্টিত হইবে তাহা রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নির্ধারণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আয়কর হইতে রাজ্যের আয় অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

৬। ইউনিয়ন ও রাজ্যের মধ্যে বন্টিত কর

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক সরকারগুলিকে অর্থসাহায্য করার ব্যবস্থা থাকে। ভারতীয় সংবিধানেও অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই অর্থসাহায্য দুই প্রকারের—নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য (specific grants) এবং সাধারণ অর্থসাহায্য (general grants)। নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে প্রতি বৎসর পাট বা পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক হইতে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবংগ রাজ্যকে অংশ সমর্পণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হইবে। যতদিন পর্যন্ত পাট বা পাটজাত শিল্পের উপর শুল্ক ধার্য থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এই অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা চালু থাকিবে ; তবে দশ বৎসরের অধিককাল—অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের পর ঐ ব্যবস্থা চলিবে না। অর্থসাহায্যের পরিমাণ ফিনান্স কমিশনের সুপারিশসমূহ বিচার-বিবেচনার পর রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করিবেন। নির্দিষ্ট ধরনের অর্থসাহায্য করিবার অন্যান্য ব্যবস্থাও আছে। তপশীলী জনজাতি (Scheduled Tribes) ও তপশীলী অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়নসাধনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে অর্থসাহায্য করা যাইতে পারে। তবে এইরূপ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ অর্থসাহায্য সম্পর্কে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট যে-সকল রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে সেই সকল রাজ্যকে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট হইতে পারে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সাধারণ অর্থসাহায্যের ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন, অর্থসাহায্যের নীতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি ফিনান্স কমিশন গঠন করিতে হয়। অবশ্য ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ বাধ্যতামূলক নয়।

অনুদান ঃ

নির্দিষ্ট ধরনের অনুদান

সাধারণ অনুদান

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় সরকারী আয়ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থা অত্যন্ত কেন্দ্রপ্রবণ; আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হইলেও আসলে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার দিকে ঝোঁক অতিমাত্রায় প্রবল। রাজ্যের এলাকাধীন রাজস্বসমূহও অনতিপরিবর্তনশীল। উপরন্তু, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাদিকে পরিবর্তন করিতে বা বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। যাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এবং রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের সমর্থক তাঁহারা ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। অপরপক্ষে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করিবার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পূর্বেকার ধারণা বর্তমান জগতে একপ্রকার অচল হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশের মত ভারত সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। জনসাধারণের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। পরিকল্পনার কার্যকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সংগতি ও পরিচালন-ক্ষমতাকে প্রসারিত করিতে হইবে। যাহাতে বিভিন্ন রাজ্য সমতালে দেশের কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহার তদারক করিবার ভার কেন্দ্রের উপর অর্পিত করিতে হইবে। ইহার দ্বারা রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ত হইবেই না বরং উহা প্রসারলাভ করিবে।

ভারতীয় সংবিধান কেন্দ্রপ্রবণ

এই যুক্তির ভিতর যে যথেষ্ট সত্য রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে মনে রাখিতে হইবে কেন্দ্রিকরণ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন সামাজিক সম্পর্ককে সাম্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠন করা হয়। বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ প্রাধান্যলাভ করিলে কেন্দ্রিকরণ সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়।

ফিনান্স কমিশন (Finance Commission): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫১ সালে প্রথম ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করা হয় এবং কমিশন ১৯৫২ সালে উহার রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন যে-সকল সুপারিশ করে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল:

(১) আয়কর বণ্টন সম্পর্কিত সুপারিশ: কমিশন মত প্রকাশ করে যে, কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্বের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য আয়করের উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। তবুও কমিশন রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্যগুলির অংশ শতকরা ৫০ ভাগ হইতে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ করিবার সুপারিশ করে। ইহার পর প্রশ্ন আসে রাজ্যগুলির মধ্যে তাহাদের মোট অংশ কোন্ নীতির ভিত্তিতে বণ্টন করা হইবে। সংগ্রহস্থান (place of collection), আয়ের উৎপত্তিস্থান (origin of income), রাজ্যের জনসংখ্যা, শিল্পশ্রমিকের পরিমাণ (volume of industrial labour), মাথাপিছু আয়, রাজ্যের প্রয়োজন প্রভৃতি নীতি কমিশনের সম্মুখে

আয়করের বণ্টন

উপস্থাপিত করা হয়। বোম্বাই ও পশ্চিমবংগ সংগ্রহের ভিত্তির উপর অধিক জোর দেয়। নানাদিক বিচার-বিবেচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত কমিশন সুপারিশ করে যে রাজ্যগুলির মোট অংশের শতকরা ৮০ ভাগ বণ্টন করা হইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আর শতকরা ২০ ভাগ বণ্টন করা হইবে সংগ্রহনীতির ভিত্তিতে। এই দুই ভিত্তিতে নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে উহাদের অংশ বিতরণের সুপারিশ করা হয়: (১) বোম্বাই ১৭·৫০%, (২) উত্তরপ্রদেশ ১৫·৭৫%, (৩) মাদ্রাজ ১৫·২৫%, (৪) পশ্চিমবংগ ১১·২৫%, (৫) বিহার ৯·৭৫%, (৬) মধ্যপ্রদেশ ৫·২৫%, (৭) উড়িষ্যা ৩·০৫%, (৮) আসাম ২·২৫%, ইত্যাদি।

(২) ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের (Union Excises) বণ্টন সম্পর্কে সুপারিশ: কমিশন রাজ্যগুলিকে তামাক, দিয়াশলাই ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক হইতে আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। এই তিনটি দ্রব্য নির্বাচন করিবার যুক্তি হইল যে, ইহাদের ব্যবহার ব্যাপক এবং ইহার স্থায়ী রাজস্ব আয়ের অন্যতম সূত্র। রাজ্যগুলিকে প্রদেয় অংশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করিবার সুপারিশ করে। এই ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যের ভাগে যে-অংশ পড়ে তাহা হইল: (১) উত্তরপ্রদেশ ১৮·২৩%, (২) মাদ্রাজ ১৬·৪৪%, (৩) বিহার ১১·৬০%, (৪) বোম্বাই ১০·৩৩%, (৫) পশ্চিমবংগ ৭·১৬%, (৬) পাঞ্জাব ৩·৬৬%, (৭) আসাম ২·৬১%, ইত্যাদি।

অন্তঃশুল্কের বণ্টন

(৩) পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে অর্থসাহায্য সম্পর্কে সুপারিশ: আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে কিভাবে দেশমুখ রোয়েদাদে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অর্থসাহায্যের পরিমাণ ধার্য করা হয়। ফিনান্স কমিশন অর্থসাহায্য কিছুটা বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির অর্থসাহায্যের পরিমাণ যাহা দাঁড়ায় তাহা হইল: পশ্চিমবংগ ১৫০ লক্ষ টাকা, বিহার ৭৫ লক্ষ টাকা, আসাম ৭৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ টাকা।

পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকে অর্থসাহায্য

(৪) সাহায্যস্বরূপ অনুদানের (Grants-in-aid) নীতি ও পরিমাণ সম্পর্কে সুপারিশ: অর্থসাহায্য সম্পর্কে কমিশন কতকগুলি নীতি অনুসরণের কথা উল্লেখ করে। প্রথমত, বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট সম্পর্কিত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলি করসংগ্রহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তৃতীয়ত, যে-সকল রাজ্য ব্যয়সংক্ষেপের দিকে লক্ষ্য রাখে তাহারা কেন্দ্রীয় সাহায্য পাইবার অধিক উপযোগী বলিয়া মনে করিতে হইবে। চতুর্থত, সাহায্য-প্রদানের সময় বিভিন্ন রাজ্যের অত্যাবশ্যকীয় সমাজ-সেবামূলক কার্যাদির (social services) অবস্থার দিকে নজর দিতে হইবে। যে-সকল রাজ্যের অত্যাবশ্যকীয় সমাজসেবার মান নিম্ন সেই রাজ্যগুলিকে অধিকমাত্রায় সাহায্যপ্রদানের অবকাশ রহিয়াছে। পঞ্চমত, যে-সকল রাজ্যের উপর বিশেষ ধরনের দায়িত্ব পড়িয়াছে সে-সকল

অনুদানের সাধারণ নীতি

রাজ্যকে অর্থসাহায্য করিতে হইবে। যেমন, ভারত-বিভাগের ফলে পশ্চিমবংগের উপর সীমান্ত রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব পড়িয়াছে। ষষ্ঠত, সমগ্র জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এমন সমস্ত উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলিকে অর্থসাহায্য করার প্রয়োজন হইতে পারে।

উপরি-উক্ত নীতিগুলির ভিত্তিতে ফিনান্স কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, রাজস্থান, মধ্যভারত এবং পেপ্সু রাজ্যের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নাই। অপরদিকে আসাম এবং পাঞ্জাবকে সাহায্য করা একান্তভাবে প্রয়োজন; ত্রিবাংকুর-কোচিন ও মহীশূর রাজ্যেরও কতকটা সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। বোম্বাই, পশ্চিমবংগ, উড়িষ্যা এবং সৌরাষ্ট্রকে উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর কোনটিতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যাহা হউক কমিশন কতকগুলি রাজ্যকে নিম্নলিখিত পরিমাণ বাৎসরিক অর্থসাহায্য করিবার সুপারিশ করে: দেশবিভাগের ফলে বিশেষ সমস্যা দেখা দেওয়ায় পশ্চিমবংগকে ৮০ লক্ষ টাকা করিয়া বার্ষিক সাহায্যপ্রদান করিবার সুপারিশ করা হয়। উড়িষ্যার সমাজ-সেবামূলক কার্যাদির অত্যল্প প্রসার হওয়ায় ঐ রাজ্যকে ৭৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক সাহায্যদানের পরামর্শ দেওয়া হয়। পাঞ্জাব ও আসামকে যথাক্রমে ১২৫ ও ১০০ লক্ষ টাকা করিয়া অর্থসাহায্যদানের প্রস্তাব করা হয়। ইহা ছাড়া মহীশূর, সৌরাষ্ট্র ও ত্রিবাংকুর-কোচিনকে যথাক্রমে ৪০, ৪০ ও ৫৫ লক্ষ টাকা করিয়া বার্ষিক সাহায্যপ্রদানের সুপারিশ করা হয়।

বিভিন্ন রাজ্যকে সাহায্যপ্রদান

উল্লিখিত ধরনের অর্থসাহায্য প্রদান ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের জন্য বিহার, হায়দরাবাদ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পেপ্সু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানকে অর্থসাহায্য করিবার প্রস্তাব করা হয়। এই সাহায্য ক্রমবর্ধমান হারে চার বৎসর পর্যন্ত দেওয়ার কথা ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অনুদান

আশা করা হইয়াছিল, ফিনান্স কমিশনের এই সকল সুপারিশের ফলে রাজ্যগুলির বার্ষিক আয় ২১ কোটি টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ, ১৯৪৯ সাল এবং ১৯৫২ সালের মধ্যে কেন্দ্র হইতে রাজ্যসমূহের প্রাপ্ত গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল ৬৫·১২ কোটি টাকা; কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক আয় এখন বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ৮৫·৯৩ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আয়কর ও ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের অংশ হইতে গড়পড়তা বার্ষিক আয় ৭১·৫০ কোটি টাকা আর বিভিন্ন প্রকারের অনুদান (grants) হইতে বার্ষিক আয় হইবে ১৪·৪৩ কোটি টাকা।

প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের ফলাফল

প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছিল। আশা করা হইয়াছিল, কমিশন রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের কথা বিচার-বিবেচনা করিয়া রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর পরিমাণ অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু ফিনান্স কমিশন রাজ্যগুলির দাবির ন্যায্য বিচার করে নাই। বোম্বাই ও পশ্চিমবংগের দিক হইতে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে আয়করের অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের যে-ভিত্তি কমিশন গ্রহণ করিয়াছে তাহা সমুচিত হয় নাই, সংগ্রহস্থলের (place of collection) উপর

প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের সমালোচনা

অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল। জনসংখ্যার উপর জোর দেওয়ার ফলে বোম্বাই ও পশ্চিমবংগের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে কারণ এই দুইটি রাজ্যের অভ্যন্তরে আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহা ব্যতীত শিল্পপ্রধান বলিয়া কল্যাণকর কার্য এবং আইন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য ইহাদের ব্যয়ও অধিক। অন্তঃশুল্কের বণ্টন ব্যাপারে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে জনসংখ্যার পরিবর্তে বিভিন্ন রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার ও উহাদের সংগ্রহস্থলের উপরই ভিত্তি করা সমীচীন ছিল। অনুদান বা অর্থসাহায্য (grants) সম্পর্কে বক্তব্য হইল যে, বাজেট অবস্থার প্রতি অধিক দৃষ্টি না দিয়া বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনের দিকে অধিক নজর দেওয়া উচিত ছিল। আর একটি অভিযোগ ছিল যে সাহায্যস্বরূপ অনুদান-ব্যবস্থা প্রসারের ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে এবং অংগরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগে পূর্বেকার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা সম্ভব নয়।

যাহা হউক, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রাজ্য পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী রাজস্বের বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য আর একটি ফিনান্স কমিশন নিয়োগ করা হয়। প্রথম কমিশনের তুলনায় দ্বিতীয় কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল ব্যাপকতর। কমিশনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুপারিশ করিবার ভার ছিল : (১) কেন্দ্র ও পুনর্গঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনযোগ্য কেন্দ্রীয় করগুলির বণ্টন ও সাহায্য-স্বরূপ অনুদানের নীতি; (২) আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবংগকে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে অর্থসাহায্য; (৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন ও রাজ্যগুলির নিজস্ব রাজস্বসূত্র হইতে অতিরিক্ত করসংগ্রহের প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে-সকল রাজ্যের সাহায্যের প্রয়োজন তাহাদিগকে সাহায্যস্বরূপ অনুদান; (৪) রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পত্তিকর বণ্টনের পদ্ধতি; (৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকারের ঋণের যথোপযুক্ত সর্ত নির্ধারণ। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা ব্যাপকতর। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে ২,২৪১ কোটি টাকার ব্যয়ভার রাজ্যগুলিকে বহন করিতে হইবে। পরিকল্পনার হিসাব অনুসারে রাজ্যগুলির রাজস্ব ও মূলধন খাতে (অতিরিক্ত কর ও কেন্দ্রের অতিরিক্ত করের রাজ্যের অংশ ধরিয়া) আয় উপরি-উক্ত ব্যয়ের পক্ষে শতকরা ৬০ ভাগের মত ঘাটতি পড়িবে। এই কারণে পরিকল্পনায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে, কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের একটি প্রধান কার্য হয় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির প্রয়োজন ও আর্থিক সংগতির মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্যবিধান করা যায় তাহা নির্ধারণ করা।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে কমিশন আয়কর, সম্পত্তিকর এবং ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের বণ্টন এবং সাহায্যস্বরূপ অনুদান প্রদান সম্পর্কে প্রধানত প্রথম কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই অন্তর্বর্তী-কালের জন্য সুপারিশ (Interim Recommendations) করে। এই অন্তর্বর্তী সুপারিশ এক আর্থিক বৎসর বা ১৯৫৭-৫৮ সালের জন্যই প্রযুক্ত ছিল। সংক্ষেপে ইহাদিগকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের অন্তর্বর্তী সুপারিশ :

(ক) আয়করের শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হইবে ; রাজ্যগুলির মোট অংশ বিভিন্ন রাজ্য নিম্নলিখিত হারে পাইবে : (১) বোম্বাই—১৮'৯১% ; (২) উত্তরপ্রদেশ—১৫'৫৯% ; (৩) পশ্চিমবংগ—১১'৪৮% ; (৪) জম্মু ও কাশ্মীর—১'০১% ; (৫) অন্ধ্রপ্রদেশ—৮'০১% ; (৬) আসাম—২'২৩% ; (৭) বিহার—৯'৩২% ; (৮) কেরল—৩'৬% ; (৯) মধ্যপ্রদেশ—৫'০৯% ; (১০) মাদ্রাজ—৭'৯৫% ; (১১) মহীশূর—৫'৯৩% ; (১২) উড়িষ্যা—৩'৪৬% ; (১৩) পাঞ্জাব—৩'৯৬% ; (১৪) রাজস্থান—৩'৪৭%। ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের ভাগ হইল করের নীট আদায়ের শতকরা ১ ভাগ।

আয়কর সম্বন্ধে সুপারিশ

(খ) অ-কৃষি-সম্পত্তির উপর ধার্য সম্পত্তিকর রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর যেভাবে বণ্টিত হয় সেভাবে বণ্টিত হইবে।

(গ) ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ ছিল যে দিয়াশলাই, তামাক ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ধার্য অন্তঃশুল্কের শতকরা ৪০ ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হইবে। রাজ্যগুলির অংশ নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা হইবে :

ইউনিয়ন অন্তঃশুল্ক

(১) উত্তরপ্রদেশ—১৮% ; (২) বোম্বাই—১৩'৫৯%। (৩) বিহার—১১'০৪%।
(৪) অন্ধ্রপ্রদেশ—৮'৯২% ; (৫) আসাম—২'৫৮% ; (৬) কেরল—৩'৮৬% ;
(৭) মধ্যপ্রদেশ—৬'১৭% ; (৮) মাদ্রাজ—৮'৫৪% ; (৯) মহীশূর—৫'৪৫% ;
(১০) উড়িষ্যা—৪'১৭% ; (১১) পাঞ্জাব—৮'৬% ; (১২) রাজস্থান—৪'৩৪% ;
(১৩) পশ্চিমবংগ—৭'৪৯% ; (১৪) জম্মু ও কাশ্মীর—১'২৫%।

(ঘ) পাটের রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি নিম্নলিখিত অর্থসাহায্য পাইবে—পশ্চিমবংগ ১৫২'৬৯ লক্ষ টাকা ; আসাম ৭৫ লক্ষ টাকা ; বিহার ৭২'৩১ লক্ষ টাকা ; এবং উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ টাকা।

পাটের রপ্তানি শুল্ক

(ঙ) তপশীলী জাতির (Scheduled Tribes) কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে গৃহীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহনের জন্য নিম্নলিখিত সাহায্যস্বরূপ অনুদান প্রদানের সুপারিশ করা হয় : অন্ধ্রপ্রদেশ ২৪ লক্ষ টাকা ; আসাম ১ কোটি টাকা ; বিহার ৫ লক্ষ টাকা ; মহীশূর ৩৬ লক্ষ টাকা ; উড়িষ্যা ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ; পাঞ্জাব ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ;

তপশীলী জাতির জন্য ব্যয়ের উদ্দেশ্যে অনুদান

রাজস্থান ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা; পশ্চিমবংগ ৮৩ লক্ষ টাকা; এবং জম্মু ও কাশ্মীর ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হয়। কমিশন প্রথমেই মন্তব্য করিয়াছে যে অনেক রাজ্যই করসংগ্রহে যথেষ্ট চেষ্টা করে নাই; সম্যক চেষ্টা করা হইলে অনেক রাজ্যই ঘাটতির হাত হইতে রেহাই পাইতে পারিত। আবার কতিপয় রাজ্যে বাকী রাজস্ব ও অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ অত্যধিক এবং অনতিবিলম্বে উহা আদায় করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে যাইয়া রাজ্যগুলির সরকারী ঋণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং সেচ, বিদ্যুৎ, পরিবহন-ব্যবসা, শিল্পপরিকল্পনা প্রভৃতি হইতে যথাসম্ভব আয় না বাড়াইতে পারিলে সুদের চাপ বাড়িয়া যাইবে। রাজ্যগুলি যাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক ব্যয়-সংকুলানের মত অর্থ পায় এবং রাজস্ব খাতে পরিকল্পনার ব্যয় মিটাইতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ফিনান্স কমিশন রাজস্ব বণ্টনের সুপারিশ করিয়াছে। কমিশনের সুপারিশগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল :

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের চূড়ান্ত সুপারিশ

(১) আয়কর বণ্টন সম্পর্কিত সুপারিশ : করপোরেশন কর ব্যতীত আয়কর হইতে মোট নীট প্রাপ্ত অর্থ শতকরা ৬০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে আয়কর হইতে নীট আয় হিসাবের সময় ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহে উৎপন্ন আয়কর (শতকরা ১ ভাগ) এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বেতনাদির উপর দেয় করকে বাদ দিতে হইবে। রাজ্যগুলির প্রাপ্য মোট অংশকে আবার উহাদের মধ্যে জনসংখ্যা (population) ও সংগ্রহনীতির (collection) ভিত্তিতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। শতকরা ৯০ ভাগ দেওয়া হইবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আর ১০ ভাগ দেওয়া হইবে সংগ্রহস্থলের ভিত্তিতে। এই দুই ভিত্তিতে নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আয়করের বণ্টনযোগ্য অংশ বিতরণের সুপারিশ করা হয় :

আয়করের বণ্টন

রাজ্য	শতকরা অংশ	রাজ্য	শতকরা অংশ
অন্ধ্রপ্রদেশ	... ৮·১২	মহীশূর	... ৫·১৪
আসাম	... ২·৪৪	উড়িষ্যা	... ৩·৭৩
বিহার	... ৯·৯৪	পাঞ্জাব	... ৪·২৪
বোম্বাই	... ১৫·৯৭	রাজস্থান	... ৪·০৯
কেরল	... ৩·৬৪	উত্তরপ্রদেশ	... ১৬·৩৬
মধ্যপ্রদেশ	... ৬·৭২	পশ্চিমবংগ	... ১০·০৮
মাদ্রাজ	... ৮·৪০	জম্মু ও কাশ্মীর	... ১·১৩

(২) ইউনিয়ন অন্তঃশুল্কের (Excise Duties) বণ্টন সম্পর্কে সুপারিশ : পূর্বে রাজ্যগুলিকে তামাক, দিয়াশলাই ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর ইউনিয়ন শুল্কের ৪০

ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় কমিশন তামাক, দিয়াশলাই, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কফি, চা, কাগজ ও অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর শুল্কের শতকরা ২৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিবার সুপারিশ করে। রাজ্যগুলির অংশকে প্রধানত জনসংখ্যার ভিত্তিতে উহাদের মধ্যে বণ্টিত করা হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের ভাগে যাহা পড়িবে তাহা হইল এইরূপ ঃ

অন্তঃশুল্কের বণ্টন

রাজ্য	শতকরা অংশ	রাজ্য	শতকরা অংশ
অন্ধ্রপ্রদেশ	৯.৩৮	মহীশূর	৬.৫২
আসাম	৩.৫৬	উড়িষ্যা	৪.৪৬
বিহার	১০.৫৭	পাঞ্জাব	৪.৫৯
বোম্বাই	১২.১৭	রাজস্থান	৪.৭১
কেরল	৩.৮৪	উত্তরপ্রদেশ	১৫.৯৪
মধ্যপ্রদেশ	৭.৪৬	পশ্চিমবংগ	৭.৫৯
মাদ্রাজ	৭.৫৬	জম্মু ও কাশ্মীর	১.৭৫

ইহা ব্যতীত বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক হইতে যে-আয় হইবে তাহা হইতে প্রথমে রাজ্যগুলিকে বিক্রয়করের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হইবে; যদি ইহার পর কোন উদ্বৃত্ত থাকে তাহা অংশত জনসংখ্যা অনুযায়ী এবং অংশত ভোগ (consumption) অনুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক

(৩) সম্পত্তিকর (Estate Duty) বণ্টন সম্পর্কে সুপারিশ ঃ কমিশন সুপারিশ করিয়াছে যে ১৯৫৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্বতন ব্যবস্থা চালু রাখা হইবে। ইহার পর ভবিষ্যতে ইউনিয়ন অঞ্চলের জন্য শতকরা ১ ভাগ রাখিয়া বাকিটা স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তি মূল্যের পরিমাণ অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তির ভাগে যে-অংশ পড়িল তাহা রাজ্যগুলির মধ্যে প্রত্যেক রাজ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ অনুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। আর অস্থাবর সম্পত্তির ভাগে যাহা পড়িল তাহা রাজ্যগুলির মধ্যে তাহাদের জনসংখ্যা অনুসারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। অস্থাবর সম্পত্তির অংশের মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবংগের প্রাপ্য হইবে শতকরা ৭.৩৭ ভাগ।

সম্পত্তিকরের বণ্টন

(৪) পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে অর্থসাহায্য সম্পর্কে সুপারিশ ঃ পূর্বের ব্যবস্থানুযায়ী পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে যথাক্রমে ১৫০ লক্ষ টাকা, ৭৫ লক্ষ টাকা, ১৫ লক্ষ টাকা ও ৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়; অবশ্য রাজ্য পুনর্গঠনের পরে বিহারের ভাগ হইতে ২.৬৯ লক্ষ টাকা কমাইয়া পশ্চিমবংগকে দেওয়া হইতেছে। কমিশন সুপারিশ করিয়াছে যে ১৯৬০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু রাখা হইবে। সংবিধান অনুসারে ঐ তারিখেই এই

পাট উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিকে অর্থ-সাহায্য

প্রকার অর্থসাহায্য যখন বাতিল হইয়া যাইবে তখন উহাদের সাধারণ সাহায্যস্বরূপ অনুদান (general grants-in-aid) বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৫) সাহায্যস্বরূপ অনুদান (Grants-in-aid) সম্পর্কে সুপারিশ : কোন্ রাজ্যের অর্থসাহায্য প্রয়োজন ও কতটা পরিমাণ অর্থসাহায্য প্রয়োজন তাহা আলোচনা করিতে যাইয়া কমিশন উক্তি করিয়াছে যে রাজ্যগুলিকে শাসন বিভাগের ব্যয়সংকোচ করিয়া, কর আদায়ের সুব্যবস্থা করিয়া এবং অনাদায়ী অর্থ আদায় করিয়া পরিকল্পনার চলতি ব্যয়নির্বাহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। যাহা হউক মোটামুটিভাবে অর্থসাহায্য প্রদান সম্পর্কে কমিশন তিনটি নীতির উল্লেখ করিয়াছে : (ক) অর্থসাহায্য ও উহার পরিমাণ ব্যাপকভাবে রাজস্ব সম্পর্কিত প্রয়োজনের (fiscal needs) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থির করিতে হইবে। পরিকল্পনার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনকে বিচার করিতে হইবে। (খ) স্বাভাবিক অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়সংকুলানের জন্য সাধারণ রাজস্বে ঘাটতি হইলে তাহা যথাসম্ভব বণ্টিত কর হইতে মিটাইবার চেষ্টা করা উচিত। ইহা সত্ত্বেও ঘাটতি থাকিলে অর্থসাহায্য করা যাইতে পারে। (গ) অন্যান্য ব্যাপক উদ্যোগেও প্রয়োজন হইলে অর্থসাহায্য দেওয়া যাইবে তবে ঐ উদ্দেশ্যেই অর্থকে ব্যয় করিতে হইবে। এই সকল নীতির ভিত্তিতে কমিশন বিভিন্ন রাজ্যকে নিম্নে বর্ণিত অর্থসাহায্য করিতে সুপারিশ করিয়াছে :

অনুদানের নীতি

রাজ্য	অর্থসাহায্য	রাজ্য	অর্থসাহায্য
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪০০ লক্ষ টাকা	উড়িষ্যা	৩২৫ লক্ষ টাকা
আসাম	৩৭৫ " "	পাঞ্জাব	২২৫ " "
বিহার	৩৫০ " "	রাজস্থান	২৫০ " "
কেরল	১৭৫ " "	পশ্চিমবংগ	৩২৫ " "
মধ্যপ্রদেশ	৩০০ " "	জম্মু ও কাশ্মীর	৩০০ " "
মহীশূর	৬০০ " "		

১৯৬০-৬১ সাল এবং ১৯৬১-৬২ সাল—এই দুই বৎসরে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবংগের বর্ধিত অর্থসাহায্যের পরিমাণ হইবে যথাক্রমে ৪৫০ লক্ষ টাকা, ৪২৫ লক্ষ টাকা, ৩৫০ লক্ষ টাকা ও ৪৭৫ লক্ষ টাকা। কারণ, ১৯৬০ সালের মার্চ মাসের পর হইতে পাট শুল্কের পরিবর্তে ইহারা কোন অর্থসাহায্য পাইবে না।

(৬) রেলভাড়ার উপর কর (Tax on Railway Fares) বণ্টন সম্পর্কে সুপারিশ : রেলভাড়ার উপর কর হইতে যে নীট আদায় হইবে তাহার শতকরা $\frac{1}{4}$ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিয়ন অঞ্চলের জন্য রাখিবে এবং অবশিষ্টাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে। রাজ্যের মধ্যে রেলপথের পরিমাণের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির অংশ বণ্টিত হইবে।

রেলভাড়া হইতে কর-আয়ের বণ্টন

(৭) ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে সুপারিশ : কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ঋণগুলির সুদ ও সর্ত সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছে যাহার ফলে রাজ্যগুলি ৫ কোটি টাকার দায় হইতে রেহাই পাইবে।

রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কে সুপারিশ

অনুমান করা হয় যে দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশসমূহের ফলে গড়ে প্রতি বৎসর ইউনিয়ন কর (Union taxes) এবং ইউনিয়ন অর্থসাহায্য হইতে ১৪০ কোটি টাকা করিয়া রাজ্য সরকারগুলি পাইবে। প্রথম কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ঐ টাকার পরিমাণ ছিল ৯৩ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে রেলমাশুলের উপর কর, বিক্রয়করের পরিবর্তে কাপড়, চিনি ও তামাকের উপর অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক এবং ইউনিয়ন-প্রদত্ত ঋণের সুদ হ্রাসের ফলে রাজ্যগুলির হাতে ১৭০ কোটি টাকা আসিবে বলিয়া আশা করা হয়।

দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশের ফলে রাজ্যগুলির অধিক অর্থপ্রাপ্তি

প্রথম কমিশনের মত দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। পশ্চিমবংগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, আয়কর বণ্টনের ভিত্তি সংগ্রহস্থলের পরিবর্তে জনসংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা অযৌক্তিক। জনসংখ্যার উপর অধিকতর মাত্রায় জোর দেওয়ায় পশ্চিমবংগ, বোম্বাই প্রভৃতি শিল্পোন্নত রাজ্যগুলির প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। প্রথম ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বোম্বাই ও পশ্চিমবংগ যথাক্রমে বণ্টনযোগ্য আয়কর অংশের ১৭.৫০% ও ১১.২৫% পাইয়াছিল। বর্তমানে উহাদিগকে হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে ১৫.৯৭% ও ১০.০৮% করা হইয়াছে। অন্তঃশুল্ক সম্পর্কে বলা হয় যে রাজ্যগুলির অংশ আরও অধিক হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবংগের দাবি ছিল সকল অন্তঃশুল্কের শতকরা ৫০ ভাগ রাজ্যগুলিকে দিতে হইবে। এবং অন্তঃশুল্কের বণ্টনের জন্য ব্যাপক ব্যবহারের দ্রব্যকে মনোনীত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বলা হইয়াছিল যে অন্তঃশুল্কের বণ্টন জনসংখ্যার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ব্যবহার বা উহাদের সংগ্রহস্থানের উপর ভিত্তিতেই করা সমীচীন। রেলভাড়ার উপর কর বণ্টন সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে রাজ্যে অবস্থিত রেলপথের পরিমাণের উপর নির্ভর না করিয়া কোন রাজ্যে কত মাশুল আদায় হয় তাহার উপর ভিত্তিশীল করা উচিত ছিল—এদিক হইতে পশ্চিমবংগ ও বোম্বাই-এর প্রতি সবচেয়ে বেশী অবিচার করা হইয়াছে কারণ এই দুই রাজ্যে সর্বাধিক রেলমাশুল আদায় হইয়া থাকে।

কমিশনের সুপারিশের সমালোচনা

বাজেট (Budget) : গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাজেটের গতি ও নীতি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অর্থাৎ, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য সরকারী আয়ব্যয়কে নিয়োজিত করা হইতেছে। সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এতটা দ্রুত না হইলে অন্যান্য ব্যয়ও বাড়িয়া চলিয়াছে। পরিকল্পনার ব্যয়সংকুলানের জন্য অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে সরকারকে ক্রমশ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। ফলে ঘাটতি ব্যয়ের

বাজেটের গতি ও প্রকৃতি পরিকল্পনার প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে

পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় সরকার কর, ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্যের মারফত অধিকমাত্রায় অর্থসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য পরিমিত ছিল; এবং সরকারী বাজেটের সামান্য পরিবর্তন করা হইলেও মোটামুটিভাবে গতানুগতিক ধারাই বজায় রাখা হইয়াছিল। কর-ব্যবস্থাকে পরিকল্পনাভিমুখী করার দিকে বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে পরিকল্পনার ব্যয় বিশেষ মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ায় সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪-৫৫ সালে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৫ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১৫৭ কোটি টাকায়।* যাহা হউক, প্রথম পরিকল্পনার সময় কৃষিজ উৎপাদন ভাল হওয়ায় ঘাটতি ব্যয় সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা প্রকট হইয়া দাঁড়ায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আসিয়া দেখা যায় যে পরিকল্পনার ব্যয় দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে কারণ প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ব্যাপকতর। প্রথম পরিকল্পনার মোট ব্যয় ছিল ২,০০০ কোটি টাকার মত, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই পরিকল্পনার ব্যয়সংকুলানের জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিঃসূত্র হইতে অর্থসংগ্রহের বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ইহার সহিত মুদ্রাস্ফীতির আশংকাও প্রকাশ পায়। অতএব কর-ব্যবস্থাকে সুসমন্বিত ও শক্তিশালী করিয়া অধিক অর্থসংগ্রহের দিকে সরকারকে ঝুঁকিতে হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে সরকার কর অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কতকগুলি পরিবর্তনসাধন করে এবং মূলধন কর পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে কর ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। কর-ব্যবস্থার ভিত্তিকে ব্যাপকতর করা হয়, কর-প্রবঞ্চনার পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, সম্পদকর ও ব্যয়কর স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। সরকারের মূল লক্ষ্য থাকে কি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে কার্যকর করা যায় এবং কি করিয়া দেশরক্ষা খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় বহন করা যায়।** ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে করস্থাপন ব্যাপারে সামান্য পরিবর্তনই দেখা যায়। একমাত্র কর-প্রবঞ্চনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দানকর ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে সম্পদকরের হার এবং কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়। ব্যয় করের ক্ষেত্রে কয়েকপ্রকার অব্যাহতির বিলোপসাধন করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে কয়েকটি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্কের এবং কয়েকটি দ্রব্যের উপর বাণিজ্যশুল্কের হার বৃদ্ধি এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে সম্পদকর ও অতিরিক্ত ডিভিডেণ্ড করের বিলোপসাধন করা হয়।

ঘাটতি ব্যয়ের বৃদ্ধি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় কর-ব্যবস্থাকে সুসমন্বিত ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা

* Report on Currency and Finance, 1955-56.

** Budget 1957-58—Taxation Measures Explained—issued by the Ministry of Finance.

এই সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮২ কোটি টাকা। তবে শেষের দুই বৎসরে ৩২০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তাহা হইলে মোট ঘাটতি ব্যয় ১,২০০ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইবে। এই ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হিসাবে প্রধানত পরিকল্পনার ব্যয়বৃদ্ধির দিকেই নির্দেশ করা হয়। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের মোট ব্যয় হয় ২,৪৬৬ কোটি টাকা। চতুর্থ বৎসরে ব্যয় হয় ১,০০০ কোটি টাকার মত এবং পঞ্চম বৎসরে ১,১৭০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পরিকল্পনার মোট ব্যয় ৪,৬০০ কোটি টাকার কিছু উপর দাঁড়াইবে।* পূর্বে অবশ্য ৪,৫০০ কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করা যাইবে না বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছিল।†

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ঘাটতি

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট (Budgets of the Central Government): কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বলিতে রাজস্ব খাত ও মূলধন খাত উভয়ই বুঝায়। বর্তমানে রাজস্ব খাত সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে। নিম্নে হিসাব হইতে রাজস্ব খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ব্যয়ের গতি বুঝা যাইবে।

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়	দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়				
	১৯৫১-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
রাজস্ব	২,২৩২·৬	৫৬৩·২	৬৭৩·৪	৬৩৯·৫	৮৩৮·৬৬	৯২০·০১
ব্যয়	১,৯৮৩·০	৪৭৩·৮	৬৩১·৩	৬৯৯·৫	৮৫৪·০৫	৯৮০·৩৫
উদ্বৃত্ত	+২৪৯·৬	+৮৯·৪	+৪২·১			
ঘাটতি				−৬০·০	−১৫·৩৯	−৬০·৩৪

হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজস্ব খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সংগে সংগে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যয়বৃদ্ধির কারণ হইল দেশরক্ষা ও অন্যান্য অনুন্নয়নমূলক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি। ইহার ফলে পরিকল্পনার ব্যয়-সংকুলানের জন্য চলতি রাজস্ব হইতে খুব বেশী অর্থ পাওয়া যায় নাই।

রাজস্ব খাতে আয়ব্যয়ের বৃদ্ধি

* ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটের উপর অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতা।

† Appraisal and Reappraisal of the Second Five Year Plan.

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র (Principal Heads of Revenue of the Central Government): কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের সূত্রসমূহের মধ্যে আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, বাণিজ্যশুল্ক রেলপথ ইত্যাদি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে আয় এবং অধ্যাপক ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে প্রবর্তিত সম্পদকর, ব্যয়কর, দানকর প্রভৃতিই প্রধান। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে।

আয়কর (Tax on Income): কেন্দ্রীয় সরকারের কর-রাজস্বের (tax-revenue) অন্যতম প্রধান সূত্র হইল আয়কর। উপরন্তু, সেদিন পর্যন্ত ভারতের কর-ব্যবস্থার যতটুকু গতিশীলতা দেখা যাইত তাহা ছিল আয়করের জন্যই। সম্প্রতি অবশ্য ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে সম্পদকর, ব্যয়কর প্রভৃতি প্রবর্তিত করিয়া সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আরও কিছুটা করভার চাপান হইয়াছে। তবুও বলা যায় যে বর্তমান পর্যন্ত আয়করই ভারতীয় কর-ব্যবস্থার গতিশীলতার নির্দেশক।

আয়করের গুরুত্ব

ভারতে আয়কর প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৬০ সালে। ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহে'র ফলে যে আর্থিক অসুবিধা দেখা দেয় তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই ঐ কর স্থাপন করা হয়। ইহার পর বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া আয়কর বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এই পরিবর্তনের মূলে একদিকে যেমন রহিয়াছে অধিক রাজস্ব আদায়ের তাগিদ, অপরদিকে তেমনি আছে পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক অবস্থা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ।

ভারতে আয়কর প্রবর্তন

আয়কর ব্যক্তি, একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার, রেজিষ্টারীভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের আয় এবং যৌথ কোম্পানীর (Joint Stock Companies) মুনাফার উভয়ের উপরই ধার্য করা হয়। সাধারণ আয়কর ব্যতীত উপরিস্থ কর (Super Tax) স্থাপনের ব্যবস্থাও আছে। যৌথ কোম্পানীর উপর স্থাপিত উপরিস্থ করকে বলা হয় 'করপোরেশন কর' (Corporation Tax) বা 'নিগম কর'। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয় ২০ হাজার টাকার অধিক হইলে তবেই উপরিস্থ কর দিতে হয়। এই করের ন্যূনতম হার ৫% এবং সর্বাধিক হার ৪৫%। ১৯৫১-৫২ সাল হইতে আবার আয়কর ও উপরিস্থ করের উপর শতকরা সারচার্জ (surcharge) বসান হয়। ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে এই সারচার্জের ব্যাপারে উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি এবং সারচার্জকে সামান্য গতিশীল করা হইয়াছে। অপরদিকে অনুপার্জিত আয়ের উপর যে অধিক হারে আয়কর (tax on income) ধার্য করা হইত তাহা রহিত করা হইয়াছে।

উপরিস্থ কর ও করপোরেশন কর

ব্যক্তিগত আয়করের বেলায় কতক পরিমাণ আয় পর্যন্ত আয়কর হইতে অব্যাহতি (exemption) দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই অব্যাহতির সীমা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে ব্যক্তিদের বেলায় ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়

এবং একান্নবর্তী হিন্দু পরিবারের বেলায় ৬,০০০ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় হইল এই অব্যাহতির সীমা। ১৯৩৯ সাল হইতে ধাপ-পদ্ধতির (Step System) পরিবর্তে স্ল্যাব-পদ্ধতিতে (Slab System) আয়কর নির্ধারিত হয়। উভয় পদ্ধতিতেই বিভিন্ন পরিমাণ আয়ের উপর ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর ধার্য করা হয়। কিন্তু দুইটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, ধাপ-পদ্ধতিতে আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী যে হার প্রযোজ্য সেই হারে সমস্ত আয় হইতে কর আদায় করা হয়। অপরপক্ষে স্ল্যাব-পদ্ধতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্ল্যাবের কর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হিসাব করিয়া পরে যোগ করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হইল ইহার ফলে কর হইতে অধিক আয় হয়, অপেক্ষাকৃত ধনীদের নিকট হইতে অধিক আদায় করা যায় এবং দরিদ্র শ্রেণীদের উপর করভার লাঘব করা সম্ভব হয়।

আয়কর হইতে অব্যাহতি

ধাপ ও স্ল্যাব পদ্ধতি

বলা হইয়াছে যে, পূর্বে উপার্জিত আয় অপেক্ষা অনুপার্জিত আয়ের উপর অধিক হারে কর ধার্য করা হইত। বর্তমানে ইহা না করিয়া ১ লক্ষ টাকা অবধি উপার্জিত আয়ের উপর ৫% হারে সারচার্জ ধার্য করা হয়। অনুপার্জিত আয়ের উপর সারচার্জের হার হইল ২০%। ১ লক্ষ টাকার অধিক যে উপার্জিত আয় তাহার উপর অবশ্য ঐ ২% হারেই সারচার্জ ধার্য করা হয়।

উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য

আবার পূর্বে আয়কর ধার্যের ব্যাপারে বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যক্তির কোন পার্থক্য করা হইত না কিন্তু বর্তমানে উহা করা হয়। দুইটি সন্তান সহ বিবাহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলেও অবিবাহিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অব্যাহতির সীমা হইল ১ হাজার টাকা।

পরিবারের জন্য অব্যাহতি

অন্যান্য প্রকারের অব্যাহতি প্রদানের ব্যবস্থাও আছে। জীবনবীমার প্রিমিয়াম ও স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে অর্থপ্রদানের জন্য আয়ের এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পূর্বেই উপরিস্থ করের (Super Tax) কথা উল্লেখ করিয়াছি। ব্যক্তি, একান্নবর্তী পরিবার ও রেজিষ্টারী-ভুক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠানের বেলায় ২০,০০০ টাকার অধিক বার্ষিক আয়ের উপর উপরিস্থ কর প্রদান করিতে হয়।

বীমা প্রিমিয়াম সম্পর্কে ব্যবস্থা

আমরা দেখিয়াছি যে যৌথ কোম্পানীগুলিকেও আয়কর ও উপরিস্থ কর দিতে হয় এবং যৌথ কোম্পানীর উপরিস্থ করকে করপোরেশন কর বলা হয়। পূর্বে করপোরেশন করের হার ছিল ২০% এবং কোম্পানী আয় করের ৩১·৫%। উভয়কে এখন মিলাইয়া কোম্পানী করে (Company tax) পরিণত করা হইয়াছে এবং উহার হার ধার্য করা হইয়াছে ৪৫%-এ।

কোম্পানী কর

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের দিক হইতে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে আয়কর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। বর্তমানে শতকরা ২০ ভাগের মত কর-রাজস্ব এই সূত্র হইতে

আসে। করপোরেশন কর ধরিয়া আয়কর হইতে রাজস্বের পরিমাণ (রাজ্যের অংশ সমেত) ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে ছিল যথাক্রমে ২০২.৯২ ও ২১৯.৮৩ কোটি টাকা। ১৯৫৯-৬০ এবং ১৯৬০-৬১ সালে ইহার পরিমাণ যথাক্রমে ২৩১ ও ২৪১ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ

আয়কর-ব্যবস্থার যে ত্রুটিবিচ্যুতি ছিল তাহা দূরিকরণের জন্য ১৯৫৩-৫৪ সালের কর অনুসন্ধানকারী কমিশন (Taxation Enquiry Commission 1953-54) ও অধ্যাপক ক্যালডোর বহু মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন। এই সকল সুপারিশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। এই সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে। তবে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভ করকে (Capital Gains Tax) আয়করের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ব্যক্তির পক্ষে প্রদেয় করের হার কমান হইয়াছে, পরিচালনার সুবিধার জন্য আয়কর-ব্যবস্থার কিছুটা সংস্কার করা হইয়াছে এবং সম্পদকর (Wealth Tax), ব্যয়কর (Expenditure Tax) ও সাধারণ দানকর (General Gift Tax) ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে কোম্পানীর উপর ব্যয়কর এবং অতিরিক্ত ডিভিডেণ্ড সম্পর্কিত করকে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ত্রুটির প্রতিবিধানের সুপারিশ

মূলধন-লাভ কর

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Central Excises): কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বপ্রাপ্তির আর একটি প্রধান সূত্র হইল অন্তঃশুল্ক। ইহাকে সর্বপ্রধান সূত্র বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যাদির উপর এই শুল্ক ধার্য করা হয়। শুল্ক মূল্যানুপাতিক (*ad valorem*) বা নির্দিষ্ট হইতে পারে। মদ্যজাতীয় পানীয় এবং নিদ্রাবহ দ্রব্যাদি ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার অন্তঃশুল্ক স্থাপন করিতে পারে। ১৮৯৪ সালে প্রথম অন্তঃশুল্ক বসান হয় সূতার উপর; ১৮৯৬ সালে উহা পরিবর্তন করিয়া মিলের কাপড়ের উপর ধার্য করা হয়। ১৯২৬ সালে বস্ত্রের উপর এই শুল্ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের মধ্যে ১৯১৭ সালে ভারতে পেট্রোলের ব্যবহার হ্রাস করিবার জন্য উহার উপর শুল্ক বসান হয়। ইহার পর ১৯২২ সালে কেরোসিন তৈলের উপর অন্তঃশুল্ক বসে। অন্তঃশুল্কের ইতিহাসে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বৎসর হইল ১৯৩৪ সাল। ঐ সালে চিনি, দিয়াশলাই ও ইস্পাত-পিণ্ডের উপর অন্তঃশুল্ক বসান হয়। যুদ্ধের মধ্যে আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তামাক, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কফি, চা প্রভৃতি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। বর্তমানে তামাক, সূতীবস্ত্র, মোটর স্পিরিট, দিয়াশলাই, টায়ার, টিউব ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক হইতেই অধিক আয় আসে। ইহা ব্যতীত কেরোসিন তৈল, কফি, চা, কৃত্রিম রেশম, সিমেন্ট, সাবান প্রভৃতি দ্রব্য হইতেও অন্তঃশুল্ক বাবদ কিছু আয় হয়।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদি

অন্তঃশুল্কের ক্রমবিবর্তন

১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে এ্যালুমিনিয়াম, সাইকেলের অংশ, ফিল্ম ইত্যাদি নূতন ৮টি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষেত্রে অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

অন্তঃশুল্কের প্রসার

এইভাবে কেন্দ্রীয় কর-ব্যবস্থায় অধিকমাত্রায় অন্তঃশুল্কের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। শিল্পপ্রসারের সংগে সংগে স্থায়ী রাজস্বের উৎস হিসাবে বাণিজ্যশুল্কের গুরুত্ব কমিয়া যাইতে বাধ্য। অতএব ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহনের জন্য ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসাইয়া সরকারী আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। উপরন্তু, যে-সকল শিল্প সংরক্ষণনীতির সুযোগ-সুবিধা লইয়া প্রসারলাভ করিয়াছে তাহাদের এখন সময় আসিয়াছে দেশের উন্নয়নকার্যে সাহায্য করিবার। উপরন্তু, উন্নয়নমূলক কার্যে অর্থ সরবরাহের জন্য বর্তমান অবস্থায় অন্তঃশুল্কের উপর বিশেষভাবে নির্ভর না করিয়াও উপায় নাই। কিন্তু এই প্রসংগে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্তঃশুল্ক সুপরিবর্তনীয় (elastic) হইলেও অনেক ক্ষেত্রে উহা অধোগতিসম্পন্ন (regressive)। অর্থাৎ, উহাদের চাপ দরিদ্র শ্রেণীর উপর অধিক পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, চা, চিনি, কেরোসিন ও দিয়াশলাই-এর উপর অন্তঃশুল্কের কথা উল্লেখ করা যায়।

অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি

অন্তঃশুল্ক হইতে রাজস্ব আয় কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যায়ঃ

(হিসাব: কোটি: টাকায়)

১৯২০-২১—২·৮৫	১৯৫২-৫৩—৮৩·০৩
১৯২৫-২৬—৩·২১	১৯৫৩-৫৪—৯৪·৯৮
১৯৩১-৩২—৬·১৯	১৯৫৪-৫৫—১০৮·২২
১৯৩৮-৩৯—৮·৭২	১৯৫৫-৫৬—১৪৫·২৫
১৯৪৮-৪৯—৫১·৬৬	১৯৫৬-৫৭—১৯০·৪৩
১৯৫০-৫১—৬৭·৫৪	১৯৫৭-৫৮—২৭১·০১
১৯৫১-৫২—৮৫·৭৮	১৯৫৮-৫৯—২৯২·৮২

১৯৫৯-৬০ (সংশোধিত হিসাব)—৩১০·১৩

১৯৬০-৬১ (বাজেট হিসাব)—৩৩৯·৯৫

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট কর-রাজস্বের মধ্যে অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ভাগ ১৯২০-২১ সালে ছিল ৪·৭ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ১০·৭ ; বর্তমানে ইহা ৪০-এর উপর দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং অন্তঃশুল্ক কেন্দ্রীয় রাজস্বের সর্বপ্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্তঃশুল্ক সর্বপ্রধান সূত্র

কর অনুসন্ধানকারী কমিশন (১৯৫৩-৫৪) প্রচলিত অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি ও নূতন নূতন দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিবার সুপারিশ করে। সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে কতকগুলি ক্ষেত্রে শুল্কের হার বৃদ্ধি ও কতকগুলি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

কর অনুসন্ধানকারী কমিশনের সুপারিশ

এই প্রসংগে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। বর্তমানে এই সূত্র হইতে মোটামুটি ৪০ কোটি টাকা পাওয়া যায়। ইহা রাজ্যসমূহের প্রাপ্য বলিয়া রাজ্যসমূহের মধ্যেই বন্টিত হয়।

বাণিজ্যশুল্ক (Customs): বাণিজ্যশুল্ক বলিতে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ককে বুঝায়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই সূত্র হইতে পাওয়া যায়। ১৯২২ সালের পূর্বে বাণিজ্যশুল্কের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা। ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করিবার পর লোহ ও ইস্পাত, চিনি, তুলা শিল্পজাত দ্রব্য, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক (protective duties) ধার্য করা হয়।

বাণিজ্যশুল্কের বিবর্তন

বর্তমানে রাজস্ব এবং সংরক্ষণ উভয় উদ্দেশ্যেই বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করা হয়। ইহা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত এবং মূল্যের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করিবার জন্যও বাণিজ্যশুল্কের সাহায্য লওয়া হয়। প্রায় সমস্ত দ্রব্যকেই আমদানি শুল্ক দিতে হয়। বর্তমানে বিলাসদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক অত্যুচ্চ হারে ধার্য করা হইয়াছে। অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমদানি নীতি নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারী নীতি হইল রপ্তানি-প্রসার। অনেক দ্রব্যের বেলায় রপ্তানি শুল্ককে হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাট তুলা চা কফি প্রভৃতি রপ্তানি শুল্ক আদায়ের প্রধান উৎস।

বাণিজ্যশুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্য

বাণিজ্যশুল্ক হইতে যে আয় হয় তাহার অধিকাংশ আসে আমদানি শুল্ক হইতে। বর্তমানে বাণিজ্যশুল্ক হইতে রাজস্ব ক্রমশ হ্রাস পাইলেও কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্যতম উৎস হইল এই বাণিজ্যশুল্ক। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই উৎস হইতে কেন্দ্রীয় আয় হয় ১৭ কোটি টাকা কিন্তু যুদ্ধের সময় ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১৯১ কোটি টাকায়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯৫১-৫২ সালে এই সূত্র হইতে সর্বাধিক আয় হয়। ঐ সালে ২৩২ কোটি টাকার মত বাণিজ্যশুল্ক হইতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি আবার উহা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। প্রধানত, বিভিন্ন দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের হার হ্রাসের জন্যই এই অবস্থার উদ্ভব হয়। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে মদ্যদ্রব্যের উপর বাণিজ্যশুল্ক বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে বাণিজ্যশুল্কের গতির ইংগিত পাওয়া যাইবে:

বাণিজ্যশুল্ক হইতে আয়ের পরিমাণ

বাণিজ্যশুল্ক হইতে নীট আয় (হিসাব কোটি টাকায়)

১৯৫১-৫২	'৫৫-৫৬	'৫৬-৫৭	'৫৭-৫৮	'৫৮-৫৯	'৫৯-৬০
২৩১'৬৯	১৬৬'৭০	১৭৩'২৩	১৭৯'৯৯	১৩৬'০০	১৬০'০০

১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে হিসাব করা হইয়াছে যে উহার পরিমাণ পূর্বের বৎসরের মত ১৬০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

উপরি-উক্ত হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, বাণিজ্য-শুল্কের গুরুত্ব ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। ভারত যত শিল্পপ্রসারের দিকে অগ্রসর হইবে তত বাণিজ্যশুল্কের তুলনায় অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে। ১৯৫৩-৫৪ সালের কর অনুসন্ধানকারী কমিশন অভিমত প্রকাশ করে যে, আমদানি শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়বৃদ্ধির খুব সামান্যই সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেরোসিন তৈল ও মোটর স্পিরিট আমদানি বন্ধ হইবার ফলে যে রাজস্ব কমিয়া গিয়াছে তাহা পূরণের জন্য কমিশন ঐ দুই দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক বসাইবার পরামর্শ দেয়; তবে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে রপ্তানি শুল্ক স্থাপনের অধিক সুযোগ ঘটিবে।

বাণিজ্যশুল্ক হইতে আয়হ্রাস

রেলপথ (Railways)ঃ রেলপথের লাভ হইতে একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার পাইয়া থাকে। ১৯০০ সালে এক রেলপথ কড়ারে (Railway Convention) স্থির হয় যে রেলপথে বিনিয়োজিত ঋণ-মূলধনের (Loan Capital) উপর বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হইবে। এই ডিভিডেণ্ড হইতে সুদ পরিশোধ করিবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কিছু টাকা থাকে। এই টাকাই কেন্দ্রীয় বাজেটে রেলপথের নীট অর্থপ্রদান (net contribution)। এই অর্থপ্রদানের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৫৫-৫৬ সালে হয় ৫·৮৬ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসর বা ১৯৬০-৬১ সালে উহা ৫·৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে রেলমাশুলের উপর যে কর ধার্য করা হইয়াছে তাহা হইতে ১২ কোটি টাকার উপর আয় হয়। এই টাকার সমস্তটাই রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের মধ্যে বন্টিত হয়।*

রেলপথ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থদান

ডাক ও তার (Posts and Telegraphs): এতদিন পর্যন্ত ডাক ও তার বিভাগ হইতে উদ্বৃত্তের একটা অংশ সরাসরি কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হইত এবং বাকিটা ডাক ও তার বিভাগের খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জমা থাকিত। ১৯৬০-৬১ সাল হইতে এই ব্যবস্থা বাতিল করিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে যে ডাক ও তার বিভাগ রেলপথসমূহের ন্যায়ই কেন্দ্রীয় সরকারকে রেলপথসমূহের হারেই ডিভিডেণ্ড প্রদান করিয়া চলিবে। ডিভিডেণ্ড প্রদানের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা ডাক ও তার বিভাগ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকার্যে ব্যয় করিবে। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে ডাক ও তার বিভাগ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্তির পরিমাণ ৪-৫ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৫০ লক্ষের মত টাকায় দাঁড়াইবে।

ডাক ও তার বিভাগ সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থা

মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাংকন (Currency and Mint)ঃ এই সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছুটা আয় হয়। ১৯৫১-৫২ সালে আয়ের

* রেলমাশুলের উপর এইরূপ করধার্যের ফলে রেল-বাজেট পৃথকিকরণ প্রথা যাহা ১৯২৪ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল (১৪ পৃষ্ঠা দেখ) তাহা একরূপ অবলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে।

পরিমাণ ছিল ৮'৭৯ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা ৪৫ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে।

মূলধন-লাভ কর (Capital Gains Tax): মূলধন-লাভের উপর কর হইল কেন্দ্রীয় রাজস্বের একরূপ নূতনতম সূত্র। একরূপ নূতনতম সূত্র বলা হইয়াছে কারণ ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ কর্তৃক ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয় কিন্তু দুই বৎসর পরে—অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ সালে ইহার বিলোপসাধন করা হয়।

এই করের ইতিহাস

বিলোপসাধনের সপক্ষে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই এইভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেনঃ মূলধন-লাভের উপর ধার্য কর হইতে আশানুরূপ রাজস্ব সংগৃহীত হয় নাই। অপরদিকে কিন্তু ইহা বিনিয়োগকে বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছে। সুতরাং সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার বিলোপসাধনের ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত।

তাহার পর ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বেসরকারী মহল হইতে মাঝে মাঝে মূলধন-লাভের উপর কর ধার্যের দাবি করা হইলেও কর্তৃপক্ষ মহল হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯৫৬ সালের জুন মাসে অধ্যাপক ক্যালডোর তাঁহার রিপোর্টে * মূলধন-লাভ কর পুনঃপ্রবর্তিত করিবার সপক্ষে সম্পূর্ণ অভিমত প্রদান করিলে পর সরকার এ-বিষয়ে ভাবিতে আরম্ভ করে; এবং ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে (বাজেট অধিবেশনের পূর্বেই) অন্যান্যের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে একটি বিল আনয়ন করে। এই বিল ১৯৫৬ সালের ফিনান্স আইন (৩) [Finance Act (3) of 1956] নামক আইনে পরিণত হয়; এবং মূলধন-লাভ কর ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় পুনঃপ্রবেশ করে।

বর্তমানে এই কর ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে প্রবর্তিত

মূলধন-লাভ কর ধার্যের ব্যাপারে কমনওয়েলথ্ দেশসমূহের মধ্যে ভারত পথিকৃৎ হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উহা প্রবর্তিত আছে। ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য কমনওয়েলথ্ দেশে এই কর ধার্য না করিবার প্রধান কারণ হইল গতানুগতিক ধারণা যে, (ক) আয়ই (Income) হইল করপ্রদান ক্ষমতার (taxable capacity) সর্বপ্রধান সূচক; এবং (খ) নিয়মিতভাবে যাহা অর্জিত হয় তাহাই আয়। বর্তমানে কিন্তু এ-ধারণার বিশেষ সমর্থন করা হয় না। বর্তমানের ধারণা হইল, সম্পদের মালিকানা ও হস্তান্তর হইতে যে অনিয়মিত লাভ হয় তাহা করপ্রদান ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে।

এই করের বিপক্ষে যুক্তি

সপক্ষে যুক্তি

এখন 'মূলধন-লাভ' বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাউক। সম্পত্তির বাজার-দাম বৃদ্ধি পাইলেই মালিকের মূলধন-লাভ হয়। এইভাবে মালিকের মূলধন-লাভ হউক আর সাধারণভাবে আয়বৃদ্ধি ঘটুক উভয় ক্ষেত্রেই তাহার আর্থিক

* এই অধ্যায়ের শেষে কর-পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে ক্যালডোরের রিপোর্ট দেখ।

অবস্থার উন্নতি ঘটে; উভয় ক্ষেত্রেই সে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য নিয়মিত আয় ও মূলধন-লাভের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে—যথা প্রথমত, মূলধন-লাভ সকল সময় হস্তান্তর দ্বারা অনুভব নাও করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইলেই মালিক যে সম্পত্তি বিক্রয় করিবে এরূপ কোন কথা নাই; এবং নিয়মিত মূলধন-লাভের দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহার অধিকাংশই সঞ্চিত হয়—বর্তমান আয়ের মত ব্যয়িত হয় না। এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তবুও বলা যাইতে পারে যে ইহা মূলধন-লাভকে কর-বহির্ভূত রাখার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নহে। বস্তুত, আয়কর ধার্য ব্যাপারে যখন আয়ের যে-অংশ ব্যয়িত হয় এবং যে-অংশ সঞ্চিত হয় তাহার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না তখন মূলধন-লাভ হইতে অধিকাংশ অর্থই সঞ্চিত হয় বলিয়া উহাকে কর-বহির্ভূত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।

উপরন্তু মূলধন-লাভকে কর-বহির্ভূত রাখিলে মাত্র মুষ্টিমেয়ের হস্তে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। ভারতে ইহা সংবিধানবিরোধী। সুতরাং, এই করের সপক্ষে প্রবল যুক্তি রহিয়াছে। পরিশেষে, সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় মূলধন-লাভ কর ধার্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, প্রথমত, এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় অন্যান্যের তুলনায় মূলধনের মূল্য ক্রমশই বাড়িয়া চলে; এবং দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান হিসাবেও ইহা প্রয়োজনীয়।

সুতরাং সকল দিক দিয়াই ভারতে মূলধন-লাভ কর ধার্যের সপক্ষে যুক্তি রহিয়াছে বলা যায়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার দিক হইতেই উহার প্রবর্তন দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমাচারী এ-বিষয়ে অধ্যাপক ক্যালডোরের নিকট ঋণী এ-সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের কর অনুসন্ধান কমিশন মূলধন-লাভ কর ধার্যের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করে। ক্যালডোরের মতে, এই অভিমত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইয়াছিল।

ভারতে সপক্ষে যুক্তি বিশেষ প্রবল

ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে বর্তমানে (ক) বাধ্যতামূলকভাবে সম্পত্তি অধিগ্রহণ (compulsory acquisition), (খ) কোম্পানী ভাঙিয়া গেলে অংশীদারগণের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন, এবং (গ) বসবাসগৃহাদির ন্যায় সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য যে মূলধন-লাভ হয় তাহার উপর কর ধার্য করা হইয়াছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, প্রকৃত মূলধন-লাভের উপর করধার্য করা হয় নাই—হস্তান্তর দ্বারা মূলধন-লাভ অনুভূত হইলে তবেই করধার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মূলধন-লাভ করের ব্যবস্থাসমূহ

ক্যালডোর সুপারিশ করিয়াছিলেন যে মূলধন-লাভের উপর করের হারের (এবং আয়করেরও) ঊর্ধ্বতন মাত্রা (ceiling rate) টাকায় ৭ আনায় নির্ধারিত করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে উভয়েরই ঊর্ধ্বতন হার ৪ আনা হারে ধার্য রাখা হইয়াছে; নিম্নস্তরেও মূলধন-লাভ করের হার আয়করের মত একই। অপরদিকে কিন্তু

আয়করের মত ইহাতে উপরিস্থ করের (Super Tax) ব্যবস্থা নাই, এবং ৫,০০০ টাকার নিম্নের লাভের উপর কোন কর দিতে হয় না। মূলধন-লাভ নির্ধারণ করিবার জন্য কর-প্রদানকারীকে সম্পত্তির মূল ব্যয় (original cost) অথবা ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের মূল্যে হিসাবের সুবিধা দেওয়া হয়।

সমালোচনা

মূলধন-লাভ করের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল যে, দানপত্র শ্রেণীর হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মূলধন-লাভের উপর কর ধার্য করা হইত না। ইহাতে সম্পত্তির মালিকরা মূলধন-লাভ নিজে ভোগ না করিয়া উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করিয়া কর এড়াইয়া যাইত। ফলে রাজস্বের উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইত। সম্প্রতি সাধারণ দানকর ধার্যের ফলে এই ত্রুটি অনেকাংশে দূর হইয়াছে।

পরিশেষে ইহা বলা প্রয়োজন যে মূলধন-লাভ কর স্বতন্ত্র কর হইলেও বাজেটে উহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখান হয় না; আইনের দিক দিয়া উহা আয়করেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, মূলধন-লাভ হইতে যে-আয় তাহা মোট আয়েরই অংশ।

সম্পদকর (Tax on Wealth): ১৯৫৭-৫৮ সালের মূল বাজেটে যে-দুইটি করধার্যের ব্যবস্থা করা হয় তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল সম্পদকর এবং দ্বিতীয়টি ব্যয়কর (Tax on Expenditure)। অর্থমন্ত্রীর মতে, এই দুইটি করধার্যের ফলে কর-পদ্ধতিতে এরূপ সংস্কার সাধিত হইবে যে ন্যায় (equity) ও দক্ষতা (efficiency) উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে।*

এই করও ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে

মূলধন-লাভ করের ন্যায় এই দুইটি কর ধার্য ব্যাপারেও ভারত সরকার অধ্যাপক ক্যালডোরের সুপারিশমত কার্য করিয়াছে। ক্যালডোরের সুপারিশ সম্বন্ধে পরে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইতেছে। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, ক্যালডোরের মতে, ভারতে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর-পদ্ধতিতে দক্ষতা বা ন্যায় কোনটাই নাই। ইহা অন্যায্য কারণ বর্তমানে আয়ের (income) যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা সংকীর্ণ ও করপ্রবঞ্চনাকারীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ইহা দক্ষতাবিহীন যেহেতু পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য কর-প্রবঞ্চনা করা বিশেষ সহজসাধ্য কার্য। উপরন্তু, আয়করের বর্তমান সর্বাধিক হার (প্রায় ৯২%) উদ্যোগকে ব্যাহত করে।

ক্যালডোরের মূল সুপারিশ

সুতরাং প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রস্তাব হইল যে, সম্পদের উপর বার্ষিক করধার্য (an annual tax on wealth), মূলধন-লাভের উপর করধার্য, দানপত্রের উপর সাধারণ করধার্য (a general gift tax), এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করধার্য (a personal expenditure tax) করিয়া প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিতে হইবে।

* অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা—১৫ই মার্চ, ১৯৫৭।

উপরি-উক্ত সুপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভকে প্রথমে (১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) করভুক্ত করা হয় এবং পরে ১৯৫৭-৫৮ সালের মূল বাজেটে সম্পদকর ও ব্যয়কর ধার্য করা হয়।

সম্পদকরের সপক্ষে ক্যালডোরের যুক্তি :

প্রত্যক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে সম্পদকর ধার্যের সুপারিশ করিবার সময় ক্যালডোর ইহার সপক্ষে ন্যায় (equity), অর্থনৈতিক ফলাফল (economic effects) এবং পরিচালনা-গত দক্ষতার (administrative efficiency) দিক দিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।*

১। ইহা ন্যায়সংগত

ন্যায়ের দিক দিয়া যুক্তি হইল যে, বিভিন্ন সূত্র হইতে আয় এবং বিভিন্ন প্রকার সম্পদের মালিকানার কথা ধরিলে একমাত্র আয়কেই করপ্রদান-ক্ষমতার (taxable capacity) মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। করপ্রদান-ক্ষমতার দিক দিয়া ১ লক্ষ টাকা মূল্যের অলংকার ও স্বর্ণের মালিক নিশ্চয়ই একজন ভিক্ষুকের সহিত তুলনীয় নহে। আয়ের দিক দিয়া অবশ্য উভয়েরই করপ্রদান ক্ষমতা শূন্য। কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও অলংকারের মালিককে সম্পূর্ণভাবে কর হইতে অব্যাহতি দিলে ন্যায় ব্যাহত হইতে বাধ্য। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক ও খ উভয়েরই সম্পত্তি হইতে ৫০ হাজার টাকা করিয়া আয় হয়। ক-এর সম্পত্তির মূল্য হইল ২০ লক্ষ টাকা এবং খ-এর ৫০ লক্ষ টাকা। উভয়েরই করপ্রদান-ক্ষমতা সমান হইতে পারে না। সুতরাং ন্যায়ের খাতিরে আয় ও সম্পত্তি উভয়কেই করপ্রদান ক্ষমতার নির্ধারক করিতে হইবে।

২। ইহা অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়া সমর্থনীয়

অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়া আয়কর অপেক্ষা সম্পদকরের সুবিধা রহিয়াছে। সম্পদকর আয়করের মত ঝুঁকির (risk) বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করে না। একশত টাকা সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিলে মাত্র ৩ টাকা আয় হয় কিন্তু ঝুঁকি লইয়া বিনিয়োগ করিলে ১০ টাকা আয়ও হইতে পারে। আয়কর এই ঝুঁকির মূল্য না দিয়া ঐ ১০ টাকার উপর করধার্য করে। সুতরাং লোককে ঝুঁকি লইতে নিরুৎসাহিত করিয়া বিনিয়োগ ব্যাহত করে।

৩। ইহার পরিচালনা সুবিধাজনক

পরিচালনাগত সুবিধার দিক দিয়া বলা যায় যে, আয়করের সহিত সম্পদকরও ধার্য করিলে কর-প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়ে—কারণ আয় সম্বন্ধে সংবাদাদি সম্পত্তি সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করিয়া দিতে পারে এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে তথ্যাদি লুকান আয়ের সন্ধান দিতে পারে।

এই করের ত্রুটি

অবশ্য সম্পদকর পরিচালনার কিছু অসুবিধাও আছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি হইল প্রধান—যথা, (ক) সম্পদের প্রকৃত মালিককে আবিষ্কার করা, এবং (খ) সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা। কিন্তু

* Nicholas Kaldor, Indian Tax Reform-এর ২০ পৃষ্ঠা।

সকল পরিচালনাতেই কিছু-না-কিছু অসুবিধা আছে। সুতরাং অসুবিধার ভয়ে ভীত হইয়া পিছাইয়া গেলে চলিবে না—ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় প্রয়োজন ও কর-সংস্কারের উদ্দেশ্যে সম্পদকর ধার্য করিবার পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, সম্পদকর এদেশে সম্পূর্ণ নূতন হইলেও বার তেরটি দেশের কর-ব্যবস্থায় ইহার সন্ধান মিলে।

অন্যান্য কয়েকটি দেশে এই কর প্রবর্তিত আছে

বাজেট বক্তৃতায় সম্পদকরের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী একরূপ ক্যালডোরকে উদ্ধৃত করিয়াই বলেন, "ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, বর্তমানে আয়ের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা করপ্রদান-ক্ষমতার প্রকৃত মাপকাঠি নহে এবং সম্পদকরকে আয়করের অনুপূরক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।" ইহার পর অর্থমন্ত্রী সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধারণার দিক হইতে সম্পদকরের সমর্থনে বলিয়াছেন যে, এমন সকল কর ধার্য করিতে হইবে যাহা "সাম্যের প্রসার করে কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত করে না।" সম্পদকর হইল এইরূপ অন্যতম কর।

ক্যালডোরের অনুসরণে অর্থমন্ত্রীর সমর্থন

ভারতে সম্পদকর ধার্য করা হইয়াছিল ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার (Hindu Undivided Families) এবং ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সকলেরই উপর। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা হইল কর-অব্যাহতির সীমা (tax exemption limit)। ইহার পর করহার হইল গতিশীল (progressive) : প্রথম ১০ লক্ষ টাকা অবধি ½%, পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা অবধি ১% এবং বাকী অংশের জন্য ১½%। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বেলায় ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পর্যন্ত সম্পদকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। তদুপরিস্থ সকল সম্পত্তির উপর অপরিবর্তিত ½% হারে (flat rate) কর ধার্য করা হইত।

ভারতীয় সম্পদকরের মূল ব্যবস্থা

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির (assets) উপর করধার্য সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, যদিও সম্পদকর হইল অন্যতম ব্যক্তিগত কর তথাপি ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইহার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ক্যালডোর মাত্র ব্যক্তিগত সম্পদের উপরই করধার্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সুপারিশ কার্যকর করা হইয়াছে ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে। এই সাল হইতে কোম্পানীর উপর সম্পদ-করের বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

পূর্বে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান-সমূহকে রেহাই না দিবার কারণ

ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে কয়েক প্রকারের সম্পদকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে—যথা, কৃষি-সম্পত্তি, এরূপ শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্বমূলক সংগ্রহ যাহা বিক্রয়ের জন্য নহে, স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বীমা তহবিলে জমা অর্থ, ২০ হাজার টাকার মূল্যের অবধি অলংকার মোটরগাড়ী আসবাব-পত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদ এবং

বিক্রয়ের জন্য নহে এরূপ পুস্তকাদি। ভারতে বসবাসকারী বিদেশীয়দের বৈদেশিক সম্পদকে সম্পদকর হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম বৎসর বা ১৯৫৭-৫৮ সালে সম্পদকর হইতে ৭ কোটি টাকা আয় হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে উহা বাড়িয়া ১২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঐ কর হইতে রেহাই দেওয়ায় ১৯৬০-৬১ সালে সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়া আবার ৭ কোটি টাকার মত দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ব্যয়কর (Expenditure Tax): সম্পদকর বার তেরটি দেশে প্রবর্তিত থাকিলেও ব্যয়কর হইল সম্পূর্ণ নূতন কর। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, "এই করের পশ্চাতে এখন পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক সমর্থনের সন্ধান পাওয়া যায় না।" ১৯৫৫ সালে অধ্যাপক ক্যালডোরই প্রথমে ন্যায় (equity) এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার (economic expediency) দিক দিয়া ব্যয়করকে সমর্থন করিয়া এক পুস্তক* প্রকাশ করেন। পরে তিনি এই করকে ভারতীয় কর-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিতে বলেন। ব্যয়করের বিরুদ্ধে, বিশেষত ভারতীয় কর-পদ্ধতিতে ইহার অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে, আজ পর্যন্ত যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি হইল প্রধান:

বিরুদ্ধে যুক্তি

(ক) বর্তমান ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় আয়করের উপর আর ব্যয়কর চাপান উচিত নয় কারণ উহার ফলে করভার একরূপ দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

(খ) আয়করের পরিবর্তে ব্যয়কর ধার্য করিলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বিত্তশালীদের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে যদি সম্পত্তিকর স্থাপন করা হয় তবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হইয়া ব্যয়করের প্রধান উদ্দেশ্যকেই পণ্ড করিবে।

(গ) আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করের পরিচালনা কঠিন।

(ঘ) ভারতে কৃষিগত আয় হইতে ব্যয়কে এই কর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে; ইহার ফলে লোকে কৃষিগত আয় হইতেই তাহাদের ব্যয় যথাসম্ভব করিতে বা দেখাইতে চেষ্টা করিবে।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে ক্যালডোর বলিয়াছেন যে, করপ্রদান-ক্ষমতার যোগ্যতর মাপকাঠি বলিয়া তুলনামূলকভাবে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়কর কাম্য হইলেও ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় উভয়েরই উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। উপরন্তু, আয়করের সহিত সম্পদকর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার সংগে যদি ব্যয়কর ধার্য না করা হয় তাহা হইলে পুঁজি-পতিরা সম্পদ ও বিনিয়োগের পরিমাণ না বাড়াইয়া যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া যাইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত করের পরিপূরক হিসাবেই ব্যয়কর ধার্য করা প্রয়োজন।

ক্যালডোর এই সকল বিরুদ্ধ যুক্তি অস্বীকার করেন

---

* Nicholas Kaldor, An Expenditure Tax (1955).

ক্যালডোরের* যুক্তি মানিয়া লইয়া তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ব্যয়করকে ভারতীয় কর-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবকালে তিনি বলেন যে, ঐতিহাসিক সমর্থনের অভাবে অতি সামান্যভাবেই ইহার সূত্রপাত করিতে হইবে।

সামান্য সূত্রপাত

১৯৫৭ সালের ব্যয়কর আইন (The Expenditure Act, 1957) অনুসারে যে-সকল ব্যক্তি এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বাৎসরিক নীট আয় (সকলপ্রকার করপ্রদানের পর) ৩৬ হাজারের অধিক সেই সকল ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যয়কর প্রযোজ্য। ব্যয়করের উদ্দেশ্য হইল প্রধানত ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয়ের উপর কর ধার্য করা (to tax primarily expenditure on personal consumption)। সুতরাং কতকগুলি ব্যয়কে ব্যয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। যেমন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যয় প্রভৃতি ব্যয়কে করভুক্ত করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর-অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যক্তির বেলায় মূল কর-অব্যাহতির পরিমাণ হইল ৩০ হাজার টাকা—অর্থাৎ ৩০ হাজার টাকা অবধি ব্যয়ের উপর ব্যক্তিকে কোন ব্যয়কর দিতে হয় না। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বেলায় অনধিক ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়কে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। উপরন্তু বিবাহ, পিতামাতার ভরণপোষণ, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য ব্যয়কে সীমাবদ্ধভাবে করমুক্ত করা হইয়াছে।

ব্যয়করের প্রকৃতি ও অব্যাহতির ব্যবস্থা

উপরি-উক্ত করমুক্ত ব্যয়গুলি ছাড়া অন্যান্য ব্যয়ের উপর স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল হারে করপ্রদান করিতে হয়। করহার নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১)	প্রথম ১০ হাজার টাকার উপর	১০%
(২)	১০ হাজারের অধিক কিন্তু ২০ হাজারের অনধিক টাকার উপর	২০%
(৩)	২০ " " ৩০ " " " "	৪০%
(৪)	৩০ " " ৪০ " " " "	৬০%
(৫)	৪০ " " ৫০ " " " "	৮০%
(৬)	৫০ " " যে-কোন পরিমাণ ব্যয়ের উপর	১০০%

কর-ব্যবস্থার অংগ হিসাবে ব্যয়করের গুরুত্ব যাহাই হউক না কেন, রাজস্ব-সংগ্রহের দিক দিয়া ইহা মোটেই উল্লেখযোগ্য সূত্র নহে। এই কর হইতে ১ কোটি টাকার অধিক সংগৃহীত হয় না।

দানকর (Gift Tax) : ১৯৫৮-৫৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল দানকর প্রবর্তন। অধ্যাপক ক্যালডোরই সুসমন্বিত রাজস্ব-ব্যবস্থার অংগ হিসাবে এই কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।* অবশ্য তাঁহার সুপারিশ ছিল যে মৃত্যুকরকে উঠাইয়া দিয়া সকল প্রকার

ক্যালডোরের প্রস্তাব ও ভারতীয় দানকর

* Nicholas Kaldor, Indian Tax Reform—Report of a Survey.

দানের উপর সাধারণ দানকর ধার্য করিতে হইবে অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে বা দানপত্রের মারফতই প্রাপ্ত হউক অথবা অন্যভাবে দানের মারফতই প্রাপ্ত হউক সকল প্রকার দান বা প্রদত্ত সম্পত্তির উপরই সাধারণ দানকর প্রযোজ্য হইবে। ভারত সরকার এই সাধারণ দানকর প্রবর্তন করেন নাই—মৃত্যুকরকে রাখিয়া অন্যান্য দানের উপর পৃথক্‌ভাবে কর স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও মৃত্যুকর ব্যতীত দানকর প্রবর্তিত রহিয়াছে।

দানকরের সপক্ষে যুক্তি

দানকরের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাতে বলা হয় যে সম্পত্তি হস্তান্তর করার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সমাজের রহিয়াছে। যদি উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রদানের উপরও করস্থাপনের যৌক্তিকতা থাকে তবে অন্যপ্রকার দানের উপরও করধার্য করা যুক্তিযুক্ত। অন্য একটি কারণেও দানকর স্থাপন করা প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রেই দানের মারফত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া মৃত্যুকর ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হয়। এই কর ফাঁকিকে বন্ধ করিতে দানের উপর উপযুক্ত করধার্য করা প্রয়োজন। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই ভারতে দানকর প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ভারতীয় দানকরের বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় দানকর আইন অনুসারে পূর্ববর্তী বৎসরে প্রদত্ত সকল দানের উপর দানকর প্রযোজ্য। কর-অব্যাহতির সীমা হইল দশ হাজার টাকা—অর্থাৎ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত দানে কোন করপ্রদান করিতে হয় না। দানের পরিমাণ ইহার অধিক হইলে দানকর দিতে হয়। স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল হারে কর-প্রদান করিতে হয়। করের হার প্রথম স্ল্যাবে শতকরা ৪ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বাধিক শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত। নির্দিষ্ট ধরনের কতকগুলি দানের বেলায় দানকর প্রযোজ্য নয়। যেমন, ভূদান বা সম্পত্তিদান আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়। আয়কর হইতে অব্যাহতি ভোগ করে এরূপ দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দানের উপর দানকর ধার্য হয় না। আবার কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দান করা হইলে উক্ত দানের উপর কর দিতে হয় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দান কর হইতে মুক্ত।

দানকর হইতেও সংগ্রহের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই। নীট সংগ্রহের পরিমাণ ১ কোটি টাকাতেও পৌঁছায় নাই।

দানকরের বিরুদ্ধ সমালোচনা

দানকরের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করা হইয়াছে। অনেকে দানকর প্রবর্তনকে ভারতের ঐতিহ্যবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া মনে করেন। ইহাদের মতে ভারতীয়দের মধ্যে দানধ্যান ও ত্যাগের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। দানকর এই অতিকাম্য প্রবণতাকে আঘাত করিবে। আবার বলা হয় যে এত প্রকারের অব্যাহতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে দানকর হইতে সরকার বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবে এরূপ আশা করা যায় না। অনেকে আবার

এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ক্যালডোরের সুপারিশ অনুযায়ী মৃত্যুকর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রকার দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ দানকর প্রবর্তন করা উচিত ছিল।

অন্যান্য সূত্র (Other Sources)ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য আয়ের সূত্র হইল শাসন বিভাগীয় আয়, অহিফেন প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় (Central Expenditure)ঃ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের বিশদ আলোচনা করা যাইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি

(১) **প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় (Defence Services)ঃ** বর্তমানে রাজস্ব খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৪ ভাগের মত যায় প্রতিরক্ষা খাতে। ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৭০'৯৬ কোটি টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৩ কোটি টাকার উপরে দাঁড়ায়। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যয় আরও ২৮ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি করিয়া ২৭২'২৬ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিশৃংখলা, ভারতের সীমান্ত লইয়া গোলযোগ প্রভৃতি কারণে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার যে-প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহার জন্যই প্রতিরক্ষা খাতে উপরি-উক্ত ভাবে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধি

(২) **বেসামরিক শাসন পরিচালনা (Civil Administration)ঃ** এই খাতেও সরকারী ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে এই খাতে ৬০'৫৯ কোটি টাকার মত ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে কিন্তু এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৪ কোটি টাকা। এই ব্যয়বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে সরকারী দপ্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশে অত্যধিক ব্যয়ে দূতাবাসের ব্যবস্থা, বিদেশে নানা ধরনের প্রতিনিধি প্রেরণ, দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি। ব্যয়সংক্ষেপের যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্যয়হ্রাস করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই।

এই খাতে ব্যয়বৃদ্ধি ও উহার কারণ

(৩) **রাজস্বসংগ্রহের প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Demand on Revenue)ঃ** রাজস্বসংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণও নিয়মিত বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে উহা ছিল ১৩ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা ২২ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে।

(৪) **ঋণজনিত ব্যয় (Debt Services)ঃ** বিভিন্ন সময়ে সরকার যে ঋণগ্রহণ করিয়াছে প্রধানত তাহার সুদ বাবদ সরকারী ব্যয়কে ঋণজনিত ব্যয় বলা হয়। ইহা রাজস্ব-খাতের অন্তর্ভুক্ত। ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয় মূলধন খাতের হিসাবে ধরা হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে ঋণজনিত ব্যয় ছিল ৬৫'১৪ কোটি টাকা; ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে উহা ৭৪'৫৯ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ঋণজনিত ব্যয়ের পরিমাণ

(৫) **উন্নয়নমূলক ব্যয় (Development Services)** : উন্নয়নমূলক ব্যয়ের বৃহদংশ মূলধন খাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে রাজস্ব খাত হইতে বড় কম উন্নয়নমূলক ব্যয় করা হয় না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায় গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতির জন্য ব্যয় রাজস্ব খাতেই ধরা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে এই ব্যয় ছিল ৪২'৪৯ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে এই ব্যয় ২৫০'৮৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তবুও বলা যায়, ভারতের মত অনগ্রসর দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয় অত্যন্ত অল্প।

উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ

বিবিধ ব্যয় (Miscellaneous) : শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য ও অপর কতকগুলি উন্নয়নমূলক ব্যয় এই বিবিধ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৯-৬০ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯৫'২৫ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে ব্যয় ১২৯'৪৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত ব্যয় ব্যতীত পেন্‌সন, বিশেষ ব্যয় ও অপরাপর ব্যয়ও রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকেও অর্থসাহায্য করিয়া থাকে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ধরনের এবং সাধারণ অনুদান দিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যগুলির সচ্ছলতা সৃষ্টি করার মূলে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য। রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত এইরূপ অর্থপ্রদানের পরিমাণ ১৯৫১-৫২ সালে ছিল ১৭'৩১ কোটি টাকা ; ১৯৫৯-৬০ সালে উহা ৪৮'৯৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে এই ব্যয় ৫১'৮১ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ব্যয়

ব্যয় সংক্রান্ত উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ই অধিক। সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক খাতে যতটা ব্যয় করা প্রয়োজন তাহা হইতেছে না। তবে সম্প্রতি এই খাতেও ব্যয়বৃদ্ধির দিকে সরকার অধিক নজর দিতেছে।

ব্যয়ের প্রকৃতি

মূলধন খাত (Capital Account) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে মূলধন খাতে সরকারের আয়ব্যয়ের (receipts and disbursements) হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০ (সংশোধিত হিসাব)	১৯৬০-৬১ (বাজেট)
(ক) প্রাপ্তি (Receipts)*—	৩০২'৭৫	২৯৭'৬২	৫৯০'৫৩	৮৪৭'১৩	৯৯০'৪২
(খ) ব্যয় (Disbursements)—	৬১৬'৭৮	৮৪৩'০৭	৮১৩'২০	১০০৬'৯০	১০৮৩'৩৭
(গ) উদ্বৃত্ত(+) বা ঘাটতি (–) (Surplus+ or Deficit–)—	–৩১৪'০৩	–৫৪৫'৪৫	–২২২'৬৭	–১৫৯'৭৭	–৯২'৯৫

* ট্রেজারী বিল (Treasury Bill) মারফত প্রাপ্ত অর্থ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে যে মূলধন খাতে প্রাপ্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে ইহাই স্বাভাবিক। প্রাপ্তির পরিমাণ ব্যয়ের সংগে সংগে বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধন খাতে ঘাটতির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। ইহা মূলধন বাজেটের স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

রাজ্য সরকারসমূহের আয়ব্যয়-ব্যবস্থা (Finances of State Governments): দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলির অর্থ-প্রাপ্তির পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে রাজ্যগুলি কেন্দ্র হইতে ঋণ, সাহায্য প্রাপ্য করের অংশ হিসাবে মোট ৩৭৩ কোটি টাকা পাইয়াছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে এই প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭১ কোটি টাকায়। পূর্বে কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত খাতে রাজ্যগুলি তাহাদের মোট ব্যয়ের শতকরা ২৯ ভাগ নির্বাহ করিত; এখন ৫২ ভাগ নির্বাহ করে। কেন্দ্র হইতে অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধির মূলে আছে রেলযাত্রীর মাসুলের উপর কর (Tax on Railway Fare)। রাজ্য বিক্রয়করের পরিবর্তে চিনি, তামাক ও বস্ত্রের উপর কেন্দ্র কর্তৃক ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক (Additional Excise Duties) এবং দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলির নিকট অধিকতর পরিমাণে রাজস্ব হস্তান্তর। প্রথম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলির নিকট ৯৩ কোটি টাকার মত রাজস্ব হস্তান্তর করা হইত; বর্তমানে ১৬০ কোটি টাকার উপর হস্তান্তর করা হয়। উপরন্তু, কেন্দ্রের বিবেচনামূলক অর্থসাহায্যের (discretionary grants) পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেন্দ্র হইতে অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি

১৯৫৭-৫৮ সালে রাজ্যসমূহের বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। প্রধানত কেন্দ্র হইতে রাজস্ব হস্তান্তর এবং রাজ্যসমূহের নিজ নিজ কর-রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে এই ঘাটতির পরিমাণ কমিয়া ১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৫৯-৬০ সালে ঘাটতি হয় ৪২ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে ইহা বাড়িয়া ৬০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে রাজ্যগুলির নগদ টাকার পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা ২ কোটি টাকা ঋণে পরিণত হইয়াছে। উন্নয়নমূলক ব্যয়বৃদ্ধিই ইহার কারণ। উন্নয়নমূলক ব্যয়বৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিলও ব্যয়িত হইয়াছে।

আয়ব্যয়ের মোটামুটি অবস্থা

রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের আয় (Incomes of the States on Revenue Account): ১৯৫৯-৬০ সালে রাজস্ব খাতে (on revenue account) জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সকল রাজ্যের আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৮৮ কোটি টাকা।

রাজ্যসমূহের মোট রাজস্ব

রাজ্যসমূহের রাজস্বের প্রধান সূত্রগুলিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—যথা, কর-রাজস্ব (tax revenue) এবং কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue)।

'কর-নিরপেক্ষ রাজস্বে'র মধ্যে আছে বনবিভাগ, সেচ-ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তি পরিকল্পনা, রাজপথ ও নদীপথ পরিবহন এবং রাষ্ট্র মালিকানাধীন শিল্পসমূহ হইতে আয়। অপরদিকে 'কর-রাজস্ব' বিভিন্ন কর লইয়া গঠিত। এই করগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (ক) আয়ের উপর কর (taxes on income), (খ) সম্পত্তি ও মূলধন হস্তান্তরের উপর কর (taxes on property and capital transactions) এবং (গ) সামগ্রী ও সেবার উপর কর (taxes on commodities and services)। এখন এই তিন শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন কর সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

কর-রাজস্বের সূত্রসমূহ

ক। আয়ের উপর করসমূহ

(ক) আয়ের উপর কর বলিতে তিনটি করকে বুঝায়—যথা, ভারতীয় আয়করের অংশ, কৃষি-আয়কর এবং বৃত্তিকর।

১। **ভারতীয় আয়করের অংশ (Share of Indian Income Tax) :** ভারতীয় আয়করের অংশকে রাজ্যসমূহের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব-সূত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। এই বিষয়ে বর্তমানে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকার করিয়া আছে বিক্রয়কর ও ভূমি-রাজস্ব। ১৯৫৯-৬০ সালে আয়করের অংশ হিসাবে রাজ্যগুলি পায় মোট ১৭·৫৬ কোটি টাকা।

প্রথম ফিনান্স কমিশনের (First Finance Commission) সুপারিশ অনুসারে ভারতীয় আয়কর (করপোরেশন কর বাদে) হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের (net proceeds) শতকরা ৫৫ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইত। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে শতকরা ৬০ ভাগ বণ্টিত হয়।

২। **কৃষি-আয়কর (Agricultural ncome Tax) :** আয়ের পরিমাণের দিক দিয়া এই সূত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা হইতে রাজ্যগুলি মোট ৮ কোটি টাকা পাইয়াছিল। একদিক দিয়া অবশ্য কৃষি-আয়কর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর। ইহা কর-পদ্ধতির এক বিরাট অসংগতি দূর করিয়াছে—ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ভোগকারীদের মধ্যে কিছুটা সমতা আনয়ন করিয়াছে।

কৃষি-আয়করের গুরুত্ব

এই সমতা আনয়ন ও প্রদেশসমূহের আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার ওয়াল্টার লেটন (Sir Walter Layton) কৃষি-আয়কর ধার্যের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ফলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশসমূহকে এই করধার্যের ক্ষমতা প্রদান করা হয়; এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও উত্তরপ্রদেশ ইহা ধার্য করে।

কৃষি আয়করের বৈশিষ্ট্য

বংগদেশে কৃষি-আয়কর ধার্য হয় ১৯৪৪ সালের বংগীয় কৃষি-আয়কর আইন (Bengal Agricultural Income Tax Act, 1944) দ্বারা। এই কর ভারতীয় আয়করের ন্যায় স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল (progressive on the slab

system)। কিন্তু ইহার সর্বোচ্চ হার ভারতীয় আয়করের সর্বোচ্চ হার হইতে অনেক কম। এই কারণে কর তদন্তকারী কমিশন কৃষি-আয়করকে সাধারণ আয়করের অন্তর্ভুক্ত করিতে সুপারিশ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে পরে অনেক আলোচনা করা হইতেছে।

৩। **বৃত্তির উপর কর (Profession Tax)**ঃ বৃত্তির উপর করকে রাজস্বের সূত্র হিসাবে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর বলিলেই চলে। এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের বৎসরে মাত্র ২৫-৩০ লক্ষ টাকা আয় হয়। ইহা সকল রাজ্যে প্রবর্তিতও নহে।

১৯৫৯-৬০ সালে উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর আয়ের উপর কর হইতে রাজ্যসমূহের মোট আয় হয় ৮৮·০৫ কোটি টাকা।

খ। মূলধন হস্তান্তরের উপর কর

(খ) সম্পত্তি ও মূলধন হস্তান্তরের উপর কর বলিতে বুঝায় সম্পত্তিকর (Estate Duty), ভূমিরাজস্ব, স্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন এবং নগরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির উপর কর (Urban Immovable Property Tax)।

১। **সম্পত্তিকর (Estate Duty)***ঃ সম্পত্তিকর বা মৃত্যুকর (Death Duty) দুই অংশে বিভক্ত—অ-কৃষি সম্পত্তির উপর কর এবং কৃষিগত সম্পত্তির উপর কর। কৃষিগত সম্পত্তি বা কৃষি-জমি রাজ্যের আইনসভার এলাকাধীন বিষয়। সুতরাং আইন পাস করিয়া ইহার উপর করধার্যের ক্ষমতা পার্লামেন্টের ছিল না। কিন্তু এই করধার্যের ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংগতির প্রয়োজনে বিভিন্ন রাজ্য পার্লামেন্টকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

সপক্ষে যুক্তি

ইতিহাসের দিক দিয়া বহুদিন হইতেই আমাদের দেশে মৃত্যুকর বসাইবার সপক্ষে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল। ১৯২৫ সালে কর অনুসন্ধানকারী কমিটি (Taxation Enquiry Committee) সম্পত্তিকর ধার্যের সুপারিশ করে। তখন হইতে এই কর-স্থাপনের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: (১) রাজ্যগুলির প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অর্থাভাব রহিয়াছে। সুতরাং এই কর রাজ্যগুলির রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে। (২) এই করের চাপ ধনী ব্যক্তিদের উপরই পড়ে। (৩) কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগও কম। (৪) সমাজে আর্থিক বৈষম্য রহিয়াছে তাহা কতক পরিমাণে এই করের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। (৫) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কর্মবিমুখতাও রোধ হইবে। (৬) সামর্থ্য অনুযায়ী করপ্রদান নীতি প্রযুক্ত করিতে হইলে আয়কর এবং সম্পত্তিকর একই সংগে স্থাপন

---

* সংবিধান অনুসারে (২৬৯ অনুচ্ছেদ) সম্পত্তিকর কেন্দ্রীয় রাজস্বের সূত্র নহে; কিন্তু ইউনিয়ন অঞ্চলগুলি ইহার অংশ পায় বলিয়া অনেক সময় ইহাকে কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান হয়।

করা প্রয়োজন। অবশেষে ১৯৫৩ সালে সম্পত্তিকর বিল গৃহীত হয় এবং ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাস হইতে উহাকে কার্যকর করা হয়।

সম্পত্তিকর আইনের উদ্দেশ্য

১৯৫৩ সালের সম্পত্তিকর আইনে (Estate Duty Act, 1953) বলা হইয়াছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য হইল: (ক) সমাজে বৈষম্যমূলক সম্পদ-বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করা, এবং (খ) রাজ্যগুলিকে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করা।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় তাহার উপর সম্পত্তি-কর প্রযুক্ত হয়। সম্পত্তির মূল্য অনুসারে কর নির্ধারিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে দুই বৎসরের মধ্যে কোন সম্পত্তি দান করা হইলেও উহার উপর কর বর্তিবে।

বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কৃষি-সম্পত্তি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং রাজ্যসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু একই প্রকার কর প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় সকল রাজ্যই কেন্দ্রের হস্তে কৃষি-সম্পত্তি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছে।

ব্যবস্থা

১৯৫৩ সালের মূল আইন অনুসারে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত কোন হিন্দুর বেলায় ৫০,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের সম্পত্তি না হইলে এবং অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল্য ১ লক্ষ টাকা বা তাহার বেশী না হইলে সম্পত্তিকর বসিত না। ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে অব্যাহতির সীমা ১ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ৫০ হাজার টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। সম্পত্তির স্ল্যাব-পদ্ধতিতে গতিশীল হারে ধার্য করা হয়। যে-সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তিকর প্রদান হইতে রেহাই দেওয়া হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান। (১) মৃত্যুর পূর্বে জনস্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে দান; (২) মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে অন্যান্য উদ্দেশ্যে দান; (৩) সম্পত্তিকর প্রদানের জন্য বীমা হইতে প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ; (৪) মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলা কোন আত্মীয়ার বিবাহের জন্য ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট অর্থ; ইত্যাদি।

এই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের বণ্টন

দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সম্পত্তিকর হইতে প্রাপ্ত অর্থ নিম্নলিখিতভাবে রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়: ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির জন্য মোট সংগৃহীত অর্থের শতকরা ১ ভাগ রাখিয়া বাকিটা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অনুসারে দুইভাগে ভাগ করা হয়। স্থাবর সম্পত্তি হইতে যে-যে পরিমাণে কর সংগৃহীত হয় রাজ্যগুলি সেই সেই পরিমাণেই—অর্থাৎ উদ্ভব অনুসারে (according to origin) পাইয়া থাকে। অস্থাবর সম্পত্তি হইতে সংগৃহীত অর্থ জনসংখ্যা অনুসারে বণ্টিত হয়। অস্থাবর সম্পত্তি হইতে পশ্চিমবংগের প্রাপ্য শতকরা ৭·৩৭ ভাগ।

রাজ্যসমূহ সম্পত্তিকর হইতে বর্তমানে অতি সামান্য টাকাই পাইয়া থাকে। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই সূত্র হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ২·৭০ কোটি টাকা।

২। **ভূমিরাজস্ব (Land Revenue):** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভূমিরাজস্ব ছিল বাংলা, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের রাজস্বের সর্বপ্রধান সূত্র। এই

সূত্র হইতে মোট প্রাদেশিক রাজস্বের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ সংগৃহীত হইত। বর্তমানে শতকরা অত ভাগ রাজস্ব সংগৃহীত না হইলেও জমিদারী বিলোপসাধনের দরুন পরিমাণে অনেক বেশী রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি টাকা; ১৯৫৯-৬০ সালে উহা বাড়িয়া ৯৭ কোটি টাকার উপরে দাঁড়ায়।

ভূমিরাজস্বের বৈশিষ্ট্য

ভূমিরাজস্বকে অন্যতম স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় কর (static and inelastic tax) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জমিদারি বিলোপের ফলে ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ বর্তমানে বাড়িলেও, একটি স্তরে পৌছানর পর ইহা আর বাড়িবে না। অপরদিকে বরং পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ভূমিনীতি অনুসারে খাজনাহ্রাসের প্রচেষ্টার দরুন ইহা কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যে রাজস্বের এই সূত্রের উপর অধিক পরিমাণে আস্থা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

ভূমিরাজস্বের পরিচালনা ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা মোটেই কাম্য নহে। এই উদ্দেশ্যে কর অনুসন্ধানকারী কমিশন কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছে। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

৩। স্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন (Stamps and Registration): এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের আয় বিশেষ অল্প নহে। ১৯৫৯-৬০ সালে এই সূত্র হইতে আয় ছিল প্রায় ৩৬ কোটি টাকা।

৪। নগরাঞ্চলে স্থাবর সম্পত্তির উপর কর (Urban Immovable Property Tax): এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের বৎসরে ২ কোটি টাকার মত আয় হয়।

১৯৫৯-৬০ সালে সম্পত্তি ও মূলধনের উপর উক্ত চারিটি কর হইতে ১৩৮·৩০ কোটি টাকা আয় হয়।

গ। সামগ্রী ও সেবার উপর কর

(গ) সামগ্রী ও সেবার উপর কর বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অংশ, রাজ্য অন্তঃশুল্ক, সাধারণ বিক্রয়কর, মোটরের তৈলের উপর বিক্রয়কর, প্রমোদকর, বিদ্যুৎশুল্ক, মোটরযানের উপর ধার্য কর, রেলযাত্রীর মাসুলের উপর ধার্য কর ইত্যাদি।

১। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অংশ (Share of Union Excise Duties): দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তামাক (সিগারেট সমেত), দিয়াশলাই, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, কৃষি, চা, চিনি, কাগজ এবং অত্যাবশ্যকীয় নয় এইরূপ উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর ধার্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের নীট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ প্রধানত জনসংখ্যা অনুসারে রাজ্যসমূহের মধ্যে বন্টিত হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে এই সূত্র হইতে প্রায় ৭৫·৪৫ কোটি টাকা আয় হয়।

রাজ্য অন্তঃশুল্কের বৈশিষ্ট্য

২। রাজ্য অন্তঃশুল্ক (State Excise Duties): মাদক দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারসমূহের। ইহার মূল উদ্দেশ্য এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধ করা। এইরূপ করকে

প্রতিরোধকারী বা নিষিদ্ধকারী অন্তঃশুল্ক (prohibitive excises) বলিয়াও অভিহিত করা হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য মাদক বর্জনের নীতি গ্রহণ করায় রাজ্য অন্তঃশুল্ক হইতে আয় দিন দিন কমিতেছে। বর্তমানে আয় ৪৬ কোটি টাকার মত।

এই সূত্র হইতে আয় দিন দিন কমিতেছে

মাদক দ্রব্য বর্জন সরকারের অন্যতম গৃহীত নীতি হইলেও বর্তমান অবস্থায় রাজ্যসমূহ এই পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কেন্দ্রীয় সরকারও এই বিষয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিয়াছে। তাই আরও কিছুদিন রাজ্যসমূহের রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে এই সূত্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া থাকিবে।

বিক্রয়কর কর-রাজস্বের প্রধান সূত্র

৩। বিক্রয়কর (Sales Tax): ১৯৩৮ সালের পূর্বে প্রাদেশিক আয়ব্যয়-ব্যবস্থায় বিক্রয়কর বলিয়া কিছুই ছিল না। ঐ বৎসর তৎকালীন মধ্যপ্রদেশ ও বেরার মোটর তৈল ও তৈলাক্ত করিবার দ্রব্যাদির (lubricants) উপর বিক্রয়কর ধার্য করে। পরবর্তী বৎসরে মাদ্রাজ সাধারণ বিক্রয়করের (general sales tax) প্রবর্তন করে, এবং বংগদেশ ও পাঞ্জাব শীঘ্রই মাদ্রাজের অনুবর্তী হয়। অপরাপর প্রদেশও এই পথে পদসঞ্চার করিতে বিলম্ব করে না। এবং শীঘ্রই এই কর প্রাদেশিক (পরে রাজ্যসমূহের) কর-রাজস্বের প্রধান সূত্র হইয়া দাঁড়ায়।

১৯৫১-৫২ সালে রাজ্যসমূহের কর-রাজস্ব ২৮১ কোটি টাকার মধ্যে বিক্রয়কর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ৫৪ কোটি টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে মোট ৫৫৩ কোটি টাকার মধ্যে বিক্রয়কর হইতে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১১১ কোটি টাকা। বস্ত্র, তামাক ও চিনির উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক স্থাপিত না হইলে প্রাপ্তির পরিমাণ আরও অধিক হইত।

কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর

ভারতে প্রবর্তিত বিক্রয়কর দুই প্রকারের—রাজ্য বিক্রয়কর (States Sales Tax) এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর (Central Sales Tax)। ভারতীয় সংবিধানের (Constitution of India) সংশোধিত ২৬৯ এবং ২৮৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্যের বাহিরে ক্রয়-বিক্রয় বা আমদানি-রপ্তানির উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কোন রাজ্য বিক্রয়কর ধার্য করিতে পারে না। যে-সকল দ্রব্য আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাদের ক্ষেত্রে কোন বিক্রয়কর ধার্য করিতে হইলে রাজ্যসমূহকে পার্লামেণ্ট নির্দিষ্ট বাধা-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। মোট কথা, এই সকল ক্ষেত্রে বিক্রয়কর ধার্য করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন (Central Sales Tax Act) পাস করে এবং পরে উহার কিছু রদবদল করা হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক ব্যবসায়ী আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য-ব্যপদেশে দ্রব্যের সকল প্রকার বিক্রয়ের উপর কর দিতে বাধ্য। এইরূপ ব্যবসায়ীকে রেজিষ্টারিভুক্ত হইতে হইবে। রেজিষ্টারিভুক্ত ব্যবসায়ীদের আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে

বিক্রয়করের হার বিক্রয়লব্ধ অর্থের (turnover) শতকরা এক ভাগ। অবশ্য যেখানে কোন দ্রব্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিক্রয়কর আইনে অব্যাহতি পায় অথবা কোন দ্রব্য উপরি-উক্ত হারের কম হারে কর প্রদান করে সেখানে আন্তঃবাণিজ্যের বেলায় দ্রব্যকে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর দিতে হয় না এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম হারে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর দিতে হয়। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকার জনস্বার্থে সমীচীন মনে করিলে কোন ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর হইতে মুক্তি দিতে পারে।

রাজ্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর লব্ধ আয় হইতে ইউনিয়ন অঞ্চলের অংশ বাদ দিয়া বাকিটা রাজ্যের হাতে থাকে।

কয়লা, তুলা, তুলাজাত সূতা, লৌহ ও ইস্পাত, চর্ম প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যকে আন্তঃরাজ্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে রাজ্যের বিক্রয়করের উপর বাধানিষেধের ব্যবস্থা আইনে রহিয়াছে।

রাজ্য বিক্রয়কর

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিক্রয়কর ধার্য করিবার ক্ষমতা হইল রাজ্য সরকারের। তবে বর্তমানে বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর রাজ্যসমূহ বিক্রয়কর বসাইতে পারে না। বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের উপর অন্তঃশুল্ক স্থাপন করে। এই অন্তঃশুল্ক হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে রাজ্যগুলিকে প্রথমত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ইহার পর যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে অংশত জনসংখ্যা অনুযায়ী এবং অংশত ভোগ অনুযায়ী (consumption) বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

রাজ্য বিক্রয়করের বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি

ভারতে প্রবর্তিত বিক্রয়করের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, ইহা অন্যতম অধোগতিশীল কর (regressive tax)। ইহার ভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই অধিক পড়ে। ফলে বিক্রয়কর এখনও জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিক্রয়কর প্রবর্তনের প্রচেষ্টা সকল ক্ষেত্রেই বিফল হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবর্তিত বিক্রয়করের মধ্যে হার ও প্রকৃতির কোন সংগতি নাই। করের হার কোথাও শতকরা ১½ টাকা কোথাও শতকরা ৫ টাকা। আবার অধিকাংশ রাজ্যে বিক্রয় একপর্যায়ী (single-point) হইলেও অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ ইহা হইল বহুপর্যায়ী (multi-point)—অর্থাৎ এই তিন রাজ্যে একই সামগ্রী যতবার হস্তান্তরিত হইবে ততবারই বিক্রয়কর লাগিবে। সম্প্রতি বিহারও কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বহুপর্যায়ী কর স্থাপন করিয়াছে।

বিহার, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে আবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও বিলাস-সামগ্রীর উপর তারতম্যমূলক হার (differential rates) ধার্য করা হয়।

ত্রুটির বিরুদ্ধে অবলম্বিত ও অবলম্বনীয় প্রতিবিধান

বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয়করের হার বিভিন্ন হওয়ার দরুন আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য ব্যাহত হইতেছিল। এইজন্যই ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইন পাস করা হয়; এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষের দিকে বস্ত্র,

চিনি ও তামাকের উপর রাজ্য বিক্রয়করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়।

বিক্রয়কর রাজ্যসমূহের রাজস্বের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইলেও ইহার পরিচালন-পদ্ধতিতে বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ফলে অনেকেই এই কর ফাঁকি দেয়। পরিচালন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিতে পারিলে এই সূত্র হইতে আরও বহু পরিমাণ অধিক রাজস্বসংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। উপরন্তু, ইহার বিস্তৃতিও (coverage) ব্যাপকতর করিয়া অধিকসংখ্যক লোককে করপ্রদানকারী গোষ্ঠীর (group of tax payers) অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে কর অনুসন্ধানকারী কমিশন যে সুপারিশগুলি করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা পরে হইতেছে।

৪। **মোটরের তৈলের উপর বিক্রয়কর (Sales Tax on Motor-spirit)** : মোটরের তৈলের উপর ধার্য বিক্রয়কর একটি বিশেষ বিক্রয়কর। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারই পথিকৃৎ। ১৯৫৯-৬০ সালে এই সূত্র হইতে রাজ্যসমূহের মোট ১৩·৩৭ কোটি টাকা আয় হয়।

৫। **প্রমোদকর (Entertainment Tax)** : আমোদ-প্রমোদের উপর ধার্য কর হইতে রাজ্যসমূহের কিছুটা আয় হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহার পরিমাণ ছিল প্রায় ১১ কোটি টাকা।

৬। **বিদ্যুৎ শুল্ক (Electricity Duties)** : এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ আরও কম। ১৯৫৯-৬০ সালে রাজ্যসমূহের আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১ কোটি টাকা।

৭। **মোটরযানের উপর কর (Motor Vehicles Taxes)** : মোটরযানের উপর করকে রাজ্যসমূহের রাজস্বের উল্লেখযোগ্য সূত্র বলিয়া গণ্য করা যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাকা। উপরন্তু, দেশের আর্থিক উন্নয়নের সংগে সংগে এই সূত্র হইতে আয়বৃদ্ধির আশাও করা যায়।

৮। **রেলযাত্রীর মাসুলের উপর কর (Tax on Railway Fares)** : এইটি রাজ্যসমূহের কর রাজস্বের একটি নূতন সূত্র। ইহা হইতে আয় হইতেছে মাত্র ১৯৫৭-৫৮-সাল হইতে। ঐ সালে প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকার কিছু উপর। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা বাড়িয়া প্রায় ১৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৯। **অন্যান্য কর ও শুল্ক (Other Taxes and Duties)** : অন্যান্য কর ও শুল্ক হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে রাজ্যসমূহের প্রায় ২৩ কোটি টাকা আয় হয়।

কর-নিরপেক্ষ রাজস্বসমূহ

কর-নিরপেক্ষ রাজস্বসমূহের মধ্যে বনসম্পদ হইতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি টাকা; ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা বাড়িয়া প্রায় ২৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অরণ্যজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিই এই আয়বৃদ্ধির কারণ। জলসেচ-ব্যবস্থা হইতেও আয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে এই

সূত্র হইতে ১০-১২ কোটি টাকার মত আয় হয়। ভবিষ্যতে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ইহার পর আছে রাজ্য সরকারসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, রাজপথ ও জলপথ পরিবহন ও কিছু কিছু শিল্প। এই সকল সূত্র হইতে রাজ্যগুলির ৫-৬ কোটি টাকার মত আয় হয়।

নানা সূত্রে রাজ্যসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বরাদ্দ অর্থ বা অনুদান ও নিয়মিত অর্থসাহায্যও পাইয়া থাকে। বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবংগ বিহার আসাম ও উড়িষ্যা পাট রপ্তানি শুল্কের অংশের পরিবর্তে যথাক্রমে ১ কোটি ৫২·৬৯ লক্ষ, ১২·৩১ লক্ষ, ৭৫ লক্ষ এবং ১৫ লক্ষ টাকা করিয়া পাইত। ১৯৬০-৬১ সাল হইতে উহার পরিবর্তে উক্ত রাজ্যগুলির বেলায় সাধারণ অনুদানের (general grants-in-aid) পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার উপর বিভিন্ন রাজ্য তপশীলী জাতিসমূহের উন্নয়ন প্রভৃতি নানা খাতে নিয়মিত অর্থসাহায্য বা অনুদান পাইয়া থাকে। ১৯৫৯-৬০ সালে কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে মোট অনুদানের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০৯ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য

রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের ব্যয় (Expenditure of the States Revenue Account) : রাজস্ব খাতে রাজ্যসমূহের ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—যথা, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয় (Development Expenditure and Non-development Expenditure)। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে আছে শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও সেচকার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, গ্রাম ও সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Rural and Community Development projects), পূর্ত (Civil Works), শিল্প প্রভৃতি। অপরদিকে অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল রাজস্বের উপর ধার্য প্রত্যক্ষ দাবি (Direct Demands on Revenue), রাজ্য সরকারের ঋণজনিত ব্যয়, বেসামরিক শাসন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি।

উন্নয়নমূলক ও অনুন্নয়নমূলক ব্যয়

উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে সর্বাধিক হইল শিক্ষা খাতে। এই ব্যয়ের পরিমাণ ১১০ কোটি টাকার মত। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয় বৎসরে ৮০ কোটি টাকার উপর। তারপর আছে কৃষি ও সমবায়। এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৭০ কোটি টাকার কাছাকাছি। পরবর্তী স্থানাধিকারী হইল সরকারী পূর্ত বিভাগ। এই খাতে ৬০ কোটি টাকার মত ব্যয় হয়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য রাজ্যগুলি বৎসরে ৫০ কোটি টাকার মত ব্যয় করে। জলসেচের জন্যও রাজ্যসমূহের ব্যয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যয়ের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকার মত। শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন খাতে ১৯৫৯-৬০ সালে মোট ৬০ কোটি টাকার উপর ব্যয় করা হইয়াছিল।

অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থানাধিকার করিয়া আছে বেসামরিক শাসন (Civil Administration)। বস্তুত, এই খাতে যত ব্যয় হয় তাহা উন্নয়নমূলক

বা অনুন্নয়নমূলক আর কোন খাতেই হয় না। ১৯৫৯-৬০ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫২ কোটি টাকা। তাহার উপর আছে রাজস্বের উপর প্রত্যক্ষ দাবি—অর্থাৎ রাজস্ব-সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যয়। উক্ত বৎসরে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬২ কোটি টাকার কাছাকাছি। অন্যান্য অনুন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় বিশেষ পরিবর্তনশীল—যেমন, দুর্ভিক্ষজনিত ব্যয়ের বিশেষ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তবে রাজ্য সরকারসমূহের ঋণজনিত ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮·৪৯ কোটি টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা বাড়িয়া ৬৪ কোটি টাকা হয়। উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য রাজ্য সরকারসমূহের ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ঋণজনিত ব্যয়ের পরিমাণ ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বাজেট – রাজস্ব খাতে

রাজস্ব খাতে বাজেটের অবস্থা (Budgetary Position on Revenue Account) : রাজস্ব খাতে রাজ্য সরকারসমূহের বাজেটের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য নিম্নের ছকটি প্রদত্ত লইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০ (সংশোধিত হিসাব)
রাজস্ব	৮১৬·৬	৮৮৮·১
ব্যয়	৭৬৮·৩	৮৬৪·৬
উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (–)	+৪৮·৩	+২৩·৫

মূলধন খাতে প্রাপ্তি

মূলধন খাতে সরকারসমূহের প্রাপ্তি ও ব্যয় (Receipts and Outlay on Capital Account) : বিভিন্ন প্রকার ঋণ হইতে প্রাপ্তিকেই মূলধন খাতে প্রাপ্তি (capital receipts) বলা হয়। চিরস্থায়ী ঋণ (permanent debt), সাময়িক ঋণ, কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ঋণ, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায় প্রভৃতি সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৯-৬০ সালে মূলধন খাতে রাজ্য সরকারসমূহের প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৫১০ কোটি টাকা।

মূলধন খাতে উন্নয়নমূলক ব্যয়

রাজস্ব খাতের মত মূলধন খাতে ব্যয়ও উন্নয়নমূলক ও অনুন্নয়নমূলক কার্যের জন্য হয়। উন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে আছে বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, সেচ ও নৌ-চলাচল, কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণা, বিদ্যুৎ-কেন্দ্র পরিকল্পনা, পথ পরিবহন, গৃহনির্মাণ, পথ ও জলসরবরাহ, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি। এই সকল কার্যের জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে ২৮০ কোটি টাকার উপর ব্যয় করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকার মত।

অনুন্নয়নমূলক ব্যয়

অনুন্নয়নমূলক কার্যের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, জমিদারী বিলোপসাধনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯-৬০ সালে অনুন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ১৬২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অনুন্নয়নমূলক কার্যের জন্য মূলধন খাতে ব্যয় দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।

ইহা ছাড়া ঋণ পরিশোধ করিবার এবং ঋণপ্রদান করিবার জন্য রাজ্য সরকারসমূহকে ব্যয় করিতে হয়।

ঋণ পরিশোধজনিত ব্যয়

ঋণ পরিশোধ ও ঋণপ্রদান খাতে ১৯৫৯-৬০ সালে প্রায় ২৫০ কোটি টাকার উপর ব্যয় হয়।

মোট বাজেটের অবস্থা

রাজ্য সরকারসমূহের মোট বাজেটের অবস্থা (consolidated budgetary position) সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য নিম্নের ছকটি প্রদত্ত হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়).

	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০ (সংশোধিত হিসাব)
(ক) রাজস্ব খাতে বাজেট		
রাজস্ব	৮১৬·৬	৮৮৮·১
ব্যয়	৭৬৮·৩	৮৬৪·৬
উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (–)	+৪৮·৩	+২৩·৫
(খ) মূলধন খাতে বাজেট		
প্রাপ্তি	৩৯১·৭	৫০৯·৭
ব্যয়	৪৩৪·৯	৫৪৯·১
উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (–)	–৪৩·২	–৩৯·৪
(গ) অন্যান্য (নীট)	–১·৬	–১·৭
(ঘ) নগদ টাকার হ্রাস (–) বা কর বৃদ্ধি (+)	+৩·৫	–১৪·২
(ঙ) ঋণপত্র ক্রয় (+) বা বিক্রয় (–)	+৫০·২	–২৭·৮
(চ) মোট উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (–)	+৫৩·৭	–৪২·০

সরকারী ঋণ (Public Debt) : সরকারী ঋণকে একরূপ অপরিহার্য বলিয়াই বর্ণনা করা চলে। রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-পদ্ধতিতে আয়ে ব্যয় সংকুলান না হইলেই সরকারকে হয় ঋণ করিতে হয়, না-হয় নোট ছাপাইতে হয়। অনেক সময় আবার উভয় পদ্ধতিই অনুসরণ করিতে হয়। স্বাভাবিক সময়ে বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য সরকার ঋণসংগ্রহই করে। অস্বাভাবিক সময়ে উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করে।

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ভারতের সরকারী ঋণের ইতিহাস অতি প্রাচীন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ব্রিটিশ সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে শাসনভার গ্রহণ করে তখন সরকার কোম্পানীকৃত ৯৬ কোটি টাকার মত ঋণের ভারও লয়। ইহার পর ব্রিটিশ সরকারের শাসনাধীনে ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বাড়িতে থাকে। ভারতে রেলপথ স্থাপন, সেচকার্যের প্রসার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতির জন্য সরকার বহু পরিমাণে ঋণসংগ্রহ করে। এই ঋণের একটা মোটা অংশ ছিল ইংল্যাণ্ডে সংগৃহীত। ইহা ষ্টার্লিং ঋণ নামে অভিহিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ষ্টার্লিং ঋণ একরূপ সম্পূর্ণভাবেই শোধ হইয়া যায়; কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীনতার পর হইতে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও ভারতের সরকারী ঋণ দুই ভাগে বিভক্ত—ভারত সরকারের ঋণ, এবং রাজ্য সরকারসমূহের ঋণ। ভারত সরকারের ঋণ আবার অনুৎপাদনশীল (unproductive) এবং উৎপাদনশীল বা সুদ উৎপাদনকারী (interest-yielding) এই দুই শ্রেণীতে পড়ে। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৫,৮৫৪'৬৭ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঋণ (internal debt) ছিল ৫,২৪৪'৭৯ কোটি টাকা, এবং বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ (external debt) ৬০৯'৬৮ কোটি টাকা। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের শেষে উক্ত ৫,৮৫৪'৬৭ কোটি টাকা মোট ঋণ ৬৫৮৯'৪০ কোটি টাকায় পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। নিম্নে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অনুমিত ভারত সরকারের ঋণের গঠন ও প্রকৃতি দেওয়া হইল :

ঋণের শ্রেণীবিভাগ ও পরিমাণ

ক। আভ্যন্তরীণ ঋণ :

	(হিসাব কোটি টাকায়)
১। সাধারণ ঋণ (Loans)	২,৫৮০'৬৪
২। ট্রেজারী বিল ইত্যাদি স্বল্পকালীন ঋণ	১,৪৬০'৩২
৩। স্বল্প সঞ্চয় (Small Savings)*	৯৫০'৫৮
৪। অবপূর্তি এবং রিজার্ভ ফাণ্ড (Depreciation and Reserve Funds)	৮৮'৫৯
৫। অন্যান্য	৩০৭'৯৯
	মোট ৫,৩৮৮'১২

খ। বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ :

১। ষ্টার্লিং ঋণ	১০২'৭৪
২। ডলার ঋণ	৫৩৫'৮২
	৬৩৮'৫৬

* নব-প্রবর্তিত প্রাইজ-বণ্ড স্বল্প সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত।

	(হিসাব কোটি টাকায়)
	৬৩৮'৫৬
৩। সোবিয়েত ইউনিয়ন হইতে ঋণ	৬৩'৯১
৪। অন্যান্য দেশ হইতে ঋণ	২১০'৭৪
	মোট ৯,১৩'২১
গ। সুদবিহীন ঋণ	২৮৮'০৭
	মোট ৬,৫৮৯'৪০

উক্ত ৬৫৮৯'৪০ কোটি টাকা ঋণের বিরুদ্ধে উৎপাদনশীল বা সুদ প্রদানকারী পাওনা বা সম্পত্তির (assets) পরিমাণ হইবে ৫,১৩০'৮২ কোটি টাকা। ইহারও গঠন ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হইল :

ঋণের বিরুদ্ধে পাওনা

	(হিসাব কোটি টাকায়)
ক।	
১। রেলপথসমূহকে প্রদত্ত ঋণ	১,৫৬২'৪৩
২। অন্যান্য বাণিজ্যিক বিভাগকে প্রদত্ত ঋণ	২২৮'৬৮
৩। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ	৫৩৩'৭৮
৪। রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত ও অন্যান্য সুদপ্রদানকারী ঋণ	২,৪৮৬'৫১
৫। পাকিস্তান হইতে প্রাপ্য ঋণ	৩০০'০০
৬। ষ্টার্লিং পেনসন্ হেতু জমা	১৯'৪২
সুদপ্রদানকারী সম্পত্তির মোট পরিমাণ	৫,১৩০'৮২
খ। ট্রেজারী খাতে নগদ ও ঋণপত্রে জমা	৫৫'৬৯
গ। সরকারী ঋণের বাকী অংশ যাহার বিরুদ্ধে কোন জমা নাই	১,১১৪'৮২
ঘ। সুদবিহীন ঋণ	২৮৮'০৭
	মোট ৬,৫৮৯'৪০

ঋণের বৈশিষ্ট্য :
১। অধিকাংশ ঋণ আভ্যন্তরীণ
২। অধিকাংশ ঋণ উৎপাদনশীল

উপরি-উক্ত বর্ণনা ও ছক দুইটি হইতে দেখা যাইবে যে, ভারত সরকারের মোট ঋণের শতকরা ৮২ ভাগের কিছু কম আভ্যন্তরীণ ঋণ। সুতরাং সরকারী ঋণের পরিমাণ অতি অধিক হইলেও ইহার ভার (burden) অতি সামান্য। দ্বিতীয়ত, মোটামুটি মোট ঋণের মাত্র ১৭ ভাগের বিরুদ্ধে কোন পাওনা বা সম্পত্তি নাই। বাকী ৮৩ ভাগ হইল সম্পূর্ণভাবে উৎপাদনশীল ঋণ। তৃতীয়ত, দেখা যায় যে, ছোট-খাট অংকের ঋণসংগ্রহের ব্যাপারে ভারত সরকারকে মোটেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ঋণপত্র বাজারে ছাড়িবার সংগে সংগেই ইহা একরূপ বিক্রীত হইয়া যায়। চতুর্থত, ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে নীট বৃদ্ধির পরিমাণ হইল ২,৬২৫ কোটি টাকা।

৩। সহজেই ঋণপত্র বিক্রয় হইয়া যায়
৪। ঋণের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে

রাজ্য সরকারসমূহের ঋণঃ ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকারসমূহের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ২,০৫৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৫৮-৫৯ সালেই ঋণের পরিমাণ ৩০৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, ১৯৫৮ সালের ঐ তারিখে রাজ্য সরকারসমূহের মোট ঋণ ছিল ১,৭৫৩ কোটি টাকা। মোট ঋণ ২,০৫৯ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণই ছিল ১,৫৬১ কোটি টাকা এবং স্থায়ী ঋণ (permanent debt) ছিল ৩৪৭ কোটি টাকা। বাকী টাকা ছিল অস্থায়ী (unfunded) ঋণ।

সুষ্ঠ পরিচালনা পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় সরকারের মত রাজ্য সরকারসমূহের ক্ষেত্রেও ঋণসংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল সরকারের সুষ্ঠু ঋণ-পরিচালনা পদ্ধতি। এই কারণেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে ঋণ-পদ্ধতির উপর যে-আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে তাহা অনুচিত হয় নাই বলিয়াই অভিমত প্রদান করা যাইতে পারে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ ঋণের মাধ্যমে ১,২০০ কোটি টাকা সংগ্রহের আশা করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালের মে মাসে অবশ্য ইহাকে কমাইয়া ১,০৪৪ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়।* বর্তমানে আশা করা হইতেছে যে উক্ত ১,২০০ কোটি টাকাই সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে।

ভারতীয় কর-পদ্ধতির ত্রুটি ও প্রতিবিধান (Defects of the Indian Tax System and their Remedies)ঃ ভারতীয় কর-পদ্ধতির প্রধান ত্রুটিগুলি হইল : প্রথমত, ভারতীয় কর-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নহে; ১৯৫৩ সালের পূর্বে ইহার সর্বাংগীণ সংস্কার করিয়া ইহাকে কাম্যভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। কর-পদ্ধতির দুইটি লক্ষ্য থাকে—যথা, প্রয়োজনমত রাজস্বসংগ্রহ ও সামাজিক উদ্দেশ্যসাধন। ভারতের কর-ব্যবস্থা কিন্তু এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি অভিমুখেই সর্বদা চলিয়াছে। ফলে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়মিত ব্যাহত হইয়াছে।

ত্রুটি :
১। কর-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নহে

দ্বিতীয়ত, ভারতে বহুপ্রকার কর প্রবর্তিত থাকিলেও ভারতীয় কর-পদ্ধতি হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কর সংগৃহীত হয় না। ক্যালডোরের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতে কর-রাজস্বের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের (National Income) শতকরা ৭ ভাগ মাত্র।** বর্তমানে শতকরা ৮ ভাগে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।†

২। ইহা পর্যাপ্ত নহে

---

* Appraisal and Prospects of the Second Five Year Plan.

** Kaldor's Report-এর ১ পৃষ্ঠা।

† Lewis, The Theory of Economic Growth.

তৃতীয়ত, ভারতের কর-রাজস্ব বিশেষভাবে অনতিপরিবর্তনশীলও (inelastic) বটে। উপরি-উক্ত রিপোর্টে দেখান হইয়াছে যে, বিগত ৫-৬ বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয়বৃদ্ধির অনুপাতে কর-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইরূপ বৃদ্ধিই হইল স্বাভাবিক।

৩। ভারতের কর-রাজস্ব অনতিপরিবর্তনশীল

চতুর্থত, ভারতীয় কর-পদ্ধতিতে পরোক্ষ করের বিশেষ ভারাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। কর তদন্তকারী কমিশন (Taxation Enquiry Commission) দেখাইয়াছে, মোট কর-রাজস্বের শতকরা ৪৫ ভাগ সাধারণের ভোগ্যপণ্যের উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত হয়। অপরদিকে প্রত্যক্ষ কর-রাজস্বের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৪-৪৫ সালে শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও, ১৯৫৩-৫৪ সালে শতকরা ২৪ ভাগে নামিয়া আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতের কর-পদ্ধতি হইল প্রকৃতিতে অধোগতিশীল (regressive)। এই অধোগতিশীলতার ধারণা ক্যালডোরের রিপোর্ট হইতেও পাওয়া যাইবে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ভারতে মাত্র শতকরা ১ জন লোক আয়কর প্রদান করিয়া থাকে। তুলনামূলকভাবে ব্রিটেনে ইহার শতকরা ভাগ হইল ৭০। সম্প্রতি অবশ্য আয়কর অব্যাহতির সীমা ৪,২০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩,০০০ টাকা করায় ভারতে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে অর্ধোন্নত দেশসমূহে এইরূপই ঘটে। যে-দেশে শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে সে-দেশে পরোক্ষ করেরই ভারাধিক্য দেখা যায়।

৪। পরোক্ষ করের আধিক্য

ভারতের কর-পদ্ধতি অধোগতিশীল

পঞ্চমত, কর-ব্যবস্থার পরিচালনা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া কর-প্রবঞ্চনার পরিমাণও অত্যন্ত অধিক। ক্যালডোর অনুমান করিয়াছিলেন যে ভারতে বৎসরে লোকে ১০০ কোটি টাকার উপর আয়কর ফাঁকি দিয়া থাকে। সম্প্রতি কর-পরিচালনা কমিটির রিপোর্টেও ইহা স্বীকার করা হইয়াছিল। কর-প্রবঞ্চনার জন্য কর-পদ্ধতি আরও অধোগতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ধনী ব্যক্তিরা কর ফাঁকি দিয়া যে করভার এড়াইয়া যায় তাহা দরিদ্রদেরই বহন করিতে হয়। ক্যালডোরকে অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে, ভারতের কর-পদ্ধতি ধনীদের প্রতি পক্ষপাতদৃষ্ট।

৫। কর-ব্যবস্থার পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ

ষষ্ঠত, ভারতের কর-পদ্ধতি গতানুগতিক ও রক্ষণশীল। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতে কোন মৃত্যুকর বা সম্পত্তিকর ছিল না। অনিশ্চিত আয়ের উপর কর (Capital Gains Tax) করার ব্যবস্থাও ছিল না। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে (Interim Government) এই কর প্রথম ধার্য করা হইয়াছিল; কিন্তু দুই বৎসর পরেই ইহার বিলোপসাধন করা হয়।*

৬। ইহা গতানুগতিক ও রক্ষণশীল

* ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিশেষে, কর-পদ্ধতির কোন সংস্কার নির্দেশ করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে, সংগৃহীত কর-রাজস্ব নায্যভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা। এই সম্পর্কে কর অনুসন্ধানকারী কমিশন বলিয়াছে, সাধারণের উপর আরও করভার চাপানর পূর্বে বর্তমান করসম্পদের ন্যায্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সরকারী ব্যয়-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে কাম্য বলিয়া বর্ণনা করা কঠিন। দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে ব্যয়ের (revenue expenditure) শতকরা ৭৫ ভাগ ব্যয়িত হয় অনুন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে (non-development purposes) এবং শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয়িত হয় সমাজসেবামূলক কাজকর্মে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে। অনুন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে আবার সর্বপ্রধান স্থানাধিকার করিয়া আছে প্রতিরক্ষা। ইহার জন্য মোট রাজস্বের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগের উপর ব্যয়িত হয়। রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুলিস, শাসন বিভাগ ও জেল খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হইল শতকরা ১৮ ভাগের কাছাকাছি। এইরূপ ব্যয়-পদ্ধতিকে কোনরূপেই সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের সূচক হিসাবে গণ্য করা যায় না। তবে আশার কথা হইল যে, ইহার পরিবর্তন ঘটিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্যয় করা হইত মোট রাজস্বের শতকরা ৫৪ ভাগ ; বর্তমানে ইহা নামিয়া ৩০-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ একই সময়ের মধ্যে শাসন বিভাগের জন্যও ব্যয় (expenditure on administrative services) শতকরা ১৩ ভাগ হইতে কমিয়া ৮-এ পরিণত হইয়াছে।

৭। ব্যয়-পদ্ধতি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের সূচক নহে

প্রতিবিধান (Remedies) : ভারতীয় কর-পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিবিধান নির্দেশে অধিকদূর যাইতে হয় না। মতদ্বৈধতার আশংকা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, সংস্কার এমনভাবে করিতে হইবে যে, কর-পদ্ধতি যেন বিজ্ঞানসম্মত ও গতিশীল (progressive) হয়, কর-রাজস্ব অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয় এবং ব্যয়-পদ্ধতি যেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের সূচক হয়। ইহাদের মধ্যে আবার অধিক প্রয়োজন হইল পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থসরবরাহের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে কর-রাজস্ব সংগ্রহের। সংগে সংগে সামাজিক উদ্দেশ্যও যাহাতে ব্যাহত না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দুইটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক রিপোর্ট ভারতীয় কর-পদ্ধতির সংস্কারের সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কিছু কিছু কার্যকরও করা হইয়াছে। রিপোর্ট দুইটি হইল : কর তদন্তকারী কমিশনের রিপোর্ট ও অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডোরের রিপোর্ট। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রতিবিধান সম্বন্ধে তদন্তকারী কমিশন ও অধ্যাপক ক্যালডোর

কর তদন্তকারী কমিশনের রিপোর্ট (The Report of the Taxation Enquiry Commission) : কর তদন্তকারী কমিশনের উপর কর-পদ্ধতির বিভিন্ন দিকের বিচার-বিশ্লেষণ ও পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতিবিধান নির্দেশের ভারার্পণ করা

কমিশনের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ

হয়। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানের পর ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে।

ক। সামগ্রিক সংস্কার-সাধন

রিপোর্টের প্রথমেই যে পট-ভূমিকায় বর্তমান কর-পদ্ধতির সমস্যা আলোচনা করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রসংগে অন্যান্যের মধ্যে কমিশনের বক্তব্য হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বে রাজ্যসরকারসমূহের স্বার্থ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্ধিত হওয়ায় ভারতের রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন সামগ্রিকভাবেই করিতে হইবে।

খ। কর-সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার

দ্বিতীয়ত, বর্তমান কর-সম্পদের (tax resources) যথাযোগ্য ব্যবহার না করিয়া সাধারণের উপর নূতন অধিক করভার চাপান উচিত হইবে না। কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, সামগ্রিকভাবে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে আয়গত বৈষম্যের দূরিকরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সম্ভব হয় নাই। তবে কিছুটা পরিমাণে আঞ্চলিক বৈষম্য অপসারিত হইয়াছে।

গ। করভার

তৃতীয়ত, করভার (incidence of taxation) ব্যাপারে কমিশনের সিদ্ধান্ত হইল ঃ

(১) যদিও গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চলের লোকে অধিক কর প্রদান করিয়া থাকে তবুও সামগ্রিকভাবে মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই ;

(২) নগরাঞ্চলের পরোক্ষ কর গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা অধিক গতিশীল ;

(৩) উভয় অঞ্চলেই করভার বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে ;

(৪) ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে আর উল্লেখযোগ্য নহে ;

(৫) কর নির্ধারণের ভিত্তি (base for taxation) প্রশস্ততর করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কিছুটা পরিমাণে পরোক্ষ করের সাহায্যে কর-পদ্ধতিকে গতিশীল করা যাইতে পারে।

ঘ। কর ও ঋণের উপর নির্ভরশীলতা

কমিশন পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ঘাটতি বাজেট (deficit financing) নীতি অপেক্ষা করধার্য ও ঋণ-সংগ্রহের উপরেই অধিকতর নির্ভরশীল হইতে পরামর্শ দিয়াছে।

ঙ। গ্রহণযোগ্য কর-নীতি ঃ

ইহার পর আছে গ্রহণযোগ্য কর-নীতি (tax policy) সম্বন্ধে কমিশন প্রদত্ত ধারণা। এই সম্পর্কে কমিশনের প্রথম বক্তব্য হইল যে, বৈষম্যের কয়েকটি মৌলিক সূত্রের অপসারণ দ্বারা সম্পদ ও উপার্জনে বর্তমানের দৃষ্টিকটু বৈষম্যের দূরিকরণ বহু পরিমাণ সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ কর-পদ্ধতিতে গতিশীলতার বৃদ্ধি ও ইহার অনুপূরক হিসাবে পরিচালনাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আবার ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, গতিশীলতার প্রয়োজন যেন জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে কর-পদ্ধতির এলাকায়

বাহিরে রাখা না হয়। কর-পদ্ধতি সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছে যে, ইহা দেশের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে। অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত সংগতিপূর্ণ বলিতে বুঝান হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের পরিমাণ সামান্য হ্রাস করিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে এইরূপ সম্পদের পরিমাণের বিশেষ বৃদ্ধি সম্ভব হইবে। স্বভাবতই এইরূপ ব্যবস্থা সংঘটিত হইবে সকল শ্রেণীর লোকের ভোগের পরিমাণ হ্রাসের দ্বারা। অবশ্য নির্ধন অপেক্ষা ধনিক শ্রেণীর ভোগই অধিক হ্রাস করিতে হইবে।

কমিশনের মতে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভোগের ব্যাপারে যে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে তাহা সাধারণ শ্রমিককে কার্যে বিশেষ নিরুৎসাহিত করে; অপরদিকে কিন্তু উচ্চ করহার উচ্চ আয়কর প্রদানকারী ব্যক্তিদের নিরুদ্যোগী করে বলিয়া যে প্রচার করা হয় তাহা অনেকাংশে অতিরঞ্জিত। অতএব প্রয়োজন হইল নীট আয়ের (net income) উর্ধ্বতন মাত্রা (ceiling) নির্ধারণ করা। দেখিতে হইবে যে, করপ্রদানের পর সর্বাধিক আয় যেন গড় পারিবারিক আয়ের ৩০ গুণের অধিক না হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যে ধীরে ধীরে পৌঁছিতে হইবে এবং ইহার জন্য কর-পদ্ধতির সংস্কার ছাড়া অন্যান্য পন্থাও অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে। সংগে সংগে যাহাতে কর-পদ্ধতির দ্বারা সঞ্চয়েচ্ছা ও বিনিয়োগের বৃদ্ধি ঘটে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নীট আয়ের উর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারণ

কিভাবে কর-পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অর্থ-সরবরাহ বৃদ্ধি করা হইবে? কমিশনের মতে, ইহা করা হইবে প্রধানত আয়কর, অন্তঃশুল্ক ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue) বৃদ্ধি করিয়া, ভূমি-রাজস্বের উপর সামান্য পরিমাণে সারচার্য (surcharges) ধার্য করিয়া এবং কৃষি-আয়কর ও বিক্রয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া। ইহার উপর সম্পত্তির উপর ধার্য করকে ব্যাপকতর করিতে হইবে।

কিভাবে কর-পদ্ধতির সংস্কার করিতে হইবে

কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত হইল যে, যোগ্য মূল্যায়ন নীতির (pricing policy) দ্বারা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে মুনাফা লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

বিশেষ বিশেষ কর সম্বন্ধে কর তদন্তকারী কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Taxation Enquiry Commission regarding Individual Taxes): (ক) আয়কর (Income tax): আয়করের সংস্কার সম্পর্কে তদন্তকারী কমিটির প্রধান সুপারিশগুলি হইল নিম্নলিখিতরূপ:

আয়করের সংস্কার

(১) করধার্যযোগ্য আয়ের (taxable income) ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রাপ্তিকে—যথা, ম্যানেজিং এজেন্সীর অপসারণ-জনিত ক্ষতিপূরণ, পেটেন্ট অধিকারের (patent rights) বিক্রয় প্রভৃতি আয়ের

অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, শব্দসংকেত ধাঁধার (crossword puzzles) ন্যায় কতকগুলি অনিয়মিত উপার্জনকেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়ত, ২৪ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্ব বেতন ও ভাতাপ্রাপ্ত কর্মচারী ও কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের বিশেষ সুবিধার (benefits) উপর কর ধার্য করিতে হইবে। চতুর্থত, সাধারণ আয় ও কৃষিগত আয়ের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপসাধন দ্বারা উভয়কেই আয়করের উদ্দেশ্যে একই বলিয়া ধরিতে হইবে।

১। আয়করের ব্যাপকতর সংজ্ঞা

(২) যন্ত্রপাতির অবপূর্তির দরুন প্রাথমিক বাদ (initial depreciation allowance)। 'বর্তমানে'র শতকরা ২০ হইতে ২৫-এ বাড়াইতে হইবে।

২। অবপূর্তির দরুন বাদ

(৩) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন রেয়াতের (development rebates) প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩। উন্নয়ন রেয়াৎ

(৪) করের কাঠামোরও (rates structure) পরিবর্তন সংঘটিত করিতে হইবে। এই দিকে প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইল আয়কর ও অতিরিক্ত করের স্ল্যাবের (slabs) সংখ্যাবৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, কর হইতে অব্যাহতির সীমা (tax exemption limit) 'বর্তমানে'র ৪,২০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩,০০০ টাকায় লইয়া যাইতে হইবে। তৃতীয়ত, পরিবারের জন্য রেয়াৎ (family allowance) দেওয়ার পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। চতুর্থত, অর্জিত আয়ের (earned income) জন্য যে-রেয়াৎ দেওয়া হয় তাহা মাত্র বাৎসরিক ২৪ হাজার টাকার নিম্নেই প্রযুক্ত হইবে। পঞ্চমত, বীমা প্রিমিয়াম, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতির জন্য যে-বাদ (abatement) দেওয়া হয় তাহা বর্তমানে এক-ষষ্ঠাংশ হইতে এক-পঞ্চমাংশে লইয়া আসিতে হইবে। তবে কখনই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৮ হাজার এবং হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে ১৬ হাজার টাকার বেশী বাদ দেওয়া হইবে না।

৪। করের কাঠামোর পরিবর্তন

(৫) পরিশেষে অন্তত সৎ করপ্রদানকারীর ভার লাঘব করিবার জন্য পরিচালনগত উন্নয়নের দ্বারা আয়কর প্রবঞ্চনার পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে।

৫। পরিচালনগত উন্নয়ন

(খ) সম্পত্তিকর (Estate Duty): সম্পত্তিকর সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ হইল যে, এই সূত্র হইতে আয়বৃদ্ধির জন্য কিছুদিন পরে ইহার হারের পরিবর্তন করিতে হইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সম্পত্তি দানপত্র করিলে যে কর দিতে হয় না তাহাকে বৃদ্ধি করিয়া ৫ বৎসরে লইয়া যাইতে হইবে।

(গ) আগম বা আমদানি শুল্ক (Import Duties): আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে শুল্কহার বৃদ্ধির দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। অপরদিকে বরং মোটর তৈল,

কেরোসিন তৈল প্রভৃতির আমদানি হ্রাস পাওয়ায় আমদানি শুল্কের হারও হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাস ঐ দুই দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক হইতে পূরণ করিতে হইবে।

(ঘ) নিগম বা রপ্তানি শুল্ক (Export Duties): রপ্তানি শুল্কের ক্ষেত্রে কিন্তু রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে—কারণ ভারতের রপ্তানি পণ্যে পূর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্য আসিয়াছে। কমিশনের মতে, আমদানি শুল্ক ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ একই সংগে আভ্যন্তরীণ মূল্যে দৃঢ়তা আনয়নকার্যে (price stabilisation) ব্যবহৃত হইবে।

(ঙ) অন্তঃশুল্ক (Excise Duties): অন্তঃশুল্ক সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ তামাক, তুলাবস্ত্র, চিনি, দিয়াশলাই, সিগারেট, কেরোসিন, চা, পশমবস্ত্র, বৈদ্যুতিক বাতি, কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ পণ্যের সহিত সম্পর্কিত। ইহাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর শুল্কবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার ফলে অন্তঃশুল্ক হইতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব শতকরা ৪০-৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

অন্তঃশুল্ক হইতে কেন্দ্রীয় রাজস্ববৃদ্ধি

(চ) বিক্রয়কর (Sales Tax): বিক্রয়কর সম্পর্কে কমিশন ব্যাপক সুপারিশ করিয়াছে। কমিশনের মতে, (১) সেবামূলক কার্যের (services) উপর বিক্রয়কর ধার্য করিলে পরিচালনগত বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে ; (২) আগাম বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর করধার্যের জন্য বিক্রয়কর অপেক্ষা স্ট্যাম্পশুল্ক বা স্ট্যাম্প ডিউটি প্রশস্ততর পদ্ধতি ; (৩) সংবাদপত্রের উপর বিক্রয়কর ধার্য করা লাভজনক হইবে না ; (৪) এক-পর্যায়ী (single-point) বিক্রয়কর সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে ; (৫) নিম্ন হারে বহুপর্যায়ী (multi-point) করধার্য করিলে হিসাব-নিকাশের সুবিধা হয় বটে তবে হারের স্বল্পতার জন্য রাজ্যসমূহের মোট সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে ; (৬) ক্রয়কর (purchase tax) পরিচালনা বিশেষ দুঃসাধ্য—সুতরাং এই সূত্র হইতে বিশেষ রাজস্বসংগ্রহেরও সম্ভাবনা নাই ; (৭) রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে অন্তঃশুল্ক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও চুংগির (octroi) সমন্বয় বিক্রয়করের কোন পরিবর্ত নহে।

বিক্রয়করের সংস্কার

কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছে যে, বিক্রয়কর অন্যতম রাজ্যকর (State Tax) হিসাবেই প্রবর্তিত থাকিবে। কিন্তু আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয় হইবে কেন্দ্রীয় বিষয়। আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয়ের উপর কেন্দ্র যে-কর ধার্য করিবে তাহার হার নিম্ন হইবে। এই সূত্র হইতে সংগৃহীত রাজস্ব পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনানুসারে রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে। এই বণ্টনকার্য প্রস্তাবিত আন্তঃরাজ্য করধার্যকরণ পরিষদের (Inter-State Taxation Council) সহিত পরামর্শ করিয়াই করা হইবে।

আন্তঃরাজ্য ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে সুপারিশ

(ছ) স্ট্যাম্পশুল্ক ইত্যাদি (Stamp Duties, etc.): কমিশনের মতে, আন্তঃ-রাজ্য ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে স্ট্যাম্পশুল্কের হারে সমতার প্রয়োজন নাই ; বর্তমানেই ব্যাংকের চেকের উপর স্ট্যাম্পশুল্ক ধার্য করা হইবে না ; কিন্তু আগাম কারবারের (forward transactions) উপর বোম্বাই-এর ন্যায় স্ট্যাম্পশুল্ক ধার্য করা উচিত।

(জ) ভূমি-রাজস্ব প্রভৃতি (Land Revenue and Agricultural Income Tax): কমিশনের মতে, ভূমি-রাজস্ব আর পূর্বের মত রাজস্বসংগ্রহের মূল সূত্র নহে। পূর্বের মত কৃষকের উপর ইহার ভারও অধিক নহে। ভবিষ্যৎ ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি-আয়কর সম্বন্ধে কমিশন এই সুপারিশ করিয়াছে যে, বিভিন্ন রাজ্যের ভূমি-রাজস্ব-পদ্ধতিতে কিছুটা সমতা আনয়ন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে (১) রাজস্ব-সংস্কার আঞ্চলিক ভিত্তিতে না করিয়া সামগ্রিকভাবে সকল রাজ্যের ভিত্তিতেই করিতে হইবে, (২) রাজস্ব-নির্ধারণ নির্দিষ্ট মান অনুসারে করিতে হইবে, (৩) যে-সকল অঞ্চলে এখনও জরিপ, শ্রেণীবিভাগ, বন্দোবস্ত করা হয় নাই সেই সকল অঞ্চলে অবিলম্বেই এই কার্য সমাধা করিতে হইবে, (৪) নির্দিষ্ট মান অনুসারে রাজস্ব-নির্ধারণ করার পর বিভিন্ন রাজ্যে নির্ধারিত রাজস্বের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, (৫) প্রতি দশ বৎসর অন্তর মূল্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত রাজস্বের পুনর্নিধারণ করিতে হইবে, (৬) যে-যে রাজ্যে কৃষি-আয়কর এখনও প্রবর্তিত হয় নাই—সেখানে ইহা অনতিবিলম্বেই প্রবর্তিত করিতে হইবে, (৭) চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইবে কৃষি-আয়করকে সাধারণ আয়করের অংগীভূত করিয়া একটিমাত্র আয়করের প্রবর্তন করা, (৮) কৃষিগত আয় ৩ হাজার টাকার অধিক হইলে ইহার উপর কৃষি-আয়কর ধার্য করিতে হইবে।

ভূমি-রাজস্ব ও কৃষি-আয়করের সংস্কার

কর-পদ্ধতির সংস্কার সম্বন্ধে ক্যালডোরের রিপোর্ট (Kaldor's Report on Tax Reform): ক্যালডোর রিপোর্টের উল্লেখ ইতিমধ্যে করা হইয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডোর (Nicolas Kaldor) ভারতে আসিয়াছিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। তাঁহার ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (the Indian Statistical Institute) তাঁহাকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজস্বের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় কর-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ইহার সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে অনুরোধ করে। অধ্যাপক ক্যালডোর ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে অনুসন্ধান কার্য সুরু করেন; এবং ইহার রিপোর্ট পেশ করেন ঐ সালের জুন মাসে। রিপোর্টে তিনি প্রধানত ব্যক্তিগত (personal) এবং ব্যবসায় (business) কর সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত ও ব্যবসায় কর

ক্যালডোরের রিপোর্টে প্রথমেই দেখান হইয়াছে যে, ভারতে সংগৃহীত কর-রাজস্বের পরিমাণ অতি সামান্য। ইহা জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র। উপরন্তু, ইহা পরিবর্তনশীল নহে—অন্যান্য দেশের ন্যায় জাতীয় আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।* সুতরাং ভারতীয় কর-পদ্ধতি উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার সহায়ক নহে।

---

* ২২১ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে—অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর-রাজস্ব সংগ্রহের আশা করা হইয়াছে। ইহার উপর ১,২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি-ব্যয় (deficit financing) করিয়াও ৪০০ কোটি টাকার মত অভাব থাকিয়া যাইবে। অধ্যাপক ক্যালডোরের মতে, পরিকল্পনাধীন ৫ বৎসরে মোট ৮০০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি-ব্যয় অর্থ-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না।* অর্থাৎ, ইহার অধিক ঘাটতি-ব্যয় করিলে মুদ্রাস্ফীতি আশংকাজনক রূপ ধারণ করিতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যদি অনুমিত অর্থসংগ্রহ করিতে হয় তবে অতিরিক্ত কর-রাজস্বের পরিমাণ ৪৫০কোটি টাকার পরিবর্তে ১,২৫০ কোটি টাকাই (পরিকল্পিত ৪৫০ কোটি টাকা + প্রাথমিকভাবে অনুমিত অভাব ৪০০ কোটি টাকা + ঘাটতি-ব্যয় হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত ৪০০ কোটি টাকা = ১,২৫০ কোটি টাকা) হইবে। ক্যালডোরের অভিমত হইল যে, কর-রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে উক্ত লক্ষ্যে পৌছান—অর্থাৎ ৫ বৎসরে ১,২৫০ কোটি টাকা (বা বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা করিয়া) সংগ্রহ মোটেই অসম্ভব নহে। আংশিকভাবে ইহা প্রত্যক্ষ করসমূহের সংস্কার-সাধনের দ্বারাই করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কর-রাজস্বের প্রয়োজনীয়তা

কর-পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা কতটা অতিরিক্ত কর-রাজস্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে

প্রত্যক্ষ করের বর্তমান ত্রুটি সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য হইল যে ইহাতে দক্ষতা বা ন্যায় (equity) কোনটাই নাই। ইহা অন্যায্য, যেহেতু বর্তমানে আয়ের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা সংকীর্ণ ও কর-প্রবঞ্চনাকারীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। ইহা দক্ষতাবিহীন, যেহেতু পরিচালনগত ত্রুটির জন্য কর-প্রবঞ্চনা বিশেষ সহজসাধ্য কার্য।

সুতরাং প্রত্যক্ষ কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রস্তাব হইল যে, ইহার ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিতে হইবে। ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিবার মাধ্যম হইল—(১) সম্পদের উপর বার্ষিক করধার্য (annual tax on wealth) করা ; (২) মূলধন-লাভকে (capital gains) করভুক্ত করা ; (৩) দানপত্রের উপর সাধারণ করধার্য (a general gift tax) করা ; এবং (৪) ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর করধার্য (a personal expenditure tax) করা।

ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ করের সংস্কার কিভাবে করিতে হইবে

এই সকল কর প্রবর্তিত হইলে আয়কর, মূলধন-লাভ কর, বার্ষিক সম্পদকর, দানপত্রের উপর সাধারণ কর এবং ব্যক্তিগত আয়কর—এই পাঁচটি প্রত্যক্ষ করের জরিপ একই সংগে করা হইবে, এবং করদাতৃগণকে ইহাদের সম্পর্কে খবরাখবর একই রিটার্ণভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ফলে কর-প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়িবে।

ক্যালডোরের মতে, আয়করের সর্বাধিক হার শতকরা ৪৫ ভাগের অধিক হওয়া উচিত নহে। বর্তমানের যে সর্বাধিক হার ৯২ তাহা উদ্যোগ ব্যাহত করে এবং

* পরিকল্পনা কমিশনও স্বীকার করিয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিক ঘাটতি-ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

কর-প্রবঞ্চনা করিতে উৎসাহিত করে। সুতরাং, আয়করের সর্বাধিক হার যদি ৪৫-এ নামাইয়া আনা হয় এবং উপরি-উক্ত করগুলি ধার্য করা হয় তবে কর-রাজস্ব বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত হইবে না বা করপ্রবঞ্চনা সহজসাধ্য হইবে না।

আয়করের সর্বাধিক হার

বাৎসরিক সম্পদকর, ব্যয়কর ও দানের উপর কর বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপরই ধার্য করা হইবে। তবে ইহাদের হার যেন অধিক না হয়। সম্পদকরের সর্বাধিক হার হইবে শতকরা ১·৫ ভাগ, ব্যক্তিগত ব্যয়করের শতকরা ৩০ ভাগ এবং দানের উপর করের শতকরা ৮০ ভাগ।

ব্যবসায়ের উপর কর সম্বন্ধে ক্যালডোরের প্রধান সুপারিশটি হইল: বর্তমানে যে মূলধন-ব্যয়ের (capital expenditure) জন্য নানারূপ রেয়াৎ দেওয়া হয়—যথা, স্বাভাবিক অপচয় (normal depreciation), অতিরিক্ত অপচয় (additional depreciation), উন্নয়ন রেয়াৎ (development rebate) প্রভৃতি—তাহার পরিবর্তে মূলধন-ব্যয়ের অনুপাতে একটি মাত্র রেয়াৎ দিতে হইবে।

ব্যবসায়ের উপর করের সংস্কার: একটি-মাত্র রেয়াৎ

দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর বর্তমানে যে নানারূপ করধার্য করা হয় তাহার পরিবর্তে টাকায় ৭ আনা হারে প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের উপর একটিমাত্র কর ধার্য করিতে হইবে। অংশীদারদের ডিভিডেণ্ডের উপরও ঐ একই হারে কর ধার্য করা প্রয়োজন। এই কর ডিভিডেণ্ড-প্রাপ্ত অংশীদারদের খাতে জমা করা হইবে—অর্থাৎ তাহার মোট কর হইতে বাদ যাইবে।

মুনাফার উপর কর

ব্যবসায়-আয়করের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্যালডোরের নির্দেশমত প্রতিবিধান হইল বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আয়ের হিসাব পরীক্ষা করান এবং পরিচালনগত অন্যান্য উন্নয়ন সাধন করা—কর-প্রবঞ্চনার শাস্তি কঠিনতর করা, আয়কর পরিচালকদের মাহিনা বৃদ্ধি করা; ইত্যাদি।

ব্যবসায়-আয়করের প্রবঞ্চনার প্রতিবিধান

উপরি-উক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর করা হইলে একমাত্র প্রত্যক্ষ কর হইতে বৎসরে ১২৫ কোটি টাকা করিয়া আগামী ৫ বৎসরে ৬২৫ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহ করা মোটেই অসম্ভব হইবে না—ইহাই ছিল অধ্যাপক ক্যালডোরের অভিমত। বাকী ৬২৫ কোটি টাকা (প্রয়োজনীয় ১,২৫০ কোটি টাকার কর-রাজস্বের অর্ধেক) কিভাবে সংগ্রহ করা হইবে সে-সম্বন্ধে ক্যালডোর সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। তবে ইংগিত দিয়াছেন যে, ঐ টাকা পরোক্ষ কর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

এইভাবে সংস্কার দ্বারা এতটা কর-রাজস্ব সংগৃহীত হইবে

সুপারিশ কার্যকরকরণ (Implementation of the Recommendations): মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, কর তদন্তকারী কমিশন ও অধ্যাপক ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে বর্তমানে ভারতীয় কর-পদ্ধতির সংস্কারকার্য

চলিতেছে। তবে অধিকাংশ সুপারিশই এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। যে-যে প্রধান প্রধান সুপারিশকে কার্যকর করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার তালিকা নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যাইতে পারে।

কর তদন্তকারী কমিশনের সুপারিশ কার্যকরকরণ

(ক) কর তদন্তকারী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আয়করের হারের গঠনে পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে—যথা, কর অব্যাহতির সীমা ৪,২০০ টাকা হইতে কমাইয়া ৩,০০০ টাকায় লইয়া আসা হইয়াছে। পরিবারের জন্য রেয়াৎ দেওয়ার পদ্ধতি (system of family allowance) প্রবর্তন করা হইয়াছে। অর্জিত আয়ের রেয়াৎ সম্বন্ধে পরিবর্তন করা হইয়াছে, ইত্যাদি।

(খ) আমদানি শুল্কবৃদ্ধির দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অন্তঃশুল্কের উপর নির্ভরশীলতার বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

(গ) বিক্রয়কর ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত সুপারিশগুলিকে অনেকটা কার্যকর করা হইয়াছে।

(ঘ) সম্পত্তিকরের (Estate Duty) ক্ষেত্রে অব্যাহতির সময় দুই বৎসর হইতে বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসর করা হইয়াছে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর ধার্য করিয়া এবং বস্ত্র, চিনি ও তামাকের বেলায় অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক দ্বারা বিক্রয়করের অনেকটা সংস্কারসাধন করা হইয়াছে।

ক্যালডোরের সুপারিশ কাযকরকরণ

(চ) ক্যালডোরের সুপারিশ অনুসারে মূলধন-লাভকর, সম্পদকর, ব্যয়কর ও সাধারণ দানকর ধার্য করা হইয়াছে, কিন্তু আয়করের হার কমাইয়া সর্বাধিক টাকার ৭ আনায় লইয়া যাওয়া হয় নাই।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে, সরকার কর অনুসন্ধানকারী কমিশন ও ক্যালডোরের সুপারিশ মূলত গ্রহণ করিলেও বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের সামগ্রিকভাবে কার্যকর করিতে পারিতেছে না। পরিকল্পনা কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে করসংস্কার কার্য আরও দ্রুত অগ্রসর হইলে রাজস্বহ্রাসের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। প্রধানত এইজন্যই সম্যক সংস্কারসাধন সম্ভব হয় নাই।

আর কতটা কর-রাজস্বের বৃদ্ধিসাধন সম্ভব

এই প্রসংগে আলোচনা করা প্রয়োজন যে কর-পদ্ধতির সংস্কারসাধন দ্বারা কি পরিমাণ কর-রাজস্বের বৃদ্ধি করা সম্ভব। ক্যালডোরের মতে, কর-পদ্ধতির কাম্য সংস্কারসাধন দ্বারা বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব। ইহা সত্য যে ক্যালডোরের সুপারিশসমূহ পুরাপুরি কার্যকর করা হয় নাই, তবুও উক্ত সংগ্রহবৃদ্ধির লক্ষ্য অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে অতিরিক্ত কর হইতে ২৭৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে এই সূত্র হইতে ৪৫২ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়। ইহার মধ্যে

প্রত্যক্ষ করের অংশ ছিল ৫৪ কোটি টাকা, এবং অপ্রত্যক্ষ করের ৩২৮ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ করভার মাত্র ৫৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বিভিন্ন মহল হইতে ইহার আধিক্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছে। বলা হইয়াছে যে ইহার ফলে আমাদের মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যাহত হইয়া উন্নয়নের গতি শ্লথ করিয়া তুলিতেছে। অপরদিকে পরোক্ষ করের ভারাধিক্যের বিরুদ্ধে এইরূপ আন্দোলনই সুরু হইয়াছে বলা চলে।* তবুও অতিরিক্ত কর-রাজস্বের জন্য সরকার পরোক্ষ করের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এই প্রসংগে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলিয়াছেন, পরিকল্পিত উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কর-সংগ্রহের ভিত্তিকে প্রশস্ততর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই কারণে প্রত্যক্ষ কর হইতে যথাসম্ভব রাজস্ব-সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান বৎসরে (১৯৬০-৬১ সালে) অতিরিক্ত কর-রাজস্বের অধিকাংশই সংগৃহীত হইবে পরোক্ষ কর হইতে।**

প্রত্যক্ষ করভার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতি-ক্রিয়া

এইভাবে পরিকল্পনার ব্যয়নির্বাহের জন্য পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতার পরিমাণ আর কত দূর বাড়ান যাইতে পারে তাহা বিবেচ্য, এবং এই নির্ভরশীলতা কতদূর সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায়ের দ্যোতক তাহাও বিশ্লেষণযোগ্য। অতএব, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভার বৃদ্ধি করিয়া কর-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অভিমত প্রদান করা কঠিন। তবে পরিচালনাগত ত্রুটি দূর করিয়া কর-রাজস্বের বেশ কিছুটা বৃদ্ধিসাধন সম্ভব। ভারতে লোক শুধু প্রত্যক্ষ করই ফাঁকি দেয় না, পরোক্ষ কর ফাঁকি দেয়। উপরন্তু, করপ্রদান ও হিসাব দাখিলের জটিলতার জন্যও ঠিকমত কর সংগৃহীত হয় না। এই দিক দিয়া কর-পরিচালনা অনুসন্ধানকারী কমিটির (Tax Administration Enquiry Committee) সুপারিশসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

পরোক্ষ করভার বৃদ্ধি সম্বন্ধে মত-দ্বৈধতা

তবে পরিচালনাগত উন্নয়ন দ্বারা কর-রাজস্বের বৃদ্ধি সম্ভব

প্রশ্নোত্তর

1. Trace briefly evolution of Federal Finance in India.

(১৭৪-১৭৬ এবং ১৭৮-১৮১ পৃষ্ঠা।)

2. Comment on the present allocation of financial resources between the Union and the States. (C. U. B. Com. 1952)

[ইংগিত: সমালোচনা প্রধানত পশ্চিমবংগ রাজ্যের দৃষ্টিভংগি হইতেই করা প্রয়োজন।

(১৮৫-১৮৯ পৃষ্ঠা)

3. Indicate the scope and importance of the Indian Income Tax. (C. U. B. Com. 1956; B. A. 1949) (১৯২-১৯৪ পৃষ্ঠা)

---

* Asoke Mehta, Eight Years of Planning.

** বাজেট বক্তৃতা, ১৯৬০।

4. Discuss in the light of incidence and effects the justifiability or otherwise of the Union Excise Duties. Examine their role in the Indian Tax System. (১৯৪-১৯৬ এবং ২২২ পৃষ্ঠা)

5. Write a defence of the Estate Duty imposed in India by the Act of 1953. Discuss the main features of the Act. What modifications have been made in it? (C. U. B. Com. 1953, '54; B. A. 1952, '53, '54)

[ইংগিত: সম্পত্তিকর ধার্যের প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা করিয়া সম্পত্তিকর আইনের মূল ধারাগুলি আলোচনা করিতে হইবে। ইহার পর সাধারণ দানকর প্রবর্তনের ফলে ইহার যে সংস্কারসাধন করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিতে হইবে।......২০০-২০৩ পৃষ্ঠা]

6. Give the reasons for the imposition of General Gift Tax. Briefly describe the main features of the tax. (২০৪-২০৬ পৃষ্ঠা)

7. Examine the case for and against the imposition of the Expenditure Tax and Wealth Tax in India. (C. U. B. Com. 1958; B. A. 1959) (২০০-২০৪ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the merits and demerits of the Sales Tax and indicate their importance in the revenue of the States. Indicate the reforms that have been carried in respect of this tax. (২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা)

9. Give a short description of India's tax structure. Do you think that it is still possible to increase substantially the tax revenue of the Government? How? (C. U. B. Com. 1960) (২২১-২২৩ এবং ২৩১-২২৩ পৃষ্ঠা)

10. Give in brief the findings and recommendations of the Taxation Enquiry Commission regarding Indian Tax System.

[ইংগিত: বিশেষ বিশেষ কর সম্বন্ধে লিখিতে হইবে না।......২২৩-২২৫ পৃষ্ঠা]

11. Point out the defects and deficiencies of the Indian Tax System and suggest ways of improvement. (২২১-২২৫ এবং ২২৮-২৩১ পৃষ্ঠা)

12. "The Indian Tax System is regressive." Examine the statement. (C. U. B. Com. 1957) (২২২ পৃষ্ঠা)

13. Give in brief Kaldor's Report on Indian Tax Reform. How far have the recommendations of Prof. Kaldor been implemented? (২২৮-২৩১ পৃষ্ঠা)

14. Describe the size and composition of India's Public Debt. Comment on it. (২১৮-২২১ পৃষ্ঠা)

অষ্টম অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(ECONOMIC PLANNING)

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Economic Planning) : জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করাই সরকারের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকিয়াছে। অর্ধোন্নত দেশসমূহে এই পরিকল্পনা-প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের কারণ—অপরিকল্পিত ব্যবস্থার ত্রুটি

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের মূলে আছে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা নামেও অভিহিত। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ দেখিয়াছে যে এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশকে কর্মহীন অবস্থায় জীবনযাপন করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, আর্থিক সম্পদ কয়েকজনের হস্তে পুঞ্জীভূত হওয়ায় সমাজে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, পরিকল্পনা না থাকায় অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেমন, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প, এবং ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের মধ্যে এক অংগাংগি সম্পর্ক রহিয়াছে। ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের (consumers) ক্রয়শক্তির (ক্রয়শক্তি তাহাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল) উপর নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার। আবার মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রসার নির্ভর করে সকল প্রকার শিল্পে নূতন মূলধন বিনিয়োগের হার ও পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের উপর। অতএব, আর্থিক কাজকর্ম অবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। ধনতন্ত্রে এইরূপ নিয়ন্ত্রণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। একমাত্র বাজারের মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চতুর্থত, ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফার অংশ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে মজুরির হার স্বল্প করিয়া রাখায় জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পায়। ইহার ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কম এবং ঐ প্রকার শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয়। আবার ভোগ্য-দ্রব্য-শিল্পে মন্দা দেখা দিলে মূলধন বিনিয়োগের গতি শ্লথ হয় এবং মূলধন উৎপাদনকারী শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। প্রধানত এই কারণে তথাকথিত অত্যুৎপাদন, মন্দাবাজার, ব্যাপক কর্মহীনতা, দুঃখদুর্দশা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। মোটকথা, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দারিদ্র্য, আর্থিক বৈষম্য, বেকার-সমস্যা, সম্পদের অপচয় প্রভৃতি হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধিই পায়।

এইরূপ অকাম্য অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিহার করিবার দাবির ফলেই উদ্ভব হইয়াছে পরিকল্পনা-প্রবণতার। বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজার, সোবিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনার সাফল্য প্রভৃতি ইহাতে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছে।

পরিকল্পনার প্রকার-ভেদ:

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রকারভেদ (variation) দেখা যায়। কাম্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, জাতীয় আয়ের কাম্য বণ্টন, অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি সকলই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইলেও সকল ক্ষেত্রে ইহাদের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। যে দেশ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণ—অর্থাৎ, কিভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা যায় তাহাই তাহার প্রধান সমস্যা; অপরদিকে অর্ধোন্নত দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল উন্নয়ন—জাতীয় আয় বৃদ্ধির দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। অনুরূপভাবে, যেখানে আর্থিক বৈষম্য অতি প্রকট সেখানে ইহার হ্রাসই অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যাহা হউক বলা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মোটামুটি দুই প্রকারের—(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পনা (maintenance planning), এবং (খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা (development planning) কারণ এই দুই প্রাথমিক উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। অর্ধোন্নত দেশ ভারতের পরিকল্পনা যে উন্নয়নমূলক তাহা সহজেই অনুমেয়।

সংরক্ষণ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

পরিকল্পনার পরিমাণ-ভেদ:

পরিকল্পনার আবার পরিমাণভেদও (degrees of planning) থাকে। কোন কোন দেশে সকল ক্ষেত্রে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর হইতে ব্যক্তিগত মালিকানা অপসারিত করিয়া সামাজিক বা সমবায়িক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অর্থনৈতিক জীবনকে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনাধীন করা হয়। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয়সাধন করা হয় যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারলাভ করিয়া সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণ-সাধন করিতে পারে। এইরূপ পরিকল্পনাকে আমরা পূর্ণাংগ পরিকল্পনা বলিতে পারি। সোবিয়েত ইউনিয়ন পূর্ণাংগ পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আবার কতকগুলি দেশ আছে যেখানে পরিকল্পনা পূর্ণাংগ নয়; সেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন রাষ্ট্র বা করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হয়, আর বাকিটা বেসরকারী উদ্যোগাধীন করা হয়। অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে অল্পবিস্তর রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও ব্যক্তিগত

পূর্ণাংগ পরিকল্পনা

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

মূলধন-মালিকানা পাশাপাশি অবস্থান করে।* ভারতীয় পরিকল্পনা এই শেষোক্ত ধরনের।

উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ (Nature of Development Planning): দেখা গিয়াছে যে ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশের পরিকল্পনা সকল সময়ই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করে। এই সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এরূপ কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে যাহা সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত দূরীভূত হইতে পারে না। উন্নত দেশসমূহে দেখা যায় যে সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীতও জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে অথবা ক্রমাবনতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।† ইহার কারণ, অর্ধোন্নত দেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণের কাছে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিশেষ মুনাফা করিতে পারা যায় না বলিয়া শিল্পপতিগণ শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে আগ্রহান্বিত হয় না।** এ অবস্থায় স্বভাবতই প্রগতিশীল সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হইতে হয়।

ভারতের ন্যায় দেশের পরিকল্পনা উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে কৃষি-ব্যবস্থা। কৃষিই এই সকল দেশের প্রধান উপজীবিকা; কিন্তু কৃষিই সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ।*** সুতরাং কৃষিগত সমস্যার সমাধান ব্যতীত কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্ধোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের চিন্তা করা যায় না। এই কার্য যে সরকারকেই করিতে হইবে তাহাও অন্যতম স্বীকৃত নীতি। কিন্তু একমাত্র কৃষির সুসংগঠনের দ্বারাই উন্নয়নের পথ নির্মাণ করা যায় না। বৃহদায়তনে যান্ত্রিক কৃষিকার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইলে বহুসংখ্যক কৃষক কর্মহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব। অতএব, কৃষির সুসংগঠনের শিল্পোন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

১। অর্ধোন্নত দেশের পরিকল্পনায় প্রথমেই কৃষিকে সুসংগঠিত করিতে হইবে

২। তারপর প্রয়োজন শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া

অন্যান্য কারণেও শিল্পোন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। প্রথমত, একমাত্র কৃষির উন্নয়নের দ্বারা জাতীয় আয় পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়ান যায় না। দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে কার্যকর বলিয়া ইহার উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করা যায় না। তৃতীয়ত, কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনেরই থাকে।

---

* প্রথম খণ্ডের ৩৪৫-৩৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† Lewis, Principles of Economic Planning.

** Nurkese, Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries.

*** ১ম খণ্ডের ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

অবশ্য অর্ধোন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে—যথা, মূলধন ও শিল্প-দক্ষতার অভাব, পরিবহনের অব্যবস্থা, মূল শিল্পের অপ্রাচুর্য, জনসাধারণের স্বল্প ক্রয়শক্তি ইত্যাদি। এগুলিকে দূর করিয়াই শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

শিল্পোন্নয়নের প্রতিবন্ধক

কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আবার সুদৃঢ় মুদ্রা-ব্যবস্থা, ন্যায্য কর-পদ্ধতি এবং জনকল্যাণকর আইন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজন। এগুলির জন্য সরকারকে শক্তিশালীও হইতে হইবে। সরকার শক্তিশালী না হইলে জমিদারী প্রথার বিলোপ, শিল্প-বাণিজ্যকে প্রয়োজনমত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন, গতিশীল কর-ব্যবস্থা (progressive tax system) প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না। ফলে পরিকল্পনাও ব্যাহত হইবে। পরিশেষে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে না পারিলে উন্নয়ন-পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না।

৩। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়

উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান (Factors of Development Planning) : উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি চারি প্রকার উপাদান বা ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য : (ক) কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষির সুসংগঠন, (খ) সুষম শিল্পোন্নয়ন (balanced industrial development), (গ) পরিবহন শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ, এবং (ঘ) সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি।

চারিটি উপাদান

(ক) কৃষির সুসংগঠন : কৃষির সুসংগঠনের জন্য সরকারকে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে রাষ্ট্র ও কৃষি অধ্যায়ে সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।* সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(খ) সুষম শিল্পোন্নয়ন : অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নব্রতী সরকারকে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উহাকে দেখিতে হইবে যে—(ক) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্প-ব্যবস্থা যেন পরস্পরের সহিত সংগতিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে, এবং (খ) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প-ব্যবস্থাতেও যেন সামঞ্জস্য থাকে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য উহাদিগকে বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পগুলির প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইতে হইবে, কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া এবং মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নয়নসাধন করিতে হইবে, বিক্রয়বাজারের প্রসার করিতে হইবে।

উন্নয়নমূলক মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থায় বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে মূল শিল্পসমূহ গঠন করিতে হইবে। খনিজ শিল্পের

* ১ম খণ্ডের ২৬৩-২৬৭ পৃষ্ঠা দেখ।

বেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। যে-শিল্প বেসরকারী মালিকানায় ঠিকমত গঠিত হয় না তাহাদের স্থাপনের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে।* প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নবগঠিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং শিল্পগত পরিচালনার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

সামাজিক মূলধন

(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ: উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যকে 'সামাজিক মূলধন' (social capital) বলিয়া অভিহিত করা হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন ব্যতিরেকে যেমন, উৎপাদন-ব্যবস্থার কাম্য উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না, তেমনি সামাজিক মূলধনের সম্প্রসারণ ছাড়াও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর হয় না।

এই সামাজিক মূলধনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহন ও সংসরণ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাসস্থান-ব্যবস্থা, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুতরাং উন্নয়নব্রতী সরকারকে কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের আনুষংগিক উপাদান হিসাবেই এগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।

সম্প্রসারণ সেবা

(ঘ) সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি: সামাজিক উৎসাহ সামাজিক মূলধনের একাংশ মাত্র। কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইহার গুরুত্বের জন্য ইহাকে পৃথক্ করিয়া দেখান হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে সামাজিক উৎসাহ সৃষ্ট না হইলে উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সম্প্রসারণ সেবার (extension service)। সম্প্রসারণ সেবার দ্বারা গ্রাম ও নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে—উন্নয়ন পরিকল্পনা যে সকলেরই জন্য ব্যাপক প্রচারকার্যের দ্বারা এই ধারণা জনসাধারণের মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা হইল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা। অর্ধোন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক, উন্নয়নকার্যের ফলে প্রথম প্রথম এই হার আরও বৃদ্ধি পায়।† সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিলে উন্নয়ন পরিকল্পনার ফল জীবনযাত্রার মানে প্রতিফলিত হইবে না—যাহা কিছু অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবে তাহা অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভোগে নিয়োগ করিতে হইবে।

---

* পূর্ণাংগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবশ্য বেসরকারী মালিকানা বলিয়া কিছু থাকে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারকে সকল প্রকার শিল্প-গঠনেরই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

† ১ম খণ্ডের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Planning in India) :

ভারত অন্যতম অর্ধোন্নত দেশ। সুতরাং ভারতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু, ধ্বংসাত্মক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং দেশবিভাগের আঘাত ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনকে পংগু করিয়া ফেলিয়াছে। এ-অবস্থা হইতেও মুক্তির পথ যে উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে নিহিত সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

ভারতের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

বহুদিন হইতেই ভারতে পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৪ সালে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া 'ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতি'* নামক এক পুস্তকে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। ইহার পর ১৯৩৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার জন্য শ্রীজওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। যুদ্ধের ফলে কমিটির কার্য বিশেষ অগ্রসর হয় না। তবে কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কে. টি. সাহার সম্পাদনায় কতকগুলি মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য বাণিজ্য সদস্যের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে। পরে এই কমিটির স্থান অধিকার করে পুনর্গঠন কমিটি (Reconstruction Committee)। ১৯৪৪ সালে স্যার আর্দেশীর দালালের পরিচালনায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ (Planning and Development Department) গঠন করা হয়। প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সরকারকে পরিকল্পনা বিভাগ গঠন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি যে-সকল পরিকল্পনা রচনা করে তাহা কতকগুলি জনহিতকর ও সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যের (Public Works and Social Service) হিসাব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অপরদিকে ভারত সরকার কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট তৈয়ারি করে এবং শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের হইয়া ৩১টি প্যানেল (Panels) গঠন করে। পুনর্গঠনের এই সমস্ত পরিকল্পনা যেমন ছিল আংশিক তেমনি ছিল সমন্বয়বিহীন। মূল সমস্যার সমাধানের সন্ধান ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। বেসরকারী তরফ হইতেও একাধিক পরিকল্পনা পেশ করা হয়। বৃহৎ শিল্পপতিগণের পক্ষ হইতে ১০,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা রচনা করা হয়। ইহা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' (Bombay Plan) নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনায় ১৫ বৎসরের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাব করা হয় এবং শিল্পপ্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনার রচয়িতৃগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত রাখিবার পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট অর্থবিদ হ্যারিশ (Harris) এই পরিকল্পনা সম্পর্কে

পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা ;

বোম্বাই পরিকল্পনা

* Planned Economy for India.

মন্তব্য করেন যে, ইহা 'অর্থনৈতিক গণিতের মারপ্যাচ ভিন্ন কিছু নয়।' ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন স্বর্গত এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে 'গণ পরিকল্পনা' (People's Plan) নামে অভিহিত দশ বৎসরের জন্যে ১৫,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করা। উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ও রাষ্ট্রকে প্রকৃতভাবে লোকায়ত্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়।

গণ পরিকল্পনা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি পরিকল্পনা হইল শ্রী এম. এন. আগরওয়ালের 'গান্ধীবাদী পরিকল্পনা' (Gandhian Plan)। পরিকল্পনায় ৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়। 'সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা' (plain living and high thinking) এই আদর্শ গান্ধীবাদী পরিকল্পনার মূল সুর। পরিকল্পনায় বিকেন্দ্রিকরণ নীতির ভিত্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হয়; এবং শিল্পক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সাহায্যে উৎপাদনপ্রসারের সুপারিশ করা হয়। যন্ত্রশিল্পের আধিক্যের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, উহাতে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রীভূত ও বৃহদায়তন হইয়া উৎপাদন-পদ্ধতির সরলতা নষ্ট করে, ব্যক্তিত্বকে পংগু করে ও স্থানীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার অবসান ঘটায়। যাহা হউক, বর্তমান শিল্পযুগে এইরূপ পরিকল্পনার খুব বেশী গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। আর যন্ত্রশিল্পের যে-সকল ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্পের নিজস্ব কোন ত্রুটি নয়, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলেই উহাদের উদ্ভব হয়। সামাজিক সম্পর্ককে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে পারিলে উপরি-উক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে।

গান্ধীবাদী পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হয়, পরিকল্পনা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য শ্রী কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড (an Advisory Planning Board) গঠন করা হয়। কমিটি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও নিয়োগের সংস্থান করাই হইবে পরিকল্পনার লক্ষ্য। প্রতিরক্ষা শিল্প এবং খাদ্য, বস্ত্র, আবাস প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। সেচ, জলবিদ্যুৎ, ইস্পাত এবং রাসায়নিক দ্রব্যকে সমগুরুত্ব দিতে হইবে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কি হইবে তাহার উল্লেখ ইহা করে নাই। কমিটি কেন্দ্রে একটি পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিসংখ্যান দপ্তর গঠন করিবার সুপারিশ করে।

১৯৪৬ সালে উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড গঠন

ইহার পর ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ, খাদ্য, তুলা ও পাট উৎপাদনে অবনতি, পাকিস্তান হইতে বহুসংখ্যক উদ্বাস্তুর ভারতে আগমন, বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার উদ্ভবের ফলে নূতন করিয়া পরিকল্পনার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা

করা হয়। অন্যত্র এই শিল্পনীতির বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।* এখানে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই শিল্পনীতিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৫০ সালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গঠিত হয়। কমিশন ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করে। খসড়া পরিকল্পনার যে-সমস্ত সমালোচনা হয় তাহার বিচার-বিবেচনা করিয়া অবশেষে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত আকারে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার্লামেন্টের নিকট পেশ করে। ইতিমধ্যে যে-সকল ছোটখাটো উন্নয়ন পরিকল্পনা চলিতেছিল তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিকল্পনার সময় নির্দিষ্ট করা হয় ১৯৫১ সালে ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত—এই পাঁচ বৎসর।

১৯৪৮ সালে ভারত সরকার কর্তৃক শিল্পনীতি ঘোষণা

১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

এই সময় অতিক্রান্ত হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় শেষ হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the nature of Developmental Planning and indicate its importance in underdeveloped countries like our own. (২৩৪-২৩৬ পৃষ্ঠা)
2. What is Developmental Planning? Indicate its main factors. (২৩৬-২৩৮ পৃষ্ঠা)
3. Trace the developmental planning of India. (২৩৯-২৪১ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(THE FIRST FIVE YEAR PLAN)

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Plan): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: (ক) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে অর্থ-ব্যবস্থার যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা, এবং (খ) উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সাহায্যে জীবন-যাত্রার মানের উন্নতিসাধন ও জনসাধারণের জন্য পূর্ণতর ও অধিকতর বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান।†

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য: অর্থ-ব্যবস্থার ভারসাম্য আনয়ন এবং উন্নততর জীবনযাত্রার সুযোগ-প্রদান

---

* প্রথম খণ্ডের ৩৪২-৩৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

† Review of the First Five Year Plan-এর ১ পৃষ্ঠা।

পরিকল্পনার অর্থনৈতিক লক্ষ্য : ভারতের পরিকল্পনার অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব শীঘ্র মাথাপিছু আয়কে দ্বিগুণ করা। ইহার জন্য একাধিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির উপর তিনটি জিনিসের প্রভাব রহিয়াছে: (১) জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার, (২) বিনিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে (Investment) সম্পর্ক, (৩) বর্ধিত জাতীয় উৎপাদনের বিনিয়োগের হার। জনসংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে ইহার বার্ষিক হার হইবে ১·২৫ শতকরা ভাগ। বিনিয়োগ ও জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে জাতীয় উৎপাদন একগুণ বাড়াইতে হইলে উহার তিনগুণ পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। অর্থাৎ, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মধ্যে আনুপাতিক হার হইল ৩ : ১। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয় ৯,০০০ কোটি টাকার মত ছিল। হিসাব করিয়া বলা হইয়াছিল যে প্রত্যেক বৎসর আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ যদি বিনিয়োগ করা যায় তাহা হইলেই ২২ বৎসরের ভিতর মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব। এত অধিক পরিমাণ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমীচীন নয় বলিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণ মূলধন-গঠনে নিয়োজিত হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হয়। ইহার ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ১০,০০০ কোটি টাকায়—অর্থাৎ জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ সম্প্রসারিত হইবে। ইহার পর ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে যদি বর্ধিত জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ করিয়া প্রতি বৎসর বিনিয়োগ করা যায় তাহা হইলে ১৯৭৭ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইবে।

অর্থনৈতিক লক্ষ্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) : পরিকল্পনা কমিশন মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সুপারিশ করে—অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বেসরকারী মালিকানার অবস্থিতির ভিত্তিতে আর্থিক উন্নয়নকার্য পরিচালিত হইবে। মূলধন-গঠন উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতিসাধন, উৎপাদিকাশক্তির সম্প্রসারণ, শ্রেণীসম্পর্কের পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝায় না যে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা বা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবসান করা হইবে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ উভয়কেই একই উদ্দেশ্যে কার্য করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগের ভূমিকা

ব্যয়-বরাদ্দ (Outlay) : উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ও উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় নির্দিষ্ট করা হয়। পরে ১৯৫৩-৫৪ সালে বেকার-সমস্যার অবস্থা দেখিয়া কতকগুলি অধিক

শ্রমনিয়োগকারী কর্মসূচী (labour-intensive schemes) গ্রহণ করা হয় এবং পরিকল্পনার ব্যয় বর্ধিত করিয়া ২,৩৭৮ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয় যেভাবে বণ্টন করা হয় তাহা নিম্নের ছকটি হইতে বুঝা যাইবে :

মূল ও পরিবর্তিত ব্যয়-বরাদ্দ

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রাথমিক হিসাব* (Original Estimate)		পরিমার্জিত হিসাব** (Revised Estimate)	
	পরিমাণ	শতকরা ভাগ	পরিমাণ	শতকরা ভাগ
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৬১	১৭.৫	৩৫৪	১৪.৯
জলসেচ ও বিদ্যুৎ	৫৬১	২৭.১	৬৪৭	২৭.২
শিল্প ও খনিজ	১৭৩	৮.৪	১৮৮	৭.৯
পরিবহন ও সংসরণ	৪৯৭	২৪.০	৫৭১	২৪.০
সমাজসেবা	৪২৫	২০.৫	৫৩২	২২.৪
বিবিধ	৫২	২.৫	৮৬	৩.৬
মোট	২,০৬৯	১০০.০	২,৩৭৮	১০০.০

উক্ত ২,৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ১,৩৯০ কোটি টাকা কেন্দ্রের এবং ৯৮৮ কোটি টাকা রাজ্যগুলির ব্যয় করিবার কথা ছিল।

ছকটি হইতে দেখা যায় যে, কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দানের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শিত হয় : প্রথমত, খাদ্য ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদনপ্রসার ব্যতীত শিল্পোন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। খাদ্যশস্য এবং কাঁচামালের উৎপাদনবৃদ্ধির সাহায্যে মূলভিত্তি সুদৃঢ় না করা পর্যন্ত কোন উন্নয়নের কথাই চিন্তা করা যায় না।

কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ ও ইহার কারণ

দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বিশেষ স্বল্প। ইহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উৎপাদনের দ্রুত প্রসার এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় আয়বৃদ্ধি সহজসাধ্য

* First Five Year Plan-এর ৭০ পৃষ্ঠা।

** Review of the First Five Year Plan-এর ২-৩ পৃষ্ঠা।

কার্য। এদিক হইতে কৃষিকে অগ্রগণ্য করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসংগতি একরূপ অকিঞ্চিৎকর। অতএব যে-সকল দিকে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন কম প্রথমে সে-সকল দিকের উপর অধিক নজর দিতে হইবে। তৃতীয়ত, কৃষিজীবীরা অত্যন্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট এবং মূলধনবিহীন, অথচ কৃষি হইতে শতকরা ৭০ ভাগ লোক জীবিকার্জন করে। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নয়নের কোন আশাই নাই। অপরদিকে শিল্পের অবস্থা এতটা সহায়-সম্বলহীন নয়; ব্যক্তিগত উদ্যোগও মূলধন শিল্পের অগ্রগতিকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে সমর্থ।

উৎপাদনের লক্ষ্য (Targets of Production): পরিমার্জিত প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল:

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	অতিরিক্ত উৎপাদন
খাদ্যশস্য (লক্ষ টন)	৫৪০	৬১৬	৭৬ (১৪%)
তুলা (লক্ষ গাঁইট)	২৯.৭	৪২.২	১২.৫ (৪৫%)
পাট (লক্ষ গাঁইট)	৩৩.০	৫৩.৯	২০.৯ (৬৪%)
ইক্ষু (লক্ষ টন)	৫৬	৬৩	৭ (১৩%)
তৈলবীজ (লক্ষ টন)	৫১	৫৫	৪ (৮%)

উপরি-উক্ত লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছিবার জন্য পরিকল্পনায় নানাবিধ পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাদের মধ্যে সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, চাষের জন্য জমির পুনরুদ্ধার, উন্নত ধরনের পদ্ধতির সাহায্যে কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধি, ভূমিসংস্কার, বন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

প্রথম পরিকল্পনায় ১৩ লক্ষ কিলোওয়াটের মত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনশক্তি উৎপাদন করিবার প্রস্তাব হয়। ভূমিনীতি সম্পর্কে পরিকল্পনায় প্রথমেই বলা হয় যে জাতীয় উন্নয়নে জমি ও কৃষিকার্যের মালিকানাকে মৌলিকতম সমস্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাপারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Development Projects) প্রবর্তন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার (National Extension Service) প্রসার পরিকল্পনা কমিশনের আর একটি সুপারিশ। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা ও গ্রাম্য জীবনের ত্রুটি দূর করা হইল ইহাদের উদ্দেশ্য।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় বেসরকারী উদ্যোগের উপর। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায় সরকারী নীতি সুস্পষ্টভাবে

ব্যাখ্যা করা হয়। অস্ত্রশস্ত্রাদির উৎপাদন, আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ রাষ্ট্রের একচেটিয়া এলাকাধীন থাকে। কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, বিমানপোত, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতারের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়। উপরি-উক্ত দুই পর্যায়ের শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের প্রসারের ভার বেসরকারী উদ্যোগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরিকল্পনার পরিবর্তিত হিসাবে সরকারী ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্প, খনিজ ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ১৩৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। অপরদিকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা হয়।*

শিল্পপ্রসার

দেশের শিল্প-কাঠামোকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রাধান্যের উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই কারণে সরকারী ক্ষেত্রে প্রধানত মূলধন ও মূল শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগের মত মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া ধরা হয়।

যাহাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পপ্রসার হয় তাহার জন্য ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে সরকারের হস্তে বেসরকারী ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়।† এই আইনে নূতন শিল্প সংগঠনের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত কোন শিল্পদক্ষতার সহিত পরিচালিত না হইলে সরকার উহাকে নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারে।

বৃহৎ শিল্প ব্যতীত পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়; এবং এই খাতে প্রথমে ৩০ কোটি টাকা এবং পরে পরিবর্তিত হিসাবে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়।

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার

পরিবহন ও সংসরণের উন্নতিসাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। পরিবহন ও সংসরণের খাতে পরিবর্তিত বরাদ্দ ৫৭১ কোটি টাকার মধ্যে রেলপথের জন্য ২৬৭ কোটি টাকা; রাজপথ ও পথ পরিবহন পরিকল্পনার জন্য ১৪৭ কোটি টাকা।

পরিবহন ও সংসরণ

সমাজ-কল্যাণকর কার্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনায় বলা হয় যে, এইরূপ কার্যের প্রসারের প্রয়োজন অধিক হইলেও বর্তমানে আর্থিক সংগতির অপ্রতুলতা হেতু সরকারী প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। প্রথম পরিকল্পনায় সমাজসেবা, বাসগৃহ ও পুনর্বাসনের জন্য মোট ৫৩২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়।

সমাজ-কল্যাণকর কার্য

ভারতের বেকার-সমস্যার যেমন একদিকে রহিয়াছে কর্মহীনতার সমস্যা, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে ব্যাপক অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) সমস্যা।

* Second Five Year Plan-এর ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

† ১ম খণ্ডের ৩৪৯-৩৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রথম পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে কতটা অতিরিক্ত নিয়োগের সংস্থান হইবে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাদির অভাবে সঠিকভাবে বলা হয় নাই। তবে মোটামুটি যে-হিসাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে শিল্প, সেচ, নির্মাণকার্য, রাস্তাঘাট, কুটির শিল্পের কয়েকটি ক্ষেত্রে ৫৭'৫ লক্ষ লোকের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হইবে ধরা হয়। আরও আশা করা হইয়াছিল যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে ৩৬ লক্ষ লোক পূর্ণতর নিয়োগের (fuller employment) সুবিধা পাইবে। ইহা ব্যতীত পরোক্ষভাবে এবং স্থানীয় কার্যে নিয়োগের অনেক সুযোগ-সুবিধা ঘটিবে।

বেকার সমস্যা ও কর্মসংস্থান

পরিকল্পনার প্রকৃত ব্যয় ও এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ (Expenditure and Financing): পরিকল্পনার বরাদ্দ ব্যয় ২,০৬৯ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২,৩৭৮ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইলেও প্রকৃতপক্ষে মোট ব্যয় হয় ২,০১৩ কোটি টাকা। বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে অনুপাত বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত ছকটি দেওয়া হইল:

(হিসাব কোটি টাকায়)

	মোট বরাদ্দ		মোট ব্যয়	
	পরিমাণ	শতকরা ভাগ	পরিমাণ	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৫৪	১৪'৯	২৯৯	১৪'৮
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৬৪৭	২৭'২	৫৮৫	২৯'১
৩। শিল্প ও খনিজ	১৮৮	৭'৯	১০০	৫'০
৪। পরিবহন ও সংসরণ	৫৭১	২৪'০	৫৩২	২৬'৪
৫। সমাজসেবা	৫৩২	২২'২	৪২৩	২১'১
৬। বিবিধ	৮৬	৩'৮	৭৪	৩'৬
	২,৩৭৮	১০০'০	২,০১৩	১০০'০

পরিকল্পনার হিসাবে ২,০১৩ কোটি টাকা ব্যয় দেখান হইলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যয় (actual outlay) হইয়াছিল ১,৯৬০ কোটি টাকা।* বাকী ৫৩ কোটি টাকা পাওনা দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে মিটান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এই ১,৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় নিম্নলিখিতভাবে অর্থসংগ্রহ দ্বারা করা হয়:

* Review of the First Five Year Plan-এর ৩ এবং ৩৫ পৃষ্ঠা।

(ক) চলতি রাজস্ব হইতে সঞ্চয়	৬৩৭	কোটি	টাকা
(খ) রেলপথের অতিরিক্ত আয়	১১৫	,,	,,
(গ) দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহ	২০৫	,,	,,
(ঘ) স্বল্পসঞ্চয় ও স্বল্পকালীন ঋণ	৩০৪	,,	,,
(ঙ) আমানত, ফাণ্ড ও বিবিধ সূত্র	৯১	,,	,,
(চ) বৈদেশিক সাহায্য	১৮৮	,,	,,
(ছ) ঘাটতি ব্যয়	৪২০	,,	,,
মোট	১.৯৬০	,,	,,

ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি ও ইহার কারণ

আমরা দেখিয়াছি যে মূল পরিকল্পনায় ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল।* অনুমান করা হইয়াছিল যে ইহার মধ্যে ১,২৫৮ কোটি টাকা কর, ঋণ, স্বল্পসঞ্চয় ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ সূত্র (domestic resources) হইতে সংগ্রহ করা হইবে, বাকী ৮১১ কোটি টাকার জন্য প্রয়োজন ও সম্ভাবনামত কর, আভ্যন্তরীণ ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য এবং ঘাটতি ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইতে যে ২৯০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে ঘাটতি ব্যয় তাহার অধিক করা হইবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে ১,৯৬০ কোটি টাকার মধ্যেই ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪২০ কোটি টাকা। † ইহার কারণ, আশামত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল (Achievements of the First Five Year Plan): ফলাফল আলোচনার পূর্বে প্রথম পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটিকে স্মরণ করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: (ক) আর্থিক কাঠামোর ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়া ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত প্রসারে সাহায্য করা, এবং (খ) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে যে-সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার সমাধান করা। এই দুই দিক হইতে পরিকল্পনা যে বহুলাংশে সফল হয় তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যাইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনের সূচকসংখ্যা (Index of Agricultural Production) বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১৯ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ২৯.৬ ভাগ। পরিকল্পনার শেষ বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট ৬১৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের আশা করা হইয়াছিল; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উৎপাদন হইয়াছিল ৬৪৮ লক্ষ টন বা নির্দিষ্ট লক্ষ্য (target) অপেক্ষা ৩২ লক্ষ টন অধিক।

* ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

† ঘাটতি ব্যয় বলিতে বুঝায় যে সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তোলা; না হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা। রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণ করিলে রিজার্ভ ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া পূরণ করিয়া লয়। এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

নিম্নলিখিত ছকটি হইতে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রসারের গতি বুঝা যাইবে :

	১৯৫০-৫১ সালে উৎপাদন	প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য (১৯৫৫-৫৬)	১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদন
খাদ্যশস্য (লক্ষ টন)	৫৪০°০	৬১৬°০	৬৪৮°০
তুলা (লক্ষ গাঁইট)	২৯°৭	৪২°২	৪০°০
পাট („)	৩৩°০	৫৩°৯	৪২°০
ইক্ষু (লক্ষ টন)	৫৬°০	৬৩°০	৫৮°৬
তৈলবীজ („)	৫১°০	৫৫°০	৫৬°৬

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার মূলে যেমন রহিয়াছে পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যাদি, তেমনি আবার রহিয়াছে আবহাওয়ার অনুকূল অবস্থার প্রভাব।

কৃষির উন্নয়নের অন্যান্য দিক

উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়া কৃষির ক্ষেত্রে অন্যান্য অগ্রগতিও দেখা যায়। পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমি সেচসমন্বিত হয়। ভূমি-সংস্কারের কার্য বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়, পরীক্ষামূলকভাবে সমবায় কৃষি ও সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের মোট গ্রামবাসীর এক-চতুর্থাংশ সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আসে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাও বিশেষ বৃদ্ধি পায়। উহা ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াটে আসিয়া দাঁড়ায়।

শিল্পোন্নয়ন

শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের কাজকর্ম সমভাবে সন্তোষজনক না হইলেও মোটামুটি-ভাবে শিল্পপ্রসার যে ভালই হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরিকল্পনার মোট শিল্প উৎপাদন শতকরা ৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং শুধু মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৭০ ভাগ। ইহা ছাড়া বহু নূতন নূতন শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং তৈল শোধন, জাহাজ নির্মাণ, বিমানপোত নির্মাণ, পেনিসিলিন উৎপাদন প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্প স্থাপিত হয়। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সিন্ধ্রির সার তৈয়ারির কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানা, রেল কোচ উৎপাদনের কারখানা, ভারতীয় টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখানা, টেলিফোনের তারের কারখানা এবং পেনিসিলিন কারখানার উৎপাদন ও প্রসার বেশ সন্তোষজনক হয়।

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সর্বদিকে সমভাবে সন্তোষজনক হয় নাই

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছান যায় নাই। তবে পরিকল্পনার শেষের দিকে তিনটি ইস্পাত কারখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভারী

বৈদ্যুতিক শিল্পের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার সময় বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রাথমিক কার্য যথেষ্ট অগ্রসর হয়।

বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পের প্রসার

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন প্রসারলাভ করে। বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতির বেলায় অবস্থিত উৎপাদনশক্তির পূর্ণতর ব্যবহারের সহায়তায় ইহা সংঘটিত হয়। কিন্তু সিমেণ্ট, কাগজ, সোডাএ্যাস্, কস্টিক সোডা, বাইসাইকেল প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বর্ধিত হয়।

পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নয়ন

পরিবহন-ব্যবস্থাতেও বেশ কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়। রেলপথের উন্নতির জন্য ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় (রেলপথের নিজস্ব তহবিল হইতে অবপূতির জন্য ১৫০ কোটি টাকা ধরিয়া) বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, গত পাঁচ বৎসরে ৪৩২ কোটি টাকার মত ব্যয় হইয়াছে। উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ভারতীয় রেলপথ শতকরা ২৫ ভাগ অধিক মালপত্র বহন করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধের সময় যে ৪৩০ মাইল লাইন তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহা পুনঃস্থাপন করা হয় এবং ৩৮০ মাইল নূতন লাইন তৈয়ারি করা হয়।

উপরি-উক্ত ফলাফল ব্যতীত সমাজসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রভৃতি অন্যান্য দিকেও দেশ কতকটা অগ্রসর হয়।

জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি

এখন দেখা যাউক জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও কর্মের সংস্থান কতদূর প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যের ভিত্তিতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয় ৮,৮৭০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০,৪২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, এবং মাথাপিছু আয় ২৪৬·৩ টাকা হইতে বাড়িয়া ২৭২ টাকা হয়। অর্থাৎ, ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় পরিকল্পনার শেষ সালে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় যথাক্রমে শতকরা ১৭·৫ এবং ১০·৫ ভাগের মত বৃদ্ধি পায়।* জাতীয় আয়ের অনুপাতে বিনিয়োগের (investment) হার শতকরা ৪·৯ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ ভাগে দাঁড়ায়। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে প্রথম পরিকল্পনায় অধিকতর নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা নিতান্ত অপ্রচুর। ইহার কারণ প্রত্যেক বৎসর ২০ লক্ষ করিয়া কর্মোপযোগী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক, ঐ পরিকল্পনাধীন সময়ে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ৪৫ লক্ষ অতিরিক্ত লোকের কর্মসংস্থান করা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক কার্যের ফলে অর্ধ-নিয়োগের (underemployment) সমস্যারও অনেকটা সমাধান সম্ভব হয়। নগরাঞ্চলের কর্মহীনতার সমস্যা অবশ্য ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। নিয়োগ সংস্থাসমূহের (employment exchange)

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

* Review of the First Five Year Plan-এর ৭-৮ পৃষ্ঠা এবং ৩৭৪ পৃষ্ঠা।

নিকট নাম রেজেষ্ট্রী করা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার হইতে ৭ লক্ষের উপরে গিয়া পৌছায়।*

আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রভাব ভারতের বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের (balance of payments) ক্ষেত্রেও দেখা যায়। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বৎসরে ১৮০-২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু মোট ঘাটতি হয় ৩০ কোটি টাকা। ইহার সহিত অবশ্য প্রাপ্ত সরকারী দান (official donations) ৯৬ কোটি টাকা যোগ করিতে হইবে। আরও হিসাব করা হইয়াছিল যে ষ্টালিং উদ্বৃত্ত হইতে ২৯০ কোটি টাকার মত উঠাইতে হইবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোট ১৩৮ কোটি টাকার মত উঠান প্রয়োজন হয়। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনের অবস্থার এই উন্নতির অন্যতম কারণ ছিল দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে উন্নতি।†

বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের অবস্থায় উন্নতি

যুদ্ধোত্তর যুগে বিশেষত কোরিয়ার যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি আশংকাজনক রূপ ধারণ করে। এই মুদ্রাস্ফীতিকে ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করা হয়। অবশ্য পরিকল্পনার শেষ বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে দ্রব্যমূল্য এবং টাকাকড়ির যোগান পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের তুলনায় বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ইহার মূলে ছিল ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণবৃদ্ধি। মোট ৪২০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের মধ্যে ১৮০ কোটি টাকা সংঘটিত হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে।

দ্রব্যমূল্যের উপর পরিকল্পনার প্রভাব

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the objectives and targets of the First Five Year Plan. (২৪১-২৪২ এবং ২৪৪-২৪৬ পৃষ্ঠা)

2. Indicate briefly the targets and achievements of the First Five Year Plan. (২৪৪-২৪৬ এবং ২৪৭-২৫০ পৃষ্ঠা)

3. "The Indian Economy had made remarkable progress under the First Five Year Plan." Examine the statement noting the progress of the First Five Year Plan. (C. U. B. Com. 1956; B. A. 1957) (২৪৭-২৫০ পৃষ্ঠা)

4. The First Five Year Plan accorded the highest priority to agriculture. How far do you think this emphasis was justified? (C. U. B. A. 1959) (২৩৬, ২৪১, ২৪৪ এবং ২৫২ পৃষ্ঠা)

5. Describe and comment upon the manner in which the First Five Year Plan was financed. (২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা)

---

* Review of the First Five Year Plan-এর ১০ পৃষ্ঠা।

† Report on Currency and Finance, 1955-56-এর ৭০-৮১ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(THE SECOND FIVE YEAR PLAN)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরিমিত। ভবিষ্যতে যাহাতে অধিকতর প্রগতিশীল ও বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহার ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল উহার লক্ষ্য। ইহা ছাড়া যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের সম্মুখে যে খাদ্যাভাব, অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয়, তাহার আশু সমাধান করাও অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি প্রথমত পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জনসাধারণের দুর্দশার লাঘব বিশেষ হয় নাই। অন্যান্য দেশের তুলনায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। অধিকাংশের ভাগ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য জুটে না; বাসগৃহাদির অবস্থা সম্পূর্ণ শোচনীয়; এ-দেশে বৎসরে মাথাপিছু ১৬ গজের অধিক বস্ত্র ব্যবহৃত হয় না; এখনও অধিকাংশ বালকবালিকা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত; সফল প্রথম পরিকল্পনার পরও জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ লোক ভোগ্যবস্তুর জন্য মাসিক ১৩ টাকার অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হয় না। ইহার পর আছে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মহীনতা; বৎসরের পর বৎসর যেভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিবে। এই সমস্ত সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য এক বৃহত্তর পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

বৃহত্তর পরিকল্পনা

কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর হইতেই বৈদেশিক মুদ্রাসংকটজনিত কারণ ও বিভিন্ন খাতে অনুমান অপেক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি হেতু প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ইহার ফলে ১৯৫৮ সালের মে ও সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট এবং বেশ কিছু পরিবর্তনসাধন করিতে হয়। পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের অনুমিত ব্যয় কমিয়া ৪,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এখন আবার উহাকে ৪,৬০০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা দুই পর্যায়ে করা প্রয়োজন—(ক) মূল পরিকল্পনা, এবং (খ) পরিবর্তিত পরিকল্পনা। সংগে সংগে অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, দ্রব্যমূল্য, ঘাটতি ব্যয় প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহের আলোচনাও অপরিহার্য। আলোচনা এইভাবেই করা হইতেছে।

পরিকল্পনার সংশোধন

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Second Five Year Plan) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (মূল এবং পরিবর্তিত উভয়েরই) চারিটি মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়: (ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি

(quicker pace of development), (খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি (wider industrial base), (গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ (accent on employment) এবং (ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত (socialistic bias)। উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়াই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

চারিটি পরস্পর সম্পর্কিত মূল উদ্দেশ্য

(ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি ঃ প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় শতকরা ১৭'৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি সাধনের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল।

(খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি ঃ ইতিপূর্বেই পর্যালোচনা করা হইয়াছে যে কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল অর্ধোন্নত দেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ভারতে বর্তমান। এখানে জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন, বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা অগণিত, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য অত্যধিক। এই অনুন্নত অবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিভিন্নতা আনিতে হইবে এবং দ্রুত শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে শক্তিশালী করিবার উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল এবং শিল্পের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। ইহা ছাড়া প্রসারের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাও কার্যত ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, প্রথম পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো কতকটা শক্তি অর্জন করে এবং জাতীয় আয়ও কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। খাদ্যাভাব, কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পপ্রসারের দিকে পদসঞ্চার করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। উপরন্তু কৃষি এবং শিল্প পরস্পরের অনুপূরক হিসাবেই কার্য করে।* শিল্পোন্নয়ন কৃষির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ হ্রাস করিয়া কৃষির উৎপাদন ও কৃষিজীবীদের আয়বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। এই সকল দিকের বিচার-বিবেচনা করিয়াই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পপ্রসারের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পপ্রসারের ব্যবস্থা করিবার কারণ

কিন্তু শিল্পপ্রসারের গতি দ্রুত করিতে হইলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য মূল ও ভারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বভাবতই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল শিল্প গঠনের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ ঃ মূল শিল্প অবশ্য ভোগ্যদ্রব্যের যোগান দ্রুত বৃদ্ধি করে না, অথচ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। তাহা ছাড়া মূল শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে খুব বেশী কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও নাই, কারণ উহাতে শ্রমের তুলনায় মূলধন অধিক ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সুসমঞ্জস

* Second Five Year Plan—The Framework-এর ১২৯ পৃষ্ঠা।

শিল্পপ্রসারের স্বার্থে চেষ্টা করিতে হইবে কি করিয়া কম মূলধন এবং অধিক শ্রম নিয়োগের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ, অধিক শ্রমনিয়োগকারী শিল্পপদ্ধতির (labour-intensive techniques) মাধ্যমে আপাতত ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহাতে একদিকে যেমন মূল শিল্পে দুষ্প্রাপ্য মূলধন নিয়োগের সুবিধা হইবে, অপরদিকে তেমনি অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনিয়োগকারী পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে শ্রমনিয়োগকারী পদ্ধতির উৎপাদন-ব্যয় অধিক হয়। ইহার সমর্থনে পরিকল্পনায় বলা হয় যে, অর্থ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিতে হইলে ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে আমাদের কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমশ যখন উৎকৃষ্ট ধরনের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, উন্নত পরিবহন ও অধিক বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে, স্বল্পব্যয়ে অধিক ভোগ্যদ্রব্যাদি উৎপাদন করা তখন সম্ভব হইবে; এবং সমাজ বর্তমান ত্যাগের জন্য ভবিষ্যতে বহুগুণে উপকৃত হইবে।

শ্রমনিয়োগকারী শিল্প-পদ্ধতি

(ঘ) **সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত**ঃ জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতি বা অর্থনৈতিক কল্যাণকে চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করা ভুল। আসলে উহা হইল এক উন্নততর মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পৌঁছাইয়া দিবার সোপান মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে এমন সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার মধ্যে থাকিয়া প্রত্যেকটি মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণবিকাশ করিতে পারে, তাহার আশা-আকাংক্ষা ও প্রেরণাকে রূপায়িত করিতে পারে। এই মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত প্রথম হইতে উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে। সংসদ এইজন্যই সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ (Socialist Pattern of Society) প্রতিষ্ঠা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তনের আদর্শ গ্রহণ

'সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা' কথাটির আসল তাৎপর্য হইল যে, উন্নয়নমূলক কার্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে এমনভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সংগে সংগে যেন আয় ও ধনসম্পদের ক্ষেত্রে অধিকতর সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ এবং বিনিয়োগ—অর্থাৎ প্রধান প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হস্তেই ন্যস্ত করিতে হইবে। যাহারা এতদিন সমাজে উপেক্ষিত ছিল তাহারা যাহাতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে, যাহাতে অর্থনৈতিক সম্পদ ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের করতলগত না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নততর যে অপরিমেয় সম্ভাবনা রহিয়াছে এতদিন পর্যন্ত তাহা উপলব্ধি করিবার সুযোগ সাধারণ লোকের অতি সামান্যই ঘটিয়াছে। আজ যাহাতে তাহারা নিজেদের জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক কল্যাণ সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ হইতে

সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা

পারে সেজন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে তাই আজ রাষ্ট্রের উপর মহান দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রকে দ্রুত প্রসারিত করিতে হইবে; বেসরকারী উদ্যোগকে সমাজানুমোদিত পরিকল্পনার মধ্যে থাকিয়া কার্য করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণ ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্ট পরিমার্জিত শিল্পনীতি গ্রহণ করে। পরিমার্জিত শিল্পনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুততর গতি, দ্রুত শিল্পায়ন, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, ব্যাপকতর সমবায়িক ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংগে সংগে ধনগত বৈষম্য ও আয়গত পার্থক্যের অপসারণ, ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবার ও কয়েকজনের হস্তে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রতিরোধ প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বভাবতই রাষ্ট্রকে অধিকতর মাত্রায় সক্রিয় হইতে হইবে এবং সরকারী ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করিতে হইবে। সমস্ত মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং সাধারণের সেবামূলক কার্যসমূহ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেই থাকিবে। অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্প এবং যে-সকল শিল্পে বর্তমান অবস্থায় বিনিয়োগ একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারাই সম্ভব তাহারাও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিবে। তবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নকার্যে বেসরকারী ক্ষেত্রেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিবে। কিন্তু ক্রমশ সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সংকোচন ঘটিতে থাকিবে।*

পরিমার্জিত শিল্পনীতি

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে সংগে বৈষম্যের হ্রাসকল্পে দুইটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে: একদিকে যেমন যাহাদের আয় ন্যূনতম তাহাদের আয়বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে, অপরদিকে যাহাদের আয় অত্যুচ্চ তাহাদের আয় কমাইয়া দিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পন্থা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইলেও দ্বিতীয় পন্থাটিকেও কার্যকর করা প্রয়োজন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বিনিয়োগের প্রকৃতি, রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যের পরিচালনা, সমাজসেবার প্রসার, জমির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার গঠনগত পরিবর্তন, যৌথ কোম্পানী ও ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সমবায়িক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, রাজস্ব-পদ্ধতি প্রভৃতি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গৃহীত পন্থাগুলির মাধ্যমেই আয়গত ও ধনগত বৈষম্য দূর করা সম্ভব। কারণ, ইহারাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টি হইবে এবং ঐ আয় কিভাবে বণ্টিত হইবে। বৈষম্য দূরিকরণের কার্যে রাজস্ব-পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে; তবে দেখিতে হইবে অবলম্বিত পদ্ধতি যেন বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রেরণাকে ব্যাহত না করে। এইজন্য কি করিয়া কর-ব্যবস্থাকে উন্নয়ন কার্যের অনুগামী করা যায় তাহার বিচার-বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত' সুদূরপ্রসারী

অন্যান্য অবলম্বনীয় পন্থা

* বিস্তৃততর আলোচনার জন্য ১ম খণ্ডের ৩৫১-৩৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।

পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিবে। বিশেষ করিয়া ব্যয়কর (Expenditure Tax), দানকর (Gift Tax) এবং আয়ের উর্ধ্বতন মাত্রা ধার্য করিয়া দিবার প্রস্তাবকে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত ধরনের অসাম্য ব্যতীত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির মধ্যে অসমতা রহিয়াছে। যাহাতে বিভিন্ন অঞ্চল উন্নতির পথে সমভাবে অগ্রসর হইতে পারে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশেষত অনুন্নত অঞ্চলগুলির প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিকেন্দ্রিকৃত শিল্পগত উৎপাদন, শিল্পস্থাপনের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে যথোপযুক্ত নীতি নির্ধারণ, শ্রমের গতিশীলতার প্রসার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আঞ্চলিক বৈষম্য দূরিকরণ

আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি (Economic Policy and Techniques): পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত আর্থিক নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন। পরিকল্পনায় মোটামুটি দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়: (১) অর্থ-নৈতিক কার্যকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব ও অর্থ সম্বন্ধীয় নীতি, এবং (২) অর্থ-ব্যবস্থার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মূল্য ও আমদানি-রপ্তানির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি। ক্রমোন্নতিশীল অর্থ-ব্যবস্থায় সরকারী কাজকর্মের গতি সম্প্রসারণশীল। বিভিন্ন সম্পদের চাহিদাও যেমন থাকে প্রভূত পরিমাণে, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যথা, বৈদেশিক মুদ্রার্জন, কৃষিজ উৎপাদন প্রভৃতিতে অ-পর্যাপ্তি দেখা দিবার সম্ভাবনাও থাকে যথেষ্ট। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির আশংকা থাকিতে বাধ্য। সুতরাং প্রধান সমস্যা হইল কি করিয়া আভ্যন্তরীণ উৎপাদনবৃদ্ধি, নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি এবং জিনিসপত্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের সহায়তায় মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিরোধ করা যায় তাহা নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে করা হয়।

মূল পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ ও বণ্টন (Outlay and Allocation in the Original Plan): মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৪,৮০০ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২,৩৫৬ কোটি টাকা—যদিও কার্যক্ষেত্রে ২,০০০ কোটি টাকার কিছু কম ব্যয় করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ব্যয় প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় অনেক অধিক; এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয় বণ্টনের ব্যাপারেও পার্থক্য রহিয়াছে। মোট বরাদ্দ ৪,৮০০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ব্যয়ের ভার ছিল ২,৫৫৯ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলির উপর ২,২৪১ কোটি টাকা। বিভিন্ন খাতে মোট সরকারী ব্যয়ের বণ্টন পরপৃষ্ঠার ছকটি হইতে বুঝা যাইবে:

সরকারী খাতে বরাদ্দ ব্যয়

বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বণ্টন (হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা		দ্বিতীয় পরিকল্পনা	
	মোট বরাদ্দ (পরিবর্তিত হিঃ)	শতকরা ভাগ	মোট বরাদ্দ (প্রাথমিক হিঃ)	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৫৪	১৪·৯	৫৬৮	১১·৮
(ক) কৃষি কার্যক্রম	২৪৯	১০·৫	৩৪১	৭·১
(খ) সমাজোন্নয়ন	৯০	৩·৮	২০০	৪·১
(গ) অন্যান্য	১৫	০·৬	২৭	০·৬
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৬৪৭	২৭·২	৯১৩	১৯·০
(ক) সেচ ও বহুমুখী পরিকল্পনা	৪৬৯	১৯·৮	৪৮৬	১০·১
(খ) বৈদ্যুতিক শক্তি	১৭৮	৭·৪	৪২৭	৮·৯
৩। ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য শিল্প	৪৯	২·১	২০০	৪·১
৪। বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	১৩৯	৫·৪	৬৯০	১৪·৪
৫। পরিবহন ও সংসরণ	৫৭১	২৪·৪	১,৩৮৫	২৮·৯
(ক) রেলপথ	২৬৭	১২·১	৯০০	১৮·৮
(খ) পথ ও পথ পরিবহন	১৪৭	৬·১	২৬৩	৫·৫
(গ) বন্দর, পোতাশ্রয়, জাহাজ-চলাচল ইত্যাদি	৯৭	৪·১	৯৬	২·০
(ঘ) সংসরণ	৬০	২·১	১২৬	২·৬
৬। সমাজসেবা	৫৩২	২২·৪	৯৪৫	১৯ ৭
(ক) শিক্ষা	১৭০	৭·২	৩০৭	৬·৪
(খ) স্বাস্থ্য	১৩৮	৫·৮	২৭৪	৫·৭
(গ) অন্যান্য	২২৪	৯·৪	৩৬৪	৭·৬
৭। বিবিধ	৮৬	৩·৬	৯৯	২ ১
মোট	২,৩৭৮	১০০·০	৪,৮০০	১০০·০

উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপ্রদান বিষয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। মোটামুটিভাবে প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ খাতে (ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য শিল্প ধরিয়া) বরাদ্দ করা হয় শতকরা ৭·৫ ভাগ ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয় শতকরা ১৮·৫ ভাগ। এই খাতে প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শতকরা ৪৫০ ভাগ বা ৪½ গুণ ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। পরিবহন ও সংসরণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় শতকরা ১৫০ ভাগ বা ১½ গুণ। কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উপর গুরুত্ব হ্রাস করা হইলেও পূর্বের তুলনায় ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সমাজসেবার ক্ষেত্রে ঐ একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ব্যয়-বরাদ্দের ধারা

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ-ব্যবস্থা (Investment in the Original Second Plan) : আমরা দেখিয়াছি যে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়। এই ব্যয়ের মধ্যে বিনিয়োগের (Investment) পরিমাণ ৩,৮০০ কোটি টাকা—অর্থাৎ এই ব্যয়ের সাহায্যে উৎপাদনশীল সম্পদ (Productive Assets) সৃষ্টি হইবে। বাকী ১,০০০ কোটি টাকা হইল চলতি উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয়।

সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ

মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য করিবার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণের সহিত বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ দিতে হইবে। এই উভয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মূল পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্য (targets of production) ধার্য করা হয়। বেসরকারী বিনিয়োগ কতটা হইবে তাহা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে বিনিয়োগের গতি ও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কর্মসূচীর ভিত্তি পর্যালোচনা করিয়া অনুমান করা হয় যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ২,৪০০ কোটি টাকার মত হইবে। এই ২,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বণ্টন এইভাবে হইবে অনুমান করা হয়।

বেসরকারী বিনিয়োগ

(হিসাব কোটি টাকায়)

১।	সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	৫৭৫
২।	রোপণ শিল্প, পরিবহন ও বৈদ্যুতিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান	১২৫
৩।	নির্মাণকার্য (Construction)	১,০০০
৪।	কৃষি এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩০০
৫।	পুঁজিপাটা (Stocks)	৪০০
	মোট	২,৪০০

অতএব দেখা যায় যে, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ৬,২০০ (৩৮০০+২৪০০) কোটি টাকা 'বিনিয়োগের ব্যবস্থা' করা হইয়াছিল।

মূল পরিকল্পনায় উৎপাদন ও উন্নয়নের লক্ষ্য (Targets of Production and Development of the Original Plan) : শিল্প ও খনিজ উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারী ক্ষেত্রের প্রাধান্যকেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা যায়। মূল পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প ও খনিজ খাতে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৯০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়। অপরপক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রে এই খাতে নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। সরকারী ক্ষেত্রের ৬৯০ কোটি টাকার সমস্তটাই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং

সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য

শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির প্রসারের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল। রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুর—এই তিনটি স্থানে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন এবং মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ইস্পাত উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা সরকারী ক্ষেত্রে (public sector) নির্মিত ইস্পাতের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ২০ লক্ষ টনে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল।

লৌহ ও ইস্পাত

লৌহ ও ইস্পাত কারখানার প্রসারের সহিত ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসার অংগাংগিভাবে জড়িত; এবং ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সাহায্যেই শিল্পের যন্ত্রপাতি ও মূলধন দ্রব্যাদি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা সম্ভব। এইজন্য মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ইস্পাত ফাউণ্ড্রী (a heavy steel foundry), ভারী ঢালাই কারখানা (foundries), হাপর (forge shops), বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা প্রভৃতি স্থাপন করিবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। ইহা ছাড়া রেল-ইঞ্জিন, রেল কোচ প্রভৃতির উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি

পরিকল্পনাধীন সময়ে খনিজ উৎপাদন শতকরা ৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে কয়লার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৩৮০ লক্ষ টন; ১৯৬০-৬১ সালে উহা ৬০০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হয়।

খনিজ

সরকারী ক্ষেত্রে নাংগল ও রুরকেলায় দুইটি সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা এবং সিন্ধ্রির কারখানায় সার উৎপাদনবৃদ্ধি করার লক্ষ্যও মূল পরিকল্পনায় ছিল।

সার উৎপাদন

প্রথম পরিকল্পনার সময় ডি. ডি. টি. কারখানা, টেলিফোন যন্ত্রপাতির কারখানা, পেনিসিলিন কারখানা প্রভৃতি যে-সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের সম্প্রসারণের এবং কেরলে আর একটি ডি. ডি. টি. কারখানা খুলিবার প্রস্তাব করা হয়। পশ্চিমবংগে দুর্গাপুরে কোক-চুল্লী (coke-oven plant) প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিকল্পনাও থাকে।

অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন

বেসরকারী ক্ষেত্রেও মূল শিল্পগুলির প্রসারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৫৮ সালের মধ্যে নির্মিত ইস্পাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উহাকে ১২·৫ লক্ষ টন হইতে ২৩ লক্ষ টনে, সিমেণ্টের উৎপাদন ৪৩ লক্ষ টন হইতে ১৩০ লক্ষ টনে লইয়া আসিবার লক্ষ্য স্থির হয়। এলুমিনিয়াম ম্যাংগানীজ প্রভৃতির উৎপাদনবৃদ্ধির কথাও থাকে। বেসরকারী ক্ষেত্রে তুলা, পাট, চিনি, কাগজ, সিমেণ্ট, কৃষি প্রভৃতি শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতির উৎপাদন এবং রসায়ন শিল্পের প্রসার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভোগ্য-দ্রব্যের মধ্যে তুলাবস্ত্রের উৎপাদন শতকরা ২৪ ভাগ, চিনির উৎপাদন শতকরা

বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য

৩৫ ভাগ এবং কাগজ ও বোর্ড কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণ হইবে বলিয়া আশা করা হয়।

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মূল পরিকল্পনায় ইহাদের প্রসারকল্পে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে ৫৯.৯ কোটি টাকা তাঁত শিল্প, ৫৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, ৫৫.৫ কোটি টাকা খাদি ও অন্যান্য গ্রাম্য শিল্প, এবং বাকী অর্থ অপরাপর শিল্পপ্রসারের জন্য ব্যয় করা হইবে।*

নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজের ক্ষেত্রে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যের কতকটা ইংগিত পাওয়া যাইবে।

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদন-বৃদ্ধির শতকরা হার
বৃহদায়তন শিল্প				
১। নির্মিত ইস্পাত (দশ লক্ষ টন)	১.১	১.৩	৪.৩	২৩১
২। এলুমিনিয়াম (হাজার টন)	৩.৭	৭.৫	২৫.০	২৩৩
৩। মোটর গাড়ী (সংখ্যা)	১৬,৫০০	২৫,০০০	৫৭,০০০	১২৮
৪। রেল-ইঞ্জিন (সংখ্যা)	৩	১৭৫	৪০০	১২৯
৫। সিমেণ্ট (দশ লক্ষ টন)	২.৭	৪.৩	১৩	২০২
৬। সার :				
(ক) এ্যামোনিয়াম সালফেট (হাজার টন)	৪৬	৩৮০	১,৪৫০	২৮২
(খ) সুপারফস্ফেট (হাজার টন)	৫৫	১২০	৭২০	৫০০
৭। তুলাবস্ত্র (দশ লক্ষ গজ)	৪,৬১৮	৬,৮৫০	৮,৫০০	২৪
৮। চিনি (দশ লক্ষ টন)	১.১	১.৭	২.৩	৩৫
৯। কাগজ ও কাগজের বোর্ড (হাজার টন)	১১৪	২০০	৩৫০	৭৫
খনিজ				
১। লৌহ-মাক্ষিক (দশ লক্ষ টন)	৩.০	৪.৩	১২.৫	১৯১
২। কয়লা (দশ লক্ষ টন)	৩২.৩	৩৮.০	৬০.০	৫৮

পরিবহন ও সংসরণের ক্ষেত্রে ১,৩৮৫ কোটি টাকার মধ্যে ৯০০ কোটি টাকা রেলপথের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ইহার উপর ২২৫ কোটি টাকা স্বাভাবিক পরিবর্তন

* পরিবর্তিত পরিকল্পনায় এই বরাদ্দ ও উহার বণ্টনের কোনরূপ রদবদল করা হয় নাই।

কার্যের জন্য ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় গমনাগমনের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ; ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিবহনের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। মোট যাত্রিবহনের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ এবং মালপত্রবহনের পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য মূল পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট করা হয়।*

পরিবহন ও সংসরণের ক্ষেত্রে উৎপাদন লক্ষ্য

রাজপথ ও পথ পরিবহন, জাহাজ-চলাচল, বন্দর ও পোতাশ্রয়, বেসামরিক বিমান-চলাচল, বেতার, ডাক ও তার এবং অন্যান্য যোগাযোগের উন্নতিবিধানেরও সম্যক ব্যবস্থা পরিকল্পনায় করা হয়। ১৯৪৩ সালের নাগপুর পরিকল্পনায় রাজপথ উন্নয়নের যে-কর্মসূচী দেওয়া হয় তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনান্তে সম্পূর্ণ করা স্থির হয়। বৃহৎ বন্দরগুলির শক্তি শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা, জাহাজী শক্তিকে ৬ লক্ষ টন হইতে ৯ লক্ষ টনে লইয়া যাওয়া হইল মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য। নিম্নে পরিবহন ও সংসরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি লক্ষ্যের হিসাব দেওয়া হইল :

পরিবহন ও সংসরণ

পরিবহন ও সংসরণ	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদনবৃদ্ধির শতকরা হার
(ক) রেলপথ :				
১। যাত্রিবাহী গাড়ীর মাইল (দশ লক্ষ)	৯৫	১০৮	১২৪	১৫
২। মালবহন (দশ লক্ষ টন)	৯১	১২০	১৬২	৩৫
(খ) রাস্তা :				
১। জাতীয় রাজপথ (হাজার মাইল)	১২·৩	১২·৯	১৩·৮	৭
২। পাকা রাস্তা (হাজার মাইল)	৯৭·০	১০৭·০	১২৫·০	১৭
৩। ডাকঘর (সংখ্যা)	৩৬,০০০	৫৫,০০০	৭৫,০০০	৩৬

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করা হয়। পরে অবশ্য খাদ্যসংকট পুনরায় দেখা দিলে এই দুই অনুপাতকে যথাক্রমে ২৮ এবং ২৫·এ লইয়া যাওয়া হয়।

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরিবহন সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

কৃষি ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎপাদন-লক্ষ্য

সেচের অধিকতর সুযোগ, উন্নত ধরনের বীজ ও সার এবং কার্যপদ্ধতি, উৎপাদনে অধিক মাত্রায় বৈচিত্র্য আনয়ন, ভূমিসংস্কার, সমবায়ের সুসংগঠন এবং গ্রাম্য ঋণ, বিক্রয়করণ ও উৎপাদনের পূর্ণাংগ পরিকল্পনাকে কার্যকরকরণ—এই কয়েকটিকেই কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মূল বিষয় বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

মূল পরিকল্পনায় দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে লইয়া আসিবার কথা ছিল।*

কৃষি ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল পরিকল্পনার মোটামুটি লক্ষ্য ছিল এইরূপ:

কৃষি	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে উৎপাদনবৃদ্ধির শতকরা হার
১। খাদ্যশস্য (দশ লক্ষ টন)	৫৪·০	৬৫·০	৭৫·০	১৫
২। তুলা (দশ লক্ষ টন)	২·৯	৪·২	৫·৫	৩১
৩। ইক্ষু—কাঁচা গুড় (দশ লক্ষ টন)	৫·৬	৫·৮	৭·১	২২
৪। তৈলবীজ (দশ লক্ষ টন)	৫·১	৫·৫	৭·০	২৭
৫। পাট (দশ লক্ষ গাঁইট)	৩·৩	৪·০	৫·০	২৫
৬। চা (দশ লক্ষ পাউণ্ড)	৬১৩	৬৪৪	৭০০	৯
৭। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক (সংখ্যা)	—	৫০০	৩,৮০০	৬৬০
৮। সমাজ উন্নয়ন ব্লক (সংখ্যা)	—	৬২২	১,১২০	৮০

সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষেত্রে উৎপাদন-লক্ষ্য

প্রথম পরিকল্পনার সময় সেচসমন্বিত জমির পরিমাণ ৫১০ লক্ষ একর হইতে বাড়িয়া ৬৭০ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ২১০ লক্ষ একর জমি সেচসমন্বিত করিবার প্রস্তাব হয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াটে পরিণত হয়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহাকে ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াটে লইয়া যাইবার লক্ষ্য স্থির করা হয়। দ্রুত শিল্পপ্রসারের জন্যই বিদ্যুৎ উৎপাদনশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ছোটখাট সহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য

মূল পরিকল্পনার সমাজসেবা খাতে ৯৪৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষাবিস্তার, চিকিৎসার উন্নতিসাধন, এবং শিল্পশ্রমিক, উদ্বাস্তু ও অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতিবিধানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

* ১ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখ

জাতীয় আয়, ভোগ ও কর্মের সংস্থান (National Income, Consumption and Employment): মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যাদির ফলাফল যাহা দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছিল নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করা হইল। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হিসাব করা হইয়াছিল যে জাতীয় আয় প্রথম পরিকল্পনান্তে শতকরা ১৮ ভাগ বাড়িয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহাকে আরও শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হয়—অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে জাতীয় আয় ১০,৮০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩,৪৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে—এই লক্ষ্য স্থির করা হয়। মাথাপিছু আয় প্রথম পরিকল্পনার ফলে শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে; দ্বিতীয় পরিকল্পনান্তে উহা আরও শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।* ১৯৫৫-৫৬ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৮১ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহা হইবে ৩৩০ টাকা। ভোগ্যদ্রব্যের উপর মোট ব্যয় শতকরা ২১ ভাগের মত বৃদ্ধি পাইবে।

জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হিসাব

মূল পরিকল্পনায় বলা হয় যে, পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট ৬,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্ভব করিবার জন্য আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ১০ ভাগে আনিতে হইবে। অবশ্য পরিকল্পনার সময় বিদেশ হইতে ১,১০০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করা যাইবে এই ভিত্তিতেই উপরি-উক্ত হিসাব করা হইয়াছিল।

সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি

কর্মসংস্থান** সম্পর্কে পরিকল্পনায় বলা হয় কৃষি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষ লোকের নিয়োগের সংস্থান করা যাইবে। ইহা ব্যতীত সেচ ও জমির পুনরুদ্ধারের যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে অর্ধ-বেকার-সমস্যার সমাধান এবং অতিরিক্ত নিয়োগের সুযোগ হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে শ্রমোপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১ কোটির মত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই নবাগত শ্রমিকসংখ্যার জন্য নিয়োগের সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল।

কর্মসংস্থানের হিসাব

পরিকল্পনার জন্য অর্থের সংস্থান ও বিদেশী মুদ্রা (Finance and Foreign Exchange): মূল পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে কারণ উভয়ই একই সঞ্চয় ভাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল। আবার

---

* অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত হিসাব করা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়। পরে চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে প্রথম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ১৭·৫ এবং ১০·৫ ভাগ বাড়িয়াছে, ১৮ এবং ১১ ভাগ নহে; তবে ১৭·৫ ভাগকে ১৮ ভাগই বলিয়া ধরা হয়।

** বেকার-সমস্যা সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

আভ্যন্তরীণ অর্থের পর্যাপ্তিই যথেষ্ট নয়, যথোপযুক্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করাও প্রয়োজন কারণ দ্রুত শিল্পপ্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে।

সরকারী ক্ষেত্রের জন্য অর্থের সংস্থান (Finance for the Public Sector):

অর্থসংগ্রহের সূত্র

সরকারী ক্ষেত্রে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়। এই অর্থসংগ্রহের সূত্রগুলির সন্ধান নিম্নলিখিত হিসাবটি হইতে পাওয়া যাইবে:

অর্থসংস্থানের হিসাব		(কোটি টাকায়)
১। বর্তমান রাজস্বের উদ্বৃত্ত (Surplus from Current Revenues):		৮০০
(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালের করের হারে	৩৫০	
(খ) অতিরিক্ত করস্থাপন	৪৫০	
২। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ (Borrowing from the Public):		১,২০০
(ক) বাজার হইতে ঋণসংগ্রহ	৭০০	
(খ) স্বল্প সঞ্চয়	৫০০	
৩। বাজেটের অন্যান্য সূত্র (Other Budgetary Sources):		৪০০
(ক) উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য রেলপথ কর্তৃক অর্থপ্রদান	১৫০	
(খ) প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমা	২৫০	
৪। বিদেশে অর্থসংগ্রহ (Resources to be raised externally):		৮০০
৫। ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing):		১,২০০
৬। বাকী—আভ্যন্তরীণ অর্থসংগ্রহের অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে পূরণ করা যাইবে (Gap—to be covered by additional measures to raise domestic resources):		৪০০
		মোট ৪,৮০০

দেখা যাইতেছে যে কর, ঋণ, অন্যান্য আয় ইত্যাদি বাজেটের সূত্র (budgetary resources) হইতে মোট ২,৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছিল। অতিরিক্ত করস্থাপনের সাহায্যে ৪৫০ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা কর অনুসন্ধানকারী কমিশনের (Taxation Enquiry Commission) সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই করা হয় এবং ঐ সকল সুপারিশ কার্যকর করারও ব্যবস্থা হয়। চলতি ও অতিরিক্ত কর মিলাইয়া বর্তমান রাজস্ব হইতে মোট ৮০০ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু কর হইতে প্রাপ্ত এই টাকা পরিকল্পনার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অ-পর্যাপ্ত। সুতরাং পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে হইলে এবং মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে করের সাহায্যে আরও অধিক অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ হিসাবে

অতিরিক্ত করের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ

যে বাকী ৪০০ কোটি টাকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আভ্যন্তরীণ সূত্র বা কর ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

জনসাধারণের নিকট ঋণগ্রহণের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ

জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণের মাধ্যমে ১,২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাজারে ঋণ হইতে সংগ্রহযোগ্য অর্থের পরিমাণ ধরা হয় ৭০০ কোটি টাকা। স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকা করিয়া সংগ্রহের আশা করা হইয়াছিল।

রেলপথ কর্তৃক অর্থ-প্রদান

রেলপথের উন্নয়ন পরিকল্পনার ৯০০ কোটি টাকার মধ্যে আশা করা হইয়াছিল যে, ১৫০ কোটি টাকার মত অর্থ রেলপথ নিজেই সরবরাহ করিবে। এই টাকা যাত্রী ও মালের উপর ভাড়ার হার পরিবর্তন এবং যাতায়াতবৃদ্ধির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রাসংগ্রহ

বৈদেশিক সূত্র হইতে ৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার সময় যে পরিমাণ বিদেশী ঋণ ও দান কার্যে লাগান হইয়াছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহার চার গুণের মত বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তির আশা করা হয়। বাণিজ্য-সর্ত ১৯৫৫-৫৬ সালের মত থাকিবে এবং মুদ্রাস্ফীতি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে—এই অনুমানের ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে হিসাব করা হয় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবের খাতে (Current Account) লেনদেনের ঘাটতি ১,১০০ কোটি টাকার মত হইবে।* ইহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইবে জমা ষ্টার্লিং হইতে। বাকী ৯০০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা, বিদেশী বাজারে ঋণসংগ্রহ, বিশ্বব্যাংকের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দান, ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দানের সাহায্যে সংগ্রহ করা হইবে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ৯০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বিনিযুক্ত হইবে। সুতরাং সরকারী ক্ষেত্রে ৮০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় উদ্বৃত্ত ৯৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা হাতে ছিল। সুতরাং সব অনুমানমত চলিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের জন্য ৭০৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করার কথা ছিল।

ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing): দেখা গিয়াছে যে মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় দ্বারা সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। পরে ইহাকে কমাইয়া ১,০৯২ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বর্তমানে আবার অনুমান করা হইতেছে যে মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ১,১৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকর

* ৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

করিবার জন্য এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহার পর্যালোচনা করিবার পূর্বে ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিলে বিচার্য বিষয় সহজ হইয়া আসিবে।

সাধারণত কর, শুল্ক প্রভৃতি রাজস্ব-পদ্ধতির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ হইতে সরকারের যে চলতি আয় হয় তাহার অধিক ব্যয় করাকেই ঘাটতি ব্যয় (deficit financing) বলা হয়। ঋণ বা জমা অর্থ হইতে তুলিয়া কিংবা অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া সরকার এই ব্যয় মিটাইয়া থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। তাহা হইল এইরূপ: কর, সরকারী প্রতিষ্ঠানের আয়, সাধারণের আমানত ও তহবিল এবং বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সরকারী আয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয় যদি বেশী হয় তবে ঐ ব্যয়কে ঘাটতি ব্যয় বলা হইবে। সুতরাং এইরূপ ব্যয়নির্বাহের পদ্ধতি হইল দুইটি: (১) সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তোলা, এবং (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করা। সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তুলিয়া ব্যয় করিলে ঐ টাকা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে; এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া পূরণ করিয়া লয়। অতএব, উভয় ক্ষেত্রেই মোট টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি পায়।

ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে

ঘাটতি ব্যয় বিচার করিবার সময় শুধু রাজস্ব খাতের ব্যয় দেখিলেই চলিবে না, মূলধন খাতের ব্যয়ও দেখিতে হইবে।

এ দেশে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ করিবার সময় দেখা হয় যে (ক) নগদ তহবিল হইতে সরকার কত টাকা উঠাইল, (খ) রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সরকারী স্বল্পমেয়াদী ঋণ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল।

এদেশে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাপ-পদ্ধতি

এখন ঘাটতি ব্যয় নীতি যুক্তিযুক্ত কিনা এবং যুক্তিযুক্ত হইলে কতটা যুক্তিযুক্ত তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করা হইয়াছিল: (১) অর্ধোন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা কর-রাজস্ব, ঋণগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় প্রভৃতি চিরাচরিত সূত্র হইতে মিটান সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় দ্রুত উন্নয়নের জন্য ঘাটতি ব্যয় প্রয়োজন। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ফলে উৎপাদনও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্ষতিকর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। (২) অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্রের তুলনায় আর্থিক ক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত হয় টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধির ততই প্রয়োজন দেখা দেয়। (৩) প্রথম পরিকল্পনায় ৪০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় করা হইয়াছিল। কিন্তু উহার ফলে বিশেষ কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই। অতএব, দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের প্রস্তাব অযৌক্তিক হয় নাই।

ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে যুক্তি

ঘাটতি ব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণা লর্ড কেইনস্ ও আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের তত্ত্ব হইতে গৃহীত। প্রাচীন ধারণা যে সরকার সকল সময়েই আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে এবং বাজেটে কোন্ ঘাটতি থাকিবে না, তাহার বিরোধিতা করিয়া কেইনস্ ও তাঁহার সমর্থকগণ বলেন, (১) একমাত্র ঘাটতি ব্যয় নীতির দ্বারাই পূর্ণনিয়োগ প্রবর্তিত রাখা যায়, (২) যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে উৎপাদনের অব্যবহৃত উপকরণ থাকে ততক্ষণ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না, (৩) অর্ধোন্নত দেশে মাত্র ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করিয়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হয়।

কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় উক্ত কেনসীয় ধারণা অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা যায় না। এইসকল দেশে নানা প্রতিবন্ধকের (bottlenecks) জন্য কেনসীয় নীতি পূর্ণ কার্যকর হইতে পারে না। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি করিলেও মূলধন-দ্রব্য ও কারিগরি-দক্ষতার অভাবহেতু কাম্য উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে না। ফলে সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির ফলে মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতিই ঘটে।

ঘাটতি ব্যয়ের বিপক্ষে যুক্তি

এই কারণে একদল আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ বলিয়াছেন যে, অর্ধোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয় যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা দুইদিক দিয়া বিচার করিতে হইবে—(ক) ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ, এবং (খ) যে পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটতি ব্যয় করা হইবে তাহা এবং ঐ ব্যয়ের সহিত সম্পর্কিত নীতি।

কতটা পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় সমর্থনীয়

এই দুই দিক বিচার করিয়াই অধ্যাপক ক্যালডোর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় অতিরিক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। একরূপ উহার জন্যই পরিকল্পনার ছাঁটকাটের সময় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণকে কমাইয়া ১,০৯২ কোটি টাকায় আনা হয়। বর্তমানে আবার উহাকে যে বৃদ্ধি করিয়া ১,১৭৫ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে তাহা আলোচনার সুরুতেই বলা হইয়াছে।*

ঘাটতি ব্যয়ের ত্রুটি প্রতিবিধানের জন্য অবলম্বনীয় পন্থা ঃ ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ কমান সম্ভব হইল না বলিয়া উহার অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য প্রতিবিধান অবলম্বন করা আবশ্যক। অন্যান্যের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিবিধানগুলিই অবলম্বনীয় বলিয়া মনে হয়ঃ প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে অনেকখানি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে। অতএব অতিরিক্ত টাকার যোগানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সব সময়েই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে ব্যাংক-ঋণ অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে দ্রব্যমূল্য

* Draft Outline of the Third Five Year Plan.

অত্যধিক বৃদ্ধি না পায়। ফটকা, আগাম বাজার প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কার্যে যেন ব্যাংক-ঋণ ব্যবহৃত না হয়। দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রাখা প্রয়োজন। অন্য কয়েকটি আবশ্যকীয় দ্রব্যের বেলায়ও এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মোটকথা, জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের আর একটি উপায় হইল ক্ষিপ্রতার সহিত উপযুক্ত কর ধার্য করা। ইহার দ্বারা অকাম্য ভোগস্পৃহাকে দমন করা যায় এবং অতিরিক্ত মুনাফা বা আকস্মিক লাভকে টানিয়া লওয়া যায়। তৃতীয়ত, র‍্যাশন, সুষম বণ্টন প্রভৃতির সাহায্যে জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ভোগের সীমারেখাকে আয়ত্তের ভিতরে রাখা এবং দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ সম্পদের অপচয় বন্ধ করা সম্ভব। রিজার্ভ ব্যাংক ব্যাপক ক্ষমতা দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দমন করিবার জন্য উপরি-উক্ত প্রতিবিধানগুলির সব কয়টিই অবলম্বন করা হইতেছে এবং ইহাতে পুরাপুরি না হইলেও কিছু কিছু সুফল ফলিতেছে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ (Investment in the Private Sector) : বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রয়োজন ঠিক কতটা হইবে মূল পরিকল্পনায় তাহা নির্ণয় করা হয় নাই। তবে ২,৪০০ কোটি টাকার মত প্রয়োজন হইবে বলিয়া ধরা হয়। ইহার জন্য সুসংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রেই এই বরাদ্দ করা হয় ৭২০ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রের অর্থসংস্থানের সূত্র কি হইবে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। তবে বলা হইয়াছিল যে যাহারা বিনিয়োগ করে তাহাদের নিজস্ব সঞ্চয় এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঞ্চয় হইবে অর্থসংগ্রহের অন্যতম সূত্র। সংগঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের হার মোটামুটি উচ্চ ও মূলধন সংগ্রহের বাজারও বেশ শক্তিশালী। এই অবস্থায় স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে অসুবিধা হইবে না। রাষ্ট্র অকাম্য বিনিয়োগ বন্ধের জন্য মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ, আমদানি-রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ, শিল্পকে লাইসেন্সভুক্তকরণ প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সাহায্য করিতে পারে। ইহা ব্যতীত করস্থাপন ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা দান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সাহায্যপ্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিতে পারে।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অর্থ-সংগ্রহের সূত্র

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reappraisal of the Second Five Year Plan) : ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে প্রবর্তনের পর হইতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরকরণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। অসুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ক্রমে উহা একরূপ সংকটে পরিণত হয়। ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) এবং পরিকল্পনা কমিশনকে (Planning Commission) প্রথম দুই বৎসরের (১৯৫৬-৫৮) পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার

১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনার পুনর্বিচার

হিসাবনিকাশ ও সম্ভাবনা বিচার করিতে হয়। এই কার্য সম্পাদন করা হয় ১৯৫৮ সালের মে মাসে। হিসাবনিকাশ ও সম্ভাবনা বিচারের ফলে পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট ও রদবদল করিতে হয়। এই ছাঁটকাট ও রদবদলই পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reappraisal) নামে অভিহিত।

পুনর্বিচারের কারণ আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, ১৯৫৬ সালে যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল তখন ইহা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা হইয়াছিল যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিবে—যথা, (১) পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, (২) নিয়মিত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের বৃদ্ধি, (৩) পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য, (৪) ন্যায্য মূল্যস্তর এবং (৫) উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের যথাযোগ্য বণ্টন ও ব্যবহার। ১৯৫৮ সালের মে মাসে হিসাবনিকাশ করিয়া দেখা যায় যে ইহার কোনটিই পূরিত হয় নাই।

পুনর্বিচারের কারণ

প্রথমত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের জন্য আবার বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। অনুমান করা হইয়াছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৎসরগুলিতে গড়ে বার্ষিক ৪৮ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইবে; কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেই এই খাতে ব্যয় হয় ১২৫ কোটি টাকা।

দ্বিতীয়ত, আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। মূল পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছিল আভ্যন্তরীণ ঋণ এবং স্বল্প সঞ্চয় হইতে গড়ে বৎসরে ২৫০ কোটি (মোট ১,২০০ কোটি টাকা) টাকা সংগৃহীত হইবে; কিন্তু প্রথম দুই বৎসরে সংগৃহীত হইয়াছিল মাত্র ৩২৭ কোটি টাকা। অবশ্য কর-রাজস্বের পরিমাণ মূল পরিকল্পনার হিসাব হইতে অধিক হয়। কিন্তু সংগে সংগে অনুৎপাদনশীল ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার জন্য এই সূত্র হইতে অনুমিত অর্থসংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, মূল্যস্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিকল্পনা প্রবর্তনের সময় হইতে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইহা মুদ্রাস্ফীতিরই সূচক। ইহার ফলে পরিকল্পনাভুক্ত কার্যক্রমের ব্যয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। ইহার সহিত যুক্ত হয় সুয়েজখাল জনিত সংকট ও আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি। এই দুইটি ঘটনার ফলে পরিকল্পনার ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের কার্যক্রম যে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পাদন করা যাইবে না তাহা সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায়।

চতুর্থত, শুধু মোট ব্যয়বৃদ্ধির প্রশ্নই নহে। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের ক্ষেত্রেই সংকট দেখা দেয়। পরিকল্পনার সুরু হইতেই লেনদেনের উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমান করা হইয়াছিল যে পরিকল্পনাকালে মোট প্রতিকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে ১,১০০ কোটি টাকা; কিন্তু দেখা যায় প্রথম

দুই বৎসরেই ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৮৮ কোটি টাকা। স্টার্লিং-উদ্বৃত্ত হইতে উত্তরোত্তর টাকা উঠাইয়া এবং বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিয়া এই ঘাটতি মিটাইতে হয়। কিন্তু স্টার্লিং উদ্বৃত্ত কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত কারেন্সী রিজার্ভের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতমে আসিয়া পৌছায় এবং বৈদেশিক ঋণ প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় নাই।

এই অবস্থায় পরিকল্পনার ছাঁটকাট এবং রদবদল করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না এবং ১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪,৮০০ কোটি টাকাতে রাখিয়াই বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমকে 'ক' ও 'খ' এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।

পুনর্বিচারের ফলে পরিকল্পনার রদবদল ও ছাঁটকাট

'ক' অংশে থাকে—(১) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কার্যক্রম, (২) কেন্দ্রস্থল অধিকারী কার্যক্রম (core projects), এবং (৩) যে-সমস্ত কার্যক্রম ও পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই 'ক' অংশের পরিকল্পনা কার্যকর করিতে ৪,৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে। 'খ' অংশভুক্ত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, এবং স্থির হয়—যদি সম্ভব না হয় তবে 'খ' অংশভুক্ত পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইবে না।

পরিশেষে, ঐ মাসেরই সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনার আবার বিচার-বিবেচনা করিয়া অনুমিত হয় যে মোট ৪,৫০০ কোটি টাকার অধিক সংগ্রহ করা যাইবে, এবং ফলে ঠিক হয় যে উহার বেশী ব্যয় করার প্রচেষ্টা করা হইবে। স্বভাবতই 'ক' অংশ কার্যকর করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবর্তিত পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ কিভাবে বণ্টিত হইয়াছে তাহা নিম্নের ছকটি হইতে বুঝা যাইবে :

(হিসাব কোটি টাকার)

	মূল পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ	কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি হেতু ব্যয় বণ্টনের রদ-বদল	ক অংশের জন্য নির্ধারিত ব্যয়
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	৫৬৮	৫১
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৯১৩	৮৬০	৮২০০
৩। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প	২০০	২০০	১৬০
৪। শিল্প ও খনিজ	৬৯০	৮৮০	৭৯০
৫। পরিবহন ও সংসরণ	১,৩৮৫	১,৩৪৫	১,৩৪০
৬। সমাজ সেবা	৯৪৫	৮৬৩	৮১০
৭। বিবিধ	৯৯	৮৪	৭০
	৪,৮০০	৪,৮০০	৪,৫০০

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে পরিবর্তিত পরিকল্পনায় ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইলে শিল্প ও খনিজ খাতে মূল পরিকল্পনার বরাদ্দ অপেক্ষা ১৯০ কোটি টাকা

অধিক এবং কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ অপেক্ষা কিছু কিছু কম ব্যয় করা হইবে। ৪,৮০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইলে শিল্প ও খনিজ খাতে মাত্র ১০০ কোটি টাকা অধিক ব্যয় করা চলিবে এবং কৃষি খাতেও ৫৮ কোটি টাকার মত ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে। বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত ৪,৫০০ কোটি টাকার ভিত্তিতেই পরিকল্পনা কার্যকরকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে অবশ্য আশা করা যাইতেছে যে আরও ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। সুতরাং সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যয় ৪,৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।*

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিশিষ্ট—ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসংকট (Appendix to the Second Five Year Plan—India's Foreign Exchange Crisis): বৈদেশিক মুদ্রাসংকট যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমস্যাসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষির উৎপাদনের অ-পর্যাপ্ত বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, অপরিমিত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহ ইত্যাদি সকলই পরিকল্পনাকে ব্যাহত করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রাসংকটই যে মূল প্রতিবন্ধকের কার্য করিয়াছে সে-সম্বন্ধে সাধারণ লোকেও সচেতন। ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচে দর্শক যেমন স্কোর বোর্ডের দিকে চাহিয়া থাকে, রিজার্ভ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের হ্রাসবৃদ্ধিও সেদিন পর্যন্ত দেশের লোক আগ্রহ ও আতংকের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। এই আগ্রহ ও আতংকই তাহাদের পরিকল্পনা-সচেতন (plan conscious) করিয়া তুলিয়াছিল। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া যখন বাহির হয় তখন অনেকের মুখেই প্রথম প্রশ্ন ছিল, পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা কত?

মুদ্রাসংকটই পরিকল্পনার মূল সমস্যা

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাসংকটকে 'স্বল্পকালীন মূল্যপ্রদান জনিত সংকট' (short-term payments crisis) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উন্নয়ন-পরিকল্পনা অনুসরণকারী অন্যান্য অর্ধোন্নত দেশের ন্যায় ভারতকে আরও এক প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইহা হইল দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের সমস্যা।** সমস্যা দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া পৃথক ভাবে উহাদের আলোচনা করা হইতেছে।

স্বল্পকালীন মুদ্রাসংকট ও দীর্ঘকালীন মুদ্রা-সমস্যা

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে 'স্বল্পকালীন মূল্যপ্রদান জনিত সমস্যা'র উদ্ভব হয় অকল্পনীয় প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের জন্য। পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছিল যে পাঁচ বৎসরে (১৯৫৬-৬১) বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবের খাতে (current account) লেনদেনের ঘাটতি পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,১০০ কোটি টাকা। ইহার

স্বল্পকালীন সংকটের আলোচনা

* Draft Outline of the Third Five Year Plan.

** P. S. Lokanathan, India's Foregin Exchange Problem.

মধ্যে ২০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা হইবে জমা স্টার্লিং হইতে এবং বাকী ৯০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ঋণ সংগ্রহ, বিশ্বব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দান, ব্যক্তিগত বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বিদেশী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও দানের মাধ্যমে। কিন্তু এই হিসাবকে ভুল প্রমাণিত করিয়া পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই—অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালে চলতি হিসাবের খাতে ঘাটতি দেখা দেয় ৩১২ কোটি টাকা এবং এই ঘাটতির মধ্যে ২২১ কোটি টাকা পূরণ করা হয় জমা স্টার্লিং হইতে খরচ করিয়া। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর বা ১৯৫৭-৫৮ সালে ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া দাঁড়ায় ৪৭৬ কোটি টাকায় এবং উহা পূরণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হইতে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাতে ভারতের মোট বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৮১৮ কোটি টাকার মত। উহা হইতে ৪৮১ কোটি টাকা (২২১+২৬০) ব্যয়িত হওয়ায় উহা কমিয়া ৩৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রামূল্যের এইরূপ অকল্পিত হ্রাসের জন্য দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট। বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। ফলে সরকারকে বিশেষ প্রতিবিধান অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল প্রতিবিধানের ফল ফলে পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে—অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে। ঐ বৎসর বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে সরকারকে মাত্র ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। এখন বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের কারণ, উহার বিরুদ্ধে প্রতিবিধান ও প্রতিবিধানের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

অকল্পিত লেনদেন ঘাটতিই সংকটের কারণ

ভারতের বিদেশী মুদ্রাসঞ্চয়ের দ্রুত অবনতির কারণ যে বহির্বাণিজ্যে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) এবং লেনদেনের উদ্বৃত্তে (Balance of Payments) অকল্পনীয় ঘাটতি তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই অনুধাবন করা যাইবে। প্রথম পরিকল্পনার সময় অধিকাংশ বৎসরে চলতি হিসাব খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হয়; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে লেনদেনের ঘাটতি হয় উক্ত ৭৮৮ (৩১২+৪৭৬) কোটি টাকা।

বহির্বাণিজ্যে এই প্রকার ঘাটতি হওয়ার প্রধান কারণ ছিল রপ্তানির তুলনায় অভূতপূর্ব আমদানি বৃদ্ধি। ১৯৫৭-৫৮ সালে আমদানির মূল্য দাঁড়ায় ১,২০৪ কোটি টাকায়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব ছিল যে ১৯৫৬-৫৭ সালে আমদানি হইবে ৭৮৩ কোটি টাকা এবং সর্বাধিক আমদানির বৎসর ১৯৫৮-৫৯ সালে উহা দাঁড়াইবে ৯৯০ কোটি টাকায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ১৯৫৭-৫৮ সালে আমদানির পরিমাণ পরিকল্পনা কমিশন অনুমিত আমদানির সর্বাধিক পরিমাণকে ছাড়াইয়া যায়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবের সহিত কার্যক্ষেত্রে আমদানির হিসাবের গরমিল হওয়ার নিম্নলিখিত হেতুগুলি ছিল: (১) আভ্যন্তরীণ উৎপাদনহ্রাসের দরুন খাদ্যশস্যের অকল্পিত আমদানিবৃদ্ধি,

লেনদেন-ঘাটতির কারণ

১। আমদানির মূল্যবৃদ্ধি

(২) আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধি ও সুয়েজ-সংকট ইত্যাদি কারণে আমদানির মূল্যবৃদ্ধি, (৩) পাকিস্তানের সহিত মনোমালিন্যের ফলে প্রতিরক্ষার উপকরণের আমদানিবৃদ্ধি, (৪) আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনার ব্যয়বৃদ্ধি, (৫) পরিকল্পনায় নূতন নূতন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি, এবং (৬) আমদানি সম্পর্কে কতকটা উদারনীতি অবলম্বন। মোটকথা, শুধু অকল্পিত কারণেই অভূতপূর্ব আমদানিবৃদ্ধি ঘটে নাই। পরিকল্পনা কমিশনও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আমদানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হিসাবে ভুল করিয়াছিল।

একদিকে যেমন আমদানিবৃদ্ধি অপরদিকে তেমনি আবার রপ্তানিহ্রাসও ঘটে। ১৯৫৫-৫৬ সালে রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ৬৪১ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৫৯৫ ও ৫৭৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রপ্তানি দ্রব্যের দাম (price) পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রপ্তানির মোট মূল্য হ্রাস পায়। ইহার অর্থ হইল ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কম পরিমাণ জিনিসপত্র বিদেশে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। এই রপ্তানিহ্রাসের কারণ ছিল বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতাবৃদ্ধি।

২। রপ্তানির মূল্যহ্রাস

সরকার কর্তৃক অবলম্বিত প্রতিবিধান (Measures adopted to tide over Foreign Exchange Crisis) : সরকার বিদেশী মুদ্রাসংকট এবং লেনদেনের ঘাটতির প্রতিবিধানকল্পে কতকগুলি পন্থা অবলম্বন হয়। প্রথমত, আমদানিকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে। বহু দ্রব্যের (বিশেষত যে-সকল দ্রব্য অপরিহার্য নয়) আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। ব্যবসায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রিত করা হয়; এমনকি আবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানি সম্পর্কে কড়াকড়ি করা হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের উৎপাদন সর্বতোভাবে বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চলে। ইহার ফলে বিদেশজাত দ্রব্যের যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা আছে তাহা দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা পূরণ করিয়া বিদেশী মুদ্রার কিছু ব্যয়সংক্ষেপ করা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্যাদির আমদানি বিলম্বে পাওনা মিটানর ব্যবস্থার (deferred payment arrangements) ভিত্তিতে করিবার চেষ্টা চলে। এই নীতি ১৯৫৭ সালের মার্চ হইতে প্রবর্তিত হয়। ইহার ফলে সুবিধামত বিদেশী প্রাপ্য পরিশোধ করার সুযোগ ঘটে। চতুর্থত, বিভিন্নভাবে বিদেশে ঋণ-সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে দ্বি-পক্ষীয় ব্যবসায় চুক্তি, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় করপোরেশন কর্তৃক অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসা, অন্যান্য দেশ এবং ব্যাংক ও ঋণদান-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি এককালীন ঋণপ্রদান প্রভৃতির সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পরিশোধ ভিত্তিতে মূলধন-দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয়। এ-বিষয়ে বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন মিত্র-ভাবাপন্ন দেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিত্রভাবাপন্ন দেশগুলি ঋণ ছাড়াও

১। আমদানি নিয়ন্ত্রণ

২। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা

৩। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য

যথেষ্ট পরিমাণে সরাসরি সাহায্য দান করে। পঞ্চমত, রপ্তানি প্রসারের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। এই সকল পন্থার মধ্যে আছে রপ্তানি প্রসার পরিষদ (Export Promotion Councils), রপ্তানি প্রসার সুপারিশ কমিটি (Export Promotion Committee), রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (State Trading Corporation), রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন (Export Risks Insurance Corporation), রপ্তানি দ্রব্যের মান নির্ধারণ প্রভৃতি। বাণিজ্য প্রসারের জন্য অন্যান্য দেশের সংগে নানারকমের চুক্তি সম্পাদিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির দ্বারা পাওনা ভারতের নিকট অন্য দেশের টাকায় পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুগোশ্লোভিয়ার সহিত চুক্তির কথা উল্লেখ করা যায়। ইহা ব্যতীত, করস্থাপন বিষয়ে সরকার দেশের রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। উপরন্তু, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য উপযোগী কর ও মুদ্রানীতি অবলম্বন করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংক পরিমাণমূলক এবং নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Quantitative and Selective and Direct Credit Control) করিয়া দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি রোধ করিতে চেষ্টা করে।

৪। রপ্তানি প্রসার

৫। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ

মুদ্রাসংকটের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অবলম্বিত উপরি-উক্ত প্রতিবিধানগুলির ফলে পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটে। শুধু যে ১৯৫৭-৫৮ সালের তুলনায় প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত ৪৭৬ কোটি টাকা হইতে ৩৩৯ কোটি টাকায় পরিণত হয় তাহাই নহে, বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণও ২৬০ কোটি হইতে কমিয়া ৪৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি বিশ্লেষণ করিলে কিন্তু দেখা যায় যে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দমিত হয় মূলত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের জন্য। ১৯৫৮-৫৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন মিত্রভাবাপন্ন দেশের নিকট হইতে ২১৬ কোটি টাকার সরকারী ঋণ (Official Loans) ও মোট ৪১ কোটি টাকার সাহায্য পাওয়া যায়। ইহা না পাইলে অবস্থা চরমে উঠিত। কারণ, পাওনা মিটাইবার মত অত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের তখন ছিল না।*

বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যই মূল প্রতিবিধান

অতএব, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যা হইতে পরিত্রাণের পথ হইল বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য। ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ৩,২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার মত লাগিবে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিশোধযোগ্য ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং তখন আরও বৈদেশিক

দীর্ঘকালীন বৈদেশিক মুদ্রাসমস্যা

* ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কমিয়া ১৭৩ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছিল।

ঋণের প্রয়োজন হইবে। ফলে সমস্যার সমাধান ঘটিবে না; উহা ব্যাপকতর আকারই ধারণ করিবে। ইহাই হইল উন্নয়নমুখী অর্ধোন্নত অর্থ-ব্যবস্থার 'বৈদেশিক মুদ্রাজনিত দীর্ঘকালীন সমস্যা'। ইহা অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষণস্থায়ী অবস্থা (passing phase) নয়; ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়াই বর্তমান থাকিবে। ইহা হইতে মুক্তির পথের সন্ধান তখনই মিলিবে যখন দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানিযোগ্য সম্পদ সরবরাহ করিতে পারিবে। ইহা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যথা, পরিকল্পিত উন্নয়নের গতি অব্যাহত থাকা, জনসংখ্যা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় আসা, অর্থ-ব্যবস্থা ভোগাভিমুখী (consumption oriented) না হওয়া, ইত্যাদি। স্থতরাং এদিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে এবং আমাদের ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশে এই উদ্দেশ্যে নাগরিকগণকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ইহার প্রতিকার

পরিকল্পনার দশ বৎসর (Ten Years of Planning): অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দশ বৎসর শেষ হইতে চলিল। এই দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১) অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হওয়া সম্ভব তাহার একটি হিসাব পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

এই দশ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উভয়প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,১১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার উপর আছে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা, বিভিন্ন প্রকার অর্থসাহায্য (subsidies) ইত্যাদির জন্য ১,৩৫০ কোটি টাকার মত চলতি ব্যয় (current outlays)। স্থতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হইবে ১১,৪৬০ কোটি টাকা। নিম্নে এই ব্যয়ের বণ্টন দেখান হইল:

দশ বৎসরে পরিকল্পনার ব্যয়

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	মোট (১৯৫১-৬১)
ক। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয়	১,৯৬০	৪,৬০০	৬,৫৬০
১। চলতি ব্যয়	৪০০	৯৫০	১,৩৫০
২। বিনিয়োগ	১,৫৬০	৩,৬৫০	৫,২১০
খ। বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ	১,৮০০	৩,১০০	৪,৯০০
গ। উভয় ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ	৩,৩৬০	৬,৭৫০	১০,১১০
ঘ। উভয় ক্ষেত্রে মোট ব্যয় (চলতি + বিনিয়োগ)	৩,৭৬০	৭,৭০০	১১,৪৬০

প্রথম পরিকল্পনার সফলতা

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিজ উন্নয়নের অনুমিত বৃদ্ধি ঘটে; অপরদিকে কোন অভাবনীয় প্রতিবন্ধকও দেখা দেয় নাই। ফলে ঐ পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য উৎপাদন লক্ষ্যে (targets of production) মোটামুটি পৌঁছান সম্ভব হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যা যাহা ক্রমে সংকটে পরিণত হয়। ইহার উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার রদবদল ও ছাঁটকাট করিতে হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়হ্রাস

ছাঁটকাটের দরুন সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ৪,৮০০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৪,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমানে অবশ্য অনুমান করা হইতেছে যে ৪,৫০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইবে। রদবদল ও ব্যয়হ্রাসের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় শতকরা ২৫ ভাগের পরিবর্তে ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। পরিকল্পনার ১০ বৎসরের (১৯৫১-৬১) কথা ধরিয়া মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ ও মাথাপিছু আয় শতকরা ২০ ভাগ, এবং মাথাপিছু ভোগ (*per capita* consumption) শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে।

দশ বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনায় অনুমিত কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু এ-বিষয়ে লক্ষ্যে পৌঁছান যাইবে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য হইল ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন; কিন্তু অনুমান করা হইতেছে যে পরিকল্পনার শেষে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনের অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। অনুরূপভাবে লৌহ ও ইস্পাতের বেলায় উৎপাদন-ক্ষমতা অনুমান মত ৪৫ লক্ষ টনে পৌঁছাইলেও ২৬ লক্ষ টনের অধিক ইস্পাত উৎপন্ন হইবে না। কয়লার উৎপাদনও উৎপাদন লক্ষ্য অপেক্ষা ৭০ লক্ষ টন কম হইয়া মোট ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আংশিক অসফলতা

এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছান না গেলেও আশা করা হইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য অনুরূপ আশা পোষণ করিতে পারে নাই। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের জন্য অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা; পরে উহাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে আনা হয়। এখন অনুমান করা হইতেছে যে পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষের অধিক লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে আবার অনুমান অপেক্ষা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে কর্মসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের।

এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

দ্রব্যমূল্যরোধে অক্ষমতা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসফলতার আর একটি দিকের পরিচায়ক। সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্থরু হইতেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাইকারী স্থচকসংখ্যা ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ৯৯·২ হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে ১১৮·৬-এ গিয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে পরিকল্পনা কার্যকরকরণে অস্থবিধা ত হয়ই, উপরন্তু শিল্প-বিবাদ, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদির নানারূপ সামাজিক বিক্ষোভও দেখা দেয়। পরিকল্পনা কমিশন এ-বিষয়ে উল্লেখ না করিলেও বলা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা গৃহনির্মাণ ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপরি-উক্ত আংশিক অসফলতা সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা মিলাইয়া সম্প্রসারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয়। এই দশ বৎসরে কৃষি উৎপাদনের স্থচকসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ ও শিল্পজ উৎপাদনের হার শতকরা ১২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে, বুনিয়াদি মূলধন-শিল্প (basic capital goods industries) ৮ গুণ সম্প্রসারিত হইবে, সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণবৃদ্ধি ঘটিবে ২ কোটি একরেরও অধিক এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৫৮ লক্ষ কিলোওয়াটে গিয়া দাঁড়াইবে। ক্ষুদ্র ও গ্রাম্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনের পরিমাণ ৭৪ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২১২½ কোটি গজে দাঁড়াইবে, খাদির উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে ৭৩০ লক্ষ গজের মত এবং সিল্কের উৎপাদন ২০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৩৭ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইবে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৭০০ ক্ষুদ্র কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প উপনিবেশ (industrial estates) গড়িয়া উঠিবে।

তবে দশ বৎসরের সম্প্রসারণ সত্যই প্রশংসনীয়

পরিবহন ও সংসরণের ক্ষেত্রে উঁচু রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ এবং বাণিজ্যিক যানের সংখ্যা হইবে দ্বিগুণ; ১২০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মিত হইবে, ১৩০০ মাইল রেলপথে দুইটি করিয়া লাইন পাতা হইবে এবং ৮৮০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিককরণ সমাপ্ত হইবে। ইহাদের সমন্বিত ফলে রেলপথে মালপত্র বহনের ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বহুগুণ প্রসারলাভ করিবে। চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিবে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের পর প্রতি ৫ হাজার লোকপিছু ১ জন করিয়া শিক্ষিত চিকিৎসক থাকিবেন।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল :

ক। কৃষি	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১
খাদ্যশস্য	৫২৪ লক্ষ টন	৭৫০ লক্ষ টন
তৈলবীজ	৫১ ,, ,,	৭২ " "
ইক্ষুগুড়	৫৬ ,, ,,	৭২ " "
তুলা	২৯ ,, গাঁইট	৫৪ " গাঁইট
পাট	৩৩ ,, ,,	৫৫ " "
সেচ-সমন্বিত জমি	৫১৫ ,, একর	৭০০ " একর
নাইট্রোজেন সার ব্যবহার	৫৫ হাজার টন	৩৬০ হাজার টন
খ। সমাজোন্নয়ন ও সমবায়		
(কত সংখ্যক গ্রামে সম্প্রসারিত)	——	৪০০,০০০
প্রাথমিক সমিতিসংখ্যা	১০৫,০০০	১৬৩,০০০
গ। শিল্প ও খনিজ		
নির্মিত ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা	১০ লক্ষ টন	৪৫ লক্ষ টন
উৎপাদন	১০ ,, ,,	২৬ " "
কয়লা	৩২০ ,, ,,	৫৩০ " "
মিলবস্ত্র	৩৭২ কোটি গজ	৫০০ কোটি গজ
সিমেণ্ট	২৭ লক্ষ টন	৮৮ লক্ষ টন
চিনি	১১ ,, ,,	২২.৫ ,, ,,
ঘ। শক্তি		
উৎপাদন-ক্ষমতা	২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ	৫৮ লক্ষ কিঃ ওঃ
কত সংখ্যক গ্রাম ও নগরে যোগান দেওয়া হইবে	৩,৬৮৭	১৯,০০০
ঙ। পরিবহন ও সংসরণ		
রেলপথের মালপত্র বহনের ক্ষমতা	৯১০ লক্ষ টন	১৬২০ লক্ষ টন
বাণিজ্যিক যানের সংখ্যা	১১৬,০০০	২০০,০০০
উঁচু রাস্তার পরিমাণ	৯৭,৫০০ মাইল	১৪৪,০০০ মাইল
চ। সমাজসেবা		
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রসংখ্যা	১০,০০০	৩৭,৫০০
কৃষি-বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা	১,৫০০	৫,৮০০
শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা	৫৯,০০০	৮৪,০০০
পরিবার পরিকল্পনা-কেন্দ্র	১৪৭	১,৮০০

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the main features of India's Second Five Year Plan. In what important respects does the Second Plan differ from the First Plan?

(C. U. B. A. 1958) (২৫১-২৫৪ পৃষ্ঠা)

2. The Second Five Year Plan aimed at rapid industrialisation with particular emphasis on basic and heavy industries. How far do you think this emphasis was justified?

[ইংগিত: কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অতটা শিল্পপ্রসারের ফলে অগ্রসর হওয়া উচিত হয় নাই; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিগত ভিত্তিকে আরও সুসংগঠিত করা উচিত ছিল। কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ না করা যে কতটা ভুল হইয়াছিল তাহা পরিকল্পনা কমিশন শীঘ্রই অনুভব করে; এবং ফলে কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্য, বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য, নূতন করিয়া নির্দিষ্ট হয় এবং ২৫২ এবং ২৬৭-২৬৮ পৃষ্ঠা]

3. Examine the justification for the relatively greater emphasis placed in the Second Five Year Plan on small-scale industries on the one hand and heavy basic industries on the other, than on the large-scale consumer's goods industries.

(C. U. B. A. 1957)

[ইংগিত: দ্বিতীয় পরিকল্পনার একদিকে মূল ও ভারী শিল্প এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রাতয়ন শিল্পগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত। এই সকল উদ্দেশ্যের অন্যতম হইল অনুন্নত আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।

পরিকল্পনা অনুসারে অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে অর্থনৈতিক কাঠামোতে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে এবং দ্রুত শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। উপরন্তু, কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক। এইজন্যও দ্রুত শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু দ্রুত শিল্পপ্রসার করিতে হইলে মূল ও ভারী শিল্পগুলি গড়িয়া তুলিতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে অর্থ-ব্যবস্থার কৃষিগত কাঠামোতে কতকটা দৃঢ়তা আসায় এই মূল ও ভারী শিল্প গঠনের সময় আসিয়াছে। অপরদিকে কিন্তু মূল ও ভারী শিল্পগুলিতে নিয়োগের সম্ভাবনা অধিক না থাকায় বর্তমান নিয়োগ-ব্যবস্থার জন্য অধিক শ্রম নিয়োগকারী ক্ষুদ্র পদ্ধতিরও পত্তন করিতে হইবে। মূল ও ভারী শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপর দৃষ্টি দিলে আর ভোগ্যপণ্য শিল্পের গুরুত্ব আরোপ করা যায় না।...... (২৪৩ এবং ২৫২ পৃষ্ঠা)]

4. Analyse the main differences between India's First and Second Five Year Plans and explain why the Second Plan is facing difficulties which did not appear during the First Plan Period. (C. U. B. Com. 1959) (২৫১-২৫৪, ২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা)

5. Discuss the scheme of financing the investment in the public sector under the Second Five Year Plan and give your views on the adequacy of the steps taken up till now. (C. U. B. Com. 1958) (২৬২-২৬৪ এবং ২৭০-২৭২ পৃষ্ঠা)

6. "Deficit finance in underdeveloped countries tends to be inflationary finance." Discuss the statement in the present Indian context.

(C. U. B. A. 1959) (২৬৫-২৬৬ পৃষ্ঠা)

7. What are the circumstances in which you would justify inflationary financing of development expenditure? Do these circumstances exist in India?

(২৬৩-২৬৬ পৃষ্ঠা)

8. Discuss the strains and stresses to which the Second Five Year Plan has been subjected ever since its commencement. Give in this connection a critical estimate of the progress of the Plan. (২৬৭-২৬৯ এবং ২৭৪-২৭৬ পৃষ্ঠা)

(C. U. B. A. 1960; B. Com. 1960)

9. Give in brief the achievements of planning during the last ten years.

(২৭৪-২৭৭ পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(THE THIRD FIVE YEAR PLAN)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা (Draft Outline of the Third Five Year Plan) : তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নকার্য ১৯৬০ সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ হয় এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ (tentative) খসড়া প্রকাশিত হয় ঐ সালের জুলাই মাসে। ঐ খসড়াটির ভিত্তিতে বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিবেচনার পর ১৯৬১ সালের সুরুতেই চূড়ান্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করা হইবে। এখন এই খসড়াটির ভিত্তিতেই তৃতীয় পরিকল্পনার রূপ কি হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

প্রস্তাবনা : প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন অর্থ-ব্যবস্থায় যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা এবং উন্নয়নমূলক কর্ম-পদ্ধতির সূচনা করিয়া দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে কৃষি, সেচ ও সমাজোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্প গঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রকৃতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্প্রসারণের (growth) গতিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও কর্মসংস্থান, মূল ও বুনিয়াদি শিল্প গঠন, আর্থিক বৈষম্যহ্রাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৎসরে শতকরা ৩½ ভাগ বৃদ্ধি পায় ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৪ ভাগে দাঁড়াইবে আশা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকৃতি

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য : তৃতীয় পরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ; ইহাকে মহত্তর পর্যায় বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। উহার মুখ্য উদ্দেশ্য পাঁচটি :

পাঁচটি উদ্দেশ্য

(১) পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক ৫% বা তাহার কিছু অধিক হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে যেন ঐ হার বজায় থাকে সেই পরিমাণ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা ;

(২) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতালাভ করা এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি করা ;

(৩) যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প-যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরেই নির্মিত হয় তাহার জন্য লৌহ ও ইস্পাতের ন্যায় মূল শিল্প ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্পের সম্প্রসারণ করা ;

(৪) যথাসম্ভব দেশের জনশক্তির (manpower resources) সদ্ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা (employment opportunity) বৃদ্ধি করা।

(৫) আর্থিক বৈষম্য বেশ কিছুটা দূর করিয়া সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া।

বৈশিষ্ট্য : (১) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য-সমন্বিত তৃতীয় পরিকল্পনা আকারে স্বভাবতই বৃহত্তর হইবে, ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সর্বসমেত ১০,২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরিচালনা ইত্যাদির জন্য চলতি ব্যয় (current outlay) হইবে ১,০৫০ কোটি টাকা। ফলে মোট ব্যয় ১১,২৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে ধরা হইয়াছে।

১। পরিকল্পনার বৃহত্তর আকার

তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হইল আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ (self sustaining growth)। এইজন্য পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কৃষি যদি জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং রপ্তানি-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য যোগাইতে না পারে তবে আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি কখনই প্রস্তুত হইতে পারে না।

২। আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ ও কৃষিকে অগ্রাধিকার

কৃষির সংগে সংগে অবশ্য শিল্পোন্নয়নের প্রতি সম্যক দৃষ্টি দিতে হইবে। কারণ, (১) শিল্প কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি সরবরাহ করে এবং কাঁচামালের চাহিদা সৃষ্টি করে বলিয়া কৃষির উন্নয়ন শিল্পোন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, (২) শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই জাতীয় আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পর্যাপ্ত বৃদ্ধিসাধন করিয়া সম্প্রসারণের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। পরিকল্পনার খসড়ায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে উন্নয়ন পদ্ধতিতে কৃষি ও শিল্পকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে এবং উভয়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি (power), পরিবহন প্রভৃতি উন্নয়নের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। গুরুত্ব আরোপ ব্যাপারে তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাই করা হইয়াছে।

শিল্পপ্রসারের প্রতি সম্যক দৃষ্টি

(৩) জনসম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগান সম্ভব হইবে না। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষ অনুমান অনুসারে ১৯৬৬ সালে জনসংখ্যা ৪৮ কোটিতে দাঁড়াইবে। ইহা যেন আর বেশী বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

৩। জনসম্পদের সদ্ব্যবহার ও কর্মসংস্থান

(৪) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজগঠনের উদ্দেশ্য গতিশীল করের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্পে সংগঠন, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও সামাজিক সংগঠনের

ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন (institutional changes) সাধন করা হইবে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার পুনর্গঠনই হইল সর্বপ্রধান।

৪। সমাজতান্ত্রিক গতি

(৫) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-গঠনের আর একটি উপাদান হইল নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। অর্থাৎ, গ্রামবাসীরা যাহাতে নগরবাসীদের মতই জীবন উপভোগ করিতে পারে তাহা দেখা। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ন্যূনতম সমাজ-সেবার (minimum social services) ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাদের মধ্যে আছে পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি। মোটামুটিভাবে কোন গ্রামই ইহাদের সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হইবে তাহা হইতেও গ্রামবাসীরা উপকৃত হইবে।

৫। নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তারতম্য

(৬) তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা করা হইবে। যে-সকল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তাহাদের উন্নয়নের অধিক প্রচেষ্টা করা হইবে।

৬। আঞ্চলিক সমতা

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বিশেষ ব্যাহত করিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও যাহাতে এইরূপ না ঘটে তাহার জন্য দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের (price stabilisation) ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাজেট-ঘাটতি যথাসম্ভব পরিহার করা ছাড়াও ঋণ-সৃজনও (credit creation) নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।

ব্যয়-বরাদ্দ : তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১১,২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৭,২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) ৬,২০০ কোটি টাকা এবং ১,০৫০ কোটি টাকা হইল চলতি ব্যয় (current outlay)। বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ৪,০০০ কোটি টাকার সমস্তটাই বিনিয়োগ-ব্যয়। সরকারী ক্ষেত্রের ৭,২৫০, কোটি টাকা ব্যয় মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে বণ্টিত হইয়াছে।

বিনিয়োগ-ব্যয় ও চলতি ব্যয়

কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১,০২৫ কোটি টাকা
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১,৫৭৫ „ „
মূল ও বৃহদায়তন শিল্প	১,১০০ „ „
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৫০ „ „
খনিজ ও তৈল	৪০০ „ „
পরিবহন ও সংসরণ	১,৪৫০ „ „
সমাজসেবা	১,২৫০ „ „
অন্যান্য	২০০ „ „
মোট	৭,২৫০ কোটি টাকা

তিনটি পরিকল্পনার বরাদ্দের মধ্যে তুলনা (Comparison of the Three Plans in respect of Outlay) : নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের সহিত তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক ব্যয়-বরাদ্দ দেখানো হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	মোট (প্রথম + দ্বিতীয় পরিকল্পনা)	তৃতীয় পরিকল্পনা
ক। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় (বিনিয়োগ-ব্যয় + চলতি ব্যয়)	১,৯৬০	৪,৬০০	৬,৫৬০	৭,২৫০
খ। বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় (বিনিয়োগ-ব্যয়)	১,৮০০	৩,১০০	৪,৯০০	৪,০০০
গ। উভয় ক্ষেত্রে মোট ব্যয় (চলতি + বিনিয়োগ)	৩,৭৬০	৭,৭০০	১১,৪৬০	১১,২৫০

উন্নয়নের গতি ও উৎপাদনের লক্ষ্য :

(১) মোট জাতীয় আয় গড়ে বাৎসরিক হারে বৃদ্ধি পাইবে ৫% ;

(২) খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩ কোটি টনের মত বৃদ্ধি পাইয়া ১০½ কোটি টনে দাঁড়াইবে ;

(৩) মোট কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৩০-৩৩ ভাগ ;

(৪) সমাজোন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা ৩,১১২ হইতে ৫,২১৭ তে দাঁড়াইবে এবং ফলে দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্নয়নের অধীনে আসিবে ;

(৫) সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৮ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ১ কোটি ১৮ লক্ষ কিলোওয়াটে পৌঁছিবে ;

শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন

(৬) শিল্পক্ষেত্রে ইস্পাতের উৎপাদন ২৬ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৯ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে ; মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৫০০ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ৫৮০ কোটি গজ এবং সিমেণ্ট ও চিনির উৎপাদন হইবে যথাক্রমে ৮০ লক্ষ টন হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন ও ২৫ লক্ষ টন হইতে ৩০ লক্ষ টন। কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণের অধিক হইবে এবং বাই-সাইকেলের উৎপাদন হইবে প্রায় দ্বিগুন। নির্মিত মোটর গাড়ীর সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষে দাঁড়াইবে। কয়লার উৎপাদন ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া হইবে ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন।

(৭) পরিবহন ও সংসরণের ক্ষেত্রে রেলপথের মালবহনের ক্ষমতা ১৬ কোটি ২০ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টনে পৌছিবে। ১,২০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মিত হইবে, পথঘাটের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং জাহাজী শক্তির পরিমাণ ২ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধি পাইবে;

পরিবহন ও সংসরণ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ

(৮) সমাজসেবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিল্প বিশেষ সম্প্রসারিত হইবে এবং চিকিৎসা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির অধিকতর সুব্যবস্থা করা হইবে; ইহা ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনাও ব্যাপকতর আকার ধারণ করিবে;

সমাজসেবার গতি

(৯) পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

অর্থসংস্থান (Financing the Plan): অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ করা হইবে:

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা
চলতি হারে বর্তমান কর-রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	–১০০ কোটি টাকা	৩৫০ কোটি টাকা
রেলপথ প্রদত্ত অর্থ	১৫০ " "	১৫০ " "
অন্যান্য সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাভ	...	৪৪০ " "
সাধারণের নিকট হইতে ঋণ	৮০০ " "	৮৫০ " "
স্বল্প সঞ্চয়	৩৮০ " "	৫৫০ " "
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি	২১৩ " "	৫১০ " "
নূতন কর ইত্যাদি	১,০০০ " "	১,৬৫০ " "
বৈদেশিক সাহায্য	৯৮২ " "	২,২০০ " "
ঘাটতি ব্যয়	১,১৭৫ " "	৫৫০ " "
মোট	৪,৬০০ কোটি টাকা	৭,২৫০ কোটি টাকা

হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ ও ঘাটতি ব্যয় ছাড়া অন্যান্য সকল সূত্র হইতেই অধিক অর্থসংস্থানের আশা করা হইয়াছে। রেলপথ হইতে অধিক অর্থগ্রহণের ব্যবস্থা করিলে রেলপথের নিজস্ব সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এইজন্যই ইহা করা হয় নাই। ঘাটতি ব্যয় দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় অর্ধেকেরও কম ধার্য করিবার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে বর্তমানেই ইহার অধিক ঘাটতি ব্যয় অনুমান করিয়া অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। দ্রব্যমূল্যের গতির দিকে লক্ষ্য করিয়া ঠিক হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯৫০ কোটি টাকার মত নূতন টাকাকড়ি চালু করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে ব্যাংক

ব্যবস্থা ৪০০ কোটি টাকা যোগান দিবে। অতএব, ৫৫০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় করা যাইতে পারে। তবে উৎপাদন যদি অনুমান অপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এব অর্থনৈতিক অবস্থায় যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তবে প্রয়োজনমত আরও ঘাটতি ব্যয়ের কথা পরে চিন্তা করা যাইতে পারে।

পরিকল্পনা কার্যকরকরণের জন্য অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ১,৬৫০ কোটি টাকা সংগ্র করা অপরিহার্য। ইহার ফলে কর-রাজস্ব জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগে দাঁড়াইবে ইহা অবশ্যই অতি কঠিন কার্য। ইহার জন্য কর ভিত্তিতে (tax structu প্রশস্ততর করিতে হইবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় শ্রেণীর করবৃদ্ধির উপর নি করিতে হইবে।

হিসাব করা হইয়াছে যে পরিকল্পনায় মোট ৩,২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মু প্রয়োজন হইবে। ইহা মিত্রভাবাপন্ন দেশগুলি হইতে পাওয়া যাইবে। ত ই মধ্যে মাত্র ২,২০০ কোটি টাকা সরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রের জন্য পাওয়া যাইবে বাকি ১,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০০ কোটি টাকা যাইবে বেসরকারী বিনিয়োগ ক্ষেত্রে, ৫০০ কোটি টাকা লাগিবে পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য এবং ২০০ কে টাকা প্রয়োজন হইবে আশংকা দূরিকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুতের (buffer stock of foodgrains)।

উপসংহার : তৃতীয় পরিকল্পনার উক্ত-খসড়া যে বিবেচনা সাপেক্ষ তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিবেচনার পর ১৯৬১ সালের প্রথম দিকে পরিকল্পনার যে চূড়ান্ত প্রকাশিত হইবে তাহাতে অনেক বিষয়ই পরিবর্তিত হইতে পারে—কারণ ইতিমধ্যে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Give in brief the Draft Outline of the Third Five Year Plan. (২৭৯-২৮৪ প

2. Discuss the main aims of the Third Five Year Plan and describe main heads of expenditure under it. (২৭৯-২৮০ এবং ২৮১ প

3. Indicate the characteristics of the Third Five Year Plan. In what respe if any, do they differ from those of the Second Five Year Plan. (২৮০-২৮১ প

4. Describe and comment on the method of financing the Third Five Year Plan. (২৮৩-২৮৪ প

অধ্যক্ষ অরুণকুমার সেন প্রণীত

ভারতীয় অর্থবিদ্যা

[৪র্থ সংস্করণ—১৯৬০]

পরিশিষ্ট স্লিপ

(Due Slip নহে)

ীয় অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর যে-সকল মূল পরিবর্তন সংঘটিত হইবে তাহা করিয়া ১৯৬১, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালের Two-year Degree urse এবং Three-year Degree Course-এর পরীক্ষার পূর্বে একটি পরিশিষ্ট বাহির করা হইবে। পরিশিষ্টটি এই স্লিপের পরিবর্তে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।
